তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

তাফসীরে মাযহারী

তাফসীরে মাযহারী

তৃতীয় খণ্ড

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পারা

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

মাওলানা মোহাম্মদ মহসীন অনূদিত

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদক ঃ মাওলানা মোহাম্মদ মহসীন

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ শে অক্টোবর, ১৯৯৮ ইং

খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, খাজা বাকী বিল্লাহ্ মহল্লা— কোমাইগাড়ী, নওগাঁ'র
বার্ষিক মহফিল উদযাপন উপলক্ষে—
হিজরী ১৪১৯।

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ৭ই আগষ্ট, ২০০৯ ইং

বিনিময় ঃ তিনশত সত্তর টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI (Volume-III): Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Mohammad Mohsin and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange: Taka Three Hundred Seventy only US$ 20.00

ISBN 984-70240-0003-3

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কে আমরা? কোথা থেকে এসেছি? যাবোই বা কোথায়? এ রকম বিস্ময়খচিত প্রশ্নাবলী আমাদের সংবেদনশীলতাকে বার বার নাড়া দিয়ে যায় নাকি? জীবনের সচল, সরব পরিব্রাজনা জুড়ে বেজে ওঠে নাকি সঠিক নোঙরের আকুতি? প্রবৃত্তি পরিকীর্ণ পৃথিবীর উদাসীন অধিবাসী আমরা। আমাদের এ ঔদাসীন্যের কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ ভেদ করে বার বার আলোকোজ্জ্বল আকাশের ঠিকানা চিনিয়ে দিয়েছেন যাঁরা, তাঁদেরকে মান্য না করলে স্খলন, পতন ও আক্ষেপানল যে অনিবার্য— সে কি আমরা জানি না? কেউ জানি। কেউ জানি না। কেউ আবার জেনেও মানি না। কেউ হয়ে যাই উপেক্ষাপ্রবন। কেউ প্রতিপক্ষ। কেনো?

বিশ্বাসের অক্ষয় আকাশের আলো নিয়ে, জীবনের চিরন্তন ঠিকানা নিয়ে যাঁরা সুপ্ত ও অবিমৃশ্য মানবতার জড়তা ভাঙিয়েছেন— তাঁরাই নবী ও রসুল। মানবতার সত্তায়, আত্মায় তাঁরাই জ্বালিয়েছেন প্রজ্ঞার প্রদীপ, ফুটিয়েছেন অনন্ত ভালোবাসার অবাক পুষ্প। বলেছেন, ভালোবাসতে হবে মানুষকে। মানুষের স্রষ্টাকে। প্রত্যাদেশিত তাঁরা। তাঁরাই প্রিয়ভাজন মহাবিশ্বের মহাপ্রতিপালকের। যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, প্রতিপালন করেন— যিনি অন্তরে জ্বালিয়ে দেন বিশ্বাসী ভালোবাসার সুখদ দহন— তিনিই একমাত্র উপাস্য। এসো সমসময়ের মানুষ, এসো অনাগত মানবতা— আমরা কেবল তাঁর উপাসনায় নিমগ্ন হই। পূর্ণ করি আমাদের পৃথিবীতে আগমনের মূল উদ্দেশ্যকে। সময়ের তরঙ্গাভিঘাতে সমুৎকীর্ণ করি তাঁর ওই বৈভবিত বাণীর অনুরণন— আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় সন্নিকটে, বিশ্বাসীদের জন্য শুভসমাচার।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীতে প্রেরিত পুরুষগণের শুভ আগমন না ঘটলে মানবতা কখনোই নির্মাণ করতে সক্ষম হতো না সভ্যতার সংজ্ঞা, ন্যায়-অন্যায়ের যথাযথ বিভাজন। চিনতো না নিজেকে, মহামানবতাকে — এক, অননুভব্য ও প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালককে। তাঁরাই নিয়ে এসেছেন আকাশী জ্ঞান— আসমানী কিতাব।

সকল নদী যেমন সমুদ্রে এসে শেষ হয়, সকল উন্মেষ যেমন এক সময়ে এসে হয়ে যায় পরিণতি ও পূর্ণতা— ঠিক তেমনি নভজ বাণীবৈভবের ক্রমধারাও এক সময়ে এসে ধারণ করলো সমাপ্তিচিহ্ন। এলেন সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম, পূর্ণতম ও শেষতম রসুল, অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মি) নবী— প্রজ্ঞার সম্রাট। নিয়ে এলেন আকাশী জ্ঞানের সম্মিলিত সমারোহ। এ অনন্ত, অতল জলধির অনিঃশেষ সলিল এখন আমাদের তৃষ্ণার উপকূলে মগ্ন তরঙ্গ হয়ে আহ্বানমুখর। তবে আমরা কেনো অভিনিবেশী হবো না মহাগ্রন্থ কোরআনের কালোত্তর কণ্ঠের প্রতি। আমাদের শ্রুতি, স্মৃতি ও জ্ঞানান্বেষণকে কেনো করবো না সতত উৎকর্ণ।

এই অক্ষয় আহ্বানের প্রণোদনা নিয়ে আমরা এবার অক্ষরান্তরে ব্রতী হয়েছি কোরআনের এক উন্মোচিত ভাষ্যের। স্বভাষায় এই উন্মোচনের (তাফসীরের) মহতী উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তাফসীরে মাযহারীকে কেন্দ্র করে। প্রায় তিনশ' বছর আগের এই মহতী তাফসীর গ্রন্থটির রচয়িতা স্বনামধন্য কাযী ছানাউল্লাহ্‌ পানিপথী রহ.। তাঁর এই অনবদ্য রচনাটি একই সঙ্গে কালজ ও কালোত্তর। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এর অন্তর্গত আবেদন কখনো নিঃশেষ হবার নয়। তাই আমাদের উদ্দেশ্য, এই অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বঙ্গবাসী জনতাও বৈভবিত হোক— হোক প্রাজ্ঞ পরিব্রাজক—চলমান প্রহরের, প্রহরান্তরের। একান্ত প্রার্থনা—— আমাদের প্রহরাশ্রু, আমাদের ভাবনা বেদনা এভাবে হোক অক্ষয়তার অমল প্রত্যুষ। সফলতার স্নিগ্ধ শ্যামল আশ্রয়ণ। মানবাত্মার অবিরল উড়াল— দীদারের তৃষ্ণা, বিরহদগ্ধতার দলিল।

থামাও মানবতা। তোমার প্রবৃত্তিপ্রপীড়িত অপবিশ্বাস কণ্টকিত চপল চঞ্চল বিহ্বল পদযাত্রা থামাও। ওই শোনো—পবিত্র কোরআনের মর্মস্পর্শী, প্রেমপরিপ্লুত, পুণ্যপরিপ্লাবিত আহ্বান— হে মানুষ! কী সে যে তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে, তোমাদের দয়াময় প্রভুপ্রতিপালকের স্মরণকে! নামাও মানবতা। ক্ষণিকের এ পৃথিবীর নিতান্ত অশোভন দর্প ও উন্নাসিকতার অসুন্দর পতাকা নামাও। এসো পাপের পৃথিবীকে করি মহাপুণ্যের শান্তিময়তা, পবিত্র আনন্দের কাংখিত বেহেশত। মুছে ফেলি সকল সীমানা— প্রবৃত্তির, ভ্রান্তির, সংকীর্ণতার। এই আকাশী আহ্বানের অনুরণন নিয়েই বাস্তবে উদ্ভাসন ঘটলো তাফসীরে মাযহারী তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অক্ষরান্তরের। সকল প্রশংসা প্রশস্তি মহারাজাধিরাজ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর। তাঁর একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারে অন্য কারো উপস্থিতি মাত্র নেই। তাঁরই অপার দয়ায় ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে আমাদের এই অনন্যসাধারণ প্রকাশনা। সোবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি সোবহানাল্লহিল আজিম।

এই বিশাল কর্মকাণ্ডের আমরা পরিচালক নই। পরিচারক মাত্র। আমাদের পদবিক্ষেপের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলেছে কুণ্ঠা ও আনন্দ। কুণ্ঠার কারণ আমাদের সীমাবদ্ধতা, অযোগ্যতা ও পুণ্যহীনতা। আর আনন্দের কারণ সফলতার সুষমা ও সংরাগ। আমরা চাই— আমাদের এই মিশ্র অনুভূতি দু'চোখের নদী হয়ে নামুক। স্বসমাজ ও সমসময়ের মানুষের সঙ্গে আমরাও অনুতাপের প্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে তুলে আনি পরিত্রাণের পুষ্প ও পীযূষ। পথ দীর্ঘ। কিন্তু গন্তব্য নিশ্চিত। আমরা তাই আশায় বুক বেঁধে চলেছি।

গ্রন্থকর্তা কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী রহ. পৃথিবীখ্যাত আলেম ও আরেফ। তাঁর পবিত্র বংশধারা নেমে এসেছে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান জিন্নুরাইন রাদ্বিআল্লহু আনহু থেকে। আর তাঁর রূহানী সংশ্লিষ্টতা নেমে এসেছে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লহু আনহু থেকে। তিনি ছিলেন সত্যানুসারী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এক স্বনামধন্য ইমাম। ছিলেন ইমামে আজম আবু হানিফার মাজহাবভুক্ত। আর তরিকার দিক থেকে সিলসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়া আলীয়ার সঙ্গে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর এই কালজয়ী তাফসীর গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই ফুটে উঠেছে তাঁর পীর ও মোর্শেদ বিস্ময়কর বুজর্গ ব্যক্তিত্ব শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা রহ. এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা— ইমাম মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. পর্যন্ত যাঁর আত্মিক সম্পৃক্ততা পৌঁছেছে এভাবে— শায়েখ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী— শায়েখ সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী— খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী— ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন।

বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে অর্জিত বিদ্যা (এলমে হুসুলী) এবং সত্তাসঞ্জাত বিদ্যার (এলমে হুজুরীর) অবাক নিদর্শন। বর্ণনানির্ভর বিদ্যার (রেওয়ায়েতের) সঙ্গে তিনি মিলিয়েছেন দেরায়েত

(প্রজ্ঞা) ও ফেরাসাতকে (অন্তর্দৃষ্টিকে)। ফলে জ্ঞানের এক পরিপূর্ণ ইশারা নিয়ে গ্রন্থটি ফুটে উঠেছে মহাকালের কালজ কাননে। অনন্য তাঁর বিদ্যাবত্তা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা। আধুনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার এ এক বিস্ময়কর মিলনতীর্থ। যেনো প্রতর্কের সতত সংক্ষোভের তরঙ্গে ভাসমান এক অচঞ্চল তরণী— পরিত্রাণের, পরিব্রাজনার, জ্ঞানানুসন্ধানের। তাই তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে এ যুগের বায়হাকী (ইমাম বায়হাকী) বলে। একই সঙ্গে দ্রোহ ও মান্যতা নিয়ে তিনি প্রতিটি আলোচনাকে দিয়েছেন মহাজ্ঞানের বিনম্র প্রসারতা। সে কারণেই এ অনন্যসাধারণ তাফসীর গ্রন্থটি সর্বমহলে সম্মানার্হ। ভাষার আড়াল সরিয়ে প্রজ্ঞার এই অনন্য আকাশকে স্বসমাজে উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্যই তাই আমাদের এ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।

এই খণ্ডটির অনুবাদ করেছেন এ নগণ্য ফকিরের প্রিয় রূহানী ফরজন্দ মাওলানা মোহাম্মদ মহসীন। অনুবাদকের নেপথ্যে রয়েছে ফকির দরবেশগণের একটি সযত্ন ও সতর্ক যুথবদ্ধতা। সর্বোপরি রয়েছে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দয়ার্দ্র অনুমোদন ও প্রশ্রয়। আমরা তাই বিশ্বাস ও অধ্যবসায় নিয়ে অতিক্রম করে চলেছি সাম্প্রতিকতাকে, সমস্যাসংকুলতাকে।

সকল স্তবস্তুতি আল্লাহ্তায়ালার। আর সকল উৎকৃষ্ট দরূদ শেষতম নবী মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। তাঁর সকল নবী রসুল ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি। তাঁর পবিত্র পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দের প্রতি। আমাদের পীর ও মোর্শেদ ইমামুল আউলিয়া শায়েখ হাকিম আবদুল হাকিম রহ. সহ সকল আউলিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি। আমিন।

তাফসীর গ্রন্থটি রচিত হয়েছিলো আরবী ভাষায়। আমাদের অনুবাদ চলেছে দিল্লীর নাদওয়াতুল মুসান্নিফিনের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈম কৃত উর্দু অনুবাদ থেকে। আর আয়াতের বাংলা তরজমাটি আমরা নিয়েছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের কুরআনুল করীম থেকে। তরজমাটি আমাদের বিবেচনায় সুন্দর। এর জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, আর্থিক ও শারীরিকভাবে যাঁরা এ মহতী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়েছেন— তাঁদেরকে আল্লাহ্পাক দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন। তাঁদের পরলোকগত মাতা-পিতাকে আল্লাহ্পাক বিনা হিসাবে জান্নাতবাসী করুন। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

বিদগ্ধ পাঠক সমাজের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করি, ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিতে এলে জানাবেন— যাতে আমরা সংশোধনের সুযোগ লাভ করে ধন্য ও কৃতজ্ঞ হই।

ওয়াস্সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

পঞ্চম পারা — সুরা নিসা ঃ আয়াত ২৪ — ১৪৭

ষষ্ঠ পারা — সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৪৮ — ১৭৬

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১ — ৮২

তাফসীরে মাযহারী

তৃতীয় খণ্ড

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পারা

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২৪ — ১৭৬

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১ — ৮২

পঞ্চম পারা

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

❑ এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহের বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করিবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সধবা নারীদেরকে এখানে 'মুহসানাত' বলা হয়েছে। এর অর্থ তারা হেফাজতপ্রাপ্তা। সধবা নারীদেরকে এ জন্যই হেফাজতপ্রাপ্তা বলা হয় যে— বিবাহ কর্ম তাদেরকে সুরক্ষিত করে। এ নারীদেরকে তখনই বিবাহ করা যাবে, যখন তারা বিধবা হবে অথবা তালাক লাভ করবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, এ আয়াত মোহাজির মেয়েদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা মুসলমান হয়েই বিধর্মী স্বামীদেরকে ছেড়ে হিজরত করেছিলেন। এমন হতো যে, অন্য কোনো মুসলমান তাঁদেরকে বিয়ে করতেন। তারপর দেখা যেতো, পূর্ব স্বামীও মুসলমান হয়েছেন। তারপর তাঁরাও হিজরত করেছেন। এই সমস্যাটিকে এড়াতেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

আমি বলি, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী আগে হিজরত করে মুসলিম দেশে এসে গেলেও তিনি নতুন করে বিয়ে বসতে পারবেন না। কারণ দু'জনেই মুসলমান হওয়ায় তাদের বিবাহবন্ধন অটুট আছে— যদিও স্বামী দারুল হরবে (যে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ) এবং স্ত্রী দারুল ইসলামে আছেন। আর যদি এমন হয় যে, স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী রাজ্যে চলে এসেছেন আর স্বামী কাফের অবস্থায় দারুল হরবে আছে— এ রকম অবস্থায় বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তখন হিজরতকারিণী নতুন করে বিয়ে বসতে পারবেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! যখন মুসলমান রমণীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে চলে আসে, তখন তোমরা তাদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে নাও। আল্লাহ্ই তাদের প্রকৃত ইমান সম্পর্কে ভালো জানেন। অনন্তর যদি তাদেরকে তোমরা মুসলমান মনে করো, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিও না। কেননা, ওই রমণীরা কাফেরদের জন্য হালাল নয়। কাফেরেরাও তাদের জন্য হালাল নয়। ওই রমণীদের বিয়ে করলে তোমরা অপরাধী হবে না।'

কিন্তু ইমামে আজম ও সাহেবাইন (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ) এর মতে, মুসলিম নারী দারুল হরব থেকে ইসলামী রাজ্যে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দারুল হরবের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ, তারা পৃথক পৃথক দেশের অধিবাসী। আর দুই দেশের আইন কানুনও আলাদা। ইমামে আজম বলেন, এভাবে পৃথক হয়ে এলে মেয়েদেরকে ইদ্দত পালন করতে হবে না কিন্তু সাহেবাইন বলেন, ইদ্দত পালন জরুরী। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, এবং ইমাম আহমদ বলেন— মুসলমান হওয়ার পর তিনবার ঋতুস্রাব অন্তে বিচ্ছিন্নতা বলবৎ হয়। তবে শর্ত হলো যদি তার স্বামীসহবাস হয়ে থাকে। সহবাস না হয়ে থাকলে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথেই পৃথক হয়ে যাবে। এই ইমামগণের নিকট রাজ্য পৃথক হওয়ার কারণে আলাদা কোনো নিয়ম নেই।

ক্রীতদাসীদের নিয়ম অন্যরকম। আতা বলেছেন, ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম এই যে— যদি কারো কোনো ক্রীতদাসী তার নিজস্ব ক্রীতদাসের বিবাহাধীনে থাকে, তবে মালিক ইচ্ছা করলে তাদেরকে বিবাহবিচ্ছিন্ন করার হুকুম জারী করতে পারবে। কিন্তু সলফে সালেহীনের নিকট এ অভিমতটি সর্ববাদীসম্মতরূপে ভুল। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মতটি বর্ণনা করেছেন— মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাসাঈ। তাঁদের বর্ণনাটি হচ্ছে—হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আওতাসের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্যে ছিলো কতিপয় সধবা মহিলা। তাদেরকে সম্ভোগ করা ঠিক হবে কিনা জানতে চেয়ে আমরা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরণাপন্ন হলাম। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আল্লাহ্তায়ালা স্পষ্ট জানালেন, গণিমত হিসেবে প্রাপ্ত বন্দিনীদের সঙ্গে সহবাস তোমাদের জন্য বৈধ। এতে কোনো গোনাহ্ নেই।

তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে— এই আয়াত নাজিল হয়েছে হুনাইন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধজয়ের পর আহলে কিতাবদের কতিপয় রমণী মুসলমানদের অধিকারাধীনা হয়। তারা ছিলো সধবা। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা তাদেরকে পেয়েছিলেন, তাঁরা তাদেরকে সম্ভোগ করতে

চাইলে তারা বলে উঠলো, আমাদের তো স্বামী আছে। একথা রসুল স. কে জানানো হলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যুদ্ধবন্দিনীদের সঙ্গে তাদের মালিকেরা সহবাস করতে পারবে। তাদের স্বামী থাকলেও তারা বিবাহবিচ্যুতা বলে গণ্য হবে। স্বামী না থাকলেতো হবেই। তবে জরায়ু ভ্রূণমুক্ত থাকা অপরিহার্য। কারণ, আওতাসের দিন রসুল স. ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, গর্ভবতীদেরকে প্রসবের পূর্বে এবং যারা গর্ভবতী নয় তাদেরকে ঋতুবতী হওয়ার আগে বিবাহ কোরো না।

বন্দিনীদের মালিকেরা তাদের অধিকৃতাদেরকে অন্যত্র বিয়েও দিয়ে দিতে পারে। অধিকৃতা বলেই পারে (অধিকার অর্থ বন্দিনীর অস্তিত্বের উপর বন্দীকারীর সার্বিক অধিকার)। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এরকমই বলেছেন। এই ইমামগণ বলেছেন, আওতাসের দিন ওই মহিলাদেরকে তাদের স্বামীসহ বন্দী করা হয়েছিলো। ইমামে আজম বলেন, কেবল বন্দিনী হলেই রমণীরা স্বামীচ্যুতা হয় না। স্বামীবিচ্ছিন্না হয় তখনই যখন একজন বন্দী হয়, অপরজন হয় না। এরকম হলে বন্দীত্বের কারণেই হবে। তবে বন্দিনী বা বন্দীর অবস্থান হতে হবে পৃথক দুই রাজ্যে। শুধু বন্দী হলেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। ইমামে আজম এই মতই পোষণ করেন। হানাফীদের বক্তব্য এই যে, রাজ্য পৃথক হলে বিবাহ আর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। আর বন্দিনীদের অধিকার লাভ করা মানে বন্দিনীদের অস্তিত্বের নির্ভেজাল মালিকানা লাভ করা। এরকম মালিকানা দ্বারা উপকার লাভ করা জরুরী নয়। কিন্তু নসের (কোরআন হাদিসের) উপস্থিতিতে এরকম অনুমাননির্ভরতা গ্রহণীয় নয়।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, আওতাসের যুদ্ধে কোনো পুরুষ বন্দী হয়নি। বন্দী হয়েছিলো কেবল রমণীরা। তিরমিজির বর্ণনায় এর সমর্থন রয়েছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আওতাসের যুদ্ধে আমরা কতিপয় মহিলাকে বন্দী করলাম। তাদের স্বামীরা ছিলো মুক্ত। এই পরিস্থিতিতেই মুসলমানেরা বন্দিনীদের সহবাসবিমুখতা সম্পর্কে রসুল স. কে জানিয়েছিলেন, আর তখনই নাজিল হয়েছিলো এই আয়াত।

আমি বলি, তিরমিজির বর্ণনায় এমন শব্দ নেই যাতে করে একথা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, মহিলারা তাদের স্বামী ছাড়াই বন্দী হয়েছিলো। এ জন্যেই ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা স্বামী ব্যতীত বন্দী হলে সাধারণ অর্থই গ্রহণীয় হবে। বিশেষ কোনো কারণ উল্লেখের প্রয়োজন হবে না। এরপর একথাটিও চিন্তা করতে হবে যে, এই আয়াতে 'অধিকারভুক্ত দাসী' বলা হয়েছে সেই সকল বন্দিনীকেও যারা সধবাও। কিন্তু পৃথক রাজ্যের কথা বলা হয়নি।

হানাফীগণ বলেন, আয়াতের সাধারণ অর্থের মধ্যে ঐকমত্য নেই। কেননা, সাধারণ অর্থে তো সকল রাজ্যই অন্তর্ভূত। যুদ্ধে বন্দী হওয়া, ক্রয়সূত্রে বা মীরাসের মাধ্যমে পাওয়া—সকল রাজ্যেই সম্ভব। আয়াতের উদ্দেশ্য যদিও

ব্যাপক, কিন্তু ক্রীতদাসী প্রাপ্তির সূত্রগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত। তাই সধবা বন্দিনীদেরকে আমরা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছি। (যেমন ঐকমত্যানুসারে ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত সধবা নারীরাও বিশেষিত। এভাবেই আমরা বিবাহিতা বন্দিনীদেরকে বিশেষভাবে কিয়াস বা ধারণা করে নিয়েছি)।

আমি বলি, বিশেষভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারটা কিয়াস (ধারণা) নির্ভর হলেও তার সমর্থনে শরিয়তের দলিল থাকতে হবে। নস (কোরআন, হাদিস), ইজমা (ঐকমত্য) অথবা কিয়াস (নস ও ইজমা সমর্থিত অনুমান) — কিছু একটা তো থাকতেই হবে। ব্যক্তিগত অভিমতের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবই নয়। তাই ক্রয় করার বিষয়টি ছাড়া অন্য সূত্রের সধবা ক্রীতদাসীদেরকে আয়াতের ব্যাপকতার মধ্যে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, বিবাহিতা রমণী বিক্রি হওয়ার সাথে সাথে স্বামী বিচ্ছিন্না হয়ে পড়ে। বিক্রি হয়ে যাওয়াই তার জন্য তালাকপ্রাপ্তা হওয়া। ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর, আব্‌দ বিন হুমাইদ্।

আমি বলি, এই আয়াতের 'মুহসানাত' শব্দটির মাধ্যমে ওই সকল স্বাধীনা রমণীকে নির্দেশ করা হয়েছে, যাদের স্বামী আছে। তাদের ও স্বামীসম্পন্না বন্দিনীদের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য তাদেরকে একসঙ্গে আলোচনায় আনা হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ হবে, স্বাধীনা সধবারা তোমাদের জন্য হারাম। কিন্তু ওই সকল সধবা হারাম নয়, যারা যুদ্ধবন্দিনী ক্রীতদাসী। এমতাবস্থায় খরিদসূত্রে অথবা মীরাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্রীতদাসীদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, খরিদ করার আগে অথবা মীরাসের অন্তর্ভূতা হওয়ার আগে তারা 'মুহসানাত' ছিলো না (স্বাধীনা সধবা ছিলো না— ক্রীতদাসীই ছিলো)।

আল্লাহ্‌তায়ালাই এই বিধান দিচ্ছেন। যাদেরকে তিনি হারাম করেছেন তারা হারামই। আর যাদেরকে হালাল করেছেন, তারা হালাল। আর এটাও আল্লাহ্‌র বিধান যে, স্ত্রীদের সংখ্যা হতে পারবে সর্বোচ্চ চারজন। ইবনে জারীর কিতাবুল্লাহ্‌র ব্যাখ্যায় হজরত ওমর বিন খাত্তাবের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম— তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে (সর্বাধিক) চারজন। ইবনে জারীহের বর্ণনাসূত্রে ইবনে মুনজির লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— এক ব্যক্তির জন্য চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হারাম ঘোষিতা ছাড়া অন্যরা হালাল। আর সংখ্যার দিক থেকে চারজনে সীমাবদ্ধ রাখাও হালাল। যারা হালাল তাদেরকে বিবাহের পয়গাম পাঠানো যাবে। তারা সম্মত হলে মোহরানা নির্ধারণ করে বিবাহ করতে হবে। মোহরানা প্রদান করা ফরজ। মোহরানা প্রদান আর অবৈধ যৌনচরিতার্থতার জন্য অর্থ ব্যয় এক কথা নয়। পবিত্রতা রক্ষা করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। নিছক যৌনপ্রয়োজন সিদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়।

মোহরানা ছাড়া বিবাহ বৈধ হবে না। রসুল স. অবশ্য এই নিয়মের ঊর্ধ্বে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'এবং ওই মুমিন নারীদেরকেও (আপনার জন্য হালাল করেছি) যে বিনা বিনিময়ে (বিনা মোহরে) নিজেকে নবীর নিকট সম্প্রদান করে, যদি নবী তাদেরকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। এ হুকুম কেবল আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়।'— এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় মোহর ব্যতীত বিবাহের অধিকার রয়েছে কেবল নবী করীম স. এর।

কিয়াস দ্বারা বুঝা যায়, মোহরানা ছাড়া বিবাহই হবে না। কিন্তু আমরা কিয়াসকে আয়াতের পশ্চাতে রেখে এসেছি। আল্লাহ্তায়ালা আরো এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের জন্য কোনো গোনাহ্ নেই যদি তোমরা রমণীদেরকে স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও অথবা তাদের জন্য মোহরানা নির্ধারণ করা না হয়ে থাকে।' এই আয়াতের শেষ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানা গেলো, মোহরানা ছাড়াও বিয়ে হতে পারে। কিন্তু আয়াত উল্লেখ করেই আমরা বলতে চাই, বিবাহের জন্য মোহরানা জরুরী। বিবাহের উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু বিবাহের প্রাক্কালেই মোহরানা নির্ধারণ জরুরী নয়। এর উপরেই ঐকমত্য হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিয়ে পড়ানোর সময় যদি মোহরানা নির্ধারণ করা না হয়ে থাকে, অথবা 'মোহরানা নির্ধারণ করা হবে না' এরকম বলা হয়ে থাকে — এমতাবস্থায় নির্জন মিলনের আগেই যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রীর মোহরানা অবশ্যম্ভাবী হবে না। কিন্তু জমহুরের অভিমত হচ্ছে, এরকম অবস্থায় 'মোহরে মেছাল' ওয়াজিব হবে (বোন অথবা ফুফুর বিয়েতে যে মোহরানা ধরা হয়েছে তাকে মোহরে মেছাল বলে)। নির্জন মিলনের পর মারা গেলে যেমন হয় তেমনি এক্ষেত্রেও হবে। আমরা বলি, স্ত্রী হালাল হওয়া সম্পদ (মোহরানা) পরিশোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই শরিয়তে মোহর নির্ধারণ করার কথা এসেছে। আয়াতের 'বি আমওয়ালিকুম' (অর্থব্যয়) শব্দটির উদ্দেশ্য এরকমই। অতএব, ইমাম শাফেয়ীর এই মন্তব্যটি ভুল যে 'মোহর উল্লেখ ছাড়া অথবা মোহর পরিশোধ করা হবে না— এই শর্তে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার পর নির্জন মিলনের আগেই মারা গেলে মোহরে মেছাল পরিশোধ করতে হবে না।' তাঁর মন্তব্যকে ঠিক মনে করলে 'বি আমওয়ালিকুম' শব্দটি অনর্থক হয়ে পড়বে।

আলকামার বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি মোহর উল্লেখ ব্যতীত বিয়ে করার পর সহবাস ব্যতীত কেউ মারা যায় তবে কী হবে? তিনি বললেন, মোহরে মেছাল ওয়াজিব হবে। এর কমও হবে না। বেশীও হবে না। আর বিধবার জন্য ইদ্দত পালন জরুরী হবে এবং সে মীরাসও পাবে। একথা শুনে হজরত মা'কাল বিন সানান আশজায়ী রা. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমাদের বংশের এক মহিলা ছিলেন বরওয়া বিনতে ওয়াশেক— তাঁর ব্যাপারেও রসুল স. এই সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন। একথা শুনে হজরত ইবনে মাসউদ সন্তুষ্ট হলেন। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, দারেমী, বায়হাকী। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।

একটি ধারণাঃ বিবাহের জন্য যদি মোহর অপরিহার্য হয়, তবে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিলে মোহরানা পরিশোধ করাও অপরিহার্য হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইমাম আহমদ ব্যতীত অন্য কেউ এরকম বলেননি। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় মোহরে মেছালের অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য জমহুরের বক্তব্যের অনুরূপ।

সমাধানঃ মুত্আ দিতে হবে (জামা, ওড়না এবং চাদর এই তিন বস্ত্রকে বলে মুত্আ)। মুত্আ অর্ধেক মোহরের স্থলবর্তী।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক বলেছেন, মোহর দেয়া হবে না একথা বলে বিয়ে করলে বিয়েই হবে না। কেননা, বিয়ে হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়ের মতো—যা স্বীকারোক্তি ও বিনিময়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। পণ্যমূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে যেমন বেচাকেনা হয় না, তেমনি মোহরানা ছাড়াও বিয়ে হয় না।

আমরা বলি, বিবাহ অবিকল বেচাকেনার মতো নয়, মোহর ওয়াজিব হওয়া শরিয়তের হুকুম (প্রকৃতপক্ষে, স্বীকারোক্তি ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে, আর শরিয়ত এজন্য মোহরকে ওয়াজিব করে দিয়েছে)। কাজেই মোহরানা ধার্য করার শর্ত অনর্থকতায় পর্যবসিত হলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু কেনাবেচার ব্যাপারটি অন্যরকম। পণ্যমূল্য নির্ধারণের উপরই ক্রয় বিক্রয়ের ভিত্তি। তাই পণ্যমূল্যের উল্লেখ না থাকলে ক্রয় বিক্রয় হবেই না।

জ্ঞাতব্যঃ এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মোহরানা হিসেবে অর্থ সম্পদ নির্ধারণ করা হোক। আর সম্পদ হতে হবে হালাল। জানা থাকা, নির্ধারিত থাকা এবং উপকার পাওয়ার জন্য অর্থ সম্পদই শরিয়তসম্মত মোহরানা। এজন্য কোরআন, হাদিস এবং এজমার দিক থেকে আকদে ইজারা (ভাড়া, চুক্তি ইত্যাদি) বৈধ। ইজারা পণ্যসামগ্রীর উপস্থিতি ব্যতিরেকেই সম্পাদিত হতে পারে। পরে প্রাপ্তব্য পণ্যসামগ্রী উপকারী হবে, না অপকারী হবে একথা জানা না থাকলেও মানুষের ব্যাপক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এরকম করা হয়েছে। যেমন বাড়ীভাড়ার ব্যাপার। বাড়ীতে বসবাস না করা পর্যন্ত বসবাসের সুবিধা অসুবিধা বাস্তবভাবে বুঝা সম্ভব নয়। তবুও বসবাসের আগেই বাড়ী ইজারা বা ভাড়া নির্ধারণ করা বৈধ হবে। শ্রমের আগেই শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমমূল্য নির্ধারণ করা, ভ্রমণের আগেই যাত্রীভাড়া ও পরিবহনমূল্য নির্ধারণ করা, শস্য উৎপাদিত হওয়ার আগেই জমির ইজারা মূল্য নির্ণয় করা, গৃহে প্রবেশের পূর্বেই বাড়ী ভাড়া ঠিক করা— এ সমস্ত কিছুই বৈধ। বিবাহের অবস্থা ঠিক এরকমই। স্বামীর যদি মোহর দেয়ার মতো সম্পদ না থাকে তবে, সুনির্দিষ্ট কোনো উপকারী বস্তুকে মোহর নির্ধারণ করলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে— এটাও সম্পদ প্রাপ্তির একটি প্রকৃতি।

মাসআলাঃ যদি বিয়ের সময় এই শর্ত করে যে, স্বামী এক বৎসর স্ত্রীর খেদমত করবে এবং এই এক বৎসরের খেদমতই হবে তার মোহর। তবে এক বৎসরের খেদমতের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে, একথা বলেছেন— ইমাম মোহাম্মদ। কারণ এই যে, এরকম সিদ্ধান্ত বিবাহের উদ্দেশ্য বিরোধী। স্বামী

স্ত্রীর খাদেম হতে পারে না। তাই সে খেদমত করতে অপারগ। আর যেহেতু মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে এক বৎসরের খেদমত। তাই স্বামীকে মোহরানা হিসেবে এক বৎসরের খেদমতের সমমূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ইমামে আজম ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন অন্যকথা। তাদের মতে, মোহরে মেছাল ওয়াজিব হবে। কেননা, খেদমত করা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই খেদমতের প্রসঙ্গটি বাতিল হওয়াই সমীচীন। অতএব, এক্ষেত্রে মোহরে মেছালই পরিশুদ্ধ।

মাসআলাঃ যদি বিবাহের সময় এই শর্ত করে যে, একজন খাদেম এক বৎসর পর্যন্ত স্ত্রীর খেদমত করবে এবং এটাই হবে বিবাহের মোহরানা তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। ওই খাদেমের শ্রমমূল্য পরিশোধ করতে হবে স্বামীকে। এটা ঐকমত্য। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, নির্ধারিত খাদেম খেদমত করতে অসম্মত হলে অন্য খাদেম নিয়োগ করা জরুরী হবে।

মাসআলাঃ যদি স্ত্রীর গৃহপালিত পশু চরানো, তার জমি চাষ করা, ফসল বোনা ইত্যাদিকে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না বলে কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে জায়েয। অবশ্য এ ধরণের খেদমত কেবল স্ত্রীরই খেদমত নয়— বরং স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই এ সমস্ত কাজ কর্ম দেখাশুনা করে থাকেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়েছে হজরত মুসা এবং হজরত শুয়াইব আলাইহিমুস্সালামের ঘটনা। আমাদের শরিয়তে ওই ঘটনার কোনো বিরুদ্ধ নির্দেশ নেই। ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজা লিখেছেন, হজরত উতবা বিন মুনজির বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. ত্ব, সিন, মীম পাঠ করছিলেন। যখন হজরত মুসার বর্ণনায় পৌছলেন তখন বললেন, হজরত মুসা তাঁর লজ্জাস্থান পবিত্র রাখার জন্য এবং জীবিকা সংস্থানের জন্য হজরত শুয়াইবের নিকট জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি ওই সময় দলিল হিসেবে পেশ করা সম্ভব যখন এটা প্রমাণিত হবে যে, ওই বকরীগুলোর মালিক ছিলেন হজরত শুয়াইবের কন্যা (তাঁর স্ত্রী)। কিন্তু বিষয়টি সেরকম ছিলো না। তাঁর স্ত্রী নন, বরং বকরীগুলোর মালিক ছিলেন স্বয়ং হজরত শুয়াইব। তাই প্রশ্ন জাগে যে, বকরী চরানোকে মোহরানা নির্ধারণ করা কী করে সম্ভব ?

মাসআলাঃ যদি কোরআনের কোনো সুরাকে শিক্ষা দেয়া মোহরানা নির্ধারণ করা হয় তবে তা বৈধ হবে। একথা বলেছেন ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী। এক বর্ণনায় এসেছে— ইমাম আহমদও এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম আজম এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, বৈধ হবে না, বরং মোহরে মেছাল ওয়াজিব হবে। প্রশ্ন হচ্ছে— হজ পালন, কোরআন শিক্ষাদান ইত্যাদি ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয কিনা। যদি জায়েয হয়, তবে কোরআন শিক্ষাকে মোহরানা নির্ধারণ করা যাবে। যদি না হয়, তবে যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যেতে পারে— ১. ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। তাই কোরআন

শিক্ষা দেয়াকে মোহরানা নির্ধারণ করাও জায়েয। ২. অন্য ইবাদত নয়—এই কোরআন শিক্ষাকেই বিশেষভাবে মোহরানা নির্ধারণ করা জায়েয।

প্রথম মাসআলার সমর্থনে রয়েছে দু'টি হাদিস। প্রথম হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত আবু সাঈদ খুদরী। হাদিসটি এই— কতিপয় সাহাবী একটি জনপদ অতিক্রম করছিলেন। তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কিন্তু ওই জনপদবাসীরা তাঁদেরকে আহার্য দিতে সম্মত হলো না। হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটলো। তাদের সর্দারকে সাপ বা বিষাক্ত কিছু দংশন করলো। তখন তারা সাহাবীগণকে বললো, তোমরা কি এর ঔষধ জানো? তোমাদের মধ্যে মন্ত্র পড়তে পারে এমন কেউ আছে কি? সাহাবীগণ বললেন, তোমরা আমাদেরকে আহার্য দিতে সম্মত হওনি; তাই বিনিময় নির্ধারণ ব্যতীত আমরা কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করবো না। তারা বিনিময় হিসেবে একপাল ছাগল দিতে সম্মত হলে হজরত আবু সাঈদ খুদরী সুরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলেন । সর্দার নিরাময় লাভ করলো। জনপদবাসীরাও ছাগল দিয়ে দিলো। সাহাবীগণ বললেন, রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা ব্যতিরেকে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি না। যখন তাঁরা রসুল স.এর নিকট উপস্থিত হয়ে সবকিছু জানালেন, তখন তিনি স. মৃদু হেসে বললেন, তোমরা কীভাবে জানলে যে সুরা ফাতিহা মন্ত্র। বকরীগুলো গ্রহণ করো আর এতে আমাকেও অংশী করো।

দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন হজরত ইবনে আব্বাস। ঘটনাটি এই— কতিপয় সাহাবী একটি ঝর্ণার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে সাপ অথবা বিচ্ছু দংশন করেছিলো। একজন বললো, তোমাদের মধ্যে কি কোনো মন্ত্র জানা লোক আছে? সাহাবীগণের একজন সুরা ফাতিহা পড়লেন। দংশিত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে গেলো। বিনিময় হিসেবে তিনি লাভ করলেন কয়েকটি ছাগল। তাঁর সঙ্গীগণ এটাকে পছন্দ করলেন না। বললেন—তুমি কিতাবুল্লাহ্‌র মজুরী নিয়েছো। তাঁরা মদীনায় ফিরে এলে রসুল স. বললেন, কিতাবুল্লাহ্‌ইতো বিনিময় গ্রহণের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বললেন, তোমরা ঠিকই করেছো। এর একটি অংশ আমাকেও দিও। বর্ণিত দু'টি হাদিসই বোখারী ও মুসলিমে লিপিবদ্ধ রয়েছে। খারেজা বিন ছলতের চাচার বর্ণনা থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ এরকম উদ্ধৃত করেছেন।

উপরোক্ত হাদিস দু'টির বিশ্লেষণার্থ এরকম হতে পারে যে, সাহাবীগণ যাদের কাছ থেকে ছাগল নিয়েছিলেন, তারা ছিলেন কাফের আর কাফেরদের তরফ হতে এরকম বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ। লক্ষ্যণীয় যে, মন্ত্রোচ্চারণ নিছক ইবাদত নয় এবং এর বিনিময় গ্রহণ করাও বৈধ (কিন্তু কোরআন শিক্ষাদান কেবলই ইবাদত)।

ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে হজরত সহল বিন সা'দ বর্ণিত নিম্নের হাদিসটি—যাতে বলা হয়েছে এক মহিলা রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসুল, আমি আমাকে আপনার নিকট সম্প্রদান করলাম। রসুল স. কোনো কথা বললেন না। মহিলা

দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। উপস্থিত এক সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসুল ওকে আমার সংগে বিয়ে দিয়ে দিন, যেহেতু আপনার প্রয়োজন নেই। রসুল স. বললেন, তোমার মোহর দেয়ার মতো কী আছে? তিনি বললেন, আমার পরিধানের এই লুঙ্গিটি ব্যতীত আমার আর কিছুই নেই। রসুলপাক স. বললেন, খুঁজে দেখো। লোহার আংটিও যদি পাও। কিন্তু ওই সাহাবী কোনো কিছুই পেলেন না। তিনি স. বললেন, তোমার কি কোরআন মুখস্থ আছে? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। অমুক অমুক সুরা আমার মুখস্থ আছে। রসুলপাক স. বললেন, তোমার ওই মুখস্থ কোরআন শিক্ষাদানের পরিবর্তে আমি এই মহিলাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে রসুল স. বললেন, ঠিক আছে। আমি এই মহিলাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। তুমি তাকে কোরআন শিক্ষা দিও। বোখারী, মুসলিম।

এই হাদিস প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এটা ছিলো রসুল স. এরই বিশেষত্ব। তিনি যেমন নিজে মোহরানা ব্যতিরেকেই বিয়ে করতে পারতেন, তেমনি অন্যকেও বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখতেন।

মাকহুল থেকে ইবনে জাওজী লিখেছেন, রসুল স. কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে একজনকে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য কারো জন্য এরকম অনুমতি নেই। লাইসের বক্তব্য হতে তাহাবী লিখেছেন, রসুল স. ছাড়া অন্য কারো জন্য এরূপ করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে ইবনে জাওজী মন্তব্য করেছেন— ইসলামের প্রথমাবস্থায় দারিদ্রের কারণে এমনটি করা হয়েছিলো।

আমি বলি, ইবনে জাওজীর মতে এ হুকুমটি পরে রহিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রহিত হওয়া বিষয়টি কোনো ধারণাসম্ভূত বিষয় নয়। আর রসুল স.ও এই বিশেষ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ইমামে আজমের অভিমত প্রমাণ করার জন্য দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ১.সাধারণতঃ ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। ২. বিশেষতঃ শিক্ষাদান মোহর হতে পারে না। প্রথমটির প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি হাদিস থেকে। যেমন, হজরত উবাদা বিন সামেত বর্ণনা করেন—আমি আহলে সুফ্ফার কতিপয় সদস্যকে লিখতে শিখিয়েছি এবং কোরআন পড়িয়েছি। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দিলেন। আমি স্থির করলাম, ধনুকটি আমি জেহাদে ব্যবহার করবো। রসুল স. কে এ কথা জানাতেই তিনি বললেন, তুমি যদি আগুনের মালা গলায় পরতে চাও তবে ধনুকটি নিতে পারো। আহমদ, আবু দাউদ। এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারীর নাম মুগীরা। ইবনে জাওজী তাকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসংগে আর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত উবাই বিন কাব রা.। তিনি বলেছেন, আমি একজনকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে একটি ধনুক উপহার দিলেন। আমি রসুল স. কে একথা জানালাম। তিনি স. বললেন, তুমি যদি এটা নাও তবে যেনো আগুনের ধনুক নিলে। একথা শুনে আমি ধনুকটি ফিরিয়ে দিলাম। ইবনে জাওজী আর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন

হজরত আব্দুর রহমান বিন সহল আনসারী থেকে। তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি কোরআন পড়ো কিন্তু সীমা অতিক্রম কোরো না এবং এর নিকট থেকে দূরেও সরে যেওনা (সম্পূর্ণরূপে পাঠ পরিত্যাগ কোরো না) আর এর জন্য বিনিময় গ্রহণ কোরো না (কোরআন শিক্ষাদানকে উপার্জনের উপকরণ বানিয়ো না) অহংকারীও হয়ো না (বিদ্যার গর্ব কোরো না)। তিবরানী।

জ্ঞাতব্যঃ সীমা অতিক্রম করা সম্পর্কে নেহায়া রচয়িতা লিখেছেন, রসুল স. সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারের হুকুম দিয়েছেন। সকল কাজে সীমাসুষমা বজায় রাখাও ওই হুকুম সমূহের একটি। মধ্যমাবস্থা সর্বাপেক্ষা উত্তম। ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা উভয় অবস্থাই মন্দ।

হজরত মিতরাফ বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, হজরত ওসমান বিন আস নিবেদন জানালেন, আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম বানিয়ে দিন। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। তবে দুর্বলতম ব্যক্তির দিকে খেয়াল রেখো এবং এমন মোয়াজ্জিন নিযুক্ত কোরো, যে বিনিময় আকাঙ্খী নয়। আহমদ। এ সমস্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা নিষেধ। অন্যান্য ইবাদতের মতো কোরআন শিক্ষার জন্যও বিনিময় নেয়া বৈধ নয়। শরিয়ত এর সম্পদগত মূল্যকে স্বীকার করেনি। আর মোহরানা সম্পূর্ণতঃই সম্পদনির্ভর। তাই কোরআন শিক্ষাকে মোহরানা নির্ধারণ করা নাজায়েয।

বায়যাবী লিখেছেন, অর্থব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়াকে বৈধ করা হয়েছে কেবল ওই সমস্ত নারীকে, যাদের ব্যাপারে নিষিদ্ধতা নেই। এই অর্থ ব্যয় করাই মোহরানা এবং শর্ত হচ্ছে অর্থ হালাল হতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, অবৈধ যৌনচরিতার্থতার জন্য এই অর্থ ব্যয়কে বৈধ করা হয়নি। বায়যাবীর উদ্দেশ্য এই যে, নিষিদ্ধ ঘোষিত রমণীরা ছাড়া অন্যান্যদের হালাল হওয়ার প্রধান শর্তই হচ্ছে অবৈধ সম্ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় না করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অর্থ ব্যতীত মহিলাদের হালাল হওয়া সম্ভবই নয় এবং বিবাহকালে মোহরানা নির্ধারণ করতেই হবে।

আমি বলি, মোহর ব্যতীত বিয়ে করলে বিয়ে বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু তাকে পরিশোধ করতে হবে মোহরে মেছাল। আর মূল্যহীন কোনো বস্তুকে মোহর নির্ধারণ করলে ওই মোহর বাতিল হয়ে যাবে এবং তদস্থলে ওয়াজিব হবে মোহরে মেছাল। এটাই ঐকমত্য। ইমাম শাফেয়ী কোরআন শিক্ষাদানকে মোহরানা নির্ধারণ করা জায়েয করেছেন এই কারণে যে, তিনি কোরআন শিক্ষা দানের বিনিময়মূল্যকে স্বীকার করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐকমত্যসম্ভূত মাসআলাটিই গ্রহণীয়।

মাসআলাঃ যদি কেউ কোনো ক্রীতদাসীকে মুক্তি দেয়ার সময় বলে, আমি এই মুক্তিদানকে মোহরানা করে তোমাকে বিয়ে করতে চাই; তবে ঐকমত্যানুসারে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, দু'জন সাক্ষীর সামনে এই শর্ত প্রকাশ করা হলে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। উম্মত জননী হজরত সাফিয়া রা. এর

বিবাহের ঘটনাটি এই মতের পরিপোষক। অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমদের বক্তব্য অবশ্য জমহুরের বক্তব্যের অনুকূলে এসেছে। জমহুরের বক্তব্য এই যে, এতে করে ক্রীতদাসী মুক্তি অবশ্যই পাবে, কিন্তু বিবাহ কবুল করা না করার ব্যাপারে সে স্বাধীনা থাকবে। যদি কবুল করে তবে সে মোহরে মেছালের অধিকারিণী হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী জমহুরের সংগে একমত হননি। তাঁরা মুক্তিপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর বিবাহ কবুল করা না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতি নন। তাদের পক্ষে জননী সাফিয়ার বিবাহের ঘটনাটিতো রয়েছেই, তদুপরি রয়েছে উম্মত জননী হজরত জুয়াইরিয়া রা. এর বিবাহের বিষয়টি। ঘটনাটি এরকম—বনী মুস্তালিকের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভূতা হয়ে এসেছিলেন হজরত জুয়াইরিয়া রা.। গণিমত বণ্টনক্রমে তিনি পড়েছিলেন ছাবেত বিন কায়েস রা. এবং তাঁর চাচাত ভাইয়ের ভাগে। হজরত ছাবেত তাঁকে মোকাতাব বলে ঘোষণা করলেন। (অর্থমূল্য পরিশোধ করে মুক্তি প্রাপ্তব্য ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে মোকাতাব বলে)। হজরত জুয়াইরিয়া রসুল স. কে একথা জানালেন। তিনি স. বললেন, এই শর্তে আমি তোমার মোকাতাবের অর্থ পরিশোধ করতে চাই যে, তুমি আমাকে বিবাহ করতে সম্মত হবে। জননী জুয়াইরিয়া বললেন, উত্তম। রসুল স. বললেন আমিও সম্মত আছি (বিবাহ করতে সম্মত আছি)। হজরত আয়েশা রা. থেকে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন আহমদ ও আবু দাউদ।

আমরা বলি, এই বিবাহ মোহর ব্যতিরেকেই সম্পাদিত হয়েছিলো। এমতো ক্ষেত্রে মোহরে মেছাল ওয়াজিব। এই হাদিসটি মোহরানা ব্যতীত বিবাহ সম্পাদনের দলিল নয়। এ বিশেষ ব্যবস্থাটি ছিলো কেবল রসুল স. এর জন্যই। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'অন্যান্য মু'মিন ব্যতীত একে আপনার বৈশিষ্ট্য করা হয়েছে।' এরকম অবস্থায় ক্রীতদাসী যদি বিবাহে অসম্মত হয়, তবে তাকে শ্রমের মাধ্যমে মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করে নিতে হবে। এরকম অভিমত পোষণ করেন ইমাম আজম, সাহেবাইন এবং ইমাম শাফেয়ী। ইমাম মালেক ও ইমাম জোফার বলেছেন— এরকম ক্ষেত্রে ক্রীতদাসীর জন্য মুক্তিপণ পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়।

ইমাম আজম, সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী তাঁদের বক্তব্যের কারণ উল্লেখ করেছেন এরকম—মনিব মুক্তিপণকে মোহরানা নির্ধারণ করেছে আর ক্রীতদাসী বিবাহে অসম্মত হয়েছে—তাই ক্রীতদাসীকে মুক্তিপণ দিতেই হবে। যদি মনিব বলে, মুক্তির শর্ত হচ্ছে এক বৎসর পর্যন্ত আমার খেদমত করতে হবে—একথা বলে মনিব যদি মারা যায় তবে ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে মনিবের ওয়ারিশগণের খেদমত করতে হবে। একথা বলেছেন ইমাম আজম এবং ইমাম আবু ইউসুফ। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, খেদমত নয় বরং খেদমতের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম মালেক ও ইমাম জোফার তাঁদের অভিমতের প্রমাণ দিয়েছেন এরকমভাবে—মুক্তিপণকে যেহেতু মোহর হিসেবে স্বীকার করা হলো না, তাই মুক্তি হবে বিনিময়বিহীন। ক্রীতদাসী যেহেতু বিবাহকেই অস্বীকার করে বসেছে, তাই বিবাহের মোহরানারূপী মুক্তিপণ পরিশোধ করা আর তার জন্য জরুরী নয়। যেমন, সে বিবাহে সম্মত হলেও তাকে মুক্তিপণ পরিশোধ করতে হতো না। তাই স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতি উভয় ক্ষেত্রে তার মুক্তি হবে বিনিময়বিহীন। এই বর্ণনাটি প্রাধান্য পেয়েছে বেশী।

মাসআলাঃ ঐকমত্যানুসারে মোহরানা নির্ধারণের ঊর্ধ্বতম কোনো সীমানির্দেশ নেই। পাত্র-পাত্রীর সম্মতি অনুসারে যতো বেশী সম্ভব মোহরানা নির্ধারণ করা যেতে পারে। মোহরানার ন্যূনতম সীমা সম্পর্কে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, ন্যূনতম মোহরের বিশেষ কোনো সীমা নেই। যে বস্তুর বিক্রয়মূল্য রয়েছে তাকেই বিবাহের মোহর নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন এই আয়াতেই বলা হয়েছে, অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো। এখানে মোহরের কম, বেশী বা বিশেষ কোনো সীমা নির্দেশ করা হয়নি। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, শরিয়তে ন্যূনতম মোহরের পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। ন্যূনতম মোহরের পরিমাণ ঠিক ততোটুকুই, যতোটুকু চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে। ইমাম আজমের মতে এর পরিমাণ হচ্ছে— এক দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) অথবা দশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)। ইমাম মালেকের মতে, এক চতুর্থাংশ দিনার অথবা তিন দেরহাম। ন্যূনতম মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার এই নির্দেশে 'আমি এ সমস্ত হুকুম অবগত আছি যা আমি তাঁদের এবং তাঁদের পত্নীগণের জন্য ফরজ করেছি।' ফরজের অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ করা। এই আয়াতের মাধ্যমে দু'টো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১. শরিয়তে মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা বলেন নির্ধারণ করা হয়নি, তাঁদের বক্তব্য এই আয়াতের বিরুদ্ধে চলে যায়। ২. মোহরের পরিমাণ নির্ধারণকারী স্বয়ং আল্লাহ্‌। এমতাবস্থায় মোহরানা যদি বান্দার ইচ্ছানির্ভর করা হয় তাহলে ফরজ কথাটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— এই আয়াতটি মোহর সম্বন্ধীয় নয় বরং এখানে মেয়েদের খোরপোষের কথা বলা হয়েছে। আয়াতের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি এরকম— 'আমি এ সমস্ত হুকুম অবগত আছি যা আমি তাঁদের এবং তাঁদের পত্নীদের জন্য ও দাসীদের জন্য ফরজ করেছি।' এখন যদি এই আয়াতটিকে মোহরানা নির্ধারণের আয়াত হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে ক্রীতদাসীদের মোহর নির্ধারণ করাও জরুরী হয়ে পড়বে। অথচ এরকম কথা কেউ বলেন না।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর মাসআলার সমর্থনে কতিপয় হাদিস উল্লেখ করেছেন। ১. হজরত সহল বিন সা'দ রা. বর্ণিত হাদিস। যেখানে রসুল পাক স. বলছেন, খুঁজে দেখো— লোহার একটি আংটিও যদি পাও। হাদিসটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে। ২. হজরত আমের বিন রবিয়া বর্ণিত হাদিস— যেখানে বলা হয়েছে এক মহিলা

একজোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। রসুল স. বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্টচিত্ত? মহিলা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বিবাহ অনুমোদন করলেন। তিরমিজি। এ হাদিসকে ইবনে জাওজী বলেছেন, বিশুদ্ধ নয়। এই সনদের একজন বর্ণনাকারীর নাম আছিম বিন উবায়দুল্লাহ্। ইয়াহিয়া বিন মুঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আরো বলেছেন, তার বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা নেই। ইবনে হাব্বানের মন্তব্য এরকমই। ৩. হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— যদি কেউ মোহর হিসেবে কোনো রমণীকে হাত ভরে খাদ্য সামগ্রী দেয়, তবে স্ত্রী হিসেবে ওই মহিলা তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মোহর হিসেবে কেউ যদি হাতের মুঠি ভরে আটা অথবা তরকারী কিংবা ছাতু দেয় তবে সে তার স্ত্রীকে হালাল বানিয়ে নেয়। দারা কুতনী। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে ছাতু অথবা খেজুর।

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের এক বর্ণনাকারী সালেহ্ বিন মুসলিম বিন রোমান সম্পর্কে দুর্বলতার অভিযোগ এনেছেন ইয়াহ্ইয়া ও রাজী। কোনো কোনো সনদে সালেহ্ বিন মুসলিমের স্থলে মুসা বিন মুসলিমের নাম এসেছে। তিনি ঠিক সুপরিচিত ছিলেন না। দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ্ বিন মোয়ামেল, আবু জোবায়ের এবং হজরত জাবের। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমরা এক লপ অথবা দুই লপের মাধ্যমে মেয়েদেরকে বিয়ে করতাম। ইমাম আহমদ বলেছেন— ইবনে মোয়ামেলের বর্ণনা মুনকার। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন দুর্বল। (অত্যধিক দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে মুনকার বলে)।

এ সম্পর্কিত আর একটি হাদিসের রাবী হচ্ছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী। তিনি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— তোমরা বিধবাদেরকে বিবাহ করো এবং আলায়েক আদায় করো। জানতে চাওয়া হলো, আলায়েক কী? তিনি স. বললেন, যার উপর উভয় পক্ষের অভিভাবক সম্মত হয়— যদিও তা হয় পিলু বৃক্ষের একটি লাঠি— দারা কুতনী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইসমাইল বিন আয়াশ থেকে। আলেমগণ বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার দলিল গ্রহণীয় নয়। এই সনদের আর এক বর্ণনাকারী হচ্ছে আবু হারুন আবদি। তার আসল নাম আম্মারা বিন জুন। হাম্মাদ বিন জায়েদ বলেছেন, সে ছিলো মিথ্যুক। ইমাম আহমদ বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। শা'বা বলেছেন, যদি সে এসে আমার গলা কেটে ফেলে তবুও তা আমার পছন্দ হবে, কিন্তু আমি তার বর্ণনা করা হাদিস গ্রহণ করতে পারবো না। সুদ্দী বলেছেন, সে ছিলো মিথ্যুক এবং ধোকাবাজ।

দারা কুতনী ও বায়হাকী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন সালমানী থেকে। তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা হজরত ইবনে আব্বাস অথবা হজরত ইবনে ওমর থেকে। শেষ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন দারা কুতনী ও তিবরানী।

ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, মোহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান কিছুই ছিলো না। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে সন্দেহযুক্ত বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীও শিথিল সনদে হজরত ওমর থেকে এ বিবরণটি দিয়েছেন। আবু দাউদ তাঁর মারাসীল গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে আব্দুল মালেক বিন মুগীরা তায়েফীর মাধ্যমে— আব্দুর রহমান সালমানী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল হক বলেছেন, এই মুরসাল হাদিসটি অন্যান্য দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। বায়হাকী ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুর রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতা আবদুর রহমান থেকে বলেছেন— কেউ যদি এক দেরহামকেও মোহর নির্ধারণ করে, তবুও তার স্ত্রী তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

ইবনে শাহীনের বর্ণনায় রয়েছে— দুই দেরহাম অথবা তার চেয়ে অধিক মোহরের উপর বিবাহ বৈধ হবে।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন— ভালো করে শোনো! মেয়েদের বিবাহ সম্পাদন করবে তাদের অভিভাবকেরা। তারা বিবাহ সম্পন্ন করবে কুফু (সমকক্ষতা) বজায় রেখে। আর লক্ষ্য রাখবে মোহর যেনো দশ দেরহাম থেকে কম না হয়। দারা কুতনী, বায়হাকী। ইবনে জাওজী বলেছেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সবগুলো মিলিত হয়েছে বশীর বিন উবায়েদের সঙ্গে। ইমাম ইবনে হাম্বল তাকে আমলই দেননি। বলেছেন, সে মিথ্যুক। তার বর্ণনা যথাযথ নয়। দারা কুতনী বলেছেন, সে মিথ্যাচারী। কিন্তু ইবনে হাব্বান বলেছেন, এ বিষয়টি বর্ণনার দিক থেকে সে নির্ভরযোগ্যই ছিলো। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্বল হলেও এর সাক্ষ্যদাতা শক্তিমান এবং বর্ণনাটির পোষকতা রয়েছে হজরত আলী থেকে। বলা হয়েছে, দশ দেরহামের কম চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না এবং দশ দেরহামের চেয়ে কম মোহরও হবে না। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন— হজরত আলী, হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর, হজরত আমের এবং হজরত ইব্রাহিম থেকে আমাদের কাছে এরকম বর্ণনা এসেছে— যাতে ন্যূনতম মোহরানা দশ দেরহাম নির্ধারিত রয়েছে। শরহে তাহাবীতে উদ্ধৃত হয়েছে— হজরত জাবেরের সূত্রানুযায়ী এটি ছিলো রসুল স. এরই নির্দেশনা। কিন্তু হজরত আলী বর্ণিত হাদিসের আর এক বর্ণনাকারী দাউদ ইজদী এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন শা'বী থেকে। ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, দাউদের বর্ণনা ধর্তব্য নয়। ইবনে হাব্বান বলেছেন, দাউদ ছিলেন বক্তব্য প্রত্যাহারকারী। আর শা'বী হজরত আলী থেকে এরকম কথা শোনেননি। অন্যান্য সূত্রে এসেছে— গিয়াস বিন ইব্রাহিমের নাম। আহমদ, বোখারী, দারা কুতনী তাকে বলেছেন মাতরুক। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন মিথ্যুক এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন বর্ণনাটি অযথার্থ।

হজরত আলীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— পাঁচ দেরহামের কম মোহর নেই। এই সনদের বর্ণনাকারীর নাম হাসান বিন দিনার। ইমাম আহমদ বলেছেন,

তার বর্ণনা লিপিবদ্ধযোগ্য নয়। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে ছিলো অপদার্থ। আবু হাতেম বলেছেন, সে ছিলো মিথ্যানুসারী।

আমি বলি, এ সকল ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, দশ দেরহাম নির্ধারণকারী কোনো বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য নয়; বরং এর বিপরীতে হজরত সহল বিন সা'দের বর্ণনাই বিশুদ্ধ। আর হাদিস বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলেও কিতাবুল্লাহকে অতিক্রম করতে পারে না। কিতাবুল্লাহ্র ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। যদি এরকম বলা হয় যে, শরিয়তের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মোহরের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে, তাই মূল্যহীন কোনো কিছুকে মোহর বলে গণ্য করা হয়নি। যেমন গমের একটি দানা, রুটির একটি টুকরা— এ সমস্তের কোনো সম্মানজনক মূল্যমান নেই। তাই শরিয়তে ন্যূনতম নির্ধারণের নিয়ম থাকা প্রয়োজন। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলবো, এ দৃষ্টিভঙ্গী কিতাবুল্লাহ্র উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। তাই এই প্রকৃতির ধারণা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন।

এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যাদেরকে সম্ভোগ করেছো তাদের মোহরানা পরিশোধ করো।' কেউ কেউ বলেছেন, এই নির্দেশটি আকদে মুত্আ (সাময়িক বিবাহ চুক্তি) সম্পর্কিত। এই ধরণের বিবাহে সময়সীমাও নির্ধারিত থাকে। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। তালাক দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু পুনঃবিবাহের জন্য স্ত্রীকে এক ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই বিবাহের আর একটি প্রকৃতি এই যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ মারা গেলে কেউ কারো মীরাস পাবে না। অর্থাৎ আকদে মুত্আয় প্রকৃত অর্থে কেউ স্বামী বা স্ত্রী নয়। বরং এরূপ বিবাহ হারাম।

মুসান্নিফ গ্রন্থে আব্দুর রাজ্জাক ইবনে জারীহের বর্ণনা থেকে আতার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস মুত্আকে (কিছু সম্পদের বিনিময়ে কয়েক দিনের জন্য বিবাহকে) হালাল মনে করতেন এবং মুত্আর সমর্থনে এই আয়াত পাঠ করতেন। তিনি আরো বলেছেন, হজরত উবাই ইবনে কা'বের ক্বেরাত ছিলো এ রকম— 'ইলা আজালিম মুসাম্মা' অর্থাৎ 'নির্দিষ্ট সময়'। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ ওমরের প্রতি রহম করুন। মুত্আ হচ্ছে আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্র এক রহমত। তিনি যদি মুত্আ নিষিদ্ধ না করতেন তবে জেনা ব্যভিচারের প্রশ্নই উঠতো না। ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো মুত্আ কি বিবাহ না জেনা? তিনি বললেন, বিবাহও নয় জেনাও নয়। পুনরায় বলা হলো, তাহলে কী? তিনি বললেন, এমনই যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো ইদ্দতের প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো, মুত্আকারী নারী-পুরুষ কি একে অপরের ওয়ারিশ? তিনি বললেন, না।

মুত্আ হালাল হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে সাহাবীগণের এক জামাতের সাথে। তাহাবী এবং নাসাঈ লিখেছেন, হজরত আসমা বিনতে হজরত সিদ্দিকে আকবর বলেন, আমরা রসুল স. এর যুগে এরকম দেখেছি। মুসলিম লিখেছেন, হজরত

জাবের বলেন, আমরা রসুল স. এর সময়, হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের খেলাফতের প্রথম যুগে এরকম করেছি। হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের শেষদিকে মুত্আ নিষিদ্ধ করে দেন। এরপর আমরা কেউ হুকুমের সীমা অতিক্রম করিনি। হজরত জাবের এবং হজরত সালমা বিন আকওয়া থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. সাহাবীগণের সামনে মুত্আর অনুমতি দিয়েছিলেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্যে এসেছে— রসুল স. আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর হজরত ইবনে মাসউদ এই আয়াত পাঠ করলেন— 'হে ইমানদারগণ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সব বস্তু হালাল করেছেন....।'

এ সকল বর্ণনানুযায়ী মুত্আ জায়েয বলে মনে হয়। অবশ্য এই জায়েয হওয়া বহাল থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ না মনসুখ বা রহিত হওয়ার দলিল না পাওয়া যায়। হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনানুযায়ী রহিত না হওয়াই প্রমাণিত হয়। আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. তায়েফে এক মহিলাকে মুত্আ করেছিলেন।

আখবারুল মদীনা গ্রন্থে স্বসূত্রে আমর বিন শায়বা লিখেছেন, হজরত সালমা বিন উমাইয়া এক মহিলাকে মুত্আ করলেন। এ সংবাদ হজরত ওমরের নিকট পৌঁছলে তিনি সালমাকে ধমক দিলেন। আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নিফ গ্রন্থে লিখেছেন— মা'বাদ বিন উমাইয়া মুত্আকে হালাল মনে করতেন। হাফেজ লিখেছেন, তাবেয়ীনদের এক জামাতও মুত্আ হালাল হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবনে জারীহ্, তাউস, আতা, হজরত ইবনে আব্বাসের ছাত্রগণ। ওই দলে আরও ছিলেন সাঈদ বিন জোবায়ের এবং মক্কার ফকিহ্গণ। এর উপর ভিত্তি করে হাকেম তাঁর উলুমুল হাদিস গ্রন্থে ইমাম আওজায়ীর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে—আহলে হেজাজের (হেজাজবাসীদের) পাঁচটি বক্তব্য পরিত্যক্ত। এর মধ্যে পড়েছে মক্কাবাসীদের মুত্আ এবং মদিনাবাসীদের স্ত্রীর সঙ্গে পায়ুসঙ্গম হালাল হওয়ার প্রসঙ্গ দু'টি।

মাসআলাঃ মুত্আ নাজায়েজ ও হারাম হওয়ার উপর এজমা হয়েছে। এখন শিয়ারা ছাড়া অন্য কেউ তাকে হালাল মনে করে না। মুত্আ হারাম হয়েছে এ আয়াত দ্বারা 'আর যারা নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, কিন্তু আপন স্ত্রীগণ ও ক্রীতদাসীগণ থেকে নয়। কেননা, এতে তাদের কোনো দোষ নেই। তবে এছাড়া যারা অন্যত্র কামলিপ্সা চরিতার্থ করতে চায় তারা সীমালঙ্ঘনকারী।' মুত্আকারী রমণীকে স্ত্রী বলা যায় না—ক্রীতদাসীও বলা যায় না। তাই তারা ওয়ারিশও হয় না। আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যত্র গমনকারীরা সীমালঙ্ঘনকারী। যদি এই আয়াতের তাফসীর হজরত ইবনে আব্বাসের মতানুসারে করা হয়, তবে একথাও মানতে হবে যে, এ হুকুমটি পরবর্তীতে রহিত হয়েছে। (কিন্তু রহিত হওয়ার বিষয়টি সকলের নিকট স্পষ্ট হয়নি)। মুসলিম লিখেছেন, রবী বিন সুবরা বিন মা'বাদ জুহুনী বর্ণনা করেন—

আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আমি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি স. বললেন— হে মানুষেরা! আমি তোমাদিগকে মুত্আ করার অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ্ এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত একে হারাম করে দিয়েছেন। কাজেই যদি তোমাদের কারও কাছে এ ধরনের রমণী থাকে তবে তাকে মুক্ত করে দাও এবং যা কিছু দিয়েছো তা ফেরৎ নিও না।

উল্লেখিত বর্ণনাকারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. আমাদেরকে মুত্আর অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই আমি এক আমেরীয়া রমণীর নিকট গেলাম। সে ছিলো যৌবনবতী, দীর্ঘ গ্রীবাধারিণী। আমি প্রস্তাব পেশ করলাম— সে বললো, তুমি আমাকে কী দিবে? আমি বললাম, চাদর। আমার সঙ্গে ছিলো আর একজন। সেও তার চাদর পেশ করলো। তার চাদর আমার চাদর থেকে উত্তম ছিলো। কিন্তু আমি ছিলাম তার চাইতে বেশী যুবক। রমণীটি আমার সঙ্গীর চাদর দেখে পছন্দ করলো, আর আমার চাদর পছন্দ না করলেও আমাকে পছন্দ করলো। বললো— তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। তুমিই আমার পছন্দ। আমি তার নিকট তিন রাত্রি অতিবাহিত করলাম। এরপর রসুল স. কে বলতে শুনলাম, যার কাছে মুত্আ রমণী আছে, সে যেনো তাকে ছেড়ে দেয়।

ইবনে মাজা বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমর ভাষণ দিলেন। ভাষণে বললেন, রসুল স. তিন দিন পর্যন্ত মুত্আর অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পরে তা হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্র কসম এখন যদি আমি কাউকে মুত্আ করতে দেখি তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেবো; যদি সে বিবাহিত হয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— হজরত ওমর তাঁর ভাষণে বললেন, মানুষেরা মুত্আকে পছন্দ করবে কেনো? রসুল স. তো মুত্আকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। মুত্আকারী ব্যক্তিকে যদি আমার কাছে আনা হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবো।

হজরত ইবনে ওমরকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন—মুত্আ হারাম করা হয়েছে। তাকে যখন বলা হলো, হজরত ইবনে আব্বাসতো এটাকে জায়েয বলেন; তখন তিনি বললেন— হজরত ওমরের যুগে এরকম কেউ বলেননি।

হজরত সালাম বিন আকওয়া বলেছেন, রসুল স. আওতাসের বৎসর তিন দিনের জন্য মুত্আর অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় আরও এসেছে— হজরত সুবরা বিন মা'বাদ বলেন, মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে আমরা যখন মক্কায় প্রবেশ করলাম তখন মুত্আর অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আগেই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। হজরত জাবের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাজেমী।

আমরা রসুল স. এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে গিয়েছিলাম। যখন শামদেশে পৌঁছলাম তখন কয়েকজন মহিলাকে দেখলাম। আমরা তাদের সঙ্গে মুত্আ করলাম। আমরা ধারণা করেছিলাম, তারা আমাদের উটে চড়ে ভ্রমণ করবে।

এরপর রসুল স. এলেন। মহিলাদেরকে দেখে বললেন, এরা কারা? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা এদের সঙ্গে মুত্‌আ করেছি। রসুল স. একথা শুনে রোষান্বিত হলেন। তাঁর স. পবিত্র গণ্ডদেশ লাল বর্ণ ধারণ করলো এবং মুখাবয়বের পবিত্র বর্ণও পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ তিনি ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার স্তবস্তুতির পর মুত্‌আকে হারাম ঘোষণা করলেন। আমরাও ওই মহিলাদেরকে বিদায় করে দিলাম। এরপর আমরা আর কখনও এরূপ করিনি।

তাহাবী উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে তাবুক অভিযানে চললাম। ছানিয়াতুল বিদায় পৌঁছে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। দেখলেন, একস্থানে প্রদীপ জ্বলছে। ভেসে আসছে নারীদের কান্না। নিকটে গিয়ে তিনি বললেন, কী হয়েছে? বলা হলো, এই রমণীদেরকে যারা মুত্‌আ করেছিলো, এখন তারা পৃথক হয়ে যাচ্ছে। রসুল স. বললেন তালাক, বিবাহ, ইদ্দত এবং মীরাস থেকে আল্লাহ্‌তায়ালা মুত্‌আকে হারাম করে দিয়েছেন। দারা কুতনীর বর্ণনায় এসেছে— আল্লাহ্‌তায়ালা তালাক, ইদ্দত ও মীরাস থেকে মুত্‌আকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

মোহাম্মদ হানাফিয়ার দুই পুত্র হাসান ও আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, মোহাম্মদ বিন আলী যখন শুনলেন হজরত ইবনে আব্বাস মুত্‌আ সম্পর্কে নম্র ভাবাপন্ন, তখন তিনি বললেন, তার একথাটি ছেড়ে দিও। কেননা, খায়বর যুদ্ধের সময় রসুল স. মুত্‌আ এবং পালিত গাধার গোশ্‌তকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— ইবনে হানাফিয়া তাঁকে বলেছিলেন, হে ইবনে আব্বাস! তোমার চিন্তায় কিছুটা অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে। বোখারী, মুসলিম।

ওরওয়া বিন জোবায়েরের মাধ্যমে মুসলিম আরও বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের মক্কায় বলেছিলেন, আল্লাহ্ কিছুসংখ্যক মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছেন, যেমন—কারো কারো চক্ষু অন্ধ হয়। যারা এরকম, তারাই মুত্‌আকে জায়েজ বলে। তিনি ওই সময় হজরত ইবনে আব্বাসের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন। শেষ বয়সে হজরত ইবনে আব্বাসের চোখ নিষ্প্রভ হয়ে আসছিলো। তিনি হজরত জোবায়েরকে ডেকে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি নির্বোধ। আল্লাহ্‌র কসম! রসুল স. এর যুগে মুত্‌আর প্রচলন ছিলো। হজরত ইবনে জোবায়ের বললেন— চিন্তা করে দেখো, তুমি এরকম করেছো কিনা। আল্লাহ্‌র কসম তুমি যদি এরকম করে থাকো তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলবো।

হজরত ইবনে আবী ওমর আনসারী বলেছেন, ইসলামের প্রথমাবস্থায় অপারগ ব্যক্তিদের জন্য মুত্‌আর অনুমতি ছিলো। যেমন —মৃত, রক্ত এবং শুকরের গোশ্‌ত। এরপর আল্লাহ্ দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন এবং মুত্‌আ নিষিদ্ধ করলেন। বায়হাকী, জুহুরীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম— পরকাল যাত্রার

আগে হজরত ইবনে আব্বাস মুত্আ হালাল হওয়া সম্পর্কিত অভিমতটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। আবু আওয়ানা তাঁর সহীহ্ পুস্তকে একথাই বলেছেন।

নাসেখ গ্রন্থে আবু দাউদ এবং আতার মাধ্যমে ইবনে মুনজির ও নুহাস বর্ণনা করেন— এই আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে— 'হে রসুল স. (মানুষকে বলে দিন) যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দিতে চাও, তখন ইদ্দতপূর্ব তালাক প্রদান করো; আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ নিজেকে তিন ঋতু পর্যন্ত বিরত রাখবে। আর তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যারা নিরাশ হয়েছে।'

বায়হাকী ও অন্যান্যরা হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য এবং আবু দাউদ ও বায়হাকী হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন— মীরাস সম্পর্কিত আয়াত মুত্আকে রহিত করে দিয়েছে।

তিরমিজি হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে উল্লেখ করেছেন, মুত্আ ইসলামের প্রথমদিকে ছিলো। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তি বা গ্রামে গিয়ে প্রয়োজনীয় কর্ম নির্বাহে অসমর্থ হয়ে পড়তো, তখন সে যে কয়দিন সেখানে থাকতো সে কয়দিনের জন্য কোনো মহিলাকে মুত্আ করে নিতো। ওই মহিলা তার জিনিসপত্র হেফাজত করতো এবং প্রাত্যহিক কাজকর্ম সেরে দিতো। তারপর নাজিল হয় সুরা মু'মিনুনের এই আয়াত— 'তবে তাদের পত্নী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না হলে তারা তিরস্কৃত হবে না।'

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, এখন স্ত্রী ও ক্রীতদাসীরা ছাড়া অন্য সবাই হারাম।

আমি বলি, সম্ভবত হজরত ইবনে জোবায়ের এবং অন্যান্য আলেমগণের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার পর হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর অভিমত থেকে সরে এসেছিলেন। সুতরাং মুত্আ রহিত হওয়া তাঁর মাধ্যমেও প্রমাণিত হলো। এক বর্ণনায় এসেছে—হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুত্আ ওই সময়ে বৈধ হবে যখন মুসাফির তার প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনে অসহায় হয়ে পড়ে। সাঈদ বিন জোবায়েরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে হাজেমী বলেছেন, ইবনে জোবায়ের বলেন, আমি হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট নিবেদন করলাম, আপনার অভিমত তো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এ নিয়ে কবিরাও অনেক কবিতা রচনা করেছে— যেগুলোর বক্তব্য এরকম— যখন শায়েখ দীর্ঘদিন যাবত অবস্থান করতে থাকলেন, তখন আমি বললাম, হে আমার বন্ধু আপনি কি ইবনে আব্বাসের অভিমতটি পছন্দ করেন? আপনি কি চান চম্পক অঙ্গুলীধারিণী রমণী আপনার অবস্থানস্থলে প্রতীক্ষারতা থাকুক?

একথা শুনে হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, সোবহানাল্লাহ্! আমিতো এরকম ফতোয়া দিইনি। মুত্আতো মৃত, রক্ত অথবা শুকরের গোশ্‌তের মতো, যা নিতান্ত অসমর্থ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও জন্য বৈধ নয়। এই বর্ণনাটি লিখেছেন, ইবনে মুনজির তাঁর তাফসীরে এবং বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে। বর্ণনাটি এরকম— 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন (আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সকলে

তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এরকম ফতোয়া দিইনি। আমার উদ্দেশ্য ওরকম নয়। নিতান্ত অসহায় ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যদের জন্য মুত্‌আ হালাল হবে না।

ইবনে জারীহও তাঁর অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সহীহ্ পুস্তকে আবু আওয়ানা লিখেছেন, বসরা শহরে ইবনে জারীহ বলেছিলেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি মুত্‌আ হালালের ফতোয়া প্রত্যাহার করে নিলাম। অথচ তিনি ইতোপূর্বে মুত্‌আ জায়েযের পক্ষে আঠারোটি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন।

একটি ধারণাঃ মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনায় মুত্‌আর হালাল হারাম প্রসঙ্গ এসেছে আওতাস যুদ্ধের প্রাক্কালে। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কাবিজয়ের দিন মুত্‌আকে হারাম করে দিয়েছেন। বোখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, মুত্‌আ হারাম হয়েছে খায়বর যুদ্ধের সময়। তাবুক যুদ্ধের সময়ে হারাম হওয়ার কথাও এসেছে অন্যত্র। এই বৈসাদৃশ্যের কারণ কী?

সমাধানঃ আওতাসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো মক্কাবিজয়ের বছরেই। বাকি রইলো খায়বর যুদ্ধের কথা। একথা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, মুত্‌আর অনুমতি দেয়া হয়েছিলো দু'বার এবং দু'বারই অনুমতি রহিত করে দেয়া হয়েছে। এরপর চিরদিনের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। একথা বলেছেন ইবনে হুম্মাম। মুসলিম শরীফে মুত্‌আ অধ্যায়ের প্রথমে মুত্‌আর অনুমতিসূচক বর্ণনা রয়েছে। এরপরও রয়েছে রহিত হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা। এই রহিত হওয়া অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হওয়া।

রবী বিন সালমানের মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন— হালাল করার পর হারাম করা হয়েছে— মুত্‌আ ব্যতীত এরকম কোনো হুকুম আমার জানা নেই। হালাল করা হয়েছে দু'বার, হারামও করা হয়েছে দু'বার। এরপর হারাম করা হয়েছে চিরদিনের জন্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন মুত্‌আ রহিত করা হয়েছে তিনবার। কেউ কেউ বলেছেন, তিনবারের অধিক। তাবুক যুদ্ধের সময় নিষিদ্ধ করার বর্ণনা দ্বারা একথা বলা যাবে না যে, তাবুকের পূর্বে অনুমতি ছিলো। বরং এটাই সত্য যে, মুত্‌আ যে চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে একথা তখনকার মুত্‌আকারীরা জানতেন না। তাই মুত্‌আর কথা শুনে রসুল স. কুপিত হয়েছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো এবং তিনি ভাষণদানের মাধ্যমে মুত্‌আর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে পুনঃ ঘোষণা দিয়েছিলেন। হাজেমী বর্ণনা করেন, স্বদেশে বা স্বস্থানে কখনোই মুত্‌আর অনুমোদন ছিলো না। সফরের অসহায়ত্বের সময় অনুমতি ছিলো এবং বিদায় হজের দিন থেকে চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়েছে।

এই আয়াতকে অধিকাংশ তাফসীরকার মুত্‌আ বিষয়ক বলেননি। বরং বলেছেন, এখানে বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সহবাসের উপকার এবং আস্বাদের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু তোমরা তাদেরকে উপভোগ করো তাই তাদের মোহরানা পরিশোধ করে দাও। হাসান এবং মুজাহিদের বক্তব্য এরকমই। ইবনে

জারীহ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— এই আয়াতটি বিবাহের মাধ্যমে উপকার প্রাপ্তি এবং মোহরানার হুকুম সম্পর্কিত আয়াত। এখানে বলা হয়েছে 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও।'

মাসআলাঃ উল্লেখিত তাফসীরের মাধ্যমে বুঝা যায়, সহবাস ব্যতীত মেয়েরা মোহরের অধিকারিণী হয় না। ইমাম মালেক তাই বলেছেন। কেবল বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে মেয়েরা সম্পূর্ণ মোহরের অধিকার লাভ করে না। অধিকার লাভ করে অর্ধেক মোহরের। সহবাসের এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তারা মোহরানার পূর্ণ অধিকার পায়। কিন্তু জমহুরের অভিমত হচ্ছে, বিয়ে হয়ে গেলেই স্ত্রী পূর্ণ মোহরের অধিকারিণী হবে। কিন্তু সহবাস ব্যতীত তালাক দিলে তখনই কেবল অর্ধেক মোহরানা বাদ পড়ে যাবে। বলা হয়েছে— 'ইন তাবতাগু বি আমওয়ালিকুম— এখানে 'বি' বর্ণটির মাধ্যমে মিলিত হওয়ার অর্থ প্রকট হয়েছে। কাজেই, বিবাহের স্বীকারোক্তির সাথে সাথেই স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহরানার অধিকার লাভ করবে। তখন সহবাসকে শর্ত করা হবে আয়াতের মর্মবিরুদ্ধ। এ আয়াতের মাধ্যমে আরও বুঝা যায় যে, উপকার লাভ এবং সহবাস করার সাথে সাথে মোহর ওয়াজিব হবে এবং তখন মোহরানা রহিত হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। কিন্তু একথা বলা যাবে না যে, বিয়ের পর সহবাস না হওয়া পর্যন্ত মোহর ওয়াজিব হবে না। এ ব্যাপারে আয়াতটি নিশ্চুপ। তাই ইমাম মালেকের দলিলটিও ভুল। আয়াত দু'টির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। আর যেহেতু কেবল বিবাহের স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই তারা সম্পূর্ণ মোহরানার অধিকারিণী হয়— তাই তাদের এমতো অধিকার রয়েছে যে, মোহর না পেলে তারা স্বামীকে সহবাসে বাধাদান করতে পারবে এবং তার অনুগমন থেকে বিরত থাকার অধিকারিণী হবে। মোহর হিসেবে যদি কোনো গোলামের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে সে গোলামকে স্বামী কখনও মুক্তি দিতে পারবে না। স্ত্রী পারবে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

'তোমরা যাদেরকে সম্ভোগ করেছো, তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে'— এ কথার মাধ্যমে মোহরানা পরিশোধ করা ফরজ করে দেয়া হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত শব্দটি হচ্ছে 'ফারিদ্বাতান'। মোহর নির্ধারণের পর স্বামী-স্ত্রী যদি এ ব্যাপারে কোনো সমঝোতায় আসে, তবে তাতে দোষ নেই। যারা এই আয়াতটি মুত্আ সম্পর্কিত বলে মনে করেন, তারা সমঝোতার ব্যাখ্যা করেন এরকম— মুত্আর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও মুত্আকারিণী সময় বাড়াতে চাইলে পারবে। তেমনি মুত্আকারী পুরুষও নির্ধারিত বিনিময় অপেক্ষা অতিরিক্ত বিনিময় পরিশোধ করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে দু'জনে একমত হতে হবে। একমত না হলে দু'জনে পৃথক হয়ে যাবে। আর যারা বিশুদ্ধ বিবাহের আয়াত বলে এই আয়াতটিকে মনে করেন, তারা সমঝোতার ব্যাখ্যা করেছেন এরকম— মোহর নির্ধারণের পর যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় অথবা সম্পূর্ণ

মোহর মাফ করে দেয় তবে তা বৈধ হবে। আবার স্বামীও যদি নির্ধারিত মোহরের অধিক মোহর পুনঃনির্ধারণ করে তবু তা জায়েয হবে।

মাসআলাঃ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতায় পুনঃনির্ধারিত (কম বা বেশী) মোহরানাই হবে প্রকৃত মোহরানা। স্ত্রী যেমন আগের নির্ধারণকৃত মোহরানার হকদার, তেমনি পুনঃনির্ধারিত মোহরানারও হকদার। দু'জনের সমঝোতায় মোহরানা পুনঃনির্ধারণে স্বামী একথা বলতে পারবে না যে, আগের মোহরানাই হলো আসল মোহরানা। পরে তো আমি অতিরিক্ত সংযোজন করেছি, পরের পরিমাণটুকুতো অনুদান—আমি ইচ্ছা করলে দিতে পারি নাও দিতে পারি।

ইমাম শাফেয়ী পরে নির্ধারিত মোহরকে আসল মোহর মনে করেন না। পরে স্ত্রী যদি তার মোহরানা কমিয়ে দেয় তবে তা স্বামীর প্রতি হেবা (দান) হবে। আর স্বামী যদি পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তবে বাড়তি পরিমাণ বিবেচিত হবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হেবা (দান)হিসেবে। দান গ্রহণকারী দানকৃত বস্তু অধিকারে না পেলে মালের মালিক হয় না। তাই মূল মোহরানার সংগে এর কোনো সংশ্রব নেই। অতিরিক্ত পাওনা পাওয়ার বিষয়টি আলাদাই রাখতে হবে। এই ব্যাখ্যাটি একদিক থেকে আমাদের হানাফী মাজহাবের অভিমতকে পোষকতা করেছে। তাই হানাফী অভিমতে বলা হয়েছে— সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একজন আর একজনকে দান করার সম্পর্ক নয়। আর এখানে প্রসঙ্গটি হচ্ছে মোহরানা বিষয়ক। দান অনুদানের প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আহমদের মতে পরের অতিরিক্ত পরিমাণও মূল মোহরের অন্তর্ভুক্ত। তাই স্বামী যদি স্ত্রীসহবাস করে অথবা মারা যায় তবে পরে নির্ধারিত অতিরিক্ত পরিমাণ সহ মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। আর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে পরে অতিরিক্ত নির্ধারণসহ যে পরিমাণ দাঁড়ায় তার অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম আজম বলেছেন, সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে প্রথমে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। পরের অতিরিক্ত অংশের অর্ধেক দিতে হবে না। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'আর যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে থাকো আর যদি মোহর নির্ধারণ করে থাকো তবে ফরজ মোহরের অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। এখানে অতিরিক্তের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম মালেক বলেছেন, সহবাসের পর পরবর্তী নির্ধারণ সহই ওয়াজিব হবে। আর সহবাসের আগে তালাক দিলে আগের পরিমাণের সঙ্গে পরের অতিরিক্ত পরিমাণের অর্ধেক দিতে হবে। যদি সহবাসের আগেই স্বামী মারা যায়, আর পরের অতিরিক্ত অংশ স্ত্রীর অধিকারে না থাকে— তবে সে অতিরিক্ত অংশ আর পাবে না।

মাসআলাঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, মোহরের হকদার নারীরা। তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারে। তারা যদি অর্ধেকের কম স্বামীকে হেবা করে

দেয়ার পর সহবাসের আগেই তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তার স্বামী পরিশোধকৃত মোহরের অর্ধেক রেখে বাকী অংশ ফেরত নেয়ার দাবী করতে পারে। বোখারী ও মুসলিমে এরকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, যে পরিমাণ স্ত্রীর অধিকারে চলে গিয়েছে, তার অর্ধেক দাবী করতে পারে। স্ত্রী তার ক্ষমাকৃত অংশ দাবী করতে পারবে না।

আয়াত শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়—এ কথার অর্থ, যে নির্দেশ তিনি জারী করলেন তার হেকমত সম্পর্কে তিনিই সম্যক পরিজ্ঞাত।

সুরা নিসাঃ আয়াত ২৫

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ
مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ
اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝

❒ তোমাদের মধ্যে কাহারো স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী যুবতী বিবাহ করিবে; আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা এক অপরের সমান সুতরাং তাহাদিগকে বিবাহ করিবে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাহারা ব্যভিচারিণী অথবা উপপতি গ্রহণকারিণী না হইয়া সচ্চরিত্রা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের মোহর ন্যায়সংগতভাবে দিবে। বিবাহিতা হইবার পর যদি তাহারা ব্যভিচার করে তবে তাহাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীদের অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারকে ভয় করে ইহা তাহাদের জন্য; ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য মংগল। আল্লাহ্ ক্ষমা-পরায়ণ, পরম দয়ালু।

'তাউলুল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে— সম্পন্ন অবস্থা। এখানে অর্থ হবে সামর্থ্য। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে উচ্চ হওয়া। পুরো অর্থটা হবে এরকম— যে ব্যক্তি স্বাধীনা রমণীদের বিবাহ করার উচ্চ যোগ্যতা স্পর্শ করতে সমর্থ নয় (যার এমন সম্পদ নেই যার দ্বারা ওই উচ্চতায় আরোহন সম্ভব) — সে যেনো অন্যের মালিকানাধীন ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করে।

স্বাধীনা রমণীরা দাসত্বের অভিশাপমুক্ত। তাই তাদেরকে বলা হয়েছে মুহ্‌সানাত্। আর নিজের ক্রীতদাসী তো ক্রীতদাসী হিসেবে রয়েছেই। এখানে বলা হয়েছে,স্বাধীনা নারী সম্ভব না হলে অন্য কোনো ক্রীতদাসীকে সে যেনো বিবাহ করে। ক্রীতদাসীকে হতে হবে মুসলমান। মুশরিক ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। এই আয়াত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ দু'টি নির্দেশ প্রমাণ করেছেন। ১.স্বাধীনা রমণীদেরকে বিয়ে করতে সমর্থদের জন্য ক্রীতদাসী বিবাহ করা হারাম। ২.আহলে কিতাব রমণীদের বিবাহ করা সাধারণতঃ হারাম। ক্রীতদাসী বিবাহ করার জন্যও রয়েছে দু'টি শর্ত— ১. স্বাধীনা রমণীদের বিবাহ করার যোগ্যতা না থাকা। ২. ক্রীতদাসীদের মুসলমান হওয়া।

হজরত জাবের এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে। বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবু জোবায়ের বলেছেন— কোনো স্বাধীন পুরুষ যেনো কোনো ক্রীতদাসীকে বিয়ে না করে। যে স্বাধীনা রমণীর মোহরানা পরিশোধ করতে সক্ষম, সে যেনো ক্রীতদাসী অভিমুখী না হয়। এই বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইবনে মুনজির হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম— আল্লাহ্ ওই ব্যক্তির জন্য ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করা হালাল করেছেন, যার স্বাধীনা রমণীদের মোহরানা পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই এবং যার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হানাফীগণ এই প্রসংগটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন কয়েক রকমভাবে। ১. আমরা উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করার পক্ষপাতি নই এবং একথাও বলি না যে, শর্তযুক্ত কোনো কিছু না সূচক হবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে কারণ সমতুল্য। যার সংগে কারণের সম্পর্ক তাও আবার অধিক উপকারী হওয়া জরুরী নয়। কারণ যার সাথে সংশ্লিষ্ট তার আবার অন্য কারণও থাকতে পারে। তাই হুকুমের সংগে শর্ত ও বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী (তবে দেখতে হবে এতে যেনো কোনো নিষিদ্ধতা না থাকে)। শর্ত ও বৈশিষ্ট্য না থাকলে হুকুম না থাকা জরুরী নয়, বরং হুকুম না হওয়ার ব্যাপারে মৌনতা বাঞ্ছনীয়। শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিতে হুকুমের সংগে দ্বিতীয় কোনো কারণ যদি সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উত্তম। অন্যথায় বুঝতে হবে হুকুম নেই। এই হুকুম না হওয়াই মূল নিষিদ্ধতা। কেননা, ঘটনাক্রমে শর্তসংলগ্নতার সঙ্গে হুকুমটি তার অবয়ব পেয়েছিলো। আসল হুকুমটি ছিলো নিষেধসূচক। আর এই নিষেধসূচতাকে অবশ্যপালনীয় শরিয়তও বলা যায় না। এখন আসল মাসআলাটির দিকে লক্ষ্য করুন। ক্রীতদাসী হোক অথবা

কাফের আহলে কিতাব হোক কিংবা স্বাধীনা রমণীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখুক অথবা নাই রাখুক— সকল অবস্থায় বিবাহ জায়েয বলে প্রমাণ রয়েছে এই আয়াতে— 'তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার ....।'

এর অনুকূলে রয়েছে আর একটি আয়াত—'উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারাআ জালিকুম।' (অর্থব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো)। কাজেই 'ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম'— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্যকে বিবাহ করে কিতাবীয়াদের বিবাহকে হারাম করে দেয়া অথবা ক্রীতদাসীকে বিবাহ করার শর্ত হিসেবে স্বাধীনা রমণীকে বিবাহ করার যোগ্যতা না থাকা— এসব কথা বলা ঠিক নয়। ২. যারা প্রচলিত অভিমতের বিরুদ্ধে তাদের কথা হচ্ছে— হুকুমটি ঘটনাক্রমে না হয়ে স্পষ্ট শর্ত এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে। স্বভাবগত এবং প্রচলনগত হওয়া চলবে না। পরিস্থিতিগত কারণে মানুষ স্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট আকাঙ্খা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনা রমণী বাদ দিয়ে ক্রীতদাসী বিবাহ করার ব্যাপারটি সেরকম। নিতান্ত অপারগতাবশতঃই মানুষ ক্রীতদাসীর পাণি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নতুবা ক্রীতদাসীর মাধ্যমে বংশধারা প্রবহমান থাকুক— এরূপ কামনা হতে পারে কার? আর মুসলমান কখনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে কাফেরকে পছন্দ করতে পারে না। মুসলমানদের এই স্বভাবজঃ বৈশিষ্ট্যের কারণে আল মুহ্সানাতের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল মু'মিনাত (ইমানদার নারী) কে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি আহলে কিতাবকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকে, তবে বাঁদীকে বিবাহ করা দুরস্ত নয়। আমরাও তাই বলি। আল মু'মিনাত নির্ধারণ করা হয়েছে ঘটনাক্রমে অথবা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে নয়, বরং এ কথা বলা হয়েছে উত্তম অবস্থা নির্ধারণার্থে। আলেমদের ঐকমত্য এরকমই। ৩. প্রকৃত জ্ঞানের বিরুদ্ধে হলেও নাজায়েয হওয়ার অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় তবুও এরকম চিন্তা অপরিহার্য নয় যে, যা মোবাহ্ (বৈধ) নয়, তা সকল ক্ষেত্রে হারাম। বরং অনেক ক্ষেত্রে যা বৈধ নয় তা মাকরূহ্ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। বেদায়া গ্রন্থে এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় রয়েছে, কিতাবীয়া ক্রীতদাসী অথবা স্বাধীনা নারী— সকলের সঙ্গে বিবাহ মাকরূহ্। কারণ, এতে করে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, আর এরকম বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমাদের মহব্বতকে শক্তিশালী করতে বৈবাহিক সম্বন্ধের তুল্য কিছু নেই। ইবনে মাজা। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।' অন্য আয়াতে এসেছে— 'যাদের প্রতি আল্লাহ গজব নাজিল করেছেন তাদের সাথে হৃদ্যতা কোরো না।' রসুল স. আরও বলেছেন, রমণীদের চারটি গুণ তাদেরকে বিবাহাধীনে পাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। সেগুলো হচ্ছে— সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য্য ও ধর্মপরায়ণতা। তোমরা ধর্মপরায়ণা রমণীর পাণি গ্রহণ করার প্রয়াসী হয়ো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত জাবেরের মাধ্যমে বর্ণিত মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতিতে

হাদিসের শব্দগুলো এসেছে এরকম— 'ধর্মানুরাগ, বৈভব এবং রূপলালিত্যের কারণে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তোমরা অগ্রগণ্য করো ধর্মানুরাগকে। হজরত আবু সাঈদ থেকে হাকেম ও ইবনে হাব্বানও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজা, বায্যার এবং বায়হাকী হজরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর থেকেও এরকম লিখেছেন। ক্রীতদাসী বিবাহ মাকরুহ্ হওয়ার কারণ এই যে, এতে করে সন্তান-সন্ততিও দাসত্বচিহ্নিত হয়। আর দাসত্ব মৃত্যু সমতুল্য। রসুল স. এরশাদ করেন, আপন ঔরসকে নির্বাচন করো, কুফু বা সুসামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে বিবাহ করো এবং করাও। আবু দাউদ, হাকেম ও বায়হাকী। বায়হাকী এই হাদিসকে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন এবং তিনি হজরত আয়েশা থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।এর পরে এরশাদ হয়েছে—'আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তোমাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হচ্ছে ইমান এবং নেক আমল। মূলতঃ তোমরা কিন্তু একই বংশোদ্ভূত। স্বাধীনা, ক্রীতদাসী— সবাই হজরত আদমের সন্তান-সন্ততি।

রসুল স. এরশাদ করেন, এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের নিকট থেকে মূর্খ যুগের অপরিচ্ছন্নতা এবং পিতা-পিতামহ নির্ভর দর্প-অহংকারকে দূর করে দিয়েছেন। মুমিন, মুত্তাকী অথবা কাফের অসৎ সবাই হজরত আদমের সন্তান। আর হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও আবু দাউদ। হজরত ওকবা বিন আমের হতে ইমাম আহমদ এবং বায়হাকী লিখেছেন, বংশগত কারণে তোমরা কেউ দোষী নও। তোমরা সকলে হজরত আদমের সন্তান। ধর্মপরায়ণতা এবং আল্লাহ্ভীতি ব্যতীত তোমরা কেউ কারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও। কর্কশভাষ্য, গালাগালি ও কৃপণতা সম্পূর্ণতঃই দোষ। রসুল স. এর বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীতদাসীর পাণি গ্রহণ করাকে যেনো কেউ মন্দ না ভাবে বরং তাদেরকে বিবাহ করতে যেনো আগ্রহী হয়।

ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে —এই নির্দেশটির মধ্যে সব রকমের ক্রীতদাসীই অন্তর্ভুক্তা। সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনা, মুকাতিবা, মুদাব্বিরা অথবা উম্মে ওয়ালাদ (যে ক্রীতদাসীকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করা হবে বলে চুক্তিবদ্ধা করা হয়েছে তাকে মুকাতিবা বলে। যে ক্রীতদাসীকে তার মালিক 'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত'— এরকম ঘোষণা দিয়েছে তাকে মুদাব্বিরা বলে। আর উম্মে ওয়ালাদ বলে ওই ক্রীতদাসীকে যে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তানের মা)। ইতোপূর্বে স্বাধীনা নারীদেরকে বিবাহ করতে অক্ষমদেরকে ক্রীতদাসী বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর এখন তাদেরকে বিবাহের পূর্বে তাদের মনিবদের অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব করে দেয়া হলো। আগের জায়েযকে 'মিম্মা মালাকাত আইমানুকুম' দ্বারা এবং এখনকার ওয়াজিবকে 'ফানকিহু' শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ক্রীতদাসদের বিবাহের ক্ষেত্রেও এরকম অনুমতি নিতে হবে। কোনো গোলামের বিবাহ তার মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। এই মাসআলাটি

ঐকমত্যসম্মত। রসুল স. এরশাদ করেন, যে ক্রীতদাস প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী। হজরত জাবের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আবু দাউদ ও তিরমিজি। তিরমিজি একে হাসান বলেছেন। সুনান গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, গোলাম যদি তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, তবে তা বাতিল হবে।

মাসআলাঃ ক্রীতদাস তার প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে, সে বিয়ে শুদ্ধ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে তার প্রভুর ইচ্ছার উপর। এই মাসআলায় মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় এবং ইমাম আহমদের বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে এ রকম— বিয়ে হয়ে যাবে, কিন্তু তা নির্ভরশীল থাকবে প্রভুর অনুমোদনের উপর। কেননা, ক্রীতদাসের বিয়ের যোগ্যতা ছিলো এবং সেই যোগ্যতানুসারে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু প্রভুর অনুমতি প্রয়োজন এজন্যই যে, তার সন্তুষ্টি ব্যতীত ক্রীতদাসী সহবাসের হক রহিত হয়ে যায়। আর ক্রীতদাসের ব্যাপারে রয়েছে মোহরানা পরিশোধের বিষয়টি, যা মালিকের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিশোধিত হতে পারে না। আয়াতে অবশ্য পূর্বানুমতির কথা আছে— প্রাক অনুমোদনের উল্লেখ নেই। তাই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিবাহই সংঘটিত হবে না। (বিয়ের পর মনিব অনুমোদন দিলেও বিয়ে ঠিক থাকবে না। বিয়ে হতে হবে আবার নতুন করে)। কেননা, রসুল স. এ ধরণের বিয়েকে বাতিল বলেছেন। আর এই আয়াতেও এরকম বলা আছে। তাই, অনুমোদন নিতে হবে পূর্বাহ্নে, পরে নয়।

বলা হয়েছে, ক্রীতদাসীদেরকে তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দিবে। এই স্পষ্ট কথাটির ভিত্তিতেই ইমাম মালেক বলেছেন, মোহরানার অধিকার ক্রীতদাসীর (মনিবের নয়)। কিন্তু জমহুরের মত এই যে, ক্রীতদাসীর মোহর পাবে তার মনিব। এখানে বাঁদীর কোনো অধিকার নেই। বরং এই অধিকারের চিন্তাও সে করতে পারবে না। ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'বিইজনি আহলেহিন্না'—একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, মালিকের অনুমতিক্রমে তাদের মোহর দিয়ে দাও। এই অনুমতির ভিতরেই মোহরানার বিষয়টি উহ্য রয়েছে। তাই পরে একথার পুনোরুল্লেখ প্রয়োজন হয়নি।

অথবা এরকমও বলা যায় যে, ক্রীতদাসীকে দেয়া মানেই তার মনিবকে দেয়া। এ দু'টি ব্যাখ্যাই অবশ্য দুর্বল। মুহাক্কিক তাফতাজানী বলেছেন, এখানে মোহর ওয়াজিব করা এবং ক্রীতদাসীর গোপনাঙ্গের দ্বারা উপকার লাভ করার বিষয়টি অপরিহার্য করে দেয়াই উদ্দেশ্য। তাই প্রকৃত অর্থ হবে— মোহর ক্রীতদাসীরই প্রাপ্য। কিন্ত মনিব যেহেতু তার উপরে কর্তৃত্বশীল তাই মোহর শেষ পর্যন্ত তার অধিকারেই চলে যাবে। ব্যাপারটি এরকম— যেমন, কোনো মনিব তার ক্রীতদাসকে ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন। এমতাবস্থায় ক্রীতদাস পণ্য বিক্রয় ও তার মূল্য গ্রহণের অধিকার রাখে, তেমনি বিবাহের অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসী তার মোহরের অধিকারিণী হতে পারে। চূড়ান্ত অধিকার কিন্তু মালিকের। এরকম হতে

পারে যে, মোহরানা বলতে এখানে খোরপোষের কথা বলা হয়েছে। আর খোরপোষের ব্যাপারে মনিবের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

মোহরানা পরিশোধ করতে হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। শরিয়তের নির্দেশানুসারে। অর্থাৎ মনিবের অনুমতিসহ। অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানা দেয়া নিষিদ্ধ।

ক্রীতদাসীদেরকে হতে হবে পবিত্রা। তারা ব্যভিচারিণী হতে পারবে না। গোপন প্রণয়িনী হতে পারবে না। এখানে পবিত্রা বুঝাতে 'মুহ্সনাত' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। 'মুসাফিহাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ একস্থানে স্থির না থাকা— এই শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ব্যভিচারিণী বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ পবিত্রা রমণী তারাই যাদের মধ্যে ব্যভিচার এবং গোপন প্রণয়— দোষ দু'টি নেই। বিবাহের সঙ্গে 'মুহ্সনাত' শব্দটি উল্লেখ করার অর্থ এই যে, এই অবস্থাই উত্তম অবস্থা। অর্থাৎ পবিত্রা রমণীকে বিবাহ করাই উত্তম যদিও ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করাও বৈধ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তওবা না করা পর্যন্ত ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। চাই সে স্বাধীনা হোক অথবা ক্রীতদাসী। কেননা, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ, ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারী ছাড়া অন্যকে বিবাহ করে না। আর ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না। মুসলমানদের জন্য এরকম বিবাহ হারাম করে দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহ সাধারণতঃ মাকরুহ্ (যদি সে তওবা না করে)। কেননা, বিবাহের জন্য নারীকে পবিত্র হওয়া শর্ত করা হয়েছে। মোহর পরিশোধ করার শর্তও করা হয়েছে এ কারণে। নারীকে পবিত্র হতে হবে বিবাহের সময় এবং মোহরানাও পরিশোধ করতে হবে ওই একই সময়ে। অতএব, এক্ষেত্রে এরকম বলা যেতে পারে না যে, ঐকমত্যানুসারে মোহর প্রদানের জন্য রমণীদেরকে পবিত্র হতে হবে না।

বিবাহিতা হওয়ার পর ক্রীতদাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীন বিবাহিতা ব্যভিচারিণীর অর্ধেক। স্বাধীনা বিবাহিতা রমণীর ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে— 'সঙ্গেসার' অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। এই শাস্তির অর্ধেক হওয়া অসম্ভব।

মাসআলাঃ অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের শাস্তি হবে একশ দোর্‌রা। কেননা, আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন— 'ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণী প্রত্যেককে একশ দোর্‌রা লাগাও।' ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একশ দোর্‌রার সাথে এক বৎসরের জন্য দেশান্তরী করা জরুরী। ইমাম মালেক বলেছেন, দেশান্তরীর শাস্তি কার্যকর হবে কেবল পুরুষের বেলায়, মেয়েদের বেলায় নয়। দেশান্তরীর দলিল সম্পর্কে হজরত উবাদা বিন সামেতের বর্ণনায় এসেছে— বিবাহিতা নারীর সঙ্গে জেনা করার শাস্তি একশ' দোর্‌রা এবং এক বৎসরের দেশান্তর। মুসলিম। হজরত জায়েদ বিন খালেদ বর্ণনা করেন, আমি নিজে রসুল স. কে অবিবাহিতা ব্যভিচারীর জন্য একশত দোর্‌রা

মারার এবং এক বৎসরের দেশান্তরীর হুকুম দিতে দেখেছি। ইমাম মালেক বলেন, হাদিসে 'আল বাকেরা' শব্দটি এসেছে। এই শব্দে মেয়েরা অন্তর্ভূতা হয় না। তাই মেয়েদের জন্য দেশান্তর নেই। কিন্তু এই দলিলটি দৃঢ় নয়। কারণ, 'বাকেরা' শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। হাদিসের বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায় রসুল স. মহিলাদের ব্যভিচারের শাস্তির কথাও বলেছেন। এরশাদ করেছেন, আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো। ব্যভিচারিণীর জন্য আল্লাহ্ উপায় করে দিয়েছেন। তাই 'বাকেরা' শব্দের মধ্যে মেয়েরা শামিল নয়— এ কথাটি ভুল। হাদিসের প্রথমেই এসেছে 'আল বিকরু বিল বিকরি' এবং প্রথম 'বিকর' অর্থ পুরুষ এবং দ্বিতীয় 'বিকর' অর্থ নারী। অন্য হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেন, বিকর থেকে বিবাহের অনুমতি নিয়ে নাও। এখানে বিকের শব্দের অর্থ কেবলই নারী। এছাড়া হজরত জায়েদ বিন খালেদের বর্ণনায় 'মান জানা' শব্দটি এসেছে, যার মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েই শামিল।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, দেশান্তরীর হাদিসটি খবরে আহাদ (একক বর্ণিত)। কিতাবুল্লাহ্র হুকুমের সঙ্গে খবরে আহাদ সংযোজন করা শোভনীয় নয়। একশত দোর্‌রার কথা এসেছে কোরআনে আর দেশান্তরের কথাটি এসেছে হাদিস শরীফে। ইনশাআল্লাহ্ সুরায়ে নূরের তাফসীরে বিষয়টির বিশদ বর্ণনা করা হবে।

মাসআলাঃ চার ইমাম বলেছেন, ব্যভিচারে লিপ্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর শাস্তি পঞ্চাশ দোর্‌রা। ক্রীতদাসীর শাস্তিতো নস (কোরআন) দ্বারা প্রমাণিত। এই প্রমাণ ক্রীতদাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেশান্তরের কথা কোনো ইমাম বলেননি। কেবল ইমাম শাফেয়ীর এক বক্তব্যে এসেছে, বাঁদীকে (ক্রীতদাসীকে) ছয়মাসের জন্য দেশান্তর করতে হবে।

আবু সওরের বক্তব্য এই যে, বিবাহিতা বাঁদীকে পাথর মারতে হবে; কিন্তু এই আয়াত তার বক্তব্যকে রহিত করে দিয়েছে। আর প্রস্তর প্রক্ষেপের শাস্তি অর্ধেক করা সম্ভব নয়। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের নিকট অবিবাহিতা বাঁদী ও অবিবাহিত গোলামের (ক্রীতদাসের) জন্য শরিয়তের আইন নেই। কেননা, আয়াতে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ার শর্ত আরাপ করা হয়েছে।এতে করে বুঝা যায় স্বাধীন না হলে কোনো শাস্তি নেই।

ইমাম আবু হানিফার মতে মাফহুমের (অভিমতের) শর্ত গ্রহণীয় নয়। অন্য তিন ইমাম মাফহুমের শর্তকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। তাঁদের মতে এ আয়াতের সঙ্গে অভিমতের শর্তের কোনো বিরোধ নেই। এ আয়াত দ্বারা বরং সতর্ক করাই উদ্দেশ্য। বাঁদী এবং গোলাম যদি বিবাহিতও হয়, তবু তাদেরকে পাথর মারা যাবে না। তাদের শাস্তি হলো দোর্‌রা। তাও অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ দোর্‌রা। স্বাধীনদের হুকুম এর বিপরীত। স্বাধীন বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি রজম (প্রস্তর নিক্ষেপণ)। এবং অবিবাহিত হলে দোর্‌রা। এই হুকুম রসুল স.এর বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। যদি কোনো বাঁদী প্রথমবারের মতো ব্যভিচারিণী হয়, তবে দোর্‌রা মারবে। কিন্তু তাকে অভিসম্পাত করবে না। দ্বিতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হলে

পুনরায় তাকে দোর্‌রা মারবে কিন্তু তাকে লাঞ্ছিত করবে না। তৃতীয়বার করলে দোর্‌রা মারার সাথে সাথে তাকে অপমানিতও করবে, মাথার চুলের পরিমাণ হলেও। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আলী বর্ণনা করেন, হে মানুষেরা! আপন বাঁদী এবং গোলামের উপর শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করো— বিবাহিত অথবা অবিবাহিত। কেননা রসুল স. এর এক বাঁদী ব্যভিচার করলে তিনি স. আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন—তাকে দোর্‌রা মারো। আমি দেখলাম বাঁদীটি গর্ভবতী এজন্য দোর্‌রা মারলাম না। রসুল স. কে একথা বলতেই তিনি বললেন, বেশ করেছো। মুসলিম।

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আয়াশ বিন আবী রবিয়া বর্ণনা করেন, হজরত ওমর আমাকে ও কতিপয় কোরায়শী যুবককে হুকুম দিলেন— তোমরা রাজ্যের কিছু সংখ্যক বাঁদীকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে দোর্‌রা মারবে।

এরপর এরশাদ হয়েছে— 'এই শাস্তির নির্দেশ জারী করা হলো এই কারণে যে, তোমরা যেনো ভীত হও। ব্যভিচারমুখী হওয়া থেকে বিরত থাকো।' ব্যভিচার বহির্ভূত জীবন অত্যুত্তম। দুনিয়াতেও। আখেরাতেও। অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে এখানে 'জালিকা' শব্দটির দ্বারা বাঁদীকে বিবাহ করার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ব্যভিচারপ্রবণতা প্রবল হওয়ার আশংকা থাকলে বাঁদীকে বিবাহ করা জায়েয। কেননা, দুনিয়ার বিপর্যয় আখেরাতের বিপদকে ওয়াজিব করে। এরপর বলা হয়েছে ধৈর্যধারণের কথা অর্থাৎ বাঁদীকে বিবাহ করার ব্যাপারে যদি ধৈর্যধারণ করতে পারো তবে তাই শোভনীয় হবে— যাতে সন্তানদের গোলাম হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রসুল স. বলেছেন, স্বাধীনা নারী কল্যাণময়ী আর বাঁদী বিধ্বংসের কারণ। এ হাদিস বর্ণনা করেন দায়লামী এবং ছা'লাবী হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আমি বলি, বাঁদী বিধ্বংসী হওয়ার কারণ এই যে, তার গর্ভজাত সন্তানেরা তার মালিকের গোলাম হয়ে যাবে। আর এ দিকে প্রকৃত পিতার বুক থাকবে সন্তানশূন্য। আয়াত শেষের উল্লেখ এই যে, আল্লাহ্ গফুরুর রহিম অর্থাৎ তোমরা যদি বাঁদীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হও, তবু আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি পরম দয়ালু বলেই বাঁদীকে বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। এই তাফসীর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের ওই বক্তব্যের পোষকতা করছে যেখানে বলা হয়েছে, বাঁদীকে বিয়ে করা কেবল তাদের জন্য বৈধ যাদের ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবেরও এরকম উক্তি করেছেন। তাউস এবং আমর ইবনে দিনারও এরকম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একথা ঠিক নয় যে, ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে বাঁদীকে বিবাহ করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, বিনা প্রয়োজনে বাঁদীকে বিয়ে করা মাকরুহ বা ক্ষতিকর।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, বাঁদীকে বিয়ে করার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হচ্ছে—স্বাধীনা রমণীর পাণিগ্রহণ করার যোগ্যতা যদি না থাকে। দ্বিতীয়তঃ ক্রীতদাসী স্ত্রীর সন্তানেরাও গোলাম হবে—

একথা জানা সত্ত্বেও উপায়ান্তর না থাকলে বাঁদীকে বিয়ে করা যাবে বটে, তবে এমতাবস্থায়ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করা যাবে না। যেমন— একজনের মাধ্যমে প্রয়োজন মিটে গেলে একাধিকতায় আগ্রহী হওয়া যাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, বাঁদী বিবাহ সাধারণভাবে জায়েয করে দেয়া হয়েছে। বাঁদী মুসলমান অথবা আহলে কিতাব হোক। স্বাধীনভাবে বিবাহে সম্মত হওয়ার অধিকার তার থাকুক বা নাই থাকুক— সকল অবস্থায় জায়েয। কেবল প্রয়োজন পূরণ করাই নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত করাও জায়েয। তবে প্রয়োজনাতিরিক্ততা মাকরুহ্ (কিন্তু জায়েয)। কেননা, আগের আয়াতে বলা হয়েছে 'অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।' আরও বলা হয়েছে 'ফানকিহ্ মা ত্বা লাকুম।'

এসবের মধ্যে পরিমাণ বা শর্ত উল্লেখ নেই। বাঁদী বিয়ে করলে তার সন্তান সন্ততিরাও গোলাম হবে (যদিও তাদের পিতা স্বাধীন) — এই কারণ দেখিয়ে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য যদি বাঁদী বিবাহ নাজায়েয করে দেয়া হয়, তবে গোলামের জন্যও তো বাঁদী বিবাহ নাজায়েয হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিধান এখানে অন্যরকম। গোলামের জন্য সর্বোচ্চ দু'জন বাঁদীকে বিবাহ করা জায়েয। তাহলে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য বাঁদী বিবাহ তো আরও বেশী জায়েয হবে। স্বাধীনের জন্য সর্বোচ্চ চারটি বিবাহের অনুমতি রয়েছে। আর গোলামের জন্য রয়েছে দু'টি। প্রথম হুকুমটি এসেছে কোরআনে। দ্বিতীয়টি এসেছে হাদিসে। স্বাধীন ব্যক্তির চার স্ত্রী স্বাধীনা রমণীও হতে পারবে, বাঁদীও হতে পারবে। চারটি স্ত্রীই স্বাধীনা হতে হবে এমন কথা নেই। ইমাম মালেক বলেছেন, স্বাধীন ব্যক্তির জন্য চারটি বিবাহ বৈধ। স্বাধীনা অথবা বাঁদী কিংবা মিলিতভাবে চারজন স্ত্রী রাখাকে তিনি সমর্থন করেছেন।

মাসআলাঃ তিনজন ইমামের মতে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য বাঁদী বিবাহ করা জায়েয নয়। শুধু ইমাম মালেক বলেছেন, স্ত্রী রাজী থাকলে বাঁদী বিবাহ করা জায়েয। রাজী না থাকলে জায়েয নয়— যদিও ওই ব্যক্তি বিবাহ করতে চায়। শুধু ইমাম মালেক বলেছেন, বিবাহ করতে চাইলে জায়েয। না চাইলে জায়েয নয়। ঐকমত্য এই যে, বাঁদীকে বিবাহ করা বৈধ। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, বাঁদী বিবাহ জায়েয। এ সম্পর্কে তাঁরা এই আয়াতটি উল্লেখ করেন 'স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে.....।' যার স্বাধীনা স্ত্রী রয়েছে সেতো সামর্থ্যবান, তাই তার জন্য বাঁদী বিবাহ দুরস্ত নয়। তার স্বাধীনা স্ত্রী রাজী থাকলেও না। ইমাম আজম এ রকম ব্যক্তির জন্য বাঁদী বিবাহ নাজায়েয হওয়ার পক্ষে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আসহাবে সুনান অর্থাৎ নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা সাঈদ বিন মানসুর থেকে বর্ণনা করেন— রসুল স. স্বাধীন ব্যক্তিদের জন্য বাঁদী বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, বাঁদী (মুক্ত) স্বাধীন হলে বিবাহ হতে পারে— বায়হাকী ও তিবরানী হাসান বসরী পর্যন্ত

সনদকে মিলিয়ে বায়হাকী এবং তাবারী এই হাদিসটি লিখেছেন। আমেরে আহওয়াল এর বর্ণনাকে গরীব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (যে বিশুদ্ধ হাদিসের বর্ণনাকারী মাত্র একজন তাকে গরীব বলে)। কিন্তু আমর বিন ওবায়েদও হাসান থেকে প্রসিদ্ধ সনদে এরকম বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বিন মানসুরের হাদিসকে হাফেজ বলেছেন মোবহাম। (যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না সে হাদিসকে মোবহাম বলে)। কেননা সাঈদ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আলিয়ার বর্ণনা এবং ইবনে আলিয়া তাঁর নিজের এবং হাসান বসরীর মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। শুধু এতোটুকুই বলেছেন, হাসান বসরী থেকে শুনেছেন এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রাজ্জাক এই হাদিসটি মুরসাল হিসেবে হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন (যে হাদিসের শেষ দিকের বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে এবং এই কারণে যে হাদিস সমাপ্ত হয়েছে কোনো তাবেয়ীর মাধ্যমে তাকে বলে মুরসাল)। ইবনে আবী শায়বাও মুরসাল হিসেবে এই বর্ণনাটি দিয়েছেন। আমাদের নিকট হাদিসটি মুরসাল হলেও দলিল হিসেবে গণ্য। ইমাম শাফেয়ীও একে মুরসাল বলেছেন এবং দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত গণ্য করেছেন। সাহাবীগণের বক্তব্য এই বর্ণনাটির পোষকতা করেছে।

ইবনে আবী শায়বা এবং বায়হাকী হজরত আলী থেকে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেন, স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন ব্যক্তির জন্য বাঁদীকে বিবাহ করা শোভনীয় নয়। (যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মওকুফ বলা হয়)। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, স্ত্রী থাকলে বাঁদীকে বিবাহ করা যাবে না। হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য এরকম। আবু জোবায়েরের মাধ্যমে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন— হজরত জাবের বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রী থাকলে কেউ যেনো বাঁদীকে বিয়ে না করে। বায়হাকীর বর্ণনাটিও এরকম। তার বর্ণনার অতিরিক্ত কথাটুকু হচ্ছে, যে স্বাধীনা রমণীর মোহর দিতে সক্ষম সে যেনো বাঁদীকে বিয়ে না করে। এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ।

ইবনে আবী শায়বা হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে— বাঁদী স্ত্রী থাকলে আজাদকে বিবাহ করবে এবং আজাদ স্ত্রী থাকলে বাঁদীকে বিবাহ করবে না।এ প্রসঙ্গে হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, গোলামের তালাক দুইবার। শেষে বলেছেন ক্রীতদাসী স্ত্রী থাকলে স্বাধীনাকে বিয়ে করা যাবে। কিন্তু স্বাধীনা স্ত্রী থাকলে ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা যাবে না।—বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। এই সনদের রাবী মাজাহের বিন আসলাম দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত। ইমাম আবু হানিফা কিতাবুল্লাহ্‌কে হাদিসে আহাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করাকে নাজায়েয বলেছেন। কিন্তু এই স্থানে বিষয়টি বিশেষভাবে নির্ধারণ করা জরুরী। কারণ, আয়াতে অর্থব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া বৈধ করে দেয়া হয়েছে। হুকুমটি তাই সাধারণ অথচ হাদিসে স্বাধীনা স্ত্রীর

বর্তমানে বাঁদী বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরকম করলে আর আয়াতের হুকুমটি সাধারণ থাকে না। এখানে আপত্তি দূর করণার্থে এরকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, হাদিসটি যদিও খবরে আহাদ (একক বর্ণিত) কিন্তু এর সমর্থনে রয়েছে এজমা। আর এজমা দ্বারা কোরআনের হুকুমকে সুনির্ধারিত করা জায়েয।

ইমাম শাফেয়ীর মতে গোলামের জন্য স্বাধীনা স্ত্রীর বর্তমানে বাঁদীকে বিবাহ করা জায়েয। কিন্তু ইমাম আজম ও অন্যান্য ইমামগণের মতে জায়েয নয়। কেননা, হাদিসে মুরসাল দ্বারা সাধারণ নিষিদ্ধতা এসেছে বিরুদ্ধবাদী ইমামগণের নিকট। জায়েয না হওয়ার সিদ্ধান্তটিও একটি সাধারণভাবে চিহ্নিত সিদ্ধান্ত। কাজেই ক্রীতদাসেরাও সাধারণ সিদ্ধান্তের বাইরে নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

সুরা নিসাঃ আয়াত ২৬

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

❒ আল্লাহ্ কামনা করেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের চরিত-কথা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে, উহার হিতাহিত নির্দেশ করিতে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

পূর্ববর্তী উম্মতের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ দান করার উদ্দেশ্য এই যে, যেনো এতে করে সত্যাসত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং হেদায়েতের পথ হয় প্রশস্ততর।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অতীত শরিয়তের কোনো হুকুম যদি আমাদের শরিয়তে মনসুখ না হয়ে থাকে এবং সেই হুকুম যদি কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নত সমর্থিত হয়, তবে তার উপর আমল করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে। এমতো ক্ষেত্রে ইহুদীদের বর্ণনা অবশ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ইহুদীরা অবিশ্বস্ত ও অমাননীয়— যদিও হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম এবং হজরত কাব বিন আহবার ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হওয়ার পর যে সকল ইসরাইলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্তায়ালার আর একটি উদ্দেশ্য এই— তিনি মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দিতে চান, তওবার সুযোগ দিতে চান। আল্লাহ্ চান তোমরা এমন কাজ করো যার দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সকলের নেক আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর সকল হুকুমের মধ্যে রয়েছে হিকমত। কারণ, তিনিই প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۝

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۝

❑ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইতে চাহেন, আর যাহারা কামনা-বাসনার অনুসারী তাহারা চাহে যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

❑ আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন; মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে নেক আমল এবং তওবার তৌফিক দিতে চান। বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য একথাটির এখানে পুনরোল্লিখিত হয়েছে। যারা প্রবৃত্তিপূজক তারা অবাধ্য। প্রবৃত্তির অভিলাষ পূর্ণ করতে হবে শরিয়তসমর্থিত উপায়ে। শরিয়তের বিরোধিতা করে নয়। আলেমগণ বলেছেন, প্রবৃত্তিপূজক বলতে এখানে ব্যভিচারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রবৃত্তিপূজক অর্থ এখানে অগ্নিপূজক। কেননা, তারা মুহরিম (নিষিদ্ধ) মহিলাকে হালাল মনে করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রবৃত্তিপূজক হচ্ছে ইহুদীরা। কেননা, তাদের নিকট সহোদরা বোন, ভাতিজি, বোনঝি সব হালাল।

আল্লাহ্ এখানে প্রবৃত্তিপূজকদের দূরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিয়ে হেদায়েত করছেন, তারা চায় তোমরাও পাপের দিকে ঢলে পড়ো, তাদের মতো হারামকে হালাল মনে করো। হালালকে হারাম জানা জঘন্য অপরাধ।

আল্লাহ্ তোমাদের ভার লাঘব করতে চান। তাই তিনি তোমাদের জন্য সহজ শরিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং অতীত সম্প্রদায়ের জন্য যেসব বস্তু হারাম ছিলো, তার মধ্যে থেকে কতিপয় বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মুনজির বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্য যে সকল সহজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে এই বিধানটি, বাঁদীর সাথে এবং ইহুদী ও খৃষ্টান মহিলার সাথে মুসলমানের বিবাহ হবে। তাফসীরে মাদারেকে রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। তারা কামনা বাসনাকে যেমন বাধা দিতে পারে না, তেমনি আনুগত্যের কষ্টও সহ্য করতে পারে না। আর কিয়ামত যতোই নিকটবর্তী হচ্ছে ততোই তাদের দুর্বলতা বেড়েই চলেছে। আল্লাহ্ তাই এই উম্মতের উপর গুরুভার চাপিয়ে দেননি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হইয়া ব্যবসায় করা বৈধ; এবং নিজদিগকে হত্যা করিও না; আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

এরশাদ হয়েছে— কেউ কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে পারবে না। গ্রাস করতে পারবে না যেমন মুসলমানদের সম্পদ, তেমনি কাফেরদের সম্পদ। যারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নয়, সে সকল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত সম্পদ ভক্ষণ করা অবশ্য অবৈধ নয়।অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ নিষিদ্ধ বলেই শরিয়তে ছিনতাই, চুরি, খেয়ানত, সুদ এবং অবৈধ বেচাকেনাকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

বৈধ সম্পদ উপার্জন এবং ভক্ষণের উপায় হচ্ছে ব্যবসা। কুফাবাসীদের ক্বেরাতে এসেছে 'তিজারাতান' শব্দটি। এই ক্বেরাতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অন্যান্য ক্বারীগণ পড়েছেন 'তিজারাতুন'।

ব্যবসা হতে হবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। রসুল স. বলেছেন, বেচাকেনা সংঘটিত হয় উভয়ের রাজীখুশীর মাধ্যমে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা এবং ইবনে মুনজির। 'বায়' বা ক্রয়বিক্রয়ের অর্থ হলো পণ্য বিনিময়— তা বাক্য ব্যয়ের মাধ্যমে হোক অথবা বিনা বাক্য ব্যয়ে শুধু লেনদেনের মাধ্যমে। 'ইজারা' অর্থ হলো অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করা। এছাড়াও একের জন্য অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার আরও উপায় রয়েছে যেমন—হেবা (দান), মীরাস ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও ব্যবসাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, সাধারণতঃ ব্যবসার মাধ্যমেই প্রাত্যহিক প্রয়োজন নির্বাহ করা সম্ভব। তাই ব্যবসাই সম্পদ অর্জন ও উপার্জনের সর্বাপেক্ষা পবিত্র অবলম্বন।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবু উমামা থেকে ইসপাহানী মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন, উপার্জন তখনই পবিত্র হবে যখন ব্যবসা পরিচালিত হবে চারটি নীতিমালার ভিত্তিতে। ১. বেচাকেনার সময় অসততা না করা— অর্থাৎ ভালো ও মন্দ এক সঙ্গে না মিশানো। ২. বিক্রয়যোগ্য বস্তুর অতিপ্রশংসা না করা। ৩. বিক্রয়ের সময় ধোকাবাজি না করা। ৪. কেনাবেচার সময় কসম না খাওয়া। ইমাম আহমদ ও ইমাম হাকেম লিখেছেন, আব্দুর রহমান বিন শাবেল বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ব্যবসায়ীরাই ফাসেক ফাজের হয়ে থাকে (সাধারণতঃ)। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্ কি বেচাকেনাকে হালাল করেন নি? তিনি স. বললেন, হালাল করবেন না কেনো? কিন্তু ব্যবসায়ীদের অভ্যাস,

বিক্রয়ের সময় তারা কসম খায় এবং গোনাহ্গার হয়ে যায়। আর কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলে থাকে। হজরত রেফায়া বিন রাফে থেকে হাকেম এরকম বর্ণনা করেছেন।

রসুল স. বলেছেন, ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন গোনাহ্গারদের দলভুক্ত করে ওঠানো হবে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তারা ব্যতীত। তাঁরা পুণ্যবান, ক্রয় বিক্রয়ের সময় যাঁরা সত্য কথা বলেন। হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন হাকেম। হাকেম ও তিরমিজির আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে— হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, রসুল স. বলেছেন— সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হবে আম্বিয়া, সিদ্দিক ও শহীদগণের সঙ্গে। তিরমিজি হাদিসটিকে বলেছেন হাসান। ইবনে মাজা এবং হাকেম হজরত ইবনে ওমর থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন, সত্যপন্থী ও আমানতদার মুসলমান ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথী হবে। হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া থেকে তিবরানী মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র সাহায্য সৎকর্মশীল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে । ইসপাহানী মারফু হিসেবে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে। হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে ইসপাহানী আরো লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যবসায়ীর উপার্জন পবিত্র যারা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মিথ্যাশ্রয়ী হয় না, অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না, আমানত রাখা হলে আমানত খেয়ানত করে না, ক্রয় করার সময় বিক্রেতার ক্ষতি করে না, বিক্রি করার সময় (অযথা) প্রশংসা করে না, ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে না এবং পাওনা আদায় করার বেলায় অসৎ আচরণ করে না।

হজরত রাফে বিন খাদিজ বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন কোন্টি? তিনি স. বললেন, স্বহস্তে উপার্জন এবং পবিত্র বিক্রয়। আহ্মদ। হজরত মেকদাম বিন মাদী কর্ব রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন—স্বহস্তে উপার্জন অপেক্ষা উত্তম কোনো আহার নেই। আল্লাহ্র নবী হজরত দাউদও স্বহস্তে উপার্জনলব্ধ আহার ভক্ষণ করতেন। বোখারী। জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— তোমাদের আহার্য বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র আহার ওইটি যা তোমরা স্বহস্তে উপার্জন করো। তোমাদের সন্তানদের উপার্জনও তোমাদের উপার্জন। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

এই আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, ব্যবসা ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ নিষিদ্ধ। যেমন—মোহর, দান খয়রাত, ঋণ ইত্যাদি। এসমস্ত উপায়ও শরিয়তসিদ্ধ। হানাফীগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, স্বীকারোক্তির মজলিশে ইজাব ও কবুলের (প্রস্তাব ও সম্মতির) পর বেচা-কেনা করার ইচ্ছা রহিত হয়ে যায় না, যদি ক্রেতা-বিক্রেতা স্থানান্তরিত না হয়। ইমাম মালেকও এই মত পোষণ করেন। কারণ, এতে রয়েছে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি। তাই কথা বদল হবে না। কিন্তু পণ্য প্রদান ও পণ্যমূল্য লাভের অধিকার বলবৎ থাকবে। এই অধিকার বাতিল করার ক্ষমতা ক্রেতা বিক্রেতা কারোই নেই। ইমাম

শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইজাব ও কবুলের পরও স্থান ত্যাগের পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতা যে কোনো একজন স্বীকারোক্তি বাতিল করতে পারে বলে মনে করেন। কেননা, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই একে অপরের বিরুদ্ধে বাতিল করার অধিকার রাখে যতোক্ষণ তারা পৃথক না হয়ে যায়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত হাকিম বিন হাজাম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের বাতিল করার অধিকার থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক হয়ে না পড়ে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং পণ্যবস্তুর দোষক্রটি জানিয়ে দেয়, তবে উভয়েই বরকত লাভ করবে। আর মিথ্যা বললে এবং দোষ গোপন করলে বরকত বিনষ্ট হবে। বোখারী, মুসলিম। এ প্রসঙ্গে হানাফিগণ বলেন, কিতাবুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে হাদিসের উপর আমল করা জায়েয নয়। আর কিতাবুল্লাহ্‌র বর্ণনা হচ্ছে এরকম— ইজাব ও কবুলের পর কারো স্বীকারোক্তি ভঙ্গের অধিকার থাকে না। অর্থাৎ ইজাব পেশ করার পর তা কবুল করা না করা সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই অধিকার রাখে। নতুবা বেচা-কেনায় চূড়ান্তভাবে সম্মত হওয়ার পর নতুন করে বিক্রয়ের পণ্য বেচা-কেনা হতে পারে না। হাদিসে বর্ণিত অধিকার হচ্ছে, স্বীকারোক্তিপূর্ব অধিকার। স্বীকারোক্তিপরবর্তী অধিকার নয়। হাদিস শরীফে পৃথক হওয়ার যে কথা এসেছে তা হচ্ছে, দরদাম নির্ধারণ সংক্রান্ত কথাবার্তার পার্থক্য হওয়া (শারীরিকভাবে পৃথক হয়ে যাওয়া নয়)। হেদায়া। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, পৃথক হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথার মাধ্যমেই হয়। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, আর আহলে কিতাবগণ তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ ও কিতাব আসার পর বিভক্ত হয়ে গেলো।

আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ধারণা এই যে, মজলিশ থেকে পৃথক হওয়ার আগেই চূড়ান্ত বেচাকেনা ও বিক্রয়মূল্য অধিকার করার বৈধতা সম্পর্কে এই আয়াতে প্রমাণ এসেছে। কিন্তু রহিত করা বা বাতিল করার অধিকারের কথা এখানে বলা হয়নি। এজন্য উত্তম এই, যেমন বলেছেন ইমামে আজম— বেচাকেনার স্বীকারোক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরও পণ্য দর্শনের অধিকার এবং দোষ চিহ্নিত করার অধিকার অবশিষ্ট থাকবে। তেমনি মজলিশ থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বের মজলিশের অধিকারও স্বীকার করতে হবে যাতে বিশুদ্ধ হাদিসের উপর আমল করার ব্যাপারটি বাদ না পড়ে যায়। হানাফীগণ আরো বলেছেন, বেচাকেনার কাজে নিয়োজিত থাকা পর্যন্ত তাদেরকে ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যাবে। আর স্বীকারোক্তি পূর্ণ হওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যাবে না—একথা ঠিক নয়। কেননা, দ্বিতীয় পক্ষ কবুল করার আগেই প্রথম পক্ষকে বলা হয় বিক্রেতা। তার ইজাবের পর ক্রেতা কবুল না করা পর্যন্ত তাদেরকে ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যায় না। হ্যাঁ ইজাব ও কবুলের পর যখন স্বীকারোক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন বাকী থাকে কেবল লেনদেনের কাজ। স্বীকারোক্তি ও লেনদেন একই মজলিশের অন্তর্ভূত। কাজেই স্বীকারোক্তির মজলিশ বাকী থাকা মানে বেচাকেনাও অবশিষ্ট থাকা। এছাড়া বিভিন্ন হাদিসের

বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, পৃথক হওয়া অর্থ শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া। এতে করে মজলিশ থেকে পৃথক হওয়াই বুঝা যায়। হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, যখন দু'জন (ক্রেতা-বিক্রেতা) বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকে, তখন পৃথক না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকের অধিকার থাকবে (তারা ইচ্ছে করলে বেচাকেনা ঠিক রাখতে পারবে, ইচ্ছে করলে রহিত করতেও পারবে)। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেচাকেনার পরও প্রত্যেকের রদবদলের অধিকার থাকবে যতোক্ষণ স্থানচ্যুত না হবে।

দ্বিতীয় বর্ণনায় আমর বিন শোয়াইবের দাদার বক্তব্য হিসেবে এসেছে— ক্রয় বিক্রয়কারী পৃথক হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অধিকার থাকবে (দেখার অধিকার ও দোষক্রটি বের করার অধিকার ব্যতীত)। অতএব, যদি এরকম হয় তবে পৃথক হওয়ার পরও এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রহিত করার অধিকার থাকবে। কারও জন্য এরকম করা বৈধ নয় যে, কেনাবেচা বাতিল করার সন্দেহে আগেই পৃথক হয়ে যাবে। তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, স্বীকারোক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত পৃথক হয়ো না। আবু দাউদ।

হজরত জাবের বর্ণনা করেন, রসুল স. এক মজলিশে এক বিধর্মীর সঙ্গে কেনাবেচার পরও বেচাকেনা বাতিল করার অধিকার দিয়েছিলেন। তিরমিজি। এই হাদিসের ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় বেচাকেনা সম্পন্ন হওয়ার পরও স্থান ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বেচাকেনাকে নাকচ করা জায়েয। ওয়াল্লহু আ'লাম।

পুনঃ এরশাদ হচ্ছে, 'নিজদিগকে হত্যা করিও না।' সাবেত বিন জুহাক বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বস্তু দ্বারা নিজকে নিজে হত্যা করলো কিয়ামতের দিন ওই বস্তু দ্বারা তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সর্বক্ষণ সে সেখানে এই শাস্তিই পেতে থাকবে। আর যে কোনো লৌহ নির্মিত অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে দোজখেও তার ওই রকম সার্বক্ষণিক আত্মহনন চলতে থাকবে। সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই হাদিসটি আরও উল্লেখ করেছেন বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি এবং নাসাঈ। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, যে বিষপান করবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যেও তার বিষপান চলতে থাকবে অব্যাহতভাবে। হজরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন—অতীত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির হাতে ঘা হয়েছিলো, সে ওই ঘা এর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজ তরবারী দিয়ে হাতটি কেটে ফেললো। রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলো। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে রক্তপাত থামলো না। আল্লাহ্তায়ালা বললেন,

আমার বান্দা জীবন দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করলো। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। বাগবী।

আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান 'সহীহ্' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আমর বিন আস এই আয়াত থেকে শীতাতংকের কারণে তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার দলিল উপস্থাপন করেছেন। রসুল স. ও তাঁর এই দলিলকে অপছন্দ করেননি। হজরত আমর বিন আস বলেন, এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো। ওই সময় আমি জাতুস্সালাসিলের যুদ্ধে ছিলাম। আমার সন্দেহ হলো, এখন যদি আমি গোসল করি তবে হয়তো ঠাণ্ডায় মরেই যাবো। আমি তখন তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নিলাম। একথা যখন রসুলপাক স. এর সামনে পেশ করা হলো, তখন তিনি স. বললেন, তুমি তাহলে জানাবাত অবস্থায় তোমার সাথীদেরকে নিয়ে নামাজ পড়েছো। আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না'। রসুলপাক স. আমার কথা শুনে হাসলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।

হাসান, হজরত ইকরামা, আতা ইবনে আবি রিবাহ্ এবং সুদ্দীর নিকটে এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— একে অপরকে হত্যা কোরো না। যেমন— অন্য এক আয়াতে এসেছে 'অতঃপর তোমরা এমন লোক যে একে অপরকে হত্যা করে'। শিরিকের পরে সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হচ্ছে মুসলমান হয়ে মুসলমানকে হত্যা করা।

হজরত জারীর বর্ণনা করেন, রসুল স. আমাকে বললেন, আমি মানুষকে শুনিয়ে দিতে চাই, আমার পর তোমরা কাফের হয়ে যাবে না বটে, তবে একে অপরের মস্তক ছেদন করতে থাকবে। বোখারী।

জ্ঞাতব্যঃ কোনো কোনো আলেম এই আয়াতের অর্থ করেছেন এরকম— অন্যায় হারাম সম্পদ ভক্ষণ করতে গিয়ে তোমরা তোমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিও না। অন্যায় সম্পদ তার ভক্ষণকারীকে বরবাদ করে দেয় এবং দোজখে নিয়ে যায়। তারা সর্বক্ষণ সেখানেই থাকবে। অন্যায় মালই তার ধ্বংসের কারণ।

আসেম বিন বাহদেলা বর্ণনা করেন, মাসরুক সিফফিনে গিয়েছিলেন। তিনি উভয় বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়িয়ে বললেন— হে মানুষেরা! মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং জবাব দাও যদি কোনো আহবানকারী তোমাদেরকে আকাশ থেকে আহবান করে, তাকে যদি তোমরা দেখতে পাও ও তার কথা শুনতে পাও—সে যদি বলে, যে কাজে তোমরা নিয়োজিত রয়েছো, আল্লাহ্ সে কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তবে কি সে কাজ থেকে তোমরা বিরত থাকবে? লোকেরা জবাব

দিলো, সোবহান আল্লাহ্। (নিশ্চয়ই বিরত থাকবো)। তখন মাসরুক বললেন, আল্লাহ্র কসম! জিবরাইল মোহাম্মদ স. এর নিকট এই ফরমান নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 'তোমাদের পরস্পরকে হত্যা কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ।' আমার ধারণা এখন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে কাউকে কিছু বলতে শোনাপেক্ষা অবতীর্ণ এই আয়াতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী (যার উপর ইমান আনা ওয়াজিব)।

'আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু' —দয়ালু বলেই তিনি তোমাদেরকে পুণ্য কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন— আল্লাহ্ বনী ইসরাইলদের তওবা কবুল হওয়ার শর্ত দিয়েছিলেন এরকম যে, তারা একে অপরকে হত্যা করবে। কিন্তু আল্লাহ্র বিশেষ রহমত যে, আল্লাহ্ এই উম্মতের তওবা কবুলের জন্য এরকম শর্ত আরোপ করেননি। বরং লজ্জিত হওয়া এবং এস্তেগফার করাকেই তওবা হিসেবে অনুমোদন দিয়েছেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩০

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

❒ এবং যে কেহ সীমালংঘন করিয়া অন্যায়ভাবে উহা করিবে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব; ইহা আল্লাহের পক্ষে সহজসাধ্য।

অন্যের প্রতি জুলুম করা প্রকৃতপক্ষে নিজের উপরই জুলুম করা। অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা এবং কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা শাস্তিকে অবধারিত করে— আল্লাহ্পাক তাই বলেছেন, আমি তাকে আগুনে পোড়াবো আর একাজ আমার জন্য অতি সহজ। অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে কেউ হালাল মনে করলে তার দোজখের আযাব হবে সার্বক্ষণিক (কারণ, হারামকে হালাল মনে করার কারণে সে কাফের হয়েছে)। তাই কাফেরদের মতো তার শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আর যে আত্মসাৎ ও হত্যা করা সত্ত্বেও একাজকে হালাল মনে করে না, তার দোজখাযাব হবে বটে কিন্তু তা চিরস্থায়ী হবে না। (কারণ, সে গোনাহ্গার হলেও ইমানদার)। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাকে ইচ্ছে করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا○

❒ তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব।

এরশাদ হয়েছে, বড় গোনাহ্ থেকে বিরত থাকলে ছোট গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। হজরত আলী বলেন, কবীরা (বড়) গোনাহ্ ওইগুলো যার শাস্তিরূপে নির্ধারিত হয়েছে দোজখ— যে কাজে রয়েছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি এবং অভিসম্পাত ও অবধারিত শাস্তি। জুহাক বর্ণনা করেন, ওই সমস্ত পাপ কবীরা গোনাহ্ নামে অভিহিত, যে সমস্ত কাজের জন্য দুনিয়ায় অথবা আখেরাতে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে।

আমি বলি, কবীরা গোনাহ্র ধরণ তিনটি। এক আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করা। রসুল স. যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করাও শিরিকের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের মিথ্যাচার ব্যাখ্যাসহ অথবা ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে করা হলেও শিরিক পদবাচ্য হবে। আর যদি ইসলামের বদনাম করার উদ্যোগ নেয়া হয় তবে তাকে নফসানিয়াত বা বেদাত বলা হবে, এরকম কাজও কুফর। দু'টি অবস্থার পার্থক্য এই যে, প্রথমাবস্থার কুফর হলো ইচ্ছাকৃত এবং পরের অবস্থার কুফর অনিচ্ছাকৃত। তাদের উদ্দেশ্য কুফরী না হলেও তাদের গতি কুফরীর দিকেই। যেমন রাফেজী, খারেজী, কদরিয়া— তারা নিজকে নিজেদের কর্মের সৃষ্টিকর্তা বলে জানে। আরও রয়েছে জুহনিয়া, মোতাজিলা ও মোজাস্সেমা। এরা মনে করে আল্লাহ্র শরীর ও অঙ্গ প্রতঙ্গ রয়েছে। এরা অন্তর্ভূত রয়েছে কুফরীর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ আকিদা ও দম্ভ প্রদর্শনের দিক থেকে তারা বেদাতী এবং নফস্ পোরস্ত (প্রবৃত্তিপূজক)। এর উপর ভিত্তি করেই হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ্ হলো আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা এবং আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় না করা এবং আল্লাহ্র রহ্মত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক বলেছেন তাঁর গোপন জিজ্ঞাসাবাদ থেকে যারা নির্ভয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র রহ্মত থেকে নিরাশ হবে না। আর আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয় কেবল কাফেরেরাই।

জ্ঞাতব্যঃ আওসাত নামক গ্রন্থে বায্যার এবং তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে লিখেছেন, রসুল স.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবীরা গোনাহ্ কী? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র জাত ও সিফাতের শরীক করা। আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্র গোপন ধরপাকড় থেকে ভাবনামুক্ত হয়ে যাওয়া।

কবীরা গোনাহের দ্বিতীয় ধরণটি হচ্ছে এই— এতে করে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জীবন সম্পদ অথবা সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেন, তোমাদের ও আল্লাহ্‌র বান্দাদের হক বিনষ্ট হওয়া কবীরা গোনাহ্। আল্লাহ্‌র হক বিনষ্ট করাও কবীরা গোনাহ্। আল্লাহ্ মহান, তাঁর রহমতের তুলনায় সকল কিছুই ক্ষুদ্র। তিনি সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিতে পারেন। রসুল স. নিবেদন করেছেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার মাগফেরাত আমাদের গোনাহ্ থেকে অনেক বড়। আল্লাহ্ নিজে বলেছেন, আমার রহমত সবকিছু থেকে বড়।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন— আল্লাহ্‌র নিকট তিনটি দপ্তর থাকবে। প্রথম দপ্তরটিকে আল্লাহ্ উপেক্ষা করবেন অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে প্রথম দফতরভূতদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। দ্বিতীয় দফতরভূতদেরকে আল্লাহ্ অব্যাহতি দিবেন না আর তৃতীয় দফতরভূত যারা আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আর ক্ষমার অযোগ্য এই দফতরটি হবে শিরিকের। আর যাদেরকে উপেক্ষা করবেন তারা হচ্ছে— আল্লাহ্‌র হক বিনষ্টকারী, নামাজ ও রোজা ইত্যাদি হুকুম পরিত্যাগকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যাদেরকে আল্লাহ্ অব্যাহতি দিবেন না, তারা হচ্ছে বান্দার হক বিনষ্টকারী। বান্দার হক বিনষ্টকারীদেরকে আল্লাহ্ মাফ করবেন না (বান্দা যদি মাফ করে তবেতো ভালোই)। আহমদ, হাকেম।

হজরত সালমান এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন বায্‌যার। হজরত আনাস বিন মালেক বলেন, রসুল স. বলেছেন কিয়ামতের দিন আরশের দিক থেকে এক আহবানকারী ঘোষণা দিবেন, হে উম্মতে মোহাম্মদী! নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিশ্বাসবান পুরুষ এবং বিশ্বাসবতী নারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা একে অপরের হক ক্ষমা করে দাও এবং আল্লাহ্‌র রহমতবেষ্টিত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। বাগবী। হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, বিদায় হজের ভাষণে রসুল করীম স. ঘোষণা দিয়েছেন— তোমাদের একের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অপরের জন্য হারাম। যেমন হারাম আজকের দিন। তোমাদের জন্য আজকের দিন, এই শহর, এই মাস হারাম হয়েছে। (অর্থাৎ কারও জানমাল এবং ইজ্জতের হক বিনষ্ট করা জায়েয নয়, যেমন জায়েয নয় হেরেম শরীফের মধ্যে কোনো গোনাহ্ করা)। বোখারী, মুসলিম। তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আমর বিন আস থেকে। তিনি আরো বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

হজরত উসামা বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে একই বাহনে আরোহী হয়ে হজ করতে গেলাম। লোকেরা রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! আমি তওয়াফ করার আগেই সায়ী করে ফেলেছি। কেউ বলতে লাগলো আমি আগের কাজটি পরে, পরের কাজটি আগে করে ফেলেছি। রসুল স. বললেন, এতে কোনো গোনাহ্ নেই। গোনাহ্‌গারতো ওই ব্যক্তি, যে অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের সম্পদ নষ্ট করেছে।তারা গোনাহে

পড়ে থাকবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'যে সকল লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয় তাদের উপর দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ্র অভিসম্পাত পতিত হবে এবং আল্লাহ্ তাদের জন্য অপমানজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর যারা মুসলমান পুরুষ ও নারীকে দুঃখ দেয় তারা নিজেদের উপর অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহ্র বোঝা ওঠাবে।' এই আয়াতে দু'প্রকার কবীরা গোনাহ্র বর্ণনা রয়েছে। প্রথমে কুফর এবং পরে বান্দাদের উপর জুলুম করার কথা এসেছে।

ইতোপূর্বে বর্ণিত 'ইমানদারগণ তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না... পরস্পরকে হত্যা কোরো না'—এ সকল কথায় বুঝা যায় সম্পদহানি এবং প্রাণহানি উভয়টিই কবীরা গোনাহ্। বিশুদ্ধ হাদিস সমূহে কবীরা গোনাহ্ সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুলুম এবং শিরিকের কথাই এসেছে।

হজরত আনাস এবং হজরত আমর বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবীরা গোনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া। মিথ্যা কসম খাওয়ার কথা হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন বোখারী। হজরত আনাসের বর্ণনায় মিথ্যা কসমের পরিবর্তে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথা এসেছে। এ বর্ণনাটি লিখেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন— কবীরা গোনাহ্ সাত প্রকার। উপরে বর্ণিত তিন প্রকার ব্যতীত অন্য চার প্রকার হচ্ছে— সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া এবং জেহাদের ময়দান থেকে পশ্চাদপসরণ করা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন— তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে দূরে থেকো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো কী? তিনি স. বললেন— ১. আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, ৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন এবং সতী সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া — বোখারী, মুসলিম। ইবনে রাহ্বিয়ার বর্ণনায় পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং কাবা শরীফের মধ্যে গোনাহ্ করার কথাও এসেছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল ! আল্লাহর নিকট সব চেয়ে বড় গোনাহ্ কোনটি? তিনি স. বললেন— কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পুনঃ জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি স. বললেন— তোমার সন্তান তোমার একান্নবর্তী হবে এই ভয়ে যদি তুমি তাকে হত্যা করো। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো—তারপর? তিনি স. বললেন—প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক কোরআনের এ আয়াত নাজিল করেছেন— 'যারা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে উপাস্য বলে স্বীকার করে না এবং

যাকে হত্যা করা আল্লাহ্তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন আইনের বিধান ব্যতীত তাকে হত্যা করে না আর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।' বোখারী, মুসলিম।

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা মানে প্রতিবেশীর হক বিনষ্ট করা। অন্য এক হাদিসে রসুলপাক স. বলেছেন—প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অপেক্ষা অন্যস্থানের দশজন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করা সহজ (অপেক্ষাকৃত কম অপরাধ)। হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আহমদ, তিবরানী এই হাদিসটিকে কবীর ও আওসাত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বর্ণনা করেন—রসুল স. বলেছেন, কবীরা গোনাহর একটি হচ্ছে পিতামাতাকে গালি দেয়া। এক ব্যক্তি বললো, পিতামাতাকে গালি দেয়া হয় কিভাবে? রসুলপাক স. বললেন—অন্য কারও পিতাকে গালি দিলে সে ব্যক্তিও গালিদাতার পিতাকে গালি দেয়। অন্যের মাতাকে গালি দিলে সে ব্যক্তিও গালিদাতার মাতাকে গালি দেয়। বাগবী।

হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন—রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে তিন প্রকার শ্রেষ্ঠ কবীরা গোনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ আরজ করলেন, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, কাউকে আল্লাহর সমান্তরাল ধারণা করা, পিতামাতার অনানুগত্য। তিনি স. হেলান দিয়েছিলেন, একথা বলে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, ভালো করে শুনে নাও তৃতীয়টি হচ্ছে মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলা। রসুলপাক স. একথা কয়েকবার বললেন। আমরা চাইছিলাম তিনি যেনো নীরব হয়ে যান। কারণ, আমরা তাঁর কথা সম্পূর্ণই বুঝতে পেরেছি।

জ্ঞাতব্যঃ রসুলপাক স. মিথ্যা বলাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন এ কারণে যে, মিথ্যা অনেক কবীরা গোনাহ্কে একত্রিত করে। আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা কসম, ব্যভিচারের অপবাদ, মিথ্যা দাবী, রসুল স. এর উপর মিথ্যারোপ— এগুলো সবই মিথ্যা বলার অন্তর্ভুক্ত। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেনো জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্বাচন করে নেয়। বোখারী, মুসলিম। গীবত ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন। মারফু পদ্ধতিতে হজরত সাঈদ এবং হজরত্র জাবের থেকে বায়হাকী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। চোগলখুরীও মিথ্যার আর একটি প্রকার। হজরত আবদুর রহমান বিন গানাম এবং হজরত আসমার মারফু বর্ণনা এই যে, ওই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম যে চোগলখুরী করে বেড়ায়। আহমদ।

আর একটি মিথ্যাচার হচ্ছে ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা। হজরত আনাসের মারফু বর্ণনায় এসেছে— ফাসেকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহ্তায়ালা রাগান্বিত হন এবং আল্লাহ্র আরশ কাঁপতে থাকে। বায়হাকী। লানতের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে লানত করা আর এক প্রকার মিথ্যাচরণ। এমতাবস্থায়, লানত ফিরে আসে লানতকারীর উপরেই। তিরমিজি। তিরমিজি এই হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে আরও বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

হজরত আবু দারদা বর্ণিত মারফু বর্ণনায় এসেছে— অপবাদ দেয়া এবং অকথ্যভাষায় গালি দেয়া, আর এক রকমের মিথ্যাচার। হজরত ইবনে মাসউদের মারফু বর্ণনায় এসেছে— ইমানদার ব্যক্তি অপবাদ দিতে পারে না, অভিশাপ দিতে পারে না, অকথ্যভাষায় গালি দিতে পারে না এবং নির্লজ্জ হতে পারে না। তিরমিজি।

কবীরা গোনাহ্ আরও রয়েছে। রসুল স. বলেছেন— যে ব্যক্তি জিহ্বা এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী অঙ্গের জামিনদার হবে আমি হবো তার জান্নাতের জিম্মাদার। হজরত সহল বিন সা'দ থেকে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী। ইমাম মালেক ও বায়হাকী হজরত সাফওয়ান বিন সুলাইমের মাধ্যমে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন— রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি কাপুরুষ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নিবেদন করা হলো, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনঃ নিবেদন করা হলো, মুমিন কি মিথ্যুক হতে পারে? তিনি স. বললেন, না।

রসুল স. বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি— যদিও নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে। নিদর্শন তিনটি হচ্ছে— ১. কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ২. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং ৩. আমানত খেয়ানত করা। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে— যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে সে মুনাফিক। যদি একটি স্বভাব থাকে তবে বুঝতে হবে তার একটি মুনাফিকি স্বভাব রয়েছে। মুনাফিকের ওই স্বভাব চারটি হচ্ছে— ১. আমানত খেয়ানত করা ২. মিথ্যা বলা ৩. প্রতিশ্রুতি ছিন্ন করা এবং ৪. অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া করা।

তৃতীয় প্রকার কবীরা গোনাহ্ আল্লাহ্র হকের সঙ্গে। যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান। ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমরকে শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি স. বলেছেন, সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হলো মদ্যপান। যে শরাবপানে অভ্যস্ত হয় সে নামাজও ছেড়ে দেয় এবং নেশার ঘোরে মা, ফুফী ও খালার উপরও চড়াও হয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন— ইমান থাকা অবস্থায় কেউ ব্যভিচার করতে পারে না, চুরি করতে পারে না, মদ্যপান করতে পারে না। সম্পদ লুণ্ঠন ও সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে না। সাবধান! তোমরা এ সকল অপকর্ম থেকে বেঁচে থেকো। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় অতিরিক্ত আরো রয়েছে, ইমান অবস্থায় কেউ হত্যা করতে পারে না।

বোখারী। আমি বলি সমকামও ব্যভিচারের মতো। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'তোমরা এমনই নির্লজ্জ কাজ করো যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে আর কেউ করেনি।'

চুরি অপেক্ষা রাহাজানি বড় অপরাধ। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করে'— এ আয়াত রাহাজানি সম্বন্ধে নাজিল হয়েছে। ওজনে কম দেয়াও চুরির অন্তর্ভূত। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'মাপে কম দেয় যারা তাদের জন্য রয়েছে মহাসর্বনাশ।' খেয়ানত বড়ই অপবিত্র কাজ এবং খেয়ানত মুনাফিকির নিদর্শন।

কোনো গোনাহ্কে ছোট মনে করা এবং ছোট গোনাহের পরওয়া না করাও কবীরা গোনাহ্। কেননা, সগীরা (ছোট) গোনাহ্কে গুরুত্ব কম দিলে মাগফেরাত থেকে দূরে থাকবে। এরকম করা আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি অবাধ্যতার প্রমাণ। এরকম আচরণ পরিশেষে কুফরীতে পৌছে দিতে পারে। ছোট বড় নির্বিশেষে সকল গোনাহ্কে বড় মনে করলে এবং আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করলে মাগফেরাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। রসুল স. বলেছেন, গোনাহ্কে এমন মনে করবে যেনো মাথার উপরে পাহাড় স্থাপন করা হয়েছে। মুনাফিকেরা গোনাহ্কে মনে করে যেনো নাকের ডগায় মাছি বসেছে যা সহজেই উড়ে যায়।

হজরত আনাস বলেন, তোমরা এমন কিছু আমল করো যেনো চুলের চেয়েও চিকন বলে তোমাদের মনে হয়। কিন্তু রসুল স. এর সময় আমরা এসবকে ধ্বংসাত্মক অপরাধ বলে মনে করতাম। বিশুদ্ধ সনদে এ বর্ণনাটি করেছেন বোখারী হজরত আবু সাঈদ থেকে। আহ্মদও এরকম লিখেছেন।

যে মনে করবে কবীরা গোনাহ্ মাত্র সাতটি সে ভুল করবে। ছোট গোনাহে লিপ্ত থেকে কেউ যদি গোনাহ্কে গুরুত্বহীন মনে করে সেও কবীরা গোনাহে লিপ্ত রয়েছে বুঝতে হবে।

ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, সা'দ বিন জোবায়ের বলেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, কবীরা গোনাহ্ কি সাতটি? তিনি জবাব দিলেন, প্রায় সাত শত। কিন্তু এস্তেগফার অর্থাৎ তওবা করলে কবীরা গোনাহ্ আর কবীরা থাকে না।আর গোনাহে নিমজ্জিত থাকলে সগীরাও আর সগীরা গোনাহ্ থাকে না– তার এ উদাসীনতা তখন কবীরা হয়ে যায়। তিনি আরো বললেন, যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়, তাই– কবীরা গোনাহ্।এ ধরণের আমল যারা করে তাদের এস্তেগফার করা উচিৎ। কেননা, এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কাউকে আল্লাহ্পাক সব সময় দোজখে রাখবেন না। ওই ব্যক্তিরা অবশ্য ব্যতিক্রম যারা ইসলাম পরিত্যাগ করেছে অথবা ফরজ অস্বীকার করেছে কিংবা তকদীরকে অমান্য করেছে।

জ্ঞাতব্য ১ ঃ খেয়ানত, চুরি ও ওজনে কম দেয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কবীরা গোনাহ্। তিরমিজি ও ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে রসুল স. এর বাণী উল্লেখ করেছেন এরকম— ওজর ব্যতীত দুই নামাজকে একত্রিত করে পড়া কবীরা গোনাহ্। হজরত ওমর, হজরত আবু মুসা এবং হজরত আবু কাতাদা থেকে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, 'এস্তেগফার করলে কোনো গোনাহ্ থাকে না'— হজরত ইবনে আব্বাসের এ কথার অর্থ হচ্ছে, ওই সমস্ত গোনাহ্ যার সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে। কিন্তু যে গোনাহের সম্পর্ক মানুষের অধিকারের সঙ্গে, সে গোনাহ্ শুধু এস্তেগফারের মাধ্যমে ক্ষমা করা হয় না। এমতোক্ষেত্রে এস্তেগফারও করতে হবে, সাথে সাথে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তার সন্তুষ্টিও অর্জন করতে হবে।

জ্ঞাতব্য ২ ঃ কোনো কোনো আরেফ বলেছেন, এক সময় এমন স্তরে বান্দা উপনীত হয়, যখন গোনাহ্ তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। এ কথার অর্থ এরকম নয় যে, গোনাহ্ করলে শরিয়তের শাস্তি তাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না। তাদের জন্য হারাম হালাল হয়ে যাবে— এরকম বিশ্বাস রাখা কুফরী ও কঠোর গোনাহ্। বরং ওই কথার উদ্দেশ্য এই যে, কলবের পবিত্রতা ও নফসের পরিশুদ্ধির পর কোনো কোনো আরেফ চৈতন্যময় অবস্থায় সর্বক্ষণ ফয়েজ লাভ করতে থাকে। তখন কোনো গোনাহ্ প্রকাশিত হতে পারে না। আবার কখনো এমন মনে হয় ছোটো বড় সকল গোনাহ্ই তাঁদের চোখে ভয়াবহ মনে হতে থাকে। গোনাহ্র চিন্তায় তখন তাঁরা এমন হয়ে যান যেনো তাদের জান, মাল, বাড়ি, ঘর, সন্তান সন্ততি সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এরকম লজ্জাবনত অবস্থায় তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় তওবা-ই-রহমত যা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়ে যায়। এ সকল মানুষের গোনাহ্কে আল্লাহ্পাক পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন।

আরেফ রূমী, ফরজ নামাজের মধ্যেকার ওই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যা সংঘটিত হয়েছিলো হজরত মুয়াবিয়া এবং শয়তানের মধ্যে। এর বিশুদ্ধ সনদ অবশ্য আমার জানা নেই। কিন্তু উপমা হিসেবে এই ঘটনাটিকে মেনে নেয়া যেতে পারে। একদিন শয়তান হজরত মুয়াবিয়াকে ফজরের নামাজের সময় জাগিয়ে দিলো। তিনি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাজ তো মানুষকে ফরজ কর্তব্য থেকে উদাসীন করে দেয়া। কিন্তু তুমি এমন করলে কেনো? শয়তান বললো, আমার ভয় হচ্ছিলো, যদি আপনার নামাজ কাজা হয়ে যায় তবে আপনি এমন চিন্তিত, দুঃখিত ও লজ্জিত হবেন, যার জন্য ফরজ আদায় অপেক্ষাও আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে। তাই, আমি আপনাকে জাগিয়ে দিয়েছি। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর কসম! যিনি আমার জীবনাধিকারী—যদি তোমরা গোনাহ্ না

করতে তবে আল্লাহ্ এমন মানুষ সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ্ করতো, তারপর ক্ষমাপ্রার্থনা করতো এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। এই হাদিসটিও উপরোক্ত অবস্থার অনুকূল।

জ্ঞাতব্যঃ অন্তরের কাঠিন্যই সকল গোনাহের ভিত্তি। প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও অসৎ ধারণার উৎপত্তি হয় এখান থেকেই। এখান থেকেই শুরু হয় পাশবিক স্বভাব ও প্রবৃত্তিপূজার অপবিত্রতা। রসুল স. বলেন, মানুষের শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। ওই মাংসপিণ্ডটি সুস্থ হলে সমস্ত শরীর সুস্থ হয়ে যায়। আর যদি অসুস্থ থাকে তবে সমস্ত শরীর অসুস্থ থাকে। জেনে রেখো, উহাই কলব (অন্তকরণ)। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, যখন সমস্ত মোকদ্দমা মীমাংসিত হবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে সঠিক অঙ্গীকার করেছিলেন, আমিও কিছু অঙ্গীকার করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর আমার কোনো বলপ্রয়োগ ছিলো না। কেবল এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম। তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ কোরো না। বরং নিজেকে দোষারোপ কোরো।'

একাগ্রচিত্ততা (হুজুরী কলব্) অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। নামাজের পবিত্রতাও হুজুরী কলবের উপর নির্ভরশীল। আর তরিকার প্রকৃত মোর্শেদের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার পথে অগ্রসর হওয়ার সাধনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত হুজুরী কলব হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তোমরা কামেলে মোকাম্মেল পীর মোর্শেদের তরিকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। তাঁদের সাহচর্য অর্জন করো। এরকম করলে তোমরা কখনো হতভাগ্য হবে না। তাঁদের বন্ধুরা কখনো অকৃতকার্য হয় না।

'লঘুতর পাপগুলো মোচন করবো'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক আমাদের সগীরা (ছোট) গোনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন অবৈধ স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদি। রসুল স. বলেছেন, চোখ, হাত ও পা–ও ব্যভিচার করে। শেষ পর্যন্ত লজ্জাস্থান ব্যভিচারকে বাস্তবায়ন করে। অথবা করে না। ইনশাআল্লাহ্ নামাজ, রোজা ছোট পাপগুলোকে দূর করে দিবে। নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম পাপকে বিদূরিত করে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের এবং জুমআর নামাজ দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময়ের পাপ সমূহ মিটিয়ে দেয়। তবে শর্ত হচ্ছে কবীরা গোনাহ্ থেকে বিরত থাকতে হবে। মুসলিম।

'সম্মানজনক স্থানে দাখিল করবো'—একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আমি তোমাদেরকে কল্যাণের সঙ্গে সম্মানজনক স্থানে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

মুজাহিদ বর্ণনা করেন, হজরত উম্মে সালমা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! পুরুষেরা জেহাদ করে, আমরা করতে পারি না। তাদের মীরাস দ্বিগুণ। আমরা যদি পুরুষ হতাম তবে আমরাও জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারতাম এবং দ্বিগুণ মীরাস পেতাম। এই কথার প্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিরমিজি, হাকেম, বোখারী, মুসলিম। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, যখন মীরাস সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলো, 'একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার সমান অংশ রয়েছে'—তখন মহিলারা বললেন, পুরুষেরা শক্তিমান। আমরা দুর্বল। আমাদের প্রয়োজন বেশী। অথচ তাদের উপার্জনের ক্ষমতা অধিক। তাই মীরাসের অধিকার আমাদেরই বেশী হওয়া প্রয়োজন। এ সকল মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিচের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত কাতাদা ও সুদ্দী বর্ণনা করেন, 'যখন একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার সমান অংশ রয়েছে'—এই আয়াত নাজিল হলো, তখন পুরুষেরা বললেন, মীরাসের নিয়মে যদি আখেরাতেও আমরা মেয়েদের পুণ্য অপেক্ষা দ্বিগুণ পুণ্য পেতাম। এরকম কথাবার্তা চলার সময় নিচের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩২

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ○

❐ যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না। পুরুষ যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহের অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। তাঁর নির্ধারণই চূড়ান্ত। তিনি একজনকে অপরজনের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া উচিৎ। আল্লাহ্তায়ালার দেয়া মর্যাদার সমকক্ষতা অর্জন করার লালসা পরিত্যাজ্য। বরং প্রত্যেকের উচিত এই যে, আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনকে উদ্দেশ্য করবে। পুণ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করে যাবে।

পুরুষদের আমল যেমন নির্ধারিত। তেমনি নারীদের আমলও। পুরুষদের জন্য জেহাদ, গণিমত, দ্বিগুণ মীরাস, ব্যবসায়িক সফলতা—আল্লাহ্তায়ালাই নির্বাচন

করেছেন। নারীদের আমলও তেমনি সুনির্ধারিত—স্বামীর অনুসরণ, সন্তান প্রতিপালন, সতীত্ব রক্ষা এগুলো হচ্ছে নারীর দায়িত্ব। তাদের জন্য রয়েছে মোহরানা, খোরপোশ, মীরাস। এছাড়াও রয়েছে নামাজ, রোজা, দান—ইত্যকার আরো অনেক পুণ্য কর্মের সুযোগ। আমল ও কর্মক্ষেত্র কিছুটা ভিন্ন হলেও পুরুষ রমণী উভয়েই আখেরাতে তাদের পুণ্যকর্মের বিনিময় লাভ করবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য নিবেদন জানাও। তাঁর রহ্‌মতের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি একটি পুণ্যকে দশগুণ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। আবার কখনো দান করেন অপরিমেয়, অনির্ণেয়। তাঁর দান দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি কাউকে বেশী দিলে তার প্রতি হিংসা করা বৈধ নয়।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলে তুমি অনুগ্রহমণ্ডিত হবে। জনৈক সাহাবী থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর কাছে তাঁর ফজল প্রার্থনা করো। আল্লাহ্‌ পছন্দ করলে ফজলের অধিকারী হতে পারবে। আর প্রশস্ততার অপেক্ষা করা অতি উত্তম ইবাদত। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তার অভিলাষ পূর্ণ করো। আবার যখন কোনো মুসলমান তিনবার দোজখ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে, তখন দোজখ বলে, হে আল্লাহ! তার প্রার্থনা পূর্ণ করে দাও। হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের উক্তি ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম উদ্ধৃত করেছেন এরকম— দোয়া পার্থিব কোনো ব্যাপার (পার্থিব বিষয় প্রার্থনা করা হলেও) নয়। দোয়া হচ্ছে ইবাদত।

আল্লাহ্‌তায়ালা সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। কে কী এবং কাকে কী মর্যাদা দিতে হবে— সকল কিছু সম্পর্কে তিনি জানেন। মর্যাদা, যোগ্যতা ও বিনিময় প্রদানের হকিকত তিনি ব্যতীত অন্য কারো জানার কথা নয়।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৩

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ○

❒ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করিয়াছি এবং যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দিবে। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ের দ্রষ্টা।

আল্লাহ্তায়ালা পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত প্রতিটি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং অধিকার প্রত্যার্পণে ধর্মনিষ্ঠ হওয়া বাঞ্ছণীয়।

জ্ঞাতব্যঃ আবু দাউদ নাসেখ পুস্তকে দাউদ বিন হোসাইনের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এ রকম— আমি উম্মে সা'দ বিনতে রবীকে কোরআন শেখাতাম। তিনি শিশুকালে এতিম হয়েছিলেন এবং প্রতিপালিতা হয়েছিলেন হজরত আবু বকরের নিকট। আমি তাঁর সামনে 'যাহাদের সঙ্গে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ' আয়াত পাঠ করলাম তখন তিনি বললেন, এ রকম নয়। বরং পাঠ করতে হবে এভাবে— 'ওয়াল্লাজিনা আক্বাদাত আইমানুকুম।' এই আয়াত নাজিল হয়েছে হজরত আবু বকরের ছেলে হজরত আবদুর রহমান সম্পর্কে। যখন আবদুর রহমান মুসলমান হতে অস্বীকার করলো, তখন হজরত আবু বকর কসম খেয়ে তাঁকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করে দিলেন। কিন্তু পরে তিনি মুসলমান হয়ে গেলে আল্লাহ্ হুকুম করলেন, তাকে মীরাস দিয়ে দাও। আমি বলি, এই আয়াত দ্বারা প্রভুর সম্পত্তিতে দাসের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয় না। আবু মালেকের উক্তি আবদ বিন হুমাইদ এবং ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন এরকম— জাহেলী যুগে কোনো কোনো মানুষ আপন গোত্র ছেড়ে দিয়ে অন্য দলে মিশে যেতো। দলের লোকেরা বলতো, তুমি আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কল্যাণ অকল্যাণ, হত্যা, রক্তপণ (দিয়ত) সকল বিষয়ে তুমি আমাদের ভ্রাতৃত্বের অংশীদার। ওই ব্যক্তির নিকট থেকেও তারা এরকম অংগীকার গ্রহণ করতো। কিন্তু বাস্তবে এ অংগীকারের প্রতিফলন পড়তো খুব কমই। প্রয়োজনের সময় সাহায্যার্থী হলে ওই ব্যক্তি যেমন এগিয়ে আসতে গড়িমসি করতো, তেমনি ওই ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হলে দলের কেউ কেউ এগিয়ে গেলেও সবাই যেতো না। আর এ সমস্ত সাহায্যে আন্তরিকতা প্রায়শই থাকতো না। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই ধরনের অঙ্গীকারের মধ্যে অসঙ্গতি দেখতে পেয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো রসুল স. সকাশে। আরজ করা হলো, মূর্খতার যুগের কৃত অংগীকার সম্পর্কে হুকুম কী? এমতাবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। নির্দেশ আসে, অংগীকার পূর্ণ করতে হবে। আবদ বিন হুমাইদ এবং ইবনে আবী হাতেম অন্য আর এক সূত্রে আবু মালেকের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম— তারা এক গোত্র অন্য গোত্রের সঙ্গে অংগীকারাবদ্ধ হতো। এক দল অপর দলকে সকল কাজকর্ম ও পরামর্শে অংশগ্রহণ করতে বলতো। হজরত ইবনে ওমর থেকে আবদ বিন হুমাইদ ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, রসুল স. মক্কাবিজয়ের দিন বলেছেন, জাহেলিয়াতের সময়কার অঙ্গীকার পূর্ণ করো। ইসলাম এই অংগীকারকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। কিন্তু এখন আর ওরকম অংগীকার কোরো না। আহমদ ও মুসলিম হজরত জোবায়ের বিন মোতয়েম থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ইসলামে পারস্পরিক কসম জায়েয নেই। কিন্তু ইসলামপূর্ব সময়ের অংগীকারকে ইসলাম অধিকতর মজবুত করেছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদ বিন হুমাইদ মারফু পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন, মূর্খতার যুগের অংগীকারকে

ইসলাম সুদৃঢ় করেছে। জুহুরীর বর্ণনা থেকে আবদুর রাজ্জাক এবং আবদ বিন হুমাইদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইসলামে পারস্পরিক কসম করা নাজায়েয।

ইমাম আবু হানিফার অভিমত এই যে, যাবিল ফুরুজ (কোরআনে উল্লেখিত উত্তরাধিকারী) আসাবা (যাবিল ফুরুজের পরের অংশীদার) এবং যাবিল আরহাম (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়) যদি না থাকে তবে সবচেয়ে উপরের স্তরের মাওলাল মাওয়ালাতকে অংশ দিতে হবে। (মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত বন্ধুকে মাওলাল মাওয়ালাত বলে)। যাবিল ফুরুজ অথবা যাবিল আরহাম অথবা আসাবা থাকলে মাওলাল মাওয়ালাত কিছুই পাবে না। এটা ঐকমত্য।

জমহুরের মন্তব্য এই যে, মূর্খতার যুগে মাওলাল মাওয়ালাতকে অংশীদার করার নিয়ম ছিলো। ইসলামের প্রথম দিকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ দেয়ার হুকুম ছিলো। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র কিতাবে রক্ত সম্পর্কিত স্বজনদের মধ্যে 'বিভিন্নজন বিভিন্নজনের চেয়ে উত্তম'—এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন মাওলাল মাওয়ালাতদের অংশীদারিত্ব রহিত হয়ে গেলো। অন্য অংশীদারদের কেউই যদি না থাকে তবুও তাদেরকে কিছু দেয়া যাবে না। সমস্ত সম্পদ তখন জমা দিতে হবে বায়তুল মালে।

জমহুরের বক্তব্যের ব্যাপারে এই আপত্তিটি উত্থাপিত হতে পারে যে, এক আয়াত যখন অন্য আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়—যদি একটি আমল করতে গেলে অন্যটির বিরুদ্ধাচরণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে, তখনই কেবল মানসুখ (রহিত) হওয়ার কথা উঠতে পারে। তখন এক আয়াত হয় রহিতকারী, অন্যটি হয় রহিত। কিন্তু এখানে সে রকম ঘটেনি। এখানে যা বলা হয়েছে তা হলো, প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের অংশ দেয়ার পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী যদি আদৌ না থাকে, তখনই কেবল মাওলাল মাওয়ালাত অংশীদার হবে। সুতরাং এখানে দ্বন্দ্ব কোথায় যে রহিত হওয়া না হওয়ার কথা ভাবতে হবে?

আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ধারণা এই যে, মাওলাল মাওয়ালাত প্রকৃত পক্ষে ওয়ারিশই নয়। এ আয়াতই তাদের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করেছে। অন্য অংশীদারেরা যদি কেউই না থাকে তবুও মাওলাল মাওয়ালাত কোনো অংশ পাবে না। কারণ আয়াতের শেষ দিকে বলা হচ্ছে, কিন্তু এই মাত্র যে, 'তোমরা আপন বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।' (তবে তোমরা মরার পর তারা শরয়ী অসিয়ত অনুযায়ী কিছু পেয়ে যাবে)। এই বাক্যটি এখানে স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, অসিয়ত করলে তারা কিছু পাবে, অসিয়ত না করলে পাবে না।

ইমামে আজম বলেছেন, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত হলে মাওলাল মাওয়ালাত কিছুই পাবে না। আমরাও একথা বলি। কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় কেউ না থাকলে মাওলাল মাওয়ালাতের অংশ বাকী থাকবে। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকাকালে তার সম্পত্তির মালিক ছিলো এবং সকল প্রকার ব্যয় করার অধিকার তার ছিলো। (সে বন্ধুদেরকে দিতে পারতো এবং দেয়ার অঙ্গীকারও করেছিলো)। বায়তুল মালে জমা দেয়ার প্রশ্ন আসে নিতান্ত অপারগ

অবস্থায়। আর বায়তুল মাল নিজে কোনো ওয়ারিশ নয়। বায়তুল মালের দান গ্রহীতা অনির্দিষ্ট ও অপরিচিত হয়ে থাকে। অপরিচিতরা উত্তরাধিকারী হয় না। (অতঃপর বংশীয় আসাবা ওয়ারিশ ও আত্মীয় না থাকলে মাওলাল মাওয়ালাতেরাই বায়তুল মাল অপেক্ষা অধিক হকদার। কেননা, মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় তার সাথে সম্পত্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলো। এই অঙ্গীকার অবশ্য অন্যান্য হকদারের হক বিনষ্ট করতে পারে না। অঙ্গীকার অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। বায়তুল মালের কোনো হক নেই)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। এই আয়াতে আত্মীয়কে মীরাস না দেয়ার প্রতি ভয় দেখানো হয়েছে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৪

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۚ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝

❒ পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা, এবং যাহা লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহের হিফাজতে উহারা তাহার হিফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না। আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

পুরুষগণ রমণীদের অভিভাবক। হজরত হাসানের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এক মহিলা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার স্বামী আমাকে চড় মেরেছে। রসুল স. বললেন, প্রতিশোধ নাও। তৎক্ষণাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। মহিলার আর প্রতিশোধ নেয়া হলো না। এই বর্ণনাটি ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নিফ গ্রন্থে এবং আবু দাউদ তাঁর মারাসিলের মধ্যে লিখেছেন। হজরত হাসান থেকে ইবনে জারীরও এ রকম লিখেছেন।

কিন্তু ছা'লাবীয়ে ওয়াহেদী এবং বাগবী বর্ণনা করেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত রবী ও তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে। সা'দ ছিলেন নুকাবাহ্ দলভুক্ত। রবীর স্ত্রী ছিলেন হাবীবা বিনতে জায়েদ বিন আবী জুহাইর। মুকাতিলও এই নাম লিখেছেন। বাগবী লিখেছেন, সা'দের স্ত্রী ছিলেন মোহাম্মদ বিন মোসলেমার কন্যা। ঘটনাটি এই— সা'দের স্ত্রী সা'দের হুকুমের বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেন। সা'দ তখন রেগে গিয়ে তাঁকে চপেটাঘাত করেছিলেন। তখন তাঁর শ্বশুর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্, আমার এ কন্যাকে আমি সা'দের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। সে আমার মেয়েকে চড় মেরেছে। রসুল স. বললেন, তোমার মেয়েরও প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। সহসা তিনি বলে উঠলেন, এখন যাও। হজরত জিবরাইল এসেছেন। ইতোমধ্যে হজরত জিবরাইল এই আয়াত নিয়ে আবির্ভূত হলেন। রসুল স. বললেন, আমি এক রকম চাইলাম। আর আল্লাহ্তায়ালা মঞ্জুর করলেন আর এক রকম। আল্লাহ্র ইচ্ছাই উত্তম। এরপর রসুল স. রমণীদের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রহিত করে দিলেন।

হজরত আলী থেকে ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, এক আনসার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রসুল স. এর দরবারে হাজির হলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল ! উনি আমাকে মেরেছেন। আমার চেহারায় দাগ পড়ে গিয়েছে। রসুল স. বললেন, তার এই অধিকার নেই। এমন সময় আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াত নাজিল করলেন। স্ত্রীকে আদব শিক্ষা দেয়ার অধিকার রয়েছে স্বামীদের। পুরুষদের অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা হিসাবে এখানে দু'টি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে— ১. দান করা ২. উপার্জন করা।

আল্লাহ্তায়ালা পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এটাই পুরুষের অভিভাবক হওয়ার প্রথম কারণ। আল্লাহ্ পুরুষকে অধিকতর জ্ঞান দিয়েছেন, তাই তারা উত্তম ব্যবস্থাপক। শারীরিক শক্তিমত্তা ও অন্যান্য যোগ্যতাও তাদের অধিক। মেয়েরা এদিক থেকে পিছিয়ে। নবুয়ত, ধর্মীয় ও পার্থিব নেতৃত্ব, রাজ্য পরিচালনা, সুবিচার, সুসিদ্ধান্ত, সাক্ষ্যদান, জেহাদ, জুম'আ, ঈদ, নামাজের জামাত, খোতবা, অধিক মীরাস, বিবাহের কর্তৃত্ব, অধিক স্ত্রী লাভের অধিকার, তালাকের অধিকার, রমজানের নিরবচ্ছিন্ন রোজা, নিরবচ্ছিন্ন নামাজ—এরকম অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে পুরুষদের। এ সমস্ত কিছু লক্ষ্য করেই রসুল স. বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা দিতে বলতাম তবে হুকুম দিতাম, মেয়েরা যেনো তাদের স্বামীদেরকে সেজদা করে। আহ্মদ হজরত মুআজ থেকে এবং তিনি হজরত আয়েশা থেকে এ বর্ণনাটি করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন তিরমিজি হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং আবু দাউদ হজরত কায়েস বিন সা'দ থেকে।

পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি কারণ হচ্ছে, তারা তাদের সম্পদ স্ত্রীদের জন্য খরচ করে। মোহরানা পরিশোধ করে। খোরপোশ ও অন্যান্য খরচ দেয়।

পুণ্যবতী রমণীরা আল্লাহতায়ালার প্রতি অনুগতা। পুরুষদের অনুপস্থিতিতে তারা আল্লাহ্র সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয়সমূহ সংরক্ষণ করে। 'কানেতাতুন' শব্দের

মাধ্যমে তাঁদের এই গুণ বিবৃত হয়েছে। তাঁরা স্বামীকেও মান্য করে। স্বামীর সম্পদ ও গোপন কথার হেফাজত করে এবং নিজের চরিত্র ও মর্যাদা রক্ষা করে চলে। তাদের হেফাজতের যোগ্যতা ও সুযোগ দিয়েছেন আল্লাহ্‌পাক। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই পুরুষকে দিয়েছেন মোহরানা, খোরপোশ, তত্ত্বাবধান ইত্যাদির হুকুম। এর মাধ্যমে তিনি মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। একারণেই মেয়েদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যেনো স্বামীদের সম্পদ, গোপন যা কিছু এবং আপন কর্তৃত্বের হেফাজত করে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— সবচেয়ে উত্তম স্ত্রী সে, যে আনন্দিত হয় যদি তুমি তার দিকে তাকাও। তুমি নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ মান্য করে। আর অনুপস্থিতিতে আপন সম্পদ-সম্মানের হেফাজত করে। এরপর রসুল স. এই আয়াত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। বোখারী। ইবনে জারীরের বর্ণনায় আপন সম্পদ ও সম্মানের পরিবর্তে তোমার সম্পদ ও আপন সম্মান এর উল্লেখ এসেছে। 'সুনানে নাসাঈতে' নাসাঈ, মুসতাদরাক পুস্তকে হাকেম এবং 'শো'বুল ইমান' পুস্তকে বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! সর্বাপেক্ষা উত্তম রমণী কে? তিনি স. বললেন, যাকে দেখে তার স্বামী প্রফুল্ল হয়। যে তার স্বামীকে মান্য করে এবং আপন সম্পদে ও স্বভাবে এমন কিছু না করে যাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, তারা আপন ইজ্জত ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করে। আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, অধিকাংশ সিলসিলায় এই কথাগুলোই এসেছে। হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে মাজাও এরকম বর্ণনা করেছেন। তৈয়বী লিখেছেন, আপন সম্পদ অর্থ স্বামীর সম্পদই। মেয়েরাই তাদের স্বামীর সম্পদ খরচ করে, তাই স্বামীর সম্পদকেই তাদের আপন সম্পদ বলা হয়েছে।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, নির্ধারিত মাসের রোজা রাখবে, আপন গোপনীয়তা বজায় রাখবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, সে যে দরোজা দিয়ে খুশী জান্নাতে প্রবেশ করবে। হুলিয়া পুস্তকে আবু নাঈম এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত উম্মে সালমার মারফু বিবরণ এই যে, যদি মেয়েরা তাদের স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে পৃথিবী পরিত্যাগ করে তবে বেহেশতবাসিনী হবে। তিরমিজি।

স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা দেখা দিলে তাকে সদুপদেশ দিতে হবে। আশংকা করা বা ভয় করা বলতে এখানে 'খউফুন' শব্দটি এসেছে। 'কামুস' অভিধানে এই শব্দটির একটি অর্থ এসেছে— জানা। এই আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। অর্থাৎ তোমরা যদি এরকম জানতে পারো যে স্ত্রী অবাধ্য, তবে তাদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। অবাধ্যতার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শাস্তি দেয়া যাবে না। আমি বলি, অবাধ্যতার আশংকা দেখা দিলে সদুপদেশ দানই যথেষ্ট। অবাধ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিদান বৈধ নয়। 'সদুপদেশ দাও' অর্থ আল্লাহর

আযাবের ভয় প্রদর্শন করো। এতে কাজ না হলে শয্যা পৃথক করো— তাও না হলে প্রহারও করতে পারো। এরকম করো এই উদ্দেশ্যে যেনো তারা সংশোধিত হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী শায়বা এবং বায়হাকী হজরত ওমরের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এরকম, ইমানের পর সর্বোচ্চ নেয়ামত হচ্ছে— সচ্চরিত্র স্বামীকে মহব্বতকারিণী চরিত্রবতী ও সন্তানবতী পত্নী। আর কুফরীর পর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে— কর্কশভাষিণী ও অসচ্চরিত্রা স্ত্রী। হজরত ওমর আরো বলেছেন, মেয়েরা তিন ধরনের। ১. পবিত্রা, বিনম্রা, সতী ও স্বামী অন্তপ্রাণা, অধিক সন্তানবতী। তারা বিপদে স্বামীর সহযোগিনী হয়। তারা অধিক পার্থিব উন্নতির জন্য লালায়িত হয় না। এরকম রমণী নিতান্তই অল্প। ২. কেবল সন্তানধারণ ছাড়া যাদের অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য গুণ নেই। ৩. তৃতীয় প্রকার মেয়েরা হচ্ছে ঘৃণিত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তার গলায় এদেরকে ঝুলিয়ে দেন। আবার আল্লাহর ইচ্ছাতেই এদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। নতুবা তারা গলদেশে কণ্ঠহারের মতো স্থায়ী হয়ে যাবে।

শয্যাবর্জন অর্থ শয়নের স্থান পৃথক করে দেয়া। অথবা নিজের লেপে বা চাদরের নিচে স্ত্রীকে আসতে না দেয়া। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শয্যা বর্জন অর্থ সহবাস বর্জন। অথবা অন্য দিকে মুখ করে শুয়ে থাকা। এই ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সুস্পষ্ট।

শয্যাবর্জন সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সংযত ও সংশোধিত না হয়, তবে প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাফসীরকারগণ 'প্রহার' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এমনভাবে প্রহার করতে হবে যেনো দাগ না হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে লঘু প্রহার কোরো। অতিরিক্ত মেরো না। এর কারণ হিসেবে হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণিত হাদিসটির উল্লেখ করা যায়— যেখানে বলা হয়েছে, বিদায় হজের ভাষণে রসুল স. বলেছেন, নারীদের অধিকার বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানতের উপর অর্থাৎ আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে গ্রহণ করেছো। আল্লাহ্র হুকুমে তাদের লজ্জাস্থান তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, তারা তোমাদের শয়নকক্ষে এমন কাউকে প্রবেশাধিকার দিবে না যাতে তোমরা অসন্তুষ্ট হও। তারা এমন করলে তাদেরকে এরকম প্রহার কোরো যেনো চামড়া না উঠে যায়। এরকম করার অধিকার তোমাদের রয়েছে।

আমি বলি, কোরআনের অকাট্য আয়াতকে খবরে আহাদ (একক বর্ণিত হাদিস) দ্বারা শর্তযুক্ত করা উচিত নয়। কোরআনের সরল ও স্পষ্ট নির্দেশই এক্ষেত্রে পালনীয়। অবাধ্যতার আলামত ও কর্কশ স্বভাব দেখতে পেলে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করবে, ভালো উপদেশ দিবে। এতে করে সে যদি সংযত হয় এবং অসুন্দর স্বভাব পরিত্যাগ করে তবে তো ভালোই। সংযত না হলে প্রথম

শাস্তি হচ্ছে শয্যাবর্জন। শয্যাবর্জনে কাজ না হলে অপরাধ অনুসারে মারবে। কখনো কম। কখনো বেশী। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেনো দাগ না পড়ে অথবা কোনো অঙ্গ যেনো বিকৃত না হয়। কঠিন শাস্তি দিবে তখন, যখন দেখতে পাও তারা ব্যভিচারপ্রবণা, ফরজ নামাজ ও রোজা পরিত্যাগকারিণী, সহবাসের পর এবং ঋতুস্রাব শেষে গোসলে অনভ্যস্তা। এরকম ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রহার করবে এবং বন্দিনী করে রাখবে যেনো তারা উল্লেখিত মন্দ স্বভাবগুলো পরিত্যাগ করে।

আয়াতের শেষ পাদে উপদেশ দেয়া হয়েছে, যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে প্রথম থেকেই অটল থাকে অথবা কৃত অপরাধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারিনী হয় তবে তাদেরকে আর কিছু বোলো না। অতীতের প্রসঙ্গ টেনে অযথা তাদেরকে উত্যক্ত কোরো না। কারণ, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন পাপহীনতার মতোই।

আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ। তাই সাবধান হও। দুর্বলের প্রতি অত্যাচার কোরো না। তোমরা তোমাদের অধীনস্তাদের প্রতি যে রকম ক্ষমতা রাখো, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক বেশী। আল্লাহ্ সর্বাধিক ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও দ্যাখো, তোমাদেরকে কেমন ক্ষমা করে দেন। তোমরাও অধীনাদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জামআ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর মতো দোররা না মারে। এরকম আচরণ নিতান্তই অসঙ্গত যে, তোমরা সকালে যাদেরকে দোররা মারবে, রাতে তাদেরকেই সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত করবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত মুয়াবিয়া বিন কুশায়রী বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের প্রতি আমাদের পত্নীদের কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি স. বললেন, সময়মতো তাদের আহারের প্রয়োজন মেটানো, উপযুক্ত পরিধেয় প্রদান করা, তাদেরকে গালি না দেয়া, মুখমণ্ডলে আঘাত না করা এবং ঘরের বাইরে একা যেতে না দেয়া। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত আয়াস বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র দাসীদেরকে মেরো না। হজরত ওমর নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! মেয়েরা স্বামীদের অবাধ্য হয়েছে । এরপর রসুল স. প্রহারের অনুমতি দিলেন। ওদিকে তাঁর স. পবিত্রা পত্নীদের ঘরে অনেক মহিলা সমবেত হলেন এবং তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেশ করলেন। রসুল স. বললেন, মোহাম্মদ স. এর স্ত্রীদের নিকট অগণিত মহিলা সমবেত হয়ে স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করছে। তারা উত্তম নয় যারা স্ত্রীদের কষ্ট দেয় এবং তাদেরকে অভিযোগের সুযোগ করে দেয়। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীগণের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। তিরমিজি, দারেমী। ইবনে মাজা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ وَحَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا اِنۡ يُّرِيۡدَاۤ اِصۡلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيۡنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا خَبِيۡرًا ○

❑ তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার পরিবার হইতে একজন ও উহার পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে; তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

আয়াতের শুরুতে 'খিফতুম' শব্দটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে হাকিম বা বিচারককে। 'শিকাক্ব' শব্দের অর্থ শত্রুতা, মতবিরুদ্ধতা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতবিরুদ্ধতা দেখা দিলে যখন একথা স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, তাদের মধ্যে কে সঠিক, কে ভুল—তখনকার করণীয় সম্পর্কে এখানে নির্দেশনা এসেছে। তাফসীরকার বলেছেন— এখানে সম্বোধন করা হয়েছে, অভিভাবককে (হাকিমকে নয়)। বলা হয়েছে, এমতোক্ষেত্রে পুরুষের পক্ষের একজন এবং স্ত্রীর পক্ষের একজন সালিস নিযুক্ত করো। সালিসেরা তাদের আত্মীয় হলেই ভালো। কারণ, আত্মীয়রাই তাদের অবস্থা অন্যের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল। সালিস আত্মীয় না হলেও ক্ষতি নেই। সালিসের প্রাথমিক কাজ হলো বিবদমান দুই পক্ষকে মিলিয়ে দেয়া। যদি স্বামীর আগ্রহ দেখে তবে সালিস তাকে বলবে, যা কিছুই ঘটে থাকুক না কেনো সব ভুলে গিয়ে সে যেনো তার স্ত্রীকে রেখে দেয়। আর ঘর করা সম্ভব নয় মনে করলে, উত্তম আচরণের মাধ্যমে যেনো সম্পর্ক পরিত্যাগ করে। স্ত্রীর অবাধ্যতার প্রমাণ পেলে সালিস তাকে সদুপদেশ দিবে যেনো সে তার স্বামীকে মান্য করে সংসারে স্থিতা হয়। আর সংসার করা তার পক্ষে নিতান্তই সম্ভব না হলে যেনো খোলা তালাক নিয়ে নীরবে সরে যায়। সন্ধি অথবা বিচ্ছেদ, যাই হোক না কেনো তা যেন হয় উত্তম ও কলহহীন অবস্থায়।

বাগবী ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে হজরত উবাদা থেকে বর্ণনা করেন, হজরত আলীর খেদমতে এক পুরুষ ও এক রমণী উপস্থিত হলো। তাদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকেরাও ছিলো। হজরত আলী নির্দেশ দিলেন, উভয় পক্ষের একজন করে সালিস নির্ধারণ করো। নির্দেশ পালিত হলো। তিনি উভয় সালিসকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা প্রথমে দু'জনের মনোভাব জেনে নাও। তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দিতে পারলে করো। আর তা সম্ভব না হলে তাদেরকে পৃথক করে দাও। রমণীটি বললো আমার লাভ ক্ষতি যাই হোক আমি চাই আল্লাহ্র কিতাবের ফয়সালা। পুরুষটি বললো, পৃথক হওয়ার প্রশ্নই আসে

না। (বাকী কাজ সালিসদের)। হজরত আলী বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি ভুল বলেছো (ওই সময় পর্যন্ত সালিস হবে না) যতোক্ষণ না তুমি তোমার স্ত্রীর অনুরূপ কথা বলবে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমাকে এবং হজরত মুয়াবিয়াকে সালিস করে (এক স্থানে) পাঠিয়ে দেয়া হলো এবং আমাদেরকে বলে দেয়া হলো, মিলমিশ করে দেয়া উত্তম মনে করলে তাই করে দিবে। আর বিচ্ছিন্নতা উত্তম মনে করলে বিচ্ছিন্নই করে দিবে। হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় এরকম ঘটেছিলো।

ইমাম মালেকের মতে, পুরুষ পক্ষের সালিসের তালাকের সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা আছে। পুরুষ এতে রাজী না হলে স্ত্রীর সালিসের খোলা করার অধিকার আছে। (অর্থের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে খোলা বলে)। স্ত্রী রাজী না হলে তার সম্পদ থেকে খোলার অর্থ পরিশোধ করে দিবে। তার সালিসের এরকম অধিকারও আছে। হজরত আলী পৃথক করে দেয়া অথবা মিলিয়ে দেয়া এই দু'রকম অধিকারই সালিসদেরকে দিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথক না করাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক।

জমহুরের রীতি এই যে, সালিসগণ নিজে থেকে কিছুই করতে পারবে না যতোক্ষণ না পুরুষ তালাকের অথবা নারী খোলার সিদ্ধান্ত না দেয়। সালিসদের কর্তব্য হলো সমঝোতার চেষ্টা করা, কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং অকল্যাণ থেকে বিরত রাখা। তারা দু'জনের একজনও যদি বিরুদ্ধবাদিতায় অটল থাকে, তবে সালিসদ্বয় হাকিমকে নিজেদের সমঝোতার প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানাবে। হাকিম তখন স্বামীকে উত্তম আচরণের সঙ্গে বিধান অনুযায়ী স্ত্রীকে রাখার অথবা তালাক দেয়ার ব্যাপারে হুকুম দেবে। মহিলাকে বাধ্য করবে সে যেনো তার অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে অথবা খোলা করে নেয় এবং খোলার বিনিময় পরিশোধ করে। হজরত আলীর সিদ্ধান্তে একথা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তিনি স্বামীকে বললেন, যতোক্ষণ না সে তার স্ত্রীর মতো কথা বলবে ততোক্ষণ তার কথা হবে ভুল। এতে করে বুঝা যায় যে, তালাকের জন্য স্বামীর রাজী থাকা শর্ত। সালিসেরা নিজেদের পক্ষ থেকে তালাক অথবা খোলার সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না। সালিসদের সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার নেই।

সালিসদ্বয় যদি বিশুদ্ধ নিয়তে ফয়সালার জন্য চেষ্টা চালায় তবে আল্লাহ্তায়ালা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। সেই মীমাংসা মিলনের আকারেও হতে পারে। আবার বিচ্ছিন্নতার আকারেও হতে পারে। এরকম হতে পারবে তখনই যখন 'ইউরিদা' সর্বনামটি সালিসদের সঙ্গে এবং 'বায়নাহুম' সর্বনামটি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। কিন্তু উভয় সর্বনাম যদি সালিসের প্রতি প্রযোজ্য হয় তবে অর্থ হবে এরকম—যখন সালিসদ্বয় স্বজনপ্রীতির বশবর্তী না হয়ে অত্যাচারিতকে

সাহায্য করার নিয়তে অগ্রসর হবে, তখন আল্লাহ উভয়ের ভাবনাকে এক করে দিবেন এবং তাতে করে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। উল্লিখিত সর্বনাম দু'টি যদি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয় অর্থাৎ দু'জনেই যদি উত্তম সিদ্ধান্তের আকাংখা করে অথবা যদি একথায় একমত হয় যে, আমাদের জন্য যা শোভনীয় তাই যেন হয়— তখন আল্লাহ্পাক তাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন এবং এমন মীমাংসার তৌফিক দিবেন যা দু'জনের জন্যই হবে কল্যাণজনক। এই আয়াতে এরকম নির্দেশনা রয়েছে যে, যে কাজ বিশুদ্ধ নিয়তে করা হয়, আল্লাহ্তায়ালা তার শুভপরিণাম দান করেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা অন্তরের নিয়ত ও আমলের পরিণাম সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তিনি জানেন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কে অন্যায়ের উপরে আছে। অন্যায় অবলম্বন যে করবে, তিনি তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৬

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

❒ তোমরা আল্লাহের ইবাদত করিবে ও কোনকিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যে দাম্ভিক, আত্ম-গরবী, তাহাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।

এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো। জুহুরী লিখেছেন, 'উবুদিয়াত' অর্থ অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। এই অর্থ 'দাসত্ব' অপেক্ষা অধিকতর যথার্থ। ইবাদত অর্থ তাই কেবলই দাসত্ব নয়—ইবাদত হচ্ছে অপরিসীম অক্ষমতাবোধ ও বিনয়। মানুষ মানুষের গোলামী বা দাসত্ব করতে পারে। কিন্তু মানুষ কস্মিনকালেও মানুষের ইবাদত করতে পারে না। ইবাদত পাওয়ার অধিকার কেবল তিনিই যিনি মহামর্যাদাশীল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

আরো এরশাদ হয়েছে— কোনো কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরীক কোরো না। কোনো কিছু বুঝাতে 'শাইয়ান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির শেষে

তানবীন (দুই জবর) তুচ্ছতাব্যঞ্জক। আল্লাহ্‌র সীমাহীন মহিমার তুলনায় সৃষ্টি নগন্যাতিনগন্য (অতএব, সৃষ্ট কোনো কিছুকে তাঁর ইবাদতে অংশী নির্ধারণ কোরো না)। এই হুকুমের মাধ্যমে গোপন প্রকাশ্য সকল প্রকার শিরিক নিষিদ্ধ হয়েছে।

ইবাদত দুই প্রকার। ১. বেএখতেয়ারী বা বাধ্যতাবদ্ধ ইবাদত। সকল সৃষ্টি তাঁর হুকুমের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর হুকুম ও বিধানবিচ্যুত কোনো সৃষ্টি থাকা সম্ভব নয়। ২. এখতেয়ারী— ইচ্ছাধীন ইবাদত। এই আয়াতে এ দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতের হুকুম দেয়া হয়েছে। ইবাদতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মান্য করে চলা।

সুফিয়ানে কেরামের মতে, ইবাদতের অর্থ এরকম,যেনো গোসলদাতার অধীনে মরদেহ।আল্লাহ্‌র হুকুম আহকামের আমলের ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছাকে মনে করতে হবে মৃতবৎ। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মেনে নিবে সন্তুষ্টচিত্তে। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকৃত ইবাদতকারীর দৃষ্টিতে এখতেয়ারী ইবাদতও বেএখতেয়ারী ইবাদতের মতো। শরিয়তের হুকুম পালনে অনীহার চিন্তা কিছুতেই তাঁদের মাথায় আসে না।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল স. কোনো সিদ্ধান্ত দেন, তখন ইমানদার নারী-পুরুষের কোনো নিজস্ব ইচ্ছা থাকে না। হজরত মুআজ বিন জাবাল বলেছেন, একদিন আমি রসুল স. এর সঙ্গে একই উটনীতে আরোহন করেছিলাম। তিনি স. বললেন, মুআজ। তুমি কি জানো, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অধিকার এই— তারা কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার অধিকার হচ্ছে— যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তাকে তিনি আযাব দিবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি কি এই কথা মানুষকে জানিয়ে দেবো? তিনি স. বললেন, না। একথা জানলে মানুষেরা এই কথার প্রতি নির্ভর করে বসে থাকবে (আমল করবে না)। বাগবী। সহীহাইনেও এই হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে। সুফীগণের মধ্যে আযাব না দেয়া অর্থ মহব্বতের কষ্ট না দেয়া। অর্থাৎ শিরিকমুক্ত মানুষকে তিনি দুঃখ দিবেন না।

এরপর এরশাদ হচ্ছে, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। হজরত মুআজ বলেন, আমাকে রসুল স. দশটি কথা দ্বারা নসিহত করলেন। তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক কোরো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না, যদিও তারা স্ত্রী ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে বলে। আহ্‌মদ।

নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে—এ প্রসঙ্গে হজরত সালমান বিন আমের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, দরিদ্রকে দান করা কেবলই দান, আর দরিদ্র আত্মীয়কে দান করলে দানও হবে এবং সেলায়ে রেহেমীও হবে (দ্বিগুণ পুণ্য হবে)। আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, হাকেম,

তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে খুজাইমা। এই হাদিসকে তিরমিজি বলেছেন হাসান এবং ইবনে খুজাইমা বলেছেন সহীহ্।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনদের ভরণ পোষণ করা বিত্তশালীদের জন্য ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ বলেছেন, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আল্লাহর রাস্তায় কী খরচ করবে? আপনি বলে দিন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু। রসুল স. বলেছেন, উত্তম দান হচ্ছে ওই দান যা বিত্তবানেরা (তাদের প্রয়োজন পূরণ করার পর) দান করে, যে দান শুরু হয় তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভূতদের থেকে। বর্ণনা করেছেন হাকেম ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী এবং হাকেম থেকে মুসলিম।

আত্মীয়-স্বজন উপার্জনে অক্ষম হলে তাদেরকে দান করা ওয়াজিব। যেমন— পঙ্গু, অন্ধ অথবা অসহায় কোনো মহিলা। পিতা-মাতাকে দান করার নিয়ম এরকম নয়। তারা অক্ষম না হলেও তাদেরকে দিতে হবে। অনাহারক্লিষ্ট আত্মীয়-স্বজনকে দান না করা ইহ্সান বিরোধী।

এতিম ও মিসকীন অর্থাৎ পিতৃহীন ও অভাবগ্রস্তদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে জাকাত দেয়া ওয়াজিব। জাকাত ছাড়াও দান করা মোস্তাহাব। হজরত সহল বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমি এবং এতিমের প্রতিপালনকারী (এতিম আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়) বেহেশতে এরকম অবস্থায় থাকবো।— একথা বলে তিনি স. তাঁর তর্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলি একত্র করে দেখালেন। দুই আঙ্গুলের মধ্যে ছিলো অতি সামান্য ব্যবধান। বোখারী।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় আদর করে হাত বুলাবে, তার স্পর্শিত প্রতিটি চুলের জন্য দশটি করে পুণ্য লেখা হবে। যে তার তত্ত্বাবধানাধীন এতিম বালক বালিকার সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে সে বেহেশতে আমার সঙ্গে থাকবে এরকম— তিনি দু'টি আঙ্গুল (তর্জনী ও মধ্যমা) একত্রিত করে দেখালেন। বাগবী।

ভালো ব্যবহার করতে হবে নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে। দূর-প্রতিবেশীর সঙ্গেও। 'কুরবা' বা নিকট বলতে বুঝানো হয়েছে ঘরের নিকটে যাদের ঘর তাদেরকে। বংশসূত্রে নিকটে কিংবা ধর্মের দিক থেকে নিকটে যারা তারাও এই হুকুমের অন্তর্ভূত।

দূর-প্রতিবেশী হচ্ছে তারা, যাদের বসবাস একটু দূরে। ঘরের সঙ্গে ঘর নয়, তবে একই রাস্তায় বা একই মহল্লায় যারা থাকে। অনাত্মীয় এবং অমুসলিমরাও এই হুকুমের আওতাধীন।

হজরত জাবের বলেছেন, প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রথম প্রকার যারা, তাদের রয়েছে তিন রকম অধিকার। ১. প্রতিবেশীর অধিকার ২. আত্মীয়তার অধিকার এবং ৩. ধর্মীয় অধিকার। দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবেশীর রয়েছে দু'টি অধিকার। প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার এবং মুসলমান হওয়ার অধিকার। তৃতীয় প্রকার

প্রতিবেশীর অধিকার একটি— তা হচ্ছে, কেবলই প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার। তারা অনাত্মীয় ও অমুসলিম কিন্তু প্রতিবেশী। প্রথম প্রকার প্রতিবেশীর তিনটি, দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবেশীর দুইটি এবং তৃতীয় প্রকার প্রতিবেশীর একটি অধিকার রয়েছে। হাসান বিন সুফিয়ান ও বায্যার। কিতাবুস সাওয়াবে আবু শায়েখ, হুলিয়ায় আবু নাঈম এবং কামেলে ইবনে আদ্দী এরকম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে। কিন্তু দু'টি হাদিসই দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত।

হজরত আয়েশা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কার গৃহে হাদিয়া পাঠাবো (দু'জনের মধ্যে কে বেশী হকদার)। রসুল স. বললেন, যার গৃহের দরোজা তোমার অধিকতর নিকটে। বোখারী।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যখন তরকারী রান্না করবে তখন পানি বেশী করে দিও যাতে ঝোল বেশী হয়। এভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখো। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশীর বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তখন মনে হতো তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করবেন। বোখারী।

সঙ্গী-সাথী ও পথচারীরাও উত্তম আচরণ লাভের অধিকার রাখে। ইবনে জারীহ্ এবং ইবনে জায়েদ বলেছেন, যারা তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের সঙ্গে থাকে তারাই চলার পথের সাথী। একথার মধ্যে ভাই, বন্ধু, ওস্তাদ, শাগরিদ সকলেই রয়েছেন। হজরত আলী, আবদুল্লাহ এবং ইব্রাহিম নাখয়ী 'ওয়াস্সাহিবি বিল জামবি'(সঙ্গী) শব্দের অর্থ করেছেন স্ত্রী যার সঙ্গ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ।

পথচারী অর্থ মুসাফির। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, মেহ্মান। হজরত আবু শুরাইহ্ খাজায়ী বলেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে আস্থাবান সে যেনো প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, একান্ত বিনয়ের সঙ্গে অতিথির সম্মান রক্ষা করে এবং উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে। বাগবী।

হজরত আবু শুরাইহ্ কা'বী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সে যেনো অন্ততঃ একদিন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে। অতিথির অবস্থানের অধিকারসীমা তিন দিন। এরপর হবে দান। অতিথির জন্য এরকম উচিত নয় যে, সে অতিথিপরায়ণতার সুযোগ নিবে। আমন্ত্রকের গৃহে তিন দিনের অধিক অবস্থান করার অর্থ তাকে কষ্ট দেয়া যা মেহমানের পক্ষে জায়েয নয়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে প্রত্যয়ী সে যেনো মেহমানের প্রতি বিনম্র হয়, প্রতিবেশীকে দুঃখ না দেয় এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করে অথবা মৌন থাকে। বোখারী, মুসলিম।

দাস-দাসীদের প্রতিও উত্তম আচরণ করতে হবে। আমি বলি, চতুষ্পদ জন্তুও এই হুকুমের অধীন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন— রসুল স. বলেছেন, প্রভুর প্রতি দাস-দাসীদের পানাহার ও পরিচ্ছদের অধিকার রয়েছে। প্রভু যেনো

তাদের প্রতি তাদের সাধ্যাতীত কাজের হুকুম না দেয়। মুসলিম। হজরত আবু জর আরো বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তারা (বাঁদী-গোলাম) তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যা খাবে, অধীনস্থ ভাই-বোনদেরকেও তাই খাওয়াবে এবং যা পরিধান করবে তাদেরকে তাই পরিধান করতে দেবে। সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তাদেরকে দিও না। যদি দাও তবে নিজেও তার সাহায্যকারী হয়ো। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো খাদেম আগুনের তাপে উত্তাপিত হয়ে আহার্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসবে তখন তাকেও পাশে বসিয়ে একত্রে আহার কোরো। আহার্যের পরিমাণ কম হলেও তাকে অন্ততঃ দুই এক লোকমা দিও। মুসলিম।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী বলেন, একদিন আমি আমার গোলামকে প্রহার করেছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ শুনলাম, আবু মাসউদ! তুমি তার উপর যতোখানি ক্ষমতাবান তার চেয়ে আল্লাহ্ অনেক বেশী ক্ষমতাবান তোমার উপর। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, রসুল পাক স. স্বয়ং উপস্থিত। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি তাকে মুক্তি দিলাম। তিনি স. বললেন, তুমি এমন না করলে আগুন তোমার কাছে পৌছতোই। অথবা বললেন, আগুন স্পর্শ করেই ফেলেছিলো। মুসলিম।

হজরত উম্মে সালমা বলেন, রসুল স. অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছেন, নামাজ এবং ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের প্রতি খেয়াল রেখো। শো'বুল ইমানে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন বায়হাকী। হজরত আলী থেকে আহমদ ও আবু দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত জাবের বলেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি স্বভাব যার থাকবে, আল্লাহ্ তার মৃত্যু সহজ করে দিবেন এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। দুর্বলের প্রতি সদয় ব্যবহার, পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ এবং দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার। তিরমিজি।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বলেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমরা খাদেমদেরকে কতোবার ক্ষমা করবো? তিনি স. নিশ্চুপ রইলেন। ওই ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলো। এবারও তিনি নিশ্চুপ। তৃতীয়বারের মতো প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, প্রতিদিন সত্তর বার। তিরমিজি।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর এবং হজরত সহল বিন হানজালা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, পথিমধ্যে রসুল স. একটি জীর্ণ-শীর্ণ উট দেখলেন যার পেটের সঙ্গে পিঠ লেপটে আছে। তিনি স. বললেন, এই নির্বাক পশুর ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কোরো। বাহনের উপযুক্ত অবস্থায় আরোহণ কোরো। ছেড়ে দেয়ার অবস্থায় পৌছলে ছেড়ে দিও (আরোহণ কোরো না)।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না যে, মন্দ মানুষ কারা? মন্দ মানুষ তারাই যারা একা একা খায়, গোলামকে দোররা মারে এবং কাউকে কিছু না দেয়। রজীন।

হজরত আবু সাঈদ বলেন, রসুল স. বলেছেন, খাদেমকে প্রহার করার প্রাক্কালে মানুষ যেনো আল্লাহ্কে স্মরণ করে নেয়। যেনো চিন্তা করে দেখে তিনি কী রকম পরাক্রম ও শক্তিমত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের শত অপরাধ ক্ষমা করে দেন। কাজেই তোমরা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের প্রহার করা থেকে হাত গুটিয়ে নাও। তিরমিজি।

দাম্ভিক ও আত্মগরবীদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন না। 'মোখতাল' শব্দের অর্থ দাম্ভিক— যে তার আত্মীয়, প্রতিবেশী ও সঙ্গীসাথীদেরকে উপেক্ষা করে ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। আর 'ফাখুর' শব্দের অর্থ ওই সকল আত্ম-গৌরব প্রকাশক যারা আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে মগ্ন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, এক লোক দু'টি চাদর পরিধান করে হেলে দুলে পথ অতিক্রম করছিলো। আল্লাহ্ তাকে মৃত্তিকাপ্রোথিত করলেন। সে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্তিকা-নিমজ্জিত হতেই থাকবে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার প্রদর্শনার্থে পরিধেয় বস্ত্র মাটি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে পথ চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে সুদৃষ্টি দিবেন না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়ায বিন হেমার আশজায়ী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যে, তোমরা যেনো পরস্পর নম্র আচরণে ব্রতী হও। পরস্পর বিনয়াবনত হও। বাহাদুরী প্রদর্শন কোরো না। বাড়াবাড়ি কোরো না। মুসলিম।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেন, রসুল স. বলেছেন, হে ইসলামী দল! আল্লাহ্কে ভয় করো। এতে কোনো ভুল নেই যে, জান্নাতের বাতাস অনুভব করতে পারবে হাজার বছর সময়ের দূরত্ব থেকে। কিন্তু পিতা-মাতার সঙ্গে অসৎ আচরণকারী তা পাবে না। আর পাবে না আত্মীয়তা ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং ওই দর্পপ্রকাশক যে তার পরিধেয় মাটি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে চলে। গৌরব কেবল আল্লাহ্র জন্যই। আওসাত পুস্তকে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিবরানী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৭

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ○

❒ যাহারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

যারা কৃপণ এবং অন্যকেও কৃপণ হতে বলে তারা আল্লাহ্তায়ালার প্রিয়পাত্র নয়। ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে জায়েদের বক্তব্যানুসারে কতিপয় ইহুদী সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হচ্ছে কারামদা ইবনে জায়েদ, হুয়াই ইবনে আখতাব, রেফায়া ইবনে জায়েদ, ইবনে তাবুত, উসামা ইবনে হাবিব, নাফে ইবনে আবী নাফে এবং বুহরা

ইবনে আমর। এই ইহুদীরা এক আনসার সাহাবীর বাড়ীতে যাওয়া আসা করতো এবং বলতো, তুমি তোমার সম্পত্তি ব্যয় কোরো না। আমাদের আশংকা— এরকম করলে তুমি দরিদ্র হয়ে যাবে। তখন তোমাকে কেউ দেখবে না। এই বর্ণনাটি ইবনে ইসহাক এবং ইবনে জারীর বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই আয়াতে কৃপণতা বলতে অর্থ ব্যয়ে কৃপণতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের বলেন, এখানে কার্পণ্য অর্থ এলেম গোপন করা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতিয়া আওফীর মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এ আয়াতে ওই সকল লোকের কথা বলা হয়েছে যারা তওরাতে লিপিবদ্ধ রসুলপাক স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী গোপন করতো এবং অন্যকে গোপন রাখার পরামর্শ দিতো। এই জ্ঞানকে গোপন করার চেয়ে অধিক বখিলি (কৃপণতা) আর কী হতে পারে? এই বর্ণনাটি দুর্বল। কারণ, আতিয়া আওফী দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত।

আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন (বৈভব অথবা জ্ঞান) তা গোপন করার ফলে তারা অকৃতজ্ঞ হয়েছে। এই অকৃতজ্ঞতা অস্বীকৃতিতুল্য। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন না। আর তার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে চরম লাঞ্ছনা। অপমানজনক শাস্তি। তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অপমান করেছে বলেই তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এই অপমানকর আযাব।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি নৈকট্য লাভ করবে আল্লাহ্র, জান্নাতের এবং মানুষের। জাহান্নাম তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। বখিল দূরে থাকবে আল্লাহ্র, বেহেশতের এবং মানুষের। সে হবে দোজখের নিকটবর্তী। আর কৃপণ আবেদ অপেক্ষা মূর্খ দাতা আল্লাহ্তায়ালার নিকট অধিকতর প্রিয়। তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর মারফু বর্ণনায় এসেছে, ইমানদারদের মধ্যে কৃপণতা ও চরিত্রহীনতা—এই মন্দ স্বভাব দু'টো কখনো একত্রিত হবে না। তিরমিজি।

হজরত আবু বকর বলেছেন, প্রতারক, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, কৃপণ এবং দানের পর খোঁটা দানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তিরমিজি।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৮

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا ○

❒ এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না; এবং শয়তান কাহারও সংগী হইলে সে সংগী কত মন্দ!

লোক দেখানো দান দূষণীয়। লোক দেখানোর প্রবৃত্তিকে বলা হয় রিয়া। রিয়াকারীর দানের উদ্দেশ্য থাকে 'দানবীর' সুখ্যাতি লাভ করা। অথচ আল্লাহ্‌র সন্তোষ সাধনই হওয়া উচিত ছিলো একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ তিনিই জীবন, সম্পদ ও দান করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কৃপণকে যেমন আল্লাহ্ ভালোবাসেন না তেমনি ভালোবাসেন না রিয়াকার দানকারীকেও। কার্পণ্য, বাহুল্য ব্যয়, লোক দেখানো ব্যয়—এ সব আল্লাহর নিতান্ত অপছন্দনীয়। এ সকল অপকর্মের জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর লোক দেখানো ব্যয় এক ধরনের শিরিক— গোপন শিরিক (শিরকে খফি)। লোক দেখানো প্রবৃত্তি অবিশ্বাসপ্রসূত বলেই এখানে বলা হয়েছে, 'এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না।'

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, আমি শিরিক থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী (আমার শরীক ধারণা করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন)। শিরিকমিশ্রিত আমলকে আমি বাতিল করবো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, শিরিকমিশ্রিত আমলের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তার আমল হবে তার জন্যই যার জন্য সে আমল করেছে। মুসলিম।

হজরত মুআজের মারফু বর্ণনায় এসেছে, যৎসামান্য রিয়াও শিরিক। ইমাম সুদ্দী বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মক্কার মুশরিক যারা রসুল স. এর প্রতি শত্রুতার্থে অর্থ ব্যয় করতো, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

শয়তান অত্যন্ত মন্দ সঙ্গী। যে তার বন্ধুত্বকে প্রশ্রয় দিয়েছে সে জঘন্য কাজ করেছে। শেষ বাক্যের মাধ্যমে শয়তানের সাথে হৃদ্যতা স্থাপন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে শয়তানানুগত্য। ইঙ্গিতার্থ এই যে, বখিলি, রিয়া ও অন্যান্য অপকর্ম শয়তানের নৈকট্য ও সংসর্গের কারণেই হয়ে থাকে। সুতরাং শয়তানের সঙ্গী হয়ে দোজখযাত্রা সম্পর্কে সাবধান।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৯

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ○

❐ তাহারা আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিলে তাহাদের কী ক্ষতি হইত? আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালভাবে জানেন।

যারা আল্লাহ্‌কে এবং কিয়ামত দিবসকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য ক্ষতিকর বলে কিছু নেই। তারা কৃতজ্ঞ ও অনুগত বলেই আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত নয়। দান কখনো আর্থিক ক্ষতি নয়। কখনোই নয়।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই বিশ্বাসীদের জীবনের ব্রত। দানের বিনিময় হিসেবে রয়েছে দশ থেকে সাত'শ গুণ পুণ্যপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি। আর আবশ্যিক দান তো নিতান্তই লঘু। জমানো সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত, পশুর জাকাত— এ সমস্ত তো বৎসরে একবার মাত্র ওয়াজিব হয়। জাকাতকে তো ক্ষতি বলে ভাবাই যায় না। বরং আল্লাহ্‌তায়ালা দয়া করে দানের হুকুমের মাধ্যমে আমাদেরকে পুণ্য লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি ভালো করেই জানেন, কারা এই সুযোগ গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী হবে আর কারা হবে না। শেষ কথাটি মূলতঃ কাফেরদের প্রতি হুঁশিয়ারী। বলা হয়েছে, তিনি তাদেরকে ভালোভাবে জানেন– তাই শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় তাদের নেই।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪০

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ○

❐ আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হইলেও আল্লাহ্ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

অণু পরিমাণ বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিছকাল' শব্দটি। মিছকাল শব্দ এসেছে 'ছাকলুন' শব্দ থেকে। এর অর্থ ক্ষুদ্র পিপিলীকা অথবা পরিষ্কার রৌদ্রে রাখা ধানের উড়ন্ত ধূলিকণা যার কোনো ওজন হয় না, যা বিন্দু (জাররা) বৎ। এরকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জুলুম করা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। তাই কাফেরদের জন্য যে আযাব প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জুলুম নয়। বরং তাদেরকে শাস্তিদানই প্রকৃত ইনসাফ (ন্যায়বিচার)। তাদেরকে শাস্তি না দেয়াই বরং জুলুম। কেননা তারা আল্লাহ্‌তায়ালার এককত্ব ও ইবাদত বিমুখ হয়েছিলো। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর অধিকার পূরণে ছিলো উদাসীন। সুতরাং, তাদেরকে আযাব না দেয়া ন্যায়ানুগতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আযাব হচ্ছে কাফেরদের অধিকার। আর জুলুম হচ্ছে অধিকার বিনষ্ট করার নাম। আল্লাহ্ কখনো জুলুম করেন না। বিন্দুপরিমাণও না। আর জুলুম করেন না বলেই তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। জুলুমের আর এক অর্থ হচ্ছে, কোনো বস্তুকে যথাস্থান থেকে অপসারণ করে অযথার্থ স্থানে স্থাপন করা। অনর্থক নাজায়েয কাজ করা। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোনো কাজই অযথার্থ ও অবৈধ নয়। তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রভু। অন্যায় ছাড়াও যদি তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে আযাব দেন, তবু তা জুলুম হবে না। অতএব, আল্লাহ্‌তায়ালার শানে কোনো কাজই জুলুম হবে না। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাঁর কোনো

কাজ জুলুম। বরং উদ্দেশ্য এই যে, অন্যের কাজ জুলুম হতে পারে—কিন্তু আল্লাহ্‌র কাজ জুলুম হওয়া সম্ভবই নয়। মূল কথা এই যে, আল্লাহ্‌পাক কারো ইবাদতের সওয়াব কম করবেন না, গোনাহের শাস্তিও বেশী দিবেন না। হজরত আনাস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের পুণ্যের বিনিময় কম করা হবে না। পৃথিবীতে তাদের রিজিক বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং আখেরাতে দেয়া হবে উত্তম বিনিময়। অবিশ্বাসীরা তাদের সৎ কর্মের জন্য পৃথিবীতে পাবে রিজিক। কিন্তু আখেরাতে কিছুই পাবে না। আহমদ, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, মুমিন যখন দোজখ থেকে পরিত্রাণ পাবে, তখন দোজখে প্রবিষ্ট তার অন্য ভাইদের জন্য তুমুল ঝগড়া শুরু করবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে। ওরকম বাদানুবাদ তোমরাও কখনো নিজেদের হকের ব্যাপারে করো না। মুমিন বলবে, তারা আমাদের ভাই। তারা আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়েছে, রোজা রেখেছে, হজ করেছে। আল্লাহ বলবেন, যাও, যাকে চিনতে পারো দোজখ থেকে বের করে নিয়ে এসো। মুমিন তখন মুখাবয়ব দেখে তার ভাইদের চিনে নেবে। কারণ মুখমণ্ডল অগ্নিদগ্ধ হবে না। তাদের কারো পা অর্ধেক, কারো টাখনু পর্যন্ত আগুনে ঝলসানো থাকবে। সে তার ভাইদেরকে আগুন থেকে বের করে নিয়ে আসবে এবং বলবে, হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি যাদের বের করে আনতে বলেছো তাদেরকে বের করে এনেছি। আল্লাহ্‌ বলবেন, আবার যাও এবং যাদের অন্তরে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পরিমাণ ইমান আছে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। (মুমিন হুকুম তামিল করবে)। এমন কি এরকম হুকুমও হবে যে, যাদের অন্তরে কণা পরিমাণ ইমান আছে তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। মুমিন হুকুম তামিল করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এই বক্তব্যের প্রতি যে দ্বিধান্বিত সে যেনো ওই আয়াতটি পড়ে, যেখানে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ জুলুম করবেন না। কেউ যদি একটি পুণ্য করে তবে আল্লাহ্‌ সেটিকে দ্বিগুণ করে দেন। তদুপরি তিনি নিজের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার দান করেন।' মুমিন আরজ করবে, আল্লাহ! তুমি যাদেরকে বের করে আনতে নির্দেশ দিয়েছো, তাদেরকে বের করে এনেছি। এখন দোজখে এমন আর কেউই নেই যাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে। আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতারা সুপারিশ করেছে। মুমিনরাও সুপারিশ করেছে। এখন বাকী রয়েছেন রহমানুর রহিম। রসুল স. বলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ দোজখ থেকে এক মুষ্টি ভরে অথবা দুই মুষ্টি ভরে এমন লোকদের বের করে আনবেন যারা কোনোদিন কোনো পুণ্যকর্ম করেনি এবং যারা জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিলো। তাদেরকে এনে তাদের উপর আল্লাহ্‌পাক ঢেলে দিবেন আবে হায়াত (চিরস্থায়ী জীবনদানকারী পানি)। সেই সলিলে স্নাত হওয়ার পর তাদের অবস্থা হবে এমন— যেনো বৃষ্টির পানিতে ধোয়া শস্যদানা। মোতির মতো চকমক করতে থাকবে তাদের অবয়ব। তাদের স্কন্ধে অংকিত থাকবে 'আল্লাহর মুক্তিকৃত।' (অর্থাৎ তাদের নিজেদের কোনো পুণ্যকর্ম নেই)। তাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ করো। যা চাও তাই পাবে। যে বস্তুর প্রতি

দৃষ্টিপাত করবে তাই পাবে। তারা আরজ করবে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন কিছু দিন যা পৃথিবীর কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন, এর চেয়ে বড় নেয়ামত আমার কাছে রয়েছে। তারা বলবে, কী সেই নেয়ামত। আল্লাহ বলবেন, আমার সন্তুষ্টি। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। বোখারী ও মুসলিমের সনদ থেকে এই বর্ণনাটি করেছেন বাগবী। হজরত আবু সাঈদের বর্ণনায় একথা নেই যে, এই বক্তব্যের প্রতি যারা দ্বিধান্বিত তারা যেনো এই আয়াতটি পড়ে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, (কিয়ামতের দিন) আমার উম্মতের একজনকে আল্লাহ্তায়ালা সকল মানুষের সামনে উপস্থিত করবেন। তার গোনাহের আমলনামার দপ্তর হবে নিরানব্বইটি। প্রতিটি দপ্তর হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত লম্বা। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি এই লিখিত কোনো কিছুকে অস্বীকার করো? এরকম মনে করো কি যে আমার লেখকদ্বয় (আমল লেখক ফেরেশতা) তোমার অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে? অথবা তোমার এমন কোনো পুণ্য যা লিপিবদ্ধ হয়নি। বান্দা হতবাক হয়ে যাবে। এরপর জবাব দিবে, না। আল্লাহপাক্ বলবেন, আমার কাছে তোমার কেবল একটি পুণ্য জমা আছে। আজ তোমার উপর জুলুম করা হবে না। এরপর ছোট্ট একটুকরা কাগজ বের করা হবে যাতে লেখা থাকবে— 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু। আল্লাহ্পাক বলবেন, ওজনের সময় লক্ষ্য রেখো। বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু এই ছোট্ট কাগজ বিশাল দপ্তরগুলোর তুলনায় যে কিছুই নয়। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার অধিকার নষ্ট করা হবে না। এরপর গোনাহের দপ্তরগুলো মিজানের এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় রাখা হবে ছোট্ট কাগজটি। ছোট্ট কাগজটির পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে। রসুল স. বলেন, আল্লাহ্র নামের সামনে সমস্ত কিছুই ওজনহীন। ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম। হাকেম এই হাদিসকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেন, আয়াতটির উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্তায়ালা কারো অধিকার অবশিষ্ট রাখবেন না। ক্ষুদ্রাতিতমক্ষুদ্র পাপ ও পুণ্যের প্রতিফল দান করবেন। কিন্তু কিছু গোনাহ তিনি বাদ দিয়ে দিবেন (এটা তাঁর অনুগ্রহ)।

অণুপরিমাণ পুণ্যকর্মকেও তিনি দ্বিগুণ করেন—একথার অর্থ অনেক গুণ করেন যার সীমানা উল্লেখ করা হয়নি।

হজরত আবু হোরায়রা কসম খেয়ে বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি—এ কথা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ একটি পুণ্যকে হাজার হাজার পুণ্যে পরিণত করে দিবেন। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বা।

তদুপরি তিনি মহাপুরস্কার প্রদান করবেন—আয়াতের শেষাংশে এরকম ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 'আজরান আজিমা' অর্থ অপরিমেয় মহাপুরস্কার। সেই মহাপুরস্কারের পরিমাণ নির্ণয় করে এরকম সাধ্য কারো নেই।

বাগবী হজরত আবু হোরায়রার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, স্বয়ং আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। কেউ এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কিয়ামতের সময় আল্লাহ্তায়ালা পূর্বাপর সকলকে একত্র করবেন। একজন আহ্বায়ক তখন ডেকে বলবে, সাবধান! সাবধান! সবাই এবার অধিকার প্রাপ্তির জন্য এগিয়ে আসছে। এ ঘোষণা শুনে মানুষ খুশী হবে। পিতা, সন্তান, ভাই—প্রত্যেকে তাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে পেয়ে যাবে। সে অধিকার যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেনো। আত্মীয়তার অধিকার সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকবে না।' তখন প্রতিটি ব্যক্তিকে ডাকা হবে। বলা হবে, সে যেনো তার অধিকার আদায় করে নেয়। দাবীদার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এখন তো তারা পৃথিবীবাসী নয়— এখন আমাদের হক তারা আদায় করবে কিভাবে? আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে হুকুম করবেন, হক বিনষ্টকারীদের আমলনামা থেকে দাবীদারদের হক পরিশোধ করে দাও। এভাবে হক আদায় করতে গিয়ে কারো কারো বিন্দু পরিমাণ পুণ্য অবশিষ্ট থেকে যাবে। ফেরেশতারা বলবেন, হে আমাদের প্রভু! এই ব্যক্তির বিন্দু পরিমাণ পুণ্য অবশিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, আমার বান্দারা কিছু গোনাহ্ তো করবেই। আমি আমার রহমতে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো। এই আয়াতটিই এই অবস্থার প্রমাণ। যারা নিতান্ত হতভাগা তাদের সম্পর্কে ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের উপাস্য—হকদারদের হক পরিশোধ করতে গিয়ে এই লোকের সকল পুণ্য শেষ। অথচ এখনো অনেক হকদার রয়েছে। আল্লাহ্ বলবেন, দাবীদারদের গোনাহ্ ওর আমলনামায় সংস্থাপন করো। তাই করা হবে। তখন তার জন্য জারী হবে দোজখের পরওয়ানা (অথবা হুকুম হবে, তাকে প্রহার করতে করতে দোজখে নিয়ে যাও)। বাগবী, ইবনে মোবারক, আবু নাঈম, ইবনে আবী হাতেম।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪১

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

❒ যখন প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব তখন কী অবস্থা হইবে?

তখন কাফেরদের কি অবস্থা হবে তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কারণ এ কথা তো স্পষ্টতঃই জানা গেলো যে, আল্লাহ্ কারো প্রতি জুলুম করেন না। করবেন না। অত্যাচারী ব্যক্তির হক তিনি অত্যাচারীর নিকট থেকে আদায় করে দেবেন। তখন কেমন অবস্থা হবে কাফেরদের? তারা তো আল্লাহ্র হক আদায় করেইনি। বান্দার হকও বিনষ্ট করেছে।

এরশাদ হয়েছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্তায়ালা পূর্ববর্তী নবীগণকে তাঁদের উম্মতের বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে হাজির করবেন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ উম্মতের ভালো মন্দ, সত্য-মিথ্যার সাক্ষ্য পেশ করবেন। এরপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম। তিনি ইসলামী উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য পেশ করবেন। যারা তাঁকে দেখেছে আর যারা দেখেনি সকলের সম্বন্ধেই তিনি সাক্ষ্যদান করবেন।

ইবনুল মোবারক হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এরকম—প্রতিদিন সকালে ও বিকালে রসুল স. এর সম্মুখে তাঁর উম্মতকে হাজির করা হবে। তিনি বিশেষ বিশেষ আলামত ও আমল দেখে তাদেরকে আপন উম্মত বলে চিনতে পারবেন। তাই তিনি সহজেই তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবেন।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেছেন, রসুল স. আমাকে বললেন, কোরআনের কিছু অংশ আমাকে পাঠ করে শোনাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আপনার প্রতি আর আমি আপনার সম্মুখে পাঠ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পাঠ করো। হুকুম মোতাবেক আমি এই আয়াতটি পাঠ করলাম। তিনি শুনলেন। তারপর বললেন, থামো। আমি দেখলাম, তাঁর পবিত্র চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু নির্গত হচ্ছে।

অনেকে বলেছেন, এই আয়াতের 'হা উলায়ি' শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে অন্যান্য নবী ও রসুলগণকে। তাঁরা তাঁদের উম্মতদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। আর রসুল স. হবেন সকল নবী রসুলগণের সাক্ষী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'হা উলায়ি' বলতে বুঝানো হয়েছে এই উম্মতের মুমিনদেরকে। এই উম্মতের মুমিনেরা নবীদের মতো সাক্ষ্য দান করবেন। তাঁরা সত্য সাক্ষ্য পেশ করবেন। আর তাঁদের (মুমিনদের) সততার সাক্ষ্য দেবেন স্বয়ং রসুল স.।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪২

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَ
لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ○

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং রসূলের অবাধ্য হইয়াছে তাহারা সেদিন কামনা করিবে যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত! এবং তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।

কিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থা হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের (কাফেরদের) এবং রসুল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের। ভয়ে, আক্ষেপে, লজ্জায় তারা এরকম কামনা করবে, হায় এই মুহূর্তে যদি মাটি ফেটে যেতো আর আমরা মৃত্তিকাভ্যন্তরে আত্মগোপন করতে পারতাম। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত কাতাদা এবং হজরত আবু ওবাদা। কালাবী লিখেছেন, কিয়ামতের দিন বন্য এবং গৃহপালিত সকল চতুষ্পদ জন্তু ও পাখিকে আল্লাহ্পাক মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। ওই সময় কাফেরেরাও চাইবে, হায় তারা যদি আজ পশুপাখিদের মতো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারতো।

কিন্তু তাদের কামনা হবে নিষ্ফল। আত্মগোপন করার কোনো সুযোগই তারা পাবে না। আতা বলেছেন, তাদের কামনা হবে এই যে, যদি আজ তারা মাটিতে মিশে যেতে পারতো। আর রসুল স. এর যে বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ ছিলো তওরাতে সেগুলো যদি গোপন না করতো। জমহুরের মতে, অর্থ হবে এরকম—তারা তাদের কোনো কথা আল্লাহ্‌র কাছে গোপন করতে পারবে না। কারণ, তাদের হাত পা তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করবে।

হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট আরজ করলো, কোরআনের কতিপয় আয়াত সম্পর্কে আমার সংশয় রয়েছে। মনে হয় আয়াতগুলো পরস্পরবিরোধী। তিনি বললেন, বলো সেগুলো কী কী? ওই ব্যক্তি বললো, যেমন বলা হয়েছে— 'ওই দিন কেউ কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'সম্মুখীন হয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নজনের নিকট প্রশ্ন করতে থাকবে।' আবার এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'ওয়ালা ইয়াকতুমুনাল্লাহা হাদিসা' (আল্লাহ্ থেকে কোনো কথাই গোপন রাখতে পারবে না)। আর এক স্থানে বলা হয়েছে, তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না।' এ কথায় কাফেরেরা তাদের উদ্দেশ্যকে গোপন রাখার চেষ্টা করবে বলা হয়েছে। (এগুলো পরস্পরবিরোধী নয় কি?) হজরত ইবনে আব্বাস বললেন (প্রকৃতপক্ষে আয়াতগুলো পরস্পরবিরোধী নয়। ব্যাপারটা এ রকম) যখন মুশরিক ও কাফেরেরা দেখবে মুসলমানদেরকে ক্ষমা করা হচ্ছে আর মুশরিকদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হচ্ছে না, তখনই তারা ক্ষমা পাবার ইচ্ছায় বলবে 'আল্লাহ্‌র কসম আমরা মুশরিক ছিলাম না।' আল্লাহ্ তখন তাদের মুখ মোহরাঙ্কিত করে দিবেন। তারা বাকরুদ্ধ হবে। তাদের হাত, পা ও অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সে সময় তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকবে। এভাবে তাদের অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাদের গোপন করার অভিলাষ চরিতার্থ হবে না। তাই বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ্ থেকে কোনো কথাই গোপন রাখতে পারবে না।' (সুতরাং পরস্পরবিরুদ্ধতার অবকাশ এখানে কোথায়)? ওই ব্যক্তি আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলো। বললো, এক আয়াতে আগে আকাশ এবং পরে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তোমরা কি এমন আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করছো যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।' এখানে বুঝা যাচ্ছে, পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে আকাশেরও আগে। জবাবে হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহ্ দুই দিনে জমিন সৃষ্টি করেছেন, তারপর দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন আসমান। আবার দুই দিনে বিন্যস্ত করেছেন জমিনকে। আয়াতগুলোর সম্মিলিত অর্থ এরকমই (তাই সংশয়ের অবকাশ কোথায়)। ওই ব্যক্তি আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে বললো, একস্থানে বলা হয়েছে 'কানাল্লহু গফুরার রহিমা'—এখানে 'কানা' শব্দটি সংযোগ করায় অর্থ হয়েছে এরকম, 'আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ছিলেন।' এ কথায় বুঝা যায়, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু ছিলেন। তার মানে এখন আর ক্ষমাশীল

ও পরম দয়ালু নন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এখানে 'কানা' অতীতকাল বোধক নয়, অবশ্যই নয়। তাঁর ক্ষমাশীলতা ও দয়ার্দ্রতার চিরন্তন অবস্থাই (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত) এখানে প্রকাশিত হয়েছে। শেষে তিনি বললেন, কোরআন মজীদে সংশয় থাকা অনুচিত। কারণ, সমস্ত কিছুই অবতীর্ণ হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। বোখারী।

প্রকাশ্যতঃ বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে হাসান বলেছেন—এ সকল আয়াতে বিভিন্ন সময় ও স্থানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন একস্থানে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'অনুচ্চ আওয়াজ ব্যতীত তারা কিছু শুনবে না।' দ্বিতীয়স্থানে তারা মিথ্যা কথা বলবে। বলবে, 'আমরা মুশরিক ছিলাম না।' আরেক জায়গায় বলবে, 'আমরা মন্দ আমল করিনি।' আর একস্থানে বলা হয়েছে, 'তারা নিশ্চুপ থাকবে।' অন্য আর এক স্থানের অবস্থা এরকম যে, তারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ ব্যক্ত করবে। সবশেষে তাদেরকে করা হবে বাকরুদ্ধ। তখন তাদের হাত পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাই বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ থেকে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৩

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

❐ হে বিশ্বাসীগণ! মদ্য-পানোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইওনা, যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার, এবং যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির চেষ্টা করিবে এবং উহা মুখ ও হাতে বুলাইবে। আল্লাহ্ পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল।

হজরত আলীর বক্তব্য আবু দাউদ, হাকেম এবং তিরমিজি উল্লেখ করেছেন এরকম—আবদুর রহমান ইবনে আউফ আমাদের জন্য আহার্য প্রস্তুত করে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করলেন। খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে আমরা শরাবও পান করলাম। তখন অবশ্য মদ্যপান হারাম ছিলো না। আমরা নেশাচ্ছন্ন হলাম। নামাজের সময় হলো। সকলে আমাকে সামনে ঠেলে দিলেন (ইমাম বানালেন)। আমি পড়তে শুরু করলাম কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন— আ'বুদু মা তা'বুদুন', 'লা' আ'বুদু মা তা'বুদুন' পড়ার কথা। কিন্তু আমি 'লা' শব্দটি বাদ দিয়েই পড়লাম। তখন এই আয়াত নাজিল হলো। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি হাসান। বলা হলো, 'তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটে যেয়ো না। তোমরা যা পাঠ করো তার মর্ম সম্যক উপলব্ধ না হলে নামাজে দাঁড়িও না। এতে করে বুঝা যায়, নেশার প্রভাব প্রবল হলে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। স্বাভাবিকতার কাছাকাছি অল্প নেশা অবস্থায় নিষিদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ যারা নেশায় বেহুঁশ তাদেরকে সম্বোধন করা নিরর্থক। অথচ আল্লাহ্ তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'মদ্যপানোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।'—এরকম সম্বোধনের কারণ কী?

উত্তরঃ সম্বোধন করা হয়েছে স্বাভাবিক সময়ে। যখন তারা স্বাভাবিক ছিলেন, তখনই তাদের অস্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখ করে তাদের প্রতি পানোম্মত্ত অবস্থার কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, (নামাজ তো ফরজ এবং নামাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে তাই) নামাজের সময় তোমরা নেশার নিকটে যেয়ো না। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ নামাজের সময় শরাব পান থেকে বিরত থাকতেন (অন্য সময় পান করতেন)। পরবর্তী সময়ে শরাব পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

জুহাক বিন মাজাহিম বলেছেন, এখানে নেশা বলতে ঘুমের নেশাকে বুঝানো হয়েছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অথবা নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নামাজ পড়তে বারণ করা হয়েছে। হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ঘুম পেলে ঘুমিয়ে নিও। কারণ, ঘুমের ঘোরে নামাজ পাঠকালে হয়তো এরকম অবস্থা হবে যে, তুমি ক্ষমাপ্রার্থনা করতে যেয়ে নিজেকে গালি দিচ্ছো। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। এই আয়াতে প্রকৃতপক্ষে এই কথাটির গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে যে, নামাজ পড়তে হবে হুজুরী কলবের (একাগ্রচিত্ততার) সঙ্গে। অর্থাৎ— এমনভাবে যেনো কোরআন পাঠ করা হয়, যাতে আয়াতের অর্থ উপলব্ধিতে জাগ্রত থাকে এবং অন্যমনস্কতা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

হজরত আসলাহ বলেন, আমি রসুল স. এর খেদমত করতাম। তাঁর জন্য উটের আসন প্রস্তুত করে রাখতাম। একদিন রসুল স. আমাকে বললেন, আসলাহ। উটের আসন প্রস্তুত করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি এখন জুনুব (অপবিত্র)। আমি গোসল করতে পারিনি এজন্যে যে, এই শীতে গোসল করলে আমি হয় মারা পড়বো অথবা নির্ঘাত কঠিন অসুখে পড়বো। এরপর

হজরত জিবরাইল তায়াম্মুমের আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। রসুল স. আমাকে তায়াম্মুমের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। একবার মাটিতে হস্ত স্থাপন করে মুখমণ্ডল মুছলেন এবং পরের বার পুনরায় মাটিতে হাত রেখে উভয় হাত কুনুই পর্যন্ত মুছে ফেললেন। আমিও এভাবে তায়াম্মুম করলাম। তারপর উটের উপরে আসন বিছিয়ে দিলাম। তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া ফারইয়ানী, ইবনে মুনজির। হজরত আলী থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ওই সকল মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে যাঁরা সফর অবস্থায় জুনুব হয়েছিলেন। তখন তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাঁদেরকে।

তায়াম্মুম সম্পর্কিত প্রথম নির্দেশটি উল্লেখিত হয়েছে সুরা মায়িদায়। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে আমরা এ বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করবো। গোসল ফরজ হয়েছে— এমন ব্যক্তি ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে যদি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার অথবা কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে ব্যক্তির উপর তায়াম্মুমের নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

'জানাবাতের অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না'—আয়াতে এরকম নির্দেশও জারী করা হয়েছে। (অপবিত্র অবস্থায় গোসল না করলেও মসজিদের ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে)। জুনুব বলে ওই ব্যক্তিকে যার জানাবাত অর্থাৎ গোসল ফরজ হয়েছে। এরকমাবস্থায় স্ত্রী পুরুষের হুকুম একই। কামুস অভিধানে লেখা হয়েছে, জানাবাত অর্থ বীর্য। হানাফিদের অভিধানসম্মত বক্তব্য এই যে, জানাবাত অর্থ কামোত্তেজনাজাত বীর্যস্খলন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বীর্যপাত হোক বা না হোক স্ত্রীসহবাস করলেই গোসল ফরজ হবে। হাফেজ ইবনে হাজার ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন, জানাবাতের প্রকৃত অর্থ সহবাস। বীর্যপাত ঘটুক অথবা না ঘটুক। জানাবাতের আসল আভিধানিক অর্থ হলো দূর হওয়া। তাই যারা জুনুব তারা অপবিত্র হওয়ার কারণে পবিত্র মানুষদের থেকে দূরবর্তী। দাউদ জাহেরী বলেছেন, জানাবাতের অর্থ বীর্য নির্গত হওয়া। তাই তাঁর মতে সহবাস করলেও গোসল ফরজ হবে না, যতোক্ষণ না বীর্যস্খলন ঘটে। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে হজরত উবাই ইবনে কাব বর্ণিত হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হজরত উবাই বিন কাব আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল স.! ওই ব্যক্তির উপর কী হুকুম যে বীর্যপাত ব্যতিরেকে স্ত্রীসহবাস করেছে? রসুল পাক স. বললেন, যতোটুকু অংশ স্ত্রী অংগ স্পর্শ করেছে তা ধুয়ে নিও (অর্থাৎ সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গের যতোটুকু ব্যবহৃত হয়েছে তা ধুয়ে ফেলো) তারপর ওজু করে নামাজ পড়ে নিও। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. একজন আনসারকে ডাকলেন। অতিদ্রুত তিনি রসুল স. এর সামনে হাজির হলেন। তার মাথা থেকে পানি পড়ছিলো। রসুলপাক স. বললেন, সম্ভবতঃ আমি তোমাকে বিব্রত করেছি। আনসারী বললেন, জি হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, যদি তোমাকে দ্রুত কিছু করতে হয় (অর্থাৎ বীর্যপাতের আগেই যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রয়োজনের কারণে পৃথক হয়ে

যেতে হয়) অথবা (লজ্জাস্থান) শুকিয়ে যায় তবে তোমার জন্য ওজুই যথেষ্ট (গোসল ফরজ নয়)। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমে এর সঙ্গে অতিরিক্ত যে কথাটুকু রয়েছে তা হচ্ছে, রসুল স. বলেন, পানি (অর্থাৎ গোসল) শুধু পানির (বীর্যপাতের) কারণে হয়।

মাসআলাঃ চার ইমাম ও সাধারণ জমহুর আহলে ইসলাম একথায় একমত হয়েছেন যে, সহবাস করলেই গোসল ফরজ হবে, বীর্যপাত হোক অথবা না হোক। জানাবাতের অর্থ যদি সহবাস ধরা হয়, তবে (যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেন) এই আয়াত দ্বারা কেবল সহবাসের গোসল ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। আর জানাবাতের অর্থ যদি বীর্যস্খলনসহ সহবাস ধরা হয় তবে প্রতিটি সহবাসই এই অর্থের আওতায় পড়বে। সে সহবাস হাকিকাতান (প্রকৃত) হোক অথবা হুকুমী। হুকুমীর উদ্দেশ্য এই যে, বীর্যস্খলন না হলেও সহবাসতো বীর্যস্খলনেরই কারণ। তাই কখনো কখনো এরকম হতে পারে যে, বীর্যপাত হয়েছে তবে তা স্পষ্ট অনুভূতিতে আসেনি। তাই, সহবাসকে বীর্যপাতসহ সহবাসই ধরতে হবে। যেমন, নিদ্রাচ্ছন্ন হলে ওজু ভংগ হবে বলা হয়েছে— যদিও শুধু ঘুমের কারণে ওজু ভংগ হয় না। কিন্তু ঘুম এমন অচেতন অবস্থা যে, ঘুমন্ত অবস্থায় বায়ু নির্গত হলেও তা জানার উপায় থাকে না। তাই ধরে নেয়া হয়, হয়তো ওই অবস্থায় বায়ু নির্গত হয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে অবস্থাটা হবে হুকমী এবং হুকমী অবস্থানুযায়ী নিদ্রাচ্ছন্ন হলেই ওজু ভংগ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

রসুল স. বলেছেন, শায়িত অবস্থায় চোখ বন্ধ হয়ে গেলে শারীরিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। হজরত আলী বর্ণিত কয়েকটি হাদিস এবং এজমা দ্বারা দারা কুতনী প্রমাণ করেছেন যে, শুধু সহবাস দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হয়। হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুল স. বলেছেন, যখন পুরুষ স্ত্রীর চারটি শাখায় উপগত হয় এবং তাকে রমণমুখর করে তোলে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। বোখারী, মুসলিম। হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, যখন পুরুষ চারটি শাখায় বসে যায় এবং লজ্জাস্থানদ্বয় একত্রিত হয় তখনই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি রসুল স. এর সঙ্গে এরকম করেছি। অতঃপর দু'জনেই গোসল করেছি। দাউদ জাহেরী যে দলিল সমূহকে গ্রহণ করেছেন, সেগুলো রহিত হয়ে গিয়েছে। ইমাম আহমদ এবং সুনান গ্রন্থের লেখকগণ হজরত সহল বিন সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই বিন কাব বর্ণনা করেন, আনসারীগণ বলতেন, 'ইন্নামাল মাউ মিনাল মায়ে' (তাই বীর্যপাতহীন সহবাসের পর ওজু করে নেয়াই যথেষ্ট)। এই অনুমতি ছিলো ইসলামের শুরুতে। পরে আমাদেরকে গোসল করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে হাব্বান। ইসমাইল বলেছেন, এই হাদিসটি বোখারীর শর্তানুসারে বিশুদ্ধ। ইবনে হারুন এবং দারা কুতনী বলেছেন— জুহুরী এই হাদিসটি হজরত সহল বিন সাদ থেকে সরাসরি শোনেননি (মাঝখানে রয়েছে আরও কয়েকজন বর্ণনাকারী)। ইবনে হাজার লিখেছেন, আবু দাউদের সনদে

রয়েছে 'ইনকেতা' (যে হাদিসের সনদে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে)। আমর বিন হরবের বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে শিহাব (জুহুরী) বলেছেন আমার নিকট এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যে আমার নিকট খুব পছন্দনীয়। ওই পছন্দনীয় ব্যক্তিটি হজরত সহলের বক্তব্য আমাকে শুনিয়েছেন। (জুহুরী ওই ব্যক্তির নামোল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ওই ব্যক্তি ছিলেন সিকাহ্) তাঁর মাধ্যমেই হজরত সহল সূত্রে হজরত উবাই বিন কাবের বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। এই আলোচনাটির সামঞ্জস্যহীনতা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, আবু দাউদের সনদ সহীহ্। সিকাহ্ (ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন বর্ণনাকারী) যদি বলেন তিনি কোনো বর্ণনাকারীকে পছন্দ করেন তবে তার বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ কথা দ্বারা বিষয়টি মেনে নেয়া অপরিহার্য নয় যে, ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজা'র সনদ মুনকাতে। জুহুরী কোনো একজন সিকাহ্ থেকে হজরত সহলের বক্তব্য শুনেছেন আবার তাঁর নিকট থেকে সরাসরিও শুনেছেন।

মাসআলাঃ ওলামাদের ঐকমত্য এই যে, মনিস্খলন অথবা বীর্যপাত উভয় অবস্থায় গোসল ওয়াজিব। কিন্তু ইমামে আজম, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে স্খলন হতে হবে দ্রুতবেগে। ইমাম ইউসুফের মতে দ্রুতবেগে হতেই হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেবল মনি নির্গত হওয়াই গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ। এই নির্গত হওয়া কামাস্বাদনের সঙ্গে হতে পারে অথবা কামাস্বাদন ব্যতিরেকেও হতে পারে। ধীরেও হতে পারে। দ্রুতবেগেও হতে পারে। কেননা, রসুল স. এর নিকট মজি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, এতে করে ওজু ভেঙে যায় এবং মনি স্খলিত হলে গোসল ওয়াজিব হয়। (উত্তেজিত হলে যে তরল পদার্থ ধীরে ধীরে বের হতে থাকে তাকে বলে মজি। আর প্রবল বেগে যে স্খলন হয় তাকে বলে মনি)। তাহাবী।

একটি সন্দেহঃ প্রথমেই হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'বীর্যপাতহীন সহবাসের পর ওজু করে নেয়াই যথেষ্ট।' এ হাদিসে দ্রুত বেগে অথবা কামোদ্দীপনার সঙ্গে এরকম কোনো শর্ত নেই। পরের হাদিসে হজরত উম্মে সালমার বর্ণনায় এসেছে, উম্মে সুলাইম রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল ফরজ হবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। যদি (জাগ্রত হওয়ার পর) পানি দেখে। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসে পানি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ অর্থে। এখানে দ্রুত বেগে অথবা কামাস্বাদনের সঙ্গে— এরকম নির্দিষ্ট কোনো কথা নেই।

জবাবঃ দু'টি হাদিসের মধ্যে 'আল মাউ' শব্দটিতে লামে আহদি হয়েছে (এমন আলিফ ও লাম যার মাধ্যমে শর্ত বলবৎ করা হয়)। আর এই শর্তটিই হলো ওই পানি যা দ্রুতবেগে এবং কামোত্তেজনার সঙ্গে বের হয়। ইমাম শাফেয়ী আলিফ লাম কে জিনসি অর্থাৎ জাতিগত বলেছেন। তাঁর বক্তব্যটি অধিক শক্তিশালী।

মাসআলাঃ ঘুম থেকে জেগে যদি তরল পানি নজরে আসে তবে স্বপ্নদোষ হোক অথবা না হোক, এই পানি মজি হোক অথবা বীর্য হোক— এমতাবস্থায় গোসল ওয়াজিব হবে। নিদ্রা হচ্ছে অচৈতন্যাবস্থা। এ অবস্থায় স্বপ্নদোষের অবস্থা বুঝা যেতেও পারে। নাও যেতে পারে। খাদ্যবস্তুর খারাবী বা অপবিত্রতা থেকে শুক্রপাতের সৃষ্টি। তাই স্বপ্নদোষ হোক কিংবা নাই হোক, তরল পানি চোখে পড়লেই গোসল ওয়াজিব হবে।

হজরত আয়েশা থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে তার কাপড় ভেজা অনুভব করে, কিন্তু তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিনা তা স্মরণ করতে পারে না, তখন সে কী করবে। তিনি স. বললেন, গোসল করবে। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, স্বপ্নে যদি দেখে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু জেগে দেখে তার কাপড় ভেজা নয় তখন কী করবে? তিনি স. বললেন, গোসল করতে হবে না। এই হাদিসের সনদ এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর, উবায়দুল্লাহ্ বিন ওমর এবং কাসেম বিন মোহাম্মদ থেকে। তিরমিজি বর্ণিত এই হাদিসের শব্দগুলোকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ।

'যদি তোমরা পথবাহী না হও'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে, গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় নামাজের সমীপবর্তী হয়ো না। তবে, মুসাফির অবস্থায় যদি পানি না পাও অথবা পানি ব্যবহার করতে অসমর্থ হও, তবে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে পারবে। ইতোপূর্বে বর্ণিত শানে নজুলে এ বিষয়টির বাস্তব সমর্থন রয়েছে। মুসাফির অবস্থায় পানি সহজলভ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মুসাফিরকে এই সুযোগটুকু দেয়া হয়েছে। তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে স্থায়ীভাবে দূর করতে পারে না। প্রয়োজন বশতঃ কেবল অপবিত্রতা থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়। জমহুর আলেমদের বক্তব্য এরকমই। কিন্তু দাউদ জাহেরী বলেছেন, তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করে। হানাফিদের অধিকাংশ কিতাবে এসেছে— তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে পুরোপুরি অপসারিত করে— —দাউদ জাহেরীর একথা ঠিকই, কিন্তু এ অবস্থা বলবৎ থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ পানি পাওয়া সম্ভব হবে না। পানি পেলে তায়াম্মুমের পবিত্রতা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ধারণা এই যে, তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে অপসারণ করে না। তাই পানি পেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। মাটি সাময়িকভাবে পবিত্রতাকে বলবৎ রাখে। অপবিত্রতাকে গোপন করে ফেলে। পানি পেলে আবার ওই গোপন অপবিত্রতাই পুনঃপ্রকাশিত হয়। নতুন করে কোনো অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় না।

দাউদ জাহেরীর বক্তব্যের দলিল ওই হাদিসটি— যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. বলেন, পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম হচ্ছে মুসলমানের ওজু— দশ বৎসর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। এ হাদিস আসহাবে সুনানে আবু জর থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিরমিজি একে বিশুদ্ধ বলেছেন। অন্য একটি হাদিসে এসেছে— রসুল

স. বলেন, আমার উম্মতের জন্য সমস্ত পৃথিবীকে মসজিদ করা হয়েছে এবং সকল স্থানের মাটিকেই পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। মুসলিম, ইবনে খুজাইমা।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিস দু'টির মাধ্যমে বুঝা যায়, তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় বটে কিন্তু স্থায়ী পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত ইমরান বিন হোসাইন বর্ণিত হাদিসে এসেছে— পানি না পাওয়া অবস্থায় রসুলপাক স. অপবিত্র ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করার হুকুম দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, পানি পেলেই গোসল করে নিতে হবে। তায়াম্মুমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হলে তিনি স. এরকম নির্দেশ দিতেন না।

জ্ঞাতব্যঃ উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের তাফসীর অনুযায়ী করা হয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'আস্‌সালাত' শব্দটির অর্থ নামাজ নয়, নামাজের স্থান অর্থাৎ মসজিদ। তাই প্রকৃত নির্দেশটি হচ্ছে এই যে— জানাবাতের অবস্থায় তোমরা মসজিদের নিকটে (অভ্যন্তরে) যেয়ো না। মসজিদের অভ্যন্তরে অপবিত্র হলে বাইরে বেরিয়ে এসো। কিন্তু সেখানে অবস্থান কোরো না।

হজরত জায়েদ বিন আবি হাবীব থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, কতিপয় আনসারীদের ঘরের দরোজা ছিলো মসজিদমুখী। যখন তাদের কারো গোসল ফরজ হতো এবং ঘরে পানি না থাকতো তখন তাঁরা পেরেশান হয়ে যেতেন। যেহেতু মসজিদের মধ্য দিয়ে গমন করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, জুহাক, হাসান বসরী, ইকরামা, নাখয়ী এবং জুহরীর অভিমত হচ্ছে— গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি মসজিদের ভেতর দিয়ে গমনাগমন করতে পারবে যদি এছাড়া অন্য পথ না থাকে। এই তাফসীরের প্রেক্ষিতে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অপবিত্র ব্যক্তির জন্য সকল সময় মসজিদের ভিতর দিয়ে গমনাগমন বৈধ। হাসান বসরীও এরকম বলেছেন। কারণ, বিশেষ পরিস্থিতিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হলেও আয়াতের নির্দেশটি সাধারণ। তাই অন্য পথ থাকুক বা না থাকুক সকল সময় মসজিদের মধ্য দিয়ে অপবিত্র অবস্থায় গমনাগমন বৈধ।

আমাদের মত হচ্ছে, মসজিদের ভেতর দিয়ে অপবিত্র ব্যক্তির চলাচল বৈধ নয়। এখানে আরও একটি সমস্যার উদ্ভব হতে পারে— যেমন 'আস্‌সালাত' শব্দটির অর্থ যদি সালাতের স্থান হয়, তবে ঘরের যে স্থানে নামাজ পড়া হয় সে স্থানেও তো চলাচল নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু এখানে মাসআলাটি মসজিদ সম্পর্কিত, গৃহ সম্পর্কিত নয়— একথাটা মনে রাখতে হবে। তবে ইতোপূর্বে নেশাগ্রস্তাবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না— বাক্যটির সালাত শব্দটির অর্থ সালাতই(সালাতের স্থান নয়)। এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য।

মাসআলাঃ মসজিদের মধ্যে অপবিত্রাবস্থায় অবস্থান করা নাজায়েয। এই অভিমত হানাফিদের। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন।

কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন জায়েয। প্রথম তিন ইমামের অভিমতের দলিল এই হাদিসটি— রসুল স. বলেছেন, তাদের গৃহের প্রবেশপথ মসজিদের বিপরীত দিকে করে দাও। আমি ঋতুবতীদেরকে এবং জানাবাত অবস্থার লোকদেরকে (মসজিদে অবস্থান করা এবং প্রবেশ করা) জায়েয করিনি। ইবনে মাজা, আবু দাউদ এবং বোখারী কর্তৃক এই হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে তারিখ গ্রন্থে। তিবরানী উল্লেখ করেছেন, জাসারা বিনতে দুজাজার মাধ্যমে হজরত আয়েশা থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই হাদিসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন জাসারার মাধ্যমে উম্মে সালমা থেকে। আবু জারয়া প্রথম বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। খাত্তাবী বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্বল। তাঁর মন্তব্য হচ্ছে— এই সনদের এক বর্ণনাকারী আখলাত বিন খলিফা আমেরী অখ্যাত। ইবনে রেফায়া বলেছেন, বর্ণনাটি বর্জনীয়। আমরা বলি, ইবনে রেফায়ার বক্তব্য গ্রহণীয় নয়। কারণ, হাদিসের ইমামদের মধ্যে কেউই তাঁকে বর্জনীয় বলেননি। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি। ইবনে খুজাইমা বলেছেন বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। ইবনে কাত্তান বলেছেন হাসান। সুতরাং, আখলাতকে কেউ জানুক বা না জানুক তিনি অখ্যাত পদবাচ্য হয়ে যেতে পারেন না।

এই হাদিসটির অবস্থান ইমাম আহমদের মতের বিপরীতে। জমহুরের অনুকূলে। ইমাম শাফেয়ীরও বিরুদ্ধে (যিনি জানাবাতের অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াতকে বৈধ বলেছেন)। কিন্তু এখানে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিই প্রমাণ করেছে যে জানাবাতের অবস্থায় মসজিদের অভ্যন্তরে চলাচল নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ অপবিত্রাবস্থায় কাবা শরীফের তাওয়াফ বৈধ নয়। কেননা, তাওয়াফের স্থান মসজিদের সীমানাভূত। গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য কোরআন পাঠ করাও জমহুর ওলামাদের অভিমতানুসারে নাজায়েয। ইমাম মালেকের মতে শয়তানের নিকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকটি আয়াত পাঠ করা জায়েয। দাউদের নিকট জানাবাত অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত নাজায়েয নয়। আমরা বলি, রসুল স. বলেছেন, ঋতুবতী নারী এবং জুনুবী পুরুষ এবং নারী যেনো কোরআন পাঠ না করে। ইতোপূর্বে সুরা বাকারার তাফসীরে যথাস্থানে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামনের দিকে 'একে কেউ স্পর্শ করতে পারে না পবিত্রাবস্থা ব্যতীত' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিষয়টি পুনঃ আলোচিত হবে।

একটি সন্দেহঃ ওজুবিহীন ব্যক্তি কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না কিন্তু তেলাওয়াত করতে পারবে—কারণ কী?

সন্দেহের অপনোদনঃ ওজুবিহীনতার প্রভাব পড়ে শরীরে, মুখের অভ্যন্তরে নয়। আবার জানাবাতের (অপবিত্রতার) প্রভাব শরীরে যেমন পড়ে, তেমনি পড়ে মুখগহবরেও। এ ছাড়া ওজুহীনতা ও জানাবাতের গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থায় আরো পার্থক্য রয়েছে যেমন— বেওজু অবস্থা একটি সাধারণ অবস্থা, দীর্ঘক্ষণ এ অবস্থায় থাকা অশোভনীয় নয়। কিন্তু জানাবাত অবস্থা একটি বিশেষ অবস্থা যা

দীর্ঘ হওয়া নিতান্ত অশোভনীয় ব্যাপার। বেওজু অবস্থায় কোরআন পাঠ নিষিদ্ধ করা হলে গুরুতর সমস্যা দেখা দিতো। জানাবাত অবস্থায় কোরআন পাঠ নিষিদ্ধ হওয়ায় সেরকম সমস্যা দেখা দেয় না (কারণ, সকলেরই জানাবাত অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ততা থাকে)। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, জানাবাত ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করতে রসুল স. নিষেধ করেননি। আহমদ, আসহাবে সুনান, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, ইবনে জারুদ, বায়হাকী, তিরমিজি, ইবনে সুকুন, আব্দুল হক, বাগবী। তিরমিজি ও বায়হাকী এই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সহিহাইনে রয়েছে, রসুল স. ওজুর আগে সুরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করেছেন। 'যে পর্যন্ত না গোসল করবে'— কথাটির অর্থ হবে এরকম, মুসাফির ও মাজুর (অসমর্থ) ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য গোসল না করে নামাজ পড়া বৈধ নয়। মুসাফির ও মাজুরেরাই কেবল জানাবাত অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামাজ সম্পাদন করতে পারবে।

আরেকটি সন্দেহঃ জানাবাতের গোসল একই সঙ্গে কীভাবে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এবং নামাজ পাঠ না করার শেষ সীমা নির্ধারিত হতে পারে? কারণ, গোসল করার সঙ্গে সঙ্গেই তো জানাবাত (অপবিত্রতা) দূর হয়ে যায়।

সন্দেহের অপনোদনঃ 'হাত্তা' শব্দটির প্রতিক্রিয়া স্থান ও কালের প্রথম থেকে শেষাংশ পর্যন্ত থাকে। যেমন, গতরাতে আমি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। একথার অর্থ হচ্ছে— রাতের শেষ অংশের পর সকালের যে সীমা শুরু হয়েছে ওই পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। এক্ষেত্রেও তেমনি অর্থ হবে এরকম যে, জানাবাতের অবস্থায় নামাজের যে নিষিদ্ধতা ছিলো জানাবাতের শেষ অংশে এসে তা গোসল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপর গোসল করে নিলে নামাজ পাঠ বৈধ হবে।

অন্য একটি সন্দেহঃ 'হাত্তা তাগতাসিল' বললে কী লাভ? জানাবাত অবস্থায় নামাজ পড়াতো নিষিদ্ধই। জানাবাত বা অপবিত্রতা দূর হয়ে গেলেতো নামাজ পড়তে পারবেই।

সন্দেহের অপনোদনঃ এখানে উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, গোসল দ্বারা অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। গোসলের বিস্তারিত বিবরণ সামনে সুরা মায়িদার তাফসীরে আসবে ইনশাল্লাহুতায়ালা।

তায়াম্মুমের অনুমতি কেবল মুসাফির এবং পীড়িত লোকদের জন্য। এটা ঐকমত্য। (মুসাফির পানি পায় না এবং পীড়িত ব্যক্তি পানি ব্যবহার করতে পারে না। জমহুর ওলামাদের নিকট এ অবস্থার ব্যাপারে কোনো আলাদা অভিমত নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কোনো বস্তি বা গ্রামবাসীর পানি যদি শেষ হয়ে যায় তবে তারা তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে পারবে। পানি পেলে নামাজ দোহ্‌রাতে হবে (ওজু করে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে)। কেননা, তায়াম্মুমের সাধারণ অনুমতি শুধু মুসাফির ও পীড়িত লোকদের জন্য।

আমাদের মত এই— মুসাফির এবং পীড়িতদের জন্য পরে পানি পাওয়া গেলেও যেমন একই নামাজ দু'বার পড়া ওয়াজিব নয় তেমনি সুস্থ ও মুকিম (গৃহবাসী) ব্যক্তিরাও পানি না পাওয়ার কারণে একবার নামাজ পড়ে নিলে একই নামাজ পুনরায় পড়বে না (পরে পানি পাওয়া গেলেও না)। রাবাজা নামক স্থানে হজরত আবু জর বসবাস করতেন। সেখানে বছরে কিছুদিন পানি পাওয়া যেতো না। তিনি রসুল পাক স. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি স. বলেছিলেন, তোমার জন্য মাটিই যথেষ্ট। দশ বৎসর পর্যন্ত যদি পানি না পাও— তবুও। অন্য বর্ণনায় এসেছে— পাক মাটি দ্বারাই মুসলমানদের ওজু হবে, যদিও দশ বৎসর অতিবাহিত হয় (এবং পানি পাওয়া না যায়)। আসহাবে সুনান। আবু দাউদ এ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

যদি, আবেরে সাবিলিন শব্দটির উদ্দেশ্য মুসাফির হয় তবে, দু'বার 'আলা সাফারিন' বলার কারণ এই যে, অসুস্থ এবং মুসাফিরের হুকুম একই। পানি না পাওয়া এবং পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া— উভয় ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। 'আর তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি শৌচস্থান থেকে আগমন করে'— ওই সময় গ্রাম দেশের লোকজন সাধারণতঃ শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নিচু এলাকায় গমনাগমন করতো। তাই আয়াতে 'গাইত' বলা হয়েছে। যার মর্ম হচ্ছে— মলমূত্র ত্যাগে মানুষ ওজুহীন হয়।

মাসআলাঃ শৌচস্থান থেকে এলে—এ কথায় বুঝা যায়, পায়খানা অথবা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে ওজু নষ্ট হয়ে যায়। অস্বাভাবিক কিছু বের হলে ওজু নষ্ট হয় না। যেমন—কীট, রক্ত ইত্যাদি। ইমাম মালেক বলেছেন, যদি কেবল অসাধারণ বস্তু উভয় রাস্তা দিয়ে বের হয় তবে ওজু নষ্ট হবে না।

মাসআলাঃ জমহুরের নিকট অসাধারণ বস্তু বের হলেও ওজু নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম মালেকের একটি বক্তব্যেও এ রকম রয়েছে। হজরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদিসেও ইস্তেহাজা সম্পর্কে এ রকম প্রমাণ এসেছে। **যেমন** রসুল স. হজরত ফাতেমা বিনতে জাহাশ কে বললেন, ইস্তেহাজার রক্ত দেখলে প্রতি ওয়াক্তে রক্ত ধুয়ে নিবে এবং নামাজের জন্য নতুন করে ওজু করবে। বোখারী, মুসলিম। ঋতুস্রাবের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর যে রক্তক্ষরণ হতে থাকে, তাকে ইস্তেহাজা বলে। ইমাম শাফেয়ী এ আয়াত থেকে মাসআলা উদ্ধার করেছেন যে— বমি, রক্ত ইত্যাদি বের হলে ওজু নষ্ট হবে না। ইমাম আহমদ বলেছেন, উভয় রাস্তা ব্যতীত রক্ত, বমি ইত্যাদি অল্প পরিমাণে বের হলে ওজু যাবে না। এ দু' ইমামের বক্তব্য থেকে সঠিক মাসআলা নির্ধারণ করা যায় না। তাই ইমামে আজম বলেছেন, অপবিত্র বস্তু যে স্থান দিয়ে যে পরিমাণই বের হোক না কেনো— ওজু নষ্ট হয়ে যাবে। রক্ত যদি প্রবহমান না হয়, তবে তা অপবিত্র হিসেবে গণ্য নয়। আর অল্প বমি এবং কফ থুথুর অন্তর্ভূত। তাই এসব বের হলে ওজু নষ্ট হবে না।

এই মত হচ্ছে আমাদের মাজহাবের। কিন্তু প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা কিছু বের হবে তা অপবিত্রই হবে। কম বেশী যে পরিমাণই বের হোক না কেনো, ওজু নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ শরীরের যে কোনো স্থান থেকে হোক অপবিত্র কোনো কিছু বের হলেই ওজু চলে যাবে।

যদি বলা হয়, অপবিত্র বস্তু নির্গত হলেই ওজু চলে যাবে— কথাটা জ্ঞানের অনুকূল হতে পারে না। এ কথাটা ঠিক নয়। কারণ জ্ঞানতো একথাই বলে যে, অপবিত্রতা পবিত্রতাকে দূর করে দেয়।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেন— একবার রসুল স. এর বমি হলো, তখন তিনি ওজু করলেন। দামেস্কের মসজিদে হজরত সাওবানের সম্মুখে আমি এ হাদিসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আবু দারদা সত্য বলেছেন। আমি তখন রসুল স. এর ওজুতে সাহায্য করেছিলাম। আহ্মদ এ হাদিসের সনদ বিবৃত করেছেন এভাবে— হোসাইন, মোয়াল্লেম, ইয়াহ্ইয়া বিন কাসির, আওজায়ী, ইয়াইশ বিন ওলিদ মাখজুমি মা'দান, আবু দারদা। এ হাদিস সম্পর্কে মতবিরোধকারীদের মন্তব্য এই যে, সিলসিলাটি মুজ্তারিব (মুজতারিব বলে ওই হাদিসকে যে হাদিসের বর্ণনাকারীগণ আগের জন পরে এবং পরের জন আগে উল্লেখিত হয়েছেন)। দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে, যেখানে সনদ উল্লেখ রয়েছে এরকম— মোয়াম্মার, ইয়াহ্ইয়া বিন কাসির, ইয়াইশ, খালেদ বিন মা'দান, আবু দারদা। এ বর্ণনাবিভ্রান্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, সকল বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি প্রখর ছিলো না। আসরাম বলেছেন, আমি ইমাম আহমদকে বললাম, লোকে বলে এ হাদিসটি মুজতারিব। তিনি বললেন, হোসাইন বিন মোয়াম্মেলতো এলোমেলো বর্ণনা করেননি। তিনি নিজে বলেছেন হাদিসটি হাসান এবং সহীহ্।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন— রসুল স. বলেছেন, নামাজরত অবস্থায় যদি কারো বমি হয়, তবে সে যেনো নামাজ ছেড়ে দিয়ে ওজু করে নেয়। তারপর পুনরায় নামাজ পড়ে নেয় (আগে যতোটুকু পড়া হয়েছিলো তার পরেরটুকু পড়ে নেয়)। তবে শর্ত হচ্ছে, ইত্যবসরে সে যেনো কোনো কথা না বলে। দারা কুতনী এই হাদিসকে ইসমাইল বিন আয়াশ থেকে মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (যে হাদিসের ধারাবাহিকতা এবং বর্ণনাকারীদের উল্লেখ পূর্ণ ও যথাযথ, সে হাদিসকে বলে মুত্তাসিল)। এই সনদের এক বর্ণনাকারীর নাম আব্দুল্লাহ্ বিন আবী মালিকা। তিনি হজরত আয়েশা থেকে এ হাদিসটি শুনেছেন। দারা কুতনী লিখেছেন ইবনে জুরাইজ থেকে। হাদিসের হাফেজগণ এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন মুরসাল হিসেবে (যে হাদিসের শেষের দিকের রাবির উল্লেখ নেই এবং তাবেয়ী পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে যার বর্ণনাক্রম, তাকে বলে মুরসাল)। ইসমাইল বিন আয়াশের বর্ণনাটিই কেবল মুত্তাসিল। আবু হাতেম রাজী ইসমাইলকে বলেছেন অনর্থক। আমরা বলি, ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন ইসমাইলকে সিকাহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর

সিকাহ্ বর্ণনায় অতিরিক্ত কিছু থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। হাদিস বিশেষজ্ঞের নিয়মানুসারে সতর্কতাবশতঃ এ হাদিসটিকে অবশ্য মুরসাল হিসেবে অগ্রগণ্য করে দেয়া হয়েছে। মুরসাল আমাদের নিকট দলিল হিসেবে গ্রহণীয়। এ বিষয়ে রয়েছে আরও অনেক হাদিস। পরিসর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা আর সেগুলোকে উল্লেখ করতে চাই না।

ইমাম আহমদ এ ব্যাপারে তার কম ও বেশীর পার্থক্য সম্পর্কে হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত মারফু হাদিসটি পেশ করেছেন— যাতে বলা হয়েছে দু' এক ফোঁটা রক্ত বের হলে ওজু জরুরী নয় তবে প্রবহমান রক্তের একটি ফোঁটাও ওজু বিনষ্ট করে দেবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. ফোঁড়ার রক্তের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এ দু'টি হাদিসই বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। প্রথমটির সনদভুক্ত এক বর্ণনাকারীর নাম মোহাম্মদ বিন ফজল বিন আতিয়া। তাকে ইমাম আহ্মদ এবং ইয়াহ্ইয়া বিন হাব্বান মিথ্যুক বলেছেন। দ্বিতীয়টির বর্ণনাকারী আতিয়া 'আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর উর্দ্ধতন বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ না করেই বিবরণটি পেশ করেছেন। তাই এই বর্ণনাটি হয়েছে মুদাল্লাস প্রকৃতির।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী তাঁদের অভিমতের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. শিংগা লাগিয়েছেন এবং নতুন ওজু না করেই নামাজ পড়েছেন। শুধু শিংগা লাগানোর স্থানকে ধুয়ে নিয়েছেন এবং অতিরিক্ত কিছু করেননি। দারা কুতনী, বায়হাকী।

এই সনদের এক বর্ণনাকারী সালেহ্ বিন মুকাতিল দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইমাম নববী তাকে দুর্বল বর্ণনাকারীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার ইবনে আরাবীর বর্ণনা থেকে লিখেছেন—দারা কুতনী বলেছেন, এই হাদিসটি বিশুদ্ধ। কিন্তু এটা বাস্তবতাবিরোধী— কেননা, বর্ণনাকারী হিসেবে সালেহ্ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন না।

হজরত সাওবান বর্ণনা করেন, রসুল স. বমি করার পর ওজুর পানি চেয়ে নিয়ে ওজু করলেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল ! বমিতে কি ওজু ফরজ হয়ে যায়? তিনি স. বললেন, যদি ফরজ হতো তবে তুমি এর প্রমাণ দেখতে পেতে কোরআনে। দারা কুতনী। এই হাদিসের সনদভুক্ত ওতবা বিন আসকান মাতরুকুল হাদিস । বায়হাকী লিখেছেন, হাদিসটি বানানো।

আয়াতে উল্লেখিত 'আও লামাসতুমুন নিসাআ' এর শাব্দিক অর্থ যদি রমণীকে স্পর্শ করে থাকে। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যদি নারী সম্ভোগ করে। হজরত আলী, হজরত আয়েশা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু মুসা আশআরী, হাসান, মুজাহিদ এবং কাতাদার বক্তব্য এরকমই। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সুফিয়ান সওরীও এরূপ বলেছেন। তবে এখানে ধরে নিতে হবে কেবল সহবাস বা সম্ভোগ নয়— বীর্যপাতসহ সহবাস। নতুবা প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রমাণিত হবে না।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ওমর বিন খাত্তাব এবং শায়বীর বক্তব্য এই যে, এখানে স্পর্শ শব্দটি হতে প্রকৃত স্পর্শই বুঝতে হবে। অর্থাৎ বাইরের চামড়ার সাথে চামড়া লেগে যাওয়া (স্পর্শ হওয়া)। তাই তাঁরা বলেছেন মেয়েদেরকে স্পর্শ করলে ওজু নষ্ট হয়ে যায়। যদি এ স্পর্শ হয় নগ্ন (বস্ত্রের আবরণহীন)।

এ আয়াতের তাফসীরে হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে স্পর্শ অর্থ সহবাস ব্যতীত অন্য যে কোনো অঙ্গের স্পর্শ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায়হাকী বলেছেন, চুম্বনও এক ধরণের স্পর্শ এবং এর দ্বারা ওজু জরুরী হয়। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমু খেয়েছে অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করেছে তাকে ওজু করতে হবে। ইমাম আহ্মদ, জুহুরী ও আওজায়ীও এরকম বলেছেন। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীরও বক্তব্য এসেছে এরকম। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইসহাকের অন্য একটি বর্ণনায় ইমাম আহ্মদের বক্তব্য হিসেবে এসেছে, কামভাবের সঙ্গে কামাতুরা রমণীকে স্পর্শ করলে ওজু নষ্ট হয়ে যায়। কামানুভূতির সঙ্গে না করলে নষ্ট হয় না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাতের ভিতরের অংশ দ্বারা স্পর্শ করলে ওজু ভঙ্গ হবে— হাতের বাইরের অংশের স্পর্শ লাগলে ভঙ্গ হবে না। তিনি এ বিষয়টিকে তুলনা করেছেন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ সম্পর্কিত মাসআলাটির সঙ্গে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, কারও হাত তার লজ্জাস্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তাকে ওজু করতে হবে। আলেমগণ লিখেছেন, এ বিধানটি প্রযোজ্য হবে তখন যখন হাতের ভিতরের অংশ দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হবে।

হজরত ওমর বলেছেন, চুম্বনও একপ্রকার স্পর্শ— এরপর ওজু করবে। হজরত ওসমান বলেছেন, স্পর্শ কেবল হাত দ্বারাই হয়।

আমরা বলি, হাতের নিম্নাংশ দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। তাই আমরা একে গ্রহণ করিনি। তাই ইমামে আজম এ আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যদি তোমরা অপবিত্র হও (তোমাদের বীর্যস্খলিত হয়) অসুস্থ হও, ভ্রমণরত থাকো, প্রস্রাব পায়খানার কারণে ওজুহীন হয়ে যাও অথবা বীর্যপাত ব্যতীত সহবাস করে থাকো, তবে তায়াম্মুম করতে পারো।

ইমাম শাফেয়ী ব্যাখ্যা করেছেন এরকম— যদি তোমরা অপবিত্র হও (সহবাস করে থাকো), রোগগ্রস্ত হও, সফরে থাকো, প্রস্রাব পায়খানার কারণে ওজুচ্যুত হও অথবা নারীস্পর্শের কারণে ওজুবিহীন হয়ে যাও, তবে তায়াম্মুম করে নিতে পারো। স্মর্তব্য যে, হাকিকী (প্রকৃত) এবং মাজাজী (রূপক) অর্থ একত্রিত হয় না। অর্থাৎ একই বর্ণনাধীন বিষয়াবলীর কিছু অংশ হাকিকী এবং কিছু অংশ মাজাজী— এ রকম হতে পারে না। তাই আয়াতের এ প্রলম্বিত বাক্যটির প্রথমে যেহেতু অসুস্থতা ও অপবিত্রতার উল্লেখ এসেছে, তাই শেষের স্পর্শ কথাটির দ্বারা সহবাস অর্থটিই ধরতে হবে (মাজাজী অর্থ কেবল স্পর্শ ধরলে চলবে না)।

হজরত ওমর 'লামাস' (স্পর্শ) শব্দটিকে কেবলই স্পর্শ মনে করেন। তাই তাঁর মতে অপবিত্রাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয নয়। হজরত আম্মারের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত অবস্থায় তিনি তাঁর এই মতটি বিবৃত করেছিলেন।

ইবনে জাওজী বর্ণনা করেন, হজরত মুআজ বিন জাবাল রসুলপাক স. এর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল ! এক লোক এক মহিলার সাথে সহবাস ছাড়া অন্য সকল কাজই করেছে, তার সম্পর্কে হুকুম কী? রসুলপাক স. বললেন, ভালোভাবে ওজু করে নিয়ে নামাজ পড়তে পারবে। ইবনে জাওজী বলেছেন, এ হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায়, মেয়েদেরকে স্পর্শ করলে ওজু চলে যায়। কিন্তু ইবনে জাওজীর এ দলিলটি যথাযথ নয়। কারণ, প্রশ্নকারীর একথা জানার উদ্দেশ্য ছিলো না যে, এমতোক্ষেত্রে ওজু যাবে কি যাবে না। তার উদ্দেশ্য ছিলো স্ত্রী নয় এরকম মহিলার সঙ্গে সহবাস ব্যতীত অন্য যে সব অপকর্ম হয়েছে, শরিয়তে সে সবের শাস্তি কী? রসুল স. এর সমাধান স্বরূপ বলেছেন— উত্তমরূপে ওজু করে নিয়ে নামাজ পড়লেই তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসে এসেছে— কোনো মুসলমান যখন ওজু করার সময় মুখ ধৌত করে তখন তার চেহারার সমস্ত গোনাহ্ ধুয়ে যায়। হজরত ওসমানের মারফু বর্ণনা এই যে, রসুল স. বলেছেন— যে ব্যক্তি আমার ওজুর মতো ওজু করে একাগ্রচিত্ততার সঙ্গে দু'রাকাত নামাজ পড়বে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে— এক ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, হে রসুল! আমি শরিয়তের শাস্তি পাবার মতো গোনাহ্ করেছি। আমার উপর শাস্তি আরোপ করুন। রসুল স. তার গোনাহ্র কথা জানতে চাইলেন না। ইত্যবসরে নামাজের সময় হয়ে এলো। তখন সে রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পড়লো। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে নিবেদন করলো— ইয়া রসুলাল্লাহ্! মদীনার শেষপ্রান্তে আমি এক মহিলাকে পেয়েছিলাম। সহবাস ছাড়া আমি তার সঙ্গে অন্য সবকিছুই করেছি। এ বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটি এসেছে যে, রসুল স. তখন আয়াত পাঠ করলেন 'আর নামাজের পাবন্দি করুন দিবসের দু' প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিঃসন্দেহে সৎকর্মসমূহ মন্দকর্ম সমূহকে মুছে ফেলে।' আমরা হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসটি এখানে দলিল হিসেবে পেশ করছি। তিনি বলেছেন, রসুল স. রাতে নামাজ পড়তেন এবং আমি তাঁর সামনে মৃতবৎ পড়ে থাকতাম। সেজদার সময় এলে তিনি আমাকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় গৃহ থাকতো আলোহীন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আয়েশা বলেছেন, এক রাতে আমি রসুল স. কে শয্যায় পেলাম না। আমি শয্যা হাতড়াতে লাগলাম। এমন সময় আমার হাত লাগলো তাঁর পায়ে। ওই সময় তিনি

সেজদারত অবস্থায় বলছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার শাস্তি থেকে পরিত্রাণ চাই। তোমার সন্তোষ চাই। তোমার আযাব থেকে বাঁচবার জন্য তোমারই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমি তোমার যথার্থ প্রশংসা করতে অসমর্থ। তুমি তো তেমনই যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছো। বোখারী। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা বলেন—আমি তাঁর পবিত্র কেশে হাত রাখলাম, বুঝতে চেষ্টা করলাম তিনি গোসল করেছেন কিনা।

হাফেজ বলেছেন, প্রকাশ থাকে যে বর্ণনা দু'টি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. ইতেকাফে ছিলেন। ওই সময় আমি তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম। বোখারী। রসুলেপাক স. এর ইতেকাফ অবশ্যই ওজুবিহীন ছিলো না।

হজরত আয়েশা, হজরত মায়মুনা এবং হজরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, তাঁরা পর্দার এপাশ ওপাশ থেকে রসুল স. এর সঙ্গে এক পাত্র থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করতেন।

আমি বলি, গোসলের পূর্বক্ষণে ওজু করা সুন্নত। তারপর, গোসলের পানি উঠাবার সময় নিশ্চয় রসুল স. এর হাত তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের হাতের সঙ্গে লেগেছে।

হজরত কাতাদা বর্ণনা করেন, হজরত জয়নাবের কন্যাকে অর্থাৎ রসুল স. এর নাতনীকে পিঠে উঠিয়ে নিয়ে তিনি স. নামাজ পড়তেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা বলেন, আমি ঋতুবতী ছিলাম। তখন রসুল স. তাঁর মস্তক মোবারক আমার উরুতে রেখে কোরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা আরো বলেন, আমার কোলেই রসুল স. মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন। নিশ্চয় তিনি তখন ওজু অবস্থাতেই ছিলেন। এই হাদিসের উপর ভিত্তি করেই ইমাম শাফেয়ী এবং তার সঙ্গীরা বলেছেন, মেয়েদেরকে স্পর্শ করলে তখনই কেবল ওজু ভঙ্গ হবে যখন কামভাবের সঙ্গে স্পর্শ করা হবে। তাঁদের এ বক্তব্যের বিরুদ্ধেও দলিল রয়েছে। যেমন, হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. তাঁর পত্নীদেরকে চুমু খেতেন এবং পরক্ষণেই নামাজে চলে যেতেন। নতুন করে ওজু করতেন না। বায্যার, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বায্যার বলেছেন, হাদিসটি হাসান। হাদিসটির সনদ এরকম—ওয়াকি', আমাশ, হাবিব বিন আবী সাবেত, ওরওয়া, হজরত আয়েশা। বোখারী বর্ণিত এই হাদিসকে দুর্বল বলে মনে করলে ভুল হবে। তাঁর ধারণানুযায়ী ওরওয়া থেকে হাবিব শোনেননি—এ রকম সন্দেহ করা ঠিক নয়। কারণ, এ সনদের সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য)।

হজরত আয়েশা থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা বলেছেন, রসুল স. ওজু করার পর চুম্বন করেছেন। এরপর নতুন করে ওজু না করেই নামাজ পড়েছেন। হাদিসের সনদ এরকম— হাজ্জাজ, আমর বিন শোয়াইব, জয়নব সাহামিয়া, হজরত আয়েশা। কেউ কেউ বলেছেন, জয়নব অপরিচিতা। আমি বলি, জয়নব অপরিচিতা হলেও তাঁর বর্ণনা গ্রহণীয়। কারণ, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় কুরুণের সময়ের (৮০ হিজরী পর্যন্ত প্রথম কুরুণ এবং ৮০ থেকে ১২০ হিজরী পর্যন্ত দ্বিতীয় কুরুণ)। দ্বিতীয় কুরুণের অখ্যাত বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। এ সনদের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ যদিও মাজরুহ (বিতর্কাহত) তবুও আওজায়ী তাঁর মাধ্যমে হজরত আমর বিন শোয়াইবের বর্ণনা পেশ করেছেন। এরকমই বলেছেন দারা কুতনী। আওজায়ী ছিলেন সিকাহ্। দারা কুতনী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সওরীর মাধ্যমে। এ সনদে ইব্রাহিমে তামীমের মাধ্যমে হজরত আয়েশার বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিরমিজি লিখেছেন, হজরত আয়েশা থেকে ইব্রাহিম শুনেছেন এরকম প্রমাণ নেই। আর এ ধরনের হাদিস মারফু অথবা সহীহ্ কোনোটিতেই পড়ে না।

আমি বলি, ইব্রাহিম ছিলেন সম্মানিত তাবেয়ী। তাঁর পক্ষে হজরত আয়েশার কথা শোনা সম্ভব। এরকম সম্ভাবনাই যথেষ্ট। শুনতে পাওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ না পেলেও চলবে। তাঁর বর্ণনা বিশুদ্ধ না হলে হাদিসটি হবে মুরসাল। আর আমাদের নিকট মুরসাল গ্রহণীয়। এখন আসা যাক তিরমিজির মন্তব্য প্রসঙ্গে। তাঁর মন্তব্যানুযায়ী এ রকম হাদিস রসুল স. থেকে সাব্যস্ত হয়নি। তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, এরকম কোনো হাদিস মারফু অথবা সহীহ্ হিসেবে সাব্যস্ত নেই। কিন্তু অন্যভাবে সাব্যস্ত আছে এবং এর বর্ণনাকারীরাও সিকাহ্।

প্রশ্নঃ যদি এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা যায় যে, ইব্রাহিমের কোনো বর্ণনার উদ্ধৃতি আবু রউফ এবং আতিয়া বিন হারেস ব্যতীত অন্য কেউ দেননি। আর আবু রউফের বর্ণনাকারী কেবল সুফিয়ান সওরী ও আবু হানিফা। এ দু'জনের মধ্যে আবার মতানৈক্যও ছিলো। সওরী বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা থেকে, আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন হজরত হাফসা থেকে। আর এ দু'জনের বর্ণনাকারী কেবলই ইব্রাহিম। আবার তাঁদের কথা ইব্রাহিমের শোনার নিশ্চিত প্রমাণও নেই। (এ সমস্ত সমস্যার সমাধান কী)?

উত্তরঃ আমরা বলি, বর্ণিত চারজন ইমামই সিকাহ্। তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, ইব্রাহিম মুরসাল হিসাবে হাদিস দু'টি বর্ণনা করেছেন। একটি করেছেন হজরত আয়েশা থেকে অপরটি হজরত হাফসা থেকে। প্রথমটি পৌঁছেছে সওরী পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি আবু হানিফা পর্যন্ত। ফকিহ্দের নিকট এরকম হওয়াতে কোনো দোষ নেই। এছাড়া সওরীর দ্বিতীয় বর্ণনা মুত্তাসিল। কেননা, ইব্রাহিমে তাইয়েনী তাঁর পিতার মাধ্যমে হজরত আয়েশার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

যদি এরকম সন্দেহ করা হয় যে, হাদিসের শব্দগুলো এরকম নয়। যেমন হজরত ওসমান বিন শায়বা বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. রোজা অবস্থায়

স্ত্রীদেরকে চুম্বন করতেন। অন্যান্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি স. চুম্বনের পর নতুন করে ওজু করতেন না। আমরা এ ধরণের সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়ার পক্ষপাতী নই। কারণ, বর্ণনাভিন্নতা সত্বেও সকল বর্ণনাকারীই এখানে সিকাহ্। তাই তাঁদের সকল বর্ণনাকেই সহীহ্ বলে মেনে নিতে হবে। কারণ, ঘটনাস্থল ও সময় হয়তো পৃথক। অথবা কেউ কেউ হয়তো ঘটনার অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। তাই কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তিনি রোজা অবস্থায় চুম্বন করতেন, অতঃপর ওজু করতেন না। আর কোনোখানে কেবল রোজা অবস্থায় চুম্বনের কথা বলা আছে। অন্য কোথাও শুধু ওজু না করার কথাটাই বলা আছে। তাই দেখা যায়, এককভাবে কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা নেই। এ ধরনের আংশিক বর্ণনা জায়েয। একথা বলেছেন বোখারী।

হাফেজ ইবনে হাজার বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমাদের কাছে সাঈদ বিন বানানার মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন ওমর এবং আতা বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. চুমু খেলে ওজু করতেন না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সাঈদ সম্পর্কে আমার ভালো জানা নেই। যদি তিনি সিকাহ্ হন তবে এ হাদিসটি দলিল হিসেবে গৃহীত হবে। হাফেজ বলেন, বায়হাকী দশটি পদ্ধতিতে এ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন এবং শেষে সবগুলোকেই দুর্বল হিসেবে গণ্য করেছেন।

আমি বলি, পদ্ধতিগত দুর্বলতা থাকলেও এ ধরনের বর্ণনা হাসান প্রকৃতির। আর এসবের বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিকাহ্। তাঁরা কেউই মিথ্যাবাদী ছিলেন না। হজরত আবু উমামা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্। নামাজের জন্য ওজু করার পর কেউ কি তার স্ত্রীর চুম্বন গ্রহণ করতে পারে? এভাবে আনন্দকে গ্রহণ করলে কি তার ওজু ভেঙে যাবে? তিনি স. বললেন, না। এ সিলসিলার বর্ণনাকারী রোকন বিন আবদুল্লাহ্কে দারা কুতনী মাতরুক বলেছেন। (হাদিসের ব্যাপারে নয়, জাগতিক কোনো ব্যাপারে যার মিথ্যাবাদীতার প্রমাণ রয়েছে তাকে বলে মাতরুক)। এ প্রসঙ্গের সকল হাদিসের বর্ণনাকারীগণ যেহেতু সকলেই বিশ্বাসভাজন, তাই একথা নিশ্চিত যে, রসুল স. চুম্বনের পর নতুন ওজু করতেন না। তাই একথা বলতে আর কোনো বাধা নেই যে, মেয়েদেরকে স্পর্শ করলে ওজু ভঙ্গ হয় না। যদি হতো তবে কোনো না কোনো বর্ণনায় একথা এসেই যেতো। বিশেষ করে মুমিনদের মাতাগণের কেউ না কেউ এরকম বিবরণ দিতেন। রসুল স. তাঁদের সঙ্গে একান্তে মিশেছিলেন। হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, মা আয়েশা বলেন, এমন কোনো দিন অতিবাহিত হতো না, যেদিন তিনি স. আমাদেরকে চুম্বন না করতেন। এ সমস্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতের 'লামাস' শব্দটির প্রকৃত অর্থ সহবাস, স্পর্শ নয়। যদি স্পর্শ হতো তবে বর্ণনাটি হতো আরো দীর্ঘ। তখন বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গটির বিবরণ দিতে হতো। কিন্তু এখানে শৌচস্থান থেকে আসার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার পর পর এসেছে স্পর্শ (সহবাস) করার কথা। আয়াতের বক্তব্য এই যে, তায়াম্মুম ওজুর স্থলাভিষিক্ত। ওজু বিনষ্টকারী বিষয়াবলীর সংখ্যা নির্ণয় করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অন্যত্র ওজু বিনষ্টকারী অনেক বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, নিদ্রা, অচৈতন্য,

উন্মাদ হওয়া, প্রস্রাবের পথ অথবা গুহ্যদ্বার দিয়ে কোনো কিছু বেরিয়ে যাওয়া, অট্টহাসি, উটের গোশত ভক্ষণ, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি।

চিৎ হয়ে কিংবা বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমালে, বেহুঁশ হয়ে গেলে কিংবা পাগল হয়ে গেলে সাধারণতঃ ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়। এটা ঐকমত্য। রসুল স. এর হাদিসে প্রস্রাব পায়খানা থেকে পৃথক হলে এবং ঘুম ভেঙে গেলে— এরকম কথা এসেছে। এ হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত সাফওয়ান বিন আস্সাল। ইবনে খুজাইমা এবং তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম মালেকের মতে নামাজের রুকু অথবা সেজদারত অবস্থায় ঘুমালে ওজু থাকবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে কোনো অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ নিদ্রামগ্ন থাকলে ওজু চলে যাবে। ইমাম আহমদও এরকম মত পোষণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নামাজের যে কোনো অবস্থায় ঘুমালে ওজু যাবে না যদি হেলান না দিয়ে থাকে। কেননা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সেজদায় ঘুমালে নতুন করে ওজু করতে হবে না। যতোক্ষণ চিৎ হয়ে না ঘুমাবে ততোক্ষণ ওজু ঠিক থাকবে। চিৎ হয়ে ঘুমালে শরীরের গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। আবদুল্লাহ বিন আহমদ।

আবু দাউদ এবং তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, বসে বসে ঘুমালে ওজু নষ্ট হয় না। বায়হাকীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, বসে বসে অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমালে ওজু ওয়াজিব হবে না। এ সকল বর্ণনার অন্তর্ভূত এক বর্ণনাকারী ইয়াজিদ বিন খালেদ দালানীকে কোনো কোনো ইমাম দুর্বল বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জাহাবীর সিদ্ধান্তটিই প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ। তিনি বলেছেন, ইয়াজিদ ছিলেন হাসানুল হাদিস। তাঁর চরিত্রে কোনো অসততা ছিলো না।

অচৈতন্য অথবা উন্মাদ অবস্থা নিদ্রা অপেক্ষা কঠিন। তাই এ ব্যাপারে আলেমগণের কোনো মতানৈক্য নেই। যে কোনো অবস্থায় এবং যতো কম সময়ের জন্যই হোক না কেনো, বেহুঁশ অথবা পাগল হলেই ওজু নষ্ট হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, নামাজে অট্টহাসি হাসলে ওজু চলে যাবে। রসুল স. বলেছেন, নামাজে যে অট্টহাসি হাসবে তাকে নতুন করে ওজু করে নিতে হবে। হজরত ইবনে ওমর থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী। এ হাদিসের আংশিক অনুসরণ করেছেন, মুসলিম। ইবনে আদীর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মতোবিরোধ রয়েছে। নিশ্চয়ই ইবনে আদী ছিলেন সিকাহ্ মুদাল্লাস্। কোনো সিকাহ্ বর্ণনাকারী যদি 'হাদ্দাসানা' (আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেন) বলে হাদিস বর্ণনা করেন, তবে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। এ হাদিসের বর্ণনাভঙ্গী সেরকমই। তাই হাদিসটিও গ্রহণীয়।

এক অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কিত ঘটনায় রসুল স. বলেছিলেন, যে নামাজের মধ্যে সশব্দে হাসে, তাকে নতুন করে ওজু করে নিয়ে নামাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। মা'বাদ খাজায়ী থেকে এ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, দারা কুতনী। বিশুদ্ধ মত এই যে, মা'বাদ ছিলেন মহিলা সাহাবী উম্মে মা'বাদের ছেলে। ইমাম আবু হানিফাও এ

হাদিসের একজন বর্ণনাকারী। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা এ হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ করেছেন। দারা কুতনী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জনৈক আনসারী সাহাবী থেকে। এই বর্ণনাসূত্রভূত খালেদ বিন আবদুল্লাহ ওয়াসেতি সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য এই যে, আমরা জানি না তাঁর সম্পর্কে কেউ আপত্তি উত্থাপন করেছেন কিনা। সঠিক কথা হচ্ছে, হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল আমাদের নিকট দলিল। যারা সশব্দে হাসাকে ওজুভঙ্গের কারণ মনে করেন না, কেবল নামাজভঙ্গের কারণ বলে জানেন, তাঁরা বর্ণনা করেন হজরত জাবের বর্ণিত ওই মারফু হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, সশব্দ হাসি নামাজ বিনষ্ট করে, কিন্তু ওজু বিনষ্ট করে না। আমরা বলি, এখানে উল্লেখিত হাসি হবে সাধারণ হাসি, যে হাসিতে উচ্চ আওয়াজ থাকে না। এভাবে বর্ণিত হাদিস দু'টির সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা সম্ভব। আর একটি কথা হচ্ছে, এ হাদিসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, তিনি ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইমাম আহমদ বলেছেন, তিনি ছিলেন অপদার্থ। তার তেমন প্রসিদ্ধিও ছিলো না।

মাসআলাঃ ইমাম আহমদের মতে উটের গোশত খেলে ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়। কেননা রসুল স. বলেছেন, উটের গোশত খেলে ওজু করে নিও। হজরত বারা থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আসহাবে সুনান (আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা এই গ্রন্থকারত্রয়কে আসহাবে সুনান বলে)। হাদিস বিশারদগণ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলেছেন। হজরত জাবের থেকে মুসলিম এবং হজরত উসাঈদ বিন হুদাইর ও জিল ইজ্জাত থেকে আহমদও এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাসের মারফু বর্ণনা এই যে, শরীরের ভিতর থেকে কোনো কিছু বেরিয়ে গেলে ওজু ওয়াজিব হয়। কিন্তু বাইরে থেকে কোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করলে ওজু যায় না। দারা কুতনী ও বায়হাকী এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল ও বর্জনীয়।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের অভিমত— লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওজু ভেঙে যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাতের ভেতরের অংশ অথবা হাতের তালু দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওজু ভেঙে যাবে। হাতের উপরের অংশ অথবা হাতের পিঠ দ্বারা স্পর্শ করলে ওজু ভাঙবে না। রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ফেলে, সে যেনো নতুন ওজু করা ছাড়া নামাজ না পড়ে। হজরত বুসরা থেকে ওরওয়ার মাধ্যমে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিন ইমাম (মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ) এবং চার আসহাবে সুনান (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা) ও অন্যান্য আলেমবৃন্দ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হাদিসটি মুনকাতে (বিপর্যস্ত ধারাবাহিকতাসম্পন্ন)। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, হাদিসটি মুত্তাসিল (যথাসূত্রসম্পন্ন)। মারওয়ানের মাধ্যমে হজরত বুসরা

থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ওরওয়া। এরপর ওরওয়া নিজেই হজরত বুসরা থেকে সরাসরি হাদিসটি শুনেছেন। এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারীদের নাম সহীহাইনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আহমদ, তিরমিজি, ইয়াহ্ইয়া ও দারা কুতনী হাদিসটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলেছেন ইমাম বোখারী। এ প্রসঙ্গে হজরত জায়েদ বিন খালেদ থেকে তিরমিজি এবং আহমদ আর একটি মারফু বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সে যেনো ওজু করে নেয়। হজরত আমর বিন শোয়াইবের দাদা থেকে তিরমিজি, আহমদ, বায়হাকীও এরকম বিবরণ দিয়েছেন। তিরমিজির বর্ণনাটিকে বোখারীও বিশুদ্ধ বলেছেন।

এই অধ্যায়ের আর একটি হাদিস লিখেছেন হজরত আবু আইয়ুব থেকে ইবনে মাজা ও হাকেম। তাঁরা হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত উম্মে সালমা থেকে এ রকম বিবরণ দিয়েছেন। আর বায়হাকী বর্ণনা দিয়েছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। কিন্তু এ সমস্তের বর্ণনাসূত্র শিথিল। এ বিষয়ে হজরত আলী বিন তোলাক্ব থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত নোমান, হজরত আনাস, হজরত উবাই বিন কাব এবং হজরত মুয়াবিয়া বিন জুন্দুব থেকে এ রকম আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে মানদাহ্ এবং হজরত আরভী বিনতে আনাস থেকে তিরমিজি।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর দলিল হিসাবে পেশ করেছেন হজরত তোলাক্ব বিন আলী বর্ণিত হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এর নিকট নিবেদন করা হলো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! যদি কেউ তার নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তবে কি তাকে ওজু করতে হবে? তিনি স. বললেন, ওটা তো তার শরীরেরই একটি অংশ (তবে স্পর্শ করলে ওজু যাবে কেনো)। আসহাবে সুনান এবং ইমাম আহমদও এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং এ হাদিসকে বিশুদ্ধ বলেছেন— আমর বিন আলী ক্বাল্লাস, ইবনে মাদেনি, ইবনে হাব্বান, তিবরানী এবং ইবনে হাজম। কিন্তু একে শিথিল বলেছেন ইমাম শাফেয়ী, আবু জুরয়া, আবী হাতেম, দারা কুতনী ও বায়হাকী।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসটির বর্ণনাসূত্র মোট পাঁচটি। এর মধ্যে চারটি দুর্বল। বাকী একটির বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন কায়েস বিন তোলাক্ব যিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। ইমামে আজম বলেছেন দুর্বল এবং বাজলী বলেছেন মজবুত। উভয় বর্ণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন ইয়াহ্ইয়া। তাই যে সকল আলেম কায়েসকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাঁদের নিকট হাদিসটি সহীহ্। যাঁরা এরকম বলেননি তাঁদের নিকট বিশুদ্ধ নয়। আমাদের মতে হাদিসটি হাসান প্রকৃতির। কিন্তু বুসরা বর্ণিত হাদিসটি অধিকতর শক্তিশালী।

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওজু না যাওয়ার হাদিসগুলো হজরত আবু উমামা, হজরত আসমা বিনতে মালেক এবং হজরত আয়েশা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এগুলোর বর্ণনাসূত্র দুর্বল। ইবনে হাব্বান দাবী করেছেন— তোলাক্ব বর্ণিত হাদিস রহিত হয়েছে। কেননা, ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণকারী হজরত আবু হোরায়রাও পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওজু যাওয়ার কথা বলেছেন। আর তোলাক্ব রসুল স. এর নিকট হাজির হয়েছিলেন হিজরত পূর্ব সময়ে অথবা মসজিদে নববী নির্মাণের প্রাক্কালে। দারা কুতনী।

আমি বলি, দারা কুতনীর এ বর্ণনাসূত্রও অশক্ত। হজরত তোলাক্ব মসজিদে নববী নির্মাণের প্রাক্কালে উপস্থিত হওয়ার কথা জানা গেলেও একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না যে, হজরত আবু হোরায়রার ইসলাম গ্রহণের পর আর কখনো তিনি রসুল স. এর সমীপবর্তী হননি। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসটি যেহেতু নিজেই অশক্ত সূত্রপরম্পরাযুক্ত, তাই হজরত তোলাক্ব বর্ণিত হাদিসটিকে রহিত বলা যায় না।

'যদি পানি না পাও'—আয়াতে বর্ণিত একথার অর্থ হচ্ছে— যদি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হও। পানি ব্যবহার না করতে পারার কারণ হতে পারে অনেক। যেমন, যদি পানি আদৌ না থাকে। যদি পানি থাকে এক মাইল দুই মাইল দূরে। দূরের পানি আনার ক্ষমতা থাকলেও যদি দলছুট হবার সম্ভাবনা থাকে। কুপে পানি আছে কিন্তু পানি ওঠানোর ব্যবস্থা যদি না থাকে। পানি আনতে গেলে হিংস্র জন্তু, বিষাক্ত সাপ অথবা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয় যদি থাকে। পানি আছে কিন্তু তার পরিমাণ এত অল্প যে ওজু করলে পান করার পানি শেষ হয়ে যেতে পারে, যার কারণে পিপাসার কষ্ট অথবা পীড়িত হবার আশংকা দেখা দিতে পারে। অথবা শারীরিক অক্ষমতা ও দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী হয়। ধ্বংস ও অঙ্গহানি হওয়ার ভয় যদি থাকে তবে পানি কাছে কিংবা দূরে থাক, তায়াম্মুম করে নিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হওয়া অথবা অঙ্গহানির আশংকাস্থলেই তায়াম্মুম জায়েয (কেবল রোগবৃদ্ধির আশংকায় জায়েয নয়)।

মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, এক আনসারী পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। উঠে বসে ওজু করার সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। তাঁর এমন কোনো সাহায্যকারীও ছিলো না, যে তাঁকে ওজু করিয়ে দেবে। রসুল স. এর দরবারে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা 'যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও'— এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। ইব্রাহিম নাখয়ীর মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, কতিপয় যুদ্ধাহত সাহাবী জখমযন্ত্রণার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ওই সময় তাঁরা জুনুবও (গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থা) হয়ে গেলেন। তাঁদের দূরবস্থার কথা রসুল স. কে জানানো হলে আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াতটি নাজিল করলেন।

হজরত আমর বিন আস বলেন, জাতুস্‌ সালাসিলের যুদ্ধের এক প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। আমি চিন্তা করলাম, এই ভয়ানক ঠাণ্ডায় গোসল করলে নির্ঘাত মারা পড়বো। আমি আর গোসল করলাম না। তায়াম্মুম করলাম

এবং নামাজ পড়ালাম। এই ঘটনাটি পরে রসুল স. কে জানানো হলো। তিনি স. বললেন, আমর! তুমি তাহলে জানাবাত অবস্থাতেই নামাজ পড়িয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ আমার স্মরণে ছিলো, 'তোমরা আত্মহত্যা কোরো না।' রসুল স. হাসলেন। আমাকে আর কিছু বললেন না। বোখারী, আবু দাউদ, হাকেম।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তিনি ওয়াকে'উজ্‌জরফ থেকে রওয়ানা দিয়ে মারবাদু নায়াম নামক স্থানে পৌঁছলে আসরের সময় হয়ে গেলো। তিনি মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দুই হাত মোসেহ্‌ করে নিয়ে তায়াম্মুম সমাপন করলেন এবং নামাজ পড়ে নিলেন। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখনও সূর্যাস্ত হয়নি। কিন্তু তিনি আসর নামাজের পুনরাবৃত্তি করলেন না। শাফেয়ী। এই হাদিসটি ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, জরফ ছিলো মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে। আর মারবাদ ও মদীনার দূরত্ব ছিলো এক মাইল। বায়হাকী বলেছেন, সফর অবস্থায় ইবনে ওমর দুই এক মাইল দূরে পানি থাকলে পানির জন্য ব্যস্ত না হয়ে তায়াম্মুম করে নিতেন। আমি বলি, দলছুট হওয়ার আশংকাতেই তিনি এরকম করতেন। ডানে কিংবা বাঁয়ে দূরে পানি থাকলে অর্থাৎ সামনের দিকে পানি না থাকলেই কেবল তিনি এ রকম করতেন।

মাসআলাঃ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুসাফির ওজুর পানি না পেলে সাথীদের কাছে পানির অনুসন্ধান করবে। যদি খোলা প্রান্তরে থাকো, কোনো দিকের কোনো সাড়া শব্দ না পাওয়া গেলেও চতুর্দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। সামনে উঁচু দেয়াল বা টিলা থাকলে ডানে বাঁয়ে তাকাবে। কেননা, আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি পানি না পাও।'— এ কথার অর্থ যদি অনুসন্ধান করে পানি না পাও। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সঙ্গীদের নিকট পানি চাওয়ার কথা এখানে বলা হয়নি। নিজের কাছে পানি না থাকলেই তার প্রতি 'যদি পানি না পাও' কথাটি প্রযোজ্য হবে।

কামুস অভিধানানুযায়ী তায়াম্মুম শব্দের অর্থ সংকল্প করা। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত ফরজ। ওজু ও গোসলের নিয়তকে তিনি ফরজ বলেননি। ইমাম জোফার বলেছেন, ওজু ও গোসলের মতো তায়াম্মুমের নিয়তও ওয়াজিব নয়। এই আয়াতটিই ইমাম জোফারের অভিমতবিরোধী। অন্য ইমামত্রয়ের অভিমত এই যে, তায়াম্মুমের মতো ওজু ও গোসলের নিয়তও ওয়াজিব। সুরা মায়িদায় এই অনুষঙ্গটি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হবে ইন্‌শাআল্লাহুতায়ালা।

তায়াম্মুম করতে হবে মাটি দিয়ে। বালি, চুনাপাথর কিংবা সাধারণ যে কোনো পাথর মাটিরই গোত্রভূত। জুযাজ বলেন, বিষয়টির প্রকৃত অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। আমি বলি, একারণেই বায়যাবী, শাফেয়ী মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও কেবল মাটিকেই তায়াম্মুমযোগ্য মনে করেননি। বাগবী

বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— 'সয়িদান' অর্থ মাটি-ই। কামুসে রয়েছে, সয়িদান অর্থ মাটি, জমির মাটি, বালি। দারা কুতনী।

হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস 'সয়িদান তইয়েবান'—এর তাফসীর করেছেন, (ওই মাটি) যার মধ্যে সবুজ বৃক্ষ অংকুরিত হয়। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আমার নিকট এরকম বিবরণ পৌঁছেনি। কিন্তু বায়হাকী এবং ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের অনুসরণে বলেছেন, পবিত্র মাটি অর্থ ক্ষেতের মাটি অর্থাৎ যে জমিতে ফসল ফলানো যায় সেই জমির মাটি। ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাসের এই হাদিসটি মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 'পবিত্র' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝা যায় যে, শস্যক্ষেত্রের মৃত্তিকা এবং অন্য সকল স্থানের মৃত্তিকা।

আমি বলি, শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, তৎসত্ত্বেও এখানে সয়িদা অর্থ সকল প্রকার মাটি। কারণ, সুরা মায়িদায় আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর ইচ্ছা নয় যে, তিনি তোমাদের প্রতি কোনো অসুবিধা চাপিয়ে দেন।' কেবল ক্ষেতের মাটি হলে ব্যাপারটা হতো খুবই কঠিন। তখন কৃষিকাজের উপযুক্ত নয় এমন লবণাক্ত বা অনুর্বর জমিতে, পাথুরে প্রান্তরে, পাহাড়ী এলাকার বসবাসে তায়াম্মুম করা কঠিন হয়ে পড়তো। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিস দৃষ্টে বুঝা যায়, সয়িদা অর্থ জমিরই মাটি।

রসুল স. বলেছেন, অন্যান্য নবী অপেক্ষা আমাকে ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। ১. কলেমায়ে জামেয়া (সমন্বিত বাণীবৈভব) ২. শত্রুদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৩. গণিমতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে। ৪. সারা পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ৫. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত সৃষ্টির জন্য ৬. নবুয়তের প্রবাহ বন্ধ করা হয়েছে আমারই মাধ্যমে। মুসলিম, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, অন্যদেরকে দেয়া হয়নি এ রকম পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে আমাকে। এই হাদিসে কলেমায়ে জামেয়া এবং নবুয়ত সমাপ্তির উল্লেখ নেই। বাকী চারটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে এ কথাটি— উম্মতের জন্য আমার সুপারিশ সুসংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।

হজরত আবু উমামা থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনাপরম্পরায় বায়হাকী লিখেছেন, আমাকে চারটি বিশেষত্বের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে। ১. সমস্ত পৃথিবী আমার ও আমার উম্মতের জন্য পবিত্র ও মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। এখন নামাজের সময় জায়নামাজ না পেলে মাটিতেই নামাজ পড়তে পারবে। ২. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের জন্য। ৩. গণিমতের মাল আমার জন্যই হালাল করা হয়েছে। ৪. দুই মাসের দূরত্বে থাকলেও শত্রুরা আমার ভয়ে ভীত হয়।

হজরত আমর বিন শোয়াইবের বর্ণনায় রয়েছে, যেখানে নামাজের সময় হবে সেখানেই তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নিতে পারবে।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে— পাঁচটি এমন বিষয় আমাকে দেয়া হয়েছে, যা ইতোপূর্বের কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। পাঁচটির একটি হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীর মাটি আমার জন্য পবিত্র করে দেয়া হয়েছে, যার জন্য সকল স্থানের মাটিই আমার জন্য মসজিদ তুল্য।

ইবনে জারুদ এবং ইবনে মুনজির হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন সমস্ত মাটি আমার জন্য পবিত্র। সকল স্থানের মাটিই মসজিদ। এ প্রসঙ্গের হাদিসগুলো থেকে বুঝা যায়, মাটি তার সমস্ত অংশসহ পবিত্র। আর আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, সকল স্থানের মাটিই মসজিদ। কেননা, 'আল আরদ্ব' শব্দটির মধ্যে আলিফ লামে জিনসী (জাতিগত আলিফ) হয়েছে। বিশেষ করে হজরত আবু উমামার হাদিস এ বিষয়টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মাটি বা মাটি জাতীয় সব কিছু দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। পাথর ও বালি ইত্যাদিও মাটির সমগোত্রীয়। ইমাম মালেকের মতে খড়ি এবং গাছ দ্বারাও তায়াম্মুম জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে খড়ি অথবা গাছ লেগে থাকতে হবে মাটির সঙ্গে। বৃক্ষ বড় হয় মাটির রস শোষণ করে, সুতরাং মাটির অংশ রয়েছে তার শরীরে। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, তায়াম্মুম বৈধ কেবল মাটি ও বালি দ্বারা। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ অভিমত প্রকাশ করেছেন, তায়াম্মুম কেবল মাটি দ্বারাই করা যায়।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ তাঁদের অভিমতের সমর্থনে হজরত হোজায়ফা বর্ণিত হাদিসটি এনেছেন, যাতে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে তিনটি বিষয়ে বিশেষিত করে মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। ১. আমাদের নামাজের কাতারগুলোকে ফেরেশতাদের কাতারের মতো সুশৃঙ্খল করা হয়েছে। ২. সমস্ত পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। ৩. মাটিকে করা হয়েছে পবিত্র যখন আমরা পানি না পাই। মুসলিম।

হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। বর্ণিত হাদিস দু'টিতে কেবল মাটির কথাই উল্লেখিত হয়েছে। তাই মাটিই তায়াম্মুমের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা সেরকম নয়। এখানে বিশেষ অর্থ ও সাধারণ অর্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ আসলে নেই। কেবল মাটির কথা উল্লেখ করা হলেও সাধারণ অর্থে মাটি জাতীয় সকল পদার্থ এর অন্তর্ভূত হবে। কারণ, এখানে মাটি জাতীয় অন্যান্য পদার্থ সমূহকে নাজায়েয ঘোষণা দেয়া হয়নি বরং নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য হাদিসে ভূমিজাত অন্যান্য বস্তুর কথা স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে। এই হাদিস দু'টিতে কেবল মাটির উল্লেখ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা উত্তম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিস থেকে ইমাম আবু ইউসুফ দলিল পেশ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা আরজ

করলেন, হে আল্লাহর রসুল! কোনো কোনো সময় পাহাড়ী এলাকায় আমাদেরকে তিন চার মাস ধরে অবস্থান করতে হয়। তখন কখনো কখনো আমাদের গোসল ফরজ হয়। স্ত্রীরা ঋতুবতী হয়। সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আমরা সেখানে পানির সংকটে পড়ে যাই। রসুল স. বললেন, সেখানকার ভূমিকে ব্যবহার কোরো। একথা বলেই তিনি তাঁর হাত রাখলেন মাটিতে এবং মুখমণ্ডল মুছলেন। আবার মাটিতে হাত রাখলেন। তারপর হাত উঠিয়ে দু' হাত কনুই পর্যন্ত মুছে ফেললেন। ইবনে জাওজী এই হাদিস উদ্ধৃত করে বলেছেন, হাদিসটি অশুদ্ধ। কেননা, এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী মোছান্না বিন সবাহ্কে ইমাম আহমদ ও রাজী বলেছেন, অপদার্থ। নাসাঈ বলেছেন, পরিত্যক্ত হাদিস।

'তইয়েবান' শব্দটির অর্থ পবিত্র। এখানে এ শব্দটির দ্বারা ফসলের জমিনের মাটি বুঝানো হয়নি। কেননা, ওলামাদের ঐকমত্য এই যে, সয়িদান অর্থাৎ মাটি পবিত্র হওয়া জরুরী। এখন যদি এই মাটিকে কেবল ফসল জন্মানোর উপযুক্ত মাটি বলে মনে করা হয় তবে প্রকৃত ও রূপক উভয় প্রকার অর্থ একই সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। এরকম করা বৈধ নয়। কারণ, কোরআন ও ঐকমত্য অনুযায়ী পবিত্রতার শর্তটিই জরুরী। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মাটি অপবিত্র হওয়ার পর শুকিয়ে গেলে তার উপর নামাজ পড়া যাবে। কিন্তু ওই স্থানের মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে না। কেননা, মাটি পবিত্র হওয়ার শর্ত কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর এই পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে আগাগোড়া পবিত্র। বাকী তিন ইমামও এ রকম মাটিতে নামাজ পড়া নাজায়েয বলেননি। হাদিস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়, মাটি তরল অপবিত্রতা শোষণ করার পর শুকিয়ে গেলে পবিত্র পদবাচ্য হয়। কিন্তু এই হাদিস তেমন প্রসিদ্ধ নয়। আমাদের নিকট এ সম্পর্কিত একটি হাদিস পৌঁছেছে হজরত হামজা বিন আবদুল্লাহ্র বর্ণনা থেকে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এর জামানায় কুকুর মসজিদের ভিতরে চলাফেরা করতো এবং প্রস্রাব করতো। কিন্তু কেউ অপবিত্র স্থান পানি দ্বারা ধৌত করতেন না। বোখারী। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন— আবু দাউদ, ইসমাইল, আবু নাঈম এবং বায়হাকী।

'উহা মুখ ও হাতে বুলাইবে'—এরকম সরাসরি নির্দেশের কারণে ঐকমত্যানুসারে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল মোসেহ্ করা ফরজ। কনুই সহ দু' হাত পর্যন্ত মোসেহ্ করাও ফরজ। কনুই থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গের নাম হাত। জুহুরী বলেছেন, বগল পর্যন্ত মোসেহ্ করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এই বিষয়টির সম্যক ব্যাখ্যা দেয়ার আগে তাঁরা বগল ও কাঁধ পর্যন্ত মোসেহ্ করতেন। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেন, রসুল স. সেনাবাহিনীতে শেষ রাতের দিকে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিলেন হজরত আয়েশা রা.। তাঁর ইয়ামানি হার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। সকলে হার অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তখন তাঁদের নিকট পানি ছিলো না। ওই সময়েই আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র মাটি দিয়ে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ করলেন।

মুসলমানেরা উঠে দাঁড়ালেন। মাটিতে হাত স্থাপন করলেন এমনভাবে যাতে মাটি লাগলো না। তারপর হাতের ভেতরের (তালুর) অংশ দ্বারা বগল এবং কাঁধ পর্যন্ত মোসেহ্ করলেন। আহমদের মাধ্যমে ইবনে জাওজী এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, আমরা কাঁধ পর্যন্ত মোসেহ্ করেছি। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, আমরা রসুল স. এর মাধ্যমে কাঁধ পর্যন্ত মোসেহ করেছি। কিন্তু রসুল স. এর শিক্ষা এবং জমহুরের ঐকমত্যে প্রমাণিত হয়েছে— এখানে হাত অর্থ সম্পূর্ণ হাত নয়। বরং হাত বলতে এখানে ততোটুকু বুঝানো হয়েছে যতোটুকু ওজুর সময় ধৌত করতে হয়।

হজরত আম্মার বর্ণনা করেন, তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমিও সকলের সঙ্গে ছিলাম। রসুল স. আমাদেরকে হুকুম করলেন। আমরা একবার হাত মাটিতে স্থাপন করে উঠিয়ে নিয়ে মুখমণ্ডল মোসেহ্ করলাম। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত রেখে উঠিয়ে নিয়ে দু' হাত কনুই পর্যন্ত মুছলাম। বায্যার।

হাফেজ ইবনে হাজারও নির্দোষসূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম বর্ণনা আরো করেছেন আবু দাউদ হজরত আম্মার থেকে। তাঁর বিবরণেও 'কনুই পর্যন্ত' উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত কাতাদার বর্ণনায় আছে, আমার নিকট এক মুহাদ্দিস বলেছেন— যিনি উদ্ধৃত করেছেন শায়বী থেকে হজরত কাতাদা ওই মুহাদ্দিসের নাম বলেননি। কিন্তু তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে বুঝা যায় তিনি ওই মুহাদ্দিসকে সিকাহ্ মনে করেন।

আয়াতটি নাজিল হওয়ার ব্যাপারে হজরত আসলাহ্র হাদিসটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে— যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রসুল স. আমাকে তায়াম্মুম করা শিখিয়েছেন এভাবে— একথা বলে একবার মুখমণ্ডল মোসেহ্ করলেন। পরের বার মোসেহ্ করলেন কনুইসহ দু' হাত। কিন্তু এই বর্ণনাসূত্রের এক বর্ণনাকারী রবী বিন বদর ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। এতদসত্ত্বেও হজরত আম্মারের হাদিসে যেহেতু একই কথা এসেছে, তাই উভয় হাদিসের ব্যাখ্যা মূলত সমগুরুত্বসম্পন্ন বলে গ্রহণ করা যায়।

মাসআলাঃ উপরোক্ত বিবরণাদির ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কনুই পর্যন্ত হাত বুলিয়ে নেয়া ওয়াজিব। এই অভিমতের সাহাযার্থে রয়েছে হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি— যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। আমি তাই (পবিত্র হওয়ার জন্য) মাটিতে গড়াগড়ি করেছি। রসুল স. বললেন, তায়াম্মুম এরকম—একবার মাটিতে হাত রেখে মুখমণ্ডল মুছতে হবে, আর একবার মাটিতে হাত দিয়ে মুছে ফেলতে হবে কনুই পর্যন্ত দুই হাত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার মাটিতে হাত রেখে তাঁর পবিত্র মুখাবয়ব মুছলেন। পরের বার একই নিয়মে মাটিতে হাত স্থাপন করে মুছে ফেললেন কনুই পর্যন্ত দু' হাত। হাকেম বলেছেন হাদিসটি সহীহ্। দারা কুতনী বলেছেন, এই

সূত্রভূত সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ্। বোখারী ও মুসলিম এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেননি।

হজরত ইবনে সামুহ বর্ণনা করেন, একদিন আমি রসুল স. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন প্রস্রাব করছিলেন। আমি সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি স. সালামের জবাব দিলেন না। প্রস্রাব সমাপন করে তিনি সামনের একটি দেয়ালে তাঁর লাঠি দিয়ে আঁচড় দিলেন। তারপর দুই হাত দেয়ালে রেখে উঠিয়ে নিয়ে মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দু' হাত মুছে নিলেন। শাফেয়ী, নাসাঈ। নাসাঈ বলেছেন, হাদিসটি হাসান। এই বর্ণনাসূত্রের আবু আসমা এবং আবু খারেজ সম্পর্কে ইবনে জাওজী সন্দেহ করেছেন। আর এক বর্ণনাকারী আবু হুয়াইরিস সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার দুর্বলতার অনুযোগ করেছেন। কিন্তু বর্ণিত তিনজন সম্পর্কে কেউই মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ তোলেননি। কাজেই হাদিসটি উন্নীত হয়েছে হাসান পর্যায়ে। সহীহাইনে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. তাঁর পবিত্র চেহারা এবং উভয় হাত মোসেহ্ করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আবী আওফাকে তায়াম্মুম প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, রসুল স. আম্মারকে এরকম করতে নির্দেশ করেছেন— উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করবে, তারপর হাত ঝেড়ে নিবে, তারপর মুছে ফেলবে মুখ ও দুই হাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় হাতের বদলে কনুই বলা হয়েছে। ইবনে মাজা। জাহাবী এই সনদের কোনো বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করলেও একথা নিশ্চিন্ততার সঙ্গে বলেছেন যে, বোখারীর শায়েখ ওসমান বিন আবী শায়বা নিশ্চিতরূপে সত্যবাদী ছিলেন। এ কারণেই প্রমাণিত হয় যে, হাদিসটি হাসান (উত্তম)। এই অনুচ্ছেদের কতিপয় হাদিস অবশ্য দুর্বল। আবু দাউদ কর্তৃক হজরত ইবনে আসমা এবং হজরত ইবনে ওমরের হাদিস এসে পৌঁছেছে মোহাম্মদ বিন সাবেত পর্যন্ত। আর মোহাম্মদ বিন সাবেত দুর্বল রূপে চিহ্নিত। দারা কুতনী, বায়হাকী এবং হাকেম বর্ণিত হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আয়েশার হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তায়াম্মুম দু'বার হাত স্থাপনের দ্বারা সমাপ্ত হয়। প্রথমবার মাটিতে হাত রেখে চেহারা মুছতে হবে। দ্বিতীয়বার মুছতে হবে কনুই পর্যন্ত দু' হাত। হজরত ওমর বর্ণিত হাদিসের এক বর্ণনাকারী আলী বিন জুবিয়ানকে কাত্তান এবং ইবনে মুঈন দুর্বল বলেছেন। হাকেম বলেছেন সত্যবাদী। এক বর্ণনাসূত্রের সোলায়মান বিন দাউদকে বলা হয়েছে মাতরুকুল হাদিস। হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী হারিশ বিন হারিছকে আবু হাতেম বলেছেন, হাদিস অস্বীকারকারী।

হজরত ওমরের এক বর্ণনায় এসেছে, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে তায়াম্মুম করেছি। দেখেছি, তিনি তাঁর হাত পবিত্র মাটিতে রাখলেন, হাত ঝাড়লেন, তারপর মুখমণ্ডল মুছে নিলেন। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত রেখে মুছে নিলেন কনুই পর্যন্ত দু' হাত। দারা কুতনী। এই বর্ণনাসূত্রটির সোলায়মান বিন আরকাম আবার মাতরুকুল হাদিস। এ সম্পর্কিত আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু উমামা থেকে যার সনদকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিবরানী।

ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তায়াম্মুমের জন্য শুধু একবার মাটিতে হস্তস্থাপন করাই যথেষ্ট। একবার মাটি স্পর্শ করেই মুখ ও হাত মুছে ফেলতে হবে। কেননা, হজরত আম্মার বর্ণনা করেন, আমি সেনাদলের সঙ্গে ছিলাম। আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো। আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর রসুল স. এর নিকট যেয়ে একথা বললে তিনি বললেন, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট—তিনি হাত রাখলেন মাটিতে। তারপর হাত উঠিয়ে নিয়ে হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুছে ফেললেন মুখ ও হাত—কনুই পর্যন্ত। হজরত আম্মারের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তায়াম্মুমকালে কেবল একবার মাটিতে হাত রেখে চেহারা এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মোসেহ্ করবে। এই হাদিস দু'টি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। সহীহাইনেও বিভিন্ন সূত্রে এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমার জন্য এরকমই যথেষ্ট ছিলো—একথা বলে তিনি দু' হাত মাটিতে রাখলেন, হাতে ফুঁ দিলেন, তারপর চেহারা এবং দু' হাত কনুই পর্যন্ত মোসেহ্ করলেন। মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তোমার জন্য এ রকম করাই যথেষ্ট ছিলো যে, তুমি উভয় হাত মাটিতে রেখে হাতে ফুঁ দিয়ে নিয়ে মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দু' হাত মোসেহ্ করে নিবে।

আমি বলি, সহীহাইনের হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, হজরত আম্মার তখন পর্যন্ত জানতে পারেননি যে, জানাবাত অবস্থার জন্যও তায়াম্মুম করা যায়। তিনি মনে করেছিলেন তায়াম্মুম ওজুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তিনি তায়াম্মুমের নিয়মকে যথেষ্ট মনে না করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। হাদিস বিশারদগণ বলেন, বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত হজরত আম্মারের হাদিস অধিকতর শক্তিমান। আমরা বলি, নিঃসন্দেহে বোখারী ও মুসলিমের হাদিস আমাদের কোনো একটি হাদিসের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অনেক। সূত্রগত দুর্বলতা সত্ত্বেও সেগুলো বিশুদ্ধ পদবাচ্য। ওই সকল বর্ণনা এবং বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনার মধ্যে বিরোধাভাস বিদ্যমান। এখন আমাদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে ওগুলোর পারস্পরিক মর্যাদা কী? ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদিসের ঘটনা ঘটেছিলো এই আয়াত নাজিলের পরে। কাজেই আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা এই হাদিস দ্বারা করা যায় না। এ ধরনের বিলম্বিত বর্ণনা জায়েয নয়। এই হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ নিলে আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, একক বর্ণনা দ্বারা কিতাবুল্লাহ্‌র হুকুম রহিত হয় না। তাই নিঃসন্দেহে কিতাবুল্লাহ্‌ই কায়েম থাকবে। আর রহিত হয়ে যাবে সহীহাইনের বর্ণনা। তাই অন্যান্য বর্ণনাগুলোই বরং গ্রহণীয়। কারণ, সেগুলো আয়াত নাজিলের সময়ের। সুতরাং, আয়াতের ব্যাখ্যা এই হাদিসগুলোর মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন।

সহীহাইনের হাদিসের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায়, হাদিসের বর্ণনায় রয়েছে কনুই পর্যন্ত হাতের কথা। সম্পূর্ণ হাত নয়। মাটিতে হাত রাখার কথা বলে মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। তায়াম্মুমের সম্পূর্ণ নিয়ম বর্ণনা করা

তখন উদ্দেশ্য ছিলো না। যেমন গোসল সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তোমার জন্য এরকমই যথেষ্ট যে, তুমি তিনবার মাথায় পানি ঢেলে দিবে। এর মধ্যে কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এবং সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলার কথা বলা হয়নি। কেননা, রসুল স. এর উদ্দেশ্য ছিলো কেবল একথা জানানো যে, খোঁপা বাঁধা চুল খোলার দরকার নেই।

শেষ কথা হচ্ছে, হাদিসগুলোর মধ্যে যেহেতু পরস্পরবিরোধিতা দৃষ্ট হলো, তাই আমরা ওগুলোকে দলিল হিসাবে না টেনে বরং আমরা তায়াম্মুমকে ওজুর সঙ্গে তুলনা করলেই ভালো করবো। তাই শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে, কনুই পর্যন্ত মুছে ফেলার কথাটিই মেনে নেয়া (যেহেতু ওজুতে এরকমই করতে হয়)।

মাসআলাঃ নামাজের সময় চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে নিয়ে নামাজ পড়া যাবে। যেমন, ঈদের নামাজ এবং জানাজার নামাজ। কিন্তু প্রতি দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমআর নামাজের সময় চলে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও তায়াম্মুম করে নামাজ পড়া যাবে না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জানাজা অথবা ঈদের নামাজ ছুটে যাবার আশংকা থাকলেও তায়াম্মুম করা যাবে না। কারণ এগুলো ওয়াজিবই নয়। ঈদের নামাজ সুন্নত। আর জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া (কিছু লোক পড়লে সকলের পক্ষ থেকে নামাজ আদায় হয়ে যায়)। তাঁরা আরো বলেছেন, ওয়াক্তিয়া নামাজ এবং জুমআর নামাজ ছুটে যাবার ভয় থাকলে তায়াম্মুম করা যাবে। এমতোক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, পরে ওজু করে নামাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, বর্ণিত চার অবস্থার কোনো অবস্থাতেই তায়াম্মুম করা যাবে না। কারণ, তায়াম্মুম করার শর্ত হচ্ছে পানি না পাওয়া। কিন্তু বর্ণিত অবস্থাগুলোর একটিতেও এরকম কিছু নেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. সালামের জবাব দেয়ার জন্যও তায়াম্মুম করে নিয়েছিলেন। (ইতোপূর্বে এই হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে)। অথচ ওজুহীন অবস্থাতেও সালামের জবাব দেয়া যায়। এ ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় কেবল ওয়াজিব আদায়ের জন্য নয়, বরং সাধারণভাবে সকল অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ।

মাসআলাঃ আমাদের মাজহাবের মত হচ্ছে, তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ার পর ওই ওয়াক্তের মধ্যেই যদি পানি পাওয়া যায়, তবুও নামাজ পুনঃ পড়া ওয়াজিব হবে না। কিন্তু আতা, তাউস, মাকহুল, ইবনে সিরীণ এবং জুহরী বলেছেন, পুনঃ পাঠ করা ওয়াজিব হবে। আমাদের পক্ষের দলিল হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত ওই হাদিস— যেখানে বলা হয়েছে, দু' ব্যক্তি ভ্রমণরত ছিলেন। নামাজের সময় হলো। তাঁদের সঙ্গে পানি ছিলো না। তাঁরা দু'জনেই তায়াম্মুম করে নামাজ পড়লেন। এরপর পানি পেলেন। তখন একজন ওজু করে নিয়ে নামাজ পড়লেন। আর একজন পড়লেন না। পরে যখন উভয়ে রসুলেপাক স. এর কাছে এই ঘটনা বললেন, তখন তিনি যে ব্যক্তি নামাজ পরে পড়েননি তাঁকে বললেন, তুমি সুন্নত অনুযায়ী আমল করেছো। তোমার নামাজ পূর্ণ হয়েছে। আর নামাজ

পুনঃপাঠকারীকে বললেন, তুমি দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম, দারেমী।

মাসআলাঃ যদি শরীরের কোনো কোনো অঙ্গ জখম হয় এবং কোনো কোনো অঙ্গ ভালো থাকে, তবে জখম অংশের জন্য তায়াম্মুম করে নিতে হবে। ভালো অংশ ধুয়ে নিলেই চলবে। এ কথা বলেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, যদি আহত অঙ্গের অধিকাংশ ভালো থাকে, তবে সে অংশ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে জখম অংশটুকুর উপরে মোসেহ্ করতে হবে। তায়াম্মুম করা যাবে না। আর অধিকাংশ অঙ্গই যদি আহত হয় তবে তায়াম্মুম করে নিবে। পানি দিয়ে তখন কিছুই ধুয়ে নিতে হবে না।

আমরা বলি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছু অংশ ভালো এবং কিছু অংশ জখম— এ রকম অবস্থায় সে কিন্তু পুরাপুরি অসুস্থ নয়। কাজেই ধৌত করার হুকুম বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু অন্য দিকে সে কিন্তু পুরাপুরি রোগীই। কারণ, সমস্ত শরীরে পানি ব্যবহার করার অবস্থা তার নেই। কাজেই তার জন্য তায়াম্মুম বৈধ হবে। এ মতের সমর্থনে রয়েছে হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, আমি এক সফরে ছিলাম। আমাদের এক সাথী মাথায় পাথরের আঘাত পেয়েছিলেন। আঘাতের জখম ছিলো তাঁর মাথায়। এমতাবস্থায় তাঁর স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো। তিনি সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কী বলো? আমার জন্য তায়াম্মুম বৈধ হবে কি? সাথীরা বললেন, আমাদের ধারণায় বৈধ হবে না। কেননা, তুমি পানি ব্যবহার করতে অসমর্থ নও। তিনি গোসল করলেন এবং গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। রসুল স. এই সংবাদ পেয়ে বললেন, তোমরাই তাকে মেরে ফেলেছো। তোমরা যা জানোনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিলে না কেনো? তার জন্য তো তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিলো। অথবা জখমের উপর পট্টি বেঁধে শরীরের বাকী অংশ সে ধৌত করে নিয়ে পট্টির উপর মোসেহ্ করতে পারতো। দারা কুতনী, ইবনে জাওজী।

মাসআলাঃ একবার তায়াম্মুম করে নিলে পবিত্রতা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত যতো ইচ্ছা নামাজ পড়তে পারবে। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন নতুন তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই। তবে পানি পেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহ্মদের অভিমত হচ্ছে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করে নিতে হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে, রসুল স. বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের ওজু, যদিও দশ বৎসর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়। হজরত আবু জর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি—যাতে বলা হয়েছে, এক তায়াম্মুম দ্বারা এক ওয়াক্তের অধিক নামাজ না পড়াই সুন্নত। দারা কুতনী, বায়হাকী। রাফেয়ী বলেন, যখন এ বক্তব্যে

'মিনাস্ সুন্নাতে' উল্লেখ রয়েছে, তখন এর অর্থ রসুল স. এর সুন্নতই হবে। কাজেই হাদিসটি মারফু প্রকৃতির। এ প্রসঙ্গে হজরত আলী থেকে ইবনে শায়বা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, হজরত আমর বিন আ'স প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য পৃথক তায়াম্মুম করতেন এবং এরকম করার নির্দেশ দিতেন— কাতাদা থেকে এরকম বর্ণনা এনেছেন দারা কুতনী। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করে নিতেন।

আমরা বলি, এ সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসের সনদভূত আবু ইয়াহহিয়া এবং হাসান বিন আম্মারাহ্কে মাতরুক বলেছেন ইবনে জাওজী। হাসান বলেছেন, তারা অত্যধিক দুর্বল। হজরত আলীর বর্ণনাসূত্রের অন্তর্ভুক্ত হাজ্জাজ বিন আরতাতকে মাতরুক আখ্যা দিয়েছেন ইবনে মাহ্দী ও কাত্তান। তাদের বর্ণনা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না —এরকম মন্তব্য করেছেন আহমদ ও দারা কুতনী। ইবনে মুঈন এবং নাসাঈ বলেছেন, তারা বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিশালী নয়। হজরত আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত আসারটির বর্ণনাসূত্রটি একারণে বিপর্যস্ত যে, তার সঙ্গে কাতাদার রয়েছে অনেক ব্যবধান। আর হজরত ইবনে ওমর থেকে আসারটির বর্ণনাসূত্রের আমের আহওয়াল সম্পর্কে হাদিস বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য রয়েছে বিভিন্ন রকম। তাকে ইমাম আহমদ বলেছেন দুর্বল। আবু হাতেম ও মুসলিম বলেছেন বলিষ্ঠ। শেষ কথা এই যে, এ সকল বর্ণনা মারফু হাদিসের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়। তাই আমরা প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করাকে মোস্তাহাব বলে থাকি। হজরত ইবনে আব্বাস যে সুন্নতের কথা বলেছেন, তা মোস্তাহাব অর্থেই। সুন্নতে রসুলুল্লাহ বা ওয়াজিব অর্থে নয়।

মাসআলাঃ যদি পানি অথবা পাক মাটি কোনটাই না পাওয়া যায়, তবে ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— নামাজ পড়বে না। তবে পরে এর কাজা অবশ্যই আদায় করতে হবে। ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে নামাজ ছেড়ে দেবে, আর পরে কাজাও আদায় করতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই অবস্থাতেই নামাজ পড়ে নেবে। পরে পানি পেলে দ্বিতীয়বার নামাজ পড়া ওয়াজিব হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, এই অবস্থাতে নামাজ পড়বে, পরে পড়া ওয়াজিব হবে না। আমাদের (হানাফিদের) দলিল এই যে, আয়াতে বলা হয়েছে জানাবাতের অবস্থায় নামাজের নিকটে যেয়ো না। এখানে অপবিত্রাবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে গোসল পর্যন্ত, যদি পানি পাওয়া যায়। না পেলে তায়াম্মুম করতে হবে। গোসলও করতে পারে না অথবা তায়াম্মুমও করতে পারে না, যদি এরকম অবস্থা হয় তবুও নিষিদ্ধতা বলবৎ থাকবে। কাজেই নামাজ পড়বে না। যদি কেউ বলে মুসাফির এই নিষিদ্ধতার বাইরে, তখন আমরা বলবো, তায়াম্মুমকারী মুসাফির অবশ্যই এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে। এরকম না হলে তায়াম্মুম ছাড়াই মুসাফিরের জন্য নামাজ পড়া জায়েয

হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী যুক্তি দিয়েছেন, এ রকম মুসাফির সম্পূর্ণতঃই এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে। তাই তাদের জন্য তায়াম্মুম ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে, আর তায়াম্মুম ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হিসেবে এসেছে পবিত্র মাটি। মাটি পেলে তায়াম্মুম করবে, না পেলে তায়াম্মুমের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। (তাই তিনি তায়াম্মুম ব্যতিরেকে নামাজ পড়ে নেয়ার কথা বলেছেন)। কিন্তু আমরা আমাদের দলিল হিসাবে ওই হাদিসটি তুলে ধরেছি যেখানে বলা হয়েছে—রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ পবিত্রতা ব্যতীত কোনো নামাজ কবুল করবেন না। তিরমিজি।

কেউ যদি বলে এই হাদিসের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম, পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ্ তারই নামাজ কবুল করবেন না—তবে আমরা বলবো, এতে করে অপব্যাখ্যা করা হবে। হাদিসের স্পষ্ট অর্থ অপেক্ষা অনুমানকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল ওই হাদিসটি, যার বর্ণনা এরকম—হজরত আম্মার বিন ইয়াসার হজরত ওমরকে বলেছিলেন, আপনার কি ওই ঘটনার কথা মনে আছে—আপনি ও আমি সফরে ছিলাম। তখন আমাদের দু'জনেরই গোসল ফরজ হয়ে গিয়েছিলো। আমি তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে শরীরে মাটি লাগিয়ে নিলাম এবং নামাজ পড়লাম। আপনি পড়লেন না। পরে রসুল স. এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি বলেছিলেন, আমার জন্য ওইটাই ছিলো যথেষ্ট। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসে দেখা যায়, রসুল স. হজরত ওমরকে পরে পরিত্যক্ত নামাজ পাঠ করার কথা বলেননি।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের সমর্থনে হজরত আয়েশার হাদিস পেশ করেছেন। হজরত আয়েশা হজরত আসমার গলার হার ধার নিয়েছিলেন। ওই হার সফরের সময় হারিয়ে গেলো। হার অনুসন্ধানের জন্য রসুল স. কতিপয় সাহাবীকে নিযুক্ত করলেন। ইত্যবসরে নামাজের সময় হলো। তখন সাহাবীগণ ওজু ছাড়াই নামাজ পড়ে নিলেন। কারণ, তাঁরা তখন পানি পাননি। পরে রসুল স. এর নিকট হাজির হয়ে তাঁরা এই ঘটনাটি বললেন। ওই সময় অবতীর্ণ হলো তায়াম্মুমের আয়াত। উসাইদ বিন হুদাইর হজরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনি সমস্যায় পড়লে এরকম কখনো হবে না যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁর সমাধান না দিবেন এবং মুসলমানদেরকে এর বরকত না দিবেন। বোখারী, মুসলিম।

দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। সকাল হয়ে গেলো। তবু পানি পাওয়া গেলো না। অতঃপর তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো। সবাই তায়াম্মুম করলেন। রসুল স. এর নকীব হজরত উসাইদ বিন হুদাইর বললেন, হে আবু বকরের বংশধর এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। হজরত আয়েশা বলেন, আমার বাহন উটটি উঠে পড়তেই তার নিচে হারানো হারটি পাওয়া গেলো। এই হাদিস সম্পর্কে আমরা বলি যে, এতে আমাদেরই মতের সমর্থন

রয়েছে। কেননা এর মধ্যে এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসুল স. ওজু ছাড়া নামাজ পড়েছেন। এরকম করেছিলেন সাহাবীগণ। তিনি করেননি। আর এ ব্যাপারে রসুল স. এর স্বতন্ত্র কোনো বক্তব্যও নেই। ওজু ছাড়া নামাজ যদি জায়েযই হতো, তবে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সকলে তায়াম্মুম করতেন না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওজু ছাড়াই নামাজ ওয়াজিব ছিলো। পরে পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব হবে এ রকম চিন্তা রীতিবিরুদ্ধ। কারণ, সুনির্দিষ্ট ওয়াক্ত না হলে ওয়াজিব তো হতে পারেই না। এবার ইমাম মালেকের অভিমতটি পর্যালোচনা করা যাক। তিনি বলেছেন, নামাজ পড়বে না। পরে কাজা আদায়ও করতে হবে না। কারণ, ব্যক্তি এখানে দোষী নয়, তাই কাজা আদায় করাও তার জন্য ওয়াজিব নয়। এই অভিমতটি ভুল। কেননা রসুল স. বলেছেন, যে নামাজ বাদ পড়ে যায় তার কাজা আদায় করে নিও। এখানে কার দোষে কেনো নামাজ বাদ পড়লো। সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। নিদ্রিত ব্যক্তির ব্যাপারটিও সেরকম। ঘুমের কারণে নামাজের ওয়াক্ত চলে গেলে সে দোষী হবে না। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর তাকে কাজা আদায় করতেই হবে।

আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী। তায়াম্মুমের নির্দেশ প্রদানকারী। তিনি তোমাদের প্রতি অত্যুচ্চ অনুগ্রহ দান করেছেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তাই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নেশাসক্ত অবস্থায় এবং জানাবাত অবস্থায় নামাজ পড়ার কারণে যে ত্রুটি তোমাদের হয়েছে, তা তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ
أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ○ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ○

❒ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে, এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও ইহাই তাহারা চাহে।

❒ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানেন। অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন, রেফায়া বিন জায়েদ বিন তাবুত ছিল ইহুদীদের এক বড় সর্দার। সে রসুল স. এর মুখোমুখী হলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতো, হে মোহাম্মদ! আপনি কিছুক্ষণ আমার

দিকে আপনার শ্রুতি নিবদ্ধ করুন, যেনো আমি আপনাকে জ্ঞানদান করতে পারি। এরপর সে ইসলামের দোষ বর্ণনা করতো। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই। আয়াতে সাধারণভাবে সকল ইহুদীকে সম্বোধন করা হয়েছে। সম্বোধনের মাধ্যম হচ্ছে তাদের সর্দার।

এরশাদ হয়েছে, হে শ্রোতা! আপনি কি লক্ষ্য করেননি ওই সকল লোককে যাদেরকে দেয়া হয়েছে কিতাবের কিছু অংশ। ওই সকল লোক বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মদীনার ইহুদীদেরকে। 'নছিবান' এর তানভিন (দু' জবর) তাদের নিকৃষ্টতাকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল কিতাব বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তওরাতকে। তওরাতের কিছু অংশ অর্থ আক্ষরিক অংশ। অভ্যন্তরীণ অংশ অর্থাৎ তওরাতে বিশ্বাস এবং তওরাত বুঝবার ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়নি। তাদের ভাগ্যে জুটেছিলো কেবল তওরাতের মৌখিক আবৃত্তি। তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকে আহরণ করে নিয়েছে। প্রথমে তাদের বিশ্বাস ছিলো আখেরী জামানায় প্রেরিত হবেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী) নবী। সেই নবীর অসিলায় তারা বিজয়ের জন্য প্রার্থনাও করে আসছিলো। কিন্তু সেই নবী যখন তাদের সম্মুখে এলেন, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো। বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করলো। অবিশ্বাসকে মান্য করলো। আর তারা এই অভিপ্রায়ও অন্তরে পোষণ করতে লাগলো যে, মুসলমানেরাও যেনো তাদের মতো পথহারা হয়ে যায়। 'আলাম তারা' বলে রসুল স. কে প্রশ্নাকারে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, হে নবী এবং নবীর উম্মতেরা তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছো এবং এ বিষয়েও সম্যক অবগত আছো যে, ইহুদীরা তোমাদের প্রতি কিরূপ শত্রুতাপরায়ণ। এ কথা তারা ভালোভাবেই জানে, তোমরাই সত্যানুসারী। কিন্তু তারা তোমাদেরকে মানে না। তারা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। সুতরাং তোমরা কখনোই তাদেরকে তোমাদের কল্যাণকামী মনে কোরো না।

আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। কর্মবিধায়ক। তিনি তাদের সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। আর আল্লাহ্র সাহায্য রয়েছে তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। অভিভাবক হিসাবেও যথেষ্ট। কাজেই তোমরা অভিভাবক এবং সাহায্যকারী হিসেবে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হও। অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক বানিয়ো না। অন্যত্র সাহায্যপ্রার্থীও হয়ো না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৬

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ۭ
وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ
وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

❒ ইহুদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলির অর্থ বিকৃত করে এবং বলে, 'শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম এবং শোন না শোনার মত;' আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করিয়া এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বলে, 'রায়িনা'। কিন্তু তাহারা যদি বলিত 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম এবং শ্রবণ কর ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর' তবে উহা তাহাদের জন্য ভাল ও সংগত হইত। কিন্তু তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। তাহাদের অল্পসংখ্যকই বিশ্বাস করে।

ইহুদীদের কিছু লোক তওরাতের শব্দগুলোকে স্থানচ্যুত করে দেয়। 'আল কালেমা' অর্থ কথা অথবা কথাগুলো। যারা এর অর্থ কথাগুলো (বহুবচন) বলে থাকেন তাদের মত হচ্ছে— এ শব্দটির পূর্বে আরও বিভিন্ন শব্দ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ তারা বিভিন্ন শব্দ অথবা বিভিন্ন কথা স্থানচ্যুত করে ফেলেছে। আল্লামা তাফতাজানী 'আলকালাম' শব্দটিকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, যারা শব্দটিকে বহুবচন বলেন না তাদের বক্তব্য হচ্ছে শব্দটি অভিধানসম্মত নয়। আর যারা বহুবচন বলেন, তাদের কথা হচ্ছে অভিধানসম্মত না হলেও এর অর্থগত দিকটি বহুবচনই হবে। সুতরাং, প্রকৃত অর্থ হবে এরকম, পবিত্র তওরাতে আল্লাহ্ যে শব্দাবলী অবতীর্ণ করেছেন, ইহুদীরা সেগুলোকে স্থানচ্যুত করে ফেলেছে। রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা সমূহকে তারা তওরাত থেকে সরিয়ে ফেলেছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেন, তওরাতে হজরত মোহাম্মদ স. এর পবিত্র আকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা ছিলো এরকম–– তাঁর আঁখি যুগল সুরমাশোভিত এবং প্রশস্ত, পবিত্র কেশ একই সঙ্গে সরল ও বঙ্কিম এবং চিত্তাকর্ষক। রসুল স. মদীনায় এলে তাঁকে দেখে ইহুদী আলেমেরা হিংসার আগুনে জ্বলতে শুরু করলো। তারা তখন তওরাতের বর্ণনা পরিবর্তন করে ফেললো। বললো, আমরা এরকম আকৃতি বিশিষ্ট নবীর প্রমাণ পাইনি। সেই প্রতিশ্রুত নবী হবেন দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট, নীল চোখ এবং অবিন্যস্ত চুলের অধিকারী। তারা তাদের অধীনস্তদেরকে বললো, ইনি সেই নবী নন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিলো তাদের উপার্জনের সম্পর্ক। তারা আশংকিত হলো এই ভেবে যে, সাধারণ ইহুদীরা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এহেন প্রতারণাকে আশ্রয় করলো তারা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা রসুল স. এর কাছে কিছু প্রশ্ন করতো। তিনি যথা উত্তর দিতেন। উত্তর শুনে মনে হতো তারা বুঝি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং রসুল স. এর কথা মেনে নিয়েছে। কিন্তু পৃথক হওয়ার পর তারা রসুল স. এর কথাকে বিকৃত করে ফেলতো। আয়াতে সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধু তওরাতের বাণীবৈভবকেই বিকৃত করতো না, রসুল স. এর কথামৃতকেও পরিবর্তন করে ফেলতো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কথার প্রবৃত্তিপ্রসূত ব্যাখ্যা— যে রকম ব্যাখ্যা করে থাকে এই উম্মতের বেদাতী সম্প্রদায় কোরআনের তাফসীরের নামে। কথা পরিবর্তনের আর একটি

উপায় অবলম্বন করতো তারা, তা হচ্ছে— দ্ব্যর্থবোধক বাক্যাবলীর ব্যবহার। যে সকল বাক্যের প্রশংসা ও অপ্রশংসা, সম্মান ও অসম্মান দু'রকমের ব্যাখ্যাই করা যায়। প্রকাশ্যে প্রশংসা এবং অন্তরালে অপবাদ—এই ছিলো তাদের রীতি। তারা বলতো আমরা শুনলাম, কিন্তু মানলাম না। এতে করে বুঝা যায়, তারা রসুল স. এর কথাকে বিকৃত করতো। তারা তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে বলতো, আমরা মোহাম্মদের কথা শুনেছি, কিন্তু মানি নাই। 'সামীয়না' শব্দের অর্থ শুনলাম। এরকম সংক্ষিপ্ত স্বীকৃতির দু'রকম অর্থ হতে পারে—১. শুনলাম (মান্য করলাম) ২. শুনলাম (কিন্তু মান্য করলাম না)। প্রথম অর্থটি ছিলো তাদের মৌখিক এবং দ্বিতীয়টি ছিলো আন্তরিক।

'শোনো, না শোনার মত'—এ কথার ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, ইহুদীরা রসুল স. কে বলতো শোনো, অন্তরে বলতো তিনি যেনো না শুনতে পান। তারা অন্তরে অন্তরে বদ-দোয়া করতো রসুল স. যেনো বধির হয়ে যান এবং মরে যান। না শোনার মতো শোনো— এ কথাটিরও বিভিন্ন রকম অর্থ হয়। একথায় সম্মান ও বদ-দোয়া উভয়টিই বুঝায়। এই অর্থে সম্মান বুঝা যায় যে, মন্দ কথা যেনো না শোনো। যেমন এরকম বলা হয়, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে খুব শুনিয়েছে (মন্দ কথা বলেছে অথবা গালি দিয়েছে)— এরকম কথা না শোনার মতো করে শোনা। আর বদ-দোয়া হবে এই অর্থে যে, শোনার ক্ষমতা যেনো তোমার অপসৃত হয়। যেনো তুমি বধির হয়ে যাও অথবা মরে যাও ইত্যাদি। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আমাদের কথা শোনো। আমরা বদ-দোয়া করছি, আমরা এমন কথা শোনাবো না, যার দ্বারা তোমরা খুশী হয়ে যেতে পারো। আর এক রকম অর্থ হতে পারে এ রকম—আমাদের কথা তোমরা না শোনার মত করেই শোনো, কারণ তোমাদের কান এ রকম শুনতে পছন্দ করে না।

আর একটি শব্দ তারা ব্যবহার করতো 'রায়িনা'— এ শব্দটিও বহু অর্থবোধক। আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন। ইবরানী এবং সুরিয়ানী ভাষায় এই শব্দটি একটি গালি। ইহুদীরা একে অপরকে এই শব্দের মাধ্যমে গালি দিতো। এই শব্দটির মাধ্যমে রসুল স.কে অপমান করা এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। এ শব্দটি তারা উচ্চারণ করতো জিহবা কুঞ্চিত করে অর্থাৎ মুখ বিকৃত করে, সত্যমিথ্যা মিশ্রিত করে, প্রকাশ্য মর্যাদার সঙ্গে অপ্রকাশ্য অমর্যাদাকে মিশিয়ে। তারা মনে করতো রসুল স. যদি সত্যিই নবী হতেন, তবে তাদের এই দ্ব্যর্থবোধক বাক্যাবলী ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করতে পারতেন। আল্লাহ্ বলেছেন, কতোইনা উত্তম হতো, যদি তারা অমন অপআচরণ ছেড়ে দিয়ে এ রকম বলতো, আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম এবং আরও বলতো আমাদের কথা শোনো এবং আমাদের দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করো।

একটি ধারণাঃ এই আয়াতে 'অভিসম্পাত' কথাটি উল্লেখ করে বেইমান ইহুদীদের আকৃতি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা থেকে

এর সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম এই আয়াত শুনে তাঁর গৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গৃহে না গিয়ে পুনরায় তিনি রসুল পাক স. এর সকাশে হাজির হলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! আমার ভয় হচ্ছিলো গাধায় পরিবর্তিত হওয়ার আগে হয়তো আমি আপনার খেদমতে হাজির হতে পারবো না—এই বলে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। হজরত কাব আহবার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—হজরত ওমরের জামানায় তিনি এই আয়াত শোনার সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই আয়াতের অভিসম্পাতের শাস্তি যেনো আমার উপর পতিত না হয়। সকল ইহুদী এখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি, আর আল্লাহ্র অভিসম্পাতও বাস্তবায়িত হয়নি— এর কারণ কী?

ধারণার অপনোদনঃ অভিসম্পাতের এই শাস্তি অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিয়ামতের পূর্বে ইহুদীদের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আয়াতে উল্লেখিত এই শাস্তির শর্ত ছিলো যে, ইহুদীর মধ্যে কেউ যদি ইমান গ্রহণ না করে, তবেই কেবল অভিসম্পাত কার্যকর হবে। কেউ কেউ ইমান গ্রহণ করলে শাস্তি বলবৎ হবে না। তাদের কারণে ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর আর আযাব আসবে না। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, এখানে দু'টি আযাবের যে কোনো একটি আপতিত হওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। আকৃতি পরিবর্তনের অভিসম্পাত এবং শুধুই অভিসম্পাত (লানত)। আকৃতি পরিবর্তন না হলেও সাধারণ অভিসম্পাত অবশ্যই পতিত হবে।

আমরা বলি, কাফের ইহুদীদের আকৃতি পরিবর্তিত হবে কিয়ামতের দিন। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে ইবনে আসাকের এবং খতিব লিখেছেন, রসুল স. 'যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে সমবেত হবে'— এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন, আমার উম্মত কিয়ামতের সময় দশ রকম আকার ধারণ করবে। একদল পাবে বানরের আকৃতি, আরেক দল পাবে শুকরের আকৃতি। একদল পাবে কুকুরের— আরেক দল পাবে গাধার আকৃতি। কিন্তু তারা ছিলো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। তাই তাদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্যবিহীন ছেড়ে দিয়েছেন এবং দূরে সরিয়ে দিয়েছেন হেদায়েত থেকে।

ইহুদীদের অল্প কয়েকজন ছাড়া অন্য সকলে অবিশ্বাসে অনড় থাকবে। তাই আয়াতের শেষ দিকে আল্লাহ্তায়ালা উল্লেখ করেছেন 'তাদের অল্পসংখ্যকই বিশ্বাস করে।' এই অল্পসংখ্যক'দের মধ্যে রয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং তাঁর কতিপয় সঙ্গী। আল্লামা তাফতাজানী বলেছেন, এই অল্পসংখ্যক (ইল্লা কালিলান) ছাড়া বাকি সকলকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দিয়েছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে ইসহাক লিখেছেন, আবদুল্লাহ্ সুরীয়া, কাব বিন উসাইদ এবং তাদের মতো আরও কয়েকজন ইহুদী আলেমকে রসুল স.

বলেছিলেন— তোমরা তো ভাল করেই জানো, আমি যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি তা সম্পূর্ণরূপে সত্য। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ! আমরা এ রকম কিছু জানি না, আমাদের কিতাবে এ রকম কিছু নেই। আমাদের কিতাবে যে নবীর কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তুমি সে নবী নও। তাদের এহেন মিথ্যাচারিতার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৭

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ○

❒ তোমাদের যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তোমরা তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদিগকে এমনভাবে পথভ্রষ্ট করার পূর্বে যখন তোমরা আর কখনও বিশ্বাস করিবে না; অথবা শনিবার-অমান্যকারীদিগকে যেরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলাম সেইরূপ তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিবার পূর্বে। আল্লাহের আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

এরশাদ হয়েছে, হে আহলে কিতাব! তোমরা কোরআনকে মেনে নাও যা আমি অবতীর্ণ করেছি মোহাম্মদ এর উপর। এই কিতাব তোমাদের উপর অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক এবং স্বীকৃতিদাতা। আর কখনো তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না— এরকম অবস্থা আসার আগেই বিশ্বাস স্থাপন করো। এই হেদায়েতটির শাব্দিক অর্থ এরকম—তোমাদের মুখগুলো যখন আমি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবো, ওরকম অবস্থা আসার আগেই বিশ্বাস স্থাপন করো। 'উজুহান' শব্দটিতে তানবীন সংযোজিত হয়েছে সম্বন্ধ পদের কারণে। এখানে মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়া বা চেহারা পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে—চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া। অর্থাৎ নাক, চোখ, মুখ ও সম্মানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। আলেমগণ বলেছেন, 'নারুদ্দুহা আলা আদবারিহা'— এর অর্থ মুখের উপর গাধার মতো পশম সৃষ্টি করে দেবো, যেমন বানরের মুখ চুল বিশিষ্ট হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, ইতোপূর্বে আমি তোমাদের চেহারাকে উটের মুজে'র মতো করে দিয়েছি। কাতাদা এবং জুহাক বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে—দৃষ্টিহীন করে দেয়া। চেহারা অর্থ এখানে চোখ। মুজাহিদ বলেছেন, আকৃতি পরিবর্তন হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়া, অন্তর্বিকৃতি ঘটে যাওয়া এবং দৃষ্টিবিভ্রম হওয়া। এই অর্থ করা হলে ইমান গ্রহণের পূর্বে ইহুদীরা শুদ্ধ পথেই ছিলো বলে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ইবনে জায়েদ

বলেছেন, চেহারা পরিবর্তন হওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা তাদেরকে মদীনা থেকে নিশ্চিহ্ন করবো। যেখান থেকে তারা এসেছিলো তাদেরকে সেদিকেই তাড়িয়ে দেবো। এরকমই হয়েছে। বনী নাজিরকে নির্বাসিত করা হয়েছে শামদেশে, আজরায়াতে এবং আরিহায়। অথবা এই আয়াতে ওই অভিসম্পাতের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে অভিসম্পাত আল্লাহতায়ালা দিয়েছিলেন হজরত দাউদ ও হজরত ঈসার মাধ্যমে। হজরত দাউদের সময় শনিবার ছিলো বিশ্রাম দিবস। ওই দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিলো। ওই নিষেধাজ্ঞা ইহুদীরা অমান্য করেছিলো— তাই তাদের প্রতি নেমে এসেছিলো আকৃতি পরিবর্তনের আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ শামদেশের কিছুসংখ্যক বনী ইসরাইল সমুদ্রতীরে বসবাস করতো। মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা। শনিবার ছিলো তাদের বিশেষ ইবাদতের দিন। নির্দেশ ছিলো, ওই দিন তারা কোনো পার্থিব কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। কিন্তু শনিবারেই অত্যধিক মৎস্য সমাগম হতো। সপ্তাহের অন্য ছয়দিন তেমন হতো না। এটা ছিলো তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার পরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত তারা সংযম প্রদর্শন করতে পারলো না। লোভের বশবর্তী হলো। কৌশল অবলম্বন করলো তারা। তীরভূমিতে বড় বড় পুকুর খনন করলো। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিতে ভরে যেতো পুকুরগুলো। সেই সঙ্গে মাছও এসে জমা হতো পুকুরগুলোতে। শনিবার তারা মৎস্য শিকার করতো না বটে— কিন্তু রবিবারে তারা সেগুলোকে ধরে ফেলতো। নবী এবং দ্বীনদার আলেমগণ তাদেরকে এমতো কৌশলানুসারী হতে বারণ করলেন। কিন্তু তারা মানলো না। দুনিয়াদার আলেমেরা তাদের এই অপকর্মকে সমর্থন করে বসলো। কেউ কেউ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, কিন্তু তাদেরকে নিষেধ করলো না এবং তাদের কাজে শরীকও হলো না। শেষ পর্যন্ত সত্যানুসারীরা ছাড়া অন্য সকলের (অপকর্মকারী এবং তাদের সরব ও নীরব সমর্থনকারীদের) উপর নেমে এলে আযাব। আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেলো তাদের। সকলেই পরিণত হলো বানরে।

আল্লাহ্র হুকুম অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। কেউ একে বাধা দিতে পারে না। হজরত আবু আইয়ুব আনছারী থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং তিবরানী লিখেছেন— এক ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র পাপাসক্ত। কিছুতেই সে পাপ থেকে নিবৃত্ত হয় না। রসুল স. বললেন, সে কি ধর্মের কাজ করে? লোকটি বললেন, সে নামাজ পড়ে এবং আল্লাহর এককত্বকে স্বীকার করে। রসুল স. বললেন, তার দ্বীন ক্রয় করো। তাকে বলো, সে যেনো তার দ্বীন তোমাকে দান করে দেয়। অর্থাৎ তাকে বলো সে যেনো তার ধর্মাচরণ— নামাজ, তৌহিদ ইত্যাদি— তোমার কাছে বিক্রয় করে দেয় যদি এতে সে অস্বীকৃত হয় তবে এটাই প্রমাণিত হবে যে, দুনিয়া অপেক্ষা দ্বীনই তার কাছে প্রিয়)। লোকটি রসুল স. এর নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তার ভ্রাতুষ্পুত্র তার কথায় সম্মত হলো না। তখন ওই ব্যক্তি পুনরায় রসুল পাক স. এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি দেখলাম দ্বীনের ব্যাপারে সে অত্যন্ত লোভী। এর পর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

❑ আল্লাহ্ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহের শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।

আল্লাহ্তায়ালা ওয়াজিবুল ওজুদ (অবশ্যম্ভাবী-অস্তিত্ব)। তিনি আজালী (শাশ্বত), আবাদী (চিরবিদ্যমান) এবং লা ফানী (অবিনাশী)। তিনি ছাড়া উপাস্য কেউ নেই। সুতরাং কেউ যদি তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়, তবে সে শিরিক করলো। মৃত্যু পর্যন্ত সে যদি এই শিরিকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। জীবদ্দশায় এই শিরিক থেকে যদি সে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এটাই ওলামাদের ঐকমত্য।

পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী এমন, যেনো সে কখনও পাপ করেইনি। আল্লাহ্পাক বলেছেন 'হে মোহাম্মদ স.! আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, যদি তারা অবিশ্বাস থেকে বিরত থাকে তবে তাদের অতীত অবিশ্বাস ও পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' সে পাপ ছোট হোক বা বড় হোক, ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায়। পাপী (মুশরিক নয়) তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তাকে ক্ষমা করা না করা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। এ কথার মাধ্যমে মারজিয়া নামক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অভিমত ভুল প্রমাণিত হলো। তাদের অসৎ বিশ্বাস ছিলো এই যে, বিশ্বাসীদের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করা আবশ্যিক। তারা বলে, ইমান থাকলে গোনাহ্ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যেমন শিরিক থাকলে পুণ্য কর্ম দ্বারা কোনো লাভ হয় না। এ সম্পর্কে আর এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় মোতাজিলাদের অভিমত হচ্ছে, ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য তওবা করতেই হবে—এ রকম কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। তাই, তওবাকারীর ক্ষমাপ্রাপ্তির সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, মুশরিক এবং পাপী ইমানদারদের পার্থক্য নির্দেশ করা এই আয়াতের উদ্দেশ্য। বিনা তওবায় মারা গেলে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করা হবে না, কিন্তু পাপী ইমানদারের ক্ষমা আল্লাহ্র ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

খারেজীদের অভিমত আরও ভয়াবহ। তারা বলে কোনো পাপীরই ক্ষমা হবে না। শিরিক হোক বা অন্য যে কোনো প্রকারের গোনাহ্ হোক। সকল গোনাহ্র জন্যই নির্ধারিত রয়েছে সার্বক্ষণিক দোজখ (গোনাহ্র ক্ষমা হবেই না)। কিন্তু এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাদের অভিমতের প্রতিকূল। আবু ইয়া'লী, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আদী বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে হজরত ইবনে ওমরের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এ রকম— প্রথম দিকে আমরা কবীরা গোনাহকারীদেরকে ক্ষমাপ্রার্থনা (ইস্তেগফার) করতে নিষেধ করতাম। পরে আমরা এ থেকে বিরত হলাম রসুল স. এর নিকট

থেকে এই আয়াতের তেলাওয়াত শুনে। রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের কবীরা গোনাহকারীদের জন্য শাফায়াত প্রার্থনাকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছি। আভ্যন্তরীণ কামনা বাসনা মুক্ত হওয়ার জন্য তাদের পক্ষে আমি দোয়া করি এবং দোয়া কবুল হওয়ার আশাও করি।

কালাবীর মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওয়াহ্শী বিন হারব এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে। ওয়াহ্শী হজরত হামজাহকে শহীদ করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। মুক্তির অঙ্গীকার পেয়ে তিনি হজরত হামজাহকে শহীদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মক্কাবিজয়ের পর চরম অনুশোচনায় পড়ে গেলেন তিনি এবং তার সঙ্গী সাথীরা। তাঁরা নবীপাক স. কে লিখে জানালেন, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমরা মুসলমান হতে চাই। কিন্তু কী লাভ হবে মুসলমান হয়ে? কারণ, আপনার মক্কা অবস্থানকালে আমরা আপনাকে তেলাওয়াত করতে শুনেছি 'এবং যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো উপাসককে ডাকবে না (কেবল তারাই মুক্তি পাবে)।' এখন আমাদের উপায় কী? আমরা তো এতোদিন গায়ের আল্লাহ্র ইবাদত করেছি। অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি এবং ব্যভিচারী হয়েছি। তখন অবতীর্ণ হলো— 'কিন্তু যারা তওবা করে এবং পুণ্য কর্ম করে।' রসুল স. আগের আয়াত এবং এই আয়াতটি লিখে ওয়াহশী এবং তাঁর সাথীদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা পুনরায় রসুল স. কে লিখলেন, এই শর্ত বড়ই কঠিন। আমরা তো কোনো পুণ্য কর্ম করিনি। তাই আমরা ভীতসন্ত্রস্ত। অতঃপর, অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি— 'আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন।' এই আয়াতটিও রসুলপাক স. লিখে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা জানালেন, এই আয়াতে তো ক্ষমা লাভ আল্লাহর ইচ্ছাধীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের ভয় হয় আমরা হয়তো তাদের অন্তর্ভূত হবো না, যাদেরকে আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করতে ইচ্ছে করবেন। এরপর নাজিল হলো এই আয়াত— 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমাতিক্রম করেছো......... আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।' রসুলপাক স. এই আয়াতও পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা তখন সকলেই রসুল স. এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। রসুল স. বললেন, এবার বলো তুমি কীভাবে হামজাকে হত্যা করেছো। ওয়াহশী হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ দিলেন। তিনি স. বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি আমার সামনে আর এসো না। ওয়াহশী তখন চলে গেলেন শামদেশে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। এ রকম সন্দেহ উত্থাপিত হতে পারে যে, নিশ্চিত ক্ষমাপ্রাপ্তির এই আয়াতটির মাধ্যমে 'যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন'— ওই আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে। আর এতে করে মারজিয়াদের অভিমতই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ তাদের বক্তব্য হচ্ছে, মুমিনদের জন্য মাগফিরাত (ক্ষমা প্রদান) ওয়াজিব। এই সন্দেহের প্রেক্ষিতে আমরা বলবো, কথিত আয়াতটি রহিত হয়নি। কারণ, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হতে পারে না। কাজেই 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমাতিক্রম করেছো'—এই আয়াত দ্বারা কেবল এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ কেবল হজরত ওয়াহশী এবং তাঁর সাথীদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন।

হজরত ইবনে ওমরের উক্তি বাগবী এবং আবু মোযলাজ এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যখন 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমাতিক্রম করেছো......'—এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে শিরিকের বিষয়ে জানতে চাইলেন। রসুলপাক স. নিরুত্তর রইলেন। ওই ব্যক্তি বার বার একই প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন নাজিল হলো এই আয়াতটি।

মুতরাফ বিন আবদুল্লাহ বিন শাখিরের মাধ্যমে বাগবী হজরত ইবনে ওমরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এ রকম— রসুল স. এর জামানায় কবীরা গোনাহ্কারী কেউ মৃত্যুবরণ করলে আমরা তাকে দোজখী বলতাম। তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। আয়াত নাজিলের পর আমরা আর ওইরূপ অসৎ উক্তি করতাম না। বাগবী আরও লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, এ আয়াত কোরআনের সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ আয়াত।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত জাবের থেকে আবু ইয়া'লী, ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন— যে বান্দা শিরিকবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাকে ক্ষমা করা হবে। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাকে আযাব ছাড়াই মাগফিরাত (ক্ষমা) করবেন। আর যদি ইচ্ছে করেন, তবে তাকে শাস্তি দিবেন (শাস্তির মেয়াদ শেষে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)। আয়াতে এ কথাই স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরিককারীকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, কিন্তু শিরিক ব্যতীত অন্যান্য পাপে লিপ্তদেরকে ইচ্ছে করলে ক্ষমা করবেন। হজরত আনাস থেকে আবু ইয়া'লী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন—যাকে আল্লাহ্ সওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন, সে নিশ্চয়ই সওয়াব লাভ করবে। কিন্তু যাকে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন তাকে তিনি আযাব দিতেও পারেন, নাও পারেন। হজরত সালমান থেকে তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এক প্রকার গোনাহ্ ক্ষমা করবেন না। আর এক প্রকার গোনাহের প্রতিফল না দিয়ে ছাড়বেন না। অন্য আর প্রকারের গোনাহ্ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। ক্ষমাহীন গোনাহ্ হচ্ছে শিরিক । যে গোনাহ্র প্রতিফল তিনি অবশ্যই দিবেন তা হচ্ছে, বান্দার হক নষ্ট করার গোনাহ্। আর আল্লাহ্পাক ক্ষমা করবেন তাদেরকে, যারা আল্লাহর হক নষ্ট করার কাজে লিপ্ত ছিলো।

যে আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক করে সে মহাপাপী। সে অবশ্যই মিথ্যাচারী, যে আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের এবং বৈশিষ্ট্যাবলীর সমকক্ষ হিসেবে কোনো কিছুকে নির্ধারণ করে নেয়। নিঃসন্দেহে শিরিক হচ্ছে জুলুম। শিরিকের তুলনায় অন্যান্য যে কোনো গোনাহ্ নিতান্তই নগন্য। শিরিক বৃহত্তম পাপ—এ কথাই এই আয়াতের শেষ শব্দ 'আজিমা'র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

হজরত জাবের বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন— দু'টি বিষয় অবশ্যম্ভাবী করে দেয়। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! অবশ্যম্ভাবী বস্তু দু'টো কী? তিনি স. বললেন, যে শিরিক না করে মরবে সে জান্নাতে যাবে আর যে শিরিক করে মরবে সে যাবে দোজখে। মুসলিম।

হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি ছিলেন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এবং নিদ্রিত। আমি ফিরে এলাম। পরের বার যখন গেলাম, দেখলাম তিনি জাগ্রত। এরশাদ করলেন, আল্লাহ্র

কোনো বান্দা যদি এ কথা বলে— আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে সে জান্নাতে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল ! যদি সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল ! যদি সে ব্যভিচারী ও চোর হয়? তিনি স. বললেন, যদিও সে ব্যভিচারী ও চোর হয়। আমি আবারও বললাম, হে আল্লাহর রসুল ! যদি সে ব্যভিচারী ও অপহারক হয়—তবু কি সে জান্নাতী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আবু জরের নাসিকা ধূলি ধূসরিত হলেও (আবু জর পছন্দ না করলেও)। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত ইবনে আবী হাতেম, ইকরামা, আবু মালেক, মুজাহিদ প্রমুখের বর্ণনা থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, ইহুদীরা তাদের শিশুদেরকে সাথে নিয়ে নামাজ পড়তো, কোরবানীও করতো এবং দাবী করতো আমাদের কোনো গোনাহ্ এবং ভুলত্রুটি নেই। আমাদের দ্বারা কোনো পাপ হয় না। তারা শিশুদের মতো নিজেদেরকেও নিষ্পাপ মনে করতো। তাদের এ মনোভঙ্গীকে নির্দেশ করে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৯

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

❑ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা নিজদিগকে পবিত্র মনে করে? না, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। এবং তাহাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।

ইহুদীরা পবিত্রতার গৌরব করতে অভ্যস্ত। আয়াতে প্রশ্নাকারে এই বিস্ময়টি প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য সকলের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের এই অনর্থক এবং মূর্খজনোচিত দাবীর উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা তো ওই ব্যক্তি লাভ করবে আল্লাহ যাকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র করবেন। এ হচ্ছে তাঁর নিছক অনুগ্রহ ও দান।

কালাবীর বক্তব্যসূত্রে বাগবী এবং ছা'লাবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বাহরী বিন আমর, নোমান বিন আওফা, মারহাব বিন জায়েদ প্রমুখ ইহুদীদের উদ্দেশ্যে। তারা তাদের শিশুদেরকে নিয়ে একবার রসুলপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। বললো, হে মোহাম্মদ। এ শিশুদের কি কোনো গোনাহ্ আছে? তিনি স. বললেন, না। তারা বললো, আমরা তো এদের মতোই। আমরা দিনে গোনাহ্ করলে রাতে তা মুছে ফেলা হয়, আর রাতে গোনাহ্ করলে দিনে সেগুলোর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। তাদের এই অপবাক্যের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত।

হাসান, জুহাক এবং কাতাদা বর্ণনা করেছেন ইহুদীরা বলতো, আমরা আল্লাহ্র পুত্র এবং প্রিয়পাত্র। খৃষ্টানেরা বলতো, ইহুদী এবং খৃষ্টান ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যাবে না। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে এ আয়াত।

আমি বলি, নির্দিষ্ট একটি প্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে এই আয়াত নাজিল হলেও এর অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আহলে কিতাবগণ (ইহুদী ও খৃষ্টান) নিজেদেরকে নিষ্পাপ বলে থাকে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তারেক বিন শিহাব উল্লেখ করেছেন, ইহুদীদের কোনো কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সকালে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এমন ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হতো যার দ্বারা তাদের জীবন ও সম্পদহানীর আশংকা থাকতো। ধর্মপ্রাণ লোকেরা ওই দুষ্ট লোকদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের অনর্থক প্রশংসা বর্ণনায় লিপ্ত হতো। বলতো আল্লাহর কসম তুমি এরকম, তুমি ওরকম ইত্যাদি। এরপর তারা যখন গৃহে ফিরে আসতো, তখন ধার্মিকতা বলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। এ রকম বলার পর হজরত ইবনে মাসউদ এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

মাসআলাঃ নবী রসুল ব্যতীত অন্য কাউকে নিষ্পাপ (মাসুম) মনে করা জায়েয নয়। কেননা, জ্ঞানছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আল্লাহ্পাক বলেন, কোনো বিষয়ে না জেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরো না। তবে, মুমিনদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখবে। উত্তম ধারণা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু কাউকে নিষ্পাপ বলার অধিকার দেয়া হয়নি। নিজেদেরকে এবং সাথীদেরকে নিষ্পাপ মনে করা একটি অহংকারজাত ধারণা। শরিয়তে এরকম করা নিষিদ্ধ। কারণ, এ সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত হতে পারে না যে, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে কে কতোটুকু অনুগ্রহ লাভ করেছে। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। তিনিই পবিত্র করার ক্ষমতাধারী। তিনি মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ওহী এবং এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি কারোর পবিত্রতার সংবাদ দান করেন তবে তা ব্যক্ত করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, কোনো অবস্থাতেই তা অহংকারপ্রকাশক হতে পারবে না। আত্ম-অহমিকা একটি বৃহৎ কুপ্রবৃত্তি। তাই, রসুল স. তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে সব বিবরণ দিয়েছেন সেগুলোর শেষে বলেছেন, ইহা গৌরব প্রকাশার্থে নয়। যেমন, তিনি স. বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের নেতা—এ কথা গৌরবপ্রকাশক নয়। এ সম্পর্কিত হাদিস সমূহ ইতোপূর্বে সুরা বাকারার তাফসীরব্যপদেশে বর্ণিত হয়েছে। হিংসাসক্ত মুনাফিকেরা রসুল স. সম্পর্কে বলতো তিনি সুষম বণ্টনকারী নন। তিনি স. বলতেন, আল্লাহ্র কসম আমার চেয়ে অধিক ইনসাফকারী তোমরা আর কাউকে পাবে না। এই হাদিস হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী এবং হাকেম। হজরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর মধ্যম বয়সী বেহেশতবাসীদের সর্দার হবেন এবং যুবক বেহেশতিদের সর্দার হবেন

ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন। আর জান্নাতিনীদের নেত্রী হবেন হজরত ফাতেমা। আওলিয়ায়ে কেরামও এলহামের মাধ্যমে এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন হজরত গাউসুল আজম বলেছেন, অলি আল্লাহ্গণের স্কন্ধদেশে স্থাপন করা হয়েছে আমার চরণ।

এরপর বলা হয়েছে, তাদের উপর সামান্য জুলুমও করা হবে না। এর অর্থ হচ্ছে— পবিত্রতা অর্জনের সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিরা তাদের উপযুক্ত বিনিময় লাভ করবে। তাদের প্রতিদান কখনও কম করা হবে না। যে পবিত্রতা লাভের উপযুক্ত, আল্লাহ্ তাকে পবিত্র করবেন। যে উপযুক্ত নয় তাকে করবেন না। আর একটি অর্থ এই যে, যারা দর্পবশতঃ পবিত্রতার দাবী উত্থাপন করে তাদের অপরাধানুসারে শাস্তি নির্ধারণ করা হবে। অপরাধ কমবেশী করে তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

'ফাতিলা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সূঁচের অগ্রভাগ। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ খেজুর দানার অর্ধাংশ। অর্থাৎ সূঁচের অগ্রভাগতুল্য অথবা খেজুর দানার অর্ধাংশতুল্য কোনো জুলুমও আল্লাহ্ কর্তৃক সংঘটিত হয় না। হতে পারে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫০

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

❒ দেখ! তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে; এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে ইহাই যথেষ্ট।

এরশাদ হয়েছে— হে নবী! আপনি দেখুন ইহুদীরা কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবনকারী! তারা নিজদেরকে আল্লাহ্র পুত্র এবং প্রিয়পাত্র বলছে। দাবী করছে, তাদের দিনের পাপ রাতে এবং রাতের পাপ দিনে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাদের এই মহাপাপ সুস্পষ্ট এবং সর্বসমখ্যে প্রকাশিত।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, উহুদ যুদ্ধের পর ইহুদীদের নেতা কাব ইবনে আশরাফ তার সত্তরজন অনুসারী নিয়ে মক্কায় গিয়ে কোরায়েশদের সঙ্গে মিলিত হলো। সে কোরায়েশদেরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করলো। ইতোপূর্বে রসুল স. এর সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকারকে তারা ভঙ্গ করলো। কাব সরাসরি কথা বললো আবু সুফিয়ানের সঙ্গে এবং অন্য কোরায়েশদের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলো তার সঙ্গীরা। মক্কাবাসীরা বললো, তোমরা আহলে কিতাব। মোহাম্মদও আহলে কিতাব। তবে তার বিরুদ্ধে তোমরা চক্রান্ত করছো কেনো? যদি তোমরা আমাদের সাথে মিলিত হয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও, তবে বিশ্বাসভাজনতার প্রমাণ দাও। তোমরা যে আমাদের আস্থাভাজন হবে তার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের প্রতিমাগুলোকে সেজদা করো। কাব তাদের কথামতো প্রতিমাগুলোকে প্রণতি জানালো। তারপর বললো, তোমাদের অন্তরতো প্রশান্ত

হলো, এখন আমাদের মনের প্রশান্তির জন্য এই কাজটি করা হোক। তোমাদের তিরিশজন এবং আমাদের তিরিশজন মিলে কাবা গৃহে দাঁড়িয়ে এই মর্মে শপথ উচ্চারণ করুক যে, আমরা একত্র হয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কোরায়েশরা সম্মত হলো। অনুষ্ঠিত হলো তাদের অসৎ শপথের পাপানুষ্ঠান।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫১

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ○

❒ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল; 'তাহারা জিব্‌ত ও তাগুতে বিশ্বাস করে; তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের সম্বন্ধে বলে যে, ইহাদেরই পথ বিশ্বাসীদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।'

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবীকে জানাচ্ছেন, দেখুন তাদের অবস্থা। তাদেরকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে অথচ তারা আজ প্রণতিপাত জানাচ্ছে জিব্‌ত ও তাগুত মূর্তিদ্বয়কে। তারা এখন সম্পূর্ণতঃই শয়তানের অনুরাগী।

দালায়েল গ্রন্থে বায়হাকী এবং হজরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের মাধ্যমে তিবরানী লিখেছেন, জিব্‌ত ও তাগুতের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইকরামা হতে বর্ণিত হয়েছে, জিব্‌ত ও তাগুত হচ্ছে কোরায়েশদের দু'টি পূজনীয় প্রতিমা। ইকরামার বর্ণনায় আরও রয়েছে, হাবশী ভাষায় জিব্‌ত অর্থ শয়তান। আমি বলি, শয়তানের নামেই সম্ভবতঃ ওই প্রতিমার নাম রাখা হয়েছিলো। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য বাতিল উপাস্যদেরকে জিব্‌ত ও তাগুত বলা হয়। কিন্তু তাগুত ও জিব্‌ত দু'টি পৃথক শব্দ এবং এর মাধ্যমে শব্দ দু'টিকে পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, দু'টি শব্দের অর্থ একীভূত হবে না। শব্দ যেহেতু দু'টি । তাই অর্থও হবে দু'রকম।

গ্রন্থকার নিশ্চিতির সঙ্গে বলছেন, জিব্‌ত শব্দটির আসল অর্থ জাবাত। জাবাত ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তাগুত শব্দটি নিঃসৃত হয়েছে তুগইয়ান হতে। তুগইয়ান অর্থ অবিশ্বাস এবং সীমালঙ্ঘন। কামুস ও সিহাহ্‌। এ কারণেই ইহুদী হুয়াই বিন আখতাবকে জিব্‌ত এবং কাব বিন আশরাফকে তাগুত বলা হয়। জুহাক, ওমর, শায়বী এবং মুজাহিদ বলেছেন, জিব্‌ত অর্থ যাদু এবং তাগুত অর্থ শয়তান। মোহাম্মদ বিন সিরীন বলেছেন, জিব্‌ত মানে গণক এবং তাগুত মানে যাদুকর। সাঈদ বিন জোবায়ের এবং আবুল আলিয়া বলেছেন, জিব্‌ত অর্থ যাদুকর এবং তাগুত অর্থ গুণিন। হজরত কাবিসা থেকে স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইয়াফত পাখির চলাচল এবং তুরক পাথর ছুঁড়ে মারাকে অশুভ ধারণা করা জিব্‌ত্‌। এগুলোতে কোনো কল্যাণ নেই।

আমি বলি, জিব্‌তের প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে মূর্তি যা অবশ্যই কল্যাণরহিত এবং তাগুত অর্থ হচ্ছে মূর্তিকে আশ্রয়কারী শয়তান, যে মূর্তির অভ্যন্তর থেকে কথা বলে মানুষকে প্রতারিত করে। মূর্তিপূজারীরা মূর্তির অন্তরালবর্তী শয়তানের কথাকেই মূর্তির কথা বলে মনে করে। হজরত আবু তোফায়েল থেকে বায়হাকী লিখেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. হজরত খালেদ বিন ওলিদকে উজ্জা নামক প্রতিমাটিকে ধ্বংস করতে পাঠালেন। হজরত খালেদ প্রতিমাসংলগ্ন বাবুল বৃক্ষটি কেটে ফেললেন এবং ফিরে এসে রসুল স. কে এই সংবাদ দিলেন। রসুল স. বললেন, তুমি কি কিছু দেখেছো? হজরত খালেদ বললেন, না। রসুল স. বললেন, তুমি তো উজ্জাকে ধ্বংস করতে পারোনি। হজরত খালেদ পুনরায় রওনা হলেন। দূর থেকে তাকে দেখে উজ্জা পূজারীরা পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। তারা বলতে বলতে যাচ্ছিলো, উজ্জা তোমাকে অন্ধ করে দেবে। তুমি লাঞ্ছনার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে। এমন সময় হজরত খালেদের সামনে আবির্ভূত হলো এক কালো নগ্ন এলোকেশী মহিলা। সে তার মাথায়, মুখে মাটি মাখতে লাগলো। হজরত খালেদ অসি উত্তোলন করে বললেন, আমি তোমাকে অস্বীকার করছি। তোমার তথাকথিত পবিত্রতাকে অমান্য করছি। আমি দেখছি, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। অতঃপর তিনি কালো মহিলাটিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং ফিরে এসে রসুল স. কে এই সংবাদ দিলেন। হ্যাঁ, এই সেই উজ্জা। এবার থেকে তোমাদের রাজ্যে তার পূজা বন্ধ হয়ে গেলো। এ রকম বলা হয়েছে সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, যখন কাব বিন আশরাফ মক্কায় পৌঁছলো, তখন কোরায়েশরা তাকে বললো— দেখো! মোহাম্মদ দাবী করছে তারা আমাদের চেয়ে উত্তম। অথচ আমরা হজের মোতওয়াল্লী, কাবার তত্ত্বাবধায়ক। আমরা হাজীদেরকে পানি পান করাই। কাব বললো, তাদের কথা ঠিক নয়। তোমরাই তাদের চেয়ে উত্তম। অতঃপর অবতীর্ণ হলো— 'ইন্না শানি য়াকা হুয়াল আবতার।'

কাব বিন আশরাফের বর্ণিত মিথ্যা ভাষণের দিকে ইঙ্গিত করে এই আয়াতে তাই বলা হয়েছে—দেখ, কী ঘৃণ্য তাদের মনোভাব। তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারিদেরকে বলে, তোমরাই সঠিক পথে রয়েছো। তোমরাই বিশ্বাসীদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কোরায়েশ, বনী গাতফান এবং বনী কুরায়জা একত্রিত হলো। এর সঙ্গে যোগ দিলো বনী নাজির গোত্রের হুয়াই বিন আখতাব, সালাম বিন আবিল হাকীক, আবু রাফে, রবী বিন আবিল হাকীক, আবু আম্মারা এবং হাওদা বিন কায়েস। যখন এরা সবাই কোরায়েশদের নিকট পৌঁছলো তখন কোরায়েশেরা বললো, এরা ইহুদী সমাজের আলেম। তোমরা এদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, কার ধর্ম উত্তম। আমাদের না মোহাম্মদের। কোরায়েশেরা প্রশ্ন করলো। ইহুদী আলেমেরা জবাব দিলো, তাদের ধর্মাপেক্ষা তোমাদের ধর্মই

উত্তম। মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা নয়, তোমরাই সঠিক পথে আছো। এরপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন এই আয়াত 'মুলকান আজিমা' পর্যন্ত।

বাগবী লিখেছেন, আবু সুফিয়ান যখন বর্ণিত প্রশ্ন উত্থাপন করলো তখন ক'াব বললো, তোমাদের ধর্মের পরিচয় দাও। আবু সুফিয়ান বললো, আমরা হাজীদের আতিথেয়তার জন্য উঁচু পিঠ বিশিষ্ট উষ্ট্রী জবাই করি। তাদেরকে পানি পান করাই এবং অতিথিদের অন্যান্য ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করি। আরও অনেক কাজ করি আমরা। যেমন— বন্দীদেরকে মুক্ত করি, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখি, আমাদের প্রতিপালকের এই গৃহ আবাদ রাখি এবং এর তাওয়াফ করে থাকি। আর আমরা হারামের অধিবাসী। মোহাম্মদতো বাপ-দাদাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছে এবং এ হেরেম ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমাদের ধর্ম পুরাতন আর মোহাম্মদের ধর্ম নতুন। আবু সুফিয়ানের কথা শুনে কাব বললো, আল্লাহ্র কসম! তোমরা মোহাম্মদের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ পথানুসারী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫২

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ○

❒ ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে অভিসম্পাত করেন তুমি কখনও তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

এরশাদ হয়েছে, ওই সমস্ত লোকের উপরেই আল্লাহ্র অভিসম্পাত (লানত)। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম নবীকে লক্ষ্য করে বলছেন, দুনিয়া অথবা আখেরাত কোনোখানেই আপনি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী দেখতে পাবেন না। যুদ্ধলিপ্ত হলে তারা যেমন সাহায্য পাবে না, তেমনি আখেরাতে শাফায়াতের মাধ্যমেও কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। ইহুদী এবং মক্কার মুশরিকদের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে এই আয়াতে। এটাই তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অভিসম্পাত নেমে আসার কারণ।

কৃপণতা, হিংসা অত্যন্ত মন্দ স্বভাব। পরবর্তী আয়াতে ইহুদীদের এসমস্ত মন্দ স্বভাবকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৩

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ○

❒ তবে কি তাহাদের রাজ-শক্তিতে কোন অংশ আছে! সেক্ষেত্রেও তো তাহারা কাহাকেও এক কপর্দকও দিবে না।

ইহুদীদের ধারণা ছিলো, তারা অতিসত্ত্বর রাজত্বের অধিকারী হয়ে যাবে। এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের সে ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়েছে। রসুল স. এর

মদীনায় আগমনের পর রাজত্বের অভিলাষ তাদের অন্তর্হিত হয়ে গেলো। তারা আতংকিত হলো এই ভেবে যে, রাজত্ব তো অনেক দূরের কথা এখন যেটুকু সামাজিক নেতৃত্ব রয়েছে সেটুকুই রক্ষা করা দায় হয়ে গেলো। এরকম অসৎ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা রসুল স. এর বিরোধীতায় অনড় অবস্থান গ্রহণ করলো। তারা নেতৃত্বাকাঙ্খী কিন্তু যোগ্যতারহিত। নেতাকে হতে হয় উদার, দানশীল। কিন্তু তারা কৃপণতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আল্লাহ্পাক তাই বলেছেন, তারা কীভাবে নেতৃত্ব, কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে— যারা অভাবগ্রস্তকে এক কানাকড়িও দিতে সম্মত হয় না। এরকম সংকীর্ণচিত্তদেরকে আল্লাহ্ কেনো রাজ্যাধিকারী করবেন? এখনই তারা এরকম কৃপণ। রাজ্য পেলে তো আরও কৃপণ হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে হজরত ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, ইহুদীরা বলতে শুরু করলো, এই তো হলো মোহাম্মদ। যার রয়েছে নয়টি স্ত্রী। কোনো রাজা বাদশাও তো তার চেয়ে অধিক আরামে আয়েশে থাকে না। তাদের এই হিংসাচ্ছন্নতাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৪

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ إِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ○

❒ অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়াছেন সে জন্য কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে? ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছিলাম।

হজরত রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ দেখে ইহুদীরা হিংসানলে দগ্ধিভূত হতে শুরু করলো। ইহুদীরা সকলেই ছিলো হিংসুক। এখানে 'আন্ নাস' (মানুষ) শব্দটির মাধ্যমে রসুল স. এর কথা বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান এবং তাদের অনুসারী একটি দলের বক্তব্য হচ্ছে—ইহুদীদের হিংসার কারণ রসুল স. এর পবিত্র জীবন সঙ্গিনীগণ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আন্ নাস' শব্দটির দ্বারা রসুল স. এর সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, 'আন্নাস' শব্দের অর্থ হবে সমগ্র আরববাসী। আল্লাহ্পাক আরবদের মাঝে নবী পাঠিয়েছেন, তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, এই ছিলো ইহুদীদের হিংসার মূল কারণ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'আন্নাস' হচ্ছে ওই সকল মানুষ যারা রসুল স. এর নবুওয়াতকে মেনে নিয়ে পথপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পূর্ণত্ব লাভ করেছে। এ ধরনের সকল মানুষই তাদের হিংসার কারণ। ইহুদীরা দেখতে পেলো নবুওয়াত, কিতাব, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, যুদ্ধবিজয়, পৃথিবীর সম্মান, পবিত্র স্ত্রী, আকাঙ্খিত হালাল বস্তু, প্রতিশ্রুত নবী—সকল কিছুই তাদের গোত্র

এবং সমাজের বাইরে। এ সমস্ত দেখে হিংসাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো তারা।

আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তিনি হজরত ইব্রাহিমের বংশধরকেও কিতাব ও এলেম দান করেছিলেন। দিয়েছিলেন বিশাল রাজত্বের অধিকার। 'আলে ইবরাহিম' (ইব্রাহিমের বংশধর) বলতে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে মোহাম্মদ স. এর সম্মানিত পূর্ব পুরুষ হজরত ইসমাইল আ., হজরত ইসহাক আ., হজরত ইয়াকুব আ. এবং বনী ইসরাইলের নবীগণকে। 'আল কিতাব' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে তওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর শরীফকে। 'আল হিকমাতা' দ্বারা ইঙ্গিত হয়েছে এলমে লাদুন্নিকে—যে জ্ঞান তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো কিতাব ব্যতিরেকেই। রাজত্বের অধিকার বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ইউসুফ, হজরত দাউদ এবং হজরত সুলায়মানের সাম্রাজ্যকে। এ সমস্ত বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ ইহুদীদেরকে যে কথা জানিয়ে দিতে চেয়েছেন তা হচ্ছে— মোহাম্মদ স. এর সম্মানিত পূর্বপুরুষগণকে আল্লাহ্ যে বিশাল রাজত্বের অধিকার দিয়েছিলেন, প্রিয়তম নবী মোহাম্মদ স. কে তিনি তদপেক্ষা উত্তম সাম্রাজ্য তো দিতেই পারেন। হজরত সুলায়মানের পত্নী সংখ্যা ছিলো এক হাজার। বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন তিনশত এবং সাতশত ছিলেন বৈধ ক্রীতদাসী। হজরত দাউদের স্ত্রী ছিলেন একশত। আর মোহাম্মদ স. এর পত্নী মাত্র নয়জন।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইহুদীরা নিশ্চুপ হয়ে গেলো। তখন থেকে তারা রসুল স. এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাঁকে প্রদত্ত অন্যান্য নেয়ামতের উপমা দেয়া ছেড়ে ছিলো (রসুল স. কে দোষারোপ করার সুযোগ আর তাদের রইলো না)।

এই বিষয়টির আর একটি ব্যাখ্যা এ রকম হতে পারে যে—হজরত ইব্রাহিমের বংশধরকে আমি নবুওয়াত, হেকমত ও রাজত্বদান করেছি। তাঁদের শত্রুরা ছিলো অধিকতর শক্তিধর। নমরূদ, ফেরাউন, কারুন, হামান সকলেই তাঁদেরকে হিংসা করতো। কিন্তু হিংসাকারীদের হিংসা হজরত ইব্রাহিমের বংশধরদের কোনোই ক্ষতি করতে পারে নি। ঠিক তেমনি তোমাদের হিংসাও মোহাম্মদ স. এবং তাঁর সহচরদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৫

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○

❐ অতঃপর তাহাদের কতক উহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কতক উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল; দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

কতিপয় ইহুদী বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো—এ কথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণকে। তাঁরা ইহুদী ধর্মমত ছেড়ে দিয়েছেন। আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ইসলাম। এ বাক্যটির এ রকমও

অর্থ হওয়া সম্ভব যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্পাক ইব্রাহিমের বংশধরকে যে নবুওয়াত, হেকমত ও রাজত্বদানের কথা উল্লেখ করেছেন, কতিপয় ইহুদী সে সত্য ভাষণটিকে স্বীকার করে নিয়েছে।

এরপরে বলা হয়েছে 'ওয়ামীনহুম মান সাদ্দা আনহু'—অর্থ তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইমাম সুদ্দী লিখেছেন, 'বিহি' এবং 'আনহু' সর্বনামদ্বয় হজরত ইব্রাহিমের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ কিছু লোক হজরত ইব্রাহিমের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো। এবং কিছু লোক হজরত ইব্রাহিমের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো এবং কিছু লোক করেনি। প্রাসঙ্গিক ঘটনাটি এই—একবার হজরত ইব্রাহিম তাঁর জমিতে শস্য বপণ করলেন। অন্যান্য লোকেরাও শস্য বপন করলো। সকলের ফসল ধ্বংস হয়ে গেলো। কেবল হজরত ইব্রাহিমের জমিতে অতিরিক্ত ফলন হলো। সহায়হীন লোকেরা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলো। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমি শস্য দান করবো তাদেরকে, যারা আমার নবুওয়াতকে মান্য করবে। একথা শুনে কিছু লোক ইমান আনলো। তিনি তাঁদেরকে ফসল দিলেন। যারা ইমান আনলো না, তিনি তাদেরকে কিছুই দিলেন না। এই প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হবে এই—হজরত ইব্রাহিমের প্রতি অবিশ্বাসীরা যেমন ইমান না আনায় কোনো ক্ষতি হয়নি, তেমনি হে প্রিয়তম নবী! হতভাগ্য ইহুদীদের অস্বীকৃতি আপনার সুমহান কর্মকাণ্ডকে তেমনি নিস্তেজ করতে পারবে না। তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের লেলিহান শাস্তি। সুতরাং দুনিয়াতে শাস্তি বিলম্বিত হলে অসুবিধার কিছু নেই।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

❒ যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই; যখনই তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইবে তখনই উহার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করিব, যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত। এই আয়াতের বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াতটির ব্যাখ্যার সহায়তা করেছে। বলা হয়েছে, যখন তাদের গায়ের চামড়া দগ্ধ হবে তখন নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেয়া হবে। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকে, আমি আংটিকে বালিতে (কানের অলংকার বিশেষ) পরিবর্তিত করেছি। অবিশ্বাসীদের দোজখাযাব হবে

সেরকমই। দগ্ধীভূত চামড়ার স্থলে সৃষ্টি করে দেয়া হবে নতুন চামড়া যাতে করে তারা পুনঃ পুনঃ আযাব ভোগ করতে পারে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের চামড়া কাগজের ন্যায় শাদা করে দেয়া হবে। বাগবী। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবী হাতেমও এরকম তাফসীর করেছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন— হজরত ওমরের সামনে এই আয়াত পাঠ করা হলো। হজরত মুয়াজ বললেন, আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানি। ব্যাখ্যাটি এই— এক ঘণ্টার মধ্যে একশতবার তাদের চামড়া পরিবর্তন করে দেয়া হবে। হজরত ওমর তখন বললেন, আমি রসুল স. এর নিকট এরূপই শুনেছি। দ্বিতীয় বর্ণনায় হজরত মুয়াজের স্থলে হজরত উবাই এর সঙ্গে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা সূত্রবদ্ধ হয়েছে। আবু নাঈমের হুলিয়ায় এবং ইবনে মারদুবিয়ার অন্য একটি সূত্রে বলা হয়েছে— এক ঘণ্টায় একশত বিশবার চামড়া পরিবর্তিত হবে। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে—— চামড়াগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং তদস্থলে দেয়া হবে নতুন চামড়া। এরকম করা হবে এক ঘণ্টায় ছয় হাজার বার। হাসান বসরীর বক্তব্যানুসারে বায়হাকী আরও বলেছেন, এক ঘন্টায় সত্তর হাজার বার চামড়া পরিবর্তিত হবে। প্রতিবারের জন্যই জারী হবে নতুন নতুন হুকুম। সেই হুকুমানুযায়ী পুনঃ পুনঃ চামড়া পরিবর্তিত হবে।

হজরত হোজায়ফার উক্তি অনুসারে ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া লিখেছেন, জাহান্নামের আগুনের ভিতরে থাকবে হিংস্র প্রাণীকূল, আগুনের কুকুর, আগুনের কাঁটা এবং আগুনের তরবারী। কাফেরদের শরীরের জোড়া কেটে কেটে হিংস্র প্রাণী ও কুকুরের সামনে রাখা হবে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার সাথে সাথে তৈরী হয়ে যাবে নতুন নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমি বলি, আগের অঙ্গের বদলে তৈরী হবে নতুন অঙ্গ এবং আগের চামড়ার স্থলে স্থাপন করা হবে নতুন চামড়া। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, দ্বিতীয় বারের চামড়া প্রথম বারের মতো হবে না (প্রতিবারে পুরোনো চামড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থলে নতুন নতুন চামড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনঃ স্থাপিত হবে)। প্রকৃতপক্ষে, শাস্তি অনুভব করবে নফস। প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শাস্তি অনুভব করার উপকরণ বা মাধ্যম। আবদুল আজিজ বিন ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, আল্লাহ্ দোজখীদেরকে এমন চামড়ার পোশাক পরিধান করাবেন, যার যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত শরীরে। যন্ত্রণা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। চামড়া পুড়ে গেলে তদস্থলে আসবে নতুন চামড়া। এভাবেই ঘটতে থাকবে শাস্তির পুনরাবৃত্তি। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'পাজামার কোনো ব্যথা হবে না বরং ব্যথা পৌঁছে যাবে সমস্ত শরীরে।' বিরতিহীন শাস্তি দানের জন্য এই ব্যবস্থা। নফসকে শায়েস্তা করার জন্যই এ আয়োজন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দ্রুতগামী অশ্বের তিনদিন ছুটে চলার পথের সমান হবে কাফেরদের দুই স্কন্ধের দূরত্ব। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, কাফেরদের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো বিশাল এবং তাদের চামড়া পুরু হবে তিনদিনের পথের সমান। মুসলিম। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে—কিয়ামতের দিন কাফেরদের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড়। তাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে। তিরমিজি এবং বায়হাকীর বিবরণে রয়েছে— পাহাড়ের মতো বিশাল হবে কাফেরদের উরু। জাহান্নামী কাফেরদের উপবেশনের স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানের সমপরিমাণ। বিয়াল্লিশ গজ পুরু চামড়া হবে তাদের। আহমদ, তিরমিজি, হাকেম এবং বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে—কাফেরদের চামড়া হবে সত্তর গজ চওড়া। বাহু হবে জাবালে নূর পর্বতের মতো এবং উরুদেশ হবে ওয়ারাকান পাহাড়ের সমান।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন দোজখীদের শরীর হবে বিশাল। তাদের কানের লতি থেকে স্কন্ধদেশের দূরত্ব হবে সাত বছরের পথ সমতুল্য। চামড়া হবে সত্তর গজ মোটা এবং দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। হজরত ইবনে ওমর থেকে মারফু পদ্ধতিতে— তিরমিজি, বায়হাকী এবং হান্নাদ উল্লেখ করেছেন, তাদের মুখাবয়ব হবে দুই ফারসাখ (তিন মাইলে এক ফারসাখ হয়)। এক এবং দুই ফারসাখের কথা তিরমিজির বর্ণনাতেও এসেছে। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের অনুসৃতিতে আহমদ এবং হাকেম বলেছেন, অনেক দোজখীদের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত দূরত্ব হবে চল্লিশ বছরের পথের সমান। তার মধ্যে প্রবহমান থাকবে রক্তের নহর। বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞেস করা হলো, রক্তের নহর মানে কি রক্তের সমুদ্র? তিনি উত্তর দিলেন, না। সমুদ্র নয়, উপত্যকা।

'আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ — আল্লাহ্ পরম পরাক্রমশালী। তিনি যা চান তাই হয়। হতে বাধ্য। তার ইচ্ছাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। উপযুক্ত শাস্তি প্রদান তাঁর প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৭

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গী থাকিবে এবং তাহাদিগকে চির স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করিব।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাকেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতীদের পত্নীরা ঋতুস্রাব, মলমূত্র, নাকের সর্দি এবং থুথু থেকে পবিত্র থাকবে। মুজাহিদের উক্তি হান্নাদ উপস্থাপন করেছেন এভাবে— তারা ঋতুস্রাব, মলমূত্র, নাকের পানি, থুথু -কফ, গর্ভধারণ এবং বীর্য থেকে পবিত্র হবে। আতার বর্ণনায়ও এ সকল কথা বলা হয়েছে।

চিরস্নিগ্ধ সুপ্রসারিত ছায়ায় থাকবে বেহেশতবাসীরা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন— জান্নাতের একটি গাছের ছায়া একশ' বছর ভ্রমণ করেও শেষ করা যাবে না। যদি তোমরা এর প্রমাণ চাও তবে এ আয়াতটি পাঠ করো— 'এবং সুবিস্তৃত ছায়া থাকবে।' বোখারী, মুসলিম।

হজরত রবী বিন আনাস থেকে ইবনে আবী হাতেম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ওই ছায়া হবে আরশের ছায়া যা কখনও অপসৃত হবে না।

আয়াতের শেষ শব্দ দু'টি হচ্ছে 'জিল্লান জালীলা'— এর অর্থ ছায়াঘন প্রশান্তি অথবা প্রশান্ত ছায়া কিংবা চিরস্নিগ্ধ ছায়া। 'জালীলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণরূপে। আরবী ভাষায় এধরনের ব্যবহার সুপ্রচুর। যেমন —শামসুন শামেসুন (প্রজ্জ্বলিত সূর্য), লাইলুন লাঈলুন (তমাসাচ্ছন্ন রাত্রি), ইয়াওমুন আইওয়ামুন (সুদীর্ঘ দিবস)। চিরস্নিগ্ধ কথাটির মাধ্যমে এ রকম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতের নেয়ামত হবে অনির্বচনীয় ও অন্তহীন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী এবং আবু সালেহের সূত্রপরম্পরায় ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. হজরত ওসমান বিন তালহাকে তলব করলেন। হজরত ওসমান উপস্থিত হলে তিনি স. বললেন, চাবি দাও। হজরত ওসমান কাবা গৃহের চাবি নিয়ে হাজির হলেন। রসুল স. চাবি নেয়ার জন্য তাঁর পবিত্র হস্ত প্রসারিত করলে হজরত আব্বাস দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং এই চাবি রক্ষকের দায়িত্ব আমার উপরে অর্পণ করুন। হজরত ওসমান তখন হাত টেনে নিলেন। রসুল স. পুনরায় বললেন, দাও। তিনি চাবি দিলেন। রসুল স. চাবি দিয়ে কাবা গৃহের দরোজা খুললেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করার পর বের হয়ে এসে তাওয়াফ করলেন। তারপর হজরত ওসমান বিন তালহাকেই চাবি দিয়ে দিলেন। তারপর পাঠ করলেন নিম্নের আয়াত।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

❒ আমানত উহার মালিককে প্রত্যর্পণ করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

সানিদ তাঁর তাফসীরে হাজ্জাজ বিন জারিহের মাধ্যমে মুজাহিদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে— এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য ছিলেন হজরত ওসমান বিন তালহা।

মক্কাবিজয়ের দিন হজরত ওসমানের নিকট থেকে চাবি নিয়ে কাবা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করলেন রসুল স.। কিছুক্ষণ পর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। হজরত ওমর বলেছেন, আল্লাহ্‌র রসুলের জন্য আমার মাতাপিতা উৎসর্গীকৃত হোক। এই আয়াত আমি আগে কখনও রসুল স.কে পাঠ করতে শুনিনি। এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কাবা শরীফের ভিতরে। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবও এ রকম বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বিবরণের অতিরিক্ত সংযোজনটুকু হচ্ছে এই— রসুল স. বললেন, হে তালহার বংশধরেরা! তোমরা এই চাবির স্থায়ী সংরক্ষক। কাফের ছাড়া অন্য কেউ তোমাদেরকে এ বিষয়ে উত্যক্ত করবে না।

ইব্রাহিম বিন মোহাম্মদ আবদারীর শিক্ষকবৃন্দ থেকে ইবনে সা'দ লিখেছেন, হজরত ওসমান বিন তালহা বলেছেন, হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে রসুল স. আমাকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। আমি বললাম আশ্চর্য! তুমি স্ব-সম্প্রদায়ের আচরণীয় ধর্ম ছেড়ে দিয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছো। আবার এ রকমও কামনা করছো যে, আমি তোমার পদাংক অনুসরণ করি। হজরত ওসমান বিন তালহা আরও বলেছেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমরা বায়তুল্লাহ শরীফের দরোজা খুলে দিতাম। তখন মানুষ তাতে প্রবেশ করবার সুযোগ পেতো। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী স. তাঁর কতিপয় সহচরসহ বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে এলেন। ওসমান তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি রসুল স.কে কাবাগৃহে প্রবেশ-প্রচেষ্টায় বাধ সাধলেন এবং বিরক্তি প্রদর্শন করলেন। মহানবী স. গভীর ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে ওসমানের অপআচরণকে সহ্য করে নিলেন। বললেন, হে ওসমান! এমন এক সময় আসবে যখন তুমি এ বায়তুল্লাহর চাবি দেখতে পাবে আমার হাতে। তখন যাকে ইচ্ছে এ চাবি অর্পণ করার অধিকার থাকবে আমারই। ওসমান বললেন, তাই যদি হয় তবে তো সেদিন কোরায়েশেরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হবে। রসুল স. বললেন, না। তা নয়।

বরং তখনই কোরায়েশেরা হবে প্রকৃত অর্থে মুক্ত, যথাসম্মানে সম্মানিত । এ কথা বলতে বলতে তিনি কাবা গৃহে প্রবেশ করলেন। ওসমান বলেছেন, আমি বিষয়টি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলাম। তখন আমার অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হলো যে, তিনি স. যা বলেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। সেই মুহূর্তেই আমি মুসলমান হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলাম। কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের মনোভাব ছিলো প্রতিকূল। তারা আমার কথা শুনে আমাকে চরমভাবে ভর্ৎসনা করলো। তাই আমি আমার সংকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলাম না। মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. আমার নিকট চাবি চাইলে আমি চাবি পেশ করলাম। আমাকে ফিরে যেতে দেখে তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, এই চাবি গ্রহণ করো সর্বক্ষণের জন্য। যে নিতান্ত জালেম, সে ব্যতীত অন্য কেউ তোমার নিকট থেকে এই চাবি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ওসমান। তোমাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করেছেন। কাজেই এই ঘরের মাধ্যমে যা কিছু উপর্জিত হয় তা তোমরা বিধি অনুসারে ভক্ষণ কোরো। আমি চলে যাচ্ছিলাম। তিনি স. পুনরায় ডেকে বললেন, আমার কথা কি ঠিক হয়েছে যা তোমাকে বলেছিলাম? আমার তখন সেই কথাটিই মনে পড়ে গেলো, যা তিনি স. আমাকে হিজরতের পূর্বে বলেছিলেন। আমি বললাম, নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্রই রসুল।

হজরত জোবায়ের বিন মুতয়েম থেকে ফাকেহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ওসমানকে চাবি দিয়ে বললেন, গোপনে রেখো। জুহুরী বলেছেন, এই নির্দেশের পর ওসমান চাবি গোপন করে রাখতেন। আমি বলি, প্রায় প্রত্যেকেই চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ছিলেন। তাই রসুল স. এ রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আব্বাস এ রকম প্রস্তাব রেখেছিলেন। ইবনে আবেদ এবং আজরুকী লিখেছেন, রসুল স. এর নিকট হজরত আলী নিবেদন করলেন, কাবার রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করার দায়িত্ব আমার হাতে অর্পণ করুন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। রসুল স. ওসমানকে ডেকে বললেন, হে তালহা তনয়! এ চাবির প্রতি রয়েছে তোমার সার্বক্ষণিক অধিকার। যে এই চাবি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে, সে জালেম।

জুহুরীর বর্ণনাসূত্রে আবদুর রাজ্জাক এবং তিবরানী লিখেছেন, কাবাগৃহে প্রবেশ করলে হজরত আলী রসুল স. কে বললেন, আমাদের উপরেই অর্পিত হয়েছে নবুয়তের খেদমত, হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব এবং কাবা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ। আমাদের চেয়ে অধিক ভাগ্যবান আর কেউ নেই। রসুল স. হজরত আলীর এ কথা পছন্দ করলেন না। তিনি হজরত ওসমানকে ডেকে চাবি দিয়ে বললেন, লুকিয়ে রেখো।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. মক্কাবিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন ওসমান কাবার দরোজা বন্ধ করে ছাদে উঠে গেলেন। তিনি স. চাবি তলব করলেন। তখন বলা হলো, চাবি রয়েছে ওসমানের নিকট। সে চাবি দিতে চায় না। বলে, আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে তিনি আল্লাহ্র রসুল, তবে চাবি দিতে অস্বীকৃত হতাম না। হজরত আলী ওসমানের ঘাড় মুড়ে দিয়ে চাবি নিয়ে নিলেন এবং কাবাঘরের দরোজা খুলে দিলেন। রসুল স. ভিতরে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ

পড়লেন। যখন বেরিয়ে এলেন তখন হজরত আব্বাস চাবি সংরক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করার দায়িত্ব কামনা করলেন। এর অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি। রসুল স. হজরত আলীকে নির্দেশ দিলেন, চাবি ওসমানকে দাও। আর তার সঙ্গে জোর জবরদস্তি করার অপরাধ স্বীকার করো। হজরত আলী হুকুম তামিল করলেন। ওসমান বললেন, তুমি আমার উপর জুলুম করেছো। এখন আবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছো। হজরত আলী বললেন, তোমার শানে আল্লাহ্‌পাক আয়াত অবতীর্ণ করছেন। রসুল স. সদ্য অবতীর্ণ আয়াতটি পাঠ করলেন। হজরত ওসমান বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। এ ঘটনার পর স্থায়ীভাবে চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পেলেন তিনি। এই চাবি তিনি মৃত্যুর সময় তাঁর ভাই শায়েবাকে দিয়েছিলেন। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত কাবার চাবি সংরক্ষণ করতে থাকবেন তাঁরই বংশধরেরা।

জ্ঞাতব্য ১ ঃ বনী তালহাকে চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান উপলক্ষে এই বিশেষ আয়াতটি বিশেষভাবে অবতীর্ণ হলেও এই আয়াতের হুকুমটি সাধারণ ও ব্যাপক। আমানতদানকারীকে তাঁর আমানত ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, যার আমানতদারী নেই, তার ইমান নেই। যার ওয়াদা ঠিক নেই, তাঁর ধর্ম নেই। বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের মারফু বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মুনাফিকির এই আলামতটিও উল্লেখ করেছেন যে, তার নিকট আমানত রাখা হলে সে আত্মসাৎ করবে। বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্য ২ ঃ হজরত জায়েদ বিন সাবেত বলেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম উঠানো হবে মানুষের আমানত। সবশেষে নামাজ। তখন অনেক নামাজী হবে কল্যাণবিবর্জিত (যাদের নামাজ ছিলো প্রদর্শনপ্রবণ)।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য হিসেবে ইবনে জারীর লিখেছেন, ধনী দরিদ্র কাউকেই এই কাজগুলো থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। মায়মুনা বিন মোহরানের বক্তব্যানুসরণে বায়হাকী লিখেছেন, বিত্তশালী সম্বলহীন সকলকেই এই কাজগুলো করতে হবে। ১. আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে হবে, আত্মীয়রা পুণ্যবান হলেও, পাপী হলেও। ২. সকলের আমানত প্রত্যর্পণ করতে হবে। উত্তমদেরও, অধমদেরও। ৩. সকলের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করতে হবে। পুণ্যশীলদের সঙ্গেও, অপুণ্যশীলদের সঙ্গেও। হজরত ইবনে মাসউদের উক্তিরূপে আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী শায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী লিখেছেন, আল্লাহ্‌র পথে শাহাদৎ বরণ করা আমানত খেয়ানত করার পাপ ছাড়া সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হাশরের সমাবেশে শহীদদেরকেও হুকুম দেয়া হবে আমানতদারের আমানত ফিরিয়ে দাও। শহীদ আরজ করবে, এখন তো আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছি। এখন কীভাবে আমানত প্রত্যার্পণ করবো। তখন হুকুম হবে, একে হাবিয়া দোজখে নিক্ষেপ করো। নির্দেশ পালন করা হবে। দোজখের অগ্নিগহবরে আসলরূপে আর্বিভূত হবে তার আমানত। সে তখন ওই আমানতের বোঝা ওঠাতে চেষ্টা করবে। যখন সে

আমানতের বোঝা উঠিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ নিবে, তখনই আমানত তার হাত ফসকে পড়ে যাবে জমিনে। সেও পুনঃপতিত হবে অগ্নিগহবরে।

বর্ণনাকারী রজিন বলেন, হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনা শুনে নিয়ে আমি গেলাম হজরত বারা বিন আজিবের নিকট। বললাম, আপনি কি জানেন আপনার ভাই ইবনে মাসউদ এ রকম বলেছেন। হজরত বারা বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্তায়ালাও এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।'

সকল ক্ষেত্রেই জড়িত রয়েছে আমানতের বিষয়টি। নামাজ, ফরজ গোসল, কথা, পরিমাপ, ধর্মাচরণ—সকল ক্ষেত্রেই আমানতদারীর ব্যাপারটি আচরণীয়। তবে সবচেয়ে কঠিন আমানত হচ্ছে সম্পদের আমানত।

জ্ঞাতব্য ৩ ঃ আমানতের সম্পর্ক সম্পূর্ণতঃই সম্পদ বিষয়ক নয়। মানুষের অধিকার আদায় করাও আমানতদারী। হকদারদের উপযুক্ত হক আদায় করতে হবে। আয়াতের শানে নুজুলে সে কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সুফিয়ানে কেরামের বিবরণ এই যে, সৃষ্টির অস্তিত্ব ও গুণাবলী আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আমানত। আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত ব্যতিরেকে সৃষ্টিতো কেবলই শূন্যতা। তাই সৃষ্টির উচিত আমানত প্রদানকারীকে সম্মান করা, আমানতের সুসংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নিজেকে আমানতের মালিক না মনে করা। আল্লাহ্তে সমর্পিতপ্রাণ হওয়া অর্থ— আল্লাহর আমানত প্রত্যর্পণ করা। ধরা যাক, কোনো পরাক্রান্ত সম্রাট কোনো ঝাড়ুদারকে পুরস্কৃত করলো এবং তাঁকে পরিধান করতে দিলো বহুমূল্যবান পরিচ্ছদ। এমতাবস্থায় ঝাড়ুদার যদি জ্ঞানী হয়, তবে নিশ্চয় স্মরণে রাখবে যে, এই গৌরব ও অনুগ্রহ আমাকে আমানত হিসেবে দান করা হয়েছে। মূলতঃ আমি ঝাড়ুদার। আর যদি সে অজ্ঞ হয়, তবে আমানদারকে ভুলে যাবে। তখন আমানত সুসংরক্ষণের চিন্তাও তার মাথায় থাকবে না। আর তখনই সে চিহ্নিত হবে আমানত খেয়ানতকারী অবিশ্বাসীরূপে।

সুফীগণের আত্মিক অবস্থা কখনো কখনো এ রকম হয় যে, শূন্যতা এবং অস্তিত্বহীনতাই যেনো তাদের প্রকৃত অবস্থা। নিজেকে তখন মনে হয়, এ অস্তিত্ব যেনো নিরস্তিত্ব, অসততা ও বিনষ্টির সমন্বয়। এ অবস্থার নাম ফানা। এরপর অবস্থা এমন স্থানে এসে দাঁড়ায় যখন তার অস্তিত্বের অনুভূতি এবং পূর্ণত্বের ধারণা বিলীন হয়ে যায়। এ রকম অবস্থার নাম ফানা উল ফানা। এভাবে কেউ কেউ কখনো শুহুদীর অবস্থায় পৌছে যান (তওহীদের প্রকৃত স্তরে পৌছলে যখন অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে সৃষ্টির অবস্থাবলী প্রতিভাসিত হতে থাকে, তখন তাকে বলে শুহুদী)। তখন তিনি নিজ অস্তিত্ব অবলোকন করেন, কিন্তু দেখেন— এই অস্তিত্ব

এবং অস্তিত্বগত সকল বৈশিষ্ট্যসমূহে আমার নিজস্বতা বলে কিছু নেই। আল্লাহ্ই অনুগ্রহ করে এই আমানত দান করেছেন। আল্লাহ্র জাত (অস্তিত্ব) ও সিফাতের (গুণাবলীর) আলোয় এবার আমাকে আলোকিত করা হয়েছে। আর এই আলোকরঞ্জিত হওয়ার কারণে এবার এসেছে স্থায়িত্ব, ধ্বংসহীনতা। এই অবস্থার নাম বাকা বা বাকাবিল্লাহ। (বাকা বিল্লাহ্য় উপনীত উচ্চ স্তরের সুফীগণ আল্লাহ্র ইসিম, সিফাত, শান, ইতেবারাতের এবং পবিত্রতার এমন জ্ঞান লাভ করেন যা অবর্ণনীয়, যে জ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করাও দুরূহ। প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কোনো বর্ণনা সে জ্ঞানকে ধারণ করতে অপারগ। ধারণাতীত ও অনুভবাতীত এই স্তরকেই বলে বাকা বিল্লাহ)। হাদিসে কুদসীতে এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে আমি হয়ে যাই তার শ্রুতি যদ্দারা সে শোনে, আমি হয়ে যাই তার দৃষ্টি যদ্দারা সে অবলোকন করে....।

সুফিয়ানে কেরামের দৃষ্টিতে এই ফানা বাকায় উপনীত হওয়াই প্রকৃত আমানতদারী। এ রকম অবস্থায় নফস পবিত্র করার কৃতিত্বের ধারণাও সুফীর স্মরণপথ থেকে অপসৃত হয়ে যায়। তখন তিনি স্পষ্টতই দেখেন, নিজের বলতে কেবল শূন্যতাই সম্বল। আর এই শূন্যতার অন্ধকারেই পূর্ণত্ববোধ অপসৃত হয়েছে। এরপর যে কামালিয়াত ও মর্যাদা লাভ হয় তা আল্লাহ্তায়ালারই নিছক অনুগ্রহ। তখন সুফী তাঁর প্রতি এই সুপ্রতুল অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করতে আদিষ্ট হন। প্রকৃত পূর্ণত্ব প্রদানকারী দয়াল দাতার দিকে আহবান জানান তিনি। মানুষের নিকট তিনি তখন প্রকৃত আমানতদারীর আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। সকল স্তবস্তুতি কেবলই আল্লাহ্র। আল হামদুলিল্লাহ্।

এই আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে পূর্বে উল্লেখিত ওই আয়াতের সঙ্গে যেখানে বলা হয়েছে— 'তুমি কি তাদেরকে দেখো নাই যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে, না আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন' (আয়াত ৪৯)। ওই আয়াত এবং এই আয়াতের মর্মকথা এই যে, আত্মশুদ্ধির পূর্বে তোমাদের কামালিয়ত বলে কিছু নেই। আর আত্মশুদ্ধির স্তরে কেবল আল্লাহ্ই পৌঁছে দিতে পারেন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার প্রতি নিক্ষেপ করেন নূরের একটি ঝলক অথবা নূরসমুদ্রের একটি ঢেউ যার কারণে সে পবিত্র হয়ে যায়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে আমানত প্রত্যর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যে পূর্ণত্ব ও সম্মান তোমাদেরকে আমানতস্বরূপ দেয়া হয়েছে, তা তাঁরই নিকট প্রত্যর্পণ করো। পবিত্রতা অর্জনকে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি বা কৌশললব্ধ মনে কোরো না। কৃতজ্ঞ হও। তাঁরই স্তবস্তুতি বর্ণনা করো যিনি তোমাদেরকে দয়া করে পবিত্র করেছেন।

কোনো কোনো পীর মাশায়েখ তাঁদের আপন ফযীলত প্রকাশ করে থাকেন, যা বাহ্যতঃ অহমিকাজাত বলে মনে হয়। যারা মূর্খ তারা এ কারণে তাঁদেরকে

দোষারোপ করার সুযোগ করে নেয়। কিন্তু তারা এ কথা বুঝতে পারে না যে, তাঁরা তাঁদের মহত্ব ও কামালিয়তকে আমানতস্বরূপ রক্ষাণাবেক্ষণে রত এবং তাঁরাই প্রকৃত আমানত প্রত্যর্পণকারী। আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ করাই তাঁদের ওই সকল কথার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন হিকমত ও পরিস্থিতির কারণেই তাঁরা তাঁদেরকে প্রদত্ত মহিমা সমূহের কথা প্রকাশ করে থাকেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

এরপর আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিচ্ছেন— 'তোমরা বিচার কার্যে ন্যায়ানুগতাকে আশ্রয় কোরো'। ইনসাফের সঙ্গে সিদ্ধান্ত দান করাও আমানতের আর একটি শাখা। ন্যায়বিচার না করা আমানত খেয়ানতের নামান্তর। এভাবে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং উলিল আমর (যারা নির্দেশ জারী করার যোগ্যতাধারী) গণের নির্দেশ অমান্য করাও আর এক ধরনের আমানতের খেয়ানত করা। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে প্রশাসক নিযুক্ত করুন। রসুল স. বললেন, তুমি তো দেখি দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দিচ্ছো। শাসনাধিকার একটি আমানত। কিয়ামতের দিন শাসকেরা অপমানিত হবে। তবে হাঁ, যারা শাসনাচরণে সততানির্ভর, তারা অপমানিত হবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হে আবু জর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্য ওই কথা পছন্দ করবো না, যা নিজের জন্য আমি পছন্দ না করি। দুই প্রকৃতির মানুষের শাসনভার নিতে যেয়ো না এবং এতিমের সম্পদের মোতোয়াল্লি হয়ো না। মুসলিম।

আয়াত শেষে এরশাদ হয়েছে, ভেবে দেখো তোমাদেরকে আমানতদারী এবং ইনসাফের যে নির্দেশ দেয়া হলো তা কতোই না সুন্দর, উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। তোমাদের চিন্তা, আচরণ, কথা, কাজ—সব কিছুই তাঁর শ্রুতি ও পর্যবেক্ষণের আওতাভূত।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসের মারফু বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, ন্যায়বিচারকারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ রহমানের দক্ষিণ হস্তের দিকে নূরের মিম্বরে থাকবে এবং আল্লাহর উভয় হস্তই দক্ষিণ হস্ত। তারা হবে ওই সকল লোক যারা স্বসম্প্রদায়ের শাসন ন্যায়ানুগতার সঙ্গে সম্পাদন করে থাকেন। মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রীতিভাজন এবং নৈকট্যভাজন হবে ন্যায়বিচারকেরা এবং ন্যায়বিচারবিরোধীরা হবে সর্বাধিক দূরবর্তী এবং সর্বাপেক্ষা শাস্তিযোগ্য। দ্বিতীয় বর্ণনায় কেবল সর্বাধিক দূরবর্তীতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিজি এই হাদিসটিকে বলেছেন হাসান এবং গরীব (দুষ্প্রাপ্য)।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. প্রশ্ন করলেন কিয়ামতের দিন কে প্রথমে আল্লাহ্তায়ালার রহমতের ছায়া লাভ করবে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও

তাঁর রসুলই উত্তমরূপে অবগত। রসুল স. বললেন, ওই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়ার দিকে অধিক অগ্রগামী থাকবে যে যথাপ্রাপ্য গ্রহণ করে এবং তা প্রদানও করে। আর ন্যায়বিচারপ্রার্থীদেরকে যে দান করে ন্যায়বিচার। মানুষের ব্যাপারে সে ওই সিদ্ধান্তই নির্বাচন করে, যা পছন্দ করে নিজের বেলাতেও। আহমদ। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে এ রকমই মারফু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৯

يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

❐ হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহের আনুগত্য কর; রসুল এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাহাদের আনুগত্য কর; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ ও রসুলের স্মরণ লও। ইহা ভালো ও ব্যাখ্যায় প্রকৃষ্টতর।

বোখারী, মুসলিম এবং আসহাবে সুনান (ইবনে মাজা, নাসাঈ, আবু দাউদ প্রমুখ) হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন হুজাফা সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছিলো। রসুল স. তাঁকে একটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো এক স্থানে প্রেরণ করেছিলেন। ইমাম সুদ্দীর বর্ণনাসূত্রে ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুল স. হজরত খালেদ বিন ওলিদকে এক সেনাদলের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। তিনি ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। দলমধ্যে হজরত আম্মার বিন ইয়াসারও ছিলেন। সেনাদল আক্রমণের লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হলো। সকালে সেনাদল যখন লক্ষ্যস্থলে পৌছলো, তখন দেখা গেলো সকলেই পালিয়ে গিয়েছে। মাত্র এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই ব্যক্তি হজরত আম্মারের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। কলেমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করলেন। হজরত আম্মার বললেন, দাঁড়াও তুমি মুসলমান হওয়ার উপকার লাভ করবে। হজরত খালেদ পুনঃআক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন হজরত আম্মার বললেন, এই লোকটিকে কিছু বলবেন না। সে মুসলমান হয়েছে। সে এখন আমার আশ্রয়াধীন। হজরত খালেদ নতুন মুসলমানকে কিছু বললেন না বটে, তবে হজরত আম্মারের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। সেনাদল মদীনায় ফিরে এলে বিষয়টি রসুল স. এর সামনে উপস্থাপন করা হলো। তিনি স. হজরত

আম্মারের আশ্রয়দানকে বলবৎ রাখলেন। কিন্তু নসিহত করলেন যেনো, ভবিষ্যতে নেতার অগোচরে এ রকম কিছু করা না হয়। দু'জনের মধ্যে তখনো কথা কাটাকাটি হচ্ছিলো। রসুল স. বললেন— খালেদ। আম্মারকে গালি দিও না। যে আম্মারকে গালি দিবে আল্লাহ্ তাকে মন্দ বলবেন। যে আম্মারের প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হবে আল্লাহ্ তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন। যে আম্মারকে অভিসম্পাত করবে তাকে অভিসম্পাত করবেন আল্লাহ্। হজরত খালেদ তৎক্ষণাত হজরত আম্মারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। হজরত আম্মার প্রসন্ন হলেন। অতঃপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি।

হজরত আবু হোরায়রার বক্তব্যানুসারে আবু শায়বা প্রমুখ লিখেছেন 'উলিল আমর' অর্থ প্রশাসক। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে সেনাধিপতি। বস্তুতঃ 'উলিল আমর' বলতে বাদশাহ, বিচারক, প্রশাসক, সেনাপতি সকলকেই বুঝায়।

হজরত আলী বলেছেন, নেতা এবং বিচারকের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং আমানতকে আদায় করা। যখন তাঁরা এ রকম করবেন, তখন জনতার কর্তব্য হচ্ছে— তাদের কথা শোনা এবং মান্য করা। হজরত হোজায়ফা বর্ণনা করেন— রসুল স. বলেছেন, যারা আমার পরে আসবেন তাদেরকে মান্য করো অর্থাৎ হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরকে মান্য করো। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে আমার অনুসরণ করলো সে আল্লাহ্রই অনুসরণ করলো। যে আমার অবাধ্য সে আল্লাহ্রও অবাধ্য। যে শাসকের অনুসরণ করলো সে আমারই অনুসরণ করলো। আর যে শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করলো সে যেনো আমারই বিরুদ্ধাচরণকারী। বোখারী, মুসলিম।

হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, আমরা রসুল স. এর নিকট এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি যে, আমরা তাঁর হুকুম শুনবো এবং মেনে নিবো। কঠিন, সহজ, খুশী-অখুশী সকলাবস্থায়। হাকিমের হুকুমও আমরা অমান্য করবো না। যেখানেই আমরা থাকবো সেখানেই সত্যপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবো আমরা। সত্য কথা বলবো এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধবাদী কাউকে ভয় করবো না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, নেতার হুকুম মান্য করো। নেতা যদি হাবশী গোলামও হয়, তবুও তার নির্দেশ সূর্যের আলোর মতোই স্বীকার্য। হজরত আবু উমামা বলেছেন, বিদায় হজের ভাষণে আমি রসুল স.কে নির্দেশ করতে শুনেছি, আল্লাহকে ভয় করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পাদন করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, সম্পদের জাকাত দিবে এবং নেতা কোনো হুকুম দিলে পালন করবে। এ রকম করলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। তিরমিজি।

স্বামী স্ত্রীকে, মুনিব গোলামকে এবং পিতা সন্তানকে হুকুম দিয়ে থাকেন। এরা সকলেই 'উলিল আমর।'

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বর্ণনা করেন, আমি রসুল স.কে নির্দেশ করতে শুনেছি— জেনে রেখো তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক, অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম বা নেতা জনগণের রক্ষক। জনতা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পরিবারের কর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার অধীনস্থ পরিবার পরিজন সম্পর্কে। নারীরা তাদের স্বামীদের, পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্ততিদের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দাস-দাসীরা তাদের প্রভুর সম্পদের সংরক্ষক। জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাদেরকেও। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তোমরা সকলে জিজ্ঞাসিত হবেই। বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ উলিল আমরের ব্যাখ্যায় হজরত ইকরামা বলেছেন, হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর উলিল আমর ছিলেন। কালাবী বলেছেন, উলিল আমর অর্থ হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ। ইকরামাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ক্রীতদাসীর সদ্যপ্রসূত সন্তান সম্পর্কে হুকুম কী? তিনি বললেন, সন্তান স্বাধীন। প্রশ্নকারীরা বললেন, আপনার কথার দলিল কী? তিনি বললেন, কোরআনে রয়েছে 'আতিউল্লাহা ওয়াআতি উর রসুলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।' হজরত ওমর, যিনি উলিল আমর ছিলেন তিনি বলেছেন—বাঁদী যদি অপরিণত শিশুও প্রসব করে, তবুও শিশুটি প্রসবের পর স্বাধীন বলে গণ্য হবে। হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেছেন, হজরত ওমর কাউকে কোনো স্থানের প্রশাসক নিযুক্ত করলে তার ফরমাননামায় লিখে দিতেন—যদি তিনি ইনসাফ করেন তবে জনতা তাঁর হুকুম মানবে। হজরত ওমর আরও বলেছেন, উত্তমরূপে অবগত হও— হাকিমের হুকুম মানতে হবে, যদিও নাক কাটা কোনো হাবশী গোলামও তোমাদের হাকিম নিযুক্ত হন। যদি তিনি প্রহার করেন, আঘাত দেন, তবে ধৈর্যধারণ করবে। আর যদি তিনি ধর্মের অবমাননামূলক কোনো নির্দেশ দেন তবে তোমরা বলে দিও— আমরা জীবন দিবো কিন্তু ধর্মাবমাননা সহ্য করবো না। উলিল আমরের প্রশস্ততর ব্যাখ্যার অন্তর্ভূত রয়েছেন ফুকাহা এবং ওলামা মাশায়েখ। এঁরাই নবীগণের প্রকৃত প্রতিনিধি। আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এঁদের উপরেই বর্তেছে। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুসরণে ইবনে জারীর, হাকেম প্রমুখ বলেছেন, ফকীহ এবং দ্বীনদার ব্যক্তিগণই উলিল আমর। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— উলিল আমর হচ্ছেন আলেমগণ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী শায়বা এবং হাকেম কর্তৃক এ রকম বর্ণনা এসেছে। আবুল আলিয়া এবং মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ করেছেন— 'আর যদি তারা বিষয়টিকে রসুলের এবং তাদের দলের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উপর সমর্পণ করতো, তবে সঠিক তথ্যানুসন্ধানকারীরা সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারতো।

রসুল স. বলেছেন, ওলামাগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। রসুল স. সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সকল মানুষ

তোমাদের অনুসরণ করবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাসআলা জানবার জন্য মানুষেরা ছুটে আসবে তোমাদের কাছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর মাধ্যমে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

মাসআলাঃ শরিয়তবিরোধী না হলে হাকিমের আনুগত্য করা ওয়াজিব। এই আয়াত দৃষ্টে এ কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা, প্রকৃত হুকুমদাতা আল্লাহ্। তিনি ইনসাফ রক্ষার হুকুম দিয়েছেন। পরে বলেছেন, হাকিমের অনুসরণ করতে। এতে করে বুঝা যায়— শাসক যতক্ষণ ইনসাফের উপরে কায়েম থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে মান্য করা জরুরী হবে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে, কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটলে বিষয়টি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলের প্রতি ন্যস্ত কোরো।

আলেমগণ বলেছেন, উলিল আমর (নির্দেশ দানের অধিকারী) শব্দটিই এ কথা প্রমাণ করে যে, প্রশাসক যে বিষয়ে নির্দেশ দানের অধিকারপ্রাপ্ত কেবল সেই বিষয়েই তাঁর অনুসরণ ওয়াজিব। যে বিষয়ে তাঁর অধিকার নেই, সে সকল বিষয়ের আনুগত্য ওয়াজিব নয় (বরং কোনো কোনো সময় এ রকম করা হারাম হবে)। শাসক যদি কাউকে বলে, অমুক ব্যক্তিকে এক হাজার টাকা (তোমার নিজের) দাও। তবে এ রকম হুকুম মানা ওয়াজিব নয়। (কেননা শাসকের এ রকম নির্দেশ দানের অধিকার নেই)।

মাসআলাঃ বিচারক যদি সিদ্ধান্ত দেয়, অমুক ব্যক্তিকে সঙ্গেসার করো (পাথর মারো) অথবা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করো কিংবা তার হাত কেটে ফেলো, তবে এই নির্দেশ যাকে দেয়া হবে সে নিঃসন্দেহে নির্দেশ পালন করতে পারে। কিন্তু এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মোহাম্মদ এই অভিমত থেকে পরবর্তীতে সরে গিয়ে বলেছিলেন, কোন দলিলের ভিত্তিতে এমতো নির্দেশ দেয়া হয়েছে—এ কথা স্পষ্ট না বুঝা পর্যন্ত হুকুম তামিল করা বৈধ হবে না। মাশায়েখগণ এই অভিমতটি পছন্দ করেছেন। কারণ, পরবর্তী জামানার অনেক কাযীর স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে।

ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদি বলেছেন, কাযী যদি মুত্তাকী এবং আলেম হন, তবে তাঁর হুকুম তামিল করা ওয়াজিব। কারণ, এক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত হওয়ার কোনো কারণ আর অবশিষ্ট নেই। আর মুত্তাকী হওয়া সত্ত্বেও যদি তিনি বিজ্ঞ না হন, তবে কোন দলিলের উপর সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে, তা জেনে নিতে হবে। যদি কাযী তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন, তবে তাঁর নির্দেশ পালন করবে। অন্যথায় করবে না। যদি কাযী আলেম ও ফাসেক (মুত্তাকী বা ধর্মভীরু নয়) হয়, তবে উপযুক্ত দলিল সহযোগে ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত তার কথা মানা যাবে না। হেদায়া।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুসরণে বোখারী লিখেছেন, এই আয়াত আবদুল্লাহ্ বিন হুজাফা বিন কায়েস সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্‌কে রসুল স. একটি সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। দাউদী বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ রকম— সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হুজাফাকে কোনো এক স্থানে পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে

তিনি তাঁর বাহিনীকে অগ্নি প্রজ্বলন করতে নির্দেশ দিলেন। সৈন্যদের আচরণে রুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। তাই হুকুম দিলেন, সবাই এই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করো। মতানৈক্য দেখা দিলো বাহিনীতে। কেউ কেউ নির্দেশ প্রতিপালন করাই বাঞ্ছনীয় ভাবলো। আর কেউ কেউ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃত হলো। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই আয়াতে বলা হয়েছে, অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে তবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের স্মরণ লও। মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। আলেমগণের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র হুকুমের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। 'শাই-ইন' শব্দটির অর্থ হচ্ছে নেতার নির্দেশ। নেতার নির্দেশ সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হলে কেউ কেউ বলেছেন, নির্দেশ প্রতিপালন করা ওয়াজিব হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, নাজায়েয হবে। এমতো ক্ষেত্রে আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র রসুলের শরণাপন্ন হতে হবে। অর্থাৎ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে আল্লাহ্র কিতাবের আলোকে এবং রসুল স. এর সুন্নাহ্র আদর্শে। যদি কোরআন ও সুন্নাহ্য় (হাদিসে) বিষয়টির স্পষ্ট সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা সম্ভব না হয়, তবে গ্রহণ করতে হবে এজমা ও কিয়াসের আশ্রয়। কোরআন ও হাদিসের অনুকূল এজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে বিষয়টি শরিয়তসম্মত প্রমাণিত হলে হুকুম মান্য করবে। অন্যথায় করবে না।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, আমিরের (নেতার) হুকুম শোনা এবং মানা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। মনঃপুত হলেও। না হলেও— যদি হুকুম আল্লাহ্র বাধ্যতাবিরোধী না হয়। আল্লাহ্র আনুগত্যবিরোধী নির্দেশ মান্য করা জায়েয নয়। বোখারী, মুসলিম। হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, পাপ কাজের অনুসরণ দুরস্ত নয়। অনুসরণ কেবল পুণ্যকর্মের জন্যই। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইমরান বিন হোসাইন এবং হজরত হাকিম বিন আমর গাফফারী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, স্রষ্টার অবাধ্যদের আনুগত্য জায়েয নয়। আহমদ, হাকেম। হাকেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

মুসলিম বিন আবদুল মালেক বিন মারওয়ান একবার আবু হাজেমকে বললেন, তোমরা কি উলিল আমরি মিনকুম সম্পর্কিত আয়াত জানার পরও মানুষকে আমাদের অনুসরণ করতে বলবে না? আবু হাজেম বলেন, হুকুমটির অব্যবহিত পরেই বলা হয়েছে— মতভেদ ঘটলে বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের প্রতি ন্যস্ত করতে হবে। এতে করে বুঝা যায়, অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ। মাদারেক।

মাসআলাঃ শাসকের হুকুম বলবৎ করার দায়িত্ব যদি বিচারকের উপরে ন্যস্ত করা হয়, তবে বিচারককে তা বলবৎ করতেই হবে— যদি তা কোরআন বিরোধী না হয়। কোরআন বিরোধী হলে বরং অমান্য করা ওয়াজিব। যেমন, দাবীদারের কসম ও প্রমাণ স্বরূপ যদি এক সাক্ষ্যের উপর খুনের রায় দেয়ার কথা বলা হয়,

তবে তা বাতিল করতে হবে। কেননা, আল্লাহ্তায়ালার স্পষ্ট হুকুম রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে দুই জন পুরুষ সাক্ষী গ্রহণ করবে।'

মশহুর হাদিসের বিরুদ্ধেও রায় দেয়া চলবে না (যে হাদিস দু'য়ের অধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তাকে মশহুর হাদিস বলে)। যেমন, তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে যদি কেউ বিবাহ করার পর সহবাস ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেয়, তবে পূর্ব স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে—এ রকম রায় দেয়া যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে সহবাস শর্ত ছিলো। হজরত রেফায়ার স্ত্রী সম্পর্কে হজরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন. তোমার বিবাহ তার সঙ্গে দুরস্ত হবে না যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তোমার সঙ্গে সহবাস না করবে (এ সম্পর্কিত আলোচনা সুরা বাকারার তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে)।

এজমাবিরোধী (ঐকমত্যবিরোধী) রায়ও অগ্রহণীয়। যেমন, পশু জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্ বলা ছেড়ে দিলে ওই পশু হালাল হবে বলে সাহাবীগণের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে রায় দেয়া যাবে না। হেদায়া।

মাসআলাঃ মুজতাহিদের (মাসআলা উদ্ধারকারীর) অভিমত কোরআন ও হাদিসবিরুদ্ধ হলে পরিত্যাজ্য হবে। এমতাবস্থায় ইজতিহাদি রায় পরিত্যাগ করা জরুরী। বিশুদ্ধ সূত্রে বায়হাকী মাদখাল পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন, আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক বর্ণনা করেছেন, আমি নিজে শুনেছি— ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আমার অভিমতবিরোধী হাদিস পেলে অবশ্যই আপন অভিমত ছেড়ে আমি হাদিসকেই বরণ করে নেবো। রওয়াজাতুল ওলামা গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আমার অভিমত রসুল স. কিংবা তাঁর সাহাবীগণের বিপরীত হলে পরিত্যাগ কোরো। ইমাম আজম আরো বলেছেন, বিশুদ্ধ প্রমাণিত হাদিসই আমার মাজহাব।

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, 'ইহা ভালো এবং ব্যাখ্যায় প্রকৃষ্টতর।' এর অর্থ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের অনুকূলে সমর্পিত হয়ে সিদ্ধান্ত করা অতি উত্তম। প্রকৃষ্টতর এই পদ্ধতিই ইমানদারদের আচরণীয় পদ্ধতি। শুভ পরিণাম নির্ভর করে এমতো পদ্ধতির উপরেই।

শায়বীর মাধ্যমে ইবনে জারীর লিখেছেন, এক ইহুদী ও এক মুনাফিকের মধ্যে কোনো এক বিষয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি হলো। ইহুদী বিষয়টি রসুল স. এর দরবারে পেশ করতে চাইলো। কারণ, কাফের হলেও তার এই বিশ্বাস ছিলো যে, রসুল স. অবশ্যই ন্যায়বিচার করবেন। কিন্তু মুনাফিক এতে রাজী ছিলো না। কারণ, সে জানতো রসুল স. কখনোই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবেন না। সে চাইলো ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই মিটমাট করে নিতে। এ রকম করা হলে বরং ঘুষ দিয়ে ইহুদীকে বশে রাখা সম্ভব হবে। সে তখন ইহুদীকে নিয়ে এক গণকের কাছে গেলো। গণক ছিলো জুহুনিয়া গোত্রের। ফয়সালার জন্য তারা বিষয়টি পেশ করলো সেই গণকের কাছে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ছা'লাবী, হজরত আবুল আসওয়াদ থেকে ইবনে আবী হাতেম মুরসাল হিসেবে এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী ও আবু সালেহের মাধ্যমে বাগবী উল্লেখ করেছেন, ইহুদীটির নাম ছিলো বাশার। জনৈক মুনাফিকের সঙ্গে তার বচসা হলো। ইহুদী বললো, চলো তাহলে মোহাম্মদের নিকট গিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করি। মুনাফিক বললো, না বরং চলো কাব ইবনে আশরাফের (মুনাফিকদের নেতা) কাছে যাই। মনে হয় ইহুদীর দাবীই সত্য ছিলো। তাই সে রসুল স. এর মীমাংসা মেনে নিতে চেয়েছিলো। কারণ, সে অবিশ্বাসী হলেও এ কথা ভালো করেই জানতো যে, রসুল স. কখনোই ছলচাতুরীকে প্রশ্রয় দিবেন না। ন্যায়বিচারই তাঁর স্বভাব। ইহুদী কিছুতেই মুনাফিকের প্রস্তাবে সম্মত হলো না। শেষ পর্যন্ত রসুল স. এর নিকট বিষয়টি উত্থাপিত হলে সিদ্ধান্ত গেলো ইহুদীর পক্ষে। মুনাফিক এ রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সে ইহুদীকে বললো, চলো এবার ওমরের নিকট যাই। তার ধারণা ছিলো, হজরত ওমর যেহেতু কাফেরদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন, তাই তার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই কাফেরের বিরুদ্ধেই যাবে। ইহুদী ও মুনাফিক তখন হজরত ওমরের নিকটে গিয়ে ঘটনাটি খুলে বললো। ইহুদী এ কথাও বললো যে, বিষয়টি সম্পর্কে রসুল স. সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ এতে সন্তুষ্ট নয়। হজরত ওমর বললেন, তাই নাকি? মুনাফিক বললো, হ্যাঁ। হজরত ওমর বললেন, একটু অপেক্ষা করো— আসছি। তিনি ঘরে গিয়ে একটু পরে খোলা তলোয়ার নিয়ে এলেন। তারপর মুনাফিককে হত্যা করে বললেন, যে ব্যক্তি মোহাম্মদ স. এর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়, এ রকম শাস্তিই তার জন্য উপযুক্ত। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬০

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

❐ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবী করে যে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে, অথচ তাহারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হইতে চায়—যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে মুনাফিকদের অবস্থা জানিয়ে দিয়েছেন। মুনাফিকদের মৌখিক দাবী হচ্ছে, তারা রসুল স. এর প্রতি এবং পূর্ববর্তী রসুলদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সমূহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের আচরণ কিরকম দেখুন, তারা বিচার মীমাংসার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানবিরোধী সিদ্ধান্ত চায়। শরণাপন্ন হতে চায় তাগুতের। 'তাগুত' বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে কাব ইবনে আশরাফকে অথবা জুহুনিয়া গোত্রের সেই গণককে। 'তাগুত' শব্দটি এসেছে 'তুগিয়ান' থেকে। এর অর্থ সীমালংঘন। তাগুত বলে শয়তানকেও নির্দেশ করা যায়। কাব বিন আশরাফ এবং ওই গণকটিও শয়তান। অথবা শয়তানী স্বভাবসম্পন্ন। তাদের নিকট মীমাংসা চাওয়ার প্রকৃত অর্থ শয়তানের কাছেই মীমাংসা চাওয়া।

হজরত ওমর কিন্তু তাগুত নন। কিছুতেই নন। তাই তিনি রসুল স. এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হওয়াতে খড়গহস্ত হয়েছিলেন। খাঁটি মুমিনের আচরণ এ রকমই। তাঁর সম্পর্কে হজরত জিবরাইল বলেছেন, ওমর হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। তাই তিনি ফারুক নামে ভূষিত হয়েছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, আবু বুরদা আসলামী নামে এক গণক ছিলো। সে ইহুদীদের পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে দিতো। ইহুদীদের দেখাদেখি কতিপয় মুসলমানও তার কাছে যাওয়া আসা শুরু করলো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

ইকরামা অথবা সাঈদের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন এ রকম—হাল্লাস বিন সামেত, মোতাব বিন কুশাইর, রাফে বিন জায়েদ এবং বাশার নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো। স্বসম্প্রদায়ের কিছু লোকের সঙ্গে তাদের বিবাদ দেখা দিলো। মুসলমানেরা বললেন চলো, রসুল স. এর নিকটে গিয়ে বিবাদ মীমাংসা করি। কিন্তু তারা বললো, তার চেয়ে চলো ওই গণকের কাছেই যাই। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

সুদ্দীর মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া লোকদের কিছু সংখ্যক ছিলেন খাঁটি মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক ছিলো মুনাফিক। মূর্খতার যুগে বনী নাজির ও বনী কুরায়জা সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে নিয়ম ছিলো, কুরায়জাদের কেউ নাজিরদের কাউকে হত্যা করলে তারা কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) নিতো। অথবা দিয়ত (রক্তপণ) হিসেবে গ্রহণ করতো শত ওসক খেজুর কিংবা খোরমা। আর নাজিরদের কেউ কুরায়জার কাউকে হত্যা করলে রক্তপণ হিসাবে ষাট ওসক খোরমা বা খেজুর দিতে হতো। কিসাস হতো না। বনী নাজির সম্প্রদায় ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী। বনী কুরায়জারা ছিলো সংখ্যালঘু ও দুর্বল। খাজরাজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারা ছিলো সন্ধিবদ্ধ। আর বনী নাজিরেরা ছিলো আউস গোত্রের মিত্র। রসুল স. এর মদীনা আগমনের পর নাজির সম্প্রদায়ের একজন কুরায়জাদের একজনকে হত্যা করলো। বিচার সালিস শুরু হলো। বনী নাজির বললো, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম হলো, আমাদের কেউ তোমাদেরকে হত্যা করলে তোমরা কিসাস গ্রহণ করতে পারবে না। রক্তপণ হিসাবে কেবল পাবে ষাট ওসক খেজুর। আর তোমরা হত্যা করলে আমরা কিসাসও গ্রহণ করতে পারি অথবা রক্তপণ হিসাবে একশত ওসক খেজুর দাবী

করতে পারি। সুতরাং প্রচলিত নিয়মানুসারে এখন আমরা রক্তপণের ষাট ওসক দিতে রাজী। তখন কুরায়জার মিত্র খাজরাজ সম্প্রদায় বললো, এতো ছিলো মূর্খতার সময়ের নিয়ম। তোমরা ছিলে সংখ্যাগুরু। তাই এ রকম অন্যায় নিয়ম জারী রাখতে পেরেছিলে। কিন্তু এখন সে নিয়ম চলবে না। এখন আমরা মুসলমান। বনী কুরায়জারও কেউ কেউ মুসলমান। আমরা মুসলমানেরা ভাই ভাই। এখন আমরা সংখ্যায় ও শক্তিতে তোমাদের সমকক্ষ। তাই এখন তোমরা আর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারো না। উভয় পক্ষের কতিপয় মুনাফিক বললো, আবু বুরদা আসলামী গণকের নিকটে চলো, সে-ই এ বিষয়ে মীমাংসা করে দিবে। উভয় পক্ষের মুসলমানেরা বললেন, না। বরং রসুল স. এর দরবারে চলো। মুনাফিকেরা তাদের মতেই স্থির রইলো। অতঃপর আল্লাহ্ কিসাস সম্পর্কিত আয়াত ও এই আয়াতটি নাজিল করলেন।

আয়াতে মুনাফিকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তোমাদেরকে তো তাগুতের শরণাপন্ন হতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। ইমানের দাবীদার হলে অবশ্যই তাগুতের বিরুদ্ধাচরণকারী হতে হবে। ইহুদী গণক ও শয়তানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে হবে অবিশ্বাসকে। অবিশ্বাসীকে। অন্যত্র আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, 'ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন কোরো না।'

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায়, তাদের কথায় আস্থা রাখে এবং ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয় অথবা তার সঙ্গে পায়ুসঙ্গম করে, সে ওই নির্দেশাদি থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে— যা অবতীর্ণ হয়েছে মোহাম্মদ স. এর উপর। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় এ বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন আহমদ ও আসহাবে সুনান।

হজরত ওয়াসেলা থেকে শিথিল সূত্রে তিবরানী লিখেছেন, যে গণকের কাছে সমাধান জানতে চাইবে— চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার তওবা কবুল হবে না। আর তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে।

শয়তান, মানুষ ও জ্বীন উভয় সম্প্রদায়েই আছে। এ সকল শয়তানের উদ্দেশ্য, মুসলমানদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করা। সর্বক্ষণ ওই শয়তানেরা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করাবার অপপ্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ○

❒ তাহাদিগকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে এবং রসূলের দিকে আইস, তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইতে দেখিবে।

যখন মুনাফিকদেরকে বলা হয়, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন এবং রসুল স. যা নির্দেশ করেন তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতদৃষ্টে বুঝা যায়, আল্লাহ্র নির্দেশাদি অবতীর্ণ না হলে কোনো কোনো ব্যাপারে রসুল স. ইজতেহাদ করতেন। তাঁর পবিত্র ইজতেহাদও এক ধরনের ওহী (ওহীয়ে খফি বা গোপন প্রত্যাদেশ)। তাই এখানে আল্লাহ্র কথা এবং রসুলের কথা পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাঁর দিকে এবং রসুলের দিকে।

ন্যায়বিচারকে মুনাফিকেরা ভয় পায়। তাই তারা রসুল স.কে এড়িয়ে চলতে চায়। ভাবে, অন্য কারো নিকট মীমাংসা প্রার্থী হলে ফয়সালাকারীকে ঘুষ দিয়ে অপমীমাংসা করানো সম্ভব। এটাই অসৎস্বার্থ বজায় রাখার পদ্ধতি।

আয়াতের শেষ শব্দটি হচ্ছে 'সুদুদা'। জাওহারী লিখেছেন, এর অর্থ বিমুখ হওয়া, বিরত থাকা। শব্দটি সকর্মক, অকর্মক—উভয় ক্রিয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে, 'ফাছাদ্দা হুম আনিস্ সাবিল'—তাকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, বাধা দিয়েছে।

বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর যখন ওই মুনাফিককে হত্যা করলেন, তখন তার উত্তরাধিকারীরা রক্তপণের দাবী নিয়ে হাজির হলো রসুল স. সকাশে। তারা কসম খেয়ে বললো, নিহত লোকটি রসুল স. এর সিদ্ধান্তকে অমান্য করেনি। এ রকম অসৎ উদ্দেশ্যে সে হজরত ওমরের কাছে যায়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো যেনো হজরত ওমর উত্তম আচরণের মাধ্যমে বাদী বিবাদীদেরকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়ে দেন। তাদের এ রকম কৌশলমূলক কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬২

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا○

❐ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাহাদের কোন মুসিবত হইবে তখন তাহাদের কী অবস্থা হইবে? অতঃপর তাহারা আল্লাহের নামে শপথ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া বলিবে 'আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাহি নাই।'

আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'কাইফা' শব্দটি একটি বিস্ময়বোধক প্রশ্নবাণ। অর্থ হচ্ছে, কী বিস্ময়ের ব্যাপার! রসুল স. কে সরাসরি অমান্য করার পরও তারা অবলীলায় কীভাবে কসম খাচ্ছে। এমতো মিথ্যা শপথ তারা উচ্চারণ করে কী করে? কী ঘৃণ্য আচরণ নিহত মুনাফিকের উত্তরাধিকারীদের। হজরত ওমরের মতো সত্য প্রেমিকের প্রতি তারা কী জঘন্য অপবাদ আরোপ করতে উদ্যত হয়েছে। কী নির্দ্বিধায় মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে তারা বলে যাচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো, হজরত ওমরের মাধ্যমে শত্রুতার পরিবর্তে যেনো পারস্পারিক সম্প্রতি স্থাপিত হয়ে যায়। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস রসুল স. ই আমাদের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। তাই আমরা হজরত ওমরের নিকট এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম যেনো রসুল স. এর সিদ্ধান্তের অনুসরণেই তিনি আমাদেরকে মিলিয়ে দেন। ভবিষ্যতে বিশৃংখলার অবকাশ যেনো আর না থাকে। কল্যাণ ও প্রীতি ছাড়া আমরা অন্য কিছুই চাই না।

মুনাফিকদের কসম খাওয়ার ব্যাপারটা ভবিষ্যতকালবোধক ধরে নিলে অর্থ হবে এ রকম— যখন তাদের উপর (আখেরাতে) আযাব নেমে আসবে, তখন তারা এ রকম মিথ্যা কসম কেমন করে খাবে? আখেরাত হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার চিরতরে পৃথক হওয়ার স্থান। সুতরাং তাদের এই অপপ্রচেষ্টা বিস্ময়কর নয় কি?

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৩

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ○

❐ ইহারাই তাহারা যাহাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা বল।

এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা এ সকল মুনাফিককে ভালো করেই চেনেন। তারা যতোই কসম করুক, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোজখ। অতএব হে প্রিয়তম নবী! আপনি শান্ত থাকুন। তাদেরকে উপেক্ষা করুন। তাদের কোনো নিবেদনকে আপনি গ্রহণীয় বিবেচনা করবেন না। বরং তাদেরকে মর্মস্পর্শী উপদেশ দিন, যেনো তারা কপটতা পরিহার করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। আপনি রসুল। তাই মানুষের অন্তর বিগলিত হয় এমন হৃদয়স্পর্শী নির্দেশনা প্রদানই আপনার জন্য শোভনীয়।

হাসান বসরী বলেছেন, 'ক্বওলাম বালিগা' অর্থ— এ রকম বলুন, তোমরা অন্তরের অপবিত্রতা সহই মারা যাবে। আয়াতের শেষ শব্দদ্বয় 'ক্বওলাম বালিগা' (মর্মস্পর্শী কথা) সম্পর্কে অন্যান্য আলেমগণ বলেন, এর অর্থ হবে আল্লাহ্‌র আযাবের ভীতিপ্রদর্শনসূচক কথা বলা।

আল্লামা জামাখশারী তাঁর তাফসীরে কাশ্‌শাফে লিখেছেন, 'ফী আনফুসিহিম' শব্দের সঙ্গে 'ক্বওলাম বালিগা' অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ এমন কথা বলো যা (শ্রুতির মাধ্যমে অথবা শ্রুতি ব্যতিরেকেই) অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যায়।

বায়যাবী কাশ্‌শাফ রচয়িতার বক্তব্যকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বালিগা' হচ্ছে 'ক্বওলান' এর বিশেষণ। সুতরাং ক্বওলান এর পরে স্পষ্ট বিশেষণ ব্যবহার হওয়ায় ক্বওলান এর আগে বিশেষ্য ব্যবহারের সুযোগ নেই। বায়যাবীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এ রকম বলা যায় যে, 'ফী আনফুসিহিম' এর পূর্বে 'ক্বওলাম বালিগা' শব্দটি উহ্য আছে। সেই উহ্য কথাটিই তাফসীরে এনে বসানো হয়েছে।

আয়াতের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুনাফিকদেরকে শাস্তি না দিয়ে নসিহত করার কথা বলার কারণ— মুনাফিকেরা প্রকাশ্যতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভূত। তাই তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলে কাফেরেরা দেখতে পাবে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। এতে করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রভাব পড়বে কাফেরদের উপরেও। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে মুনাফিকদের শাস্তি বিধান করার নির্দেশ দেননি। বরং বিনম্র উপদেশ দিতে বলেছেন। এ রকম একক উপদেশ অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৪

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ
جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ○

❐ রসূল এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছি যে আল্লাহের নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য করা হইবে। যখন তাহারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তাহারা তোমার নিকট আসিলে ও আল্লাহের ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিলে তাহারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু রূপে পাইত।

এরশাদ হয়েছে— হে নবী! আপনি তাদেরকে রসুল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দিন। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র হুকুমে যেনো তাঁদের (নবীদের) আনুগত্য করা হয়। 'বিইজনি' অর্থ হুকুম। 'বিইজনিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নবীকে মান্য করবে। তাঁর হুকুম

অনুযায়ী জীবন গঠন করবে। সকল ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তকেই শিরোধার্য করবে। যে এ রকম করবে না, সে হত্যার উপযোগী হবে। কারণ, রসুলের মীমাংসা না মানার অর্থ হচ্ছে রেসালতের অবমাননা করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কেই অবমাননা করা। কারণ, রসুল নির্বাচন করেন আল্লাহ্‌তায়ালাই।

'আর যখন তারা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করে' (অভ্যন্তরীণ অপরিচ্ছন্নতার কারণে অন্যের মীমাংসামুখী হয়), তখন তাদের কর্তব্য হবে তওবা করা। তখন তওবার উদ্দেশ্যে যদি তারা আপনার শরণাপন্ন হয়, খাঁটি নিয়তে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর সেই সঙ্গে রসুলও যদি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তবে তারা দেখবে, আল্লাহ্ তায়ালা কতোইনা ক্ষমাপরায়ণ, কতোইনা দয়ালু। অপরাধীদের ক্ষমাপ্রার্থনার সঙ্গে তাদের জন্য রসুলের ক্ষমাপ্রার্থনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, রসুলের অত্যুচ্চ মর্যাদাকে সুপ্রমাণিত করা।

ক্ষমাপ্রার্থনা করলে সকল অপরাধেরই ক্ষমা আছে। অপরাধ যতো বড় হোক না কেনো, অপরাধের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। ক্ষমাপ্রার্থনাকারীকে আল্লাহ্‌পাক বিমুখ করেন না। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৫

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

❒ কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা বিশ্বাস করিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে উহা মানিয়া লয়।

সিহাহ্ সিত্তায় (বোখারী, মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজি, নাসাঈ, এবং সুনানে ইবনে মাজায়) লিপিবদ্ধ রয়েছে, হেরার কোনো এক পাহাড়ী নালা থেকে জমিতে পানি দেয়ার ব্যাপারে হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম এবং জনৈক আনসারীর মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। রসুল স. এর দরবারে তাঁরা বিচার প্রার্থী হলেন। রসুল স. বললেন, জোবায়ের তুমি প্রথমে তোমার বাগানে পানি দেয়ার পর আনসারীর বাগানের দিকে পানি ছেড়ে দিও। আনসারী এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। বললেন, জোবায়ের আপনার ফুফাতো ভাই। সেজন্যেই

আপনি এ রকম সিদ্ধান্ত দিলেন। এ কথা শুনে রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হলো। তিনি স. বললেন, জোবায়ের! তুমি নালার পানি দিয়ে বাগানের জমি ভেজাবার পর নালা বন্ধ করে দিও যেনো পানি বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত ওঠে। তারপর পানি ছেড়ে দিও। রসুল স. এর প্রথম সিদ্ধান্তটি এ রকম ছিলো, যাতে করে হজরত জোবায়েরের যেনো অধিক অসুবিধা না হয়, আবার আনসারীও যেনো সুবিধা লাভ করে। আনসারী যখন এই সিদ্ধান্তে অপ্রসন্ন হলো, তখন তিনি স. দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে হজরত জোবায়েরের পূর্ণ অধিকার বলবৎ করে দিলেন। হজরত জোবায়ের বলেছেন, যতোটুকু জানা যায়, তাতে এই ঘটনা সম্পর্কেই এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

কবীর গ্রন্থে তিবরানী এবং মসনদ গ্রন্থে হুমায়দী হজরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তির সঙ্গে হজরত জোবায়েরের বিবাদ দেখা দিয়েছিলো। বিষয়টি উপস্থাপিত হলো রসুল স. এর দরবারে। তিনি স. সিদ্ধান্ত দিলেন হজরত জোবায়েরের পক্ষে। তখন ওই লোকটি বললো, রসুল স. এর ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে এ রকম সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, এক আনসারীর সঙ্গে হজরত জোবায়েরের বিবাদ দেখা দিলো। আনসারীর নাম ছিলো হাতেব বিন আবী বালতা। হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত জোবায়ের এবং হাতেব বিন বালতাকে উপলক্ষ করে। পানিসিঞ্চন সম্পর্কে দু'জনের বচসা দেখা দিয়েছিলো। রসুল স. তাঁর ফয়সালা ঘোষণা করে বলেছিলেন, প্রথমে উঁচু জমিতে পানি দিতে হবে। তারপর নিচু জমিতে।

আমি বলি, এই ঘটনার সঙ্গে হাতেব বিন আবী বালতা জড়িত নন। কারণ, তিনি আনসারী ছিলেন না। ছিলেন মুহাজির। বদর যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে যে আনসারী জড়িত ছিলো, সে ছিলো প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক। আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে বংশগত সম্পর্ক থাকার কারণে তাকে আনসারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বাগবী বলেছেন, বিষয়টি মীমাংসার পর উভয়ে চলে যাওয়ার সময় হজরত মেকদাদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। হজরত মেকদাদ জিজ্ঞেস করলেন, কার পক্ষে ফয়সালা হলো? আনসারী মুখ বাঁকিয়ে বললো, তাঁর ফুফাতো ভাইয়ের পক্ষে। হজরত মেকদাদের কাছে উপস্থিত ছিলো এক ইহুদী। সে আনসারীর অবজ্ঞা প্রদর্শন দেখে বললো, আল্লাহ্ একে ধ্বংস করুন। এরা কেমন লোক। এরা রেসালাত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, অথচ রসুলের নির্দেশ উপেক্ষা করে। আল্লাহ্র কসম! বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসার সময় গোনাহ্ করেছিলো। হজরত মুসা নির্দেশ দিয়েছিলেন— তওবা স্বরূপ তারা একে অপরকে হত্যা করবে। বনী ইসরাইল তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করেছিলো। নবীর নির্দেশ মানতে গিয়ে তাদের সত্তর হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তবু তাঁরা নবীর ফয়সালায় সন্দেহ করেননি। হজরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহ্র কসম! মোহাম্মদ স. যদি আমাকে আত্মহত্যা করতে নির্দেশ দেন তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে হত্যা করবো।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ ও শাযবীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিক বাশার এবং জনৈক ইহুদীকে লক্ষ্য করে। তারা কোনো এক বিষয়ে রসুল স. এর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েছিলো। রায় ঘোষিত হয়েছিলো ইহুদীর পক্ষে। তারপর তারা হজরত ওমরের নিকট পুনঃবিচার প্রার্থী হলে হজরত ওমর মুনাফিক বাশারকে হত্যা করেছিলেন। ইতোপূর্বে এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয়, ওই দুইজনের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াতের 'লা' শব্দটিকে না সূচক ধরে নিলে অর্থ হবে এ রকম—ঘটনাটি এমন নয় যেমন ওই মিথ্যা ইমানের দাবীদার করেছিলো। ইমানের স্বীকৃতি দেয়ার পরও সে আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হচ্ছিলো না। কসম আপনার প্রতিপালকের! বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ব্যাপারে আপনার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত তারা ইমানদার নয়। এ রকমও হতে পারে যে, 'ফালা ওয়া রব্বিকা'—র মধ্যে 'লা' শব্দটি অতিরিক্ত কসমের তাগিদে এসেছে। অর্থাৎ আপনার আল্লাহ্‌র কসম, এ ব্যাপারটি নিশ্চিত যে, ওই ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না সে পারস্পরিক মতবিরোধপূর্ণ ব্যাপারগুলো সমাধানকল্পে আপনাকে বিচারক নির্ণয় না করে। 'শাজার' শব্দটির অর্থ বৃক্ষ। কিন্তু এখানে অর্থ হবে মতভেদ। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে, মতভেদও তেমনি বিভিন্ন গতি ও অবস্থাসম্পন্ন।

'হারাজান' শব্দটির অর্থ সন্দেহ। এ কথা বলেছেন মুজাহিদ। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমানের দাবীদারেরা অবশ্যই আপনাকে দ্বিধাহীনতার সঙ্গে মেনে নিবে। আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তারা কোনো দ্বিধা-সন্দেহকে প্রশ্রয় দিবে না। আপনাকে এবং আপনার সিদ্ধান্তকে মান্য করবে সর্বান্তকরণে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৬

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ○

❒ যদি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম যে তোমরা নিহত হও অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাহাদের অল্প সংখ্যকই ইহা করিত। যাহা করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তাহা করিলে তাহাদের ভাল হইত এবং চিত্তস্থিরতায় তাহারা দৃঢ়তর হইত।

বাইরে বিশ্বাসী—অন্তরে অবিশ্বাসী, যারা এ রকম তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক। আর রসুল স. এর সাহাবা তাঁরাই যাঁরা অন্তরে বাইরে পূর্ণ বিশ্বাসী। মুনাফিক ও সাহাবীগণের বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিলো। পার্থক্য ছিলো অন্তরে। এই

আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুনাফিকদেরকে। সাহাবীগণকে নয়। সাহাবীগণতো আল্লাহ্‌তায়ালার আনুগত্য করার জন্য সদা উন্মুখ। আল্লাহ্ তাদের প্রশংসায় অন্যত্র বলেছেন, 'তোমরাই উত্তম উম্মত যাদের অভ্যুদয় ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে।' আর এক স্থানে বলেছেন, 'তারা সৎকাজে পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী।' রসুল স. বলেছেন, উত্তম সময় আমার সময়। অন্য হাদিসে এসেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সহচরবৃন্দকে মনোনীত করে নিয়েছেন।

এই আয়াতে যদি সাহাবীরা সম্বোধিত হতেন তবে তাঁরা হজরত মুসার ওই উম্মতদের মতোই প্রমাণিত হতেন যাঁরা হজরত মুসার নির্দেশে তওবা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করেছিলেন। নির্দেশ পালন করতে দ্বিধান্বিত হবেন, এ রকম বিশ্বাসহীনতা সাহাবীগণের চরিত্রে সম্পূর্ণতঃই অনুপস্থিত।

জ্ঞাতব্যঃ সম্মানিত গ্রন্থকার র. এই কালামের উদ্দেশ্য বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন মনে হয়। 'যদি তাহাদেরকে আদেশ দিতাম'—বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা যদি মুনাফিক হয় তবে এ কথা কেনো বলা হলো 'অল্প সংখ্যকই ইহা করিত?' এ কথার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, মুনাফিকেরা নিহত হওয়ার এবং গৃহচ্যুত হওয়ার হুকুম অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করবে বটে কিন্তু কিছুসংখ্যক পালন করবে। অথচ সকল মুনাফিকদেরই হুকুম অমান্য করার কথা। আর যারা হুকুম পালন করবেন তাঁরা তো মুমিন। মুনাফিক নন। সুতরাং কীভাবে বলা যেতে পারে যে, আয়াতটির সম্বোধনস্থল কেবল মুনাফিকেরা। আর আয়াতে সম্বোধিতদের সকলকে সাহাবী তো বলা যেতে পারেই না। কারণ, তাঁরা সকলেই হুকুম মানবেন। কেউ মানবেন, কেউ মানবেন না— এ রকম নয়। কারণ, তারা খাঁটি ইমানদার। ইমানদারেরা হুকুম প্রত্যাখ্যানকারী হতেই পারেন না। এ সমস্ত চিন্তা করে সম্মানিত গ্রন্থকার স্থিরনিশ্চিত হতে পারেন নি যে, আয়াতের সম্বোধিতরা কারা? সাহাবীরা না মুনাফিকেরা। এই মন্তব্যের দৃষ্টিতে বুঝা যায়, এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে সকল মুসলমানকে। খাঁটি মুসলমান এবং মুনাফিক সকলকে। কারণ, দৃশ্যতঃ সকলেই মুসলমান। এ রকম ধারণা রাখাই উত্তম। তাহলেই বরং আয়াতের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ, পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'অল্প সংখ্যকই উহা করিত।' অর্থাৎ প্রকৃত মুমিনরাই হুকুম তামিল করতো। বাইরে বাইরে মুসলমানরূপে দৃষ্ট হলেও মুনাফিকেরা কিছুতেই নির্দেশ পালন করতো না। ইসলামের দাবীদার তো খাঁটি ও কপট সকলেই। এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের মধ্যে অর্থাৎ খাঁটি ও অখাঁটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

তাই আয়াতে মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, হে প্রিয়তম রসুল! যারা আপনার সিদ্ধান্তকে প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেনি, তাদেরকে যদি আমি নিহত হতে এবং গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে বলি, তবে তারা তা করতে গড়িমসি করবে।

'নিহত হও'—অর্থ আত্মহত্যা করো। বনী ইসরাইলেরা বাছুর পূজার মাধ্যমে হজরত মুসার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলো, তোমাদের অপরাধও সেরকমই। তোমরাও অন্যকে মীমাংসাকারী মেনে নিয়ে রসুলবিমুখ হয়েছো। তাদের উপর এ রকমই হুকুম দেয়া হয়েছিলো 'নিহত হও' (পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করো)।

'আপন গৃহ ত্যাগ করো'—অর্থ আপন জনপদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হও। বনী ইসরাইলদেরকে মিসর পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছিলো। বর্ণিত হুকুম দু'টি সম্পর্কে এ রকম ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, রসুলবিমুখতার কারণে বনী ইসরাইলদেরকে যেমন নিহত হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের পরিত্রাণের নিশ্চিতির জন্য যেমন জন্মভূমি পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো— সে রকম নির্দেশ যদি মুসলমান বলে পরিচিতদেরকে দেয়া হয়, তবে মুনাফিকেরা এই হুকুম তামিল করবে না। কিন্তু সাহাবীরা করবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তিনি ভালো করেই জানেন কে অনুগত। কে নয়।

সুদ্দীর বর্ণনা থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, এ আয়াতটি 'অল্প সংখ্যকই ইহা করিত'.... পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবী সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস এবং এক ইহুদীর মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। ইহুদী গর্ব ভরে বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্ আমাদের জন্য আত্মহত্যা ওয়াজিব করলে আমরা অবশ্যই তা করতাম। হজরত সাবেত বললেন, আল্লাহ্র কসম। এ রকম নির্দেশ আমাদের প্রতি ফরজ করা হলে আমরাও তা করতাম। এর পর অবতীর্ণ হলো আয়াতের অবশিষ্ট অংশটুকু। এরশাদ হলো, বর্ণিত হুকুম দু'টো অত্যন্ত কঠিন হলেও যারা এ দু'টোকে কার্যকর করতো তারা নিশ্চিতরূপে লাভ করতো চিরঅক্ষয় ইমান ও প্রভূত কল্যাণ।

হাসান এবং মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর, হজরত আম্মার বিন ইয়াসার, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ এবং আরো কতিপয় সাহাবা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাদেরকে এ রকম হুকুম দিলে আমরা অবশ্যই প্রসন্নচিত্তে তা পালন করতাম। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ্। আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ওই কঠিন বিপদ থেকে মুক্ত রেখেছেন। রসুল স. যখন সাহাবীগণের এ সকল মন্তব্য জানতে পারলেন তখন বললেন, আমার উম্মতের কারো কারো ইমান মৃত্তিকাস্থিত পাহাড়াপেক্ষাও অধিকতর মজবুতভাবে অন্তরে প্রোথিত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৭, ৬৮

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ○ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

❒ এবং তখন আমি আমার নিকট হইতে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপুরস্কার প্রদান করিতাম;

❒ এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করিতাম।

অনুগ্রহসিক্ত এরশাদ হয়েছে, হুকুম প্রতিপালনের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। সেই সঙ্গে রয়েছে সরল সহজ পথ প্রদানের অঙ্গীকার, যে পথে রয়েছে প্রভূত মর্যাদা ও আল্লাহতায়ালার কাংখিত সামীপ্য।

নির্ভুল সূত্রপরম্পরায় আবু নাঈমের মাধ্যমে তিবরানী লিখেছেন, জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে রসুল! আপনি আমার নিকট জীবন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। এখানে আপনার রূপচ্ছটা দেখে মোহিত হয়ে থাকি। কিন্তু ভাবতে পারি না পরবর্তীতে কী হবে। আপনি তো চলে যাবেন আপনার ভ্রাতৃবৃন্দ অন্যান্য নবী রসুলদের কাছে। আপনাকে পেয়ে ধন্য হবে সর্বোত্তম জান্নাত। আমরা থাকবো নিম্নস্তরে। আমরা তখন আপনার দর্শনবঞ্চিত হবো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত জিবরাইল নিয়ে এলেন নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৯

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

❐ কেহ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন সে তাহাদের সঙ্গী হইবেঃ যেমন, নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ! এবং তাহারা কত উত্তম সঙ্গী।

যাঁরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের অনুগত, ফরজ নির্দেশসমূহ ও সুন্নতসমূহ যাঁরা মেনে চলেন, তাঁরা আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজনদের সঙ্গ লাভে ধন্য হবেন। নবী, শহীদ ও অন্যান্য পুণ্যবানগণ আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে তিবরানী এ রকম বলেছেন।

ইবনে আবী হাতেম হজরত মাসরুকের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, সাহাবীগণ রসুল স.কে বললেন, পৃথিবীতে আমরা সামান্য সময়ও আপনার নিকট থেকে পৃথক থাকতে পারি না। পরজগতে আপনি হবেন অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী। আমরা তখন কী করে দর্শন পাবো আপনার?

ইবনে জারীর, হজরত রবীর বক্তব্যানুসরণে বলেছেন, সাহাবীগণ বলেন, আমরা জানি ইমানের জগতে রসুল স. এর মর্যাদা সর্বাধিক। কিন্তু তাঁকে যারা বিশ্বাস করেছে, তাঁর অনুসরণ করেছে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত ঘটবে কেমন করে (তাঁরা যেহেতু পৃথক পৃথক অবস্থানে থাকবেন)। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন এই আয়াত। বললেন, বেহেশতবাসীরা বেহেশতের বাগানে সম্মিলি[illegible] [illegible]য়ে

আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশ করবেন। উপরের স্তরের জান্নাতীগণ সকলেই নেমে আসবেন ওই বাগানে।

মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ লিখেছেন, হজরত রবীয়া বিন কাব আসলামী বলেছেন, আমি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হতাম। অজু ও ইস্তেঞ্জার পানির ব্যবস্থা করতাম আমি। তিনি স. একদিন বললেন, কিছু চাও। আমি নিবেদন করলাম, জান্নাতে আমি যেনো আপনার সঙ্গে থাকতে পারি। তিনি স. বললেন, আর কী চাও? আমি বললাম, ব্যস। এতোটুকুই। তিনি স. বললেন, তাহলে সেজদার সংখ্যা বাড়াতে থাকো। অর্থাৎ অধিক নামাজ পড়ো, যাতে করে তোমার নিবেদন বাস্তবায়নে সুপারিশ করতে পারি আমি।

হজরত ইকরামা বর্ণনা করেন, এক যুবক রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসুল, আপনার পবিত্র অবয়ব তো এখানে অহরহ দেখছি, কিন্তু কিয়ামতের দিন কী অবস্থা হবে? আপনি তো তখন থাকবেন অত্যন্ত উচ্চ অবস্থানে। ওই সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। রসুল স. যুবকটিকে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ্ তুমি জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে।

ইবনে জারীর মুরসাল হিসেবে হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের, হজরত মাসরুক, হজরত রবী, হজরত কাতাদা এবং সুদ্দী থেকে এই হাদিসটির বিবরণ দিয়েছেন।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর মুক্ত ক্রীতদাস হজরত সাওবান সম্পর্কে। রসুল স. কে তিনি অত্যধিক ভালোবাসতেন। রসুলবিরহ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একদিন রসুল স. দেখলেন, সাওবান বিষণ্ন ও চিন্তান্বিত। তিনি স. বললেন, তুমি বিমর্ষ কেনো? হজরত সাওবান বললেন, আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার বিরহ অসহনীয়। আখেরাতে আপনি আপনার নবী ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে অবস্থান করবেন অনেক উঁচু বেহেশতে। তখনকার বিরহভাবনাই আমাকে বিমর্ষ করেছে। তখন তো দেখতে পাবো না আপনাকে। হজরত সাওবানের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি।

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রীতিভাজনদের শ্রেণীবিন্যাস দেখিয়েছেন। তাঁরা হবেন চার শ্রেণীর। এতে দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিলাষ জাগ্রত করা হয়েছে। ওই তিন শ্রেণীর যে কোনোটিতে শামিল হওয়ার প্রচ্ছন্ন উৎসাহ দেয়া হয়েছে। শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে এভাবে—

১. নবী ও রসুল। তাঁরা প্রীতিভাজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর তাজাল্লীর অন্তরালবিহীন। নৈকট্যভাজন। তাঁরা বিনা মাধ্যমে জাতি নূরে রঞ্জিত। এ রকম জাতি তাজাল্লি সমৃদ্ধ পূর্ণত্বের নাম হচ্ছে কামালিয়তে নবুয়ত। আল্লাহ্তায়ালার জাতের ফয়েজ তাঁরা সরাসরি লাভ করে থাকেন। আর মাধ্যম হন ওই সকল মানুষের যাঁরা পূর্ণতার অনুসারী। কামেল ইনসানেরা (পূর্ণ মানুষেরা) এই নবী

রসুলগণের মাধ্যমে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে আল্লাহ্তালার নৈকট্যের স্তরসমূহ অতিক্রম করে চলেন। আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নির্বাচিত এই নবী, রসুলগণই আল্লাহ্র আহবান মানুষের নিকট পৌছে দেন এবং মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনকে করে তোলেন অর্থবহ।

২. সত্যবাদীগণ। এঁরা নবীর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অবস্থার পূর্ণ অনুসারী। তাঁরা অনুসারী হিসেবে কামালিয়তে নবুয়তের নূরে নিমজ্জিত। তাই নবীর পূর্ণ প্রতিনিধি।

৩. শহীদগণ। তাঁরা আল্লাহ্র পথে জেহাদরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই অনবদ্য কোরবানীর বিনিময় স্বরূপ তাঁরা জাতি নূরের এক বিশেষ পূর্ণত্ব অর্জন করে থাকেন।

৪. সৎকর্মপরায়ণ (সলিহীন)। এই পুণ্যবানেরা অন্যায় ও আবিলতা থেকে নফসকে (প্রবৃত্তিকে) পবিত্র রাখেন। তাঁদের অন্তর সদা জাগ্রত থাকে আল্লাহ্র স্মরণালোকে। সৃষ্টির প্রতি তাঁরা আন্তরিকভাবে আকর্ষণচ্যুত। তাঁদের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পাপমুক্ত। ফানা ও বাকা লাভের পর তাঁরাও লাভ করেন জাতি তাজাল্লির ছায়া প্রতিচ্ছায়া। এঁদেরকেই বলা হয় অলিআল্লাহ্ বা আউলিয়া। আল্লাহ্তায়ালার নূরসমুদ্রে নিমজ্জিত হলে ফানা সংঘটিত হয়। তখন সৃষ্টজগতের অনুভূতি অবলুপ্ত হয়। আর বাকা হচ্ছে ওই অবস্থা — আল্লাহ্ পাকের ইসম (নাম), সিফাত (গুণাবলী), শান (মর্যাদা) এবং ইতেবারাত (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুমান) এবং পবিত্রতা সমূহের জ্ঞানলাভের পর এমন স্থানে উপনীত হওয়া যা বর্ণনায়, ইঙ্গিতে প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থা অনুভবযোগ্য নয়। এ রকম আত্মিক পরিণতির নামই বাকা বা বাকা বিল্লাহ্।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্র অনুমোদন না থাকলে নবীগণ কাউকে হেদায়েত করতে পারেন না। প্রকৃত হাদী হচ্ছেন আল্লাহ্তায়ালা। মানুষ তাদের নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে নবীর মাধ্যমে ফয়েজ লাভ করে থাকেন এবং অবশেষে সফলতায় উপনীত হন।

নবীগণ মাধ্যমবিহীন তাজাল্লীয়ে জাতির অধিকারী। সিদ্দীক (সত্যবাদী) গণ নবীগণের মাধ্যমে তাজাল্লিয়ে জাতির নূরে স্থায়ীভাবে নিমজ্জিত। শহীদগণ লাভ করেছেন তাজাল্লীয়ে জাতির এক বিশেষ পূর্ণত্ব (অবশ্যই নবীর মাধ্যমে)। জাতি তাজাল্লীর সার্বক্ষণিক ফয়েজ তাঁরা পান না। কিন্তু জাতি তাজাল্লীর বিশেষ এক নূরে তাঁরা প্রোজ্জ্বল। আর আউলিয়া সম্প্রদায় নিমজ্জিত থাকেন সিফাতে তাজ্জাল্লীর নূরে। আর কখনো কখনো জাতি তাজাল্লীর ছায়া নয় বরং প্রতিচ্ছায়া পড়ে তাঁদের উপর। এখানেও নবীর মাধ্যম অপরিহার্য।

আল্লাহ্পাক এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, তিনি বেহেশতে ইমানদারদেরকে দীদার দানে ধন্য করবেন। তবে সেখানে দীদার লাভের স্তরগত পার্থক্য থাকবে। কারো দীদার লাভ হবে অধিক। কারো অল্প।

সিদ্দীকিয়াতের (সত্যবাদীতার) মাকামে (স্তরে) নবীগণও রয়েছেন। নবীগণ সিদ্দীক এবং নবী। আর যাঁরা নবী নন কেবলই সিদ্দীক— তাঁরা নবীদের মতোই পূর্ণত্বসম্পন্ন—কিন্তু তাঁদের অর্জনের অসিলা বা মাধ্যম হচ্ছেন নবী। সলিহীন (পুণ্যবান) গণ কেবলই সলেহীন। কিন্তু নবীগণ ও সিদ্দীকগণও সলেহীন (পুণ্যবান)। নবী হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক ও সলেহ (পুণ্যবান)। সিদ্দীকগণ হচ্ছেন সিদ্দীক ও সলেহীন। আর সলেহীন হচ্ছেন শুধুই সলেহীন।

আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কে বলেছেন, 'নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী নবী।' হজরত ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন, 'তিনি নেতা। তিনি সাধু এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভূত।' হজরত ঈসা সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'তিনি দোলনায় অবস্থানকালে পরিণত বয়সীদের মতো কথা বলবেন। তিনি পুণ্যবানদের একজন।'

আমার পীর ও মোর্শেদ ইমাম মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা যখন শহীদ হলেন, তখন আমি তাঁর মৃত্যুদিবস নিয়ে চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ আমার অন্তরে উদ্ভাসিত হলো এই আয়াতটি— 'ফা উলায়িকা মাআল্লাজিনা আনআমাল্লহ্......' আমি তখন হিসেব বের করতে সক্ষম হলাম। মৃত্যুর বছর ১১৯৫ হিজরী নির্ধারণ করা গেলো। ওয়াল হামদুলিল্লাহ্।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, 'ওয়া হাসুনা উলায়িকা রফিক্বা।'—এর অর্থ তাঁরাই (উপরোক্ত চার শ্রেণীর মানুষেরাই) উত্তম সঙ্গী। 'রফিক্বা' শব্দটি পার্থক্যজ্ঞাপক বিশেষ্য অথবা অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষ্য। এই শব্দটি একবচন ও বহুবচন— সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭০

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

❑ ইহা আল্লাহের অনুগ্রহ। জ্ঞানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানেরা আল্লাহ্তায়ালার প্রিয়জন। কেবল আল্লাহ্র নিছক অনুগ্রহেই তাঁদের সঙ্গী হতে পারা যায়। তাঁদের সঙ্গী হওয়া মানে তাঁদের দলভুক্ত হওয়া। তাঁদের সকলের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আর মহব্বত বা প্রেম-ভালোবাসা এমনই বিষয় যার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্তায়ালাই সম্যক জ্ঞাত। দুই কাঁধের আমল লেখক ফেরেশতারা এর কোনো কিছুই জানতে পারে না।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এক লোক এক সম্প্রদায়কে ভালোবাসে। কিন্তু সে ওই সম্প্রদায়ের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম নয়। দূর থেকেই সে তাদেরকে ভালোবাসে। রসুল স. বললেন, ওই ব্যক্তি (প্রকৃত অর্থে) তাদেরই সঙ্গী যাদেরকে সে ভালোবাসে। আহমদ, বোখারী, মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমে এই হাদিসটি হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কিয়ামত সংঘটিত হবে কখন। রসুল স. বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো। আমি বললাম, অন্য কিছুতো নেই। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলকে ভালোবাসি। রসুল স. বললেন, তবে তুমি তাঁদেরই সঙ্গী যাদেরকে তুমি ভালোবাসো। বর্ণনাকারী হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এর এই পবিত্র বাণী শুনে মুসলমানদেরকে ইসলাম আগমনের পর আর কখনো এতো আনন্দিত হতে দেখা যায়নি। বোখারী, মুসলিম।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা যে অনুগ্রহের কথা বলেছেন—তা অনুগ্রহভাজন বান্দাদের মর্যাদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অনুগ্রহভাজন বান্দাগণের নিকট থেকে ফয়েজ লাভ করাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। নিজস্ব সাধনার মাধ্যমে এই অনুগ্রহ অর্জনের যোগ্য হওয়া যায় না।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমল দুরস্ত রাখো। কিন্তু মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) কখনোই আমল নির্ভর নয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনিও কি? তিনি স.বললেন, আমিতো তাঁর রহমতবেষ্টিত। বোখারী, মুসলিম।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ○
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ
إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ○ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ
كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا
عَظِيمًا ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর; অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা এক সঙ্গে অগ্রসর হও।

❐ তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে গড়িমসি করিবেই। তোমাদের কোন মুসিবত হইলে সে বলিবে, 'তাহাদের সহিত না থাকায় আল্লাহ্‌ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।'

❐ আর তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ হইলে, যেন তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই এমনভাবে বলিবেই, 'হায়! যদি তাহার সহিত থাকিতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করিতাম।'

এরশাদ হয়েছে, (জেহাদের জন্য) সতর্ক হও অর্থাৎ অস্ত্রসজ্জিত হও। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অথবা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হও।

বিভিন্ন দল অর্থ ছোট ছোট সেনাদল। এ রকম বলেছেন মুজাহিদ। আর হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— দশ কিংবা দশের অধিক সৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল।

অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ জারী করার পর বলা হয়েছে, দেখবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই নির্দেশ প্রতিপালনে গড়িমসি শুরু করেছে।-এ রকম তারা করবেই। কারণ, তারা ইমানদার নয়। মুনাফিক। তারা কেবল নিজেরা গড়িমসি করেই ক্ষান্ত হবে না, অন্যদেরকেও জেহাদে গমন করতে নিরুৎসাহিত করবে। যেমন উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই কিছু লোককে যুদ্ধে যেতে বাধা দিয়েছিলো। মুনাফিকেরা এ রকমই করে। তারা সাগ্রহে যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে। যদি দেখে মুসলমান বাহিনী বিপদগ্রস্ত হয়েছে, তবে বলে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ রয়েছে আমাদের প্রতি। তাই আমরা মুসলমানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পেরেছি। নতুবা মুসলমানদের মতো আমরাও বিপদগ্রস্ত হতাম।

ফলাফল বিপরীত হলে তারা আক্ষেপ করতে থাকে। বলে, হায়! আমরা যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তবে কতোইনা উত্তম হতো। সাথে থাকলে যুদ্ধবিজয়ের গৌরব আমরাও পেতাম। আর সেই সঙ্গে পেতাম গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)। তাদের এ সকল কথায় পরিষ্কার বুঝা যায়, তোমাদের প্রতি তাদের কোনো মহব্বত বা ভালোবাসা বলে কিছু নেই। তাদের ভালোবাসা কেবল বিজয় ও সম্পদের প্রতি। তারা হিংসুক। তোমাদের সফলতা তাদের অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আর তোমাদের বিপদগ্রস্ততা তাদেরকে আনন্দিত করে। এই হচ্ছে মুনাফিকদের পরিচয়। হে ইমানদারগণ, তাদেরকে ভালো করে চিনে নাও।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৪

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ
وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

❐ সুতরাং, যাহারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করুক, এবং কেহ আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।

জেহাদ আল্লাহ্র হুকুম। তাই পূর্বের আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রসজ্জিত হও। তারপর আল্লাহ্র পথে জেহাদে অবতীর্ণ হও। মুনাফিকদেরকে আমলে এনো না। তারা যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে করতে দাও। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধযাত্রা করা। সুতরাং অগ্রসর হও।

এই আয়াতে বলা হলো, 'যাহারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে'—এ কথার লক্ষ্য হচ্ছেন ওই সকল বিশুদ্ধচিত্ত মানুষ, যাঁরা আখেরাতের কল্যাণ লাভের আশায় তাঁদের পার্থিব জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এ কথার মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে মুনাফিকদেরকে। সুতরাং অর্থ হবে এ রকম— তোমরা যারা আখেরাতকে ছেড়ে দুনিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছো তাদের কর্তব্য হবে বিশুদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বন করা। নেফাক (অপবিত্রতা) পরিত্যাগ করতে হবে। জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ রকম না করলে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে লাভ হবে কেবলই গ্লানি। কেবলই আক্ষেপ।

এরশাদ হয়েছে, জেহাদে নিহত হওয়া অথবা বিজয়ী হওয়া উভয় অবস্থাই কল্যাণকর। নিহত হলে লাভ হবে শাহাদাতের বিরল সৌভাগ্য। আর বিজয়ী হলে লাভ হবে সম্মান ও সম্পদ। কিন্তু এ সকল কিছু মূল লাভ নয়। আখেরাতের সওয়াব লাভই হচ্ছে মূল সফলতা। এই সওয়াব শহীদও পাবেন। গাজী (বিজয়ী)ও পাবেন। বিজয়ীদের সম্মান ও সম্পদ আখেরাতের সওয়াব লাভের প্রতিবন্ধক হবে না। কারণ, জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করাই ছিলো মুজাহিদদের উদ্দেশ্য।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ইমান এবং রসুলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় (পার্থিব লাভালাভ যদি তার উদ্দেশ্য না থাকে), আল্লাহ্ তাকে তাঁর আপন জিম্মায় নিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে সওয়াব ও গণিমতের মালসহ বিজয়ীর বেশে স্বগৃহে প্রবেশ করাবেন অথবা (শাহাদাতের মাধ্যমে) তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার দ্বিতীয় বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদলিপ্তরা বিরতিহীন রোজা পালনকারী, সারারাত ইবাদত সম্পাদনকারী এবং বিনয়াবনত কোরআন পাঠকারীর মতো। মুজাহিদেরা এ রকম অবস্থায় থাকবে গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। আল্লাহ্ তাদেরকে সওয়াব ও গণিমতসহ গৃহগমনের সুযোগ দিবেন অথবা শাহাদাতের মাধ্যমে জান্নাতে দাখিল করাবেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৫

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ○

❑ তোমাদের কী হইল যে তোমরা সংগ্রাম করিবে না আল্লাহের পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুগণের জন্য? যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যাহার অধিবাসী জালিম উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও;

তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর।'

জেহাদে উদ্বুদ্ধ করতে এই আয়াতে উপস্থাপিত হয়েছে এক অনন্য বাকভঙ্গি। বলা হয়েছে, ওই শোন, নিপীড়িত নারী-পুরুষ ও শিশুদের আহাজারী! তোমরা তো ইমানদার। অত্যাচারিত মানবতাকে উদ্ধার করা তোমাদের ইমানী কর্তব্য নয় কি? তবে কেনো তাদের মুক্তির জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ শুরু করবে না? কী হলো তোমাদের? এখানে প্রশ্নাকারে জেহাদ বিমুখতাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

রসুল স. মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মুসলমানদের অনেকেই মদীনায় এসে নিরাপদে বসবাস করছিলেন। কিন্তু মক্কায় আটকে পড়েছিলেন বেশ কিছু মুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশু। মুশরিকদের দ্বারা অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌পাক মদীনায় বসবাসরত মুসলমানদেরকে রসুল স. এর মাধ্যমে এই আয়াতে জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

'ফি সাবিলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে। সকল পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু দুর্বল মুসলমানদেরকে উদ্ধার করা শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম— তাই এখানে বিশেষ করে 'ফি সাবিলিল্লাহ্' উল্লেখিত হয়েছে।

মক্কায় আটকে পড়া মুসলমানেরা প্রার্থনা করে চলেছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদের অধিবাসীরা অত্যাচারী। তারা আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। আমাদের ত্রাণ করো। অন্যত্র আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করে দাও। আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দাও অভিভাবক এবং সাহায্যকারী, যারা আমাদেরকে মুশরিকদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করবেন।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি ও আমার মা ওই অত্যাচারিতদের মধ্যে ছিলাম। বোখারী।

আল্লাহ্‌তায়ালা মজলুমদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. মক্কার শাসক হিসাবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন হজরত ইতাব বিন উমাইদকে। তিনি ছিলেন অত্যাচারিতের সাহায্যকারী এবং ন্যায়পরায়ণ।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৬

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا۝

❒ যাহারা বিশ্বাসী তাহারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করে এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাহারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে; সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর; শয়তানের কৌশল দুর্বল।

যারা ইমানদার তারা জেহাদ করেন আল্লাহ্র পথে। এই পথেই তারা আল্লাহ্ পর্যন্ত উপনীত হন। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) — তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এই পথ তাদেরকে নিক্ষেপ করে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে।

এখানে নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা শয়তানের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। অবিশ্বাসীরাই শয়তানের সঙ্গী। শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়। সত্যের বিরুদ্ধবাদী হতে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু তার এই কুমন্ত্রণা দানের প্রচেষ্টা নিতান্তই দুর্বল। আঘাত হানলে সহজেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বদর যুদ্ধের সময় সে কাফেরদেরকে বলেছিলো, অগ্রসর হও। আমি তোমাদের পিছনে রয়েছি। তোমাদের উপর জয়লাভ করার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে সে যখন মুসলমানদের সাহায্যকারী হিসেবে ফেরেশতাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখলো, তখন ভয়ে পালিয়ে গেলো। যেতে যেতে বললো, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। হে অবিশ্বাসীর দল! আমি যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে নাসাঈ এবং হাকেম লিখেছেন, রসুল স. মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করলে এক এক করে এগিয়ে এলেন অনেকেই। মুশরিকেরা তাদের উপর নির্যাতন শুরু করলো। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং কতিপয় সাহাবী বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন সম্মানিত ছিলাম। মুসলমান হওয়ার পর লাঞ্ছিত হচ্ছি। রসুল স. বললেন, আমাকে বলা হয়েছে অত্যাচারী কাফেরদেরকে ক্ষমা করে দিতে। সুতরাং তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ো না। হিজরতের পর যখন রসুল স. এবং মুহাজির সাহাবীরা মদীনায় বসবাস করছিলেন, তখন আল্লাহ্পাক মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু মুসলিম জনতা জেহাদে উজ্জিবীত হচ্ছিলেন না। এক ধরনের স্থবিরতা যেনো পেয়ে বসেছিলো তাঁদেরকে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৭

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

❐ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সম্বরণ কর, সালাত কায়েম কর এবং জাকাত দাও।' অতঃপর

যখন তাহাদিগকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের একদল মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মতো অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলিতে লাগিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদিগকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না?' বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য! এবং যে সাবধানী তাহার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।'

এখানে বিস্ময়াবিষ্ট প্রশ্নের আকারে বলা হয়েছে, হে প্রিয়তম নবী! আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, এক সময় তারা যুদ্ধ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো, তখন তাদেরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। তাদের সেই আকাংখিত যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হলো এখন। অথচ তারা উদ্দীপনারহিত, ভীত। কেনো?

'হস্ত সম্বরণ করো'— অর্থ হাত গুটিয়ে বসে থাকো। যুদ্ধ করো না। বাগবীর মাধ্যমে কালাবী লিখেছেন, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, জুহুরী, হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ কান্দি, হজরত কুদামা বিন মাজউন জাহমী, হজরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস ও আরো কতিপয় সাহাবী মক্কার মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাঁরা রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল, অংশবাদীরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, হাত গুটিয়ে বসে থাকো। এখনো আমাকে যুদ্ধ করতে বলা হয়নি।

নামাজ পড়ো এবং জাকাত দাও—এই হুকুমটিও জেহাদ। প্রাথমিক এবং প্রধান জেহাদ। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ অপেক্ষা এই যুদ্ধই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। প্রথমে এই যুদ্ধে রত হতে হবে। বিজয়ী হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। আত্মসংশোধনের পর অন্যের সংশোধনের কথা আসে। তাই মক্কায় অবস্থানকালে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্যই নামাজ ও জাকাত প্রতিপালনের হুকুম দেয়া হয়েছিলো। প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার এই যুদ্ধ ফরজে আইন (ব্যক্তিগত ফরজ)। আর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরজে কেফায়া। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে সংশোধন করা, অপরাধ মুক্ত করা।

জেহাদের অনুমতি দেয়া হলো মদীনায় হিজরতের পর। কিন্তু কী আশ্চর্য! যারা যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল ছিলো, তারা কেমন আগ্রহরহিত, ভীত, চিন্তিত। ভয় তো করতে হবে আল্লাহ্‌কে। কিন্তু তারা এখন অবিশ্বাসীদের ভয়ে ভীত। যেমন ভয় করতে হয় আল্লাহ্‌কে, সে রকম অথবা তারও বেশী ভয় করছে তারা অংশীবাদীদেরকে। বিষয়টি বিস্ময়কর নয় কি!

যে ভয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা প্রকৃত অর্থে ভয় নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র চেয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাকে অধিক ভয় করা কুফরী। এ রকম ভয় সাহাবীগণের ছিলোই না। কারণ তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ মুমিন। এখানে ভয় অর্থ এক ধরনের অনুদ্দীপনা, জড়তা। আয়াতে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এ জন্যই। ইমানদারেরা

হবে আড়ষ্টতামুক্ত, অথচ তাঁদেরকে মনে হচ্ছে কী রকম ভীতসন্ত্রস্তদের মতো আড়ষ্ট, উজ্জীবনহীন। আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ এ রকমই।

খারেজীদের অভিমত এর বিপরীত। তারা সব সময় প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। তারা বলে, কবীরা গোনাহকারী কাফের। আর আল্লাহ্‌র চেয়ে বান্দাকে অধিক ভয় করা কুফরী। তারা এ সম্পর্কে এ রকম যুক্তির অবতারণা করে যে, জ্ঞানীরা সাপের গর্তে হাত প্রবেশ করায় না। যদি প্রবেশ করায় তবে বুঝতে হবে, হয় সে উম্মাদ, অজ্ঞ কিংবা তার বিশ্বাস নেই যে, গর্তের মধ্যে সাপ আছে। কবীরা গোনাহকারীদের অবস্থা এ রকমই। আযাবের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস থাকলে তারা কখনোই গোনাহ্ করতো না।

আমাদের ব্যাখ্যায় খারেজীদের দলিল বাতিল প্রমাণিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তরে সাপ দংশন করবে না—এ রকম দৃঢ় বিশ্বাসও থাকতে পারে। এছাড়া অমনোযোগিতা, ভুল (গোনাহ নয়) — এ রকম মানবিক প্রভাবও তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। সুতরাং নির্দেশ প্রতিপালনে বিলম্বিত সাড়া দিলে ইমানদার কখনো কাফের হয়ে যায় না। যদি যেতো তবে ব্যাপারটা আর আশ্চর্যজনক থাকতো না। কারণ, কাফেরদের কুফরী কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। বরং ইমানদারদের অনুৎসাহই বিস্ময়ের কারণ। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিতে এই সুরটিই কিঞ্চিত নেপথ্যে প্রস্ফূটিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা এর পর ওই সকল সাহাবীর মনের অবস্থাকে প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন, তাদের কামনা এ রকম— যুদ্ধ বিলম্বিত হোক। আমরা অবকাশ প্রার্থী। কেনো যে সহসা জেহাদের বিধান বলবৎ করা হলো। আমরা তো চাইছিলাম নিরুপদ্রব জীবন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদের এই অসুন্দর চিন্তাকে খণ্ডন করে স্নেহসিক্ত আহবানের মাধ্যমে বৃহত্তর সাফল্যের দিকে পথনির্দেশ করে জানিয়ে দিচ্ছেন, হে প্রিয়তম নবী! আপনি জানিয়ে দিন, পার্থিব জীবন অস্থায়ী। এই অনিশ্চয়তায় ভোগবিলাসের আর অবকাশ কোথায়? অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে এই পার্থিবতা। আয়ুর পরিসর কিঞ্চিত প্রসারিত হলেও কী লাভ—মৃত্যুই যখন সকলের অনড় পরিণতি। সুতরাং সাবধান হও। পরকালকেই উত্তম জ্ঞান করো। আলস্য পরিত্যাগ করো। অস্ত্রসজ্জিত হও। যুদ্ধযাত্রা করো। তোমাদের উপর জেহাদ ফরজ করার উদ্দেশ্য তোমাদেরকে পুণ্যপ্লাবিত করে দেয়া, চিরস্থায়ী জীবনের সফলতা দান করা। আরো অবগত হও হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের উপর যৎসামান্য জুলুমও করা হবে না। তোমাদের পুণ্যসম্ভার ন্যূনতর করা হবে না। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীর যে আয়ু নির্ধারণ করা হয়েছে তাও কম করা হবে না। সুতরাং একথা মনে কোরো না যে, জেহাদে গেলেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে। আর না গেলেই নির্ধারিত মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

মুনাফিকেরা বলাবলি করছিলো, তারা (সাহাবীগণ) যদি আমাদের মতো যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে আসতো— তবে, মারা পড়তো না (শহীদ হতো না)। তাদের এহেন মূর্খজনোচিত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ○

❒ তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও। যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহের নিকট হইতে;' আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে।' বল, 'সব কিছুই আল্লাহের নিকট হইতে।' এই সম্প্রদায়ের হইল কী যে ইহারা একেবারেই কোন কথা বোঝে না।

মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুকে রোধ করা কিংবা প্রতিহত করা কারো পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আয়াতে বলা হয়েছে, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের অবস্থান বেছে নাও। সুদৃঢ় দুর্গ বুঝাতে এখানে উল্লেখিত হয়েছে 'বুরুজীল মুশাইয়াদাহ' শব্দটি। হজরত কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ মজবুত অট্টালিকা। হজরত ইকরামা বলেছেন, চুনাপাথর নির্মিত অট্টালিকা।

পূর্ববর্তী আয়াতের 'আমাদেরকে কিছু দিন অবকাশ দাও'—এর পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে জবাব স্বরূপ বলা হয়েছে, 'মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই—'। সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে, যুদ্ধ করলেই মৃত্যু আসে না। তকদীরের অনড় লিখন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু এসে পড়ে। যুদ্ধ করলেও। না করলেও।

রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পর ইহুদীরা ও মুনাফিকেরা হিংসায় জ্বলতে লাগলো। তারা রসুল স. কে লক্ষ্য করে বলতো, এই লোক ও তার সহচরদের কারণেই আমাদের এহেন দুর্দশা। আমাদের ফল ও ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। ভালো কিছু হলে তারা বলে, এ রকম হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ায়। অর্থাৎ আমাদের যোগ্যতার কারণেই আল্লাহ্ আমাদেরকে অধিক সম্পদ ও রিজিক দান করেছেন। যখন তাদের পার্থিব ক্ষতি হয় তখন আবার বলে, এসব হচ্ছে তোমার (রসুল স. এর) কারণে। তোমরা হতভাগ্য তাই তোমরাই আমাদের ক্ষতিগ্রস্ততার কারণ। —ইহুদীদের এ রকম ঘৃণ্য মনোভাব ও কথোপকথনের পরিচিতি দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে নির্দেশ করছেন, বলুন, 'সবকিছু আল্লাহের নিকট হতে।' অর্থাৎ

ভালো মন্দ সবই আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারণ। তিনিই অবতীর্ণ করেন কল্যাণ ও অকল্যাণ। একজনের অপরাধের জন্য অন্যজনকে শাস্তি দেয়া তাঁর বিধান নয়।

আয়াতের শেষ দিকে সত্যবিমুখ ইহুদী ও মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওরা একেবারেই বুঝে না। সত্য কথা শুনতেই চায় না। আয়াতের শেষ শব্দটি হচ্ছে 'হাদিসান'—এর অর্থ কথা। এখানে অর্থ হবে আল্লাহ্‌র কথা (কোরআন)। কোরআনের প্রতি মনোনিবেশ করলে সহজেই প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হতো তাদের সামনে। 'হাদিসান' শব্দটির অর্থ কেবল কথা ধরা হলে অর্থ হবে এ রকম—ইহুদী ও মুনাফিকেরা চতুষ্পদ পশুর মতো। তাই কথা বুঝে না। যদি মানুষ হতো তবে কথা শুনতো এবং বুঝতো।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৯

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

❐ কল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা আল্লাহের নিকট হইতে এবং অকল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা তোমার নিজের কারণে এবং তোমাকে মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি; সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

এরশাদ হয়েছে, ভালো যা কিছু তোমরা লাভ করে থাকো তা সমস্তই আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ। এ আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ তার সততা ও সৎকর্মশীলতার জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না। মানুষ যদি সম্পূর্ণতঃই পাপমুক্ত হয়, সারাক্ষণ সৎ আমলে ব্যাপৃত থাকে, তাদের সৎকর্ম যদি আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক অনুমোদিতও হয়, তবু তারা গৌরব প্রকাশ করতে পারবে না। প্রতিদান লাভের দাবীদারও হবে না। কারণ তাদের অস্তিত্ব, অস্তিত্বজ যোগ্যতা, সৎকর্মের আগ্রহ, আমল সম্পাদনের শক্তি ও সাহায্য সবই লাভ হয়েছে আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক অনুগ্রহ। ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব নয়। কারণ, তিনি তওফিক না দিলে ইবাদত তো সম্ভবই ছিলো না। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যখন সম্ভব নয়, তখন ইবাদতের বিনিময় লাভের দাবীও অযৌক্তিক। নিজস্ব যোগ্যতা থাকলেই কেবল দাবীর প্রসঙ্গটি ওঠে। কিন্তু এখানে সে রকম কিছু নেই। রয়েছে শুধু দিকহীন, চিহ্নহীন, সীমানাহীন অনুগ্রহ। কেবলই অনুগ্রহ। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অনুগ্রহ দান করতে তিনি বাধ্য নন। কারণ বাধ্যগত হওয়া থেকে তিনি পবিত্র।

অকল্যাণও অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্‌র দিক থেকে। কিন্তু অকল্যাণ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে মানুষ। এ সমস্ত হচ্ছে মানুষের গোনাহের শাস্তি। প্রত্যেকে তার নিজ পাপের জন্যই শাস্তির উপযোগী হবে। একে অন্যের পাপের জন্য দায়ী হবে না। মানুষ যখন অবিশ্বাসকে নির্বাচন করে তখন আখেরাতের অনন্ত শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়। দুনিয়াতেও সে অন্তহীন শাস্তির নিদর্শন প্রকাশিত হতে পারে। বিশ্বাসীদের প্রতিও পৃথিবীতে বিপদ মুসিবত নেমে আসে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা শাস্তি মনে হলেও তাদেরকে শাস্তি দান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন। পাপের ক্ষতিপূরণ। আখেরাতের অধিকতর মর্যাদা লাভের সুযোগ। জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের প্রতি আপতিত বিপদ গোনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ)। পায়ে কাঁটা ফুটলেও গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, যে সকল দুঃখকষ্ট, রোগব্যাধি মুসলমানদের প্রতি আপতিত হয়— এমন কি পায়ে কাঁটাও যদি ফোটে তবুও তা পাপের ক্ষতিপূরণ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেন, হোঁচট খাওয়া অথবা এর চেয়েও কম কষ্ট যা কিছু এসে থাকে—তা গোনাহের কাফফারা। আর আল্লাহ্ অধিকাংশ গোনাহ তো বিপদ কষ্ট ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দেন। তিরমিজি।

পূর্ববর্তী আয়াতে কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কিত ইহুদীদের বিকৃত ধারণাকে সংশোধন করা হয়েছে এই আয়াতে। দেয়া হয়েছে কল্যাণ অকল্যাণের যথাযথ ধারণা।

এরশাদ হয়েছে, 'আমি আপনাকে মানুষের জন্য রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনিই মহাবিশ্বের রহমত'। অবিশ্বাসী ইহুদী ও মুনাফিকদের কথা অসঙ্গত। তারা তাদের অপপ্রবৃত্তির কারণে রহমতবঞ্চিত। তাই তারা আযাবগ্রস্ত হবে। আখেরাতেও। দুনিয়াতেও। রসুল স. এর আনুগত্যহীনতার কারণেই তারা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। হে প্রিয়তম নবী! মনস্তাপের কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্ নিজেই আপনার সততার সাক্ষ্যদাতা। সাহায্যকারী। তিনি মোজেজা দানের মাধ্যমে আপনার রেসালতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিয়ামতের দিন কাফেরদের বচসাপ্রবণতার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ই আপনার পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করবেন। কাফেরেরা তখন নির্বাক হয়ে যাবে। আযাবগ্রস্ত হবে তারা। তখন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কিছু হবে তাঁর সরাসরি হুকুমের অধীন। তিনিই তখন তাঁর অসীম জ্ঞানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, 'যে আমার অনুসরণ করলো, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই অনুসরণ করলো। যে আমাকে ভালোবাসলো, সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কেই ভালোবাসলো।' এই পবিত্র নির্দেশনা শুনে কোনো কোনো

অবিশ্বাসী বলতে শুরু করলো, ইনি তো চাচ্ছেন, খৃষ্টানেরা যেমন হজরত ঈসাকে প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে, তেমনি আমরাও যেনো তাকে প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করি। তাদের এই অপবিত্র কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮০

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ○

❒ কেহ রসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহেরই আনুগত্য করিল এবং কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে তোমাকে তাহাদের উপর প্রহরীরূপে প্রেরণ করি নাই।

কেউ যদি রসুলের আনুগত্য স্বীকার করে তবে বুঝতে হবে, সে আল্লাহ্র আনুগত্যকেই শিরোধার্য করেছে। রসুল তো হচ্ছেন বাণীবাহক। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ প্রচার করাই তাঁর কাজ। আর সেই নির্দেশদাতা স্বয়ং আল্লাহ্। সুতরাং রসুলের কথা আল্লাহ্রই কথা এবং রসুলকে মান্য করা আল্লাহ্কেই মান্য করা। এতে আর দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

এরশাদ হয়েছে, হে প্রিয়তম নবী! যারা আপনাকে অস্বীকারকারী তাদেরকে কোনোই পরওয়া করবেন না। আমি ওই সকল অবিশ্বাসীর পাহারাদার হিসেবে আপনাকে নিযুক্ত করিনি। আপনি কেবল সংবাদ প্রচার করতে থাকুন। মানুষের স্বীকৃতি অস্বীকৃতির হিসেব তো গ্রহণ করবো আমিই। সুতরাং আমিই তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী। তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানকারী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮১

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَاۤئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ۚ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

❒ তাহারা বলে, 'আনুগত্য করি'; অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন রাত্রে তাহাদের একদল তাহারা যাহা বলে তাহার বিপরীত পরামর্শ করে; তাহারা যাহা রাত্রে পরামর্শ করে আল্লাহ্ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহের প্রতি ভরসা কর; কর্ম-বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

এরশাদ হয়েছে, হে নবী! আপনি যখন ওই সকল মুনাফিকের সামনে নির্দেশনা উপস্থাপন করেন, তখন তারা বলে, আমরা অনুগত। আনুগত্য করাই আমাদের কাজ। তারপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন তাদের একটি দল রাত্রিবেলা একত্রিত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করে।

হজরত কাতাদা এবং কালাবী বর্ণনা করেন, আয়াতে উল্লেখিত 'বাইয়াতা' শব্দটির অর্থ পরিবর্তন করা। ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ আখ্ফাশ বলেছেন, 'বাইয়াতা' অর্থ কোনো কিছু নির্ধারণ করা বা সম্পন্ন করা। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকেন 'বাইয়েতা ফুলানুন'—অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি রাত্রিযাপন সম্পন্ন করেছে। 'বাইয়াতা' শব্দের আরেকটি অর্থ ভিত্তিপ্রস্তরের উপর গৃহনির্মাণ করা। কবিরা যেমন কিছু শব্দ সমন্বয়ে বাণী নির্মাণ করে। যেমন কোনো গৃহস্বামী কাঠ, লোহা, ইট ইত্যাদি একত্র করে গৃহনির্মাণ করে। মুনাফিকেরাও তেমনি শলাপরামর্শের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ষড়যন্ত্রকে। হজরত আবু উবাইদা কুতাইবি বলেছেন, 'বাইয়াতা' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'বাইয়ুতাত' থেকে। এর অর্থ রাত্রি অতিবাহিত করা। এর মাধ্যমে তাদের রাতের ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শকে বুঝানো হয়েছে— যা তাদের দিনের অঙ্গীকারবিরুদ্ধ।

আল্লাহ্তায়ালা তাদের রাতের এই পরামর্শকে আমল লেখক ফেরেশতাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করে রাখছেন, যাতে আখেরাতে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া যায়। লিপিবদ্ধ করার অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তাদের রাত্রিকালীন ষড়যন্ত্রের কথা লিখিত আকারে ওহীর মাধ্যমে রসুল স. কে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং নির্দেশনা দিচ্ছেন, হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন। তাদের কোনো পরওয়া করবেন না। রাগ করবেন না। তাদের নামও প্রকাশ করবেন না। দৃষ্টি কেবল নিবদ্ধ রাখুন আল্লাহ্র দিকে। সকল ব্যাপারে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করুন। তাঁর প্রতি নির্ভরশীলদের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনিই আপনার পক্ষ থেকে অবিশ্বাসীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ○

❑ তবে কি তাহারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও হইত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত।

এরশাদ হয়েছে, ওই সকল কপটেরা কোরআন অনুধাবন করে না কেনো? কোরআনে রয়েছে কতো বিস্ময়কর ও অলৌকিক বিষয়বস্তু—তারা সেগুলো গবেষণা ও অনুশীলন করে না কেনো? অনুধাবন করতে চেষ্টা করলে তারা সহজেই দেখতে পেতো কোরআনের এই অনন্যসাধারণ বাণীসমাহার মানবরচিত হতেই পারে না। এই বাণী নিশ্চিত আল্লাহ্র বাণী। অনুধাবনস্পৃহা থাকলে তারা সহজেই অন্তরের অপরিচ্ছন্নতাকে ঝেড়ে ফেলে পৌঁছে যেতে পারতো বিশ্বাসের বাগানে।

'তবে কি তাহারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না'—এ কথায় বুঝা যায়, কোরআন অনুধাবনের চেষ্টা করে (গবেষণা বা কিয়াস করে) শরিয়তের মাসআলা উদ্ধার করা জায়েয।

কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম—এ কথা নিশ্চিত। কোরআন মানুষের কালাম নয়। অবশ্যই নয়। যদি হতো তবে এতে অনেক রকম অসংগতি পরিদৃষ্ট হতো। বর্ণনাবৈষম্য থাকতো, দেখা দিতো অর্থগত ত্রুটিবিচ্যুতি, প্রকাশভঙ্গিতে থাকতো সামঞ্জস্যশীলতার অভাব। অনাবশ্যক কাঠিন্য কিংবা অনভিপ্রেত সারল্যের দোষে দুষ্ট হতো বিধানাবলী। ফলে কোনো কোনো নির্দেশ প্রতিপালন করা হতো অসম্ভব। আবার কোনো নির্দেশ হতো প্রশ্নপ্রতিরোধের সম্মুখীন। মানুষের কালাম হলে এ রকম বিভিন্নমুখী অসংগতি দেখা দিতোই। কারণ, মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। আর তা সুস্থিরও নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কোরআনের কিছু কিছু আয়াত পরবর্তীতে মনসুখ (রহিত) হয়েছে। এটা কি এক ধরনের অসংগতি নয়? উত্তরে বলা যায়, কখনোই নয়। কারণ, রহিত নির্দেশটি ছিলো এক বিশেষ সময়ের জন্য। মেয়াদ শেষে তাই সেটিকে রহিত করা হয়েছে। এসেছে সময়োপযোগী নতুন বিধান। এটা বরং সুসংগতিরই দৃষ্টান্ত। অসংগতির নয়।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন। তাঁরা কখনো জয় লাভ করতেন। কখনো হতেন পরাজিত। মুনাফিকেরা মুসলিম বাহিনীর জয়পরাজয় সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করতো। পরাজয়ের সংবাদ পেলে তারা ফলাও করে তা প্রচার করতো। উদ্দেশ্য — ইমানদারেরা যেনো দুর্বলচিত্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, কতিপয় দুর্বলচিত্ত মুসলমান সেনাদলের খারাপ বা ভালো সংবাদ মুনাফিকদের নিকট থেকে জানতে পেলে অথবা রসুল স. এর নিকট থেকে শুনলে— তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে বেড়াতো। ফলে শত্রুপক্ষ লাভবান হতো। তারা এ রকম সংবাদ শুনে পরিবর্তন করতো তাদের রণকৌশল। নতুন রূপে সেনাবিন্যাস করে আত্মরক্ষার উপায় বের করতো তারা। অবস্থা যখন এ রকম তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৩

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ○

❒ যখন শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ তাহাদের নিকট আসে তখন তাহারা উহা প্রচার করিয়া থাকে। যদি তাহারা উহা রসুল কিংবা তাহাদের মধ্যে

যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাহাদের গোচরে আনিত তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করে তাহারা উহার যথার্থতা নির্ণয় করিতে পারিত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসরণ করিত।

মুসলিম সেনাবাহিনীর জয় পরাজয়ের সংবাদ মুনাফিকেরা প্রচার করে বেড়াতো। তাদের দেখাদেখি দুর্বলচিত্ত কিছু মুসলমানেরাও এ রকম করতো। এ রকম অজ্ঞজনোচিত কাজ মুসলমানদের স্বার্থবিরুদ্ধ। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির উপর এ রকম সংবাদ মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। মুনাফিকদের এ রকম আচরণ বিস্ময়কর কিছু নয়। কারণ, তারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে কাফের। কিন্তু মুসলমানদের এ রকম দুর্বলচিত্ততা শোভনীয় নয়। তাই এরশাদ হয়েছে, তাদের উচিত ছিলো, যে সংবাদই কানে আসুক না কেনো প্রথমে তা রসুল স. এর দরবারে পেশ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশের অপেক্ষা করা। তাঁর স. ক্ষমতাধর (উলিল আমর) সহচরবৃন্দের নিকটেও তাঁরা এ ব্যাপারে নির্দেশনা লাভ করতে পারতেন। তাঁরা সংবাদ বিশ্লেষণ করে পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে কর্তব্যনির্দেশ করতে সক্ষম। সংবাদ গোপন রাখা অথবা প্রচার করা— কোনটি কখন উত্তম সে সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবগত। সুতরাং মুসলমানদের উচিত ছিলো অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারীতাকে বর্জন করা। সুবিজ্ঞ নির্দেশনার অপেক্ষা করা।

আয়াতে রসুল স. সহ ক্ষমতাধর (উলিল আমর) সাহাবীগণের মর্যাদাও বিবৃত হয়েছে। উলিল আমর বলতে এখানে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান এবং হজরত আলী—এই চারজন সম্মানিত ও জ্ঞানী সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। পর্যবেক্ষণের ও সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার ছিলো তাঁদের। রসুল স. স্বয়ং তাঁদের অভিমতের মূল্য দিতেন। অধিকাংশ বিষয়ে তাঁদেরকেই নেতা নির্ধারণ করতেন। তাঁদেরকে অনুসরণের নির্দেশও দিয়েছিলেন রসুল স। বলেছিলেন, পৃথিবীতে আমার দু'জন প্রতিনিধি হবে আবু বকর ও ওমর। তিরমিজি। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা ওই দু'জনকে অনুসরণ কোরো, যারা আমার পরে খলিফা হবে। তারা হচ্ছে আবু বকর ও ওমর। তিরমিজি।

আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাজিনা ইয়াসতামবিতুনাহু' বাক্যাংশটির অর্থ তত্ত্বানুসন্ধানীগণ। এঁরা হচ্ছেন রসুল স. এবং তাঁর জ্ঞানী সহচরবৃন্দ। তাঁরা ছিলেন এলেম ও মারেফতে সিদ্ধ পুরুষ। 'ইস্তিমবাত' অর্থ উদ্ধার করা। যেমন 'ইস্তেমবাতাল মাআ' অর্থ পানি বের করা। তাঁরা সমস্যাসংকুলতা থেকে এভাবেই যথাকর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারতেন। আয়াতে তাই সাধারণ মুসলমানদেরকে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শেষে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষিত হয়েছে তোমাদের প্রতি। তিনি রসুল প্রেরণ করেছেন। কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এসবের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি ফজল ও রহমত যদি বর্ষিত না হতো তবে তোমরা হতে নিরাপত্তারহিত এবং অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই হয়ে যেতো শয়তানের অনুসারী। (কিন্তু বিশেষ অনুকম্পায় আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন)। এই অল্পসংখ্যক সাহাবীদের মধ্যে রয়েছেন হজরত জায়েদ বিন আমর বিন নুফাইম এবং ওয়ারকা বিন নওফেল। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী। ছিলেন আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহভাজন। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগেই আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে শয়তানের অনুসরণ থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন। স্বয়ং রসুল তোমাদের সামনে উপস্থিত। তদুপরি কোরআন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে। তাই বয়ে চলেছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার বিরতিহীন প্রস্রবণ। অতএব নির্দেশ প্রতিপালন করো। শরণ গ্রহণ করো রসুলের এবং তাঁর প্রাজ্ঞ সহচরবৃন্দের।

হজরত ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, রসুল স. তাঁর পবিত্রা পত্নীগণকে পরিত্যাগ করেছেন। দেখলাম সবাই উদ্বিগ্ন, ব্যথিত। পেরেশান হয়ে কেউ কেউ পাথর দ্বারা মাটি খুঁড়ে চলেছে। তখন অবতীর্ণ হলো, 'ওয়া ইজা জাআহুম আমরুম মিনাল আমনি আবিল খওফ।' মসজিদে অবস্থান নিয়েছিলেন রসুল স.। আমি মসজিদে প্রবেশ করে বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করলাম। গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে রটনাটির সত্যাসত্য নির্ণয় করে মসজিদের দরোজায় দাঁড়িয়ে (অস্থিরচিত্ত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বললাম, রসুল স. তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দেননি। (তত্ত্বানুসন্ধানের এ এক অনন্য উদাহরণ)। ওয়াল্লহু আ'লাম।

যুদ্ধকালে দুর্বলচিত্ত মুসলমানদের অসংলগ্ন আচরণ এবং তাদের কর্তব্যসচেতনতা সম্পর্কে এতোক্ষণ আলোচনা করা হলো। এবার আসছে রসুল স. এর প্রতি জেহাদের নির্দেশ। এরশাদ হচ্ছে—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৪

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللّٰهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ○

❒ সুতরাং আল্লাহের পথে সংগ্রাম কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হইবে এবং বিশ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ কর, হয়তো আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শক্তি সংযত করিবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তি দানে কঠোরতর।

হে নবী! আপনি আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করুন। কেউ আপনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করুক অথবা না করুক। আপনি আপনার ব্যক্তিগত কর্তব্য সম্পাদনে দণ্ডায়মান হোন। অন্যকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা আপনার কর্তব্য। বাধ্য করা

নয়। আপনি রসুল। আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন। মানুষের অসহযোগিতা কিংবা বিরুদ্ধাচরণ আপনার রেসালতে কোনো পরিবর্তন আনতে অসমর্থ।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত খালেদ বিন মাদানের বর্ণনা থেকে ইবনে সা'দ লিখেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমাকে রসুল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের জন্য। মানুষেরা না মানলে কেবল আরববাসীদের জন্য। আরবেরা না মানলে পারস্যবাসীদের জন্য। তারা না মানলে বনী হাশেমের জন্য। তারাও যদি না মানে, তবে আমার রেসালাত কেবল আমার নিজের জন্য।

বাগবী লিখেছেন, উহুদ যুদ্ধের পর রসুল স.আবু সুফিয়ানের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন, পরের বছর জিলকদ মাসে ছোট বদরে কাফের ও মুসলমানেরা পুনরায় যুদ্ধ করবে। (মদীনা থেকে আট মাইল দূরের এক বাজারের নাম ছোট বদর)। জিলকদ মাস যখন এলো, তখন রসুল স. মুসলমানদেরকে যুদ্ধযাত্রার আহবান জানালেন। উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের স্মৃতি তখনও তাজা। তাই অনেকেই সাড়া দিচ্ছিলেন না। তখন এই আয়াত নাজিল হলো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীরও এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

এরশাদ হয়েছে, বিশ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ করুন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই আল্লাহ্তায়ালা শত্রুপক্ষকে শক্তিহীন করে দিবেন। রসুল স. মাত্র সত্তর জনকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। শত্রুপক্ষ যুদ্ধের ময়দানে এলো না। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে সংযত করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে এলো মদীনায়। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে ইতোপূর্বে এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ চলে গিয়েছে।

'আল্লাহ্তায়ালা শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তি দানে কঠোর'—এ কথা বলে যুদ্ধে অনীহ, ভীত মুসলমানদেরকে শাসানো হয়েছে। ইতোপূর্বে বলা হয়েছিলো, 'কেউ আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করলে সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী হোক আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দান করবো।' (আয়াত ৭৪)। এখন বলা হচ্ছে, জেহাদ না করলে মনে রেখো, আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সুতরাং তাকেই কেবল ভয় করা উচিত। আর শাস্তিদানেও তিনি কঠোরতম। তবে কাফেরদের ভয়ে জেহাদ বিমুখ হচ্ছো কেনো? আয়াতের এই শেষ বাক্যে ভর্ৎসনা করা হয়েছে যুদ্ধভীত মুসলমানদেরকে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৫

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

❒ কেহ কোন ভালো কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে; এবং কেহ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করিলে উহাতেও তাহার অংশ থাকিবে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে নজর রাখেন।

এই আয়াতে আলোচিত হয়েছে সুপারিশ প্রসঙ্গটি। সুপারিশ হচ্ছে কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা ও নিবেদন। সুপারিশকারী তার চেষ্টা ও নিবেদনের জন্য সওয়াব লাভ করবে। মুজাহিদ বলেছেন, সুপারিশকারীর সুপারিশ গৃহীত না হলেও সে সওয়াব পাবে। হজরত হাসান থেকে ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেন, রসুল স. এর নিকট কেউ কিছু চাইলে তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলতেন, সুপারিশ করো। সওয়াব পাবে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে যা ইচ্ছা প্রচার করেন। বোখারী, মুসলিম। রসুল স. আরো জানিয়েছেন, কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীদের মতোই। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন বায্যার। তিবরানী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত সহল বিন সা'দ থেকে।

জ্ঞাতব্যঃ মুসলমানদের জন্য দোয়া করাও শাফায়াতে হাসানা (উত্তম সুপারিশ) হিসেবে গণ্য। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অসাক্ষাতে দোয়া করতে থাকে তখন ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকেন, হে আল্লাহ্ এমনই করে দাও। তার (প্রার্থনাকারীর) জন্যও এমনই হোক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সন্ধির প্রচেষ্টাও শাফায়াতে হাসানা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলাও শাফায়াতে হাসানা। এর জন্যও সওয়াব পাওয়া যাবে।

মন্দকাজের জন্য সুপারিশ করলে গোনাহ্ হবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, চোগলখোরী করাও মন্দ সুপারিশ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পরচর্চা করা ও মন্দ আচরণও মন্দ শাফায়তের মধ্যে গণ্য।

এরশাদ হয়েছে, মন্দ সুপারিশও মন্দ কাজের অংশবিশেষ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো মুমিনকে হত্যার ব্যাপারে যে আংশিক বাক্য দ্বারাও সমর্থন করবে কিয়ামতের দিন তার দুই চোখে লেখা থাকবে, 'এই লোক আল্লাহ্তায়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত'। ইবনে মাজা।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, 'ওয়া কানাল্লহু আ'লা কুল্লি শাইইম মুক্বিতা।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুক্বিতা' অর্থ ক্ষমতাবান। মূল শব্দটি হচ্ছে 'কুতুন। 'কুতুন' অর্থ খাদ্য যার মাধ্যমে শরীরে শক্তি সৃষ্টি হয়। মুজাহিদ বলেছেন, মুক্বিতা অর্থ শাহেদ (হাজির নাজির)। কাতাদা বলেছেন, পর্যবেক্ষণ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রাণীদের খাদ্য প্রদানকারীকেও বলা হয়

মুক্বিতা। সুতরাং শেষ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম— রিজিক প্রদান ও শক্তিমত্তায় তিনি সদাবিদ্যমান পর্যবেক্ষণকারী (সুতরাং সৎ সুপারিশ করো)।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৬

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ○

❒ তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

এই আয়াতে নির্দেশনা এসেছে সালাম ও সালামের প্রত্যুত্তর প্রদান প্রসঙ্গে। বলা হয়েছে, অভিবাদনের প্রত্যুত্তর হবে সমপর্যায়ের অথবা তদপেক্ষা উত্তম। আরববাসীরা অভিবাদন বিনিময় করতো এভাবে— 'হাইয়্যাল্লাহ্' (আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন)। অভিবাদন বিনিময়ের জন্য এ রকম আরো কিছু বাক্যের প্রচলন ছিলো। ইসলাম অভিবাদনের নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। কুশল বিনিময়ের জন্য প্রচলন করা হয়েছে সালামের।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেন, মূর্খতার যুগে আমরা বলতাম, আনআলাল্লাহু বিকা আইনা (আল্লাহ্ তোমার আঁখিযুগল শীতল করুন)। কখনো বলতাম, আনআলা সাবাহান (তোমার জন্য সুপ্রভাত)। ইসলাম আগমনের পর আমাদেরকে এ রকম করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে সালাম প্রচলনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবু দাউদ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদম কে তাঁর (জন্য নির্ধারিত) আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিলো ষাট গজ। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে নির্দেশ করলেন, যাও। ফেরেশতাদের ওই দলটির নিকট গিয়ে তাদেরকে সালাম করো এবং শোনো, তারা কী জবাব দেয়। তোমার সালাম এবং তাদের প্রত্যুত্তর হবে তোমার এবং তোমার বংশধরদের কুশলবিনিময়ের নিয়ম। হজরত আদম ফেরেশতাদের নিকটে গিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশতারা বললেন, আস্সালামু আলাইকা ওয়া রহ্মাতুল্লাহ। বোখারী, মুসলিম।

সালামের প্রত্যুত্তরে সালামের সঙ্গে রহমত ও বরকতের উল্লেখ করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ এ রকম বলতে হবে 'ওয়া আলাইকুমুস্সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ ওয়াবারাকাতুহ্। এ রকম বাড়িয়ে বললে সওয়াবও বাড়বে।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম।' তিনি স. বললেন, 'ওয়া

আলাইকুমুস সালাম।' লোকটি চলে গেলে রসুল স. বললেন, এর জন্য লেখা হলো দশটি পুণ্য। কিছুক্ষণ পর আরেকজন উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।' রসুল স.ও একইভাবে তাঁর সালামের জবাব দিলেন। তারপর লোকটি বসলে বললেন, এর জন্য লেখা হলো বিশটি পুণ্য। কিছুক্ষণ পর অন্য আর একজন এসে বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' রসুল স. ওভাবেই প্রত্যুত্তর দিলেন। লোকটি বসলে বললেন, এর জন্য লেখা হলো তিরিশটি নেকী। তিরমিজি, আবু দাউদ। হজরত মুআজ বিন আনাসের বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে—চতুর্থ ব্যক্তি হাজির হয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহ্। রসুল স. প্রত্যুত্তরে এ রকমই বললেন। তারপর মন্তব্য করলেন, এ লোকের আমলনামায় চল্লিশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ হলো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পরিপূর্ণ সালাম হলো—'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্ (তোমার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। এই বাক্যটির সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজন নেই। বর্ণিত হয়েছে, এক লোক একবার হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই বাক্যটির অতিরিক্ত কিছু বললেন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' তারপর বললেন, সালাম বারাকাতুহু পর্যন্তই। বাগবী।

হজরত সালমান ফারসী থেকে আহমদ, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' রসুল স. বললেন, 'ওয়া আলাইকাস্সালাম।' ওই ব্যক্তি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি আমার অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে। অথবা উহারই অনুরূপ করবে।' তিনি স. বললেন, তুমি কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখোনি। তাই তুমি যা বলেছো— তাই ফিরিয়ে দিয়েছি। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে, তবে জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' (তোমার উপরও) বলা যাবে। এই নিয়মটি অবশ্য প্রকাশ্যতঃ এই আয়াতের নির্দেশনার খেলাফ। বলা হয়েছে সালামের জবাব সমপর্যায়ের বাক্য অথবা তদপেক্ষা উত্তম বাক্যের মাধ্যমে হতে হবে। বর্ণিত হাদিসটি কিন্তু আয়াতের মর্মের অনুকূল। এতে করে বুঝা যায়, অবিকল বাক্য নয়, মূল উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে, এ রকম তুলনীয় বাক্যের মাধ্যমে সালামের প্রত্যুত্তর দেয়া যাবে। এমতো ক্ষেত্রে 'আলাইকাস্ সালাম' এর প্রকৃত অর্থ হবে 'যে পুণ্য ও সুন্দর বাক্যের মাধ্যমে তুমি সালাম করেছো ওই রকম সালাম তোমার প্রতিও বর্ষিত হোক।'

মাসআলাঃ সালামের উত্তর দেয়া ফরজে কেফায়া। দলের মধ্য থেকে একজন জবাব দিলেই চলবে। আরাজিয়া। হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একটি দল

উপবিষ্ট আরেকটি দলের পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন সালাম করবে। অন্যদলের একজন জবাব দিবে। এ রকম করাই যথেষ্ট (সমস্বরে সকলেই সালাম বলতে থাকা শোভনীয় নয়)। বাগবী, বায়হাকী। এই হাদিসটি আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট মারফু হিসেবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত হাসান বিন আলী। তিনি ছিলেন আবু দাউদের শায়েখ।

উপবিষ্ট দলের কোনো লোককে যদি কেউ নাম ধরে সালাম দেয়, তবে ওই লোককেই সালামের জবাব দিতে হবে। এ রকম করা ওয়াজিব। অন্য লোক জবাব দিলে জবাব দেয়া হয়েছে ধরা যাবে না।

কোনো দলকে লক্ষ্য করে সালাম দেয়ার পর ওই দলের বাইরের কোনো লোক জবাব দিলে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।

মাসআলাঃ প্রথমে সালাম করা সুন্নত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমান ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতোক্ষণ তোমরা একে অপরকে ভালো না বাসবে ততোক্ষণ ইমানদারও হতে পারবে না। আমি কী তোমাদেরকে ওই কথাটি জানিয়ে দেবো না, যা করলে তোমরা ভালোবাসতে পারবে। কথাটি হচ্ছে এই—অভিবাদন বিনিময় অব্যাহত রাখো। মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, প্রথম সালাম দানকারী অহংকার থেকে পবিত্র হয়ে যায়। বায়হাকী। হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহ্তায়ালার অধিকতর নৈকট্যভাজন যে প্রথমে সালাম করে। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেন, এক লোক রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলামের সর্বোত্তম আদর্শটি কী? রসুল স. বললেন, আহার করানো এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে অভিবাদন করা। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ বাহনের আরোহী পদব্রজে চলাচলকারীকে, পদব্রজে গমনকারী উপবিষ্টকে এবং স্বল্প সংখ্যকেরা অধিক সংখ্যকদেরকে সালাম করবে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। বোখারীতে অতিরিক্ত রয়েছে এ কথাটি —কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করবে।

মাসআলাঃ শিশু ও মহিলাদেরকেও সালাম করা যায়। যেহেতু হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. বালকদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত জারীরের বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. মহিলাদের পাশ দিয়ে গমনকালে তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। আহমদ।

ফতোয়ায়ে গারায়েবে বর্ণিত হয়েছে, অপরিচিতা যুবতী এবং শিশুদেরকে সালাম করা মাকরূহ। তারা সালাম দিলে উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। আমি বলি, এই হুকুমটি তখনকার, যখন বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা ছিলো।

মাসআলাঃ গৃহস্বামী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের সময় গৃহবাসীদেরকে সালাম বলবে। হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হে বৎস! তুমি স্বগৃহে প্রবেশকালে সকলকে সালাম বলবে। এ রকম করলে তোমার ঘরের লোকজনদের জন্য বরকত হবে। তিরমিজি।

মাসআলাঃ শূন্য গৃহে প্রবেশকালে বলতে হবে, 'আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সলেহীন' (আল্লাহ্র পুণ্যবান দাসদের প্রতি সালাম)। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'যখন ঘরে প্রবেশ করবে তখন সালাম কোরো।' তাফসীরকারদের মধ্যে একটি দল এই আয়াতের 'বুয়ুতান' শব্দটির অর্থ করেছেন শূন্যগৃহ। আর 'আনফুসিহিম' অর্থ করেছেন 'তুমি' (যাকে নির্দেশ করা হয়েছে তার সত্তা)। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মাসআলাঃ আগে অভিবাদন। তারপর কথোপকথন। অর্থাৎ আগে সালাম পরে কালাম। এ রকম করা সুন্নত। হজরত জাবের বর্ণিত মারফু হাদিসে এসেছে, 'আস্সালামু ক্বলাল কালাম।' তিরমিজি।

মাসআলাঃ যতোবার সামনাসামনি হবে ততোবার সালাম করা সুন্নত। সালাম বিনিময় শেষে বৃক্ষ অথবা দেয়ালের আড়ালের পর পুনরায় মুখোমুখি হলে পুনঃঅভিবাদন করবে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ভ্রাতৃবৃন্দের সাক্ষাত পেলেই সালাম কোরো। সালামের পর গাছ বা দেয়ালের আড়াল শেষে পুনঃসাক্ষাত ঘটলে পুনরায় সালাম কোরো। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ বিদায় বেলায় সালাম করা সুন্নত। হজরত কাতাদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, গৃহে প্রবেশকালে গৃহবাসীদেরকে সালাম বলবে। গৃহনিষ্ক্রান্তকালেও সালাম বলবে। মুরসাল পদ্ধতিতে এই বর্ণনাটি শো'বুল ইমানে লিপিবদ্ধ করেছেন বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো জনসমাবেশে পৌছলে সালাম বলবে। বসতে ইচ্ছে হলে বসবে। প্রত্যাবর্তনের সময়েও সালাম বলবে। প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা অধিকতর জরুরী নয় (অর্থাৎ দুই সালামই সমগুরুত্বসম্পন্ন)। তিরমিজি, আবু দাউদ।

মাসআলাঃ যদি কেউ কারো সালাম পৌছায় তবে যাকে সালাম পৌছানো হয়েছে সে বলবে, 'আলাইকা ওয়া আলাইহিস্ সালাম।' অর্থ তোমার প্রতি এবং তার প্রতি (যে সালাম বলেছে) শান্তি বর্ষিত হোক। গালেব তাঁর পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, আমাকে আমার পিতা বললেন, রসুল স. এর নিকটে যেয়ে আমার সালাম বোলো। আমি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম পৌছালাম। তিনি স. বললেন, তোমার প্রতি এবং তোমার পিতার প্রতি সালাম। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ কাফেরদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া জায়েয নয়। রসুল স. বলেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম করবে না। রাস্তায় ইহুদী কিংবা খৃষ্টানের সাক্ষাত পেলে এমনভাবে পথ চলো যেনো তারা রাস্তার একপাশ দিয়ে

চলে যেতে বাধ্য হয়। মুসলিম। কোনো দলে মুসলমান, মূর্তিপূজক, ইহুদী মিলিতভাবে থাকলে দলকে লক্ষ্য করে সালাম দিও। এ প্রসঙ্গে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী ও মুসলিম। বলা হয়েছে, দলকে উদ্দেশ্য করে সালাম বললেও নিয়ত রাখতে হবে কেবল মুসলমানদেরকে সালাম দেয়া হচ্ছে।

মাসআলাঃ জিম্মি কাফেরদের সালামের জবাব দেয়াতে দোষ নেই। জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকা' বলবে। এর বেশী নয়। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যখন তোমাকে কোনো আহলে কিতাব সালাম দিবে তখন জবাবে বলবে, 'ওয়া আলাইকুম'।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে যে কেউ (ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক) সালাম বলুক তার জবাব দিতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'ইজা হুইয়িতুম বি তাহিয়্যাতিন' (তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয়.....)। ইবনে আবী শাইবা, বোখারী।

মাসআলাঃ নামাজ ও খোতবা পাঠকালে সালামের জবাব দেয়া যাবে না। এ রকম করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াতের সময়, হাদিস লিপিবদ্ধ করার সময়, ধর্মীয় আলোচনার সময় এবং আজান-ইকামতের সময় সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে জায়েয।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ের হিসাব গ্রহণকারী।' মুজাহিদ বলেছেন, হিসাব গ্রহণকারী অর্থ হেফাজতকারী। আল্লাহ্‌ বান্দাদের হক প্রতিপালিত হলো কিনা সে বিষয়ে হিসাব গ্রহণ করবেন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। যেমন— ১. পীড়িতের সেবা শুশ্রুষা করা। ২. মৃতের জানাজা ও দাফন কাফনে উপস্থিত থাকা। ৩. নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অথবা আহবানে সাড়া দেয়া। ৪. সাক্ষাতে সালাম করা। ৫. হাঁচি শুনলে দোয়া করা অর্থাৎ হাঁচি দাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌ বলা। ৬. উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করা। নাসাঈ। এই হাদিসটি হজরত আলী থেকে তিরমিজি ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার ছয় নম্বরে কল্যাণকামনার কথা বলা নেই। তদস্থলে রয়েছে, নিজের জন্য যা পছন্দ অন্যের জন্য তাই পছন্দ করা। উভয় বর্ণনার মূল মর্ম একই।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা রাস্তায় উপবেশন কোরো না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌। এ রকম না করলে আমাদের চলে না। প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা, লেন-দেন আমাদেরকে রাস্তায় বসেই সমাধা করতে হয়। রসুল স. বললেন, যদি তোমরা নিরূপায় হও তবে রাস্তার হক আদায় কোরো। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! রাস্তার হক কী রকম? রসুল স. বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, পথে পতিত কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা, অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দেয়া, সৎকর্মের পরামর্শ দেয়া এবং অসৎকর্মের প্রতিবন্ধক হওয়া। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে,

পথানুসন্ধানীকে পথের সন্ধান দেয়া। আবু দাউদ। হজরত ওমরের বর্ণনায় এসেছে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, পথহারাকে পথের দিশা দেয়া। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ সালামের পূর্ণতা হলো মুসাফাহা (করমর্দন) এবং মুয়ানাকা (আলিঙ্গন)। হজরত আবু উমামা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, মুসাফাহা হচ্ছে সালামের পূর্ণতা।

হজরত আবু জর বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হলে তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করতেনই। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বাড়ী ছিলাম না। বাড়ী এসে যখনই সংবাদ জানলাম তখনই ছুটে গেলাম রসুল স. এর খেদমতে। তিনি একটি আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর আলিঙ্গন ছিলো অনবদ্য, অনন্য। আবু দাউদ।

শা'বী বর্ণনা করেন, একবার সফর থেকে ফিরে হজরত আবু জাফর ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে দেখা হতেই রসুল স. তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) চুম্বন করলেন। আবু দাউদ। শো'বুল ইমানে এই হাদিসটি মুরসাল হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন বায়হাকী। শরহে সুন্নায় বিইয়াদীর বর্ণনাসূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মিলিতভাবে— সেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবু জাফর বলেন, রসুল স. আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করেছেন।

হজরত আতা খোরাসানী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা পরস্পর করমর্দন করো এবং ঈর্ষা দূর করো। উপঢৌকন বিনিময় করো। এতে করে বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে এবং শক্রতা দূর হবে। মুরসাল রূপে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক।

হজরত বারা বিন আজিব বর্ণনা করেন, যখন দু'জন মুসলমান মুসাফাহা করে তখন তাদের গোনাহ্ ঝরে যায়। বায়হাকী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৭

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ○

❐ আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেনই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা অন্য কারো নেই। পূর্ববর্তী আয়াতে 'সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' বলে বান্দাদের হক প্রতিপালনের ব্যাপারে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিলো— এই আয়াতের শুরুতে সেই সতর্ক সংকেতকেই

জোরদার করে বলা হয়েছে, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু।' অর্থাৎ স্মরণে রেখো আল্লাহ্ যেমন সকল কিছুর হিসাব গ্রহণ করবেন, তেমনি তিনি ব্যতীত উপাস্যও কেউ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন সবাইকে কবর থেকে তুলে হাশরের ময়দানে একত্র করবেন। 'কিয়াম' এবং 'কিয়ামত' শব্দ দুটির অর্থ একই। যেমন 'তলব' ও 'তলবাতুন'—এই দুটি শব্দের অর্থ এক। অর্থাৎ হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। কিয়ামতের একত্রিকরণের সংবাদটিতে সন্দেহের অবকাশই নেই।

শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? এই বাকভঙ্গিটি হচ্ছে প্রশ্নবোধক অস্বীকৃতি। অর্থাৎ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কেউই নেই। সুতরাং তিনি যখন কিয়ামতের ভয়াবহতার সংবাদ দিচ্ছেন, তখন তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত।

বোখারী ও অন্যান্যরা হজরত জায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, রসুল স. মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উহুদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন। কিছু দূর তাঁর সঙ্গ নিয়ে মুনাফিকেরা ফিরে গেলো মদীনায়। তাদের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেন সাহাবীরা। একদল বললেন, এই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। অন্যদল বললেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করাই উচিত। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৮

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

❒ তোমাদের হইল কী যে তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে, যখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও? এবং আল্লাহ্ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।

সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ হচ্ছে, তোমরা বাদানুবাদ করছো কেনো? এখানে দলাদলি করার কোনো কারণই তো নেই। বিষয়টিকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট সোপর্দ করলেই তো পারো। অপেক্ষা করো তাঁর হুকুমের। তাঁর প্রতিই পূর্ণ আস্থাশীল হও। যে নির্দেশ তিনি তাঁর রসুলের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন, তাই প্রতিপালন করে যাও।

হজরত সাদ বিন মুআজ থেকে সাঈদ বিন মানসুর এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, একদিন রসুল স. ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে দুঃখ দেয় এবং তার ঘরে এমন লোকদেরকে একত্র করে যারা আমাকে কষ্ট দেয়—আমার সহায়তার্থে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য প্রস্তুত

আছো কে? সা'দ বিন মুআজ বললেন, ওই লোক যদি আওস গোত্রের হয় তবে তাকে আমরা হত্যা করবো। আর যদি সে খাজরাজ গোত্রের হয় তবে আপনি তার সম্পর্কে যা হুকুম দিবেন আমি তাই পালন করবো। একথা শুনে সা'দ বিন উবাদা দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, সা'দ বিন মুআজ! এটা রসুল স. এর অনুসরণ নয়। কেননা, তোমরা অবগত। আর ওই লোক অজ্ঞ। এবার দাঁড়িয়ে গেলেন উসাইদ বিন হুদাইর। বললেন, হে ইবনে উবাদা! তুমি মুনাফিক। মুনাফিকদের সঙ্গেই তোমার হৃদ্যতা। এ রকম বাদানুবাদ দেখে হজরত মোহাম্মদ বিন মুসলিমা বললেন, সবাই চুপ করো। রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত। তিনি যা নির্দেশ করবেন, আমরা তাই নির্বিবাদে প্রতিপালন করবো। অতঃপর অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত জায়েদ বিন আসলাম থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুল স. তাঁর ভাষণে বললেন, ওই সকল লোক সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী যারা রসুলের সহচরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং রসুলের পবিত্র স্ত্রীগণ সম্পর্কে অপবাদ ছড়ায়, অথচ আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং তাঁদের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। এরপর রসুল স. ওই আয়াত পাঠ করলেন, যাতে বিশ্বাসীদের জননী হজরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি।

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, কতিপয় আরববাসী রসুল স. এর খেদমতে মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লো। পীড়া নিয়েই তারা বের হয়ে গেলো মদীনা থেকে। পথিমধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে দেখা হলো তাদের। তাঁরা মদীনা থেকে চলে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। প্রত্যাবর্তনকারীরা বললো, মদীনার মহামারী প্রভাব বিস্তার করেছে আমাদের উপর। তাই আমরা পীড়াগ্রস্ত। সাহাবীগণ বললেন, তোমরা তাহলে রসুল স. এর অনুসরণ করোনি। তিনি তো হিজরতের পর থেকে মদীনাতেই বসবাস করে চলেছেন। আর তোমরা তাঁর অনুসারী হয়ে ফিরে যাচ্ছো। ওই লোকগুলোকে কেন্দ্র করে সাহাবীগণের মধ্যে সৃষ্টি হলো দু'টি দল। একদল বললেন, এরা মুনাফিক। আর এক দল বললেন, মুনাফিক নয়। এই বাদানুবাদের প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাটির সূত্রে রয়েছে ত্রুটিবিচ্যুতি। বর্ণনাকারীর নাম এখানে বাদ পড়েছে। তাই এ বর্ণনাটি গ্রহণীয় নয়।

মুজাহিদের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, কিছু লোক মদীনায় এসে মুসলমান হলো। তারপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলো। রসুল স. এর নিকটে তারা ব্যবসার মালমাত্তা সংগ্রহের জন্য মক্কায় যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। অনুমতি পেয়ে মক্কায় গিয়ে বসবাস করতে লাগলো তারা। তাদের সম্পর্কে সাহাবীগণ বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, তারা ছিলো মুনাফিক। কেউ কেউ বললেন— না, মুমিন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কতিপয় কোরায়েশ মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর তারা এজন্য লজ্জিত হলো এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলে ভিড়ে মদীনা থেকে চলে গেলো। দূর থেকে রসুল স. কে তারা এই মর্মে চিঠি লিখলো যে, আমরা আমাদের আগের বিশ্বাসেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। মদীনায় আমরা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের আকাংখা হয়ে উঠেছিলো প্রবল। তাই আমরা চলে এসেছি। এর কিছুদিন পর তারা বাণিজ্য ব্যাপদেশে শামদেশে গেলো। সাহাবীগণ এই সংবাদ পেলেন। কেউ কেউ বললেন, চলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। তাদেরকে ধরে নিয়ে আসি। কারণ তারা ধর্মত্যাগী। আবার কেউ বললেন, তারা তো আমাদের ধর্মমতেই রয়েছে। স্বধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও কেনো? এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পূর্ববৎ অবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। কারণ, তাদের কৃতকর্ম ছিলো এই অবস্থার অনুকূল। তারা পূর্ব বিশ্বাসকেই পছন্দ করেছে এবং (রসুলের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করে) কাফের মুলুকে বসতি গড়েছে। আল্লাহ্ তাই তাদের ভ্রষ্টতাকেই তাদের চোখে শোভনীয় করে দিয়েছেন। তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাও অথবা তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রাপ্ত বলতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ই পথভ্রষ্ট করেছেন?

এই আয়াত দ্বারা ওই দলিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বান্দাদের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বজ ক্রিয়াকলাপের স্রষ্টা আল্লাহ্ই। বান্দা কর্তা আর আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টিকর্তা।

অবশেষে তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা জানিয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহ্পাক যাকে পথভ্রষ্টতায় প্রতিষ্ঠিত করে দেন, তার হেদায়েতের পথ তোমরা কখনোই পাবে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৯

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

❐ তাহারা যেরূপ সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তোমরাও সেই রূপ সত্য প্রত্যাখান কর এবং তোমরা তাহাদের সমান হও ইহাই তাহারা কামনা করে। সুতরাং আল্লাহের পথে গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না; যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তাহাদিগকে যেখানে পাইবে গ্রেফতার করিবে এবং হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করিবে না;

মুমিনদেরকে কাফেরদের অভিপ্রায় সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে এই আয়াতে। বলা হচ্ছে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা চায় তোমরাও সত্যপ্রত্যাখ্যান করো

এবং তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের মতো হয়ে যাও। অতএব সাবধান। তাদের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপন কোরো না। তারা যতোক্ষণ না আল্লাহ্র পথে গৃহত্যাগ (হিজরত) করবে, ততোক্ষণ তাদেরকে বিশ্বাস কোরো না।

হজরত ইকরামা বলেন, হিজরত তিন ধরনের— ১. ওই হিজরত যা মক্কার সাহাবীগণ করেছিলেন। ২. মুজাহিদগণের হিজরত যারা রসুল স. এর সঙ্গী হয়ে কেবল পুণ্য অর্জনের ইচ্ছায় আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করেছেন। ৩. ওই হিজরত যা আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিত্যাগ করাকে বুঝায়।

এরশাদ হচ্ছে, যারা হিজরত বিমুখ অথবা হিজরত থেকে ফিরে যায় তাদেরকে বন্দী করো এবং হত্যা করো। পুনরায় বলা হচ্ছে, তাদেরকে তোমাদের বন্ধু নির্বাচন কোরো না। মনে কোরো না, তারা তোমাদের সহায়।

শেষ বাক্যটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের সময়েও কাফেরদের সহায়তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। জুহুরী বর্ণনা করেছেন, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার সাথীদেরকে নিয়ে যখন উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে গেলো তখন সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন, ইহুদীদের সঙ্গে আমরা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। এখন তাদের সহায়তা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রসুল স. বললেন, তারা জঘন্য। তাদের সহায়তার প্রয়োজন আমাদের নেই।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯০

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

❐ কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয় যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ও তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। সুতরাং তাহারা যদি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়, তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।

পূর্ববর্তী আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছিলো, কাফেরদেরকে বন্দী ও হত্যা করতে হবে। এই আয়াতে বলা হলো, সকল কাফেরের সঙ্গে এ রকম আচরণ কোরো না। যারা তোমাদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ তাদেরকে বন্দী করা অথবা হত্যা করা যাবে না।

একটি প্রশ্নঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিলো, কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। এখানে আবার সন্ধির কথা বলা হলো কেনো? সন্ধি মানে তো বন্ধুত্বই।

উত্তরঃ বন্ধু নির্বাচন কোরো না অর্থ যে সকল কাফের তোমাদের শত্রু তাদেরকে বন্ধু ভেবো না। তারা কতলের উপযোগী। কারণ, তারা তোমাদেরকে কতল করতে চায়। তাই তাদেরকে কখনো প্রিয়ভাজন ভেবো না। আন্তরিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে দ্বিধা কোরো না।

বাগবী লিখেছেন, সন্ধিবদ্ধ গোত্র হচ্ছে বনী আসলাম গোত্র। ঘটনাটি এ রকম— হেলাল বিন আওয়ামির আসলামী মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসুল স. এর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ ছিলো যে, সে এবং তার গোত্র রসুল স. অথবা তাঁর শত্রুপক্ষ কাউকেই সমর্থন করবে না। আর বিধর্মীদের কেউ যদি হেলালের আশ্রয় যাচনা করে, তবে তাকেও হেলালের গোত্রের লোকেদের মতো নিরাপত্তা দিতে হবে (বন্দী বা হত্যা করা যাবে না)। মুজাহিদ থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম।

হজরত সুরাকা বিন মালেক থেকে হাসানের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, (সুরাকা বলেন) বদর ও উহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিজয় দেখে আশে পাশের অনেক লোক মুসলমান হয়ে গেলো। তখন আমি জানতে পারলাম, রসুল স. খালেদ বিন ওলিদকে আমার সম্প্রদায় বনী মাদলাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাচ্ছেন। আমি তৎক্ষণাৎ রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন জানালাম, সংবাদ পেলাম আপনি খালেদকে আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করতে চাচ্ছেন। আমি আপনার নিকট এই মর্মে শান্তি প্রস্তাব করছি যে, আপনি আমার সম্প্রদায়কে নিরূপদ্রব রাখুন। যদি কখনো মক্কাবাসী আপনার স্বজনেরা মুসলমান হয়ে যায় তবে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। আর যদি তারা মুসলমান না হয় তবুও আমার সম্প্রদায় আপনার বিরুদ্ধবাদী হবে না। আপনার শত্রুপক্ষকে সহায়তাও করবে না। রসুল স. তখন হজরত খালেদের হাত ধরে বললেন, তাদের নিকট যাও। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। হজরত খালেদ বনী মাদলাজের নিকটে গিয়ে এই মর্মে সন্ধি করলেন যে, তারা রসুল স. এর শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে পারবে না। আর কোরায়েশেরা যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। ওই সময় অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি। এই চুক্তির কারণে কেউ যদি বনী মাদলাজ গোত্রে গিয়ে আশ্রয় নিতো তবে সেও তাদের মতো নিরাপত্তা লাভ করতো।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুসরণে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে সুরাকা বিন মালেক মাদলাজী হেলাল বিন উয়াইমির আসলামী এবং বনী খুজাইমা বিন আমের বিন আবদে মানাফ সম্বন্ধে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাক লিখেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্যও ছিলো মুসলমানদের

সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ বনী বকর বিন জায়েদ মানাত। মুকাতিল বলেছেন, সন্ধিবদ্ধ গোত্রটি ছিলো বনী খাজাআহ্।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে তাদেরকেও বন্দী অথবা হত্যা করা যাবে না। কারণ, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। এখানে বলা হচ্ছে, মুনাফিকেরাও বন্দী ও হত্যার হুকুমের আওতায় পড়বে না। কারণ, তারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। এই নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে মদীনার সন্ধিবদ্ধ ইহুদীদের ক্ষেত্রেও।

এরশাদ হয়েছে, এ ধরনের ভীত ও হতোদ্যম মুনাফিক ও কাফেরেরা তোমাদের উপর চড়াও হতে পারতো যদি আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের ভয় তাদের অন্তরে স্থাপন না করতেন। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমতা দিলে তারা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো। এখন তারা যখন এ রকম করে না, সুতরাং তোমরাও এ রকম কোরো না। তাদেরকে বন্দী এবং হত্যা করার হুকুমটি এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯১

سَتَجِدُونَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

❐ তোমরা অপর কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত শান্তি চাহিবে। যখনই তাহাদিগকে ফিতনার দিকে ফিরাইয়া লওয়া হয় তখনই এই ব্যাপারে তাহারা তাহাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাহাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে গ্রেফতার করিবে ও হত্যা করিবে এবং তোমাদিগকে ইহাদেরই বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অনুমতি দিয়াছি।

এরশাদ হচ্ছে, তোমরা দেখতে পাবে এক ধরনের মুনাফিক তোমাদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে চায়, আবার স্বসম্প্রদায়কেও সন্তুষ্ট রাখতে চায়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ্র মাধ্যমে কালাবী বর্ণনা করেছেন, ওই মুনাফিকেরা ছিলো বনী আসাদ ও বনী গাতফান গোত্রের। তারা মদীনায় এসে বসবাস করছিলো। তারা লোক দেখানোর জন্য মুখে কলেমা পড়েছিলো। অন্তরে

অন্তরে তারা ছিলো কাফের। তাদের গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো, তোমরা মুসলমান হলে কেনো? তারা তখন বলতো, আমরা বানর ও বিচ্ছুর ইমান গ্রহণ করেছি (বানর ও বিচ্ছুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি)। আর সাহাবীগণের সাক্ষাতে তারা বলতো, আমরা তোমাদের ধর্মেই আছি। এভাবে তারা উভয় পক্ষকে খুশী রাখতে চেষ্টা করতো। এদের স্বভাব এ রকম— যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিলে তারা আসলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এরশাদ হয়েছে, তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত না থাকে, যদি তোমাদের নিকট সন্ধি ও শান্তির আবেদন পেশ না করে তবে তাদেরকে যেখানে পাও, ধরো এবং হত্যা করো। এ রকম লোকদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে মোকাবিলা করার স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি। কারণ, তাদের শত্রুতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চিতরূপে জানা হয়েছে যে, তারা প্রকৃতই কাফের এবং শত্রুতালিপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, আয়াশ বিন রবীয়া মাখজুমী ছিলেন আবু জেহেলের ভাই। রসুল স. এর হিজরতের আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মনে হলো, তাইতো ব্যাপারটা তো পরিবারের সবাই জেনে যাবে (সবাই তখন নির্মম অত্যাচার চালাবে)। তিনি তখন দ্রুত মক্কা ত্যাগ করলেন। চলে গেলেন মদীনায়। সেখানকার এক পাহাড়ী গহবরে আত্মগোপন করলেন। আয়াশ উধাও হওয়ার পর তাঁর মা হয়ে পড়লো প্রায় উন্মাদিনী। সে তার দুই ছেলে আবু জেহেল এবং হারেস বিন হিশামকে বললো, আয়াশকে এনে দাও। আল্লাহ্‌র কসম তোমরা আয়াশকে না আনা পর্যন্ত আমি ঘরে যাবো না। পানাহারও করবো না। মায়ের কসম শুনে দুই ভাই বের হলো আয়াশের সন্ধানে। হারেস বিন জায়েদ বিন আবী আনিসাও সঙ্গী হলো তাদের। খুঁজতে খুঁজতে তারা হাজির হলো সেই পাহাড়ী গর্তের কাছে। বললো, নিচে নেমে এসো। তোমার চলে আসার সংবাদ শুনে মা কসম খেয়েছে, তোমাকে তার কাছে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মা ঘরে ঢুকবে না। পানাহারও করবে না। আমরাও কসম খাচ্ছি, আমরা তোমার ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করবো না। তুমি যে ধর্মে ইচ্ছা করবে সেই ধর্মেই থাকতে পারবে। মা শোকাচ্ছন্না। বেহুঁশ। তার উপর কসম খেয়ে বসে আছে। সুতরাং চলো আমাদের সঙ্গে। মায়ের দুরবস্থার কথা শুনে আয়াশ নরম হয়ে গেলো। সে গিরিগহবর থেকে নিচে নেমে এলো। সাথে সাথে ভাইয়েরা তাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো। প্রত্যেকে একশ' করে চাবুক মারলো। তারপর তাকে হাজির করে দিলো মায়ের সামনে। মা বললো, আল্লাহ্‌র কসম— ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে বাঁধনমুক্ত করবো না। আয়াশকে ফেলে রাখা হলো প্রখর রৌদ্রে। বন্দী আয়াশ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওই কথাই উচ্চারণ করলো যা ছিলো তার মায়ের ইচ্ছা। তখন বাঁধনমুক্ত করে দেয়া হলো আয়াশকে। হারেশ বিন জায়েদ এই ঘটনা দেখে বলে উঠলো, সামান্য কষ্টও সহ্য করতে পারলে না। ইমান পরিত্যাগ করলে। আল্লাহর কসম! তুমি যে মত গ্রহণ করেছিলে তা যদি সত্য হয় তবে তো তুমি সত্যকেই পরিত্যাগ করলে। তুমি যে পথভ্রষ্ট সেই

পথভ্রষ্টই রয়ে গেলে। আয়াশ এ কথা শুনে রেগে গেলো। বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি তোমাকে কখনো একা পাই তবে হত্যা না করে ছাড়বো না।

কিছু দিন পর আয়াশ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং চলে গেলেন মদীনায়। এর কিছু দিন পর হারেস বিন জায়েদও মুসলমান হয়ে গেলেন এবং মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় রসুল স. এর নিকটে হাজির হলেন। আয়াশ এ কথা জানতেন না। একদিন তিনি কোবার বাইরের দিকে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে দেখা হলো হারেসের সঙ্গে। আয়াশ আর কালবিলম্ব না করে হারেসকে হত্যা করলেন। লোকেরা বললেন, তুমি করেছো কী? হারেস তো এখন মুসলমান। আয়াশ রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে জানালেন, হারেস যে মুসলমান হয়েছে এ কথা আমার জানা ছিলো না। আমি তাকে কাফের ভেবেই খুন করেছি।

ইবনে জারীর হজরত ইকরামার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, হারেস বিন জায়েদ আবু জেহেলের সঙ্গী হয়ে আয়াশের উপর অত্যাচার করেছিলো। পরে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। আয়াশ এ কথা জানতেন না। তাই হাতের কাছে পেয়েই তাঁকে খুন করেছিলেন। খুন করার পর আয়াশ রসুল স.এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯২

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

❒ কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর জন্য সংগত নহে, তবে ভুলবশতঃ করিলে উহা স্বতন্ত্র; এবং কেহ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করিলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তাহার

পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন সে একাধিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিবে। তওবার জন্য ইহা আল্লাহের ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীকে হত্যা করতে পারবে না। এ রকম করা হারাম। এ রকম বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ ও সুদ্দী। এ রকম আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসাহাক, আবু ইয়া'লী, হারেস বিন আবী উসামা, আবু মুসলিম কাহী এবং কাসেম বিন মোহাম্মদ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ বিন জোবায়েরের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাটিও একই রকম।

আয়াতের বক্তব্য এই যে, এক মুমিনকে হত্যা করা অন্য মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এ কাজে রয়েছে বিশ্বাসের অনড় অন্তরায়। এ কাজ যারা করে তারা অবিশ্বাসীদের মতো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী রসুল স. এর এই নির্দেশটি বর্ণনা করেছেন যে, ইমান থাকা অবস্থায় কেউ কোনো মুমিনকে খুন করতে পারে না।

সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, সাধারণভাবে পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, এ রকম বিষয়াবলী প্রকাশের বাকভঙ্গিতে আরবীতে 'কানা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'কানাল ইনসানা কুফুরা' (বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ), 'কানাল ইনসানু ক্বতুরা (বস্তুত মানুষ বড়ই সংকীর্ণচিত্ত)। আমি বলি, সিহাহ্'র বর্ণনানুসরণে এ কথাও বলা যায় যে, এক বস্তু অন্য বস্তু থেকে যখন অধিকাংশ সময় পৃথক থাকে অর্থাৎ সাধারণতঃ একত্র হয় না (বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে একত্র হয়) —এমতাবস্থায় 'মা কানা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন 'মা কানাল্লহু লি ইউআয্যিবাহুম ওয়া আংতা ফিহিম' (আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন)। এই বিধানটি সাধারণ। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে। যেমন, উহুদ যুদ্ধের সময় রসুল স. উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মুসলমান বাহিনীর উপর নেমে এসেছিলো বিপদ। পর্যুদস্ত হয়েছিলেন মুসলমানেরা। কিন্তু এ রকম ঘটনা সকল ক্ষেত্রে কিংবা সাধারণতঃ ঘটেনি। এই আয়াতেও তেমনি সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোনো বিশ্বাসীর জন্য সংগত নহে।' এবং বাক্যটির শুরুতে 'মা কানা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'মা কানা লাকুম আং তু-জু রসুলাল্লাহি ওয়ালা আং তানকিহু আজওয়াজাহু মিম বায়াদিহ্।' 'তোমাদের জন্য রসুল স. কে কষ্ট দেয়া সংগত নয় এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করাও সংগত নয়।' এ কথার উদ্দেশ্য এই যে— এমন কাজ তোমরা কোরো না। 'সংগত নয়' অর্থ জায়েয নয়। অর্থাৎ হারাম।

কিন্তু ভুলক্রমে এ রকম হত্যাকাণ্ড ঘটে যেতেও পারে। হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত হতে পারে। অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। ইচ্ছাকৃত হত্যা হচ্ছে কতলে আমাদ এবং অনিচ্ছাকৃত হত্যা হচ্ছে কতলে খাতা। ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কে বিভিন্নমুখী বর্ণনা, কিসাসের হুকুম, প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয়ে সুরা বাকারার আয়াত 'কুতিবা আলাইকুমুল কি্বসাস....' এর তাফসীরে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। এখানে কেবল অনিচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব

হবে কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, কাফফারা ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওয়াজিব। ইমাম আহমদ থেকে ওয়াজিব এবং ওয়াজিব নয়— দু'রকম বর্ণনাই এসেছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলবশতঃ হত্যার কারণে যদি কাফফারা ওয়াজিব হয়, তবে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তো আরো বেশী ওয়াজিব হওয়া প্রয়োজন। হজরত ওয়াসেল বিন আসকা' বর্ণনা করেন, আমাদের এক সাথী হত্যাকাণ্ড ঘটনোর কারণে দোজখী হয়েছিলো। তার সম্পর্কে আমরা রসুল স. এর নিকট বিধান জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, তাকে বলো, সে যেনো একটি গোলাম আজাদ করে দেয়। গোলামের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুক্ত হওয়ার কারণে তারও প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুক্ত হয়ে যাবে। রাফেঈ। এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, দোজখমুক্তির জন্য ইচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারা ওয়াজিব। এ জন্য একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিতে হবে। আমরা বলি, এই হাদিসটি আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেমও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওই বর্ণনায় কেবল এ কথাটিই আছে যে, আমাদের সাথী দোজখী হয়ে গিয়েছে। (কিসাস, দিয়ত অথবা দোজখবাসের অবস্থা সম্পর্কে সেখানে ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি)।

নস্ (কোরআন, হাদিস) দ্বারা বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ভুলবশতঃ হত্যা করলে যেহেতু কাফফারা ওয়াজিব তাই ইচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারাও ওয়াজিব—এ কথাটি গ্রহণীয় নয়। কারণ, ইচ্ছাকৃত হত্যা কবীরা গোনাহ্। এজন্য কাফফারাকেই যথেষ্ট মনে করা হলে ইচ্ছাকৃত হত্যার সুযোগ অবারিত করা হবে। ভুলক্রমে হত্যার সঙ্গে তাহলে আর পার্থক্য রইলো কোথায়? দোজখবাস তো পরের ব্যাপার। আর গোলাম আজাদ করা একই সঙ্গে ইবাদত ও শাস্তি।

আমাদের নিকট পার্থক্যটি ইয়ামিনে গামুস এবং ইয়ামিনে মোনাক্বাদার মতো। জেনে শুনে কসম খেয়ে ভুল সাক্ষ্য দেয়াকে ইয়ামিনে গামুস এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কসম খাওয়াকে ইয়ামিনে মোনাক্বাদা বলে। প্রথমটির কাফফারা নেই। দ্বিতীয়টির আছে। ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে ভুলক্রমে হত্যার মতোই কাফফারা দিতে হবে। শিবহে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা সম্পর্কে ওলামাগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা ওই হত্যাকে বলে— যা এমন অস্ত্র দ্বারা করা হয় যা হত্যার জন্য বানানো হয়নি (যেমন বড় পাথর অথবা বড় কাঠ)। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদও এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এমন বস্তু দ্বারা হত্যাকাণ্ড ঘটানো যার দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যু সংঘটিত হয় না। তাই দুই একবার চাবুক মারলেই যদি মৃত্যু সংঘটিত হয় তবে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হবে। আর ছোট চাবুক দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহারের ফলে মৃত্যু সংঘটিত হলে তা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে বিবেচিত হবে। এ কথা বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের মতে, এ রকম হত্যা হবে ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ। বড় পাথর বা বড় তক্তার দ্বারা হত্যা করা হলে তা হবে ইমাম আজমের মতে

ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ এবং অন্য ইমামদের মতে ইচ্ছাকৃত হত্যা। পাহাড় থেকে ফেলে দেয়ার ফলে মরে গেলে ইমাম হানিফার মতে কিসাস হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারা না হওয়ার দলিল ওই হাদিসটি, যা হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে আবী শায়বা, বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই—রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশসমূহ মান্য করেছে, সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে জাকাত দিয়েছে এবং মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেনি, সে জান্নাতে যাবে। পাঁচটি বিষয়ের কাফফারা নেই। ১. অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ২. মুসলমানকে অপবাদ দেয়া। ৩. যুদ্ধপ্রান্তর থেকে পলায়ন। ৪. অর্থ আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ।

ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যা অপেক্ষা নিম্নস্তরের। শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করাটা ইচ্ছাকৃতই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। ইমাম আবু হানিফা দলিল হিসেবে এই হাদিসটি পেশ করেছেন— রসুল স. বলেছেন, দোররা এবং লাঠি দ্বারা হত্যা করা হচ্ছে ভুলক্রমে হত্যা সদৃশ। সত্ত্বরই বর্ণনা আসছে যে, চাবুক এবং লাঠির মধ্যে ছোট বড় সব ধরনের হত্যাকেই শামিল করা যায়। জমহুর বলেন, লাঠি বলতে ছোট লাঠিই বুঝতে হবে। বড় বাঁশ বা বৃক্ষকে লাঠি বলা যায় না।

দ্বিতীয় প্রকার হত্যা হচ্ছে ভুলবশতঃ হত্যা— শিকার মনে করে হত্যা করলে, পরে দেখা গেলো শিকার নয়, মানুষ অথবা যুদ্ধে কাফের মনে করে হত্যা করার পর জানা গেলো নিহত ব্যক্তি কাফের নয় —মুসলমান।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, ঘটনাক্রমে অনিচ্ছাকৃত হত্যা। তীর নিক্ষেপের ফলে দেখা গেলো কেউ অতর্কিতে তীরবিদ্ধ হয়ে মরেছে। এ রকম হত্যা ভ্রমবশতঃ হত্যা। যেমন, কোনো ব্যক্তি ঘুমজড়িত অবস্থায় পাশ ফিরতে যেয়ে অন্য কোনো মুসলমানের উপর পড়ে গেলো এবং এর ফলে তার মৃত্যু হলো।

চতুর্থ প্রকার হচ্ছে, কারণিক হত্যা। যেমন কোনো ব্যক্তি তার আপন এলাকার বাইরে একটি কূপ খনন করলো—ওই কূপে পড়ে কেউ মারা গেলো। অথবা কেউ জমিতে কোনো পাথর রাখলো, সেই পাথরে হোঁচট খেয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলো। এ ধরনের হত্যা হচ্ছে কারণিক হত্যা।

এই প্রকারে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে হুকুম এই যে, জ্ঞানবানদের জন্য দিয়ত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে। এটা ঐকমত্য। এমতোক্ষেত্রে কিসাস (খুনের বদলে খুন) হবে না। রক্তপণ না দিলে অন্যায় হবে। দিলে গোনাহ্গার হবে না। এ ব্যাপারেও সকলে একমত হয়েছেন যে, এমতোক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কাফফারাও ওয়াজিব হবে এবং সে মীরাস (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সে উত্তরাধিকারবঞ্চিত হবে না। কারণ, সে যা করেছে তা প্রকৃত হত্যাকাণ্ড নয়— ইচ্ছাকৃতভাবে যেহেতু হত্যা করা হয়নি। এ ব্যাপারে কূপ খননকারী অথবা পাথরস্থাপনকারী সরাসরি জড়িত নয়। জমহুর বলেন, উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেনো হত্যাকাণ্ড তো সংঘটিত হয়েছেই। আর

শরিয়তও এটাকে হত্যাকাণ্ড বলে সাব্যস্ত করেছে। সে কারণেই তো দিয়ত ওয়াজিব করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে কারো মতদ্বৈততাও নেই। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এমতোক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে। দিয়ত হবে না। কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে সর্বাবস্থায়। গোনাহ্ মাফের জন্যই কাফফারাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। আর শায়িত ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে যেয়ে যদি কারো উপরে পড়ে গেলে তার মৃত্যু হয় তবে সে অপরাধী হবে কেনো?

রসুল স. বলেছেন, তিন প্রকার ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে— অর্থাৎ তাদের গোনাহ্ লেখা হবে না, তার মধ্যে এক ব্যক্তি হচ্ছে ঘুমন্ত ব্যক্তি— জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত যার কোনো গোনাহ্ নেই। কিন্তু অন্যের জমিতে কূপ খনন করে রাখলে সে কূপে পড়ে যদি কোনো মুমিন মারা যায়, তবে কূপ খননকারীকে কাফফারা দিতেই হবে। জুলুম বা ছিনতাই করার সময় (কূপে পড়ে) মারা গেলে অবশ্য কাফফারা দিতে হবে না।

দিয়ত হচ্ছে হত্যার বিনিময়। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারী যে ধনসম্পদ বা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দেয়, তাকে বলে দিয়ত। বলা হয়েছে, 'অতঃপর তার কাফফারা স্বরূপ একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিতে হবে।'

মাসআলাঃ এক বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হিসেবে এসেছে, শিবহে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার কাফফারা ওয়াজিব নয়। কেফায়া শরহে হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, জুরজানী বলেন, আমাদের আলেমগণ বলেছেন, 'শিবহে আমাদের' জন্য কাফফারা ওয়াজিব নয়। আমি বলি, এই অভিমতটিই অধিকতর সঙ্গত যে, হত্যার জন্য নির্ধারিত অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যা সংঘটিত না হওয়ায় 'শিবহে আমাদের' জন্য কিসাস হয় না। কিন্তু হত্যার গোনাহ্ থেকে নিষ্কৃতি নেই। কেননা, গোনাহ্র সম্পর্ক নিয়ত বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে। অস্ত্রের সঙ্গে নয়। অস্ত্রের প্রকারভেদ এখানে ধর্তব্য নয়। এমনকি ঘুষি মেরে কাউকে মেরে ফেললেও হত্যার কবীরা গোনাহ্ই হবে। এ রকম হত্যা তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা অপেক্ষা গুরুতর। দেখুন, কিসাস কার্যকর হয় তরবারী দ্বারা। দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু সহজ করার জন্যই এই ব্যবস্থা। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল কাজ সম্পাদনের সুন্দর নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা (কিসাস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও) সুন্দর নিয়মে কতল কোরো। কষ্ট দিয়ে কতল কোরো না। জবেহ্ কালেও সুন্দর নিয়মে জবাই কোরো। ছুরি শানিত করে নিও। কতলের প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে মেরো না। শাদ্দাদ বিন আওসের হাদিস থেকে এ রকম বর্ণনা এনেছেন আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরিমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা।

কাফফারা হিসেবে একটি গোলাম আজাদ করা ওয়াজিব। আজাদ করাকে আয়াতে 'হুর' বলা হয়েছে। ভালো এবং শ্রেষ্ঠ বস্তুকে হুর বলা হয়। কামুস অভিধানে রয়েছে, উত্তম বস্তুকে হুর বলা হয়। মুক্তিদানকে হুর বলার কারণ এই যে, এতে রয়েছে সৌজন্য ও কল্যাণ। 'রক্বাবাতুন' অর্থ গর্দান। আসল অর্থ জীবন। যেমন মাথা (নেয়া) অর্থ জীবন।

গোলাম বা বাঁদী পূর্ণ মালিকানাধীনে থাকলে তাকে মুক্তি দেয়া যাবে। বাঁদী গর্ভবতী থাকলে তার গর্ভস্থিত শিশুও মুক্ত হয়ে যাবে। কতলের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেয়া বৈধ নয়। আর তাকে বিক্রয় করাও জায়েয নয়। রসুল স. বলেছেন, শিশুর মাকে শিশুই আজাদ করে দিয়েছে।

এভাবে মুদাব্বার গোলামকে (যে দাসকে তার মালিক 'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত' এ কথা বলেছে তাকে মুদাব্বার গোলাম বলে) মুক্ত করাও বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা এ কথা বলেছেন। কেননা, মনিবের মৃত্যুর পর তার মুক্তির ঘোষণা তো রয়েছেই। ইমাম শাফেয়ীর মতে মুদাব্বার গোলামকে কাফফারা হিসেবে মুক্ত করে দেয়া জায়েয। মুকাতিব দাসকেও মুক্ত করা জায়েয, যদি সে তার মালিককে কিছুই পরিশোধ করে না থাকে (মুকাতিব বলে ওই দাসকে যাকে বলা হয়েছে, তুমি এতো টাকা পরিশোধ করতে পারলে মুক্ত)। ইমাম আবু হানিফার মতে, মুকাতিব আজাদ করা জায়েয। কেননা, দাস ও প্রভু সম্মত হলে চুক্তি রহিত করা যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুকাতিব মুক্ত করা নাজায়েয, যদি গোলাম কিছু অংশও পরিশোধ করে থাকে। মুকাতিব আজাদ করা অধিকাংশের মতে নাজায়েয—যদি মুকাতিব তার কিছু অংশ পরিশোধ করে থাকে।

পাগল, বোবা, কালা ও অন্ধকে আজাদ করা জায়েয নয়। উভয় হাত অথবা উভয় পা কাটা অথবা একদিকের এক হাত কাটা ও অন্য দিকের এক পা কাটা—এ রকম গোলামও আজাদ করা বৈধ নয়। এ ধরনের মানুষ মৃততুল্য। চোখে কম দেখে, ধবল কুষ্ঠের রুগী অথবা রাতকানা যদি হয়, তবে আজাদ করা জায়েয হবে। কেননা, এধরনের মানুষ সম্পূর্ণ সক্ষম না হলেও পুরাপুরি অক্ষম নয়।

জন্মগতভাবে পুরুষত্বহীন অথবা পরে নির্বীর্যকরণ করা হয়েছে— এমন গোলামকেও আজাদ করা সিদ্ধ। কেননা, তারা পৌরুষহীন হলেও শ্রম দিতে সক্ষম এবং তাদের নিকট থেকে শ্রম নেয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো, বংশবিস্তার নয়। এভাবে বাঁদী আজাদ করাও জায়েয, যদি সে কর্মসক্ষমা হয় (সহবাসসক্ষমা না হলেও)।

মাসআলাঃ হত্যাকারীকে হতে হবে জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং মুসলমান। কেননা, কাফফারা হচ্ছে ইবাদত। ইমাম শাফেয়ী কাফফারাকে দিয়ত তুল্য মনে করেছেন। দিয়ত আদায়ের ক্ষেত্রে বালেগা, জ্ঞানবান ও মুসলমান হওয়ার শর্ত নেই। তাই তিনি কাফফারার বেলাতেও এ সকল শর্তের উল্লেখ করেননি।

মাসআলাঃ ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এই যে, কাফফারার জন্য স্বেচ্ছায় আজাদ করতে হবে। তাই কাফফারার উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ যদি তার আপন পিতাকে ক্রয় করে, তবে জায়েয হবে না (কেননা, পিতা তো ক্রয় করার সাথে সাথেই ক্রেতার ইচ্ছা ছাড়াই আপনাআপনি আজাদ হয়ে যায়)। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, পিতা কিংবা নিকটতম কোনো আত্মীয় (যারা ক্রয় করার সাথে সাথেই আপনাআপনি মুক্ত হয়ে যায়) —তাদেরকে কাফফারার উদ্দেশ্যে খরিদ করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা, এক্ষেত্রে নিয়ত করা ওয়াজিব। এখানে ক্রয় মুক্তির কারণ এবং ক্রয়ের বিষয়টি ক্রেতার ইচ্ছাধীন। তাই ক্রয় করার সময়

কাফফারার নিয়ত করা জরুরী। তাই যদি কারো পিতা জায়েদ নামক কারো গোলাম হয় এবং জায়েদ আমর নামের কাউকে সেই পিতাকে দান হিসেবে দিয়ে দেয় অথবা অসিয়তের মাধ্যমে পিতার মালিকানা লাভ হয়, তবে হত্যার কাফফারা হিসেবে সেই দান বা অসিয়ত জায়েয হবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জায়েয হবে। কিন্তু পিতা পুত্রকে অথবা পুত্র পিতাকে মীরাস হিসেবে পেলে (অথবা আজাদ হয়ে গেলে) এই আজাদী বা মুক্তি কতলের কাফফারা হিসেবে যথেষ্ট হবে না (কাফফারার নিয়ত করে থাকলেও) —এটা ঐকমত্য।

আয়াতে 'মু'মিনা' শব্দটি এসেছে, তাই ঐকমত্যানুসারে কাফফারার জন্য যাকে মুক্তি দিতে হবে তাকে হতে হবে মুসলমান ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী। (কসমের কাফফারা, জেহারের কাফফারা এবং রোজার কাফফারার জন্য মুসলমান হওয়ার শর্ত নেই)। মুসলমান হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট, যেনো শরিয়তসম্মতভাবে সে মুসলমান বলে গণ্য হয়। যেমন, কোনো মুসলমান পিতা অথবা মাতা নিজের ছোট শিশুকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়—এ রকম করা জায়েয। কারণ, শিশুকে শরিয়তে তার পিতামাতার অনুগামী হিসেবে ধরে নেয়া হয়। মাতা পিতার মধ্যে যে কোনো একজন মুসলমান হলেও ওই শিশুকে মুসলমান ধরা হবে। ইবনে মুনজির, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন যে, এখানে 'মু'মিনা' অর্থ ওই গোলাম বা বাঁদী যার ইমানের অনুভূতি রয়েছে এবং যে নামাজ রোজা করে থাকে। কিন্তু কোরআনের যে স্থানে ক্রীতদাসের সঙ্গে মু'মিনার শর্তটি নেই, সেখানে সদ্যজাত শিশু কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও জায়েয। কাতাদা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক। ক্বারী হজরত উবাই বিন কাবের কে্বরাত অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক জায়েয নয়।

দিয়ত অর্থ রক্তের বিনিময়। এই বিষয়টিও দাসমুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। কামুস অভিধানে দিয়ত শব্দটি লিখিত হয়েছে 'দাল' অক্ষরে জের সহযোগে। দিয়ত বা রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে হত্যাকারীকে। আয়াতে কেবল দিয়ত প্রদানের হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু কার বা কাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে, সে কথা বলা হয়নি। এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে হাদিস শরীফে।

মাসআলাঃ দিয়ত হত্যাকারীর আসাবা ও উত্তরাধিকারীদের উপর ওয়াজিব। প্রতিটি উত্তরাধিকারীকে যতোটুকু দিতে হবে ততোটুকু—এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হত্যাকারীকে কিছুই দিতে হবে না।

আকেল (জ্ঞানসম্পন্ন) ব্যক্তির উপর দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কথা কোরআনে উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু বিষয়টি প্রসিদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং এর উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাদিসটি যদিও খবরে আহাদ (এককভাবে বর্ণিত) — তবুও তা ঐকমত্যপুষ্ট হওয়ার কারণে কোরআনের বিধানের মতো অকাট্য। কেননা, জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির উপর দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অবধারিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— বনী হুজাইল গোত্রের দুই রমণী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলো। একজন পাথর নিক্ষেপ করলো অন্যজনের

প্রতি, যে ছিলো গর্ভবতী। পাথরের আঘাতে সে এবং তার গর্ভস্থ শিশু দু'জনেই মৃত্যুবরণ করলো। এ প্রসঙ্গে রসুলপাক স. নির্দেশ দিলেন, শিশুর দিয়ত হিসেবে একটি গোলাম অথবা বাঁদী মুক্ত করে দিতে হবে। আর নিহত রমণীর দিয়ত পরিশোধ করবে হত্যাকারীর জ্ঞানসম্পন্ন আত্মীয়েরা। অন্য সূত্রের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, নিহত রমণীর দিয়ত পরিশোধ করবে তার ওয়ারিশেরা। এবং গর্ভস্থ শিশুর জন্য একটি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী মুক্ত করে দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী থেকে বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন—আমরা আলেমগণের ঐকমত্যসূত্রে জেনেছি যে, স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে নিহত হলে দিয়তের পরিমাণ হবে একশত উট। আর এই দিয়ত পরিশোধ করতে হবে হন্তারকের জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজনদেরকে। ঐকমত্যসূত্রে এ কথাও এসেছে যে, দিয়ত পরিশোধ করতে হবে তিন বছরের মধ্যে। প্রতি বছরে পরিশোধ্য এক তৃতীয়াংশ।

লেহিয়া সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন—সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেছেন, তিন কিস্তিতে তিন বছরে দিয়ত পরিশোধ করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই নিয়মটি ঐকমত্যসমর্থিত। তিরমিজি ও ইবনে মুনজিরও এ কথা বলেছেন। শা'বী সূত্রে মুনকাতে' হিসেবে ইবনে আবী শাইবা, আবদুর রাজ্জাক এবং বায়হাকীও বলেছেন (ধারাবাহিকতাছিন্ন বর্ণনাকে বলে হাদিসে মুনকাতে') — হজরত ওমর সম্পূর্ণ দিয়তের জন্য তিন বছর, অর্ধেকের জন্য দুই বছর এবং অর্ধেকের চেয়ে কমের জন্য এক বছর সময় নির্ধারণ করেছেন। হজরত আলীও বলেছেন এ কথা। তাঁর উক্তি মুনকাতে' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে বায়হাকী এবং ইয়াজিদ বিন আবী হাবীব কর্তৃক।

মাসআলাঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিছু সম্পদ দানের মাধ্যমে যদি সন্ধি হয়ে যায় অথবা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) মাফ হয়ে যাবে। এমতোক্ষেত্রে সম্পদ পরিশোধ করতে হবে হত্যাকারীকে। তার জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজনদেরকে নয়। হত্যাকারী সম্পদ দিতে স্বীকৃত হলেও জ্ঞানসম্পন্নরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ক্রীতদাস নিহত অথবা হত্যাকারী যেই হোক না কেনো, হত্যাকারীকেই দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধের দায় জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজনদের উপর বর্তাবে না।

হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে দারা কুতনী এবং তিবরানী বর্ণনা করেছেন—রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, জ্ঞানসম্পন্নদের উপর ওয়াজিব করে দিও না। অর্থাৎ স্বীকারোক্তিকারীর স্বীকৃত দিয়ত জ্ঞানসম্পন্ন উত্তরাধিকারীদের উপরে চাপিয়ে দিও না। এই হাদিসটির সনদ অত্যধিক দুর্বল। এর মধ্যে মোহাম্মদ বিন সাঈদ নামক বর্ণনাকারী ছিলো মিথ্যুক এবং হারিস বিন নাবহান ছিলো হাদিস অস্বীকারকারী। হজরত ওমর থেকে মাওকুফ রূপে দারা কুতনী এবং বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন—গোলাম নিজে নিহত হলে বা কাউকে হত্যা করলে এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস রহিত হয়ে গেলে সন্ধির মাধ্যমে কিংবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে দিয়ত অবশ্যপরিশোধ্য হয়ে থাকলে সেই দিয়ত জ্ঞানসম্পন্ন

নিকটাত্মীয়েরা পরিশোধ করবে না। হাদিসটির সনদ মুনকাতে'। এর এক বর্ণনাকারী আবদুল মালেক বিন হোসাইন দুর্বল। বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে সমঝোতা অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে গোলাম অপরাধী সাব্যস্ত হলে তার জ্ঞানসম্পন্ন নিকটাত্মীয়েরা দিয়ত পরিশোধ করবে না। মুয়াত্তা গ্রন্থে জুহুরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. এর সুন্নত এবং সাহাবীগণের সুন্নতের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল অবস্থায় হন্তারকের বুদ্ধিসম্পন্ন নিকটজনেরা দিয়ত পরিশোধের দায় বহন করবে না। বায়হাকী আবু জেনাদের মাধ্যমে বলেছেন, মদীনার ফকিহ্গণও এই অভিমতের প্রবক্তা।

মাসআলাঃ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন অর্থ হত্যাকারীর গোত্রের লোকজন এবং আসাবা (কোরআন ও হাদিসের বিধানানুসারে সম্পদবণ্টনের পর অতিরিক্ত অংশ যারা পায় তাদেরকে বলে 'আসাবা')। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গোত্রনেতৃত্ব না থাকলে নিকটতম আত্মীয়রা হবে জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন এবং কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে গোলামকে যে মুক্ত করেছে সে-ই হবে তার জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন আর 'মাওলাল মাওয়ালাত' এর ক্ষেত্রে বুদ্ধিসম্পন্ন নিকটজন হবে সেই ব্যক্তি, যে অঙ্গীকারাবদ্ধ (যারা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আমাদের দু'জনের জান ও মাল এক)।

মাসআলাঃ জ্ঞানসম্পন্ন একজন নিকটজনের উপর প্রতি বছর চার দেরহামের অধিক কিস্তি নেয়া যাবে না। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন। অপর একটি বর্ণনায় প্রতি বছরের স্থলে এসেছে তিন বছরের কথা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একজনের উপর অর্ধ দিনারের বেশী ধার্য করা যাবে না।

মাসআলাঃ নিহত ব্যক্তির জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন না থাকলে দিয়ত জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, হত্যাকারীর জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন না থাকলে দিয়ত পরিশোধ করতে হবে বায়তুল মাল থেকে। মুফাসসিরগণ এই মাসআলাটির সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হননি।

দিয়তের পরিমাণঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাতুল্য হত্যার ক্ষেত্রে পরিশোধ্য দিয়ত হবে কঠিন। আর কোনো কারণে কিসাস রহিত হয়ে গেলে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রেও কঠিন দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। রসুল পাক স. বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাতুল্য হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়ত কঠিন। আর কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) প্রযোজ্য হবে কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে। ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার ক্ষেত্রে নয়। ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার ব্যাপারটা এ রকম—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শয়তানের খপ্পরে পড়ে গেলো এবং হয়তো তখন বিক্ষিপ্তভাবে কারো প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলো—এ ধরনের অপরিকল্পিত হত্যা, যাতে কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। আহমদ।

ভুলবশতঃ হত্যার দিয়ত হবে লঘু। কঠিন দিয়ত পরিশোধ করতে হবে উটের মাধ্যমে (সোনা রূপার মাধ্যমে নয়)। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, কঠিন দিয়তের পরিমাণ হচ্ছে একশত উট—যা পূরণ করতে হবে

এভাবে—বিনতে মাখাজ পঁচিশটি, বিনতে লাবুন পঁচিশটি, হিক্কা পঁচিশটি এবং জায্আ পঁচিশটি (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এ রকম উটনীকে বলে বিনতে মাখাজ। বিনতে লাবুন বলে ওই উটনীকে যা দ্বিতীয় বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পড়েছে। চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উটনীর ও উটের নাম হিক্কা। আর জায্আ হলো ওই উট বা উটনী যা পঞ্চম বছরে পড়েছে)।

ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ীর মতে একশ' উট পূরণ করতে হবে তিরিশটি জায্আ, তিরিশটি হিক্কা এবং চল্লিশটি ছানিয়া দ্বারা (গর্ভবতী উটনীকে বলে ছানিয়া)।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. বলেন, শুনে নাও। কতলে শিবহে আমাদ (চাবুক অথবা লাঠির মাধ্যমে হত্যা) এর দিয়ত হবে একশত উট। তার মধ্যে চল্লিশটিকে হতে হবে গর্ভবতী। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে তিরমিজি এবং ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সোপর্দ করতে হবে। তারা যদি ইচ্ছা করে তবে তারা তাকে হত্যা করবে অথবা হত্যা না করে দিয়ত গ্রহণ করবে। দিয়তের একশত উটের মধ্যে থাকতে হবে তিরিশটি হিক্কা, তিরিশটি জায্আ এবং অবশিষ্ট চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী, যার নাম ছানিয়া। হজরত উবাদা বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেন, শুনে রাখো, কঠিন দিয়তের পরিমাণ হচ্ছে একশত উট, যার মধ্যে চল্লিশটিকে হতে হবে গর্ভবতী। দারা কুতনী ও বায়হাকী। হাদিসটি ধারাবাহিকতাছিন্ন (মুনকাতে)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর এরশাদ হচ্ছে, মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার দিয়ত একশত উট। কিন্তু উটনীর পেটে বাচ্চা আছে কিনা সে সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা যায় না। আবার এমনও হতে পারে যে, যে কোনো সময় উটনী তার বাচ্চা প্রসব করতে পারে। এভাবে প্রসব যদি হয়েই যায় তবে উটের সংখ্যা একশত ছাড়িয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফার এ কথাটি অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ, যা শরিয়ত কর্তৃক গৃহীত হওয়ার উপায় নেই। বরং গর্ভবতী উটনী সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এখানে গর্ভবতী উটনী অর্থ ওই উটনী যা গর্ভ ধারণের উপযোগী। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার মতে লঘু দিয়ত হবে এ রকম—বিশটি জায্আ, বিশটি হিক্কা, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি বিনতে মাখাজ এবং বিশটি ইবনে মাখাজ। ইমাম আহমদের মতও এ রকম। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের মত হচ্ছে—ইবনে মাখাজের স্থলে হবে ইবনে লাবুন। ইমাম আবু হানিফার দলিল ওই হাদিসটি যা হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, বায্যার, দারা কুতনী, বায়হাকী এবং আসহাবে সুনান। হাদিসটি এই—রসুল পাক স. ভুলক্রমে হত্যার দিয়ত নির্ধারণ করেছেন এ

রকম—বিনতে মাখাজ বিশটি, বিনতে লাবুন বিশটি, হিক্কা বিশটি, জায্‌আ বিশটি এবং ইবনে মাখাজ বিশটি। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ এ রকম—হাজ্জাজ বিন আরতাদ—জায়েদ বিন জোবায়ের—হাশফ বিন মালেক—আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ। ইমাম শাফেয়ী দলিল পেশ করেছেন দারা কুতনী বর্ণিত ওই হাদিস থেকে, যার বর্ণনাকারী আবু উবায়দা— তিনি বলেছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন, ভুলক্রমে হত্যার দিয়ত একশ' উট, যার পাঁচটি অংশ এ রকম—বিশটি করে হিক্কা, জায্‌আ, বিনতে মাখাজ, বিনতে লাবুন এবং ইবনে লাবুন। দারা কুতনী হাদিসটিকে উত্তমসনদবিশিষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন, এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। আরো বলেছেন, পূর্বে বর্ণিত হাদিসের হাশফ বিন মালেক বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তাই তার বর্ণনা আলেমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তার বর্ণনা হজরত আবু উবায়দার বর্ণনার বিরুদ্ধে। হজরত আবু উবায়দার বর্ণনাই সঠিক। যেহেতু তিনি তাঁর পিতার উক্তির অবিকল উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর সূত্রপ্রবাহ নেমে এসেছে বিশুদ্ধভাবে। আর এই মাসআলায় হজরত আবু উবায়দাই হাশফ বিন মালেকের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল। রসুলপাক স. এর সিদ্ধান্ত জানার পর কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বলতে পারে না। অথচ হাশফ তাই করেছে। তাছাড়া হাশফ তেমন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীও নয়। পরবর্তী বর্ণনাকারী জায়েদ বিন জোবায়ের—তার পরের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন আরতাদ—এই হাজ্জাজ বিন আরতাদ ছিলো মুদাল্লাস (মুদাল্লাস শব্দটি তাদলিস কৃদন্ত পদ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালের দোষত্রুটি গোপন করা। আবার কেউ বলেছেন, শব্দটির উৎস 'দালসুন' —যার অর্থ ভীষণ অন্ধকার। মোটকথা, বর্ণনাকারী এখানে তার ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। এই অস্পষ্টতার কারণে বর্ণনাটিকে বলা হয়েছে মুদাল্লাস)। হাজ্জাজের বর্ণনা থেকে পরবর্তীরা বিভিন্নভাবে বর্ণনাটিতে বিকৃতি ঘটিয়েছেন।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, দারা কুতনী বলেছেন, হজরত আবু উবায়দা তাঁর পিতার নিকট থেকে কোনো হাদিস শোনেননি। অথচ বর্ণনা করেছেন পিতার সূত্রে; সুতরাং বর্ণনাটি দ্বন্দ্বদীর্ণ। হাদিস বিশারদগণের শর্ত এই যে, প্রত্যেক বর্ণনাকারীর নিকট থেকে কমপক্ষে দু'জনকে হাদিস শুনতে হবে এবং বলতে হবে। নতুবা তা প্রামাণ্য বলে গৃহীত হবে না। কিন্তু হজরত আবু উবায়দার বর্ণনার ক্ষেত্রে এই শর্তটি পালিত হয়নি।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এখানে বায়হাকী দারা কুতনীকে আক্রমণ করে বলেছেন, দারা কুতনী তাঁর ধারণার শিকার। হাফেজ ইবনে হাজার আরো লিখেছেন, আমি সুফিয়ান সওরীর 'জামিয়া' গ্রন্থে হাদিসটিকে তিনভাবে বর্ণিত হতে দেখেছি। ১. মানসুর—ইব্রাহিম— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ। ২. আবু ইসহাক—আলকামা— হজরত ইবনে মাসউদ। ৩. আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ বিন হারুন—সুলায়মান তামিমি— আবু মুজলাজ—হজরত আবদুল্লাহ্

ইবনে মাসউদ (ধারাবাহিক সূত্রে)। বর্ণিত তিনটি প্রশাখাতেই ইবনে মাখাজের উল্লেখ রয়েছে।

মাসআলাঃ নগদ পরিশোধ্য দিয়তের পরিমাণ হাজার দিনার তোলাই অথবা বারো হাজার দিরহাম। ইমাম আহমদের মতে দশ হাজার দিরহাম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আসল দিয়ত হলো উট। উট দিতে না পারলে দিতে হবে যে কোনো একটি— ১. হাজার দিনার তোলাই অথবা বারো হাজার দিরহাম। ২. উটের মূল্যমান যা হয়— মুদ্রা কিংবা হাজার দিনার অথবা বারো হাজার দিরহাম।

হাজার দিনার তোলাই এর প্রমাণ রয়েছে আবু বকর বিন মোহাম্মদ বিন আমর বিন হাজমের হাদিসে। ওই হাদিসটি আমরা বর্ণনা করবো সামনের দিকে গিয়ে। রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা দিয়ত পরিশোধের প্রমাণ রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায়। তিনি বলেছেন, রসুল স. দিয়ত নির্ধারণ করেছেন বারো হাজার রৌপ্য মুদ্রা। হজরত ইকরামার মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আসহাবে সুনান (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)। কিন্তু ইকরামার নিচের দিকের এবং আমর বিন দিনারের উপর দিকের বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। আমর বিন দিনারের বর্ণনা থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন মোসলেমা তায়েফী। আবার হজরত ইকরামা থেকে সুফিয়ান বিন উয়াইনা বর্ণনা করেছেন মুরসাল পদ্ধতিতে। আবদুর রাজ্জাক এ রকম বলেছেন। ইবনে আবী হাতেম তাঁর পিতার বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন যে, একে মুরসাল বলাই অধিকতর বিশুদ্ধ। ইবনে হাজম লিখেছেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনার প্রখ্যাত ছাত্রগণ একে মুরসাল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, রসুল স. এর যুগে দিরহামের ওজন ছিলো ছয় রতি। হজরত ওমরের জামানায় হয়ে গিয়েছিলো সাত রতি। তাই ছয় রতি হিসেবে বারো হাজার এবং সাত রতি হিসেবে প্রায় দশ হাজার। ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় বক্তব্যটি এই কারণে হয়েছে যে, আমর বিন শোয়াইবের হাদিসে এসেছে, বস্তিবাসীদের উপর রসুল স. দিয়তের মুদ্রামূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। উটের মূল্য মহার্ঘ হলে তিনি স. মুদ্রামূল্য বাড়িয়ে দিতেন এবং কম হলে দিতেন কমিয়ে। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও ইবনে জুরাইজের বর্ণনা থেকে এবং আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন রাশেদ সূত্রে সুলায়মান বিন মুসার মাধ্যমে আমর বিন শোয়াইব থেকে।

মাসআলাঃ জমহুরের নিকট উপরোল্লিখিত তিনটি নিয়মেই দিয়ত পরিশোধ করা যাবে (উট, দিনার, দিরহাম)। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ এবং ইমাম আহমদ বলেন, দিতে হবে দুইশত গাভী অথবা দুই হাজার ছাগল কিংবা দুইশত জোড়া কাপড়। কেননা, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে আতা বর্ণনা করেছেন—রসুলুল্লাহ্ স. উটওয়ালাদের জন্য একশত উট, গাভীওয়ালাদের

জন্য দুইশত গাভী, বকরীওয়ালাদের জন্য দুই হাজার বকরী এবং বস্ত্রব্যবসায়ীদের জন্য দুইশত জোড়া কাপড় দিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবু দাউদ।

স্বসূত্রে ইবনে জাওজী এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। হাদিসটি নিঃসন্দিগ্ধ। আবু দাউদ তাঁর 'মারাসিল' গ্রন্থে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন আতা থেকে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌র নাম সেখানে নেই।

মাসআলাঃ জখম সম্পর্কে আবু বকর বিন মোহাম্মদ বিন আমর বিন হিশাম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে-রসুলুল্লাহ্ স. ইয়ামানবাসীদের নিকট প্রেরিত ফরমানে নির্দেশ করেছেন, যদি কেউ কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তবে তাকে বন্দী ক'রে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশের নিকট কিসাসের জন্য পাঠিয়ে দিবে। ওয়ারিশেরা দিয়ত নিতে সম্মত হলে দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। পুরুষকে রমণীর বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। হত্যার দিয়ত একশত উট। স্বর্ণব্যবসায়ীদের জন্য এক হাজার দিনার (তোলাই)। নাক যদি সম্পূর্ণ কেটে ফেলে তবে পরিশোধ করতে হবে পূর্ণ দিয়ত (এক শত উট) দাঁত উঠিয়ে ফেললে দিয়ত দিতে হবে। ঠোঁট কেটে ফেললেও দিয়ত দিতে হবে। দিয়ত দিতে হবে অণ্ডকোষ কেটে ফেললে বা অকেজো করে দিলে, পুরুষাঙ্গ কেটে ফেললে অথবা অকেজো করে ফেললে, পিঠ ভেঙে দিলে, কোমর ভেঙে ফেললে, চোখ নষ্ট করলে এবং দুই হাত কেটে ফেললেও। দিয়তের পরিমাণ একশত উট। এক হাত কেটে ফেললে পঞ্চাশটি। দুই পা কেটে ফেললে একশ'টি এবং এক পা কেটে ফেললে পঞ্চাশটি। মস্তকে আঘাত করলে পূর্ণ দিয়তের এক তৃতীয়াংশ। উদরাভ্যন্তর পর্যন্ত জখম পৌঁছে গেলেও তাই। অস্থি স্থানচ্যুত করলে পনেরোটি, হাত বা পায়ের কোনো আঙ্গুল কেটে ফেললে দশটি এবং দাঁত ভেঙে ফেললে পাঁচটি উট দিতে হবে। নাসাঈ, দারেমী। মালেকের বর্ণনায় এর সঙ্গে আরো বলা হয়েছে, চোখ ফুটো করে ফেললে পঞ্চাশ উট এবং হাড়ের জোড়া খুলে ফেললে পাঁচ উট। হাদিসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। আবু দাউদ তাঁর মারাসিলের মধ্যে বলেছেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ নয়। হাকেম ইবনে হাব্বান এবং বায়হাকী বলেছেন, বিশুদ্ধ। আহমদ বলেছেন, আমি ধারণা করি হাদিসটি বিশুদ্ধ। ইমামগণের একটি দল এই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেননি। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ স. এর লিখিত ফরমান হওয়ায় এটি বিশুদ্ধ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রসুল স. এর ওই চিঠিটি ছিলো প্রসিদ্ধ, তাই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলে মান্য করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ফরমানটি যে রসুল স. এর সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আলেমগণ হাদিসটিকে গ্রহণ করেননি। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, ফরমানটি সুবিখ্যাত, আলেমগণ তা ভালো করেই জানেন। বহুবিদিত হওয়ার কারণে এখানে সনদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে গৌণ। এ রকম সর্বজনবিদিত হাদিস সনদ ব্যতিরেকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। হাকেম লিখেছেন, ওমর বিন আবদুল আজিজ এবং ইমামগণের যুগে জুহুরী হাদিসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেছেন। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে স্বসূত্রে আবদুর

রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আঘাত যদি উদরের অভ্যন্তরে পৌছে যায়, তবে হজরত আবু বকরের সিদ্ধান্ত মতে দুই তৃতীয়াংশ দিয়ত দিতে হবে। ইবনে আবী শায়বা থেকেও এ রকম বর্ণিত হয়েছে। দারা কুতনী মওকুফ হিসেবে হজরত জায়েদ বিন সাবেতের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম—প্রহারের ফলে অস্থি স্থানচ্যুত হলে দশটি উট দিতে হবে। আবদুর রাজ্জাক এবং বায়হাকী। বায়হাকীর নিকট হাদিসটি মারফু। ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী এবং ইবনে আবু ইসহাক সূত্রে মাকহুল বর্ণনা করেছেন—রসুল স. অস্থি স্থানচ্যুত করার দিয়ত নির্ধারণ করেছেন পাঁচটি উট। এর চেয়ে কম আঘাত হলে পরিশোধ্য দিয়তের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি স. কিছু বলেননি। হাসানের বর্ণনা থেকে আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন, অস্থি স্থানচ্যুতির চেয়ে কম আঘাতের দিয়ত সম্পর্কে রসুল স. কোনো সিদ্ধান্ত দান করেননি। আবু জেনাদ এবং ইসহাক বিন আবী তালহা থেকে মুরসাল রূপে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, জুহুরী এবং রবীয়া। রসুল স. হাত ও পায়ের আঙ্গুলকে সমান্তরাল মূল্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, দাঁত ভাঙা এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুল কেটে ফেলার অপরাধ সমান। হাদিসটি পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও বায্যার। ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্তরূপে। ইবনে হাব্বানও এ রকম করেছেন। বোখারীতে বলা হয়েছে, দাঁত ও আঙ্গুল এক বরাবর।

আমর বিন শোয়ায়েবের বর্ণনা থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা বলেছেন, আঙ্গুল ও দাঁত এক বরাবর। প্রতি আঙ্গুলের জন্য দশ উট এবং প্রতি দাঁতের জন্য পাঁচ উট। হাজ্জাজের যুগের এক বৃদ্ধ ব্যক্তির বর্ণনাসূত্রে ইবনে আবী শায়বা বলেছেন, হজরত ওমরের যুগে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির মাথায় পাথর মেরেছিলো। সেই পাথরের আঘাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো তার শ্রুতি, স্মৃতি, বাকক্ষমতা এবং পুরুষত্ব। হজরত ওমর তার ক্ষেত্রে চারগুণ দিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

মাসআলাঃ মহিলাকে হত্যা অথবা জখম করলে দিয়ত হবে অর্ধেক। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা কম। শেষে তিনি অর্ধেক দিয়তের কথাটি মেনে নিয়েছিলেন। মোহাম্মদ বিন হাসানের বর্ণনা থেকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা, হাম্মাদ ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, হজরত আলী বলেন, নারীহত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত হবে অর্ধেক। জিয়াদ প্রমুখের মাধ্যমে শা'বীর উক্তি হিসেবে সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, হজরত আলী বলেন, রমণীদের জখমের দিয়ত পুরুষদের জখমের দিয়তের অর্ধেক— দিয়ত যে পরিমাণই হোক না কেনো।

বাগবী বলেছেন, হজরত জায়েদ বিন সাবেতের বক্তব্য এই যে, পুরুষ ও রমণীর আঘাতের দিয়ত এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সমান। এর বেশী হলে মহিলার জন্য দিয়ত হবে পুরুষের অর্ধেক। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, দাঁত এবং

হাড় ভেঙে ফেললে পুরুষ ও রমণীর দিয়ত হবে একই রকম। কিন্তু হজরত আলী এ ক্ষেত্রেও মহিলার দিয়ত পুরুষের অর্ধেকের কম নির্ধারণ করেছেন।

ইব্রাহিম থেকে মুগীরার মাধ্যমে হিশামের বর্ণনাসূত্রে সাঈদ বিন মানসুর তাঁর পিতা থেকে বলেছেন, হজরত ওমর বলেন, হাত ও পায়ের আঙ্গুল এক বরাবর। দাঁত ভাঙার ক্ষেত্রে পুরুষ ও রমণীর দিয়ত এক সমান। হাড় ভেঙে গেলেও তাই। এগুলো ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে নারীর দিয়ত পুরুষের দিয়তের অর্ধেক। হজরত জাবের—সুফিয়ান সূত্রে বায়হাকী বলেছেন, শোরাইহ্ বলেন, আমাকে হজরত ওমর এ রকমই লিখে পাঠিয়েছিলেন।

ইসমাঈল বিন আয়াশ— জুরাইজ— আমর বিন শোয়াইব সূত্রে নাসাঈ লিখেছেন, এক তৃতীয়াংশ দিয়ত পর্যন্ত নারী পুরুষ সকলেই সমান। ইমাম মালেক অভিমত গ্রহণ করেছেন হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে মাসউদের। তিনি বলেছেন, এটাই সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমিও এটিকে সুন্নত মনে করতাম। কিন্তু সিদ্ধান্তটি যে সুন্নত সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ নই। পরে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইমাম মালেক কর্তৃক এটিকে সুন্নত বলার কারণ এই যে, সুন্নতটি ছিলো মদীনাবাসীদের—এ কথা জানার পর আমি সন্দেহমুক্ত হয়েছি। হজরত আলীর অভিমত সম্পর্কে শা'বী বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু জমহুর এটাকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা, রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা অপূর্ণ। পুণ্যার্জনের ক্ষেত্রেও তারা পুরুষ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ।

ঐকমত্যসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীর দিয়ত পুরুষের দিয়তের চেয়ে কম। অর্থাৎ অর্ধেক। জখমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এক তৃতীয়াংশ বা এর চেয়ে বেশীর সঙ্গে বিষয়টিকে কিয়াসের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

মাসআলাঃ ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, গোলাম ও বাঁদীর দিয়ত হবে তাদের মূল্যানুসারে। ইমাম আজম এবং ইমাম মোহাম্মদও এ রকম বলেন। কিন্তু তার সঙ্গে তারা যে অতিরিক্ত কথাটি বলেন সেটি হচ্ছে—যদি গোলামের মূল্য দশ হাজার দিরহাম অথবা তার চেয়ে বেশী এবং বাঁদীর মূল্য পাঁচ হাজার অথবা তার চেয়ে অধিক হয়, তবে তাদের প্রত্যেকের মূল্য থেকে দশ দিরহাম কম করে দেবে। এভাবে গোলাম জখম হলে তার দিয়ত হবে তার মূল্য অনুপাতে। আর স্বাধীন ব্যক্তি আঘাত পেলে দিতে হবে পূর্ণ দিয়ত। হজরত ওমর এবং হজরত আলীর ফরমান বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—মুক্ত ক্রীতদাসও স্বাধীন ব্যক্তির মতো। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি ও মুক্ত ক্রীতদাসের দিয়ত সমান। হাদিসটি বিপর্যস্ত সূত্রসম্পন্ন।

ইবনে শায়বা বক্তব্য পেশ করেছেন হজরত আলীর এবং বিশুদ্ধ সূত্রে শাফেয়ী জুহ্রীর এই উক্তিটি উপস্থাপন করেছেন যে, আঘাতপ্রাপ্ত গোলামের দিয়ত পরিশোধ করতে হবে তার মূল্যানুসারে— যেমন, আঘাতপ্রাপ্ত স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত পরিশোধ করতে হয় দিয়তের নিয়মানুসারে।

ইমাম আজমের বক্তব্যের দলিল এই যে, আল্লাহপাক বলেছেন, 'এবং তার উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়ত (রক্তপণ) দিতে হবে।' এই নির্দেশের মধ্যে আজাদ ও গোলাম দু'জনেই শামিল। তাই গোলাম হত্যা করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়। অতএব, ক্রীতদাসকে ভুলক্রমে হত্যা করলে কিসাসের পরিবর্তে দিয়ত পরিশোধ করা জরুরী হয়। তাই ক্রীতদাসের দিয়ত কখনো আজাদের দিয়তের সমান অথবা বেশী হয় না। কেননা, ক্রীতদাসের মানবত্ব অপূর্ণ। একদিক থেকে লক্ষ্য করলে তারা সামগ্রীতুল্য। অন্য দিক থেকে লক্ষ্য করলে তারা মানুষ। লক্ষ্যণীয় যে, স্বাধীনা রমণীর দিয়তও স্বাধীন পুরুষের চেয়ে কম। কিন্তু কেউ যদি বিশ হাজার দিনার মূল্যের কোনো ক্রীতদাসকে লুণ্ঠনের মাধ্যমে অধিকার করে বসে এবং ওই লুণ্ঠনকারীর অধিকারে থাকাবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে তার পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে, লুণ্ঠনের জরিমানা দিতে হবে মালের দ্বারা (জানের দ্বারা নয়)।

মাসআলাঃ গোলাম যদি কাউকে ভুলক্রমে হত্যা অথবা জখম করে, তবে তার মনিবের নিকট বলতে হবে— সে যেনো তার গোলামের অপরাধের বিনিময় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদেরকে জরিমানা হিসেবে দিয়ে দেয়। গোলামের অপরাধ স্খলনের দায়িত্ব তারই। কিন্তু যদি সে জরিমানা দিতে অসম্মত হয়, তবে জরিমানা আদায়ের জন্য বন্দী করতে হবে গোলামকে অথবা তার মনিবকে। শাফেয়ী বলেছেন, গোলামের জরিমানা দিতে হবে গোলামকেই। তবে তার মনিব যদি জরিমানা পরিশোধ করে, তবে তা উত্তম। গোলাম মুক্ত করার পর দিয়ত পরিশোধ করার জন্য কাকে বন্দী করতে হবে সে সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেন, গোলামকে বন্দী করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গোলামের অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর যদি মনিব সেই গোলামকে আজাদ করে দেয়, তবুও মনিবকেই বিনিময় পরিশোধ করতে হবে। আর যদি গোলামের অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বেই তাকে মুক্তি দেয়, তবে মনিবের উপর জরিমানা অপরিহার্য হবে অথবা দিতে হবে ক্রীতদাসের মূল্য। এ দুটোর মধ্যে যেটি কম সেটিই পরিশোধ করতে হবে মনিবকে।

রক্তপণ বা দিয়ত দিতে হবে নিহত ব্যক্তির পরিজনবর্গ বা উত্তরাধিকারীদেরকে। উত্তরাধিকারীরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মতো রক্তপণলব্ধ সম্পদও ব্যয় করবে। প্রথমে ব্যয় করবে তার কাফন দাফনের জন্য। তারপর পরিশোধ করবে তার ঋণ। এরপর যা থাকে, তার এক তৃতীয়াংশ থেকে পূর্ণ করবে অসিয়ত (স্মর্তব্য যে, অসিয়ত এক তৃতীয়াংশের কম হলে তাই পূর্ণ করতে হবে। এক তৃতীয়াংশের বেশী হলে উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছা করলে তাও পূর্ণ করতে পারে)। এরপর বাকি অংশ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

নিহত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে হত্যাকারীকে সদকা করে দেয়— অর্থাৎ মাফ করে দেয়, তবে হত্যাকারীকে আর রক্তপণ দিতে হবে না। তার উত্তরাধিকারীরা যদি মাফ করে দেয়, তবুও রক্তপণ দিতে হবে না। এই মাফ করে দেয়ার কথা আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে—'ইল্লা আইয়াস্‌সাদ্দাকূ (যদি না তারা সদকা

করে)।' এখানে সদকা করার অর্থ ক্ষমা করা। এ রকম শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে, এতে করে যেনো ক্ষমা করে দেয়ার উৎসাহ জাগ্রত হয় এবং ক্ষমার ফযীলত প্রকাশ পায়। কারণ, ক্ষমা এক প্রকার সদকা (দান)। কাজেই ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম। রসুল স. এরশাদ করেন, সদকার মধ্যেই সকল কল্যাণ। হজরত জাবের থেকে বোখারী এবং হজরত হোজায়ফা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন— যে ব্যক্তি সদকাকে মালের ময়লা মনে করে এবং সদকা গ্রহণ করতে রাজী হয় না, সেই ব্যক্তিকে দান করার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

নিহত ব্যক্তি যদি শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং ইমানদার হয় তবে একটি ইমানদার ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতে হবে, রক্তপণ দিতে হবে না। এখানে শত্রুপক্ষের অর্থ কাফের শাসিত রাজ্যের মুসলমান অধিবাসী । যেমন, কোনো মুসলমান যদি মুসলমান শাসিত রাজ্যে হিজরত না করে কাফেরদের রাজ্যে থেকে যায়, অথবা হিজরত করলেও পুনরায় কাফেরের রাজ্যে ফিরে যায় এবং ইসলাম ত্যাগ না করে সেখানেই বসবাস করতে থাকে—এ রকম মুসলমানকে যদি কোনো মুসলমান ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেলে তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কারণ, দিয়তের হুকুম মুসলমান শাসিত রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য। মুসলিম রাষ্ট্রে দিয়তকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এজন্যই যে, নিহত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান করা তাদের অপরিহার্য দায়িত্বভূত, যা তারা প্রতিপালন করেনি। কিন্তু শত্রুরাষ্ট্রে (দারুল হরবে) এ রকম নিরাপত্তা লাভের তো প্রশ্নই ওঠে না।

হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহিল বাজালী থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন— রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যারা মুশরিকদের সাথে (রাজ্যে) বসবাস করে, আমরা তাদের দায় থেকে মুক্ত।

নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় এবং মুসলমান শাসিত অঞ্চলে বসবাস করে অথচ তার বংশধরেরা যদি কাফের হয় এবং কাফের রাজ্যে বসবাস করে—যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে (হজরত হারেস বিন জায়েদের অবস্থা ছিলো এ রকম) — এমতাবস্থায় উক্ত মুসলমানের কাফের বংশধরকে হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মুক্ত করে দিতে হবে একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে। দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কেননা, ওই কাফের সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি ছিলো না। আরেকটি কারণ এই যে, মুসলমান ও অমুসলমান পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসধারী বলে এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের বিধানও বলবৎ করা যাবে না।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, তিবরানী এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত ও হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, কোনো কোনো লোক মুসলমান হয়ে যেতো। তারপর ফিরে গিয়ে বসবাস করতো নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে। ওই সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হলে

অজ্ঞতাবশতঃ তাদের কেউ কেউ নিহত হতো। এ রকম হত্যার জন্য একজন মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দিতে হতো— এটাই ছিলো তাদের জন্য কাফফারা। আর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের কেউ নিহত হলে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে পরিশোধ করতে হতো দিয়ত এবং মুক্ত করে দিতে হতো একজন মুসলমান গোলাম।

নিহত ব্যক্তি যদি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের হয় তবে দিয়ত ওয়াজিব। এক্ষেত্রে দিয়ত প্রদান করার দু'টি প্রকার রয়েছে। একটি হচ্ছে—নিহত ব্যক্তি জিম্মি (মুসলিমশাসিত দেশে বসবাসকারী কাফের) অথবা এমন কাফের যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার (সন্ধি) করা হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে—নিহত ব্যক্তি মুসলমান এবং তার উত্তরাধিকারীরাও মুসলমান। এই দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র দিয়ত দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই দু'টি প্রকারের আওতায় না পড়লে দিয়ত জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে।

মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, এই আয়াতটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জিম্মির দিয়ত মুসলমানদের দিয়তের মতোই। আমি বলি, তার প্রমাণ এ আয়াতে নেই। এখানে বলা হয়েছে কেবল দিয়তের কথা। আর বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে এসেছে দিয়তের বিভিন্ন রূপ। পুরুষ, নারী এবং আজাদ ও গোলামের দিয়ত সম্পর্কে যে সকল মতবিরোধ রয়েছে, সেগুলোকে আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ রকম হওয়া সম্ভব যে, মুসলমান ও কাফেরের দিয়তের প্রসঙ্গটিও মতানৈক্যমণ্ডিত।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার অভিমতানুসারে মুসলমান এবং কাফেরের দিয়ত একই রকম। ইমাম মালেকের মতে সকল প্রকার কাফেরের দিয়ত মুসলমানের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় হাজার দিরহাম। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত চার হাজার দিরহাম। আর অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের দিয়ত আটশত দিরহাম। ইমাম আহমদ বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফের— উভয়ের বেলায় দিয়ত দিতে হবে সমপরিমাণ। আর ভুলক্রমে সংঘটিত হত্যার ক্ষেত্রে অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের দিয়ত আটশত দিরহাম। ইহুদী ও নাসারাদের ক্ষেত্রে তাঁর দু'টি অভিমতের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি ইমাম মালেকের, অন্যটি ইমাম শাফেয়ীর অনুরূপ। ইমাম মালেক ওই হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যার বর্ণনাকারী আমর বিন শোয়াইব এবং তাঁর পিতা। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে দু'ভাবে। একটিতে রয়েছে—রসুল স. বলেন, কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে— রসুল স. বলেন, ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক।

ইমাম শাফেয়ী ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত সম্পর্কে বলেছেন, এই হাদিসটির উপর ভিত্তি করে আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর যুগে দিয়তের পরিমাণ ছিলো একশত দিনার অথবা আট হাজার দিরহাম। আর ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত ছিলো এর অর্ধেক। হজরত ওমরের খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মই বলবৎ ছিলো। তিনি খলিফা

হওয়ার পর এক ভাষণে বললেন, উট মহার্ঘ হয়েছে। এরপর তিনি নগদ দিয়তের পরিমাণ নির্ধারণ করলেন এক হাজার দিনার তোলাই অথবা বারো হাজার দিরহাম। গো-পালকদের জন্য নির্ধারণ করলেন দুইশত গাভী এবং বকরীওয়ালাদের জন্য দুই হাজার বকরী। আর বস্ত্রব্যবসায়ীদের জন্য দুইশত জোড়া কাপড়। কিন্তু তিনি জিম্মিদের দিয়ত বৃদ্ধি করেননি। আবু দাউদ। ইমাম শাফেয়ী ফুজাইল বিন আয়াজের নিয়মে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—হজরত ওমর ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত চার হাজার দিরহাম এবং অগ্নিপূজকদের দিয়ত আটশত দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। স্বসূত্রে দারাকুতনীও সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে এ রকম বলেছেন।

ইমাম শাফেয়ীর নিয়মে বায়হাকী যে বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা বুঝা যায় যে, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেছেন, সন্ধিচুক্তির দিয়তের কথা। হজরত ওসমান সন্ধিবদ্ধদের জন্য দিয়ত নির্ধারণ করেছেন চার হাজার দিরহাম। বায়হাকী এবং দারা কুতনী হজরত ওমরের এই সিদ্ধান্তটি উদ্ধৃত করেছেন যে, অগ্নিপূজারিণীর দিয়ত চারশত দিরহাম। হজরত উকবা বিন আমের থেকে ইবনে হাজম লিখেছেন—রসুল স. বলেন, অগ্নিপূজকদের দিয়ত আটশত দিরহাম। শিথিল সূত্রের এই হাদিসটির বর্ণনাকারী তাহাবী, ইবনে আদী এবং বায়হাকী। বর্ণনাকারী ইবনে লাহবিয়ার কারণেই হাদিসটি শিথিল পদবাচ্য হয়েছে। হজরত উকবা বিন আমের বলেছেন, হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় এক ব্যক্তি একটি শিকারী কুকুরকে হত্যা করেছিলো, যার মূল্য ছিলো আটশত দিরহাম। নজীরবিহীন এই ঘটনায় হজরত ওসমান আটশত দিরহামই পরিশোধ করতে হত্যাকারীকে বাধ্য করেছিলেন। এভাবে অগ্নিপূজকের মূল্য হয়ে গিয়েছে কুকুরের মূল্যের সমান।

জুহুরীর বর্ণনা থেকে বায়হাকী লিখেছেন— হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদও অগ্নিপূজকের দিয়ত আটশত দিরহাম বলেছেন। হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, জিম্মির দিয়ত মুসলমানের দিয়তের সমান। 'আওসাত' পুস্তকে এই হাদিসটি বিবৃত করেছেন তিবরানী। হেদায়ার বর্ণনাটি এ রকম—সন্ধিবদ্ধদের প্রত্যেকের দিয়ত এক হাজার দিনার। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন—হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের সিদ্ধান্তও এ রকম। আমি বলি, তিবরানী বর্ণিত হাদিস দারা কুতনীও উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছেন যে, (হজরত ইবনে ওমরের ছাত্র) নাফে থেকে আবু বকর কোরায়শী নাহদি এবং আবদুল্লাহ্ বিন মালেক ব্যতীত অন্য কেউ হাদিস বর্ণনা করেননি। আর নাহদি ছিলো পরিত্যক্ত। দারা কুতনী বলেছেন, বর্ণনাটি বাতিল এবং ভিত্তিহীন। ইবনে হাব্বানও এ রকম বলেছেন।

হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে দারা কুতনী বলেছেন, রসুল স. সন্ধিবদ্ধদের দিয়ত নির্ধারণ করেছিলেন মুসলমানদের দিয়তের সমপরিমাণ। দারা কুতনী বলেছেন, এই সনদের ওসমান বিন আবদুর রহমান ওক্কাসী পরিত্যক্ত। হজরত

ইবনে আব্বাস থেকে দারা কুতনী লিখেছেন—রসুল স. বনী আমের গোত্রের দুই ব্যক্তির দিয়ত করে দিয়েছিলেন মুসলমানদের দিয়তের সমপরিমাণ। এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী আবু বকর আইয়াজ বলেছেন, ওই ব্যক্তিদ্বয় ছিলো সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। দারা কুতনী বলেছেন, এই সনদের এক বর্ণনাকারী আবু সাঈদ বিন মারজুবান ছিলো বাচাল। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। কালাস বলেছেন, পরিত্যক্ত। এবার আসা যাক হজরত ওমরের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে। আবদুর রাজ্জাক — রেবা—ওবায়দুল্লাহ্—হামিদ—হজরত আনাস থেকে এসেছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক ব্যক্তির দ্বারা জনৈক ইহুদী নিহত হয়েছিলো। হজরত ওমর তার দিয়ত নির্ধারণ করেছিলেন বারো হাজার দিরহাম। এই সূত্রপরম্পরার বর্ণনাকারী রেবা জঈফ।

আবু জাফর বিন আবদুল্লাহ্ বিন হাকিমের বর্ণনাসূত্রে তাহাবী ও হাকেম লিখেছেন, রেফায়া বিন শামুয়েল ইহুদী নিহত হয়েছিলো শামদেশে। হজরত ওমর তার দিয়ত নির্ধারণ করেছিলেন এক হাজার দিনার। ইমাম আবু হানিফার এই দলিলটিকে ইমাম আহমদও দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। অন্যান্যদের উপস্থাপিত ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কিত হাদিসকে এখানে ধারণা করা হয়েছে ভুলক্রমে হত্যার দলিল হিসেবে।

'এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়'—এ কথার অর্থ ঋণ পরিশোধের পর হত্যাকারীর নিকট যদি ক্রীতদাস ক্রয় করার মতো অর্থ থাকে তবে সে একটি ক্রীতদাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেবে।

'এবং যে সঙ্গতিহীন সে একটানা দুই মাস রোজা রাখবে'— এ কথার অর্থ যার ক্রীতদাস ক্রয়ের ক্ষমতা নেই তার জন্য ওয়াজিব হবে একাধারে দুই মাস রোজা রাখা। কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি তার এই রোজা দুই মাসের চেয়ে একদিন কম হয় অথবা ভুলে রোজার নিয়ত না করে কিংবা অন্য কোনো রোজার নিয়ত করে নেয়, তবে তাকে আবার নতুন করে দুই মাস লাগাতার রোজা রাখতে হবে। এটা ঐকমত্য। মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের কারণে যদি রোজা রাখার বিরাম দিতে হয়, তবে শুরু থেকে আবার তাকে রোজা রাখতে হবে না। এটাও ঐকমত্য। আর যদি অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে রোজা ভঙ্গ হয়, তবে জমহুরের মতে শুরু থেকে রোজা রাখতে হবে। কিন্তু এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, প্রথম থেকে আবার রোজা রাখা জরুরী নয়। ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে মুজাহিদের অভিমতও এ রকম বলা হয়েছে। রোজা রাখতে অসমর্থ হলে অন্য কাউকে আহার করানো যথেষ্ট নয়। ইমাম আজম এবং ইমাম মালেক এ রকম বলেছেন। বিশুদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এ রকম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর অন্য সূত্রে বর্ণিত অভিমত এবং ইমাম আহমদের সিদ্ধান্ত এই যে, জেহারের মতো এক্ষেত্রেও অন্য কাউকে আহার করালেই যথেষ্ট হবে (স্ত্রীর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করাকে বলে জেহার)। মুজাহিদের অভিমতও এ রকম—বলেছেন ইবনে আবী হাতেম। আমরা বলি, অকারণে

বিষয়টি জেহারের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত নয়। কারণ, আয়াতে বর্ণিত হুকুমটি ওয়াজিব। আর নসের বিপরীতে সমষ্টিভূত কারণ ছাড়া কিয়াস গ্রহণীয় নয়।

'তওবার জন্য ইহা আল্লাহ্র ব্যবস্থা' —এখানে 'তাওবাতান' হুকুমটি দেয়া হয়েছে এ জন্য যে, তওবার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে আল্লাহ্পাকের মেহেরবানী। তাই বিধানানুসারে এমন একনিষ্ঠ রোজা পালন করতে হবে যাতে তওবা গৃহীত হয়—এটাই আল্লাহ্পাকের ব্যবস্থা।

'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'—আল্লাহ্পাক জানেন হত্যাকারীর প্রকৃত অবস্থা। আর তার জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত। বাগবী লিখেছেন, মুকাইয়েস বিন দুবাবা কান্দী এবং তার ভাই হিশাম মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন মুকাইয়েস বনী নাজ্জার গোত্রের নিকট হিশামের লাশ দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসুল স. এর শরণাপন্ন হলেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে ফেহরী নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে বনী নাজ্জারকে বলে পাঠালেন, তোমরা হিশামের হত্যাকারীকে চিনতে পারলে মুকাইয়েসের কাছে সমর্পণ করো, যেনো সে তার ভাইয়ের কিসাস গ্রহণ করতে পারে। আর হত্যাকারীকে না চিনতে পারলে হিশামের দিয়ত আদায় করো। ফেহরী রসুল স. এর নির্দেশনামা যথারীতি পৌঁছে দিলেন। বনী নাজ্জার উত্তরে জানালো, আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশানুসারে আমরা বলছি, হিশামের হত্যাকারীকে আমরা চিনি না। তবে আমরা দিয়ত আদায় করতে প্রস্তুত। এই বলে তারা মুকাইয়েসকে একশত উট দিয়ে দিলো। মুকাইয়েস এবং ফেহরী একশত উট নিয়ে ফিরে চললো। পথিমধ্যে মুকাইয়েস পড়ে গেলো শয়তানের খপ্পরে। সে মনে করলো, এভাবে দিয়ত গ্রহণ করা তো বড়ই অপমানের কথা। বরং ফেহরীকে হত্যা করে ভ্রাতৃহত্যার কিসাস গ্রহণ করাই উত্তম। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবে একশত উট তো রইলোই। এ রকম শয়তানী চিন্তা মাথায় নিয়ে সে অপ্রস্তুত ফেহরীর মাথায় সাজোরে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলো। এভাবে ফেহরীকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে সে পালিয়ে গেলো মক্কায়। হয়ে গেলো ধর্মত্যাগী। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৩

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ○

❒ কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন, এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; কারণ, সে জেনে শুনে একজন ইমানদারকে হত্যা করেছে অথবা তার হত্যাকে হালাল মনে করেছে। যেমন, মুকাইয়েস হত্যা করেছিলো ফেহরীকে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ভারী পাথর দ্বারা হত্যা করলে ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যা হবে। বাগবী বলেছেন, ফেহরীকেও পাথর দ্বারা হত্যা করা হয়েছিলো এবং সেটি ছিলো ইচ্ছাকৃত হত্যা। এই আয়াত নাজিল হয়েছে সে কারণেই। তাই ইমাম আবু হানিফার অভিমতটি ভুল (কারণ, তিনি পাথর দ্বারা হত্যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যা বলেছেন)। জুরজানীর বর্ণনানুসারে এর উত্তরে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যাও ইচ্ছাকৃত হত্যার সমতুল্য। তাই এই হত্যার ক্ষেত্রেও কাফফারা নেই। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস হয়ে থাকে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব নয়। এই আয়াতে তাই এ ব্যাপারে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ বাগবী লিখেছেন, মুকাইয়েস এমন পাপিষ্ঠ যে, রসুল স. তাকে মক্কাবিজয়ের দিনে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভূত করেননি। তাকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিলো। কেননা, সে প্রতারণার মাধ্যমে ফেহরীকে হত্যা করেছিলো এবং হয়ে গিয়েছিলো মুরতাদ।

ইবনে জারীহ্ এর মাধ্যমে ইবনে জারীর হজরত ইকরামার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—এক আনসারী মুকাইয়েসের ভাইকে হত্যা করেছিলো। রসুল স. তাকে তার ভাইয়ের দিয়ত দিয়েছিলেন। সেই দিয়ত সে গ্রহণও করেছিলো। এর কিছুদিন পর সে ভাইয়ের হত্যাকারীকে আক্রমণ করলো এবং তাকে হত্যা করে ফেললো। রসুল স. তখন ঘোষণা দিলেন, আমি তাকে আশ্রয় দেবো না। হেরেমের অভ্যন্তরেও না এবং হেরেমের বাইরেও না (যেখানে পাও, তাকে হত্যা করে ফেলো)। শেষে মক্কাবিজয়ের দিন তাকে হত্যা করা হয়েছিলো।

ইবনে জারীহ্ বলেছেন, তার সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাটি প্রকাশ্যতঃ মুরসাল। কিন্তু আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে—হজরত ইকরামা বলেন, আমি এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে (আমি তার নাম উচ্চারণ করি অথবা না করি)। এমতাবস্থায় বর্ণনাটি মুত্তাসিল। বর্ণনাটির উদ্দেশ্য এই যে, মুকাইয়েসের ভাই হিশামের হত্যাকারী কে তা জানা ছিলো না এবং হত্যাকাণ্ডটিও ইচ্ছাকৃত ছিলো না। হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিলো ভুলবশতঃ। তাই রসুল স. দিয়তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাগবীর বর্ণনা থেকে এ কথাও জানা যায় যে, হত্যাকারীকে সনাক্ত করা না গেলে তার উত্তরাধিকারীরা দিয়ত পরিশোধ করবে। এই মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে যথাস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো বিশ্বাসীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী জাহান্নামী। কেননা, সে ইমান বা বিশ্বাসকে ঘৃণা করে অথবা হত্যাকাণ্ডকে বৈধ মনে করে। তাই সে কাফের (অবিশ্বাসী)। আর অবিশ্বাসের শাস্তি হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এমনও বলা যেতে পারে যে, তার জাহান্নামে প্রবেশ করাকে বুঝাতে যে 'খুলুদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে সুদীর্ঘ সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে। শিথিল সূত্রপরম্পরায় হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল

স. এই আয়াত পাঠের পর বলেছেন, আল্লাহ্ যদি তাদেরকে শাস্তি দেন (তবে তাদের শাস্তি হবে সার্বক্ষণিক জাহান্নাম)।

'সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন'— এ প্রসঙ্গে বোখারী ও মুসলিম হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম— ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে তার তওবা কবুল হবে না। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে—হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীর হন্তারকদের জন্য কোনো তওবা নেই। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'এবং যারা আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন তাকে শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি এমন করবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে লাঞ্ছিত হতে থাকবে অনন্তকাল, কিন্তু যারা তওবা করে'—এই আয়াত উল্লেখ করে হজরত ইবনে আব্বাসকে বলা হলো, এখানে যে হত্যাকারীর তওবা কবুল করার কথা বলা হয়েছে? হজরত ইবনে আব্বাস তখন বললেন, এই আয়াতের প্রেক্ষাপটটি ছিলো মূর্খতার যুগের। তখন কতিপয় মুশরিক ছিলো হত্যা ও ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী। তারা রসুল স. সকাশে নিবেদন করলো, আপনার আহবান উত্তম। তবে আপনি কি এ কথার নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আমাদের ইতোপূর্বের পাপ কর্মগুলোর ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্ভব? তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াতটি। আর আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য মুসলমানেরা। তারা ইসলামকে মেনেছে। ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেছে। এর পরেও যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে—তবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম এবং তার তওবা কবুল হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যাবিরোধী। তিনি বলেছেন, বিশ্বাসী ব্যক্তি কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে জাহান্নামই হবে তার স্থায়ী আবাস, যদি আল্লাহ্পাক এ রকম ইচ্ছা করেন। কিন্তু আল্লাহ্পাক তো এ রকম ইচ্ছাই করেন। কিন্তু আল্লাহ্পাক অবশেষে অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁরা ইমানদার হওয়ার কারণে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবেন। সাঈদ বিন মানসুর এবং বায়হাকী সুনান গ্রন্থে লিখেছেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে নিবেদন করলেন, আমি আমার হাউজ পানি দ্বারা পূর্ণ করে আমার পশুপালের অপেক্ষা করছিলাম। ইত্যবসরে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখলাম, এক ব্যক্তি দ্রুতগতিতে তার উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে আমার হাউজের কিনারা বন্ধ করে দিয়েছে। সে কারণে পানি উপচে পড়ছে। আমি তখন বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম এবং তরবারীর আঘাতে তাকে হত্যা করলাম। এখন আমার জন্য কী হুকুম? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, তওবা করতে হবে।

সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনা বর্ণনা করেছেন, আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, যে ইমানদার অন্য ইমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার তওবার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু কেউ যখন এ রকম করেই ফেলে, তখন তাঁরা বলেন, তুমি তওবা করো। হজরত ইবনে

আব্বাস এবং আলেমদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কে আমি বলি, ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধ দ্বিগুণ। একটি হচ্ছে বান্দার রক্তের অবমাননা এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র অধিকারের অপমান। আলেমগণ যখন বলেন, যেহেতু হত্যাকারীর জন্য তওবা নেই, তখন তার উদ্দেশ্য হবে এই যে, এক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণ করা জরুরী হবে। বান্দার হক যদি নিজে অথবা তার উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা না করে, তবে তাকে সে হক অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। হয় পৃথিবীতে। না হয় আখেরাতে। নস এর মাধ্যমে এই ব্যাখ্যা এ রকম করা হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করলে যে কোনো পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন— ওই ব্যক্তির পাপ ব্যতীত যে শিরিকলিপ্তাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে অথবা কোনো বিশ্বাসীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে। হজরত আবু দারদা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। নাসাঈ এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত মুয়াবিয়া থেকে। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাদিসটির উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষেত্রে কিসাস অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং হত্যাকারী মু'মিনের তওবা কবুল হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তার হক ক্ষমা করে দিবেন এবং হত্যাকারীকে আখেরাতে শাস্তি দিবেন না।

হজরত জায়েদ বিন সাবেত বলেছেন, যখন 'তওবা করলে এবং ইমান গ্রহণ করলে এই অপরাধ ক্ষমা হয়ে যাবে'—এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা এ রকম সহজ নির্দেশ অবলোকন করে বিস্মিত হয়ে গেলাম। এ রকম অবস্থায় অতিবাহিত হলো সাতটি মাস। এরপর সুরা নিসার এই কঠোর আয়াতটি অবতীর্ণ হলো এবং রহিত হয়ে গেলো পূর্বের সহজ আয়াতটি।

আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে এ কথাই অনুমিত হয় যে, হত্যাকারীর তওবা গ্রহণীয় হবে না। এই আয়াতে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে। তবে এই শাস্তি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন হন্তারক তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে। তওবা করলে ক্ষমা তো হয়েই যায়—অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক তাঁর নিজের হক ক্ষমা করে দেন। বাকী থাকে কেবল বান্দার হক—যার জন্য হকদারকে প্রসন্ন করা অথবা শাস্তি ভোগ করা জরুরী।

এই আয়াত থেকে মোতাজিলা সম্প্রদায় এই অর্থ গ্রহণ করেছে যে, কবীরা গোনাহ্‌কারীরা চিরকাল দোজখে থাকবে। খারেজীরাও কবীরা গোনাহ্‌কারীকে কাফের বলেছে। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তা আমরা এতোক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে উম্মতের ঐকমত্য এই যে, তওবা ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হলেও যারা বিশ্বাসী তারা চিরদিন দোজখে থাকবে না। কারণ, কবীরা গোনাহ্ ইমানকে বিনষ্ট করতে পারে না। এই ঐকমত্য, কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং সর্বজনবিদিত হাদিস দ্বারা সুসাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ পুণ্যকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে।' বিশ্বাস এবং কর্ম দু'টি পৃথক বস্তু। অতএব কর্মগত ত্রুটির কারণে শাস্তি অবধারিত হলেও সঠিক বিশ্বাসের বিনিময় পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। এই আয়াতের তাফসীর আমরা যথাস্থানে করেছি। আল্লাহ্‌পাক আরো এরশাদ করেন, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের জন্য কিসাস ফরজ করা হয়েছে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে।'

মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত এবং কিসাসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুসলমানদেরকে হত্যার কারণেই। হাদিস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ব্যভিচারী অথবা অপহারক হলেও। বোখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত এই হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত আবু জর। অন্য এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি শিরিকলিপ্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে বেহেশতে যাবে। মুসলিম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। রসুল স. বলেন, আমার নিকট তোমরা এই শর্তে শপথ করো যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যকে শরীক করবে না, অপহরণ করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং পুণ্যকর্মে অবাধ্য হবে না—এ সকল অঙ্গীকার যে পূর্ণ করবে, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যে এ সকল অপরাধের যে কোনো একটিতে লিপ্ত হবে এবং তার জন্য এই পৃথিবীতে শাস্তি পাবে, ওই শাস্তি হবে তার অপরাধের ক্ষতিপূরণ। আর পৃথিবীতে যদি ওই পাপের শাস্তি না হয়, তবে বিষয়টি হবে আল্লাহ্পাকের ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মার্জনা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমরা এ সব কথার উপর রসুল স. এর পবিত্র হস্তে বায়াত গ্রহণ করলাম। বোখারী, মুসলিম। হজরত উবাদা বিন সামেত হাদিসটির বর্ণনাকারী।

দ্রষ্টব্যঃ ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীদের সম্বন্ধে বর্ণিত হাদিসসমূহ হচ্ছে— ১. হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন—রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রক্তপাতের মীমাংসা করা হবে। বোখারী, মুসলিম। ২. হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমার একক স্রষ্টা। ওই ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলো, তারপর কোনটি? তিনি স. বললেন, তোমার সন্তান তোমার অন্নে অংশগ্রহণ করবে—এই আশংকায় তাকে যদি তুমি হত্যা করো। বোখারী, মুসলিম। ৩. হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন—নবীপাক স. বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে দূরে থাকবে। তিনি স. অন্যায়ভাবে হত্যা করাকেও ওই সাতটি বিধ্বংসী বস্তুর অন্তর্গত করেছেন। বোখারী, মুসলিম। ৪. মারফু পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, মু'মিন যখন হত্যা করে তখন তার মধ্যে ইমান থাকে না। বোখারী। ৫. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুলপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকট একজন মুসলমানের হত্যার তুলনায় সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত বারা বিন আজিব থেকে। ৬. হজরত বুরায়দা থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন—আল্লাহ্র নিকট বিশ্বাসীকে হত্যা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর। ৭. হজরত আবু সাঈদ এবং হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন—রসুল স. বলেন, যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী কোনো মু'মিনের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্পাক তাদের সবাইকে উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করবেন।

তিরমিজি। ৮. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেন—আমি দেখলাম রসুল স. কাবা শরীফ তাওয়াফ করছেন এবং বলছেন, হে কাবা! তুমি কতো পবিত্র। তোমার সুবাস কতো মনোমুগ্ধকর। তুমি উচ্চমর্যাদাশালী। মহাসম্মানিত! কিন্তু আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ। বিশ্বাসীর জীবন ও সম্পদ তোমাপেক্ষা অধিক সম্মানীয়। ইবনে মাজা। ৯. হজরত আবু দারদা বলেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, বিশ্বাসীরা ততোক্ষণ পর্যন্ত দোজখমুক্ত ও পুণ্যবান, যতোক্ষণ না তারা নিষিদ্ধ হত্যার অপরাধে অপরাধী হয়। হারাম হত্যার অপরাধে অপরাধীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আবু দাউদ। ১০. হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে অর্ধেক কথা বলেও সহায়তা করবে, সে আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হলে দেখা যাবে তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লেখা রয়েছে, 'আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত'। ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে জাওজী। আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া পুস্তকে এ রকম বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে। আল্লাহ্পাকই অধিক অবহিত।

বোখারী, তিরমিজি এবং হাকেম হজরত ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—বনী সুলাইম গোত্রের এক লোক তার বকরীর পাল নিয়ে কয়েকজন সাহাবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে সাহাবীগণকে সালাম করলো। তাঁরা বললেন, এ লোক আমাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সালাম করেছে (প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমান নয়)। এই ধারণা করে সাহাবীগণ তাকে হত্যা করলেন এবং তার বকরীগুলো নিয়ে রসুলপাক স. সকাশে উপস্থিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহের পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে, এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে ইহ-জীবনের সম্পদের আকাংখায় তাহাকে বলিও না, 'তুমি বিশ্বাসী নহ,' কারণ আল্লাহের নিকট অনায়াস লভ্য সম্পদ প্রচুর রহিয়াছে। তোমরা তো পূর্বে এইরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করিয়া লইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

এখানে বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধ গমনকালে পরীক্ষা করে নিতে হবে কে শত্রু, কে বন্ধু। এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

যে নিহত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি ছিলেন মুসলমান। হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন বাগবী ও কালাবী। ওই নিহত ব্যক্তির নাম মুরদাস বিন নাহিক। তিনি ছিলেন ফেদাকের অধিবাসী। তিনি মুসলমান ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো অমুসলমান। মুসলিম বাহিনীকে আসতে দেখে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা পালিয়ে গেলো। তিনি মুসলমান ছিলেন, তাই পালালেন না। হঠাৎ তাঁর ভয় হলো অগ্রসরমান বাহিনী কি রসুলপাক স. এর, না অন্য কারো—এ কথা ভেবে তিনি তাঁর বকরীগুলোকে পাহাড়ের আড়ালে একটি নিরাপদ স্থানে হাঁকিয়ে দিলেন। নিজেও উঠে পড়লেন এক পাহাড়ে। সেনাবাহিনী তকবীর উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে এলো। তাদের তকবীর স্পষ্টরূপে কর্নগোচর হতেই তিনি বুঝলেন, এই বাহিনী রসুলপাক স. এর সাহাবীগণের। তিনি তখন কলেমা শরীফ পড়তে পড়তে পাহাড় থেকে নেমে এলেন এবং সাহাবীবাহিনীকে সালাম বললেন। কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস না করে তরবারীর আঘাতে তাঁকে হত্যা করলেন হজরত উসামা বিন জায়েদ। সেনাবাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে রসুলপাক স. সকাশে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তিনি স. ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন আগেই। নিতান্ত দুঃখিত হয়ে তিনি বললেন, তোমরা তাকে হত্যা করেছো সম্পদের লোভে। তারপর তিনি পাঠ করলেন এই আয়াত। হজরত উসামা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দোয়া করুন। রসুল স. পরপর তিনবার বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'—এর কী হবে (সে তো এই কলেমা পাঠ করেছিলো তা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করেছো। এখন আমি কিভাবে দোয়া করতে পারি) হজরত উসামা বলেছেন, রসুল স.এর বার বার কলেমা শরীফ উচ্চারণ শুনে আমি মনে মনে আক্ষেপ করলাম, হায়! আমি যদি আগে ইসলাম গ্রহণ না করে এখন ইসলাম গ্রহণ করতাম, তবে অতীত পাপের জন্য অভিযুক্ত হতাম না। কেননা, ইসলাম পূর্ববর্তী পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পর রসুল স. আমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দাও। কালাবীর নিয়মে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন ছা'লাবী।

হজরত আবু জুবিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত উসামা বলেছেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে অস্ত্রের ভয়ে কলেমা পড়েছিলো। রসুল স. বললেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছো? (তবে কিভাবে বুঝলে তার ভীতি অস্ত্রসঞ্জাত না হৃদয়োৎসারিত)? হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ভিন্ন সূত্রে বায্যার বলেছেন, রসুল স. যোদ্ধাদের একটি দল প্রেরণ করলেন। ওই দলে ছিলেন হজরত মেকদাদ। যোদ্ধারা একটি কাফের অধ্যুষিত জনপদে পৌছলে তারা পালিয়ে জীবন বাঁচালো। কেবল এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তাঁর নিকট

ছিলো অনেক সম্পদ। তিনি যোদ্ধাদেরকে দেখে উচ্চারণ করলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)। এ কথা শুনেও হজরত মেকদাদ তাঁকে হত্যা করলেন। যোদ্ধৃবৃন্দ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে রসুল স. হজরত মেকদাদকে বললেন, কিয়ামতের দিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সম্পর্কে তুমি কী জবাব দেবে? অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আহমদ, তিবরানী, আবদুল্লাহ্ বিন হাজার আসলামীর বর্ণনা থেকে এবং ইবনে জারীর আবু ওমরার মাধ্যমে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন—রসুলুল্লাহ্ স. এক মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করলেন আমাদেরকে। হজরত আবু কাতাদা এবং হজরত মুহলিম বিন খাসামা বিন কায়েস লাইলীও ছিলেন ওই বাহিনীতে। এক স্থানে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সালাম করলেন আমের বিন আদ্বাতে আশজায়ী। হজরত মুহলিম তাঁকে আক্রমণ করলেন এবং হত্যা করে ফেললেন। তারপর আমরা যখন রসুল স. এর নিকট ফিরে গিয়ে এই ঘটনাটি বললাম, তখন আমাদের সম্পর্কে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

ইবনে মান্দা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—হজরত জুযআ বিন হদরজাম বলেছেন, আমার ভাই খাদ্দাদ রসুল স. সকাশে উপনীত হয়ে নিবেদন করেছিলো, আমি ইমানদার। কিন্তু লোকেরা তার কথা বিশ্বাস না করে তাকে হত্যা করেছিলো। আমি সেই দুঃসংবাদ শুনে রসুল স. এর নিকট ছুটে গেলাম। তিনি স. আমাকে আমার ভাইয়ের দিয়ত দান করলেন। আমার সেই নিহত ভ্রাতাকে উপলক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

সুদ্দীর নিয়মে ইবনে জারীর, কাতাদার মাধ্যমে আবদ এবং ইবনে লেহিয়ার সূত্রে ইবনে আবী হাতেম হজরত আবু জোবায়েরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এ রকম—এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মারদাসকে লক্ষ্য করে। বর্ণনাটি ছা'লাবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসের সমর্থক।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন—রসুল স. হজরত মুহলিম বিন খাসামাকে একটি সেনাদলের সঙ্গে পাঠালেন। পথিমধ্যে তিনি সাক্ষাত পেলেন আমের বিন আদ্বাতের। আমের তাঁকে সালাম করলেন। মূর্খতার যুগে তাঁরা ছিলেন পরস্পর পরস্পরের শত্রু। তাই হজরত মুহলিম তীর নিক্ষেপ করে আমেরকে হত্যা করলেন। সংবাদটি পৌছে গেলো রসুল স. এর নিকট। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর হজরত মুহলিম রসুল স. এর নিকট মাগফেরাতের দোয়ার জন্য নিবেদন জানালেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা না করুন। হজরত মুহলিম কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুবরণ করলেন। যথারীতি দাফন করা হলো তাঁকে। কিন্তু মাটি

তার মরদেহ গ্রহণ করলো না। উগলে দিলো মাটির উপর। সাহাবীগণ রসুল স. কে ঘটনাটি জানালেন। তিনি স. বললেন, হে মৃত্তিকা! তুমি কি এমন লোককে গ্রহণ করবে না; যে তার সাথীর সঙ্গে অসদাচরণ করেছে? এই ঘটনাটির মাধ্যমে সদুপদেশ প্রদানই ছিলো আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা। অবশেষে মুহলিমের মরদেহে পাহাড়ের এক গুহায় রেখে তার উপর পাথর চাপিয়ে দেয়া হলো এবং তখনই অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

এরপর এরশাদ হয়েছে, 'কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে ইহজীবনের সম্পদের আকাংখায় তাকে এ কথা বোলো না যে, তুমি বিশ্বাসী নও।' কেননা আল্লাহ্র নিকট অনায়াস লভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে—গণিমতের সম্পদ লাভই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্য গণিমত লাভ হতে পারে না। মু'মিনের রক্ত ও সম্পদ পবিত্র। সুতরাং কেউ যদি নিজেকে ইমানদার বলে ঘোষণা করে, তবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। তাকে এ কথা বলা যাবে না যে, তুমি বিশ্বাসী নও। আর সম্পদের মূল মালিক তো আল্লাহ্ই। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে অসংখ্য গণিমত মওজুদ রেখেছেন। সম্পদ লাভ করতে চাইলে কারো ইমানের ঘোষণাকে অবিশ্বাস করতে হবে কেনো? আর তাকে হত্যাই বা করতে হবে কেনো? আখেরাতের সফলতাই বিশ্বাসীদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেখানকার অগণিত ও অক্ষয় সম্পদ এবং অগণন সওয়াব তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মু'মিনের জন্যে।

এরপর এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে'—এখানে অদূর অতীতের প্রতি মনোনিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা। বলেছেন, কিছু কাল পূর্বে তোমরাও তো ছিলে বিশ্বাসবর্জিত। আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ইমান দান করেছেন। আর তোমরাও ইসলামের কলেমা পড়ে তোমাদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করেছো। তখন তো তোমাদেরকে এ কথা বলা হয়নি যে, তোমাদের ইমানের ঘোষণা কেবল মৌখিক—আন্তরিক নয়। অনুগ্রহ করার অর্থ এ রকম হতে পারে যে, হিজরতের পূর্বে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কাফের সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করতে। তখন কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমাই ছিলো তোমাদের রক্ষাকবচ। তারপর আল্লাহ্পাক দয়া করে হিজরতের সুযোগ দিয়েছেন। ফলে তোমরাও পেয়েছো পূর্ণ নিরাপত্তা। আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পর্কে কাতাদা বলেছেন, নিকট অতীতে অবিশ্বাসীদের মতো তোমরাও ছিলে পথভ্রষ্ট। অতঃপর আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার তৌফিক দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, তাদের মতো তোমরাও প্রথমে

ইমানকে গোপন করেছিলে। তারপর আল্লাহ্তায়ালা দয়া করেছেন বলে তোমরা ইসলামকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছো।

অতএব হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সতর্কতাকে অবলম্বন করো, পরীক্ষা করে দেখো হত্যার মাধ্যমে যে গণিমত তোমরা লাভ করতে চাও, তা আসলে হালাল না হারাম। এই আয়াতে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে দু'বার। প্রথমে বলা হয়েছে, পরীক্ষা না করে হত্যার ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিও না— যদি দেখো, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে ইসলামের চিহ্ন। পরের বার পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে এ জন্য যে, তাদের বাহ্যিক ইসলামের ঘোষণাকে খারাপ জেনে অনুমানকে প্রশ্রয় দিও না— যতোক্ষণ না তাদের মধ্যে দেখতে পাও অবিশ্বাসের স্পষ্ট আলামত।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা কানা বিমা তা'মালুনা খবীরা'—এ কথার অর্থ তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ্পাক সবিশেষ অবহিত। অর্থাৎ তোমাদের আমল ও আমলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের রয়েছে নিশ্চিত অবহিতি। তাই তিনি বিনিময় দান করবেন তোমাদের নিয়ত ও আমল অনুসারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এই আয়াতের মাধ্যমে যে বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা হচ্ছে— ১. কেউ যদি বাধ্য হয়ে ইমানের ঘোষণা দেয়, তবু তার ইমানের ঘোষণাকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে। ২. কোনো মুজতাহিদ সৎ উদ্দেশ্যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি ভুল করেন, তবে তিনি ক্ষমার্হ। ৩. মুজতাহিদকে অগ্রসর হতে হবে সতর্ক পরীক্ষা এবং গভীর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে। এ রকম করা তাঁর জন্য ওয়াজিব। এতদসত্ত্বেও ভুল হয়ে গেলে সৎপ্রচেষ্টার কারণে তিনি সওয়াব লাভ করবেন। ৪. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সম্পর্কে আহলে কিতাবদেরও এক রকম বিশ্বাস আছে। তারা যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ঘোষণা দেয়, তবে চট করে তাদেরকে এ কথা বলা যাবে না যে, তারা ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী এই ঘোষণা দিলো কিনা। তাদের ক্ষেত্রে দ্রুত হত্যার সিদ্ধান্ত না নিয়ে সংযত হওয়াই সমীচীন। অবিশ্বাসের স্পষ্ট আলামত না পাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করতে হবে। ৫. কোনো শহরে অথবা জনপদে ইসলামের বিশেষ চিহ্ন পরিদৃষ্ট হলে হত্যা এবং লুণ্ঠন থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব হবে। যেমন রসুল স. কোনো স্থানে প্রেরিত সেনাদলকে এই মর্মে নির্দেশ দিতেন যে, যদি সেখানে আজানের আওয়াজ শুনতে পাও, তবে আক্রমণোদ্যত হয়ো না। আজান শুনতে না পেলে আক্রমণ কোরো। বাগবী ও ইমাম শাফেয়ীর নিয়মে ইবনে ইসামের মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রসুল স. সেনাদলকে বলতেন, যদি কোথাও মসজিদ দেখতে পাও অথবা আজান শুনতে পাও, তবে সেখানকার কাউকে হত্যা কোরো না। আল্লাহ্পাকই উত্তমরূপে অবহিত।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

❐ বিশ্বাসীদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসিয়া থাকে ও যাহারা আল্লাহের পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তাহারা সমান নহে। যাহারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে, যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর, মর্যাদা দিয়াছেন; আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর যাহারা জিহাদ করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।

সাহাবী ইবনে উম্মে মকতুম ছিলেন দৃষ্টিহীন। একবার তিনি রসুল স. কে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি সক্ষম হলে অবশ্যই জেহাদ করতাম। বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে— বোখারী হজরত বারা বিন আজিব থেকে—তিবরানী, হজরত জায়েদ বিন আরকাম থেকে— ইবনে হাব্বান ইবনে আসেম থেকে— এবং তিরমিজি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছে , রসুল স. হজরত জায়েদ বিন সাবেতের দ্বারা লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন—'লা ইয়াসতাবিল কৃয়িদুনা মিনাল মু'মিনিনা ওয়াল মুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহ্।' ইতোমধ্যে উপস্থিত হলেন হজরত ইবনে উম্মে মকতুম। বললেন, আমি জেহাদ করতে সক্ষম হলে অবশ্যই জেহাদ করতাম। তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. কে এ রকম বলেছিলেন হজরত ইবনে উম্মে মকতুম এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ। তাঁরা বলেছিলেন, আমরা তো চোখে দেখি না। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—'বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়।'

হজরত জায়েদ বিন সাবেত বলেছেন, এই আয়াত ওই সময় অবতীর্ণ হয়েছিলো যখন রসুল স. এর উরুদেশ ছিলো আমার উরুদেশের উপর। তখন আমি আমার উরুদেশে অনুভব করছিলাম ওহীর প্রচণ্ড ভার। মনে হচ্ছিলো আমার উরু বুঝি ফেটে যাবে। কিছুক্ষণ এই অবস্থা চললো। তারপর সমাপ্ত হলো এই আয়াতের অবতরণ।

কামুস অভিধানে রয়েছে 'দুররুন' এবং 'দ্বরারুন' অর্থ শোচনীয় অবস্থা অথবা খারাপ অবস্থা। যার দৃষ্টিশক্তি নেই তার অবস্থা তো খারাপই। এই খারাপ অবস্থা বুঝাতে আয়াতে উলিদ্‌দ্বরার (অক্ষম) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমি বলি, এখানে 'উলিদ্‌দ্বরার' বলে সকল রকম অক্ষম ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন বোবা, খোঁড়া, শারীরিকভাবে অসুস্থ কিংবা দুর্বল অথবা দৃষ্টিহীন, সহায় সম্বলহীন ইত্যাদি। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে— যাঁরা চলচ্ছক্তিহীন, রোগগ্রস্ত, অন্ধ অথবা সম্পদহীন তাঁরা জেহাদ করতে সমর্থ নন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যদি এ রকম থাকে যে, আমরা এ রকম অক্ষম না হলে অবশ্যই জেহাদে যাত্রা করতাম— তবে এ রকম বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে তাঁরাও লাভ করবেন মুজাহিদের মর্যাদা। হজরত আনাস থেকে বোখারী এবং হজরত আনাস ও হজরত জাবের থেকে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে বললেন, মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল, মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও। তারাতো এখানে আটকে ছিলো উপযুক্ত ওজরবশতঃ।

মুকসেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতে যারা বদর যুদ্ধে গমন করেছিলেন এবং যারা করেননি তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা বদরে গিয়েছিলেন এবং যারা যাননি তাঁরা সমান নন। এখানে যারা ঘরে বসে থাকে তাদেরকে বলা হয়েছে আল ক্বায়িদুনা। এ কথার অর্থ যারা অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকে।

প্রশ্নঃ পূর্বের বাক্যে বলা হয়েছে যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে ধন-প্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়। পরের বাক্যে বলা হয়েছে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপরে ধন-প্রাণ দ্বারা জেহাদকারীকে আল্লাহ্‌পাক মর্যাদা দিয়েছেন। দু'টি বাক্য একই বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে। সুতরাং আগের বাক্যটি উল্লেখ না করলেও চলতো। তাই প্রশ্ন — এ রকম পুনরাবৃত্তি করা হলো কেনো?

উত্তরঃ আগের বাক্যে সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই দুই দল সমান নয়। পরের বাক্যে তার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়েছে, জেহাদকারী দল জেহাদ বিমুখদের চেয়ে মর্যাদাশালী। এ রকম বাকভঙ্গির উদ্দেশ্য হচ্ছে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা— যাতে করে শ্রোতার স্মৃতিতে বক্তব্যটি গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়।

পুনঃ প্রশ্নঃ এ কথাতো সর্বজনবিদিত যে, যারা জেহাদ করে তারা জেহাদ বিমুখদের চেয়ে উত্তম। এতদ্‌সত্ত্বেও এখানে সে কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হলো কেনো?

উত্তরঃ বিশেষভাবে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেহাদের প্রতি সকলকে উৎসাহিত করে তোলা। অধিকতর শুদ্ধ উত্তর এই যে, যুদ্ধ না করলেই বরং

ইবাদত বন্দেগী এবং মানুষের হক সঠিকভাবে প্রতিপালন করা যায়। কিন্তু যারা জেহাদ করে তারা এ রকম নির্বিঘ্ন ও প্রশান্ত ইবাদত করার সুযোগ পায় না—এ রকম চিন্তার কারণে কেউ হয়তো মনে করতে পারে, জেহাদ করার চেয়ে না করাই উত্তম। এই আয়াতে এ রকম অযথার্থ চিন্তাকে অপসারিত করা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত মুজাহিদগণের অবস্থা ওই ব্যক্তিদের মতো, যারা বিরামহীনভাবে রোজা রাখে এবং সারা রাত নামাজ পড়ে। বোখারী, মুসলিম।

'আল্লাহ্ সকলকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন'—এ কথার অর্থ যারা যুদ্ধে গমন করবে, অথবা অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকবে, তাদের সকলকেই আল্লাহ্তায়ালা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ইমানের কারণে জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে।

এ কথাটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ ফরজে কেফায়া। কতিপয় লোক এই ফরজ সম্পাদন করলে অন্য সকলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। জেহাদ ফরজে আইন নয়। যদি হতো তবে জেহাদ বিমুখেরা পুণ্য লাভের অধিকারী হতো না। হতো শাস্তিযোগ্য।

আরো কিছু কথাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, কাফের সাম্রাজ্য যদি মুসলমানদের প্রতি আক্রমণপ্রবণ না হয় (শান্তিপ্রিয় হয়) তবুও খলিফা বা প্রতিনিধিকে প্রতি বছর যুদ্ধের আয়োজন করতে হবে। খলিফা বা প্রতিনিধির জন্য এটা ওয়াজিব। অন্যথায় জেহাদ অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এ সকল জেহাদে খলিফা বা প্রতিনিধি নিজে অংশগ্রহণ করবে অথবা সেনাদল পাঠিয়ে দেবে। রসুল আকরম স. এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কখনও জেহাদ পরিত্যাগ করেন নি।

একদল মুসলমান যুদ্ধোদ্যত হলে যদি আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় এবং কাফেরদেরকে রুখে দেয়া হয়, তবে অবশিষ্ট মুসলমানেরা জেহাদের ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। এ সকল অবস্থায় মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রীতদাস, স্বামীর নির্দেশ ব্যতীত স্ত্রী, ঋণপ্রদাতার অনুমোদন ব্যতীত ঋণী এবং পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সন্তান জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, সকলেই যদি জেহাদ থেকে বিরত থাকে তবে সকলেই গোনাহগার হবে। কিন্তু যার প্রকৃত ওজর রয়েছে সে গোনাহগার হবে না।

আলেমগণের আরও ঐকমত্য এই যে, মুসলমানেরা তাদের শহরে ও জনপদে বসবাসকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এই দায়িত্বটি ওয়াজিব। যদি তারা দুর্বল হয়, তবে নিকটবর্তী মুসলমানেরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। যদি তাতেও যথেষ্ট না হয়, তবে তাদেরকে সাহায্য করবে তাদের নিকটবর্তীরা। না হলে তাদের নিকটবর্তীরা। এভাবে প্রয়োজনবশতঃ মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

মাসআলাঃ আলেমগণ এই বিষয়টিতে একমত হয়েছেন যে, সম্মুখসমরে উপস্থিত হওয়ার পর পশ্চাদাপসরণ-নাজায়েয। তখন আপন সেনাদল থেকে এদিক ওদিক চলে যাওয়াও নাজায়েয। তবে শত্রুকে ধাওয়া করার জন্য অথবা

আপন দলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাওয়া আসা করা যাবে। শত্রুর সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়ে অধিক হলে নিরাপদ পশ্চাদপসরণ জায়েয। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতেও অটল থাকা উত্তম।

মাসআলাঃ জেহাদ বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধসরঞ্জাম তো থাকতেই হবে। তার সঙ্গে থাকতে হবে খাদ্য ও বাহন। ইমাম মালেক ছাড়া অন্য তিন ইমাম এ রকম বলেছেন। শুধু ইমাম মালেক বলেছেন, কেবল সমরসরঞ্জাম থাকলেই চলবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, তারাই অক্ষম যাদের নিকট আহার্য ও বাহন নেই। আরও বলেছেন, যখন তারা আপনার নিকট বাহনপ্রার্থী হয় তখন আপনি বলে দিন আমার নিকট কিছুই নেই (এই আয়াতে বাহন থাকা জরুরী বলা হয়েছে)।

মাসআলাঃ ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য এই যে, অবিশ্বাসীদের দ্বারা কোনো মুসলমান জনপদ আক্রান্ত হলে ওই জনপদের সকল মুসলমানের উপর জেহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। (তখন জেহাদ ফরজে কেফায়া থাকে না)। স্বাধীন, ক্রীতদাস, বিত্তবান, বিত্তহীন— সকলের উপর তখন জেহাদ ফরজ হয়ে যায়। যেমন ফরজ নামাজ ও রোজা। দাসের উপর মনিবের, ঋণীর উপর ঋণদাতার এবং সন্তানের উপর তার পিতামাতার হক সম্পর্কে তখন পরোয়া করলে চলবে না। তখন মনিব, ঋণদাতা, এবং পিতামাতার নিষেধাজ্ঞা যথাক্রমে গোলাম, কর্জগ্রহীতা এবং সন্তানের উপর থাকবে না। ফরজ নামাজ, রোজা নিষেধ করার ক্ষমতা যেমন কারোর নেই, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তেমনি জেহাদে বাধা দেয়ার অধিকারও কারো নেই। ইমাম আবু হানিফা এ কথাও বলেছেন যে, ওই পরিস্থিতিতে স্বামীর নির্দেশের তোয়াক্কা না করে জেহাদে অংশগ্রহণ করাকে স্ত্রী অপরিহার্য কর্তব্য বলে জানবে। আক্রান্ত জনপদবাসীরা মোকাবেলায় যথেষ্ট হলে তো ভালোই, না হলে নিকটবর্তী মুসলমান জনপদের অধিবাসীরা অত্যাবশ্যক জ্ঞানে আক্রান্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এ রকম সঙ্গিন পরিস্থিতিতেও যারা অক্ষম তাদের উপর জেহাদ ফরজ নয়।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, 'যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জেহাদ করে—তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' এই মহাপুরস্কার বা 'আজ্‌রি আজিম' অর্থ আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য এবং জান্নাতের উচ্চতর মর্যাদা।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৬

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

❒ ইহা তাঁহার নিকট হইতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

'দারাজাত' অর্থ মর্যাদা, 'মাগফেরাত' অর্থ ক্ষমা এবং 'রহমত' অর্থ দয়া। এই তিনটি বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালার দান। যে গোনাহ থেকে মুক্ত তার জন্য রয়েছে

মর্যাদা। যে গোনাহগার তার জন্য রয়েছে ক্ষমা। আর দয়া বা রহমত উভয় দলের জন্য। আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, জেহাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্পাক মহাপুরস্কার স্বরূপ মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া এই তিনটি নেয়ামত দান করবেন।

পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেহাদে উৎসাহ প্রদান। প্রথমে বলা হয়েছে, যারা জেহাদ করে এবং যারা করে না তারা সমান্তরাল নয়। তারপর বলা হয়েছে, যারা জীবন ও সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে, তারা জেহাদ বিমুখদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। তারপর বলা হয়েছে, মুজাহিদদেরকে আল্লাহ্পাক মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এতটুকু বলেই পূর্ববর্তী আয়াত শেষ করা হয়েছে। পরের আয়াতে কেবল বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাকের দরবারে রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া যা মুজাহিদদের জন্য নির্ধারিত।

একটি প্রশ্নঃ প্রথমে বলা হয়েছে মর্যাদা দানের কথা। পরে বলা হয়েছে 'দারাজাত' অর্থাৎ বহুতর মর্যাদা (মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া) দানের কথা। তবে কি প্রথমে বর্ণিত মর্যাদা ও পরে বর্ণিত মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

উত্তরঃ না। পৃথকভাবে উল্লেখিত মর্যাদার মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। প্রথমে উক্ত হয়েছে জেহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে জেহাদ পরিত্যাগকারী ব্যক্তির উপরে মর্যাদা দানের কথা। পরে বলা হয়েছে, যারা জেহাদ করে না সেই দলের উপরে মুজাহিদদের মর্যাদাশালী হওয়ার কথা। মুজাহিদগণ দলগতভাবে সমমর্যাদাশীল। এ রকম বলা যেতে পারে যে, এই সমমর্যাদার অর্থ পার্থিব মর্যাদা যার মধ্যে রয়েছে গণিমত, বিজয়, সাহায্য এবং রাজত্ব। এ সকল মর্যাদা আখেরাতের মর্যাদার তুলনায় নগণ্য। তাই প্রথমেই বলা হয়েছে, একক মর্যাদার কথা এবং পরে আখেরাতের মর্যাদা বুঝাতে 'দারাজাত' (বহুতর মর্যাদা) বলা হয়েছে। অথবা এ কথাও বলা যেতে পারে যে, 'দরজা' বা মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্যের সিঁড়ি এবং দারাজাত (মর্যাদাসমূহ) হচ্ছে জান্নাতের মর্যাদাসমূহ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্পাক অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে মর্যাদা দান করবেন। আর আপন প্রবৃত্তির (নফসের) বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদেরকে দান করবেন মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুজাহিদ, যে আল্লাহ্র অনুগত হয়ে আপন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করে থাকে এবং পূর্ণ মুহাজির (হিজরতকারী) ওই ব্যক্তি যে ত্রুটি বিচ্যুতি এবং পাপ পরিত্যাগ করে। হজরত ফুজালা থেকে বায়হাকী এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে।

এ রকমও বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত (আয়াত ৯৫) —এর প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, যারা শরিয়তসম্মত ওজরের কারণে অক্ষম তাঁরা পাবেন একটি স্তরের মর্যাদা। কারণ, তাঁদের অন্তরে রয়েছে জেহাদে গমনের বিশুদ্ধ সংকল্প। কিন্তু অক্ষমতা তাদেরকে জেহাদে শরীক হতে দেয়নি। আর মুজাহিদেরা অন্তরের বিশুদ্ধ সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে জেহাদ কার্যকর করেছে। এই দুই দলকে আল্লাহ্পাক কল্যাণ প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। তাঁরা কেউই গোনাহ্গার নন। পরের বাক্যে বলা হয়েছে বিনা ওজরে যারা জেহাদে অনুপস্থিত থাকে তাদের

কথা। ইমান থাকার কারণে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী হবে মুজাহিদেরা। এ রকম বর্ণনা করেছেন মুকাতিল।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুলুল্লাহ্ স. বলেন, আল্লাহ্ প্রভুপ্রতিপালক, ইসলাম সত্য ধর্ম এবং মোহাম্মদ স. সত্য নবী— যে ব্যক্তি এই আদর্শের উপর প্রসন্ন তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। এ কথা শুনে হজরত আবু সাঈদ খুদরী বিস্মিত হয়েছিলেন এবং এ কথা পুনর্বার শুনতে চেয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ্ স. পুনরায় এ কথা উল্লেখ করেছিলেন। আরও বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক বেহেশতবাসীদেরকে শতস্তরের মর্যাদা দান করবেন। পৃথিবী থেকে আকাশ যেমন উচ্চ তেমনি উন্নত হবে ওই মর্যাদা— একটি থেকে অন্যটি। হজরত আবু সাঈদ তখন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, ওই উচ্চতর মর্যাদাগুলো অর্জিত হবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র পথে জেহাদ, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জেহাদ। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করেছে, যথানিয়মে নামাজ আদায় করেছে এবং রমজানের রোজা রেখেছে, আল্লাহ্পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে থাকুক অথবা স্বগৃহে বসে থাকুক। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কি মানুষকে এই সুসংবাদ জানাবো? তিনি স. বললেন, জান্নাতের রয়েছে এক শত স্তর। ওই স্তরগুলো আল্লাহ্র পথে জেহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ওই স্তরগুলোর দূরত্ব আসমান ও জমিনের দূরত্বের মতো। প্রার্থনাকালে তোমরা জান্নাতুল ফেরদাউস প্রার্থী হয়ো। এই জান্নাত প্রশস্ততম ও উচ্চতম। এর উপরে রয়েছে আল্লাহ্র আরশ। আর আরশ থেকে নেমে আসে স্বর্গের স্রোতস্বিনী।

সব শেষে বলা হয়েছে , 'ওয়াকানাল্লহু গফুরর্ রহিমা' (আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)।

বাগবী লিখেছেন, কিছু সংখ্যক মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু হিজরত করেননি। তাদের মধ্যে কায়েস বিন ফাকা বিন মুগীরা এবং কায়েস বিন ওলিদ বিন মুগীরাও ছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় তাঁরা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন এবং নিহত হয়েছিলেন।

বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে, কতিপয় মুসলমান মুশরিক বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। তাঁরা মুসলমান বাহিনীর তীর অথবা তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। আমি বলি, মুশরিক বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন—এ কথার দ্বারা বুঝা যায়, তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেনি। ইবনে মান্দা ওই সকল লোকের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে—কায়েস বিন ওলিদ বিন মুগীরা, আবু কায়েস বিন ফাকা বিন মুগীরা, ওলিদ বিন উকবা বিন রবীয়া, আমর বিন উমাইয়া, সুফিয়ান এবং আলী বিন উমাইয়া বিন খালফ। ইবনে মান্দা এ কথা বলেছেন যে, এ সকল লোক মুশরিক বাহিনীর সঙ্গে বদর প্রান্তরে এসে দেখলো মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা

অনেক কম। তখন তারা সন্দেহে পতিত হলো এবং বলতে শুরু করলো, ধর্ম ওই লোকগুলোকে প্রতারণা করেছে। এই লোকগুলো যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো।

আমি বলি, তারা সন্দেহে পতিত হলো—এ কথায় বুঝা যায় তারা মুরতাদ বা কাফের হয়ে গেলো। কিন্তু কোরআনের বর্ণনায় তাদের কাফের হওয়ার প্রমাণ নেই। ইবনে আবী হাতেমও এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি ওই দলের তালিকার মধ্যে হারেস বিন রবীয়া বিন আসওয়াদ এবং আস বিন উতবা বিন হাজ্জাজের নামও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তিবরানী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল পাক স. যখন হিজরত করলেন, তখন কতিপয় মুসলমান ভয় পেয়ে গেলো। তারা হিজরত করাকে ভালো মনে করলো না। ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কতিপয় মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু তারা তাদের ইমানকে প্রকাশ করেনি। বদর যুদ্ধের সময় মুশরিকেরা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো। ওই সকল লোকের মধ্যে কেউ কেউ তখন নিহত হয়েছিলেন। সাহাবীগণ বললেন, তাঁরা মুসলমান। মুশরিকেরা বলপূর্বক তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিলো। অতএব তাদের মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করা দরকার। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৭

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○

❒ যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ-গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তাহারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;' তাহারা বলে, 'তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বসবাস করিতে পারিতে আল্লাহের দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না?' ইহাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর উহা কত মন্দ আবাস!

যারা সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত করে না, তাদের মৃত্যুর সময়ের অবস্থা বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। এখানে 'তাওয়ফফা' শব্দটির অর্থ রূহ কবজ করা বা প্রাণ গ্রহণ করা। শব্দটির মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— যে কোনো কালে জান কবজের কথা বুঝানো যেতে পারে। 'মালায়েকা' শব্দটির অর্থ ফেরেশতা। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, এখানে ফেরেশতা অর্থ মৃত্যুর ফেরেশতা বা 'মালাকুল মউত।' আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'আপনি বলে দিন, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের জীবন সংহার করে থাকে, যে নিযুক্ত

রয়েছে তোমাদের জন্য।' আরবী ভাষার রীতি হচ্ছে— কখনো কখনো এক বচনকেও বহুবচন হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এখানে তেমনি 'মালায়েকা' অর্থ হবে ফেরেশতাগণ—মৃত্যুর ফেরেশতা ও তার সঙ্গীগণ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এ কথাও রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, বিশ্বাসীর মৃত্যুর সময় শাদা রেশমী বস্ত্র নিয়ে রহমতের ফেরেশতা এসে বলতে থাকেন, হে পবিত্র রূহ! বহির্গত হও। তুমি আল্লাহ্র প্রতি প্রসন্ন এবং আল্লাহ্ও তোমার প্রতি প্রসন্ন। চলো আল্লাহ্র রহমত ও শান্তির দিকে এবং ওই প্রভু-পালকের দিকে— যিনি তোমার প্রতি অপ্রসন্ন নন। অবিশ্বাসীর মৃত্যুর সময় আযাবের ফেরেশতা আসেন কদর্য বস্ত্র নিয়ে এবং বলতে থাকেন, হে অপবিত্র নফস, বের হয়ে এসো আল্লাহ্র আযাবের দিকে। তুমি আল্লাহ্র প্রতি অপ্রসন্ন এবং আল্লাহ্ও তোমার প্রতি রুষ্ট।

হজরত বারা বিন আজিব থেকে আহমদ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিন বান্দা পৃথিবী পরিত্যাগের সময় সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল শুভ্র অবয়ববিশিষ্ট ফেরেশতাকুল বেহেশতি কাফন এবং সৌরভ নিয়ে অবতরণ করেন এবং উপবেশন করেন তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর শিয়রে এসে বলতে থাকেন, হে প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারী! চলো, আল্লাহ্র মার্জনা ও সন্তোষের দিকে। তখন মশক থেকে যেমন পানির প্রবাহ বেরিয়ে আসে তেমনি করে বেরিয়ে আসে তার রূহ। মৃত্যুর ফেরেশতা তখন তার সেই রূহ গ্রহণ করেন। উপবিষ্ট ফেরেশতাগণ এক মুহূর্ত দেরী না করে পবিত্র সে আত্মাকে কাফনে জড়িয়ে নিয়ে বেহেশতি সৌরভে সুরভিত করে প্রস্থান করেন। কাফের বান্দার মৃত্যু আসন্ন হলে তার কাছে আকাশ থেকে নেমে আসেন কালো মুখবিশিষ্ট ফেরেশতার দল। তাঁদের হাতে থাকে কদর্য বস্ত্রের টুকরা। ওই ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসে যান তাঁরা। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার কাছে বসে বলতে থাকেন, আল্লাহ্র গজবের দিকে বের হয়ে এসো হে অপবিত্র আত্মা! অপবিত্র আত্মা তখন ভয়ে শরীরের অভ্যন্তরে লুকোবার চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতা লোহার কাঁটার মতো তাকে টেনে বের করে আনে। উপবিষ্ট কৃষ্ণকায় ফেরেশতারা তখন এক মুহূর্ত দেরী না করে অপবিত্র আত্মাকে কদর্য বস্ত্রে জড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানেরা তাঁদের মক্কায় অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনদেরকে লিখে জানালেন, অতি শীঘ্র সকলে মদীনায় চলে এসো। মক্কায় অবস্থানের পরিণাম ভালো নয়। সংবাদ পেয়ে তাঁরা মদীনার পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু মক্কার মুশরিকেরা তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালো এবং পুনরায় তাঁদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। তখন অবতীর্ণ হলো, 'অতঃপর যখন তাদেরকে আল্লাহ্র পথে কোনো কষ্ট আপতিত হয় তখন তারা মানবপ্রদত্ত কষ্টকে মনে করে এ যেনো আল্লাহ্র আযাব।' মদীনার মুসলমানেরা এই আয়াত পুনরায় লিখে পাঠিয়ে দিলেন মক্কার মুসলমানদেরকে। তখন মক্কার মুসলমানেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, নিশ্চয়ই আমরা হিজরত করবো। যারা পশ্চাদ্ধাবন করবে তাদের সঙ্গে করবো যুদ্ধ। পুনরায় মদীনায় যাত্রা করলেন তাঁরা। পেছনে পেছনে

ছুটে এলো মুশরিকেরা। শুরু হলো যুদ্ধ। মুসলমানদের কেউ কেউ নিহত হলেন। অন্যরা চলে এলেন মদীনায়। অবতীর্ণ হলো, 'অতঃপর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক এ রকম লোকদের জন্য যারা অবিশ্বাসে লিপ্ত থাকার পর বিশ্বাসী হয়ে হিজরত করেছে।'

হিজরতের হুকুম পালন করা ফরজ। এই ফরজ হুকুম না মেনে মুশরিকদের সাহচর্যে (মক্কায়) অবস্থান করা শক্ত পাপ। এ রকম আচরণ অবিশ্বাসকে সমর্থনদান তুল্য।

বাগবী লিখেছেন, হিজরতের নির্দেশ দানের পর হিজরত না করলে ইমান ও ইসলাম কবুল হবে না। মক্কাবিজয়ের পর এই হুকুমটি রহিত হয়ে গিয়েছে। রসুল স. বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পর হিজরত করা জরুরী নয়। বিশুদ্ধ সূত্রে মোজাশী বিন মাসউদ থেকে এ বর্ণনাটি এনেছেন আহমদ ও আবু দাউদ। এই হাদিসটি জুহাকের বর্ণনাসূত্রে লিপিবদ্ধ করে ইবনে জারীর লিখেছেন, হিজরতের হুকুমটি রহিত হয়নি। পরাক্রান্ত কাফেরদের জনপদ থেকে অন্যত্র হিজরত করে যাওয়া আলেমগণের ঐকমত্যসূত্রে ফরজ। এই আয়াতের বক্তব্য এই যে, যে স্থানে মুসলমানেরা ইসলামী বিধিবিধান কার্যকর করতে অক্ষম তাদের জন্য সেই স্থান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব। আর 'মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই'— এই হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, মক্কাবিজয়ের পর যেহেতু মক্কায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত— তাই সেখান থেকে হিজরত করা আর ওয়াজিব নয়। কেউ বিজয়ের পর মক্কা পরিত্যাগ করলে তাকে মোহাজিরও বলা যাবে না। সে হিজরতের সওয়াবও লাভ করবে না। আর একটি কথা এই যে, হিজরতের নির্দেশ বলবৎ থাকার সময় যারা হিজরত করে নি তাদের ইমান ও ইসলাম যে আদৌ কবুল হবে না এ কথাটিও ঠিক নয়। তবে তারা গোনাহ্গার এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যাবে না। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'আর যারা ইমান এনেছে অথচ হিজরত করেনি তাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্বের সংশ্রব নেই, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা তোমাদের নিকট ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী হয় তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু তোমরা ওই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না— যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধির অঙ্গীকার করেছো'। অর্থাৎ যে সকল ইমানদার হিজরত করেনি তারা তোমাদের বন্ধু নয় যতোক্ষণ না তারা হিজরত করবে। তবে তারা সাহায্যপ্রার্থী হলে তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য প্রদানে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তোমরা তোমাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না।

হিজরতবিমুখদের প্রাণহরণের সময় মৃত্যুর ফেরেশতারা শাসাবেন— বলো, কী অবস্থায় ছিলে তোমরা। হিজরতকারীদের সঙ্গে না হিজরতবিমুখ কাফেরদের সঙ্গে? তোমরাতো বন্ধুত্ব করেছো কাফেরদের সঙ্গেই (তাই হিজরত করোনি)।

ফরজ হিজরত পরিত্যাগকারীরা তখন বলবে, আমরা ছিলাম অসহায়। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের ছিলো না। অবিশ্বাসের প্রতাপে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও ধর্মকে প্রকাশ করতে পারিনি।

ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমরা তো দেশত্যাগ করতে পারতে। চলে যেতে পারতে ইসলাম প্রভাবিত এলাকায়। আল্লাহ্র পৃথিবী কি এ রকম প্রশস্ত ছিলো না?

মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাওয়ার ক্ষমতা তো তোমাদের ছিলোই। তোমরা সেখানে যেয়ে তোমাদের বিশ্বাস ও ধর্মকে রক্ষা করতে পারতে— যেমন আবিসিনিয়ার ও মদীনার হিজরতকারীগণ করেছেন।

হিজরত পরিত্যাগকারীদের সঙ্গে মৃত্যুর ফেরেশতাদের এই কথোপকথনের বিবরণ দানের পর আয়াত শেষে বলা হয়েছে, এদের আবাসস্থল জাহান্নাম। এ কথার মাধ্যমে হিজরত পরিত্যাগকারীরা যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী সে কথা অবশ্য প্রমাণিত হয়নি। তবে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তারা যে জাহান্নামী—এ কথা ঠিক। আর জাহান্নাম কতোই না মন্দ আবাস।

হজরত হোসাইন থেকে মুরসালরূপে ছা'লাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ধর্মরক্ষার জন্য কেউ এক হাত দূরত্বের স্থানে হিজরত করলেও তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। জান্নাতে সে তাঁর সঙ্গী হিসাবে পাবে হজরত ইব্রাহিম আ. এবং আল্লাহ্‌র হাবিব হজরত মোহাম্মদ স. কে।

বোখারী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, মুসলমানদের উত্তম সম্পদ ওই সকল বকরী যেগুলো নিয়ে তাঁরা ফেতনা ফাসাদ থেকে ধর্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাবে।

হজরত আমর বিন আস থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— নিশ্চয়ই ইসলাম পূর্ব জীবনের সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয়। হিজরত মিটিয়ে দেয় হিজরত পূর্ব সময়ের পাপরাশি। আর হজ ধ্বংস করে দেয় হজপূর্ববর্তী সকল অপরাধকে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৮, ৯৯

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ○ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ○

❒ তবে যে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না এবং কোন পথও পায় না,

❒ আল্লাহ্ হয়তো তাহাদের পাপ মোচন করিবেন কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

যারা অক্ষম তাদের উপর হিজরত ওয়াজিব নয়। আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'লা ইউকাল্‌লিফুল্লহু নাফসান ইল্লা উসআ'হা (আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যাতীত নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না)। সুতরাং হিজরত তাদের প্রতি অত্যাবশ্যকীয় নয়— যারা বয়োবৃদ্ধ, কঠিন রোগে আক্রান্ত, চলচ্ছক্তিহীন, বাহনবিহীন অথবা এমন ব্যক্তি যে পরিবার পরিজনসহ হিজরত করার সামর্থ রাখে

না। অর্থাৎ যে একা হিজরত করলে তার পরিবার পরিজন হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন। বিপদগ্রস্ত। আয়াতে উল্লেখিত 'অসহায় পুরুষ' বলতে এদেরকে বুঝানো হয়েছে। নারী ও শিশুরাও অক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত। শিশুদের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, হিজরত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। অভিভাবকগণ যদি সামর্থ রাখে তবে শিশুদেরকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করবে। আর শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদেরকে নিজ উদ্যোগে হিজরত করতে হবে।

আয়াতে ক্রীতদাসদেরকে অক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই তাদের উপর হিজরত ওয়াজিব। মনিব তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। কারণ, হুকুমটি ফরজে আইন। এই ফরজ প্রতিপালনে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক, হজরত ইউনুস বিন বুকাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, তায়েফ অবরোধের সময় রসুল স. এর পক্ষ থেকে একজন আহবানকারী এই মর্মে আহবান জানিয়েছিলেন যে, যারা দূর্গ থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হবে— তারা মুক্ত। এই আহবান শুনে দশ জনের অধিক লোক দূর্গ থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। হাফেজ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শাফেয়ী তাঁর 'সাবিলির রাশাদ' পুস্তকে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন— গোলামদের মধ্যে যারা আমাদের কাছে আসবে তারা আজাদ হয়ে যাবে। এই ঘোষণা শুনে কয়েকজন গোলাম দূর্গ থেকে বের হয়ে এলেন। রসুল স. তাঁদেরকে মুক্ত করে দিলেন। হজরত আবু বকরাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। বোখারী ও মুসলিমে এই বর্ণনাটি উল্লেখিত হয়েছে হজরত ওসমান নাহদী থেকে। হজরত সা'দ বলেছেন, আবু ওসমান নাহদী ছিলেন আল্লাহর পথের প্রথম তীর নিক্ষেপকারী। তখনকার মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। আর ছিলেন হজরত আবু বকরাও। তিনি ছিলেন ওই দলের তেইশতম ব্যক্তি। তায়েফবাসীরা এই ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। প্রচণ্ড রুষ্ট হয়েছিলো হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের প্রতি। রসুল স. মুক্তিপ্রাপ্তদেরকে একজন একজন করে একেকজন সাহাবীর দায়িত্বে অর্পণ করলেন এবং এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যেনো তাদেরকে দেখাশুনা করে, তাদের বাহনে উঠিয়ে নেয় এবং কোরআন ও ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষা দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রাক্তন অধিকর্তা বনী সাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তখন রসুল স. এর নিকট তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া গোলামদেরকে ফেরত চেয়েছিলেন। রসুল স. বলেছিলেন, আল্লাহ্ তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদেরকে আর অধিকারভূত করতে যেয়ো না। হারেস বিন কালাদাও ছিলেন ওই নিবেদনকারীদের মধ্যে একজন।

যারা হিজরত করতে অক্ষম, তারা যেহেতু উপায়হীন, পাথেয়বিহীন, পথ ও পথপ্রদর্শকহীন—তাই খুব সম্ভব আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মার্জনা করবেন। পরের আয়াতে অক্ষমদেরকে নিশ্চিত ক্ষমা প্রদানের সুসংবাদ না দিয়ে বলা হয়েছে—

'হয়তো' অর্থাৎ 'খুব সম্ভব'। এই বাকভঙ্গিমার মাধ্যমে এ কথাটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হিজরতের গুরুত্ব যেনো অক্ষমেরাও অনুধাবন করতে সচেষ্ট থাকে। ধ্যান ও চিন্তা হিজরতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে তারাও যেনো সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে।

সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। সুতরাং অক্ষমেরা ক্ষম্য।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা হিজরত করতে সমর্থ ছিলেন না তাঁদের মধ্যে আমার মা ও আমিও ছিলাম। আমাদের জন্য রসুল স. নামাজের পর দোয়া করতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, তখন ইশার নামাজের শেষ রাকাতে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলার পর রসুল স. বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি আয়েশা বিন আবী রবিয়াকে মুক্ত করো, হে আল্লাহ্ ! তুমি ওলিদ বিন ওলিদকে নিষ্কৃতি দাও। হে আল্লাহ! সালমা বিন হিশামকে তুমি অব্যাহতি দান করো। হে আল্লাহ, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অসহায় তাদেরকে পরিত্রাণ দাও। হে আল্লাহ মোজার গোত্রের প্রতি তুমি কঠোর হও (তাদের বিনাশ সাধন করো)।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০০

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

❑ কেহ আল্লাহের পথে দেশ ত্যাগ করিলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করিবে এবং কেহ আল্লাহ্ ও রসূলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হইয়া বাহির হইলে এবং তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহের উপর; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলী বিন আবু তালহা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, এখানে উল্লেখিত 'মুরাগামান' শব্দটির অর্থ হিজরতের স্থান। অথবা গন্তব্যস্থল। শব্দটি এসেছে 'রিগম' থেকে। 'রিগম' অর্থ মৃত্তিকা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মুরাগামান' অর্থ এমন পথের সন্ধান লাভ যা আপন সম্প্রদায়ের নাসিকা ধূলিধূসরিত করে দেয়। অর্থাৎ দেশত্যাগের যে পথ স্বসম্প্রদায়ের মতবিরুদ্ধ। মুজাহিদ বলেছেন, মুরগামান অর্থ প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ নির্দেশে স্থানান্তরে গমন। আবু উবাইদা বলেছেন, দেশান্তরে গমনের স্থান। অর্থাৎ এ কথা বুঝানো যে, আমি স্বদেশ ত্যাগ করেছি। কামুস অভিধানে রয়েছে মুরাগামান অর্থ পরিত্যাগ,

দূরগমন। 'মুরাগাম' অর্থ গন্তব্যভূমি, আশ্রয় গ্রহণের স্থান অথবা শরণ প্রার্থনার স্থান।

'ওয়াসায়্তা' অর্থ জীবনোপকরণের কিংবা উপার্জনের নিশ্চিন্ততা। অথবা প্রচারের জন্য বক্ষদেশের প্রশস্ততা।

এই আয়াতের প্রথমেই হিজরতকারীদের বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্যের শুভসমাচার দেয়া হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, শুভসমাচারটি অবতীর্ণ হলে বনী লাইস নামক জনপদের এক অতিবৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি এখন আর দুর্বল নই। আমি হিজরত করতে সক্ষম। দেশত্যাগের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা আমার আয়ত্বে। মদীনা কিংবা মদীনা অপেক্ষা দূরবর্তী স্থানে গমনের জন্য আমার নিকটে রয়েছে প্রয়োজনীয় পাথেয়। আল্লাহ্পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে আমি আজ রাতেই মক্কা ছেড়ে চলে যাবো।

ওই অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির নাম জুনদা, বিন জুমরাহ্। তিনি তাঁর কথামতো ওই রাতেই মদীনার পথে যাত্রা করলেন। তানয়ীম নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বুঝলেন, তাঁর মৃত্যুকাল সন্নিকটবর্তী। তিনি তখন আনন্দে দুই হাতে তালি বাজিয়ে বলে উঠলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি এবং তোমার রসুলের জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। আমি তোমার সঙ্গে ওই অঙ্গীকারে আবদ্ধ, যে অঙ্গীকার করেছেন তোমার রসুল। এ কথা বলার অল্পক্ষণ পরেই তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন। মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে গেলো মদীনায়। সাহাবীগণ বলাবলি করলেন, সে যদি মদীনায় পৌঁছুতে পারতো তবে তাঁর হিজরতের পূর্ণ পুণ্য লাভ হতো। মক্কার মুশরিকেরা তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে হাসাহাসি করতে শুরু করলো। বললো, হায়— তার মনের আশা আর পূরণ হলো না।

ইবনে আবী হাতেম ও আবু ইয়া'লী উত্তমসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত জুমরাহ্ বিন জুনদুব হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। গৃহবাসীদেরকে বললেন, আমাকে একটি বাহনে বসিয়ে দাও। শিরিক প্রভাবিত এই স্থান থেকে আমাকে আমার রসুল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। গৃহবাসীগণ তাঁকে মদীনার দিকে নিয়ে চললেন। পথিমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের পরবর্তী অংশটি— 'কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হয়ে বের হলে এবং তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'—এ কথার অর্থ হিজরতের স্থানে না পৌঁছুতে পারলেও ওই ব্যক্তি পুণ্য লাভ করবে। তাকে পুণ্য প্রদান আল্লাহ্পাক অত্যাবশ্যকীয় করে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্পাকের প্রতি কোনো কিছুই অত্যাবশ্যকীয় নয়। তিনি অবশ্যই অত্যাবশ্যকতা থেকে পবিত্র। কিন্তু তিনি যে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাই তিনি তাঁর দয়া ও ক্ষমার কারণে ওই পুণ্যাভিসারীকে পুরস্কৃত করার দায়িত্ব নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, আবু জুমরাহ্ নামক এক অন্ধ ব্যক্তি মক্কায় বসবাস করতেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ

হলো তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে পড়েছে আমার উপর। আর এই নির্দেশ প্রতিপালনের ক্ষমতাও আমার রয়েছে। এই বলে তিনি হিজরতের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং অনতিবিলম্বে যাত্রা শুরু করলেন মদীনার দিকে। কিন্তু তানয়ীম নামক স্থানে পৌঁছে মৃত্যুবরণ করলেন তিনি। তখন আয়াতের পরবর্তী অংশটি অবতীর্ণ হলো। এই ঘটনাটি হজরত জোবায়ের থেকে ইবনে জারীর এবং হজরত ইকরামা থেকে কাতাদা, সুদ্দী এবং জুহাকও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাগুলোতে ওই হিজরতকারীর বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেছেন, পথিমধ্যে মৃত্যুবরণকারী ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির নাম জুমরাতা বিন আইস, কেউ বলেছেন আইস বিন জুমরাহ্। কেউ বলেছেন জুনদুব বিন জুমরায়ে জুনদায়ী। আবার কেউ বলেছেন, জুমারী। কারো নিকট তিনি ছিলেন বনী জুমরাহ্'র এক ব্যক্তি, কারো নিকট বনী খাজায়ার অন্তর্ভুক্ত, কারো নিকট বনী লাইস, কারো নিকট বনী কেনানা এবং কারো নিকট বনী বকর।

তব্‌কাত গ্রন্থে ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন কাসিদ থেকে ইবনে সা'দ লিখেছেন, জুনদাহ বিন জুমাইরা জামেরী দুমরী জুনদায়ী ছিলেন মক্কার অধিবাসী। তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, আমাকে মক্কা থেকে বের করে নিয়ে চলো। পুত্রগণ বললেন, কোথায়? তিনি ইশারায় জানালেন, মদীনায়। পুত্রগণ তাঁকে নিয়ে চললেন। এজায়াতে বনী আম্মারায় পৌঁছলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। ইবনে মান্দা থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং হিশাম বিন ওরওয়া থেকে বাওয়ার্দী বর্ণনা করেছেন, হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম বলেছেন, খালিদ বিন হিশাম হিজরতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে একস্থানে তিনি সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে।

আমুবী তাঁর মাগাজী গ্রন্থে হজরত আবদুল মালেক বিন ওমায়ের সূত্রে লিখেছেন, রসুল পাক স.এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির সংবাদ শুনতে পেয়ে আকতাম বিন সাইফি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বাধা দিলো। কারণ, তিনি ছিলেন দুর্বল। আকতাম বললেন, তবে তোমরা আমার জন্য এমন লোক নিযুক্ত করে দাও, যে আমার কথা রসুলের নিকট এবং রসুলের কথা আমার নিকট পৌঁছে দেয়। তাঁর কথামতো তখন দৌতকর্মে নিযুক্ত করা হলো দুই ব্যক্তিকে। তাঁরা রসুল স. এর দরবারে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আকতাম বিন সাইফির দূত। আকতাম আপনার পরিচয় জানতে চেয়েছেন। আরো জানতে চেয়েছেন, আপনি কোন ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। রসুল স. বললেন, আমি আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসুল। অতঃপর তিনি স. 'ইন্নাল্লহা ইয়া'মুরু বিল আদ্‌লি ওয়াল ইহ্‌সান (নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক হুকুম দিয়েছেন অনুগ্রহ, ন্যায়বিচার.....)'— এই আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। দূতদ্বয় ফিরে গিয়ে আকতামকে এ সকল কথা জানালো। আকতাম তখন সকলকে ডেকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! রসুল মোহাম্মদ স. উত্তম

চরিত্র গঠনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং অসুন্দর কথা ও কর্ম থেকে নিবৃত্ত করেন। সুতরাং, তোমরা আর মাথা গুঁজে থেকো না (সবার আগে ইমান আনো—এমন যেনো না হয় যে, ইমানে অন্যেরা অগ্রবর্তী আর তোমরা অনুবর্তী)। এ কথা বলে আকতাম উষ্ট্রারোহী হয়ে মদীনার দিকে চললেন। কিন্তু পথিমধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাটি মুরসাল এবং এর সনদ অদৃঢ়।

আবু হাতেম তাঁর কিতাবুল মুয়াম্মারাইন নামক পুস্তকে দুইভাবে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আকতাম বিন সাইফির সম্পর্কে। লোকেরা বলেছিলো, তবে যে বলা হয় আয়াতটি নাজিল হয়েছে লাইসী সম্পর্কে? তিনি তখন বলেছিলেন, এই ঘটনাটি ছিলো লাইসীর এক বৎসর পূর্বের। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে বিশিষ্ট এবং হুকুমের দিক থেকে সাধারণ।

জ্ঞাতব্যঃ আলেমগণ বলেন— হিজরত অর্থ জ্ঞানান্বেষণ, হজ ও জেহাদ অথবা বৈধ জীবনোপকরণের জন্য এমন শহরে যাত্রা যেখানে রয়েছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, এবং ধর্মীয় উন্নতির সুযোগ। সেই স্থানের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করলেও (গন্তব্যে পৌঁছেতে না পারলেও) আল্লাহ্‌র দায়িত্বভূত হয়ে যায়।

হজরত আলী থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, বনী নাজ্জারের কতিপয় ব্যক্তি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা সফরের সময় কিভাবে নামাজ আদায় করবো? তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০১

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط إِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

❑ এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করিবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের জন্য ফিত্না সৃষ্টি করিবে তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

কামুস অভিধানে রয়েছে 'জুনাহুন' অর্থ পাপ। আয়াতের সরল বক্তব্য হচ্ছে, সফরের সময় কাফেরদের আক্রমণের আশংকা থাকলে নামাজ সংক্ষিপ্ত বা কসর করায় দোষ নেই। কসর অর্থ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ দুই রাকাতের মধ্যে

সম্পন্ন করা। ঐকমত্যসঞ্জাত অভিমত এই যে, তিন বা দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজের কসর হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে আয়াতে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ দুই রাকাত বিশিষ্ট করে পড়তে বলা হয়েছে।

কতিপয় প্রতর্ক—১ঃ অনুমোদিত সফরের সময়সীমা কতদূর, ইতোপূর্বে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সুরা বাকারায় করা হয়েছে। ওই আলোচনাটি ছিলো সফরে রোজা রাখা না রাখা সম্পর্কে।

প্রতর্ক—২ঃ সফরে নামাজ কসর না করা কি বৈধ? ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং তাঁদের সুহৃদগণের নিকট কসর না করা বৈধ নয়। বাগবী লিখেছেন, এ রকম আমল করতেন হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত জাবের। হাসান বসরী, ওমর বিন আবদুল আজিজ এবং কাতাদাও এই অভিমতের অনুসারী। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকও এ রকম বলেছেন। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেকের প্রখ্যাত উক্তি এই যে, ভ্রমণাবস্থায় কসর না করে পূর্ণ নামাজ পড়া জায়েয। বাগবী লিখেছেন, এ রকম আমলে অভ্যস্ত ছিলেন হজরত ওসমান গণি এবং হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য দৃষ্টে ইমাম শাফেয়ী কসর না করাকে জায়েয বলেছেন। কারণ এখানে বলা হয়েছে, 'সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নাই'। যদি কসর না করা অবৈধ হতো তবে বক্তব্যটি হতো সরাসরি (সফরে পুরো নামাজ পোড়ো না—কসর কোরো—এ ধরনের)। হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. ভ্রমণের সময় কখনও কসর করতেন। আবার কখনো পুরো নামাজ পড়তেন। তেমনি কখনো রোজা রাখতেন, কখনো রোজা পরিত্যাগ করতেন। শাফেয়ী, ইবনে আবী শায়বা, বায্যার, দারা কুতনী। দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রসংবলিত। কিন্তু এই সূত্রসংশ্লিষ্ট মুগীরা বিন জিয়াদ সম্পর্কে (যিনি আতা বিন রিবাহ্ এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন) আপত্তি রয়েছে। ইমাম আহমদ তাঁকে দুর্বল বলেছেন এবং আবু জারআ তার বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলে মনে করেননি। এই হাদিসটি আবার হজরত আতা থেকে ওমর বিন সা'দের মাধ্যমে ইবেন জাওজী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—যার সূত্রশৃংখলে মুগীরার নাম নেই। তাছাড়া মুগীরাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন ওয়াকি' এবং ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন।

আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি রমজানে ওমরা করার সময় রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন রোজা রাখেননি, আমি রেখেছি। তিনি স. নামাজে কসর করেছিলেন, আমি করিনি। আমি তখন বলেছিলাম, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান। আপনি রোজা রাখলেন না, আমি রাখলাম। আপনি নামাজ সংক্ষেপ করলেন, আর আমি পড়লাম পুরো নামাজ। তিনি স. বললেন, আয়েশা তুমি উত্তম কর্ম করেছো। নাসাঈ, দারা কুতনী। দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি উত্তম। বায়হাকী বলেছেন, বিশুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আবার এই আপত্তিটি উত্থাপিত হয়েছে যে, আবদুর রহমান বিন

আসওয়াদ হজরত আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন অতি শৈশবে। আর তিনি তখন হজরত আয়েশা থেকে কোনো হাদিস শোনেননি। দারা কুতনী বলেছেন, তিনি হজরত আয়েশার খেদমতে উপনীত হয়েছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সাহায্য গ্রহণ করেছেন বোখারীর ইতিহাস ইত্যাদির দ্বারা। তারপর বলেছেন, আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ এই হাদিসটি তাঁর পিতার মাধ্যমেও বর্ণনা করেছেন। এ রকম বলে দারা কুতনী হাদিসটির দু'রকম সূত্রের অবতারণা করেছেন। একটি বর্ণনা মুসনাদ, অপরটি মুরসাল। আল ইয়াসীর গ্রন্থে মুসনাদকে বলা হয়েছে বিশুদ্ধ এবং এলাল গ্রন্থে মুরসালকে করা হয়েছে সন্দেহযুক্ত। এখানে এই মর্মে আরেকটি আপত্তি রয়েছে যে, ঐতিহাসিকদের ঐকমত্যানুসারে রসুল স. কখনো রমজানে ওমরা করেননি। দারা কুতনীর এই বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনায় রমজানের ওমরার কথা আসেনি। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

ইমাম আবু হানিফার দলিল হচ্ছে—ইয়া'লী বিন উমাইয়া বলেছেন, আমি হজরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, অবিশ্বাসীদের আক্রমণের আশংকা থাকলে সফরে নামাজ সংক্ষেপ করাতে দোষ নেই। তবে কি আক্রমণের আশংকা না থাকলে নামাজ সংক্ষেপ করা যাবে না? হজরত ওমর বললেন, আমিও রসুল স.কে এ রকম প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, এটা হচ্ছে আল্লাহ্র সদকা। তোমরা এই সদকা (দান) গ্রহণ করো। মুসলিম।

যেখানে দানের মাধ্যমে কাউকে দানকৃত বস্তুর মালিক করা যায় না সেখানে সদকা অর্থ হবে রহিত করে দেয়া। এখানেও নামাজ সংক্ষেপ করার এই দানের মাধ্যমে কাউকে কোনো বস্তুর মালিক করা হয়নি। তাই এ কথা নিশ্চিত যে, এখানে দুই রাকাত নামাজকে রহিত করে দেয়াই হবে দানের উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ্র দিক থেকে যে হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে, তা করা নাজায়েয অর্থাৎ কসর না করা নাজায়েয। লক্ষণীয় যে, দাবীদারেরা মাফ করে দিলে কিসাস রহিত হয়ে যায় (রহিত কিসাস পুনরায় কার্যকর করা যায় না)। আর বিত্তশালী দাতার অনুসরণ ওয়াজিব (তবে মহাশক্তিধর দাতা আল্লাহ্তায়ালার দান অবশ্যমান্য হবে না কেনো)!

বনী আবদুল্লাহ্ বিন কা'ব গোত্রভূত আনাস বিন মালেক একটি মাত্র হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর আর অন্য কোনো বর্ণনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি বলেছেন, একবার রসুল স. এর সঙ্গীরা আমাদের উপর হামলা করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম। দেখলাম, তিনি স. দ্বিপ্রহরের আহার সম্পন্ন করছেন। আমাকে দেখে বললেন, এসো আহার করো। বললাম, আমি রোজা রেখেছি। তিনি স. বললেন, কাছে এসো। আমি তোমাকে রোজা সম্পর্কে একটি কথা বলবো। আমি নিকটে গেলে তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাক মুসাফিরদের জন্য নামাজ ও রোজার অর্ধেক অংশ রহিত করে দিয়েছেন। তেমনি রহিত করে দিয়েছেন দুগ্ধদাত্রী ও গর্ভধারিণীদের রোজা। আনাস আরো বলেছেন,

আক্ষেপ! আমি রসুল স. এর আহার্য্য ভক্ষণ করতে পারলাম না। ইবনে জাওজী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজির নিয়মে। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—এখানে রোজা ও নামাজের কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সফরে মুসাফিরের রোজা ঐকমত্যসূত্রে জায়েয—ওয়াজিব নয় (কাজেই সফরের সময় নামাজ সংক্ষেপ করা জায়েয, ওয়াজিব নয়)।

'ওয়াদ্বিয়া' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো রহিত করে দেয়া। এই একই শব্দ সফরের নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ সফরে রোজা রাখা না রাখা উভয়টিই বৈধ। সুতরাং রোজার ক্ষেত্রে এই শব্দটির রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আর নামাজের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে প্রকৃত অর্থ (ওয়াজিব)। কিন্তু প্রকৃত (হাকিকি) এবং রূপক (মাজাজী) একই বাক্যে একত্র করা রীতিবিরুদ্ধ। তাই হজরত ওমর বর্ণিত হাদিসে কেবল নামাজের কথাই উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—রসুল স. আজ্ঞা করেন—সফরে নামাজ দুই রাকাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজ দুই রাকাত এবং জুমআর নামাজ দুই রাকাত। নাসাঈ, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের নবীর উপর স্বগৃহে বসবাসের সময় চার রাকাত, ভ্রমণাবস্থায় দুই রাকাত এবং ভীতির সময় এক রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন। মুসলিম।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, নামাজ প্রথমে দুই রাকাতই ফরজ করা হয়েছিলো। পরে ভ্রমণাবস্থায় ওই দুই রাকাতই নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে এবং গৃহবাসের সময় আরো দুই রাকাত সংযোজিত হয়েছে। বোখারী, মুসলিম।

জুহুরী বলেছেন, আমি হজরত ওরওয়ার নিকট জিজ্ঞেস করলাম, মাতা আয়েশা সফরে পুরো নামাজ পড়তেন কেনো? তিনি বললেন, মাতা সাহেবা হজরত ওসমানের অভিমতের ভাবার্থ অনুযায়ী এ রকম করতেন। তাই বোখারীর বর্ণনায় তিনি এ কথা বলেছেন যে, প্রথমে নামাজ দুই রাকাত ফরজ করা হয়েছিলো। হিজরতের পরে গৃহবাসের সময় চার রাকাত করা হয়েছে। কিন্তু ভ্রমণাবস্থায় দুই রাকাতই নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি দেখেছি, রসুল স. পৃথিবী থেকে প্রস্থানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সফরের সময় দুই রাকাতের অধিক নামাজ পড়েননি। আমি হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানকেও দুই রাকাতের বেশী পড়তে দেখিনি। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'লাক্বদ কানালাকুম ফি রসুলিল্লহি উসওয়াতুন হাসানা (নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ স. এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ)। বোখারী।

সহিহাইনে (বোখারী ও মুসলিমে) হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি সফরের সময় দুই রাকাতের বেশী নামাজ পড়তেন না। হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানকেও আমি এ রকম করতে দেখেছি। সহিহাইনে আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মিনা প্রান্তরে রসুল স. দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন। পরে হজরত আবু

বকর এবং হজরত ওমরও তাঁদের খেলাফতকালে এ রকম করেছেন। কিন্তু হজরত ওসমান তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে এ রকম করলেও পরে চার রাকাত নামাজ পড়েছেন।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওসমান যখন মিনায় চার রাকাত নামাজ পড়লেন তখন জনতা আপত্তি উত্থাপণ করলো। তিনি বললেন, হে সমবেত জনতা! আমি এখন মক্কায় গৃহবাসী (মুসাফির নই)। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো শহরে গৃহবাসী হয়, সে গৃহবাসীদের মতোই পুরো নামাজ পড়বে। লক্ষ্যণীয় যে, সফর অবস্থায় পুরো নামাজ পড়া যায় না। যদি যেতো তবে জনতা আপত্তি উত্থাপন করতো না এবং হজরত ওসমানও আপত্তির যথাউত্তর দিতেন না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাবের বর্ণনায় রয়েছে, সফরের নামাজ দুই রাকাত—এ কথার অর্থ দুই রাকাত নামাজ পড়লে কোনো ক্ষতি নেই। বরং পুরো সওয়াবই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, নামাজ আসলেই দুই রাকাত এবং সফরে পুরো নামাজ পড়া যাবেই না। যদি এ রকমই হতো তবে আয়াতে নির্দেশমূলক বক্তব্য থাকতো। 'সংক্ষিপ্ত করলে দোষ নেই'—এ রকম বলা হতো না। আয়াতের বক্তব্য সফরের নামাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো একক বর্ণিত হাদিস মারফু হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল না হলে পরিত্যাজ্য হবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটি তো ঐকমত্যসূত্রে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা তিনি বলেছেন, ভীতির সময়ে নামাজ পড়তে হবে এক রাকাত (অথচ কোনো নামাজই এক রাকাত হয় না)। হজরত আয়েশার বর্ণনাটিও আমলে আনা যায় না। কারণ, তাঁর বর্ণনা এবং আমলের মধ্যে সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি সফরের সময় পুরো নামাজ পড়তেন এবং তিনি যে এর অনুমতিপ্রাপ্ত সে কথাও বলেছেন। তাই 'সফরের নামাজ প্রথম অবস্থায় রাখা হয়েছে'—তাঁর এ কথার অর্থ যে দুই রাকাত নামাজ পড়তে চায়, সে দুই রাকাতই পড়তে পারবে। পুরো নামাজ পড়ার কষ্ট আর তাকে করতে হবে না।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনাটি নেতিবাচক। আর জননী আয়েশার বর্ণনাটি ইতিবাচক (হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দেখিনি এবং জননী আয়েশা বলেছেন, দেখেছি)। তাই জননী আয়েশার বর্ণনাটিকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত ইবনে ওমরের 'দুই রাকাতের অতিরিক্ত করেননি'— কথাটির প্রকৃত অর্থ অধিকাংশ সময় তিনি স. দুই রাকাতের অতিরিক্ত করেননি (কোনো কোনো সময় হয়তো করেছেন)। হজরত ইবনে ওমর শেষে এ কথাও বলেছেন যে, হজরত ওসমান তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে দুই রাকাতই পড়তেন। পরে পড়েছেন চার রাকাত। তাঁর ওই বর্ণনায় জনতার আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সফরে দুই রাকাত অথবা চার রাকাত পড়া যাবে (দুই রাকাত ওয়াজিব হবে না)। তাঁর বর্ণনার শেষে

'নিশ্চয় রসুলুল্লাহ্ স. এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ'—এই আয়াতটির মাধ্যমেও কসর ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না বরং প্রমাণিত হয় যে, এ রকম করা উত্তম। এ কথাও বলা যায় যে, হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে জনতা কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিটি ছিলো উত্তমতা পরিত্যাগ করার কারণে (ওয়াজিব তরক করার কারণে নয়)। ইমাম আবু হানিফা এ ক্ষেত্রে একটি যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, কসরের নামাজের শেষ শোফা (দুই রাকাত নামাজকে একত্রে বলে শোফা) বাদ দিলে গোনাহ্গার হতে হবে না। তাই প্রমাণিত হয় যে, প্রথম শোফা ফরজ এবং শেষ শোফা নফল। রোজার অবস্থা কিন্তু এ রকম নয়। সফরের পরিত্যক্ত রোজার পরে কাযা আদায় করা ওয়াজিব। দরিদ্রের হজের অবস্থা আবার পৃথক প্রকৃতির। দরিদ্র ব্যক্তির উপর হজ যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু সে যদি মিকাতের সীমানায় প্রবেশ করে, তবে তাঁর উপর হজ ফরজ হয়ে যাবে।

ইচ্ছা করা না করার বিষয়টি তো ওই সময় পালনীয় হয়, যখন দু'টি আমলের যে কোনো একটিকে সহজসাধ্য বলে গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। যেমন মুসাফিরের রমজানের রোজা। মুসাফিরেরা রমজানের রোজা রাখতেও পারে। ছেড়েও দিতে পারে।

জুমআ এবং জোহরের নামাজের মধ্যেও মুসাফিরেরা সহজসাধ্য আমলটিকে বেছে নিতে পারবে। জুমআর নামাজ দুই রাকাত— কিন্তু জুমআর নামাজে কতিপয় অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে, যা জোহরের নামাজে নেই। অতএব জোহর (কসর) অধিকতর অভিপ্রেত। উল্লেখ্য যে, সহজসাধ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখাই সমীচীন।

ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের জবাবঃ সফরে নামাজ সংক্ষেপ করা না করার অধিকার দেয়া হলে দুটি নির্দেশের কারণ হতো পৃথক পৃথক। সংক্ষিপ্ত আমলের জন্য কম এবং সম্পূর্ণ আমলের জন্য বেশী সওয়াবের কথা আসতো। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে নামাজের ক্বেরাতের (কোরআন পাঠের) কথা বলা যেতে পারে। সেখানে সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ— উভয় প্রকার ক্বেরাতের অনুমতি রয়েছে। সংক্ষিপ্ত ক্বেরাতের সঙ্গেও নামাজ আদায় হয়ে যাবে। এতোটুকুই ফরজের সীমা। কিন্তু কেউ ইচ্ছা করলে নফল (অতিরিক্ত) হিসেবে নামাজে পুরো কোরআন শরীফও পাঠ করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় ক্বেরাতই ক্বেরাত পদবাচ্য। ক্বেরাত হিসাবে তাদের প্রকার এক।

তবে কি বলা যাবে, মুসাফির পুরো নামাজ পড়লে বেশী সওয়াব পাবে আর সংক্ষেপ করলে সে রকম সওয়াব পাবে না (শুধু ফরজ আদায় হয়ে যাবে) — যেমন ঐকমত্যসূত্রে নামাজে দীর্ঘ ক্বেরাত দ্বারা অধিক সওয়াব লাভ হয়? জবাব এই—সুন্নতসম্মত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ক্বেরাত পাঠ করা ইমামের জন্য মাকরূহ, যদি মোক্তাদিরা তা অপছন্দ করে। একা একা নামাজ পড়লে অবশ্য অধিক ক্বেরাতই উত্তম। আর মোক্তাদিরা আগ্রহী হলে ইমাম অধিক কোরআন পাঠ

করতে পারবে এবং এতে সওয়াবও বেশী হবে। কিন্তু ঐকমত্যোৎসারিত অভিমত এই যে, সফরের সময় সম্পূর্ণ নামাজ পড়ার চেয়ে কসর পড়া উত্তম। ইমাম শাফেয়ী অবশ্য বলেছেন, সফরে পুরো নামাজ পড়াই উত্তম। কিন্তু পরে তিনি ওই অভিমত পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী 'কসর করাতে দোষ নেই'—আয়াতের এই নির্দেশনাকে ইচ্ছাধীন মনে করে ভুল করেছেন। বিষয়টি আসলে সে রকম নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে—মানুষের মনে ভয় ছিলো, হয়তো নামাজ সংক্ষেপ করলে গোনাহ্ হয়ে যেতে পারে। তাদের এই মনোভাবের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যে বক্তব্যের ধরনটি এখানে হয়েছে এ রকম। বলা হয়েছে, তোমাদের আশংকা অমূলক। প্রশান্তচিত্তে তোমরা সফরের সময়ে নামাজে কসর করো—এ রকম করাতে দোষ নেই। অন্য একটি আয়াতেও এ রকম বাকভঙ্গির মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অপনোদন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্র স্মৃতি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে তার জন্য সাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ করায় দোষ নেই।'

মূর্খতার যুগেও মানুষ সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করতো। তখন ওই দুই পাহাড়ে ছিলো দু'টি প্রতিমা। ইসলাম প্রবর্তনের পর সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ ওয়াজিব করে দেয়া হলো। এই হুকুম প্রতিপালন করতে মানুষ যেনো দ্বিধান্বিত না হয় (যেনো একে মূর্খতার যুগের নিয়ম ভেবে না বসে) —তাই বলা হলো 'লা জুনাহা' (কোনো পাপ নেই)। শাফেয়ীগণের পক্ষ থেকে অবশ্য এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আয়াতটিতো তাহলে এখানে অকারণে পরিত্যাগ করা হচ্ছে। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত পরিজ্ঞাতা।

প্রতর্ক—৩ঃ এই আয়াতের নিদের্শনা সাধারণ ও ব্যাপক। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অবৈধ সফরেও নামাজে কসর করতে হবে। অন্য ইমামত্রয় অবৈধ সফরে নামাজ কসর করাকে জায়েয বলেননি। কিন্তু তাঁদের নিকট এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, যাতে করে তাঁদের অভিমতকে আয়াতের সাধারণ নির্দেশনার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো যায়।

প্রতর্ক—৪ঃ মুসাফির যখন জনবসতি থেকে বের হয়ে যাবে তখন কসর করবে। এ ব্যাপারে চার ইমামই একমত। অবশ্য এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেক বলেছেন, জনপদ থেকে তিন মাইল দূরে যাওয়ার পর কসর করবে। এক বর্ণনায় এ রকমও এসেছে যে, হারেস বিন রবিয়া ভ্রমণের সময় তাঁর আপন শহরেই দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন। তখন সেখানে হজরত আসওয়াদ এবং হজরত আবদুল্লাহ্সহ তাঁর অনেক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, দিনে সফর শুরু করলে রাত না আসা পর্যন্ত কসর করবে না। আর রাতে সফর শুরু করলে দিন আসার আগে কসর করবে না।

ইবনে আবী শায়বা বলেছেন, হজরত আলী বসরা থেকে বহির্গমনের প্রাক্কালে জোহরে নামাজ চার রাকাত পড়েছেন। তারপর বলেছেন, আমরা যদি এই শহর

থেকে বের হয়ে যেতাম তবে দুই রাকাত পড়তাম। তিনি প্রত্যাবর্তনের সময় শহরে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত কসর পড়তেন। আর শহরে প্রবেশ করার পরেই পড়তেন পুরো নামাজ। এই বিষয়টিও ঐকমত্যাশ্রিত। বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী সফরের পথে গৃহ থেকে বের হয়ে গেলেই কসর পড়তেন। অথচ তখনও তাঁর গৃহ থাকতো দৃষ্টিসীমার মধ্যে। সফর থেকে ফিরে আসার পরও তিনি এ রকম করতেন। অর্থাৎ বাড়ী নজরে এলেও কসর করতেন তিনি। লোকেরা বলেছিলো, কুফা তো এসেই গিয়েছে। তিনি তখন বলেছিলেন, নগরাভ্যন্তরে তো এখনও প্রবেশ করিনি।

সওরীর বর্ণনা থেকে আবদুর রাজ্জাক ওফা বিন আয়াশ আসাদীর উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম— ওফা বলেন, আমরা হজরত আলীর সঙ্গে কুফা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম। নামাজের সময় হলো। হজরত আলী নামাজে কসর করলেন। সফর থেকে ফিরে আসার পরও এ রকম করলেন তিনি। অথচ তাঁর মহল্লা পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো। তবুও তিনি সেখানে কসর করলেন। আমরা নিবেদন করলাম, আমরা কি চার রাকাত পড়বো না? তিনি বললেন, না— যতোক্ষণ না গৃহে প্রবেশ করবে।

প্রতর্ক—৫ঃ সফরের সময় কেউ যদি কোনো শহরে অথবা গ্রামে চার দিন অবস্থানের নিয়ত করে, তবে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে তাকে চার রাকাত নামাজ পড়তে হবে। আর ওই চার দিনের মধ্যে শহরে প্রবেশ করার দিন এবং নিষ্ক্রান্ত হওয়ার দিন অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম আহমদ বলেছেন, যে মুসাফির বিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সময় পর্যন্ত কোথাও অবস্থান করবে, তাকে সেই স্থানে পুরো নামাজ পড়তে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো শহরে পনেরো দিন থাকার নিয়ত করলে মুসাফির আর মুসাফির বলে গণ্য হবে না। সে হয়ে যাবে মুকিম। সেখানে তখন তাকে পুরো নামাজ পড়তে হবে। কিন্তু অরণ্যে, বন্ধুগৃহে কিংবা কোনো তাঁবুতে অবস্থানকে এই নিয়মের মধ্যে ধরা যাবে না।

হানাফিদের দলিল এই—বিদায় হজের সময় ৪ঠা জিলহজ রবিবার রসুলুল্লাহ্ স. মক্কায় পৌছুলেন। ৮ই জিলহজ বৃহস্পতিবার তিনি উপস্থিত হলেন মিনায়। এই দিনকে বলা হয় তারবীয়ার দিন (আরাফায় গমনের উদ্দেশ্যে এই দিন হাজীরা তাদের উটকে প্রচুর পানি পান করান, যেনো হজ সম্পাদন পর্যন্ত তারা পিপাসার্ত না হয়— তাই এই দিনের নাম ইয়াওমে তারবীয়া বা তারবীয়ার দিন)। ৯ই জিলহজ সূর্যোদয়ের পর তিনি স. আরাফায় উপস্থিত হলেন। সারাদিন আরাফা প্রান্তরে অবস্থান করে রাতেই ফিরে এলেন মুজদালিফায়। এরপর মিনায় অবস্থান করে হজের অবশিষ্ট বিধানসমূহ পালন করলেন এবং বিদায় তাওয়াফ করে ৪ঠা জিলহজ সকালে মক্কা থেকে মদীনাভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। এভাবে মক্কায় তিনি স. অবস্থান করলেন পূর্ণ দশটি রাত। (মক্কায় চার দিন এবং বাকী সময় মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায়)। এই দশ দিনই তিনি স. নামাজে কসর করেছেন। এই ঘটনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, কোথাও চার দিন অবস্থানের নিয়ত করলে কসর করা যাবে না। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর অভিমতটি পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমদের এ সম্পর্কীয় অভিমতটি পরিত্যক্ত

হয়নি। কারণ তিনি বলেছেন, বিশ ওয়াক্ত নামাজের বেশী সময় কোথাও অবস্থান করলে তাকে পুরো নামাজ পড়তে হবে। কিন্তু রসুল স. মক্কায় মোট বিশ রাকাত নামাজই আদায় করেছেন। এর বেশী করেননি।

ইমাম আবু হানিফা সাহাবীগণের আসারকেও দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাহাবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, ভ্রমণাবস্থায় তোমরা কোনো শহরে যদি পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত করো, তবে পুরো নামাজ পড়ো। আর যদি তোমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হও যে, সেখানে কতোদিন অবস্থান করতে হবে, তবে কসর পড়তে থাকো— এভাবে যতো সময়ই অতিবাহিত হোক না কেনো।

মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী শাইবা লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর কোথাও পনেরো দিন থাকার দৃঢ় সংকল্প করলে পূর্ণ নামাজ পড়তেন। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আসারে লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আমাদের নিকট মুসা বিন মুসলিম মুজাহিদের এই বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছেন যে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মুসাফির অবস্থায় যদি তোমাদের কোথাও পনেরো দিন অবস্থান করতে হয়, তবে সেখানে তোমাদেরকে পুরো নামাজ পড়তে হবে। আর কবে সেখান থেকে যেতে হবে— সে কথা জানা না থাকলে কসর পড়তে হবে।

মাসআলাঃ কোনো শহরে প্রবেশের পর সেখানে অবস্থানের নিয়ত না থাকলেও কার্যোপলক্ষ্যে যদি আজ কাল করতে করতে কয়েকটি বৎসরও অতিবাহিত হয়ে যায়, তবুও কসর পড়তে হবে। এটাই জমহুরের অভিমত। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ীও এই অভিমত পোষণ করেন। (অন্য বর্ণনানুসারে চৌদ্দ দিন পর্যন্ত কসর করার পর পঞ্চদশ দিবসে পুরো নামাজ পড়তে হবে)। কিন্তু তাঁর অধিকতর দৃঢ় অভিমত এই যে, সতেরো দিন কসর করবে। তারপর পড়বে পুরো নামাজ। কেননা হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর সঙ্গে সফর অবস্থায় তিনি সতেরো দিন কসর পড়েছেন। আমরাও তাই সতেরো দিন পর্যন্ত কসর করি এবং সতেরো দিনের অধিক হলে পুরো নামাজ পড়ি। তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। কিন্তু এই হাদিসে সতেরো দিন কসর করার নিয়ম প্রমাণিত হয় না। হয়তো ওই সফরে রসুল স.কে সতেরো দিন অবস্থান করতে হয়েছিলো, যা ছিলো তাঁর পরিকল্পনার বাইরে। অষ্টদশ দিবসে তিনি স. পুরো নামাজ পড়েছেন—এ কথা ওই হাদিসে বলা হয়নি। এতে করে বুঝা যায়, তিনি স. যদি আরও অধিক দিবস অতিবাহিত করতেন তবুও হয়তো কসরই করতেন। কারণ, কতোদিন সেখানে অবস্থান করতে হবে সে বিষয়ে তিনি হয়তো নিশ্চিত ছিলেন না।

হজরত জাবের থেকে আহমদ ও আবু দাউদ লিখেছেন, তবুক যুদ্ধের সময় তিনি স. সেখানে বিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং কসর করেছেন। স্বসূত্রে আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন, আজারবাইজান নামক স্থানে হজরত ইবনে ওমর ছয় মাস কাটিয়েছেন এবং ছয় মাসই কসর করেছেন। বায়হাকীও বিশুদ্ধসূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

স্বসূত্রে তিনিও লিখেছেন— হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে ছয় মাস আজারবাইজানে ছিলাম। প্রচণ্ড তুষারপাত আমাদেরকে পথরুদ্ধ করেছিলো। ওই সময় আমরা নামাজে কসর করেছি। বর্ণনাটিতে এ কথাও এসেছে যে, ওই সময় হজরত ইবনে ওমরের সঙ্গী সাহাবীগণও কসর করেছিলেন।

আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন, হাসান বলেছেন, আমরা হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরার সঙ্গে কয়েক বৎসর যাবৎ পারস্য রাজ্যে ছিলাম। তিনি ওই সময় দুই নামাজকে একত্রিত করতেন না এবং দুই রাকাতের অতিরিক্ত নামাজও পড়তেন না। আবদুর রাজ্জাক এ সম্পর্কিত আরও একটি বর্ণনা এনেছেন হজরত আনাস বিন মালেক থেকে— যেখানে বলা হয়েছে, আমরা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের সঙ্গে শাম দেশে দুই মাস ছিলাম। সেখানে আমরা দুই রাকাত করে নামাজ পড়েছি।

মাসআলাঃ যে মাঝি বা মাল্লা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও আসবাবপত্রসহ জাহাজে সফর করতে থাকে এবং যে শ্রমিক সারাক্ষণ সফরে থাকে, তাদেরকে কসর করতে হবে। ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য তিন ইমাম এ কথা বলেছেন। কেবল ইমাম আহমদই বলেছেন, তাদেরকে কসর করতে হবে না।

মাসআলাঃ যারা কোনো স্থানের স্থায়ী অধিবাসী নয় (প্রান্তরে তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করে)— অনেকেই তাদেরকে গৃহবাসী আখ্যায়িত করতে চাননি। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, তারা মুকিম (গৃহবাসী)। কেননা এ রকম স্থানান্তর দ্বারা গৃহবাসের বিধানটি বাতিল হতে পারে না।

মাসআলাঃ জমহুর বলেন, মুসাফির মুকিম ইমামের নামাজের কোনো অংশে শামিল হলে তাকে পুরো চার রাকাতই পড়তে হবে। ইমাম মালেক বলেছেন, সে যদি এক রাকাত পায় তবে তাকে পুরো চার রাকাতই পড়তে হবে। অন্যথায় পড়তে হবে না। ইসাহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্ বলেছেন, মুকিম ইমামের অনুসারী হলেও মুসাফির কসরই পড়বে। হজরত মুসা বিন সালমা থেকে ইমাম আহমদ বলেছেন, আমরা হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে মক্কায় ছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমরা তো আপনাদের সঙ্গে নামাজ পড়লে পুরো চার রাকাতই পড়ি। আর আপনাদের সঙ্গে না পড়লে পড়ি দুই রাকাত। তিনি বললেন, এটাই ছিলো রসুল স. এর রীতি।

মাসআলাঃ গৃহবাসের সময় নামাজ কাযা হলে সেই কাযা নামাজ সফরে আদায় করতে হবে পুরোপুরি। ইবনে মুনজির বলেছেন, এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে আমার জানা নাই। তবে এক বর্ণনায় হাসান ও মাজানীর বক্তব্যরূপে এসেছে, সফরে সেই নামাজ কসর রূপেই পড়তে হবে। সফরে কোনো নামাজ কাযা হলে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের নিকট গৃহবাসের সময় সেই নামাজ পড়তে হবে কসররূপেই। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, আদায় করতে হবে পুরো নামাজ। আর এটাই ইমাম শাফেয়ীর বিশুদ্ধ অভিমত।

মাসআলাঃ ইমাম মুসাফির এবং মোক্তাদী মুকিম হলে ইমাম দুই রাকাত পড়বে এবং মুকিম তার নামাজ পুরো করবে। ঐকমত্যাগত সিদ্ধান্ত এটাই।

হজরত ইমরান বিন হোসাইনের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে একই বাহনে আরোহণ করে জেহাদ করেছি। মক্কাবিজয়ের সময়েও আমি তাঁর স. এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি স. মক্কায় তখন আট রাত অতিবাহিত করেছিলেন। ওই সময় আমরা দুই রাকাত পড়তে থাকি। এ রকম করতে দেখে রসুল স. বলেছিলেন, হে আহলে মক্কা, তোমরা চার রাকাত পড়ো। আর আমরা তো মুসাফির। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধসূত্রে।

'যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের জন্য ফেত্না সৃষ্টি করবে'—এ কথার অর্থ, যদি তোমাদের ধারণা হয় নামাজ পাঠের সময় অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হবে, অতর্কিত আক্রমণ করে তোমাদের মাল-মাত্তা লুণ্ঠন করবে। আয়াতের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, কাফেরদের আক্রমণের আশংকাই নামাজ সংক্ষেপ হওয়ার কারণ। খারেজীরা তাই বলে, আক্রমণের ভয় না থাকলে নামাজ সংক্ষেপ করা যাবে না। কিন্তু আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, সে সময় শত্রুর আক্রমণের আশংকা লেগেই ছিলো। অধিকাংশ সফরেই এ রকম আক্রমণের আশংকা ছিলো। তাই আয়াতে এ রকম করে বলা হয়েছে। নতুবা আক্রমণের আশংকা নামাজ সংক্ষেপ হওয়ার প্রধান কারণ নয়। সফরই প্রধান কারণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসীকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য কোরো না, যদি তারা পবিত্রতা বজায় রাখতে চায়।' উল্লেখ্য যে, এখানে পবিত্রতা বজায় রাখতে চাওয়ার কথা বলা হয়েছে অধিকাংশ ক্রীতদাসীর দিকে লক্ষ্য করে। ক্রীতদাসী যদি মুসলমান হয় তবে তো সে ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট হবেই না, পবিত্রতা বজায় রাখার প্রতিই তার আগ্রহ থাকবে। অতএব পবিত্রতা রক্ষা করতে না চাইলে ক্রীতদাসীকে কি ব্যভিচারে বাধ্য করা যাবে?

নিরাপদ সফরে নামাজ সংক্ষেপ করা সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। হাদিসগুলো একটি অপরটির পরিপূরক। যেমন ইতোপূর্বে ইয়া'লী বিন উমাইয়া কর্তৃক বর্ণিত হজরত ওমরের হাদিসে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. মক্কা ও মদীনার মধ্যে নিরাপদ সফরে দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ভয় অবশিষ্ট ছিলো না।

হজরত হারেসা বিন ওয়াহাব খাজায়ী বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে মিনায় দুই রাকাত নামাজ পড়িয়েছেন। ওই সময় আমরা ছিলাম পূর্ণ নিরাপদ। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'ইন খিফতুম' যদি তোমরা শংকাগ্রস্ত হও এই শব্দটির সম্পর্ক ইতোপূর্বে বর্ণিত সালাতুল খওফ (ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ) এর সঙ্গে যদিও ওই আয়াতটি বর্ণনার দিক থেকে দূরবর্তী, কিন্তু তা অর্থের দিক থেকে নিকটে। ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজের প্রধান কারণ শত্রুর ভয়—এ কথা ঐকমত্যাগত এবং ইতোপূর্বে আর কোথাও 'শত্রুর ভয়' শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। বাগবী বলেছেন, হজরত আবু আইয়ুব আনসারী উল্লেখ করেন, এই আয়াতটি প্রথমে 'ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন, আনতাকসুরু মিনাস্সলাত'—এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক বৎসর পর সাহাবীগণ যখন ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন অবতীর্ণ হলো 'ইন খিফতুম আঁইইয়াফতিনা কুমুল্লাজিনা কাফারু ইন্নাল কাফিরিনা কানু লাকুম আদুওয়াম মুবিনা'—এর সঙ্গে পরবর্তী আয়াত (১০২) 'ওয়া ইজা কুনতা ফিহিম' (এবং হে নবী, আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন)। বাগবী বলেছেন, কোরআন মজীদে এ রকম আয়াত রয়েছে অনেক। আসল সংবাদটি দেয়া হয়েছে প্রথমে। পরে তা অন্য সংবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে— যা প্রকৃত তত্ত্ব থেকে পৃথক প্রকৃতির। যেমন সুরা ইউসুফে বলা হয়েছে, 'এখন তো সত্য প্রকাশ হয়ে পড়লো, আমি তার নিকট আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা করেছিলাম এবং নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদী। ইউসুফ বললেন, এ সকল আয়োজন এ জন্যে যেনো আজিজ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ কথা অবহিত হোন যে, আমি তাঁর কুলমর্যাদায় হস্তক্ষেপ করিনি।' এখানে প্রথমে আজিজের পত্নীর উক্তি এবং পরে হজরত ইউসুফের বক্তব্য রয়েছে।

ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, বনী নাজ্জারের কতিপয় লোক রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলো, আমরা দেশবিদেশে সফর করি। তাই জানতে চাই সফরে আমরা কিভাবে নামাজ পড়বো? তখন অবতীর্ণ হলো 'ওয়া ইজা দ্বরবতুম ফিল আরদ্বি ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন আংতাক্বসারু মিনাস্‌সলাত।' এর এক বৎসর পর রসুলুল্লাহ্ স. এক জেহাদে গমন করলেন। সেখানে জোহরের নামাজ পড়লেন তিনি। মুশরিকেরা বললো, মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীদেরকে পিছনদিক থেকে আক্রমণ করা যায়, তবে তোমরা আক্রমণ করছো না কেনো? তাদের একজন বললো, পরবর্তী নামাজের সময় হোক (তখন আক্রমণ করবো)। ঠিক তখনই জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে 'ইনখিফ্‌তুম' থেকে এই আয়াতের শেষাংশ সহ পরবর্তী আয়াতের শেষাংশ (১০২) পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। আমি বলি, এই শানে নুজুল থেকে প্রতীয়মান হয়— 'ইনখিফ্‌তুম' (শত্রুর ভয়) সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে, কাফেরদের পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা করলে তোমরা নামাজের সময়েও সতর্কতা অবলম্বন করবে— জেহাদ পরিত্যাগ করবে না।

এই আয়াতের শেষ বক্তব্য হচ্ছে—'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' ইমাম আহমদ, বায়হাকী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু আয়াশ জরক্বী বলেছেন, আমি আসফান সফরে রসুল স. এর সঙ্গে একই বাহনের আরোহী ছিলাম। আমাদের সম্মুখে ছিলো মুশরিক বাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিলো খালেদ বিন ওলিদ। রসুল স. আমাদের নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। মুশরিকেরা বলতে শুরু করলো, এইতো সুযোগ। আমরা তাদেরকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করার সুযোগ পাবো। সামনে রয়েছে আরেকটি নামাজ। এই নামাজ তাদের নিকট তাদের জীবন ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক প্রিয় (তাই নামাজ পাঠের সময় আমরা আক্রমণ করবো)। তখন হজরত জিবরাইল জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে পরবর্তী আয়াত (১০২) নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। তাই নামাজের সময় রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তোমরা অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় নামাজে দণ্ডায়মান হও। আমরা তাঁর আজ্ঞা যথাপ্রতিপালন করলাম। তাঁর পশ্চাতে দুই কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা। তিনি রুকু করলেন। আমরাও রুকু

করলাম। তিনি মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরাও করলাম। কিন্তু তাঁর সেজদার সঙ্গে সেজদা করলেন প্রথম কাতারের মোক্তাদীরা। দ্বিতীয় কাতারের মোক্তাদীরা দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরের রাকাতে রসুল স. এর সঙ্গে রুকুতে শামিল হলেন সকলেই। কিন্তু সেজদায় শামিল হলেন কেবল দ্বিতীয় কাতারের অনুসারীরা। তখন প্রথম কাতার এবং দ্বিতীয় কাতারের অনুসারীরা তাঁদের স্থান বদল করেছিলেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় কাতারের নামাজীরা প্রথম কাতারের নামাজীদের স্থানে গিয়ে সেজদায় শামিল হয়েছিলেন। আর তখন প্রথম কাতারের নামাজীরা দ্বিতীয় কাতারের স্থানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন শত্রুদের গতিবিধি। রসুল স. এর নামাজ দুই রাকাত হওয়ায় তিনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করেছিলেন। আর মোক্তাদীরা তাদের বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত তাঁর স. সালামের পর আদায় করে নিয়েছিলেন। এভাবে ভীতিপ্রদ অবস্থায় রসুল স. নামাজ পড়েছিলেন দুইবার— একবার আসফানে, আরেকবার বনী সুলাইম গোত্রের ভূখণ্ডে। হজরত জাবের থেকে মুসলিম ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে রসুল স. এর নামাজের এ রকমই বিবরণ দিয়েছেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০২

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَ
لْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ
أَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى
مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضٰىٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ
إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ○

❒ এবং তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে ও তাহাদের সঙ্গে সালাত কায়েম করিবে তখন তাহাদের একদল তোমার সহিত যেন দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাহাদের সিজ্‌দা করা হইলে তাহারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যাহারা সালাতে শরীক হয় নাই তাহারা তোমার সহিত যেন সালাতে শরীক হয় এবং তাহারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও

আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে। আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

আয়াতের বর্ণনাদৃষ্টে বুঝা যায়— যুদ্ধপ্রান্তরে মুসলমান সেনাদলের সঙ্গে যদি রসুলপাক স. অবস্থান করেন, তবে ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ বা সালাতে খওফ পড়তে হবে। পূর্ববর্তী আয়াতের শেষাংশের 'ইনখিফ্তুম' (শত্রুর ভয়) এর সঙ্গে এই আয়াতের সংযোগ রয়েছে। শত্রুর ভয় না থাকলে এবং সেনাদলের সঙ্গে রসুলপাক স. উপস্থিত না থাকলে ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ জায়েয নয়— আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য এ রকমই। তাই ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ রসুল স. এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো। অন্যদের জন্য এই নামাজ জায়েয নয়। কিন্তু জমহুরের বক্তব্য এই যে, রসুল স এর জামানার পরেও এই নামাজ পড়া হয়েছে। পরবর্তী খলিফাগণ এরূপ করেছেন, কারণ তাঁরা রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত। সকল সাধারণ বিধান রসুল স. কে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়। সুতরাং সম্বোধন রসুল স. কে করা হলেও সাধারণভাবে বিধানটি সকল উম্মতের জন্য প্রযোজ্য। রসুল স. এর পরে সকল খলিফাই সালাতে খওফ্ পাঠ করেছেন। আর তাঁরা এ ব্যাপারে কেউ কারোর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেননি। অতএব, বিষয়টি ঐকমত্যসঞ্জাত।

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, কাবুলের যুদ্ধে হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা তার সঙ্গী সৈন্যদেরকে নিয়ে সালাতে খওফ্ পাঠ করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, সিফ্ফিন যুদ্ধের সময় হজরত আলীও তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে এই নামাজ পড়েছিলেন। রাফেঈ উল্লেখ করেছেন, লাইলাতুল হারীরে (জঙ্গে জামালে) হজরত আলী মাগরিবের নামাজ সালাতে খওফের নিয়মে পাঠ করেছেন।

ইমাম জাফরের বর্ণনাসূত্রে ইমাম জয়নাল আবেদীনের মাধ্যমে ইমাম হোসাইন থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী লাইলাতুল হারীরে মাগরিবের নামাজ সালাতে খওফের রীতি অনুযায়ী পাঠ করেছেন। আবুল আলিয়া থেকে বায়হাকী আরো বর্ণনা করেছেন, ইসপাহান যুদ্ধের সময় ভীতিপ্রদ নামাজ পড়েছেন। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বায়হাকীর এ বর্ণনাটিও এসেছে যে, অগ্নিপূজকদের সঙ্গে যুদ্ধে তিবরিস্তানে সেনাপতি হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ভীতিকালীন অবস্থার নামাজ পড়েছেন। ওই সময় তাঁর সঙ্গে হজরত হাসান বিন আলী, হজরত হোজায়ফা বিন ইয়ামান এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসও ছিলেন। আবু দাউদ ও নাসাঈ সা'লাবাহ্ বিন খাহ্বামের পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন—আমরা সাঈদ বিন আসের সঙ্গে ছিলাম, তিনি এক দল লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছেন যিনি রসুল স. এর

সঙ্গে সালাতুল খওফে অংশ গ্রহণ করেছেন? হজরত হোজাইফা তখন বলেছিলেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে সালাতুল খওফ পাঠ করেছি। তিনি ওই নামাজে এক দলকে নিয়ে প্রথম রাকাত এবং অপর দলকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত পাঠ করেছেন।

আয়াতে এরপর সালাতে খওফ পাঠের নিয়ম বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নামাজের সময় সেনাবাহিনীকে দু'টি দলে বিভক্ত করতে হবে। এক দল প্রথমে রসুল স. এর সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়বে, তখন অপর দল থাকবে সশস্ত্র ও সদাসতর্ক। পরের রাকাতে রসুল স. এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে অপর দলটি যারা প্রথম রাকাতের সময় পাহারারত ছিলো।

ইমাম মালেক বলেছেন, ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজে সশস্ত্র থাকা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন, কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, ভীতির নামাজে অস্ত্রসজ্জিত থাকা মোস্তাহাব।

রসুল স. যখন তাঁর দুই রাকাত নামাজ শেষ করবেন, তখন সেনাবাহিনীর এক রাকাত করে নামাজ শেষ হবে। কারণ, একদল তাঁর সঙ্গে প্রথম রাকাতে এবং অপর দল দ্বিতীয় রাকাতে শরীক থাকবে অর্থাৎ প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে সশস্ত্র প্রহরায় রেখে প্রথম রাকাত পড়বে। তারপর চলে যাবে দ্বিতীয় দলের অবস্থানে। দ্বিতীয় দল প্রথম দলের অবস্থানে এসে রসুল স. এর সঙ্গে পাঠ করবে দ্বিতীয় রাকাত, প্রথম দল তখন থাকবে পাহারায়। এভাবে রসুল স. এর দুই রাকাত নামাজ শেষ হলে প্রথম ও দ্বিতীয় দল তাদের বাদ পড়ে যাওয়া এক রাকাত নামাজ আদায় করে নিবে।

এরপর আয়াতে বলা হয়েছে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক থাকো, আর ওই অসতর্ক মুহূর্তে তারা তোমাদের উপর একযোগে আক্রমণ করতে চায়।

রসুল স. এর ভীতির নামাজের পদ্ধতি ছিলো কয়েকটি ঃ

১. আবু আয়াশ জারক্বী এবং হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বর্ণিত পদ্ধতিটি আসফানের যুদ্ধ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। ওই সময় শত্রুদের অবস্থান ছিলো মুসলমান বাহিনী এবং নিকটবর্তী জনপদের মাঝামাঝি।

২. বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে 'জাতুর রেকা' নামক স্থানে পৌঁছুলাম। এক বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. তখন এক দলকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন, তারপর তাঁরা পেছনে চলে গেলেন, পেছনে পাহারারত দলটি এসে নামাজে যোগ দিলেন। তাদেরকে নিয়ে রসুল স. আরো দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। এভাবে রসুল স. এর চার রাকাত নামাজ হলো এবং পিছনের দল দুইটির নামাজ হলো দুই রাকাত করে। হাদিসটির দু' রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি এই—রসুল স. এক সালামে চার রাকাত নামাজ সমাপণ করেছেন। আর মুজাহিদ বাহিনী করেছে দুই রাকাত করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রসুল স. এক দলকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে

সালাম ফিরিয়েছেন, তারপর অপর দলকে নিয়ে পুনরায় দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন।

হজরত জাবেরের বর্ণনার ব্যাখ্যায় এ রকমও এসেছে যে, বাতনে নাখলে রসুল স. জোহরের নামাজ ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজরূপে পড়িয়েছেন এভাবে—এক দলকে নিয়ে দুই রাকাত এবং অপর দলকে নিয়ে দুই রাকাত। ওই নামাজে তিনি দুই রাকাত পর পর সালাম ফিরিয়েছেন। শাফেয়ীর নিয়মে এ রকম বর্ণনা করেছেন বাগবী। মূল বর্ণনাকারীর নাম না জানলেও শাফেয়ী বর্ণনাটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন, একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আমাকে এ কথা বলেছেন, আবু আলিয়া অথবা অন্য কেউ।

দারা কুতনীর নিয়মে আম্বাসা— হাসান— হজরত জাবের— এই সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে জাওজী। ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, আম্বাসা অপদার্থ। নাসাঈ বলেছেন, পরিত্যক্ত এবং আবু হাকিম বলেছেন, সে হাদিস প্রস্তুতকারী।

হজরত আবু বকরা থেকে এই হাদিসটিই বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং দারা কুতনী। আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় বলা হয়েছে ওই নামাজ ছিলো জোহরের নামাজ। দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে মাগরিবের নামাজ। ইবনে কাত্তান বলেছেন, বর্ণনাটি মুয়াল্লাল। কেননা, হজরত আবু বকরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সালাতুল খওফ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন বর্ণনাটি মুয়াল্লাল নয় বরং মুরসাল, যা গ্রহণযোগ্য।

৩. হজরত সালেহ বিন খাওয়াত থেকে শাইখাইন এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যিনি জাতুর রেকা'র দিনে রসুল স. এর সালাতুল খওফে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভিন্নসূত্রে হজরত সালেহ বিন খাওয়াত থেকে বর্ণনা এনেছেন সহল বিন আবি হাসামাহ। ওই বর্ণনায় রয়েছে, একটি দল রসুল স. এর পশ্চাতে সারিবদ্ধ হলো। অপর দলটি দাঁড়িয়ে রইলো শত্রুর সম্মুখে। প্রথম দলকে নিয়ে রসুল স. পড়লেন এক রাকাত। তারপর রসুল স. স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন, আর মোক্তাদিরা পূর্ণ করলো তাদের দ্বিতীয় রাকাত। তারপর তারা শত্রুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের অবস্থানে এলো দ্বিতীয় দলটি তখন তাদেরকে নিয়ে রসুল স. এর দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে বসে রইলেন। আর দ্বিতীয় দলটি পূর্ণ করলো তাদের দ্বিতীয় রাকাত। সবশেষে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় দলকে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলেন।

৪. হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দাহ্নান ও আসফানের মধ্যবর্তীস্থানে শিবির স্থাপন করলেন। সামনে ছিলো মুশরিক বাহিনী। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, মুসলমানদের কাছে আসরের নামাজ তাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততিদের চেয়ে অধিক প্রিয়। সুতরাং তারা যখন আসরের নামাজ পাঠ করবে, তখন আমরা পূর্ণশক্তি নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করবো। হজরত জিবরাইল তাদের এই আলোচনার

সংবাদ রসুল পাক স. কে জানিয়ে দিলেন এবং বললেন, নামাজ পাঠ করতে হবে এভাবে— সেনাবাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে নিয়ে আপনি এক রাকাত নামাজ পড়বেন। তখন অপর ভাগটি সশস্ত্র প্রহরায় থাকবে। এক রাকাত শেষ করে তারা অপর দলটির স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। অপর দলটি তখন আপনার পশ্চাতে এসে আপনার সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়বে। এভাবে আপনার নামাজ হবে দুই রাকাত এবং সেনা দলের নামাজ হবে এক রাকাত। বাগবী লিখেছেন, হজরত হুজাইফা থেকে রসুল স. এর ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজের এই নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। এই নিয়মে তিনি স. দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন এবং তাঁর সঙ্গী সৈন্যরা পড়েছেন এক রাকাত করে। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত যায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় রসুল স. নামাজ পড়েছেন দুই রাকাত এবং তাঁর সহচরবৃন্দ পড়েছেন এক রাকাত। আলেমগণ ওই নামাজকে অত্যন্ত ভীতির নামাজ বলেছেন এবং ব্যাখ্যাস্বরূপ মন্তব্য করেছেন, ওই রকম অবস্থায় এক রাকাত নামাজই ফরজ।

৫. সালেম বিন ওমরের মাধ্যমে হজরত ওমর থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন— হজরত ওমর বলেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে নজদের দিকে পরিচালিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। শত্রুদের সম্মুখে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। নামাজের সময় হলো, রসুল স. আমাদের এক দলকে নিয়ে নামাজ শুরু করলেন, অপর দল তখন সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি স. এক রুকু ও দুই সেজদা করে এক রাকাত নামাজ শেষ করলেন। প্রথম দলটি এক রাকাত নামাজ শেষ করেই দ্বিতীয় দলের অবস্থানে সশস্ত্র প্রহরায় দাঁড়িয়ে গেলো। দ্বিতীয় দলটি এসে রসুল স. এর পশ্চাতে দাঁড়ালো, তিনি স. এক রুকু ও দুই সেজদা করে তাঁর স. দ্বিতীয় রাকাত শেষ করে সালাম ফিরালেন, তারপর মুক্তাদিরা তাদের বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত এক রুকু ও দুই সেজদাসহ শেষ করলেন। হজরত নাফেও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার অতিরিক্ত কথাগুলো এ রকম— যদি এর চেয়েও অধিক ভয়সংকুল পরিস্থিতি দেখা দেয়, তবে চলমান অবস্থায়, বাহনে আরোহী অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে, অথবা কেবলামুখী না হয়েও নামাজ পড়া যাবে। হজরত নাফে আরো বলেছেন, রসুল স. না বললে হজরত ওমর নিজে থেকে এ রকম বলতেন না।

ইমাম আবু হানিফা ভীতিকালিন অবস্থার নামাজে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে শেষোক্ত পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন। অন্য নিয়মগুলোকে তিনি নাজায়েয বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, দ্বিতীয় দল ইমামের সালাম ফিরানোর পর শত্রুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন প্রথম দল তাদের বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত পূর্ণ করবে। তারপর দ্বিতীয় দল আদায় করবে তাদের বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আসারে ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক হজরত ইবনে আব্বাসের এরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এ ধরনের বর্ণনাকে হাদিসে মাওকুফ বলে যা হাদিসে মারফুর মতোই।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি (যে পদ্ধতিতে রসুল স. এর চার রাকাত এবং তাঁর অনুসারীদের দুই রাকাত নামাজ হয়) এ কারণে গ্রহণীয় নয় যে, এতে করে নফল নামাজ পাঠকারীর পিছনে ফরজ নামাজ পাঠকারীর এক্তেদা হয় (রসুল স. এর পরের দুই রাকাত নামাজ নফল, ফরজ নয়)। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নফল নামাজ পাঠকারীর পিছনে ফরজ নামাজ হয় না।

তৃতীয় পদ্ধতিটিও গ্রহণীয় নয়। কারণ, ওই পদ্ধতিতে ইমামের পূর্বে মোক্তাদীদেরকে রুকু ও সেজদা করতে হয়, শরিয়তে এ রকম বিধানের অবকাশ নেই।

চতুর্থ পদ্ধতিটি ঐকমত্যসূত্রে পরিত্যক্ত। কারণ, এই নিয়মে মোক্তাদিদের নামাজ হয় মাত্র এক রাকাত। আর নামাজ কখনো এক রাকাত হয় না। ভয় কখনো নামাজের রাকাতের সংখ্যা কমাতে পারে না।

প্রথম নিয়মটি (যেখানে নিকটবর্তী জনপদ এবং মুসলমান বাহিনীর মধ্যে শক্রসেনারা অন্তরায় হয়েছিলো) কোরআনের বক্তব্যের প্রতিকূল। কারণ, এই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের একদল তোমার সঙ্গে যেনো দাঁড়ায়।' আরও বলা হয়েছে, 'আর অপর এক দল যারা সালাতে শরীক হয় নাই তারা তোমার সঙ্গে যেনো সালাতে শরীক হয়।' অথচ প্রথম নিয়মে দুই দল দুই কাতার হয়ে একই সঙ্গে নামাজে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। নিয়মটি তাই কোরআনের বক্তব্যবিরোধী।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, ভীতির নামাজের সকল নিয়মই সঠিক (মতানৈক্য হয়েছে কেবল অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য প্রদান সম্পর্কে)। ইমাম আহমদ আবার এ কথাও বলেছেন যে, আমার জানা মতে এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে একটি হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো হাদিস বিশুদ্ধ নয়। ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে চারটি পদ্ধতিকে অগ্রগণ্য ভেবেছেন। ইমাম আহমদ অগ্রগণ্য মনে করেছেন তিনটিকে। যদি শত্রুর অবস্থান কেবলার দিকে হয়, তবে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ প্রথমোক্ত পদ্ধতিকে অগ্রগণ্য বলে মনে করেছেন। যদি অন্যদিকে হয় তবে তাঁরা অগ্রাধিকার দিয়েছেন দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে— যে পদ্ধতিতে রসুল স. নামাজ পড়েছিলেন বাতনে নাখলায়। এ রকম অবস্থায় তৃতীয় পদ্ধতিটিকেও তাঁরা প্রতিপালনীয় বলে মনে করেন— যে পদ্ধতিতে রসুল স. নামাজ পড়েছিলেন জাতুর রেকা নামক স্থানে। ইমাম আহমদের মতে এ রকম অবস্থায় তৃতীয় পদ্ধতিটিই অধিক অগ্রগণ্য। আলেমগণ বলেছেন, এই পদ্ধতিটিই কোরআন মজীদের বক্তব্যের অধিক অনুকূল এবং এই নিয়মের মধ্যে রয়েছে অধিকতর সতর্কতা ও নিরাপত্তা।

কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, প্রথম দল ইমামের সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়ে সশস্ত্র প্রহরারত দ্বিতীয় দলের অবস্থানে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল এসে ইমামের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে এক রাকাত নামাজ পড়বে। উভয় দলই পরে তাঁদের এক রাকাত নামাজ পূর্ণ করবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এই যাওয়া আসার

মধ্যে নামাজবহির্ভূত কোনো কাজ (আমলে কাসির) যেনো না হয়। তবে জরুরী বা বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এবং অত্যন্ত ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হলে পদবিক্ষেপরত অবস্থায় যে কোনো দিকে মুখ করে নামাজ পড়া যাবে। এ রকম অপারগ অবস্থায় কেবলামুখী না হলেও এবং নামাজবহির্ভূত কাজ করতে হলেও নামাজ হয়ে যাবে। রুকু ও সেজদা করার সুযোগ না পেলে ইশারায় রুকু সেজদা আদায় করতে হবে। রুকুর জন্য করতে হবে সাধারণ ইশারা এবং সেজদা করতে হবে ইশারা অপেক্ষা একটু বেশী মাথা ঝুঁকিয়ে। ইমাম আবু হানিফার মতে অতি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দু'টি নিয়মে নামাজ পড়া যাবে। দণ্ডায়মান অবস্থায় অথবা বাহনে আরোহী হয়ে। আর রুকু ও সেজদা করতে হবে ইশারায় (যেমন ইশারার কথা বলা হলো একটু আগে)। কিন্তু পদাতিক অবস্থায় যুদ্ধ চালানোর সময় নামাজ পড়া যাবে না। পূর্বের আয়াতে আমলে কাসির সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্যঃ হাফেজ ইবনে হাজার রসুল স. এর ভীতির নামাজের চৌদ্দটি নিয়ম লিখেছেন। ইবনে হাজমের জুযে মোফরাদ পুস্তকেও সেগুলোর বর্ণনা রয়েছে। কয়েকটি বর্ণনা মুসলিমেও রয়েছে। তবে বেশীর ভাগ বর্ণনা রয়েছে সুনানে আবু দাউদে। হাকেম লিখেছেন আটটি নিয়ম এবং ইবনে হাব্বান লিখেছেন নয়টি।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক ব্যতীত জমহুরের মতে লোকালয়েও সালাতে খওফ সিদ্ধ। আসর নামাজে সালাতে খওফ জায়েয। প্রতিটি দল দু'রাকাত করে পড়বে। আর মাগরিবের নামাজের সময় প্রথম দল দু'রাকাত এবং দ্বিতীয় দল পড়বে এক রাকাত।

'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ কামনা করে যেনো তোমরা তোমাদের অস্ত্রসস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও। যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে।'— এ কথার মাধ্যমে নামাজে সশস্ত্র থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সশস্ত্র ও সতর্ক না থাকলে অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ স. বনী মুহারিব ও বনী আনমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। পথিমধ্যে সেনাদলসহ একস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন তিনি স.। শত্রুপক্ষের কাউকে সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। তাই রসুল স. যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করলেন এবং অস্ত্র রেখে দিলেন। তাঁর দেখাদেখি সকলেই এ রকম করলেন। এরপর তিনি স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে নিম্নভূমির দিকে চলে গেলেন। সেনাব্যাহিনী রয়ে গেলো পাহাড়ের আড়ালে। তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি একটি বৃক্ষের নিচে উপবেশন করলেন। হঠাৎ সেখানে হাজির হলো মুজারিব গোত্রের গুআইরাস বিন হারেস। সে বললো, এখন যদি আমি তাকে হত্যা করতে না পারি তবে আল্লাহ যেনো আমাকে হত্যা করে। এ কথা বলে সে আরো এগিয়ে এলো এবং রসুল স.কে লক্ষ্য করে বললো, মোহাম্মদ!

এখন তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে? রসুল স. নির্বিকারচিত্তে বললেন, আল্লাহ্। তারপর দোয়া করলেন— হে আমার আল্লাহ্! তুমি যেভাবে ইচ্ছা আমাকে এই দুরাচারের হাত থেকে বাঁচাও। গুআইরাস তলোয়ার উত্তোলন করলো। অকস্মাৎ তার স্কন্ধদেশের মধ্যস্থলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলো সে। তারপর প্রচণ্ড ব্যথার কারণে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো। তলোয়ার খসে পড়লো তার হাত থেকে। রসুল স. তৎক্ষণাৎ তলোয়ার উঠিয়ে নিয়ে বললেন, এবার তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে? সে বললো, কেউ না। তিনি স. বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর মোহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও রসুল? যদি এরূপ সাক্ষ্য দিতে সম্মত হও, তবে আমি তোমার তলোয়ার তোমাকেই দিয়ে দেবো। সে বললো, না। তবে আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তোমার বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করবো না এবং তোমার কোনো শত্রুকে সাহায্যও করবো না। রসুল স. তলোয়ারটি ফেরত দিয়ে দিলেন। গুআইরাস বললো, আল্লাহ্র কসম তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তিনি স. বললেন, নিশ্চয় আমি এ রকম উত্তম আচরণ প্রদর্শনের অধিকারী। গুআইরাস তার দলের লোকদের নিকট উপস্থিত হলো। তাকে দেখে তার সাথীরা বললো, কী হয়েছে তোমার? তোমার উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিলো কে? সে বললো, আমি তো তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তলোয়ার উত্তোলন করেছিলাম। কিন্তু কে যেনো আমার ঘাড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সৃষ্টি করে দিলো। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম।

এরপর অবতীর্ণ হলো পরবর্তী বাক্যটি 'যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক, তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিও।'—এখানে বৃষ্টিপাত, অসুস্থতা, ইত্যাদির কারণে যুদ্ধসজ্জা খুলে ফেলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, ইতোপূর্বে প্রদত্ত সশস্ত্র থাকার নির্দেশটি ছিলো ওয়াজিব। ঐচ্ছিক নয়। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী এ রকম বলেছেন।

বৃষ্টির কারণে চামড়া নির্মিত জেরা (বর্ম) ভিজে ভারী হয়ে গেলে এবং অসুস্থতার কারণে ভারী অস্ত্র উত্তোলন কষ্টদায়ক মনে হলে অস্ত্রসজ্জা পরিত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হলেও পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে।' এ কথার অর্থ এমন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করবে, অথবা এমন ব্যূহ রচনা করে তার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করবে, যাতে করে শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ না পায়। আত্মরক্ষা করা ওয়াজিব। অনর্থক জীবন দান বৈধ নয়। জীবন, সম্পদ এবং আল্লাহ্র কলেমা সুরক্ষা করতে হবে। আল্লাহ্পাক তাঁর নবী ও রসুলগণকে এই মর্মে নির্দেশনাও দিয়েছেন যে, শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময়েও নিরাপদ এলাকার বাইরে যাওয়া যাবে না।

আয়াতের শেষ বাক্যটিতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক কাফেরদের জন্য পৃথিবীতে নির্ধারণ করেছেন হত্যা, বন্দীত্ব এবং আখেরাতে দোজখ। পূর্ণ আয়াতটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এখানে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে—অবিশ্বাসীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বাসীদের বিজয় ও সাফল্য। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার বিধান এই যে, আল্লাহ্পাক প্রদত্ত বিজয় ও সফলতা লাভ করতে হলে প্রচেষ্টা এবং সতর্কতাও প্রয়োজন। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে জারী রাখতে হবে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও সতর্কতা। আর এই সতর্ক অধ্যবসায় হতে হবে উপকরণের মাধ্যমে (যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে)।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ফিরে এসে গুআইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটি জানালেন এবং পাঠ করলেন, 'ইনকানা বিকুম আযাম্ মিম মাতারিন আও কুনতুম মারদ্বা' (যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাকো)। এ বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ সম্পর্কে। তিনি আহত হয়েছিলেন। আর এ কারণে তাঁকে যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০৩

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

❒ যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে; যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে, নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র জিকিরে রত থাকা। মাতা আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. সব সময় আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকতেন। আবু দাউদ। উল্লেখ্য যে, কোরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত সার্বক্ষণিক জিকিরের উদ্দেশ্য কলবী জিকির। মুখে সর্বক্ষণ জিকির করাতো সম্ভবই নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে— তোমরা যখন সালাতুল খওফ থেকে অবসর গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ্র জিকির করবে। অর্থাৎ তখন সুস্থাবস্থায় থাকলে নামাজ দাঁড়িয়ে পড়বে। পীড়িত বা আহত অবস্থায় থাকলে অথবা দাঁড়াতে অপারগ হলে নামাজ পাঠ করবে বসে কিংবা শুয়ে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, ভয়সংকুল অবস্থায় নামাজের সময় হলে ক্ষমতা থাকলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। অন্যথায় পড়বে বসে। তাও যদি না পারো তবে নামাজ আদায় করবে শায়িত অবস্থায়।

'যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে'—এ কথার অর্থ ভয়াবহ পরিস্থিতি দূর হয়ে গেলে নামাজের সকল রোকন ও শর্তসহ পরিপূর্ণ নামাজ আদায় করবে। কারণ, নিরাপত্তার সময় এবং শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকার সময় এক নয়। যে সংক্ষিপ্তি ও অবকাশ ভীতির নামাজে দেয়া হয়েছিলো, নিরাপদ সময়ে সেই অবকাশ আর থাকবে না।

'নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য'—এ কথার অর্থ নির্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ অত্যাবশ্যক। অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় নামাজ পাঠ করতেই হবে। ইমাম শাফেয়ী যুদ্ধরত অবস্থাতেও দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে নামাজ পাঠ অত্যাবশ্যক বলেছেন। উদ্ধৃত বাক্যটির মাধ্যমে বায়যাবীও এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তটি ভুল। যদি এ রকমই হতো তবে পূর্বের আয়াতে এ কথার উল্লেখ থাকতো। স্মর্তব্য যে, এই আয়াতে নামাজের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে হাদিস শরীফে।

মাসআলাঃ ঐকমত্যসূত্রে এ কথা গৃহীত হয়েছে যে, দ্বিপ্রহরের পর সূর্য ঢলে পড়লে জোহরের নামাজের সময় শুরু হয়। এবং জোহরের ওয়াক্ত থাকে আসর পর্যন্ত। আর আসরের সময় থাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে যখন সূর্যকিরণ হরিদ্রাভ হয় তখন আসরের নামাজ পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী (হারামের নিকটবর্তী)। সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যাশ্রিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে যখন কোনো বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুণ হয়, সেই সময়ের মধ্যে আসরের নামাজ পাঠ করা উত্তম।

মাগরিবের নামাজ শুরু হয় সূর্যাস্তের পর। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছে গেলে শুরু হয় ইশার ওয়াক্ত। তখন থেকে শুরু করে সুবহে সাদেক পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত থাকে। ঐকমত্য এই যে, অর্ধরাত্র বিলম্ব করে ইশার নামাজ পাঠ না করা মোস্তাহাব। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের নামাজের সময়।

জোহর ও মাগরিবের সর্বশেষ সময় নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, যখন কোনো বস্তুর ছায়া মূল ছায়া বাদে ওই বস্তুটির দ্বিগুণ হয়ে যায়, তখন পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে সূর্যাস্তের শেষ আভা পরিদৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা

বলেন, জোহরের সময় থাকে কোনো বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর এক অভিমত অনুসারে মাগরিবের নামাজ পাঠ করতে হবে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরক্ষণেই, বিলম্ব করা যাবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসে নামাজের সময় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেন, কাবা শরীফের সন্নিকটে হজরত জিবরাইল ইমাম হয়ে দু'বার আমাকে নামাজ পড়িয়েছেন, প্রথমবার তিনি পড়িয়েছিলেন জোহরের নামাজ, যখন ছায়া ছিলো তস্মার মতো (চামড়ার লম্বা টুকরাকে বলে তস্মা)। এরপর তিনি আসরের নামাজ ওই সময় পড়িয়েছেন, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) এক গুণ হয়ে গিয়েছিলো। এরপর তিনি মাগরিবের নামাজ পড়ালেন সূর্যাস্তের পরক্ষণেই, যখন রোজাদারেরা ইফতার করে। এরপর পশ্চিমাকাশের লাল রঙ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইশার নামাজ পড়ালেন। এরপর ফজরের নামাজ পড়ালেন সেহেরির সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর, যখন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। দ্বিতীয় বার হজরত জিবরাইল জোহর পড়ালেন, প্রতিটি বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার সময়। আসর পড়ালেন ছায়া দ্বিগুণ হয়ে গেলে, মাগরিব পড়ালেন আগের সময়েই এবং ইশা পড়ালেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। আর ফজর পড়ালেন তখন, যখন হলুদ ফর্সা আলোয় উদ্‌ভাসিত হয়ে গেলো পৃথিবী। সবশেষে তিনি আমার সামনাসামনি হয়ে বললেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ সীমানা এটাই। আপনার পূর্বের নবীগণ এই সময়সীমাকেই মান্য করেছেন। আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান। তিরমিজি এই হাদিসকে বলেছেন, উত্তম ও বিশুদ্ধ।

হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত। কিন্তু এ সূত্রের বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান বিন হারেসকে দুর্বল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মুঈন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদুর রাজ্জাকও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। তাঁর বর্ণনাকে উত্তম বলেছেন, ইবনে দাকিকুল ঈদ। আর একে বিশুদ্ধ বলেছেন, আবু বকর বিন আরাবী এবং ইবনে আব্দুল বার।

হজরত জিবরাইলের নামাজ পড়ানো সম্পর্কে আরো কতিপয় সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিস হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসের মতোই, তবে তাঁর বর্ণনায় কেবল ইশার নামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তখন রাতের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়েছিলো। বোখারী লিখেছেন, নামাজের সময় সম্পর্কে হজরত জাবেরের বর্ণনাটি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ।

হজরত বোরায়দার বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট নামাজের সময় সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি স. বললেন, আমাদের সঙ্গে দু'দিন নামাজ পড়ো (প্রশ্নকারী তাই করলো)। প্রথম দিন রসুল স. জোহরের নামাজ হজরত বেলালের আজান ও একামত সহ পড়লেন সূর্য ঢলে পড়ার পরপর এবং সূর্যের প্রখরতা অটুট থাকতে থাকতেই হজরত বেলালকে আসরের আজান দিতে বললেন। তারপর হজরত বেলালের একামতসহ আদায় করলেন আসরের

নামাজ। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আদায় করলেন মাগরিব। ইশা পড়লেন পশ্চিমাকাশের সান্ধ্য আভা মুছে গেলে। আর ফজর পড়লেন সুবহে সাদেকে। দ্বিতীয় দিন তিনি স. জোহর পড়লেন সূর্য বেশ কিছুটা ঢলে পড়লে। আসর পড়লেন আগের দিনের চেয়ে কিছুটা বিলম্বে, যখন সূর্য উঁচু অবস্থানে ছিলো কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিলো তার প্রখরতা। মাগরিব পড়লেন পশ্চিমাকাশের রক্তিম বর্ণ মুছে যাওয়ার কিছুটা পূর্বে। আর ইশা পড়লেন, রাতের তিন ভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর। ফজর পড়লেন চতুর্দিক ফর্সা হয়ে গেলে। তারপর বললেন, নামাজের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ব্যক্তিটি কোথায়? লোকটি বলে উঠলো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি উপস্থিত। তিনি স. বললেন পরপর দু'দিন যেভাবে আমাকে নামাজ পাঠ করতে দেখলে, সেটাই প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা। মুসলিম।

হজরত আবু মুসার বর্ণনাটিও উপরোক্ত বর্ণনাটির মতো। তবে তাঁর বর্ণনায় মাগরিব নামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি স. দ্বিতীয় দিন মাগরিব পড়েছেন সন্ধ্যার রঙ অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে। মুসলিম।

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন— জোহর নামাজের সময়সীমা সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত। যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া ওই বস্তুটির সমপরিমাণ হয় (মূল ছায়া বাদে)। আর আসরের সময় থাকে সূর্যের রঙ হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত। মাগরিবের সময় থাকে সূর্যাস্তের পর থেকে সন্ধ্যার রঙ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। ইশার সময় থাকে অর্ধ রাত্রি বা মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। আর ফজরের সময় শুরু হয় সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, মাগরিব শুরু হয় সূর্যাস্তের পরক্ষণেই। সন্ধ্যার সর্বশেষ রঙ মুছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে। তারপর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত থাকে ইশার সময়। আর সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত হচ্ছে ফজরের সময়। তিরমিজি এই হাদিসটিকে মোহাম্মদ বিন ফুজাইল— আ'মাশ আবু ছালেহ— আবু হোরায়রা— এই সূত্রে বর্ণনা করছেন। বোখারী ভুলক্রমে বর্ণনাটি এনেছেন মারফু রূপে। এ সকল হাদিস অনুযায়ী জমহুরের অভিমত ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে এতটুকু এসেছে যে, মাগরিবের শেষ সময় লাল আভা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের সর্বশেষ সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কোরআন মজীদের আয়াতও এ বিষয়ে জমহুরের অনুকূল। যেমন বলা হয়েছে 'যখন ধারণোদ্যত উত্তম অশ্বগুলো সন্ধ্যার সময় তাঁর (হজরত সুলায়মানের) সম্মুখে আনা হলো, তখন তিনি বললেন— এই সম্পদের মোহে আপন প্রতিপালকের স্মরণ (নামাজ) থেকে গাফেল হয়ে গেলাম; এমনকি সূর্য অন্তরালে চলে গেল।' এ ছাড়াও রসুল স. এরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে সকালের নামাজ এক রাকাত পেলো, সে ফজরের নামাজ পেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাজ এক রাকাত পেলো সেও আসরের নামাজ পেলো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম এ রকম বলেছেন।

ইশার শেষ সময় সম্পর্কে হাদিসের বক্তব্যসমূহে বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু মুসা আশআরী এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে— রসুলুল্লাহ স. রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার নামাজ বিলম্ব করেছেন। আবার হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত বিলম্ব করার কথা। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর ইশার নামাজ পড়েছেন। মাতা আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, তিনি স. রাতের বেশীর ভাগ গত হওয়ার পর ইশার নামাজ পড়েছেন। বর্ণিত হাদিসগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে 'সীহাহ্' গ্রন্থে।

তাহাবী লিখেছেন, উল্লেখিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত রাতই ইশার ওয়াক্ত। কিন্তু এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত উত্তম, অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম উত্তম এবং অর্ধরাত্রির পরের ফযীলত আরো কম। স্বসূত্রে তাহাবী নাফে বিন জোবায়েরের মাধ্যমে হজরত ওমর এবং হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে লিখেছেন, তাঁরা বলেছেন— ইশার নামাজ রাতের যে সময়ে ইচ্ছা পড়ো, কিন্তু উদাসীন হয়ো না। হজরত আবু কাতাদার বর্ণনাসূত্রে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেন, ঘুমের মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই (ঘুমের কারণে নামাজ কাযা হয়ে গেলে ক্ষতি নেই)। তবে পরবর্তী নামাজের সময় পর্যন্ত পূর্ববর্তী নামাজকে বিলম্বিত করা অনুচিত। এই হাদিস থেকেও বুঝা যায় যে, ইশার নামাজের সর্বশেষ সময় ফজরের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত। যদিও এরূপ বিলম্ব অভিপ্রেত নয়। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, রাত শেষ হওয়ার কিছু আগে কোনো অবিশ্বাসী ইসলাম গ্রহণ করলে অথবা কোনো ঋতুবতী নারী ঋতুমুক্ত হলে কিংবা কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের প্রতি ইশার নামাজ ওয়াজিব হবে।

প্রকৃত কথা এই যে, হজরত জিবরাইলের নামাজ শিক্ষাদান সম্পর্কিত হাদিস এবং এক ব্যক্তির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বাস্তব নামাজ শিক্ষাদান সম্পর্কিত হাদিসে নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের নির্দেশনা এসেছে। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মাগরিবের নামাজ ওয়াক্তের প্রথম দিকে না পড়ে শেষ দিকে পড়া মাকরূহ। কিন্তু এই মাকরূহ— মাকরূহে তাহরীমী নয়। কেননা রসুল স. এ রকম করেছেন। কিন্তু ইশার নামাজ কিঞ্চিত বিলম্বে পড়াই মোস্তাহাব— রসুল স. এর দ্বিতীয় দিবসের নামাজের বর্ণনায় এ রকমই এসেছে। সূর্যের রঙ হলুদাভ হয়ে গেলে আসর নামাজ পড়া মাকরূহে তাহরীমী হবে (রসুল স. এ রকম কখনও করেন নি)। এরূপ অতিবিলম্বে নামাজ পাঠ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এ রকম আমলকে শয়তানের প্রভাবদুষ্ট বলা হয়েছে।

হজরত জিবরাইলের হাদিসে বলা হয়েছে, আসরের সময় হচ্ছে বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু এই হাদিসটি রহিত হয়েছে ওই হাদিসের মাধ্যমে যেখানে বলা হয়েছে, আসরের নামাজের সময় থাকে ততোক্ষণ পর্যন্ত— যতোক্ষণ সূর্যের আলো নিষ্প্রভ না হয়। আর জোহরের নামাজ বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত— এ কথা বিশুদ্ধ কিংবা দুর্বল কোনো হাদিসেই আসেনি। তাই এই মাসআলাটিতে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের বক্তব্য ইমামে

আজমের বিপক্ষে এবং জমহুরের পক্ষে। কিন্তু ইমামে আজম তাঁর অভিমতের সমর্থনে হজরত বোরায়দার হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেছেন, দ্বিতীয় দিনে রসুলুল্লাহ স. এর নির্দেশ অনুসারে হজরত বেলাল একামত বলেছিলেন সূর্যের প্রখরতা কমে আসার পর। রসুল স. এ রকমও বলেছেন যে, প্রচণ্ড গরম অনুভূত হলে তাপ কিছুটা কমে আসার পর নামাজ পাঠ কোরো। কেননা, তপ্ত অবস্থা সৃষ্টি হয় দোজখের প্রশ্বাসের কারণে। ইমামে আজম আরো বলেছেন, বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত মদীনার পরিবেশ থাকতো অত্যন্ত উত্তপ্ত। তাই উত্তাপ কমে আসার পর নামাজ পাঠ করতে বলা হয়েছে। আর এই হাদিস হজরত জিবরাইলের ইমামত সম্পর্কিত হাদিসকে রহিত করেছে। কেননা, হজরত জিবরাইল নামাজের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে পরিচিতি দান করেছিলেন প্রথম দিকে আর উত্তাপ কমে আসার পর জোহর পাঠ করার কথা বলা হয়েছে পরবর্তীতে। সুতরাং বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের সময় থাকবে। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই নামাজ মু'মিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।' রসুল স. বলেছেন, পরবর্তী নামাজের সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববর্তী নামাজকে বিলম্বিত করতে পারো। এই নীতিমালা অনুসারে জোহরের নামাজ বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছে। আর হজরত জিবরাইল দ্বিতীয় দিবসে আসরের নামাজে ইমামতি করেছিলেন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর। সুতরাং এটাই আসরের নামাজের ওয়াক্ত। ইমামে আজমের এই অভিমত্যানুসারে জোহর বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার পর পাঠ করাই সমীচীন। কিন্তু এই অভিমতটি তেমন সবল নয়। কারণ, হাদিসে উল্লেখিত উত্তাপ কমে আসার পর নামাজ পাঠের নির্দেশের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার পর জোহর পড়তে হবে। চরম উত্তপ্ত অবস্থা থেকে সূর্য হেলে পড়ার প্রাক্কালে আর বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার আগেই সে উত্তাপ কিছুটা কমে আসে। এরপর আবার উত্তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই উত্তাপ কমে আসার পর নামাজপাঠ করার অর্থ হচ্ছে বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার আগেই জোহর পড়তে হবে। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

মাসআলাঃ 'শাফাক' অর্থ রক্তিম রেখা অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমাকাশে রক্তিম আভা থাকে। একটি দুর্বল বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমত এ রকমই। কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, শাফাক অর্থ ওই শ্বেতাভ বর্ণ যা রক্তিম আভা অবসানের পর দৃষ্ট হয়। শাফাক অর্থ যেহেতু লাল ও শাদা দু'রকমই হয়, তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সন্দিগ্ধ সময়কে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। কেননা, নির্ধারিত ওয়াক্তের পরেও নামাজ পাঠ করা যায় (কাযা হলেও)। কিন্তু সময়ের পূর্বে নামাজ পাঠ কোনোক্রমেই সিদ্ধ নয়।

জমহুরের দলিল এই— রসুল স. বলেছেন, রক্তিম বর্ণ অপসৃত হলে ইশার নামাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। গারায়েবে মালেক গ্রন্থে ইবনে আসাকের এই হাদিসটিকে দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। ১. আতিক বিন ইয়াকুব মালেক থেকে, তিনি নাফে থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে ওমর থেকে মারফু পদ্ধতিতে। ২. মালেক থেকে আবু হোজায়ফা। প্রথমোক্ত সনদটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ইবনে

আসাকের। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি মাওকুফ (যার বর্ণনাসূত্র সাহাবা পর্যন্ত)। হাকেম তাঁর মাদখাল গ্রন্থে আবু হোজায়ফার বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ওই মাওকুফ হাদিস সমূহের সঙ্গে— সমালোচকগণ যেগুলোকে মারফু মনে করেন। মারফু হিসেবে আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে খুজাইমা, মোহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ওয়াসেতি থেকে, তিনি শো'বা থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি আবু আইয়ুব থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে ওমর থেকে। বর্ণনাটি এই— মাগরিবের সময় থাকে রক্তিমাভা পরিদৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত। ইবনে খুজাইমা লিখেছেন, যদি এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধতার স্তরে উপনীত হয়, তবে অন্য কোনো বর্ণনার প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু এ কথা কেবল বলেছেন মোহাম্মদ বিন ইয়াজিদ। তিনি বলেছেন, আসহাবে শো'বা হামরাতুশ শাফাকের স্থলে সাউরুশ্ শাফাক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, মোহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। বায়হাকী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত উবাদা বিন সামেত, হজরত শাদ্দাদ বিন আউস এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে। কিন্তু তাঁর বর্ণনার কোনো সূত্রই বিশুদ্ধ নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

বাগবী লিখেছেন উহুদ যুদ্ধের পর মুশরিকবাহিনীর অধিনায়ক আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে যখন মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলো, তখন রসুল স. একটি দলকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বললেন। কিন্তু তাঁরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের কারণে অনুযোগ উত্থাপন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০৪

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

❐ শত্রুদলের সন্ধানে তোমরা কাতর হইও না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তাহারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহের নিকট তোমরা যাহা আশা কর উহারা তাহা আশা করে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

যুদ্ধরত উভয় দলই আঘাত প্রাপ্ত হয়। হয় কমবেশি বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। তাই এখানে বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্পাক এই মর্মে নির্দেশনা দান করেছেন যে, যুদ্ধযন্ত্রণা কেবল তোমরাই পাওনি, অবিশ্বাসীরাও পেয়েছে। সুতরাং দুর্বলতা প্রদর্শনের কোনো হেতু নেই। রসুলের নির্দেশে তাই অবিশ্বাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করাই শ্রেয়। আর হে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, তোমরা তো তাদের মতো নও। তোমাদের সম্মুখে রয়েছে আশা। আর অবিশ্বাসীদের সম্মুখে রয়েছে নৈরাশ্য। আল্লাহ্ দর্শন, বেহেশত লাভ, ইহ-পরকালের কল্যাণ তোমাদের কাম্য। কিন্তু

কাফেরদের এ সকল মহৎ অভিলাষ নেই। সুতরাং তোমরাই তো হবে জেহাদে অধিক অগ্রগামী এবং ধৈর্যশীল।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সর্বজ্ঞ বলেই তিনি তোমাদের নিয়ত ও আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আর প্রজ্ঞাময় বলেই এ কথাও তিনি উত্তমরূপে অবগত যে, তোমাদের প্রতি আরোপিত নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে অনন্ত রহস্য ও কল্যাণ।

বাগবী বলেছেন, আয়াতের বর্ণনাদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো হামরাউল আসাদে (মদীনা থেকে আট মাইল দূরে এই নামের একটি বাজারে)। 'যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও'—এ কথার মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কিন্তু বায়যাবী বলেছেন, আয়াতটির অবতরণ স্থল ছোট বদর। ঐতিহাসিকেরা বর্ণিত অভিমত দু'টির একটিকেও সমর্থন করেননি। তাঁদের মতে এ আয়াতটি বদর কিংবা উহুদ— কোথাও অবতীর্ণ হয়নি। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিমাতেও এ রকম প্রমাণ নেই। বরং এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে সুরা আলে ইমরানের ওই আয়াতে— যেখানে বলা হয়েছে, 'যারা আহত হওয়ার পর আল্লাহ্র রসুলের আহবানে সাড়া দিয়েছে.....'। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০৫, ১০৬

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۙ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

❐ তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না।

❐ এবং আল্লাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হজরত কাতাদা বিন নোমানের উক্তি হিসাবে তিরমিজি, হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, বনী উবাইরিকেরা ছিলেন তিন ভাই— বশর, বশীর ও মোবাশ্বের। বশীর ছিলো মুনাফিক। সে রসুল স. এর সাহাবীগণের বিরুদ্ধে শ্লেষপূর্ণ কবিতা রচনা করে প্রচার করতো এবং বলতো এই কবিতা রচিত হয়েছে অমুকের জন্য। মূর্খতা ও ইসলাম—উভয় যুগে সে ছিলো অনটনক্লিষ্ট। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো তার। তখন মদীনাবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিলো খেজুর, খোরমা ও যব। আমার চাচা রেফায়া বিন জায়েদ একটি মাটির পাত্রে কিছু আটা রেখেছিলেন। ওই পাত্রে তিনি তাঁর যুদ্ধাস্ত্র ও জেরা (বর্ম)ও রেখেছিলেন। এক রাতে সেই পাত্রে রক্ষিত আটা ও যুদ্ধসরঞ্জামগুলো চুরি হয়ে গেলো। সকালে আমার চাচা আমাকে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! কাল রাতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম বলে বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিলাম। সকালে উঠে দেখি, সিঁদ কেটে চোর আমার আটা ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে

গিয়েছে। আমরা তল্লাশি শুরু করলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে খবর পেলাম, বনী উবাইরিকের গৃহে আটা দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমি পিতৃব্যকে বললাম,মনে হয় ওই আটা আপনারই। আমরা দু'জন বনী উবাইরিকের গৃহে গমন করে তাকে আটা চুরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই সে জানালো, আমার মনে হয় চুরি করেছে লবিদ বিন যুহাইল। লবিদ ছিলেন পুণ্যবান মুসলমান। তাঁকে চুরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই তিনি তলোয়ার উত্তোলন করে বললেন, আমি যদি চুরি করে থাকি তবে আমার ঘর থেকে চুরির মাল বের করে নিয়ে এসো। নাহলে এই তলোয়ার দিয়েই আমি তোমাকে দ্বিখণ্ডিত করবো। তলোয়ার উত্তোলিত হয়েছিলো বনী উবাইরিকের উপরে। সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, আরে আরে করো কি! তলোয়ার নামাও। আমি তো তোমাকে চোর বলিনি। খেপছো কেনো? পিতৃব্য বললেন, বুঝতে পেরেছি বনী উবাইরিকই আসলে চোর। চলো, রসুল স. এর নিকটে গিয়ে আসল কথা খুলে বলি। তাই করলাম আমরা। রসুল স. কে জানালাম, আটা নয়—আমরা কেবল যুদ্ধসরঞ্জামগুলো ফেরত পেতে চাই। ওদিকে বনী উবাইরিকের লোকটি তার সুহৃদ আসির বিন ওরওয়ার কাছে গিয়ে জানালো যে, সে নির্দোষ। আশে পাশের লোকজনও সেখানে জমা হয়ে গেলো। তারপর সকলে মিলে এসে হাজির হলো রসুল স. এর দরবারে। তার পক্ষের লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের গোষ্ঠীর লোকের উপর কাতাদা বিন নোমান ও তার পিতৃব্য চুরির অপবাদ দিচ্ছে। অথচ তাদের কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। রসুল স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখো। লোকেরা যাকে ভালো বলছে—তোমরা তাকেই বলছো চোর। এ কথা বলার অল্পক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো এই আয়াত (ইন্না আনজালনা....আজিম পর্যন্ত)। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর বনী উবাইরিকের লোকটি তার অপরাধ স্বীকার করলো এবং যুদ্ধসরঞ্জামগুলো এনে হাজির করলো। রসুল স. সেগুলো আসল মালিককে প্রত্যর্পণ করলেন। ইত্যবসরে চোর বশীর পালিয়ে গিয়ে যোগ দিলো মুশরিকদের সঙ্গে। অতঃপর অবতীর্ণ হলো এই সুরার ১১৫ এবং ১১৬ নং আয়াত দু'টি। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ এবং এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে মুসলিম শরীফে।

ইবনে সা'দ তাবকাত গ্রন্থে স্বসূত্রে মাহমুদ বিন লবিদের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, কাতাদা বিন নোমানের পিতৃব্য রেফায়া বিন যায়েদের ঘরের পেছনের দিকে সিঁদ কেটে কিছু পরিমাণ আটা, জেরা এবং কতিপয় সামগ্রী চুরি করেছিলো বশীর বিন হাকেম। হজরত কাতাদা এই ঘটনাটি রসুল স.কে জানালেন। রসুল স. বশীরকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অভিযোগ অস্বীকার করে বসলো বশীর। উল্টো বরং সে দোষ চাপিয়ে দিলো হজরত লবিদের উপর। অথচ তিনি ছিলেন সজ্জন ও শ্রদ্ধার্হ। তখন হজরত লবিদের সততা প্রমাণার্থে এই আয়াতটি (১০৫) অবতীর্ণ হয়। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানতে পেরে বশীর ইসলাম পরিত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলো। সেখানে সালাফা বিনতে সা'দের নিকটে সে রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক কবিতা প্রচার করতে লাগলো। কবি সাহাবী হাস্সান বিন সাবেত তখন তার বিদ্রূপাত্মক কবিতার জবাব কবিতার মাধ্যমেই দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো চতুর্থ হিজরীর রবিউস্ সানি মাসে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ বর্ণনাটি এনেছেন কালাবী। আবু সালেহের বর্ণনাটি ইবনে জারীরও উদ্ধৃত করেছেন এবং

বলেছেন, আয়াতটি নাজিল হয়েছে এক আনসারী সম্পর্কে। তাঁর নাম ছিলো তুমা বিন উবাইরিক, সে ছিলো যুফার বিন হারেসের বংশোদ্ভূত। সে তার প্রতিবেশী হজরত কাতাদা বিন নোমানের ঘর থেকে আটা ও জেরা চুরি করেছিলো। আটা ভর্তি থলিটি ছিলো ফাটা। চুরির সময় সেই ফাটা দিয়ে আটা পড়ছিলো। তাই তার বাড়ি পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিলো আটার দাগ। তুমা জেরাটি এক ইহুদীর নিকট জমা রেখেছিলো—তার নাম যায়েদুস্ সামিন। পরদিন সকালে আটার দাগ ধরে হজরত কাতাদা পৌছলেন তুমার বাড়িতে। বললেন, তুমি যে থলিটি নিয়ে এসেছো তার মধ্যে ছিলো আমার আটা ও জেরা। তুমা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বললো, আমি তোমার জেরা নেইনি। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। হজরত কাতাদা বললেন, এই দেখো আমার বাড়ি থেকে তোমার বাড়ি পর্যন্ত আটার দাগ। দাগ দেখা সত্বেও তুমা আবার আল্লাহ্র নামে কসম করলো। হজরত কাতাদা তাকে ছেড়ে দিলেন এবং আটার দাগ দেখে দেখে উপস্থিত হলেন ইহুদী যায়েদের বাড়িতে। ইহুদী বললো, তুমা বিন উবাইরিক আমাকে একটি জেরা দিয়েছে। এরপর তুমার সম্প্রদায়ের লোকেরা রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আমাদের লোকের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন, যদি এমন না করেন,তবে আমাদের গোত্রের লোকেরা অপদস্থ হবে। রসুল স. তখন ওই ইহুদীকে শাস্তি দিতে মনস্থ করলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তুমা ভুসি ভর্তি একটি থলিতে রক্ষিত জেরা— থলিটিসহ চুরি করে ইহুদী যায়েদের নিকট নিয়ে গিয়ে আমানত রাখলো। থলিটির নিচে ছিলো ফুটো, সারা পথ ওই ফুটো দিয়ে ভুসি পড়েছিলো। পর দিন ওই ভুসির চিহ্ন ধরে জেরার মালিক ইহুদী যায়েদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় হাজির হলেন রসুল স. এর দরবারে। রসুল স. চুরির অভিযোগে ওই ইহুদীর হাত কাটতে ইচ্ছা করলেন। মুকাতিলের বক্তব্য হিসেবে বাগবী বর্ণনা করেছেন, ইহুদী যায়েদের নিকট তুমা চুরি করা জেরাটি গচ্ছিত রেখেছিলো। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে সে অভিযোগ অস্বীকার করে বসে। তখন নাজিল হয় এই আয়াতটি।

আয়াতে বলা হয়েছে —তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করো। এখানে 'জানিয়েছেন' বুঝাতে আরাকা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে রুইয়াত থেকে যার অর্থ দেখা। রুইয়াত এর পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য দু'টি কর্মপদের প্রয়োজন হয়। অথচ এখানে বাবে ইফয়ালের ইরায়াতুন ধাতুমূল থেকে 'আরাকা' ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আসলে তিনটি কর্মপদের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটির। আর রুইয়াত অর্থ যে দর্শন— সেই দর্শন এখানে বুঝানো হয়নি। এখানে রুইয়াত বা দর্শনের উদ্দেশ্য হবে, মারেফাত বা পরিচিতি। অর্থ হবে এ রকম—আল্লাহ্ যা তোমার নিকট বর্ণনা করেছেন (প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছেন) — সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করো। এখানে প্রথম কর্মপদটি কেবল বিদ্যমান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্মপদটি রয়েছে উহ্য।

আমি বলি, এখানে রুইয়াত অর্থ জানা বা জ্ঞাত হওয়া। এর পূর্বে সম্বন্ধবাচক পদ 'মা' সংযোজন করার উদ্দেশ্য হবে— ওই পূর্ণ বিষয়টি যার সঙ্গে এলেমের

(জ্ঞানের) সম্পর্ক রয়েছে। এখানে সম্বন্ধবাচকের দিকে প্রত্যাবর্তনের সর্বনামটি রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য সর্বনামটি এখানে শব্দটির অর্থ প্রকাশ করবে। উহ্য সর্বনামটিই এখানে উহ্য কর্মপদ দু'টির স্থলাভিষিক্ত। তাই এখানে একাধিক কর্মপদ উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি। অতঃএব আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য হবে এই— তুমিই তুমা, লবিদ এবং ইহুদী যায়েদের মধ্যে সংঘটিত মামলাটির বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দান করবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমি কিতাবের এই আয়াত অবতীর্ণ করেছি।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, রসুল স. শুধু ধারণা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। কিন্তু তিনি যে ইজতেহাদ (গবেষণা) করতেন না— সে কথার প্রমাণ এখানে নেই। বরং তিনি প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করতেন। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ভুল না বলা হলে তিনি বুঝতেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক। অন্য মুজতাহিদগণের অবস্থা এ রকম নয়। অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ দ্বারা অন্য মুজতাহিদগণকে সাহায্য করা হয় না। তাই তাঁদের ইজতেহাদ নিশ্চিত বিশ্বাসের স্তরে উপনীত হতে পারে না। আমর বিন দিনার থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হজরত ওমরকে বললেন, আল্লাহ্পাক যা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন আপনিতো সেই শিক্ষা অনুসারে মীমাংসা করেন। হজরত ওমর বললেন, খামোশ । এই মহান মর্যাদাতো কেবল ছিলো রসুল স. এর।

এ রকমও মনে করা যেতে পারে যে, এই আয়াতের নির্দেশটি ব্যাপক অর্থবোধক (কেবল রসুল স. জন্য নির্ধারিত নয়)। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, যখন খবরে আহাদ (একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা) অথবা কিয়াস (অনুরূপ বিধান) থেকে কোনো হুকুম মুজতাহিদগণের জ্ঞানের আওতায় আসে, তখন কোরআন, হাদিস ও এজমার মাধ্যমে ওই হুকুমের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। সে বিধান বিশুদ্ধ হলেও। ভুল হলেও। এ অবস্থা বলবৎ থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী দলিল পাওয়া যায়। চিন্তা ও বোধের চূড়ান্ত ব্যবহারের পরেও মুজতাহিদগণের এমতো বিশ্বাস অর্জিত হয় না যে, সিদ্ধান্তটি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র হুকুম। তবুও তাঁরা এতটুকু বুঝতে পারেন যে, এ ইজতেহাদ অবশ্য পালনীয়।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে ওয়াহাব বলেছেন, মালেক আমাকে জানিয়েছেন, মানুষের মধ্যে মীমাংসার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার প্রকার দু'টি। ১. ওই মীমাংসা যা কোরআন ও হাদিসে স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ রকম নির্দেশ অকাট্য, বিশুদ্ধ এবং ওয়াজিব। ২. ওই নির্দেশ যা কোরআন ও হাদিসে সরাসরি হাঁ বা না হিসেবে লিপিবদ্ধ নেই। এ ধরনের বিধান বিদ্বান মুজতাহিদগণকে গভীর অভিনিবেশসহকারে বুঝে নিতে হয়। এই দুই প্রকারের বাইরে অন্য কোনো কিছুই গ্রহণীয় নয়।

শায়েখ আবু মনসুর বলেছেন আয়াতটির অর্থ হবে এ রকম—অবতীর্ণ প্রত্যাদেশটির মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তোমাদের অন্তরে যে রকম উপলব্ধি দান করেছেন, সেই মোতাবেক মীমাংসা করো। শায়েখের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, রসুল স. এর জন্য যে ইজতেহাদ সিদ্ধ— তার প্রমাণ রয়েছে এই আয়াতে।

আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে—বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক কোরো না। 'তর্ক কোরো না' কথাটি যদি 'সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করছি' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তবে এখানে অর্থ হবে, এ রকম অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি বলে দিয়েছি যে, আমানত খেয়ানতকারী বা বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সাহায্যকারী হয়ো না। আর তর্ক করার সম্পর্ক যদি 'আল কিতাব' এ সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তবে অর্থ হবে এ রকম—আমি কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং এ নির্দেশও অবতীর্ণ করেছি যে, বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সহায়তাকারী হয়ো না। এখানে 'আল খয়িনিনা' শব্দটির উদ্দেশ্য বনী উবাইরিক এবং 'খসিমা' শব্দটির উদ্দেশ্য নিরপরাধ লবিদ বিন সহল অথবা ইহুদী যায়েদ বিন যামীন।

পরের আয়াতে (১০৬) নির্দেশ করা হয়েছে (তোমরা কাতাদা বিন নোমান সম্পর্কে যে কথা বলেছো তার জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। হজরত কাতাদার এই ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করেছেন তিরমিজি এবং হাকেম। বাগবী লিখেছেন, এখানে ক্ষমাপ্রার্থনার অর্থ ইহুদীকে শাস্তি প্রদানের যে ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছিলো, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। মুকাতিল বলেছেন, এখানে অর্থ হবে এ রকম— তোমার সাহায্যার্থে যা কিছু বলা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও।

শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ নিশ্চয়ই ক্ষমাপ্রার্থীগণকে আল্লাহ্‌পাক ক্ষমা করেন এবং তাদের প্রতি তিনি পরম দয়াবান।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۝ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

❒ যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে তাহাদের পক্ষে কথা বলিও না, আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে ভালবাসেন না।

❒ তাহারা মানুষকে লজ্জা করে; কিন্তু আল্লাহ্‌কে লজ্জা করে না এবং রাত্রে যখন তাহারা তিনি যাহা পছন্দ করেন না এমন বিষয়ের পরামর্শ করে তখন তিনি তাহাদের সঙ্গেই থাকেন এবং তাহারা যাহা করে তাহা সর্বোতভাবে আল্লাহের জ্ঞানায়ত্ব।

এই আয়াতে (১০৭) আত্মপ্রতারকদের পক্ষে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যকে যারা প্রতারণা করে, তারা আসলে নিজেকেই প্রতারণা করে। তাদেরকেই

আয়াতে বলা হয়েছে 'যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে'। ইবনে উবাইরিক এবং তার মতো লোকদেরকে এখানে আত্মপ্রতারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথবা এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ইবনে উবাইরিক ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরাই এখানে আত্মপ্রতারক। কারণ, তারা ছিলো অন্যায়ের সমর্থক। ইবনে উবাইরিক সম্পর্কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা রসুল স. এর নিকট সুপারিশ করেছিলো।

'আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে ভালোবাসেন না'— এ কথার অর্থ যারা খেয়ানতের পাপে নিবিষ্টচিত্ত, আল্লাহ্পাক তাদেরকে ঘৃণা করেন। কারণ তারা মিথ্যাবাদী। তারা সত্যকে গোপন করে এবং নিরপরাধ লোকের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে যদিও রসুল স. কে লক্ষ্য করে এ রকম বলা হয়েছে, 'তাদের পক্ষে কথা বোলো না'— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশটি তাঁর স. মাধ্যমে জানানো হয়েছে অন্য লোকদেরকে। কেননা আত্মপ্রতারকদের পক্ষে কথা বলা রসুল স. এর জন্য অসম্ভব। খেয়ানতের সমর্থক তিনি কস্মিনকালেও নন। নির্দেশনাটির বাকভঙ্গি ওই আয়াতের মতো যেখানে বলা হয়েছে, 'অতঃপর আপনি সন্দেহে নিপতিত হন যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।' — এই আয়াতেও রসুল স. এর মাধ্যমে অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রসুল স. এর পক্ষে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া সম্ভবই নয়।

ইস্তেগফার অর্থ শরিয়তের হুকুম মানা এবং অনুসরণ করা। বাগবী লিখেছেন, নবী-রসুলগণের ইসতেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা তিন ধরনের। ১. নবুয়ত লাভের পূর্বের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। ২. আপন উম্মত এবং নিকট আত্মীয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। ৩. ওই সকল বৈধ কর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা— যা তাঁরা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।

পরের আয়াতে (১০৮) এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষকে নয়, লজ্জা করতে হবে আল্লাহ্কে। ইবনে উবাইরিক ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষের নিকট লজ্জিত ও অপমানিত হওয়ার আশংকায় সত্য গোপন করতে সচেষ্ট হয়েছিলো।

আত্মপ্রতারকেরা এ কথা জানেনা যে, প্রকারবিহীনরূপে আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টির সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তিনি সকলের অবস্থা সম্যক পরিজ্ঞাত। আত্মপ্রতারকেরা রাতে গোপনে একে অপরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে। আল্লাহ্পাক তাদের সকল দূরভিসন্ধিরই খবর রাখেন। কারণ, সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্বে।

বাগবী লিখেছেন, তুমার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে স্থির করেছিলো যে, রসুল স. কে বলতে হবে তুমা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ কথা বললে রসুল স. তুমার কথা বিশ্বাস করবেন এবং তার কসমকেও গ্রহণ করবেন। তখন তিনি স. ইহুদীর কথা আর শুনবেন না। আল্লাহ্পাক তুমার সম্প্রদায়ের এই দূরভিসন্ধিকে পছন্দ করেননি।

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ○ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

❒ দেখ তোমরাই ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে কথা বলিতেছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহের সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে কথা বলিবে অথবা কে তাহাদের উকিল হইবে?

❒ কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি জুলুম করিয়া পরে আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্‌কে সে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু পাইবে।

'তোমরা তাদের পক্ষে কথা বলছো'— এখানে তাদের পক্ষে অর্থ ইবনে উবাইরিক এবং তার মতো অসৎ লোকদের পক্ষে। পক্ষে কথা বলা বুঝাতে এখানে 'জিদালুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ তুমুল বাদানুবাদ। শব্দটি এসেছে 'জাদলুন' থেকে। 'জিদাল' এর আরেকটি অর্থ কঠোরতা ও বিভিন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া। অথবা শব্দটি 'জাদ্‌লাতুন' থেকেও উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে। 'জাদ্‌লাতুন' অর্থ ওই মৃত্তিকা যেখানে একদল অন্যদলকে ধরাশায়ী করতে প্রয়াসী হয়।

কিয়ামতের দিন ইবনে উবাইরিক এবং তার মতো লোকদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে, তখন কে তাদের পক্ষে কথা বলবে? কে-ই বা সুপারিশ করবে তাদের পক্ষে? উকিলেরা তাদের মোয়াক্কেলের পক্ষে সুপারিশ ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, পাপ করার পর অথবা নিজের উপর জুলুম করার পর যে ব্যক্তি ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহ্‌পাককে পায় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে। পাপ বুঝাতে এখানে 'সু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'সু' অর্থ শিরিক ব্যতীত অন্য সকল পাপ। আর 'জুলুম' অর্থ 'শিরিক'। অথবা 'সু' সগীরা গোনাহ এবং জুলুম কবীরা গোনাহ। এখানে ইবনে উবাইরিক এবং তার মতো লোকদেরকে তওবা ও ইসতেগফারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে রাহ্‌ওয়াইহ্ তাঁর মসনদে লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, যখন 'আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কর্ম করবে সে তার প্রতিফল লাভ করবে এবং সে তার নিজের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না'— এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা আতংকে পানাহার পরিত্যাগ

করলাম। অতঃপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত দু'টি। ক্ষমাপ্রার্থনাকারীরা আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে—এ রকম আশ্বাস প্রাপ্তির পর আমরা দুশ্চিন্তামুক্ত হলাম। বিভিন্ন পদ্ধতিতে হজরত আলীর মাধ্যমে হজরত আবু বকরের উক্তি বর্ণিত হয়েছে এ রকম— আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো পাপ কর্ম করে ফেলে, সে যেনো তৎক্ষণাৎ উত্তমরূপে ওজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায় এবং কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন, মন্দকর্ম ও জুলুমের পর যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুরূপে পাবে। ইবনে আবী হাতেম, ইবনুস সুন্নী, ইবনে মারদুবিয়া।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১১, ১১২

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ○

❐ কেহ পাপ কার্য করিলে সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❐ কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি পাপিষ্ঠের উপরেই আপতিত হয়। স্বকৃত পাপের বোঝা কখনো অন্যেরা বহন করে না। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ, তাই তিনি সকলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আর তিনি প্রজ্ঞাময়—তাই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিনিময় দান করবেন। পাপীকেও। পুন্যবানকেও।

যে ব্যক্তি ছোটো অথবা বড় গোনাহ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে করার পর নিরপরাধ কারো (লবিদ কিংবা ইহুদী যায়েদের মতো) উপর দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো চরম অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা আপন স্কন্ধে স্থাপন করে। সে অপবাদ ও পাপের গুরুভারবাহী।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত জায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদিন হজরত ওমর দেখলেন, হজরত আবু বকর তাঁর আপন রসনা ধরে টানছেন। হজরত ওমর বললেন, হে রসুলুল্লাহ্র প্রিয় খলিফা! আপনি এমন করছেন কেনো? হজরত আবু বকর বললেন, এই জিহবা আমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ শানিত রসনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে (বাচালতা ও বাকপটুতার জন্য দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গই দুঃখ পায়)।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১৩

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَیْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

❐ তোমার প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের এক দল তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিতই; কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও পথভ্রষ্ট করে না, এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার প্রতি আল্লাহের মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।

এরশাদ হয়েছে— হে রসুল, আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ (ফজল) এবং দয়া (রহমত)। তাই আপনি নিরাপদ। ইবনে উবাইরিকের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে আল্লাহ্পাক আপনাকে অবহিতি দান করেছেন। তাই আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ ও দয়ার কারণেই এ রকম হয়েছে। ইবনে উবাইরিকের দল আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলো। তারা মিথ্যা কথা বলে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছিলো ভুল মীমাংসার দিকে। আপনিও সরল বিশ্বাসে তাদেরকে সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অপচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তারা নিজেরাই হয়েছে বিভ্রান্তির শিকার। আল্লাহ্পাক আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন আল কোরআন এবং হিকমত (প্রজ্ঞা)। আরও দান করেছেন ওই জ্ঞান যা ইতোপূর্বে আপনি জানতেন না। কাতাদা বলেছেন, এই জ্ঞান হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কিত বিবিধ জ্ঞান এবং হালাল ও হারাম বিষয়ক জ্ঞান।

সবশেষে বলা হয়েছে, তোমার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ। —এই মহা অনুগ্রহ হচ্ছে নবুয়ত ও রেসালত। এর চেয়ে উন্নততর অনুগ্রহ আর নেই।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১৪

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

❐ তাহাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নাই, তবে কল্যাণ আছে যে দান খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়

তাহার পরামর্শে, আল্লাহের সন্তুষ্টি লাভের আকাংখায় কেহ উহা করিলে তাহাকে মহা পুরস্কার দিব।

গোপন পরামর্শ বুঝাতে এখানে 'নাজওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কামুস অভিধানে বলা হয়েছে, 'নাজওয়া' অর্থ গোপন ভেদ। যেমন নাজাইতুহু অর্থ আমি তার সাথে গোপন কথা বলেছি। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, নাজওয়াতুল আরদ্ব অর্থ টিলা। অর্থাৎ সকলের নিকট থেকে পৃথক হয়ে কোনো টিলায় আরোহন করে কথা বলা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নাজওয়া অর্থ এমন কথা যাতে নিহিত রয়েছে, বক্তার নাজাত বা পরিত্রাণ। বাগবী লিখেছেন, নাজওয়া গোপন পরামর্শের নাম। কেউ আবার বলেছেন, নাজওয়া অর্থ ওই উদ্যোগ— যা কোনো দল প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এককভাবে করে থাকে। এ ধরনের গোপন পরামর্শ বা উদ্যোগ অধিকাংশই কল্যাণহীন। এখানে 'তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শ'— অর্থ, ইবনে উবাইরিক গোষ্ঠীর গোপন পরামর্শ। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ঘোষণাটি সাধারণ অর্থবোধক। অর্থাৎ কেবল উবাইরিক গোষ্ঠী নয়—সকল মানুষের গোপন শলাপরামর্শের কথাই এখানে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এ সকল পরামর্শের অধিকাংশই কল্যাণরহিত।

ওই সকল গোপন পরামর্শকারীরা অবশ্য এর ব্যতিক্রম— যারা সৎকর্মশীল, দানশীল এবং শান্তিকামী। গোপন পরামর্শকারী হিসেবে যদি উবাইরিক গোত্রকে ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে যারা দানশীল তাঁরা উবাইরিক গোষ্ঠীর কেউ নয়। মুজাহিদের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ হবে, যারা দানশীল তারা কল্যাণহীন গোপনপরামর্শকারী জনতা থেকে পৃথক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সকল গোপন পরামর্শকারীকে কল্যাণহীনরূপে চিহ্নিত করার পর দানশীলদেরকে এখানে পৃথক করে দেয়া হয়েছে।

একটি সন্দেহঃ 'আমার নিকট অনেক লোক এসেছে কিন্তু যায়েদ আসেনি'— এ রকম বললে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, অনেক লোকের মধ্যে যায়েদও রয়েছে। তারপর তাকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। এমনও বলা যেতে পারে যে, যায়েদ অনেক লোকের অন্তর্ভুক্তই নয় —বরাবরই সে জনতা থেকে পৃথক।

উত্তরঃ এখানে আয়াতের অর্থ এ রকম— তাদের অধিকাংশের গোপন পরামর্শের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু যারা দান খয়রাত করার পরামর্শ দেয় তারা এর ব্যতিক্রম। এখানে 'তাদের' শব্দটির মধ্যে সকল পরামর্শদাতা অন্তর্ভুক্ত। এই অন্তর্ভুক্তির পর দানের পরামর্শ দানকারীদেরকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। গোপন পরামর্শ দানকারীদেরকে কর্তা হিসেবে গ্রহণ না করা হলেই কেবল এই উত্তরটি বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। নতুবা বাক্যটি হবে এ রকম— কোনো কল্যাণ নেই অধিক পরামর্শকারীদের মধ্যে, যাকে হুকুম করা হয় তাকে ব্যতীত। এ ধরনের কথা অতিরিক্ত ও নিরর্থক।

উল্লেখ্য এখানে 'ইল্লা' শব্দটির অর্থ 'ব্যতীত' নয় বরং অর্থ হবে বিশেষণমূলক। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো

উপাস্য যদি হতো তবে সব ধ্বংস হয়ে যেতো (লাওকানা ফিহিমা আলেহাতুন ইল্লাল্লাহু লা ফাসাদাতা)। এখানে 'ইল্লা' শব্দটির অর্থ হবে 'অন্য কেউ'। দানশীলতার পর বলা হয়েছে সৎকর্মের কথা আও মারুফ। মারুফ অর্থ শরিয়ত সমর্থিত সৎকর্ম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে দানখয়রাত অর্থ ফরজ জাকাত এবং মারুফ অর্থ ঋণ, নফল (অতিরিক্ত) সদকা এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা।

এ রকমও হতে পারে যে, মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশের সঙ্গে সৎকর্মের বিষয়টি সম্পৃক্ত। শান্তি স্থাপন বুঝাতে এখানে 'এসলাহ্' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে সৎকর্ম সম্পাদন এবং বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এখানে। বিষয় দু'টোর গুরুত্ব তুলে ধরাই এ রকম পৃথক উল্লেখের কারণ। অথবা এ রকমও বলা যায় যে, সংশোধন বা সন্ধির সকল দিক কল্যাণকর নয়—তবুও তা শরিয়ত সমর্থিত। যেমন মিথ্যা কথা বলা— যদিও উত্তম নয় তবুও সংশোধন বা সন্ধির মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা বলা জায়েয। হজরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মুয়ীত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে— যে কোনো উত্তম কথা নিজের দিক থেকে বলে দেয়। অথবা কোনো উত্তম বাক্য সৃষ্টি করে অন্যের নিকট পৌঁছায়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু দারদার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন— আমি কি তোমাদেরকে ওই কথা জানাবো না যা কিয়ামত দিবসে হবে নামাজ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদামণ্ডিত। (হজরত আবু দারদা বলেন) আমরা নিবেদন করলাম, নিশ্চয়ই। বলুন ইয়া রসুলাল্লাহ্। তিনি স. বললেন, মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করো। পারস্পরিক বিবাদ পুণ্যকে অপসারিত করে। আবু দাউদ, তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, তিনটি স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয— আপন স্ত্রীকে প্রসন্ন করতে, যুদ্ধরত অবস্থায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে।

দান-খয়রাত, সৎকার্য এবং শান্তি স্থাপন করতে হবে আল্লাহ্পাকের সন্তোষ সাধনার্থে। যে এ রকম করবে সে লাভ করবে মহাপুরস্কার। এ সকল কর্মের পরামর্শ যারা দেয় তারা কল্যাণহীন গোপন পরামর্শ দাতাদের মতো নয়। কারণ তারা সুনাম, সুখ্যাতি বা লোক দেখানোর জন্য আমল করেন না। হজরত ওমর থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসে রয়েছে 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়াত' (সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভশীল)। বোখারী, মুসলিম।

আল্লাহ্পাক এখানে যে মহা পুরস্কারের শুভসংবাদ দিয়েছেন, তা পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থিত সকল সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। বোখারী ও মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু শোরাইহ্ থেকে আহমদ লিখেছেন, রসুল স. বলেন— — যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সে যেনো উত্তম কথা বলে অথবা

নিশ্চুপ থাকে। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্পাক ওই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করুন যে কল্যাণজনক কথা বলে অথবা নীরব থাকে। এ রকম ব্যক্তি ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত।

পুণ্যবানদেরকে মহাপুরস্কারের শুভসমাচার দেয়ার পর আসছে পুণ্যবিবর্জিতদের শাস্তির কথা। এরশাদ হচ্ছে—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১৫

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۟

❒ কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যে দিকে সে ফিরিয়া যায় সে দিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কতো মন্দ আবাস!

সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসুলের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে রসুলের নির্দেশ অবগত হওয়ার পর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ। নিশ্চিত ও অকাট্য অবহিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, যারা রসুল স. এর নির্দেশ সম্পর্কে জানে না অথবা নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোনো অস্পষ্ট কিংবা শিথিল সূত্রে নির্দেশ অবগত হয়, তাদেরকে নির্দেশ লংঘনকারী বলা যাবে না। আবার সর্বাত্মক চেষ্টা করা সত্বেও হাদিসের অর্থ বুঝতে গিয়ে যদি কারো 'ইজতেহাদী' (গবেষণালব্ধ) ভুল হয়ে যায় তবে তাকেও নির্দেশবিরোধী মনে করা যাবে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে রসুলের বিরুদ্ধাচরণ অর্থ ধর্মত্যাগী হওয়া। তওহীদ ও নবুয়ত প্রকাশিত হওয়ার পর যে ধর্মবিমুখ হয় সে-ই প্রকৃতপক্ষে রসুলের বিরুদ্ধাচারী। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তুমা'র প্রসঙ্গটি।

বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করার অর্থ ইমানদারগণের ঐকমত্যের বিরুদ্ধাচারী হওয়া। ঐকমত্যবিরোধী না হয়ে যদি কোনো কোনো মুসলমানের ধারণা ও কর্মধারার বিরোধী কেউ হয় তবে তা দূষণীয় নয়। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, একদল প্রকৃত বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে গেলেও অন্য কোনো বিশ্বাসীর দলভুক্ত হতে হবে। রসুল স. এরশাদ করেন, আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তাঁদের যে কোনো একজনের অনুসরণ করলে তোমরা প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবে।

রসুলের বিরুদ্ধাচারী এবং বিশ্বাসীদের পথবিচ্যুত যারা, তাদের সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে— আল্লাহ্পাক তাদেরকে বাধা দিবেন না। তারা যেদিকে যেতে চায় সেদিকেই যেতে দিবেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথার

অর্থ তারা পৃথিবীতে যে যার প্রতি নির্ভরতা রাখবে, আখেরাতে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ওই সকল বস্তুর সঙ্গী করে দিবেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিবসে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকবে— যারা পৃথিবীতে গায়ের আল্লাহ্র উপাসনা করেছো এখন তাদেরকেই অনুসরণ করো। এরপর তাদেরকে তাদের উপাস্যসহ নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে।

শেষে বলা হয়েছে, জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করবো, আর জাহান্নাম কতো মন্দ আবাস।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম মালেক লিখেছেন, ওমর বিন আব্দুল আজিজ বলেন, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর তাঁর খলিফাগণ কতিপয় তরিকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ওই সকল পদ্ধতিকে মান্য করলে সত্যানুসরণ ও ধর্মপরায়ণতা শক্তিশালী হয়। খোলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তিত ওই সকল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার অনুমতি কারো নেই। সিদ্ধান্তগুলোর পুনর্বিবেচনা-চিন্তা নিষিদ্ধ। ওই সকল সিদ্ধান্তকে যে মান্য করবে সে আল্লাহ্ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। যে মান্য করবে না, সে হবে বিশ্বাসীদের পথ থেকে বিচ্যুত। তার এই বিচ্যুতির পরিণাম জাহান্নাম। আর জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট অধিবাস।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে তু'মা বিন উবাইরিক সম্পর্কে। সে চুরি করেছিলো। চৌর্যকর্ম প্রমাণিত হলে হাত কাটা যাওয়ার ভয়ে সে ধর্মত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলো মক্কায়। তার সম্পর্কে এই আয়াতে বলা হয়েছে 'যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

রসুলের বিরুদ্ধাচরণ আযাবকে অপরিহার্য করে। বিশ্বাসীদের ঐকমত্যের বিরোধিতাও শাস্তিকে ডেকে আনে। এ দু'টো অপরাধ যে করবে সে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। এর যে কোনো একটি করলেও শাস্তিযোগ্য। রসুলের বিরুদ্ধাচরণ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি ঐকমত্যের বিরুদ্ধাচরণও নিষিদ্ধ। সুতরাং মেনে নিতে হবে যে, ঐকমত্যের অনুসরণ ওয়াজিব।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্তায়ালা এই উম্মতকে ভুলের উপর একত্র করবেন না। যুথবদ্ধতার উপরে রয়েছে আল্লাহ্র হাত। যে যুথচ্যুত, সে দোজখী। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, তু'মা বিন উবাইরিক মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে হাজ্জাজ বিন এলাজ নামক এক ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করলো। সে আশ্রয়দাতার গৃহেই একদিন চুরি করে বসলো। সিঁদ কেটে চুরি করার সময় একটি পাথর গড়িয়ে এসে তাকে চাপা দিলো। সে আর নড়াচড়া করতে পারলো না। সকাল হলে লোকেরা সচক্ষে

দেখলো তার এই অপকীর্তি। কেউ কেউ তাকে হত্যা করতে চাইলো । কেউ কেউ বললো, সে তোমাদের আশ্রিত, সুতরাং ছেড়ে দাও। তাকে ছেড়ে দেয়া হলো বটে, কিন্তু বলা হলো সে যেনো মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। মক্কা পরিত্যাগের পর বনিকদের একটি কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া যাত্রা করলো সে। পথিমধ্যে একস্থানে কাফেলা যখন বিশ্রামরত তখন কাফেলার লোকদের মাল চুরি করলো। পলায়ণকালে আবার ধরা পড়লো সে। লোকেরা তখন সকলে তাকে সঙ্গেসার (প্রস্তর নিক্ষেপ) করে মেরে ফেললো। তার উপর এতো পাথর নিক্ষিপ্ত হলো যে, পাথরের নিচেই রচিত হলো তার সমাধি। এক বর্ণনায় এসেছে— সে চুরি করা একটি স্বর্ণমুদ্রার থলিসহ একস্থানে নৌকায় আরোহণ করেছিলো। সেখানেই ধরা পড়লো সে। লোকেরা তখন তাকে সমুদ্রে ফেলে দিলো। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সে বনী সুলাইম জনপদে গিয়ে মূর্তিপূজকে পরিণত হলো। মৃত্যু পর্যন্তই সে ছিলো মূর্তিপূজক।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

❒ আল্লাহ্ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং কেহ আল্লাহের শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এক বৃদ্ধ বেদুঈন সম্পর্কে। তিনি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে একদিন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অনেক পাপ কর্ম আমি করেছি কিন্তু আল্লাহ্কে যখন চিনেছি এবং তাঁকে বিশ্বাস করেছি তখন থেকে আমি শিরিক থেকে মুক্ত। ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই। এখন আমি বয়োবৃদ্ধ। মৃত্যুকাল সন্নিকটে। আমি লজ্জিত, তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থী–জানিনা আমার অদৃষ্টে কী রয়েছে। বৃদ্ধ বেদুঈনের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ছা'লাবী ও জুহাক এ রকম বলেছেন।

আয়াতে স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন না। কিন্তু শিরিক ছাড়া অন্য সকল পাপ ক্ষমার্হ। তিনি ইচ্ছে করলে এ সকল পাপ মার্জনা করেন— কখনো তওবার পর আবার কখনো তওবা ব্যতিরেকেই। তাই শেষে বলা হয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক যে করে সে চরম পথভ্রষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে।

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ○ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ○

❒ তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।

❒ আল্লাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করেন, এবং সে বলে,'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবই।'

আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদত গ্রহণ করার অধিকার কারো নেই। ইবাদত করতে হবে কেবল আল্লাহ্র এবং প্রার্থী হতে হবে তাঁর নিকটেই। রসুল স. এরশাদ করেছেন, প্রার্থনাও ইবাদত। অতঃপর তিনি স. 'অক্বলা রব্বুকুমুদউনি আসতা জিব লাকুম' (এবং তোমাদের স্রষ্টা নির্দেশ করেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো) —এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

উপাসনাকারীরা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য উপাসনা করে থাকে। অবিশ্বাসীরা উপাসনা করে থাকে দেবদেবীর এবং বিদ্রোহী শয়তানের। দেবী বুঝাতে এখানে 'ইনাস্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ দেবী প্রতিমা। আরবের মুশরিকেরা তাদের উপাস্যদেরকে দেবী বলে জানতো এবং মানতো। মানাত, উজ্জা, লাত— এগুলো ছিলো তাদের দেবী। তারা মনে করতো মানাতের পুংলিঙ্গ মান্নান। লাত এর পুংলিঙ্গ আল্লাহ্ এবং উজ্জার পুংলিঙ্গ আয়াজ্জু। বিভিন্ন প্রতিমাকে তারা বলতো, অমুক গোত্রের দেবী। হজরত উবাই বিন কাব 'ইল্লা ইনসান' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রতিমাপূজকেরা মনে করে দেবী প্রতিমাগুলোই প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির, আব্দুল্লাহ্ বিন আহমদ প্রমুখ এ রকম বলেছেন।

এ রকমও হতে পারে যে, তাদের উপাস্যগুলোর মূল বা আসল বলে কিছু ছিলো না। ছিলো কেবল নাম— যা তারা পূজা করতো। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কতকগুলো নাম ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত তারা করতো না।' তাদের পূজ্য নামগুলো ছিলো নারীর। তাই সেগুলোকে এখানে 'ইনাস্' বলা হয়েছে। এটাও একটি কারণ হতে পারে যে—তাদের উপাস্যগুলো ছিলো প্রাণহীন পাথর, পিতল, স্বর্ণ ইত্যাদি। তাদের ওই মাবুদগুলো নিষ্প্রাণ ছিলো বলেই তারা সেগুলোকে নারী মূর্তির সঙ্গে কল্পনা করে নিয়েছে। কামুস নামক অভিধান গ্রন্থে রয়েছে 'উনাস্' শব্দটি 'উনসা' শব্দের বহুবচন এবং 'ইনাস্' বলা হয় প্রাণহীন বস্তুকে। যেমন— গাছ, পাথর, ছোট বিড়াল। এ রকম অর্থ গ্রহণ করলে রূপক অর্থের প্রয়োজন আর হয় না। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, দেবী পূজারীরা

প্রাণহীনতার উপাসক। ব্যকরণ গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে, 'আলিফ' ও 'তা' এর সঙ্গে কোনো একবচনের বহুবচন এবং বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গের নুন অচেতন বস্তুসমূহের আসল বা প্রকৃত অবস্থা। যেমন, বলা হয় 'সুফনুন জারিইয়াতুন, নাখলুন বাসিক্বতুন। এ সকল ক্ষেত্রে 'আলিফ' ও 'তা' এর মাধ্যমে স্বল্পজ্ঞানকে জ্ঞানহীনের সংজ্ঞাভূত করা হয়েছে।

হাসান ও কাতাদা 'ইল্লা ইনাসান' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রীলিঙ্গ যেমন পুংলিঙ্গের তুলনায় নিকৃষ্ট তেমনি প্রাণহীনতা প্রাণের মোকাবেলায় গুরুত্বহীন। তাই এখানে প্রাণবিহীন অবস্থা নির্দেশ করতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'ইনাস্' ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় 'ইনাসের' অর্থ রূপক হিসেবে গৃহীতব্য।

হজরত ইবনে আব্বাসের ক্বেরাত অনুসারে শব্দটির উচ্চারণ 'উসুনান'—শব্দটি 'আউসান' এর বহুবচন। আউসানের আরেকটি বহুবচনবোধক শব্দ হচ্ছে 'ওয়াসনুন'— যার অর্থ বিগ্রহ মন্দির। জুহাক বলেছেন, 'ইনাসুন' অর্থ ফেরেশতামণ্ডলী। কেননা অংশীবাদীরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'ওয়া জায়ালুল মালাইকাতা ল্লাজিনা হুম ইবাদুর রহমানি ইনাসা (আর তারা ফেরেশতাদেরকে নারী সাব্যস্ত করে রেখেছে—যারা আল্লাহ্‌র বান্দা)।

শয়তানের পূজা করার কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। প্রতিটি প্রতিমার উপরে ভর করে থাকে এক একটি শয়তান। তারা তাদের পূজারীদের এবং গণৎকারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং তাদের সাথে কথাও বলে—ইতোপূর্বে আমরা এ কথা বলেছি। কেউ কেউ বলেছেন এখানে শয়তান অর্থ ইবলিস। ইবলিসই অংশীবাদীদেরকে প্রতিমাপূজার নির্দেশ দিয়ে থাকে। প্রতিমাপূজা প্রকৃতপক্ষে ইবলিসেরই পূজা ও অনুসরণ।

শয়তানকে এখানে বলা হয়েছে বিদ্রোহী। দ্রোহ বুঝাতে এখানে 'মারিদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'মারিদা' এবং 'মারাদা' কল্যাণের সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত। মিম, র ও দাল সহযোগে গঠিত এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ চাকচিক্য। 'সারহুন মুমার্‌রাদুন' অর্থ পরিষ্কার ঝকমকে প্রাসাদ। 'আমরদু' অর্থ শশ্রু ও গুম্ফবিহীন বালক। কিন্তু এখানে 'মারিদ' অর্থ আল্লাহ্‌দ্রোহী, আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বহিষ্কৃত।

পরের আয়াতে (১১৮) বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌পাক শয়তানকে অভিসম্পাত করেন। অভিশপ্ত শয়তান বলে, আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করবো (তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো)। শয়তানের অধিকারভূত ওই মানুষেরা হবে জাহান্নামী। হাসান বলেছেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন হবে জাহান্নামী এবং একজন হবে জান্নাতী। আমি বলি, জাহান্নামীদের সম্পর্কে হাদিস শরীফে এ রকমই বলা হয়েছে। যে নির্দিষ্ট অংশ শয়তানের কবজায় চলে যাবে তারা চিরতরে হয়ে যাবে সৌভাগ্যশীলদের জামাত থেকে পৃথক।

শয়তান মানুষের চির শত্রু। সে হজরত আদমকে সেজদা করার নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিলো। তখন থেকেই সে অভিসম্পাতগ্রস্ত। অভিসম্পাতলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সে বলেছিলো, তোমার মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ! আদমের বংশধরেরা যতোক্ষণ জীবিত থাকবে, ততোক্ষণ আমি তাদেরকে পথচ্যুত করার চেষ্টা করতেই থাকবো। বিশুদ্ধ হাদিসে এ রকমই বর্ণনা এসেছে। নিম্নের আয়াতে রয়েছে এ কথার বিশদ বিবরণ।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১৯

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ○

❒ এবং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবই; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব এবং তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই, এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব এবং তাহারা আল্লাহের সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহের পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়,

---

শয়তান বলে, আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবোই। তাদের অন্তরে সৃষ্টি করবো মিথ্যা বাসনার ধূম্রজাল। এখানে শয়তান পথভ্রষ্ট করবে বলেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পথভ্রষ্ট করা এবং হেদায়েত দান করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্ই রাখেন। শয়তান পথভ্রষ্টতার উপকরণ, উপলক্ষ ও মাধ্যম মাত্র।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন— শয়তান কোনো কোনো লোককে প্রশ্ন করতে থাকে এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে। মানুষ বলে, আল্লাহ্। আল্লাহ্ই সকল কিছুর স্রষ্টা। এ রকম প্রশ্নত্তোরের এক পর্যায়ে এসে সে প্রশ্ন করে বসে, বলো আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে? এমতাবস্থায় কর্তব্য হচ্ছে বিতর্কে ক্ষান্ত দেয়া এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা। বোখারী, মুসলিম।

মিথ্যা বাসনার ধূম্রজাল হচ্ছে এ রকম—শয়তান বলে কিয়ামত হবে না, আযাব গজব বলে কিছু নেই, জীবনের পরমায়ু শেষ হতে এখনও অনেক দেরী, পাপী হলে কি হবে, আখেরাতের কল্যাণ তোমরাই লাভ করবে ইত্যাদি।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, শয়তান মানুষের শরীরে রক্ত চলাচলের মতো বিচরণশীল। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— মানুষের উপর

শয়তানের প্রভাব রয়েছে। প্রভাব রয়েছে ফেরেশতাদেরও। শয়তানের প্রভাবে মানুষ অমঙ্গলের ভয়ে ভীত হয় এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর ফেরেশতাদের প্রভাব হচ্ছে শুভসান্ত্বনা প্রদান ও সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। যে ব্যক্তি ফেরেশতাদের এই শুভপ্রভাব লাভ করবে, সে জ্ঞাপন করবে আল্লাহ্পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আর যে শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করতে পারবে, সে হবে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকারী। এর পর তিনি স. পাঠ করলেন 'শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভয় দেখায় এবং নির্দেশ দেয় অশ্লীলতার।' তিরমিজি এই হাদিসটিকে বলেছেন গরীব।

শয়তান আরো বলে, আমি মানুষকে এইমর্মে নির্দেশ দিবো, যেনো তারা তাদের পশুদের কান ছিদ্র করে। মূর্খতার যুগে এভাবে পশুদের কর্ণচ্ছেদন করা হতো। কর্ণচ্ছেদনকৃত পশুকে তারা তাদের দেবীর নামে ছেড়ে দিতো। তাদের রীতি ছিলো কোনো উষ্ট্রী দশবার প্রসব করলে তার কান চিরে দিয়ে দেবীর নামে ছেড়ে দিতো। সেই উষ্ট্রী তখন যত্রতত্র স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতো। উষ্ট্রী মরে গেলে পুরুষেরা তার গোশ্ত ভক্ষণ করতো, রমণীদের জন্য সেই গোশ্ত ভক্ষণ ছিলো নিষিদ্ধ। এই উষ্ট্রীকে বলা হতো বাহিরা।

শয়তান আরোও বলে 'তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি বিকৃত করবেই।'— এ কথার অর্থ আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় প্রকার বিকৃতি সাধন করবে তারা।

জ্ঞাতব্যঃ রসুল স. বলেছেন, যারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুঁই দ্বারা খোদাই করে, সুরমা কাজল অথবা নীল কালি দ্বারা আঁকে বিশেষ কোনো লিপি বা চিত্র, উপড়িয়ে ফেলে মস্তকের পক্ক কেশ— তাদেরকে আল্লাহ্পাক অভিসম্পাত দেন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এ বর্ণনাটি এনেছেন, আহমদ বোখারী ও মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেন ওই সকল লোকের উপর আল্লাহ্র লানত যারা পাকা চুল তুলে ফেলে, পরচুলা পরিধান করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে দাগ দেয়। হজরত আয়েশা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্ লানত করে থাকেন ওই সকল ব্যক্তিকে যারা সুঁইয়ের দ্বারা অঙ্গ খোদাই করে ও করায়, কেশ উৎপাটন করে কেশ সংযোগ করে এবং করায় । হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর জানোয়ারকে খাসী করতে নিষেধ করতেন। কারণ, এতে করে বংশধারা রহিত করা হয়। এ রকম ভাবে পশুর বংশপ্রবাহ রুদ্ধ করা অসিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জানোয়ার খাসী করালে কোনো ক্ষতি হবে না। হেদায়া গ্রন্থে এ রকম বর্ণনা এসেছে আব্দুর রাজ্জাক এবং আবদ্ ইবনে হুমাইদ এবং হাসান থেকে। মোহাম্মদ বিন সিরিন ও হাসান থেকে ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ওমর পশুকে খাসী করতে নিষেধ করতেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মুনজির ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. জানোয়ারকে খাসী করতে নিষেধ করেছেন। এই বর্ণনার সঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইবনে আবী শায়বা অতিরিক্ত এ কথাটিও বলেছেন যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এই প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ইবনে জারীর ও

ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করার যে কথাটি বলা হয়েছে, তার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিকৃতি।

আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি বিকৃতির মধ্যে আরো রয়েছে ষাঁড়ের এক চোখ অন্ধ করে দেয়া, ক্রীতদাসকে নির্বীর্যকরণ শরীরে উলকি আঁকা ইত্যাদি। মুশরিকেরা এ রকম করতো। সৃষ্টি বিকৃতির আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, শরীরে চিত্রাংকন, বালু দ্বারা দাঁত ধারালো করা, বদলা রূপে হাত পা কান নাক ইত্যাদি কেটে ফেলা, সমকাম, নারী নির্যাতন, চন্দ্র, সূর্য, প্রস্তর বৃক্ষ, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা এবং এমন কাজে শারীরিক শক্তি ক্ষয় যা কোনো প্রকার পরিপূর্ণতা সাধনে সক্ষম নয়। আরেকটি বিকৃতি হচ্ছে ফিৎরত অর্থাৎ ইসলামের বিকৃতি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি মানব শিশু ফিৎরতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। পরে তার জনক জননী তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। পশুকুলও প্রসব করে পরিপূর্ণ পশুশাবক। অথচ তোমরা তাদের নাক, কান কেটে দাও এবং নির্বীর্য করো। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ফিতরতের উপর মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পরিবর্তনযোগ্য নয়। এটাই হলো সরল সোজা ও মজবুত পথ'। বোখারী, মুসলিম।

এখানে পাঁচটি বাক্যের মাধ্যমে শয়তান তার নিজের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছে। এই অপকর্মগুলো কেবল ইবলিসই করে না। তার অনুসারীরাও করে। তাই বিশেষভাবে এগুলোর জন্য কেবল ইবলিসই দায়ী নয়। তার মতো যারা তারা সকলেই দায়ী।

শিরিক হচ্ছে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্টতা। এই শিরিক সম্পর্কেই আল্লাহ্‌তায়ালা সতর্ক করে দিয়েছেন এভাবে— তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ওই সকল বস্তুকে শরীক করছো যেগুলো নিষ্প্রাণ, উপকার কিংবা অপকার করতে অক্ষম। আবার তোমরা তাদের নাম রেখেছো রমণীদের নামের মতো। অথচ সেগুলোর প্রকৃত তত্ত্ব বলে কিছু নেই। শিরিক করলে অভিশপ্ত শয়তানের অনুসরণ করতে হয়, যে শয়তান নিজেই শিরিক ও গোমরাহীর মধ্যে আমস্তক নিমজ্জিত। কল্যাণ ও হেদায়েতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। সে চির অভিশপ্ত। তার অনুসরণের মধ্যেও রয়েছে লানত এবং গোমরাহী। সে মানুষের নিকৃষ্টতম শত্রু।

শেষে বলা হয়েছে, শয়তানকে যে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য কখনই সম্মিলিত হতে পারে না। শিরিকমিশ্রিত ইবাদত কস্মিনকালেও আল্লাহ্‌র ইবাদত বলে গণ্য হবার নয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, আমি সকল শিরিক থেকে বেপরোয়া। যে ব্যক্তি তার আমলের মধ্যে আমার সঙ্গে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে এবং তার শরীককে পরিত্যাগ করি। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, আমি তাদের চেয়ে পৃথক। তাদের আমল ওই শরীকের জন্যই হবে, যার জন্য তারা ইবাদত করেছে। মুসলিম।

প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ শিরিকের কারণে তারা তাদের আসল সম্পদ— ইমান হারিয়ে ফেলবে এবং জান্নাতের বদলে প্রবিষ্ট হবে জাহান্নামে।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۖ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

❒ সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে, এবং শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা ছলনা মাত্র।

❒ ইহাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতির উপায় পাইবে না।

❒ এবং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহের প্রতিশ্রুতি সত্য; কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

শয়তান তার প্রকৃত অনুসারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম প্রতিশ্রুতি দেয়— যেগুলো সে কখনোই পূর্ণ করতে পারবে না। এ রকমও হওয়া সম্ভব যে, কখনো কখনো সে নিজে মানুষের সম্মুখে এসে সফলতার লোভ দেখায়। বদর যুদ্ধের সময় সে এ রকম করেছিলো। মুশরিক বাহিনীকে বলেছিলো, আজ তোমাদের উপর কেউ সফল হতে পারবে না, আমি তোমাদের জিম্মাদার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে আচরণ করলো এর বিপরীত। মুশরিক ও মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হওয়া মাত্র পলায়ন করলো এবং এ কথা বলতে বলতে গেলো যে, আমি আজ তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না। আমি আল্লাহ্র দিক থেকে এমন কিছু দেখেছি যা তোমরা দেখতে সমর্থ নও।

শয়তান তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসন্নার সৃষ্টি করে। কামনা বাসনা সৃষ্টি করে দীর্ঘ আয়ুষ্কালের এবং অধিক সম্পদের।

শয়তানের অঙ্গীকার ছলনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে অন্যায় কাজকে কল্যাণকর এবং ভালো কাজকে অকল্যাণকর হিসেবে প্রতিভাত করতে প্রয়াসী হয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায়। (বলে), যদি তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করো অথবা আত্মীয় স্বজনকে দান করো তবে দরিদ্র হয়ে যাবে'।

শয়তানের অনুসারীদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম। সেখান থেকে কোনো দিনই তারা নিষ্কৃতি পাবে না। নিষ্কৃতির উপায় পাবে না— এ কথা বুঝাতে আয়াতে (১১২) 'মাহিসুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ পলায়ন বা পলায়নের

স্থান। কামুস অভিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'হাসা আনহু,' ইয়াহিসু, হায়াসান, হাইসাতান ও মাহিসান— শব্দগুলোর ধাতুমূল 'হাইসুন'। 'হাইসাতান' ও 'মাহিসুনের' পরে যদি 'আন' আসে তবে অর্থ হবে প্রত্যাবর্তন করা। আর 'আন' না এলে অর্থ হবে সেলাই করা। যেমন হাসাআইনিয়াহ্ অর্থ দু'চোখ সেলাই করা হয়েছে অর্থাৎ ঘুম তার চক্ষুযুগলকে বন্ধ করে দিয়েছে। আয়াতে 'মাহিসা'র পূর্বে 'আনহা' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও শব্দটি 'মাহিসা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কেননা 'মাহিসা' শব্দটি ধাতুগত অথবা স্থান কালগত— কোনোভাবেই কার্যকারিতা অগ্রগণ্য হতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের সর্বশেষটিতে বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে শীঘ্রই প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে— যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে? এই প্রশ্নটির মাধ্যমে সত্যবাদীতায় অন্যের অগ্রণী হওয়ার বিষয়টিকে সমূলে নিবারণ করা হয়েছে। করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যেনো, শয়তানের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির সমকক্ষতার ধারণা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বলতো, আমরা ছাড়া অন্য কেউ বেহেশতে যাবে না। আর মক্কার মুশরিকেরা বলতো, হাশর নশর বলে কিছু নেই। তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৩

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

❒ তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল খুশী অনুসারে কাজ হইবে না, কেহ মন্দ কাজ করিলে তাহার প্রতিফল সে পাইবে, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার জন্য সে কোনো অভিভাবক ও সহায় পাইবে না।

এখানে 'তোমাদের খেয়াল খুশী' কথাটির অর্থ মক্কার মুশরিকদের খেয়াল খুশী। আয়াতের বাচনভঙ্গি দৃষ্টে সে কথাই প্রমাণিত হয়। মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। এখানে বলা হচ্ছে— হে মক্কাবাসী মুশরিক, তোমরা বলো পরকাল বলে কিছু নেই। কেউ কেউ বলো, তোমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলো তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। আবার কেউ কেউ বলো, আমরা যদি দ্বিতীয়বার জীবিতও হই তবুও তোমাদের (বিশ্বাসীদের) চেয়ে উত্তম অবস্থায় থাকবো। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তোমাদের ধারণার অনুকূল নয়। আর হে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)!

তোমাদের খেয়াল খুশীজনিত ধারণাও ঠিক নয়। তোমরা বলো, তোমরা আল্লাহ্‌র পুত্র। এ রকমও বলো যে, ইহুদী ও খৃষ্টান ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আবার কেউ কেউ বলো, মাত্র কয়েকদিনের জন্য তোমাদেরকে নরকানল ভোগ করতে হবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই, পরকালের পরিত্রাণ এবং পুণ্যপ্রাপ্তির সম্পর্ক ইমান ও পুণ্যকর্মের সঙ্গে। আর সেখানকার আযাবের সম্পর্ক অবিশ্বাস, বিকৃত বিশ্বাস এবং অসৎ কর্মের সঙ্গে। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবেই এবং এ কথাও তোমরা জেনে রাখো যে, মন্দকর্মে জড়িত ব্যক্তিরা সেখানে কোনো অভিভাবক পাবে না। কারো পক্ষ থেকে কোনো সহায়তাও পাবে না।

আয়াতের শানে নুজুল মক্কার মুশরিক ও মদীনার আহলে কিতাবদের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হলেও এটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই এই আয়াতের লক্ষ্য। হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের বক্তব্যরূপে বাগবীর বর্ণনায় এ রকমই বলা হয়েছে। শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ্‌পাকের মার্জনা থেকে বঞ্চিত। শাস্তির ভয় প্রদর্শন সম্পর্কিত সকল আয়াতের এই একটিই শর্ত যে, আল্লাহ্‌ যদি ক্ষমা না করেন তবে আযাব হবে। সে আযাব পরকালেও হতে পারে। ইহকালেও।

হজরত উবাদা বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে —এক দল সাহাবী রসুল স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে রসুল স. নির্দেশ করলেন, তোমরা আমার হাতে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, অপহরণ করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না, এবং পুণ্যকর্মে অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে না। যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যে ব্যক্তি এ সকল অপরাধের মধ্যস্থিত কোনো অপরাধ করে বসবে, সে জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পৃথিবীতে আযাব ভোগ করতে হবে। আর পৃথিবীতে আযাব না হলে বিষয়টি হয়ে পড়বে সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌পাকের উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছে করলে মার্জনা করবেন অথবা ইচ্ছে করলে আযাব দিবেন। হজরত উবাদা বিন সামেত বলেন, অতঃপর আমরা এ সব কথার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ (বায়াত) হলাম। বোখারী, মুসলিম।

কেউ কেউ বলেছেন, কেবল অবিশ্বাসীরাই এই আয়াতের লক্ষ্য। এই আয়াতের সঙ্গে বিশ্বাসীদের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা বিশ্বাসীদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী আল্লাহ্‌। তিনি ইচ্ছে করলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তাঁর নির্দেশে ফেরেশতাবৃন্দ, নবী-রসুলগণ এবং আউলীয়ায়ে কেরাম বিশ্বাসীদের সুপারিশকারী হবেন। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্‌পাকের আযাব অপসারণ করতে পারবেন না। আর বিশ্বাসীরাও তাঁদেরকে কার্যনির্বাহী এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে সাহায্যকারী মনে করেন না। অপর পক্ষে অবিশ্বাসীরা মনে করে তাদের পূজ্য প্রতিমা গুলোই

তাদের কার্যনির্বাহক। অবিশ্বাসীরা তাদেরকে তাদের সুহৃদ ও সাহায্যকারী বলে মনে করে। কিন্তু আখেরাতে তাদের কোনো কর্মনির্বাহক ও সাহায্যকারীর অস্তিত্ব থাকবে না।

কেবল অবিশ্বাসীরাই এই আয়াতের লক্ষ্য—এই অভিমতটি ভুল। নিম্নের আয়াত দ্বারা অভিমতটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। হজরত আবু বকর বলেছেন, আমি রসুল স. সকাশে উপস্থিত ছিলাম। তখন 'ফামাইয়াআ'মাল সুআম ইউজ জা বিহি (১২৪) আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। রসুল স. বললেন, হে আবু বকর, আমি কি একটি আয়াত পাঠ করে শুনানো যা এই মাত্র আমার উপর অবতীর্ণ হলো। আমি নিবেদন করলাম, শোনান, ইয়া রসুলাল্লাহ্! তিনি স. আয়াতটি পাঠ করলেন। তাঁর তেলাওয়াত শুনে আমার কোমরের ব্যথা দূর হয়ে গেলো। আমি কোমর সোজা করে বসলাম। আমি আগে কখনও এ রকম অনুভব করিনি। তিনি স. বললেন, আবু বকর তোমার কি হয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আমরা কেউ কোনো মহৎ কর্ম সম্পাদন করিনি। আমাদের পাপের শাস্তিতো অবশ্যই হবে। তিনি স. বললেন, তুমি এবং তোমার বিশ্বাসী সঙ্গীরা পৃথিবীতেই পাপের শাস্তি লাভ করবে। তারপর আল্লাহ্র সকাশে উপস্থিত হবে পাপমুক্ত পবিত্র অবস্থায়। অন্য লোকদের পাপ জমা হতে থাকবে আর ওই পুঞ্জীভূত পাপের শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে আখেরাতে। বাগবী, তিরমিজি, আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির। আহমদ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর বললেন, এই আয়াত প্রকাশিত হওয়ার পর পরিত্রাণ পাবে কে? রসুল স. বললেন, তুমি কি দুঃশ্চিন্তায় নিপতিত হও না? পীড়াগ্রস্ত হও না কিংবা তোমাদের উপর কি মুসিবত নেমে আসে না? আমি বললাম, অবশ্যই আসে। তিনি স. বললেন, এগুলোই তোমাদের পাপের শাস্তি। এ রকম বর্ণনা আরো এসেছে আহমদ, আবু ইয়া'লী, বায়হাকী এবং বোখারীর ইতিহাসের মাধ্যমে। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে আবু সালেহ্ ও কালাবীর মাধ্যমে বাগবীর বর্ণনায় এসেছে— এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানেরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, আপনি ব্যতীত আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে কোনো পাপ করেনি। রসুল স. বললেন, দুনিয়ার বিপদ মুসিবত এক ধরনের আযাব। (১) যে একটি পুণ্য কর্ম করবে, তার জন্য লেখা হবে দশটি নেকী। একটি পাপ করলে ওই দশটি নেকী থেকে একটি কমে যাবে। বাকী থাকবে নয়টি। ওই ব্যক্তির জন্য আক্ষেপ, যার পাপ পুণ্যাপেক্ষা বেশী। এখানে আক্ষেপ করা হয়েছে এজন্যে যে, একটি পুণ্য পরিণত হয় দশটিতে। কিন্তু একটি পাপ একটিই। এভাবে একটি নেকী দশটি গোনাহ্র মোকাবিলা করে। সুতরাং কেউ যদি এগারো, বারো কিংবা তেরোটিও গোনাহ করে থাকে, তবে দশের অধিক গোনাহ্গুলোর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে এই পৃথিবীতেই। সুতরাং আক্ষেপ ওই ব্যক্তির জন্য যার পুণ্যকর্ম অপেক্ষা পাপকর্ম অধিক।

আখেরাতে নেকী ও বদি ওজন করা হবে। সেখানে প্রতিটি গোনাহ্র বিপরীতে একটি করে নেকী রহিত করে দেয়া হবে। এভাবে বদি অপেক্ষা যদি নেকী বেশী হয় তবে সে লাভ করবে সওয়াব ও জান্নাত। (২)

জ্ঞাতব্য ১ঃ হজরত মোহাম্মদ বিন মোনতাশার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ওমর বলেছেন, 'কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার জন্য সে কোনো অভিভাবক ও সহায় পাবে না'— এই আয়াত অবতীর্ণ হলে আমরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। পানাহারে রুচি বিবর্জিত অবস্থায় আমাদের দিনাতিপাত হচ্ছিলো। তখন আমাদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'কেউ কোনো মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে— পরে আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুরূপে পাবে'।

জ্ঞাতব্য ২ ঃ ইবনে আবী শায়বা, আহমদ, বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে লিখেছেন, বর্ণিত সাহাবীদ্বয় রসুল স. কে বলতে শুনেছেন, বিশ্বাসীদের প্রতি আপতিত দুঃখ, বিপদ ও দুশ্চিন্তা তাদের গোনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ)। বোখারী ও মুসলিমে উম্মতজননী হজরত আয়েশা থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। হজরত বোরায়দা আসলামী থেকে ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, মুসলমানের প্রতি আপতিত বিপদের জন্য, এমন কি তার পায়ে কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহ্পাক তার বিনিময় প্রদান করেন। ওই অমোচনীয় বিপদের মাধ্যমে তার পাপ মার্জনা করা হয়। অথবা তাকে দান করা হয় কোনো মর্যাদা, যা ওই বিপদ ছাড়া অর্জন করা ছিলো অসম্ভব।

হজরত আবু ফাতেমা থেকে ইবনে সা'দ এবং বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেন, যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্ত্বার শপথ, তিনি তাঁর অপার করুণাস্বরূপ বিপদ আপতিত করেন তাঁর বান্দার উপর। বেহেশতে ওই বান্দা এমন মর্যাদায় উপনীত হবে যা ওই বিপদ ছাড়া লাভ করা ছিলো অসম্ভব। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায়হাকীও এ রকম বলেছেন।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক 'কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল পাবে....'— এই আয়াতের শানে নুজুল বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতের আরেকটি শানে নুজুলের বর্ণনা এসেছে মাসরুক থেকে কাতাদা, জুহাক এবং সুদ্দীর মাধ্যমে মুরসালরূপে ইবনে জারীর কর্তৃক এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে আউফী কর্তৃক । বর্ণনাটি এ রকম— 'তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল খুশী'— আয়াতটি নাজিল হয়েছে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের একটি বিতর্ককে উপলক্ষ্য করে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানেরা এক স্থানে বসে বিতর্ক করে যাচ্ছিলো। প্রত্যেকে দাবি করছিলো—আমরাই উত্তম। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বলছিলো, আমাদের নবী এসেছে তোমাদের নবীর আগে আর আমাদের

কিতাবও অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের কিতাবের পূর্বে। সুতরাং আমরা তোমাদের আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্যের অধিকারী। মুসলমানেরা বললেন, আমাদের নবী হচ্ছেন খাতামুল আম্বিয়া (সর্বশেষ নবী) আর আমাদের কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী। আমরা আমাদের কিতাবসহ পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে বিশ্বাস করি কিন্তু তোমরা আমাদের কিতাবকে বিশ্বাস করো না। সুতরাং আমরাই উত্তম। এই শানে নুজুল অনুযায়ী বিআমানিয়্যুকুম বলে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে এবং 'মাই ইয়া'মাল সুআন ইয়ুজজা বিহী (কেউ মন্দ কাজ করলে) বলে বুঝানো হয়েছে সকল ধর্মাবলম্বীকে।

মাসরুক থেকে ইবনে জারীর এবং হজরত আমাশ থেকে ইবনে জুহার বক্তব্য বাগবী উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— যখন 'তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল খুশী অনুসারে...' আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন কিতাবীরা বলতে শুরু করলো দেখো, আমরা ও তোমরা সমান্তরালে (উল্লেখিত হয়েছি)। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো-

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৪

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

❒ পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করিলে ও বিশ্বাসী হইলে তাহারা জান্নাতে দাখিল হইবে এবং তাহাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুলুম করা হইবে না।

পুণ্যবান বিশ্বাসী এবং পুণ্যবতী বিশ্বাসিনীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে। এখানে 'মিনাস সলিহাত' অর্থ সৎকর্মসমূহের মধ্যে। অর্থাৎ পুণ্য কর্মসমূহের মধ্যে কিছুসংখ্যক পুণ্যকর্ম যারা সম্পাদন করবে তারাও বেহেশতে প্রবেশ করবে— যদি তারা মুমিন কিংবা মুমিনা হয়। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, মাই ইয়াআ'মাল মিছক্বলা যার্‌রতিন খইরই ইয়ারহ্ (যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অণু পরিমাণ পুণ্যকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে)।

'মিন জাকারিন আউ উনছা' অর্থ— পুণ্যবান অথবা পুণ্যবতীদের মধ্যে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথার মাধ্যমে ওই মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, যারা তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করতো এবং মনে করতো রমণীরা জন্তু-জানোয়ার সদৃশ— তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নেই এবং তারা পুণ্যকর্ম সম্পাদনের অযোগ্য।

ওয়া হুয়া মু'মিন অর্থ বিশ্বাসী হলে —এ কথার উদ্দেশ্য পুণ্যকর্মের প্রতিদান ইমান বা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বাসবিহীন পুণ্যকর্ম গ্রহণীয় নয়। অপরপক্ষে মন্দকর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যেমন

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে।' এ কথায় বুঝা যায় যে, মন্দকর্ম আল্লাহ্পাকের পছন্দনীয় নয়। তাই আল্লাহ্পাক মার্জনা না করলে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সকল পাপীদের জন্য শাস্তি অপরিহার্য। তাই সাধারণভাবে সকলকে মন্দকর্মের প্রতিফল সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম সাধারণ বিধান নেই। এক্ষেত্রে বিশ্বাসযুক্ত পুণ্যকর্ম গৃহীতব্য। বিশ্বাসবিহীন পুণ্যকর্ম আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় না বলে তা স্পষ্টতই শিরিক (অংশীবাদিতা)। এই শিরিকই সর্বোচ্চ পাপ।

একটি প্রশ্নঃ যদি অবিশ্বাসীদের কোনো কর্মই পুণ্য বলে বিবেচিত না হয়, তবে পুণ্যকর্মের সঙ্গে বিশ্বাসের শর্ত সংযোজনের অর্থ কী (যখন বিশ্বাসীদের পুণ্যকর্মই একমাত্র পুণ্যকর্ম)।

উত্তরঃ সৎকর্মের সঙ্গে বিশ্বাসের উল্লেখের মাধ্যমে এখানে এ কথাটিই স্পষ্ট করে নেয়া উদ্দেশ্য যে, ইমান বিহীন সৎকর্ম আল্লাহ্পাক গ্রহণ করেন না। সুতরাং অবিশ্বাসীরা যেনো তাদের পুণ্যকর্মকে (নিকটজনের সঙ্গে শিষ্ট আচরণ, সন্তানসন্ততির ভরণ-পোষণ, জনকল্যাণমূলক কর্মসমূহ ইত্যাদি) পরিত্রাণের উপায় ভেবে না বসে।

'ফা উলাইকা ইয়াদ্ খুলুল জান্নাহ্' অর্থ তারা (পুণ্যবাণ বিশ্বাসী ও পাপীরা) বেহেশতে প্রবেশ করবে। পাপী বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে তওবা করে মৃত্যুবরণ করলে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তওবা না করে মরলেও বেহেশতে যাবে তারা। আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমাপ্রাপ্তির পরই তারা বেহেশতে যাবে, পাপের শাস্তিভোগ না করে অথবা কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর।

সবশেষে বলা হয়েছে 'ওয়ালা ইউয্লামুনা নাক্বিরা (তাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুলুম করা হবে না)— এ কথার অর্থ অনুগতদের পুণ্য অণু পরিমাণও কম করা হবে না। স্পষ্ট করে উল্লেখ করা না হলেও এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, মেহেরবান আল্লাহ্ পাপকর্মের শাস্তির ক্ষেত্রেও অণু পরিমাণ অতিরিক্ত করবেন না। আল্লাহ্পাকের ন্যায়পরায়ণতা নিখুঁত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'অণু পরিমাণ জুলুম করা হবে না'— এ কথা মন্দ কর্মের প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রে (পূর্ববর্তী আয়াতে) উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, শিরিক সকল অবস্থাতেই ঘৃণ্য। বক্তব্যটির উদ্দেশ্য ছিলো কাফেরদেরকে সতর্ক করা। আর এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে পুণ্যকর্মে উৎসাহিত করা। তাই এখানে 'অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না' বক্তব্যটি সংযোজিত হয়েছে।

আমি বলি, 'অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না' কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, ইবাদতকারীর ইবাদতের বিনিময় যেমন কম দেয়া হবে না, তেমনি পাপিষ্ঠদের প্রাপ্য শাস্তিও বিন্দু পরিমাণ অতিরিক্ত করা হবে না। আর আলোচ্য আয়াতে নেককার ও গোনাহ্গার— সকল বিশ্বাসীকে জান্নাত গমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসবান পাপীরাও কোনো না কোনো পুণ্যকর্ম করে থাকে।

অন্ততপক্ষে তৌহিদের (আল্লাহ্‌র এককত্বের) সাক্ষ্যতো দিয়ে থাকেই। — আর এই সাক্ষ্যইতো ইমানের সর্বপ্রধান বিষয়। তাই পাপী পুণ্যবাণ নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে 'তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' অর্থাৎ তাদের সওয়াব যেমন কম করা হবে না, তেমনি শাস্তিও বেশী করা হবে না। স্মর্তব্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতে 'কেউ মন্দ কাজ করলে'— কথাটির মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পাপী বিশ্বাসীরা। দেখা যাচ্ছে, পাপী বিশ্বাসীরা মন্দ কর্মের ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে এবং সৎকর্মের ক্ষেত্রে পুণ্যবাণ বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে আলোচ্য আয়াত দু'টো পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, পাপী বিশ্বাসীরা প্রথম দিকে (পাপের শাস্তি ভোগের প্রাক্কালে) অবিশ্বাসীদের সঙ্গে এবং শেষ দিকে (মার্জনা বা শাস্তি আস্বাদনের পর) নেককারগণের সঙ্গে থাকবে। 'অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না' এ কথাটি কেবল গোনাহ্‌গার মুসলমানের উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে কেবল পাপপুণ্য কম না করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। যারা প্রকৃত কাফের তারা এই সুসংবাদের বাইরে। তাদের সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আযাবের উপর আযাব তাদের উপর বৃদ্ধি করে দেয়া হবে'।

একটি ধারণাঃ আল্লাহ্‌পাক সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। অথচ বলা হয়েছে, কাফেরদের আযাব বাড়িয়ে দেয়া হবে। এ রকম করাতো জুলুম— এই সমস্যাটির সমাধান তবে কী?

ধারণার অপনোদন ঃ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার নাম জুলুম। আল্লাহ্‌পাক কখনই অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধীন। সমগ্র সৃষ্টির তিনিই একক স্রষ্টা। সুতরাং তিনি যদি অপরাধ ছাড়াই সকলকে শাস্তি দেন, তবুও তাকে জুলুম বলা যাবে না (কারণ তিনি অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেননি)'।

একটি সন্দেহঃ আল্লাহ্‌র জন্য 'জুলুম' শব্দটি যখন প্রযোজ্যই নয়, তখন এই আয়াতে 'অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না' বলা হলো কেনো? অন্য স্থানে বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বান্দাদের উপর জুলুম করবেন না'।—এ সকল ক্ষেত্রে তবে জুলুম না করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

সমাধানঃ বর্ণিত বাক্যগুলো রূপক অর্থবোধক। বক্তব্যগুলোর উদ্দেশ্য এই যে —জুলুম বলতে যা বুঝা যায়, সে ধরনের আচরণ আল্লাহ্‌পাক তাঁর অনুগত দাসদের ক্ষেত্রে কিছুতেই করবেন না। অর্থাৎ মানুষ ও ফেরেশতামণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কর্মকে জুলুম বলে অভিহিত করা হলেও আল্লাহ্‌পাক তার বিশ্বাসী বান্দাদের সঙ্গে কস্মিনকালেও জুলুম করবেন না।

মাসরুক থেকে বাগবী লিখেছেন, 'তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়ালখুশী অনুসারে...' আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিতাবীরা যখন বললো— তোমরা ও আমরা একবরাবর, তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সেই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নবর্ণিত আয়াতটি।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَّاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا ۝

❒ তাহার অপেক্ষা দ্বীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

যে তার অন্তর বাহির সহ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে, যে সৎকর্মপরায়ণ এবং একনিষ্ঠভাবে হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমত অনুসরণ করে— ধর্মপরায়ণতার দিক থেকে তার চেয়ে কে অধিক উত্তম? — এখানে এমতো গুণবত্তার অধিকারী ব্যক্তির চেয়ে অন্য কেউ উত্তম নয়— সে কথা প্রশ্নাকারে অস্বীকার করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিই আল্লাহ্পাকের নিকট সর্বোত্তম। এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। এঁদের ধ্যান জ্ঞান চিন্তা আল্লাহ্কেন্দ্রিক। এঁরা একাগ্রতা ও বিশুদ্ধচিত্ততার অধিকারী। পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী। মন্দকর্ম পরিত্যাগকারী। আয়াতে বলা হয়েছে ওয়াহুয়া মুহ্সিন। —এর অর্থ এঁরা এহ্সানের অধিকারী। এহ্সান সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন, এহ্সান (ইবাদতের সৌন্দর্য্য) এই যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে কোরো যেনো আল্লাহ্কে দেখছো। যদি এভাবে দেখতে না পাও তবে (মনে রেখো) তিনিতো তোমাদেরকে দেখছেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর। বোখারী, মুসলিম।

'ওয়াত্তাবায়া মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানিফা'— এ কথার অর্থ একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে। স্মর্তব্য যে, সকল নবী ও রসুলগণের ধর্মাদর্শ মূলতঃ একই। স্বীয় সত্ত্বা ও শরীর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাই সকল নবী ও রসুলের ধর্মাদর্শ। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে হজরত ইব্রাহিমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, তিনি সর্বজনগ্রাহ্য, সকল ধর্মমতাবলম্বীদের নিকট মাননীয়। ইসলাম ধর্মের প্রধান নির্দেশসমূহ তাঁর ধর্মমতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যেমন কাবামুখী হয়ে নামাজ পাঠ, কাবা শরীফের তাওয়াফ, হজ, কোরবানী, খৎনা, অতিথিপরায়ণতা ইত্যাদি। এ সকল উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্পাক কর্তৃক পরিক্ষীত হয়েছিলেন। আর সে পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণও হয়েছিলেন। তাই ইসলামী শরিয়তে তাঁর ধর্মাদর্শকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

হানিফ শব্দটির অর্থ সকল মিথ্যা মত ও পথ থেকে বিমুখ হয়ে সত্য পথের অনুসারী হওয়া। তাঁর পিতা, নিকটজন ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা ছিলো প্রতিমাপূজক। তাই তিনি সকলকে পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন সিরাতুম মুসতাক্বিম— সরল সহজ পথ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ওয়াত্তাখজাল্লহু ইব্‌রাহীমা খলিলা (এবং আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন)। খুল্লাতুন শব্দটি গঠিত হয়েছে খলালুন থেকে। খিলাল অর্থ ওই বস্তু যা শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় প্রবেশ করে। খুল্লাতুন তাই গোপন ভালোবাসারূপে প্রবেশ করে হৃদয়ে এবং হয়ে যায় সত্ত্বাসম্পৃক্ত। শব্দটি ওই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নির্দেশ করে যারা সুগভীর অনুরাগরঞ্জিত— যারা একে অপরের প্রয়োজন পূর্ণ করেন, একে অন্যের সন্তোষ সাধনে থাকেন ব্যাপৃত।

জুজায বলেছেন, খলিল অর্থ অটুট ভালোবাসার অধিকারী। শব্দটি খালুন থেকেও উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে। খালুন অর্থ ওই পথ, যে পথের পথিক দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। খালাত থেকেও খলিল শব্দটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। খালাত অর্থ সমস্বভাববিশিষ্ট দুই বন্ধু। সমস্বভাবসম্পন্ন বলেই তাদেরকে বলা হয় খলিল।

হজরত ইব্রাহিমকে খলিল বলার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। সৃষ্টির সম্মুখে তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণের আবেদন পেশ করতেন না। বর্ণিত হয়েছে, নমরূদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হলে হজরত জিবরাইল তাঁকে বলেছিলেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন। তিনি তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক আমার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। সুতরাং প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন।

জ্ঞাতব্যঃ খলিল অর্থ যিনি দান করেন কিন্তু গ্রহণ করেন না। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে লিখেছেন, রসুল স. একদিন হজরত জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত ইব্রাহিমকে খলিল বানিয়েছেন— কারণ কী? হজরত জিবরাইল বললেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবকে আহার করানোর জন্য। ইবনে আবাজীর উক্তিরূপে ইবনে মুনজির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার হজরত ইব্রাহিম হজরত আজরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রভু প্রতিপালক আমাকে খলিল বলেছেন কেনো? হজরত আজরাইল বললেন, আপনি সৃষ্টিকে দিতে পছন্দ করেন— কিন্তু সৃষ্টি থেকে কিছু নিতে পছন্দ করেন না। হজরত আবু হোরায়রার এ রকম একটি উক্তিকে রসুল স. এর বাণী বলে উল্লেখ করেছেন দায়লামী। কিন্তু তাঁর সনদের শেষ দিকটি দুর্বলতাদুষ্ট। ইবনে বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত ইব্রাহিমের নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন, তুমিতো জানো আমি কেনো তোমাকে খলিল বলি। হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি জানি না। আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম; তুমি দিতে ভালোবাসো। কিন্তু নিতে ভালোবাসো না।

একটি প্রশ্নঃ একটু আগেই বলা হয়েছে খিলাল অর্থ ওই বন্ধুদ্বয় যারা পরস্পরের প্রয়োজন পূরণ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তো সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তবে এ রকম বলার অর্থ কী?

উত্তরঃ সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক তাঁর নামের সঙ্গে নয়। বরং নামের প্রতিক্রিয়া বা কার্যকলাপের (আফআলের) সঙ্গে। যেমন রহমান ও রহীম আল্লাহ্‌পাকের দু'টি গুণবাচক নাম। উভয় নামের উৎস রহমত বা দয়া। তিনি দয়াদ্র। তিনি অপরকে দয়া করে থাকেন এবং অতিথিপরায়ণতার প্রতি আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌পাক মানুষের মতো চিত্ত বা অন্তর থেকে এবং অন্তরে সৃষ্ট দয়া বা করুণার প্রভাব থেকে পবিত্র। প্রভাবিত হওয়া অক্ষমতার চিহ্ন। আর আল্লাহ্‌পাক সকল অক্ষমতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাই রহমান বা রহীম থেকে উৎসারিত করুণার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও তিনি যে সৃষ্টির মতো দয়াদ্রচিত্ত— তা কিন্তু নয়। কারণ, তিনি সকল আনুরূপ্য থেকে পবিত্র। তেমনি এখানে খিল্লাত বা খুল্লাত শব্দের অর্থ হিসেবে যে প্রয়োজন পূরণের কথা বলা হয়েছে, সেই প্রয়োজন অর্থ হজরত ইব্রাহিমের প্রয়োজন পূরণ যা বিশুদ্ধ ভালোবাসার প্রতিফল। ওই ভালোবাসা শুরু হয় আল্লাহ্‌র দিক থেকে। কিন্তু তা আল্লাহ্‌র প্রয়োজন হিসেবে নয়—কেবলই ভালোবাসা ও দয়া হিসেবে।

আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন— এ কথার মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিমের অনুসরণকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। কেননা, যিনি আল্লাহ্‌র খলিল তাঁর আনুগত্য যে অত্যাবশ্যক— এ কথা সুনিশ্চিত। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. বলেছেন, খলিল হচ্ছেন ওই সুহৃদ ও সহচর যাঁর নিকট প্রেম-ভালোবাসার রহস্য উন্মোচন করা হয়। আব্দুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁদের আপনাপন তাফসীরে হজরত জায়েদ বিন আসলামের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলো নমরূদ। লোকেরা অভাবে পড়ে তার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করতো। সে তখন প্রার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করতো, তোমাদের প্রতিপালক কে? প্রার্থীরা বলতো, আপনি। এ রকম বললে সে খাদ্য দান করতো। একদিন হজরত ইব্রাহিম গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। নমরূদ বললো, তোমার প্রতিপালক কে? হজরত ইব্রাহিম বললেন, যার অধিকারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। নমরূদ বললো, আমিও জীবন মৃত্যুর অধিকারী। (বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি আবার জীবন ভিক্ষাও দিতে পারি)। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌ সূর্যের অভ্যুদয় ঘটান পূর্বাকাশে (তুমি যদি প্রতিপালক হও) তবে পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঘটাও। এ কথা শুনে নিরুত্তর হয়ে গেলো নমরূদ। কিন্তু সে হজরত ইব্রাহিমকে কোনো খাদ্যশস্য দিলো না। হজরত ইব্রাহিম গৃহাভিমুখী হলেন। ফেরার পথে একটি টিলার নিকট দিয়ে গমন কালে তিনি ভাবলেন, থলিতে করে এখান থেকে কিছু মাটি নেয়া দরকার। রাতে গৃহে পৌছলে বাড়ীর লোকেরা তাহলে ভর্তি থলি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ হবে না (সকালে অবশ্য আসল কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে)। তিনি তখন সেখান থেকে কিছু বালি থলিতে ভরে নিয়ে বাড়ীতে এলেন। ঘরের এক কোণে থলি রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। তারপর নিদ্রাভিভূত হলেন। তাঁর স্ত্রী থলিটি উঠিয়ে নিয়ে আহার্য প্রস্তুত করতে বসলেন। দেখলেন, খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ রয়েছে থলিটি। রান্না হওয়ার পর তিনি হজরত ইব্রাহিমকে ঘুম

থেকে জাগালেন এবং রান্না করা খাদ্য রাখলেন তাঁর সম্মুখে। হজরত ইব্রাহিম বিস্মিত হয়ে বললেন, রান্না হলো কেমন করে (ঘরেতো কিছু ছিলো না)। স্ত্রী বললেন, আপনিইতো থলি ভর্তি করে খাদ্যশস্য নিয়ে এসেছেন। হজরত ইব্রাহিম বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে আল্লাহ্পাকের অযাচিত দান। তিনি আল্লাহ্পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

আবু সালেহের বর্ণনা থেকে ইবনে আবী শায়বা লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম খাদ্যশস্য আনতে গেলেন, কিন্তু পেলেন না। প্রত্যাবর্তনের পথে একটি লাল টিলা থেকে কিছু বালি নিয়ে তিনি তাঁর থলি পূর্ণ করলেন। বাড়ী ফিরে এলে তাঁর পরিবারের লোকেরা বললেন, থলির মধ্যে কী? তিনি বললেন, লাল গম। তাঁর সহধর্মিনী থলি খুলে দেখলেন, এক আশ্চার্যজনক লাল গমে থলি পরিপূর্ণ। সেখান থেকে কিছু গম নিয়ে তিনি মাটিতে বপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই গম বীজ থেকে উৎপন্ন হলো গমের গাছ। আর সেই গাছে দেখা গেলো অনেক শীষ।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তাঁর বসতবাটি ছিলো সিরিয়ায়। সেখান দিয়ে গমনকারী সকল পথিককে তিনি সাদরে আপ্যায়ণ করাতেন। একবার দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। অভুক্ত লোকেরা একে একে তাঁর নিকট সমবেত হতে শুরু করলো। তিনি তখন সকলের জন্য আহারের বন্দোবস্ত করলেন। মিসরে বাস করতেন তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর নিকট থেকে প্রতি ফসলের মৌসুমে খাদ্যশস্য আসতো। দুর্ভিক্ষের বছরেও তিনি তাঁর কয়েকজন ক্রীতদাসকে উটসহ ফসল আনতে পাঠালেন। মিসরীয় বন্ধু ক্রীতদাসদেরকে বললেন, (শস্যহানী হয়েছে তাই) এবার যদি হজরত ইব্রাহিম তাঁর নিজের প্রয়োজনের কথাও বলে পাঠাতেন, তবুও ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় ছিলো না। সকলের মতো আমরাও এবার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। বিফল মনোরথ ক্রীতদাসেরা ফেরার পথে মরুভূমি অতিক্রম করতে করতে ভাবতে লাগলো, এভাবে শস্যশূন্য অবস্থায় প্রত্যাগমন লজ্জাজনক। বরং আমাদের উচিৎ, এখানকার কিছু মাটি দিয়ে থলিগুলো পূর্ণ করে নেয়া। যাতে প্রথম দর্শনে অপেক্ষমান জনতা হতাশ না হয়। মনে করে, আমাদের সকল উটই শস্যবাহী। ক্রীতদাসেরা তাই করলো। সকল থলি বালি ও মাটি দিয়ে পূর্ণ করে উটের পিঠে চাপিয়ে উপস্থিত হলো হজরত ইব্রাহিম সকাশে। তখন রাত্রি। হজরত ইব্রাহিমের স্ত্রী ছিলেন নিদ্রামগ্না। হজরত ইব্রাহিম ছিলেন জেগে। গৃহাঙ্গনের বাইরে অপেক্ষা করছিলো বুভুক্ষু জনতা। হজরত ইব্রাহিম ক্রীতদাসদের নিকট থেকে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে দুঃখিত হলেন।

আর ওদিকে অপেক্ষমান জনতা মনে করলো আহারের আয়োজন হতে আর দেরী নেই। সকালে একটু দেরী করে নিদ্রাভঙ্গ হলো হজরত সারা'র। তিনি বললেন, কী আশ্চর্য ক্রীতদাসেরাতো এখনো এলো না। ক্রীতদাসেরা জবাব দিলো, এইতো আমরা সকলেই এসেছি। হজরত সারা বললেন, তোমরা কি কিছু আনোনি? ক্রীতদাসেরা বললো, এনেছি। হজরত সারা উট থেকে নামানো থলিগুলোর নিকটে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, থলিগুলো অত্যন্ত উন্নতমানের

আটায় পরিপূর্ণ। তিনি পরিচারকদেরকে রুটি তৈরীর নির্দেশ দিলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হজরত ইব্রাহিম শয্যাগ্রহণ করেছিলেন। ইত্যবসরে তিনিও গাত্রোত্থান করলেন। আহার্যের গন্ধ পেয়ে তিনি বললেন, সারা! আহারের আয়োজন হলো কীভাবে? হজরত সারা বললেন, আপনার মিসরবাসী বন্ধু আটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, না। এ রিজিক প্রেরণ করেছেন আমার খলিল (আল্লাহ্)। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক হজরত ইব্রাহিমকে খলিল বানিয়ে নিয়েছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ রসুলশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মর্যাদা ছিলো খলিলের মর্যাদারও উর্ধ্বে। তাঁর মাকাম বিশুদ্ধ প্রেমাস্পদত্বের (খালেস মাহবুবিয়াতের) মাকাম। তিনি স. ছিলেন আল্লাহ্পাকের মাহবুব (প্রিয়জন)। খলিলতো ছিলেনই। তিনি স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপ্রতিপালক ব্যতীত যদি অন্য কাউকে বন্ধু (খলিল) রূপে গ্রহণ করতাম তবে গ্রহণ করতাম আবু বকরকে। কিন্তু আবু বকর আমার ভ্রাতা ও সুহৃদ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। বোখারী ও মুসলিম অনুরূপ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বলেছেন, রসুল স.বলেন, শুনে রাখো তোমাদের সাথী (আমি) আল্লাহ্র খলিল।

হজরত জুনদুব বলেছেন, আমি স্বকর্ণে মৃত্যুর পূর্বে রসুল স. কে বলতে শুনেছি— আল্লাহ্ আমাকে করেছেন খলিল। যেমন হজরত ইব্রাহিমকে করেছিলেন। হাকেম। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের মতো আমিও আল্লাহ্র খলিল। আর কিয়ামত দিবসে আমি হবো আদম সন্তানদের সর্দার। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন, আছা আই ইয়াব্ আছাকা রব্বুকা মাক্বামাম মাহ্মুদা (অচিরেই আপনার প্রভুপ্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহ্মুদে অধিষ্ঠিত করবেন)।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম ছিলেন আল্লাহ্র খলিল। প্রকৃত অর্থেই খলিল ছিলেন তিনি। কিন্তু তোমরা শুনে রাখো, আমি আল্লাহ্র হাবিব (প্রিয়জন)। — এ বাক্যটি কোনো গৌরবপ্রকাশক বাক্য নয়। (কিয়ামত দিবসে) আমিই সর্বপ্রথম শাফায়াত করবো এবং আমার শাফায়াত মঞ্জুর করা হবে। এই উক্তিটিও কোনো দম্ভোক্তি নয়। আমি সর্বপ্রথম বেহেশতের শিকল ধরে নাড়া দেবো। আল্লাহ্পাক তখন আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন বেহেশতের দরোজা। আমার সঙ্গে তখন থাকবে ফকির ও মু'মিনদের একটি দল। এ কথাও দর্পমুক্ত যে, কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকল মানুষের মধ্যে আমিই হবো সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে তিবরানী ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত ইব্রাহিমকে করেছেন খলিল (বন্ধু)। হজরত মুসাকে করেছেন কলিম (কথোপকথনকারী)। আর মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে দিয়েছেন দীদার (দর্শন)।

রসুল স. ছিলেন মাহবুবিয়াতের মাকামধারী— যে মাকাম খলিলগণের মাকাম অপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু তিনি স. চাইতেন যেনো তাঁর উম্মতের অনেকে খুল্লাতের মাকামে উন্নিত হয়। তাহলে খুল্লাতের কামালিয়াত (পূর্ণত্ব) তাঁর নিজস্ব কামালিয়তের অংশ হয়ে যাবে। কেননা এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অনুসরণকারীর কামালিয়ত অনুসরণীয়ের কামালিয়তের অন্তর্ভূত। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যানুসারে ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে এ কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, আউলিয়াগণের কারামত তাঁদের অনুসরণীয় পয়গম্বরের মোজেজা (মোজেজার প্রতিবিম্ব অথবা ধারাবাহিকতা)।

রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, উত্তম পদ্ধতি প্রচলনকারী ওই পদ্ধতির অনুসারীদের সমান পুণ্য অর্জন করবে। এতে করে অনুসরণকারীদের সওয়াবও হ্রাস করা হবে না। তিনি স. আরো বলেছেন, পুণ্যপদ্ধতি উদ্ভাবনকারী ওই পুণ্যপদ্ধতি সম্পাদনকারীর মতোই। এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উম্মতের আমল ও কামালিয়ত রসুল স. এরই অধিকারভূত। তিনি স. তাই তাঁর উম্মতের কামালিয়তের বিস্তার (প্রশস্ততা) কামনা করেছিলেন এভাবে— আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিঁও ওয়াআলা আলি মোহাম্মদ কামা সল্লাইতা আলা ইব্‌রহিম ওয়া আলা আলি ইব্‌রহিম (হে আল্লাহ্ তুমি মোহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করো যেমন করেছো ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের উপর)। আল্লাহ্‌পাক রসুল স. এর এই আকাংখা পূর্ণ করেছেন। তাঁর মহাপ্রস্থানের এক হাজার বছর পর খুল্লাতের এই মাকাম তিনি দান করেছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. কে। তাই হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. ও আল্লাহ্‌পাকের খলিল। এ খলিলের ফজিলত রসুল পাক স. এর পরে এভাবে (উম্মতের মধ্যে) কেউ লাভ করেন নি। সরাসরি ও নিখুঁত অনুসরণের কারণে তাঁর স. কোনো কোনো সম্মানিত সাহাবী এবং আহলে বাইতের সদস্যগণ খুল্লাতের মাকাম অতিক্রম করে মাহবুবিয়াতের মাকাম পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলের মাধ্যমে এই মাকামে উপস্থিত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে– ইনকুংতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিয়্যুনি ইউহ্ বিবকুমুল্লহ্ (যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসারী হও; আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন)। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক এভাবে কাউকে কাউকে বিশেষভাবে অনুগ্রহরঞ্জিত করে মর্যাদামন্ডিত করেছেন। আর আল্লাহ্‌পাক যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তাঁর বিশেষ অনুকম্পা দানে ধন্য করেন।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের অবস্থা বৃষ্টিপাতের মতো। বুঝা যায়না যে (এই বৃষ্টিপাতের) প্রথম দিক উত্তম না শেষ দিক। অথবা তাদের দৃষ্টান্ত যেনো একটি বাগান— যে বাগানে প্রথম বৎসরে এক দলকে এবং দ্বিতীয় বৎসর অন্য দলকে ভোগদখলের অধিকার দেয়া হয়। এ রকম হওয়াও সম্ভব যে, প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দল অধিক রিজিক প্রাপ্তিতে আনন্দচিত্ত হবে। আবু জাফর বিন মোহাম্মদের বর্ণনা থেকে রজীন এই হাদিসটি এনেছেন।

এই মাসআলাটি সহীহ্ কাশ্‌ফ (বিশুদ্ধ অন্তর্দর্শন) দ্বারাও প্রমাণিত। সুতরাং কেউ যদি একে মান্য নাও করে তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরাতো ওই সকল লোকের উদ্দেশ্যে বলছি যারা উত্তম ও পথপাপ্ত। তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কতিপয় স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন আলেম না বুঝতে পেরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর দাবিকে অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি (হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী) কোনো অসম্ভব প্রাপ্তির দাবি করেননি। অবিসংবাদিত বুজুর্গবৃন্দের প্রতি সুধারণা রাখাই সমীচীন। অন্তঃত পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময় কেউ কেউ বলতো, এই কোরআন ওই দু'টি জনপদের মধ্যে বিত্তশালী জনপদের কারো উপর অবতীর্ণ করা হলো না কেনো? আল্লাহ্পাক তাদের কথার উত্তরে বলেছেন, মানুষেরা আল্লাহ্র রহমতকে নিজেরাই বন্টন করেছে।(যাকে ইচ্ছা তাকেই পয়গম্বর বানিয়ে দিয়েছে)। কেউ কেউ বলতো, আমাদের মধ্য থেকে ওই ব্যক্তির উপর কেনো কোরআন নাজিল করা হলো (এমনটি কখনও হতে পারে না)। সেতো মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্পাক তার উত্তরে বলেছেন, সকলেই (এক সময়) জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী কে।

সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই খুল্লাতের মাকাম অতিক্রম করে মাহবুবিয়াতের মাকামে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা হজরত ইব্রাহিম খলিলের চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী নন। কারণ, সাহাবীগণের প্রাপ্তি ঘটেছে রসুল স. এর অনুসরণের মাধ্যমে। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের প্রাপ্তি মাধ্যম বিবর্জিত— সরাসরি। সুতরাং এ কথাটি স্মরণে রাখতে হবে যে, মাধ্যমসহ এবং মাধ্যম বিবর্জিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে বিপুল ব্যবধান।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানীও খুল্লাতের মাকামে উপনীত হয়েছিলেন অনুসরণের মাধ্যমে। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। মাহবুবিয়াতের মঞ্জিলের দিকে ছিলো তাঁর নিরন্তর অভিযাত্রা। এভাবে যথাঅনুসরণের মাধ্যমেই তিনি মাহবুবিয়াতের মাকাম লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দানে মর্যাদায়িত করেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৬

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ۝

❒ আস্মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই, এবং সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ্পাকের অধিকারভূত। এই বিশাল সৃষ্টির তিনিই একক অধীশ্বর ও স্রষ্টা। কিন্তু এখানে কেবল আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বস্তুনিচয়ের মালিকানার কথা বলা হয়েছে। মানুষের দৃষ্টি সাধারণত স্থূল। দৃষ্টি গ্রাহ্যতার মধ্যেই তাদের চিন্তা আবদ্ধ থাকে। তাই এখানে দৃষ্টিসীমা বহির্ভূত সৃষ্টির উল্লেখ না করে বলা হয়েছে— আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্র। এই বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম যে সৎকর্মশীলতার সঙ্গে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে'— কথাটির সঙ্গে অর্থগতভাবে সম্পৃক্ত। এভাবে বাক্যটির অর্থ হবে— সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং

অধীশ্বর যেহেতু আল্লাহ্, তাই সকলের জন্য এ দায়িত্বটি অপরিহার্য যে তারা আল্লাহ্‌মুখী হবে (আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করবে)। পূর্ববর্তী আয়াতের 'আল্লাহপাক্ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন' কথাটির সঙ্গেও এই আয়াতটি সম্মিলিত অর্থ প্রকাশ করতে পারে। এভাবে অর্থ হতে পারে— আল্লাহ্‌পাক যেমন হজরত ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে অন্যদেরকেও তাঁর বন্ধুত্ব দানে ধন্য করতে পারেন। সুতরাং সৃষ্টির জন্য তাঁর আনুগত্য অপরিহরণীয়। তিনিই সমকক্ষতাবিহীন একক অধিকর্তা। তিনিই সৃষ্টির সৎ ও অসৎ কর্মের একক বিনিময় প্রদাতা।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। এই পরিবেষ্টন আমাদের ধারণাসঞ্জাত পরিবেষ্টনের মতো নয়। কারণ তাঁর সত্তা, গুণবত্তা এবং কার্যকলাপ ধারণাতীত। এখানে এ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ এই যে, সকল সৃষ্টি তাঁর অধীন। সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রকৃত অস্তিত্ব নয়। আল্লাহ্‌পাক অনুকম্পাবশতঃ সৃষ্টিকে সম্ভাব্য অস্তিত্ব দান করেছেন। অতএব করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া অন্য দিকে মুখ ফিরানো (অন্য কিছুর নিকট আত্মসমর্পণ করা) বৈধ নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে পরিবেষ্টনের অর্থ জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিবেষ্টন। সৃষ্টির সকল কিছু তাঁর জ্ঞানায়ত্ব ও ক্ষমতাভূত (যদিও এই জ্ঞানায়ত্ব ও ক্ষমতাভূত অবস্থাটি আমাদের জ্ঞানাতীত ও ধারণার অতীত)। কাজেই তিনিই সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের বিনিময় প্রদান করবেন। উত্তম বিনিময় দান করবেন পুণ্য কর্মের জন্য। মন্দ কর্মের জন্য প্রদান করবেন মন্দ বিনিময়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মুসতাদরাক গ্রন্থে হাকেম লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মূর্খতার যুগে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং রমণীদেরকে মীরাস (সম্পদের উত্তরাধিকার) দেয়া হতো না। ইসলামের আবির্ভাবের পর বিশ্বাসীরা রসুল স. এর নিকট নারী ও শিশুর মীরাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করলেন—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৭

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ○

❑ এবং লোকে তোমার নিকট নারীদিগের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানিতে চায়, বল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন এবং পিতৃহীন নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা

তাহাদিগকে বিবাহ করিতে চাহ ও অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং পিতৃহীনদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদিগকে শুনান হয় তাহাও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া হয়। এবং যে কোনো সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

ইসতিফতা অর্থ জানতে চাওয়া। সিহাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে ইসতিফতা অর্থ ফতোয়া (অভিমত)। জটিল মাসআলার (সমস্যার) উত্তর।

ইবনে মুনজির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, তখনকার মানুষেরা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকা এবং নারীকে সম্পদের উত্তরাধিকার দিতো না। এরপর যখন সুরা নিসার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হতে শুরু করলো, তখন অনেকের নিকটই বিষয়টি হয়ে পড়লো অত্যন্ত কঠিন। সকলে মিলে রসুল স. এর নিকটে নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলেন। সে কথাই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে এভাবে— ওয়া ইয়াসতাফতুনাকা ফিন্নিসাই (এবং লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায়)। ইবনে জারীর ও আবদ্ বিন হুমাইদ মুজাহিদের উক্তিরূপে এ রকমই বর্ণনা করেছেন আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে উম্মে কোহার মেয়েদের সম্পর্কে (ঘটনাটি এই সুরার প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে)।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্য ওই ব্যক্তি, যে ছিলো একটি এতিম বালিকার অভিভাবক। তার সম্পদের মধ্যে এতিম বালিকাটিরও অংশ ছিলো। বালিকাটির অন্যত্র বিবাহ হলে সম্পদ অন্যত্র চলে যাবে বলে সে বিবাহে বাধা প্রদান করে আসছিলো। বাগবীর বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, এতিম বালিকাটি ছিলো কুৎসিতদর্শনা। তাই সে নিজে তাকে বিবাহ করতে রাজী ছিলো না। আবার সম্পদ অন্যত্র চলে যাবে বলে অন্যের সঙ্গে বিবাহেও সে ছিলো গররাজী। সে চাইছিলো বালিকাটির মৃত্যু হোক। তাহলে সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার ভয় আর থাকবে না। তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। অন্য একটি বর্ণনায় জননী আয়েশার উক্তিরূপে এসেছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই পিতৃহীনা রমণীকে লক্ষ্য করে, যে ছিলো এক ব্যক্তির প্রতিপালনাধীনা। মেয়েটি সুন্দর ছিলো না। সুন্দর হলে হয়তো লোকটি তাকে বিয়ে করতো। কিন্তু যথোপযুক্ত মোহর দিতো না।

জ্ঞাতব্যঃ আহকামুল কোরআন গ্রন্থে কাযী ইসমাইল লিখেছেন, আবদুল মালেক বিন মোহাম্মদ বিন হাজম বলেছেন, ওমরা বিনতে হাজম ছিলেন হজরত সা'দ বিন রবীর স্ত্রী। হজরত সা'দ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই ওমরা হয়ে পড়লেন বিধবা এবং তাঁর গর্ভজাত কন্যাটি হয়ে পড়লো এতিম। মেয়েটি তার পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। বোখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে— উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, 'মা ইউত্লা আলাইকুম

ফিল কিতাব' (আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন) — এ কথার মাধ্যমে ওই আয়াতের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি আশংকা করো যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে (আয়াত- ৩)।

'কুলিল্লাহু ইউফতিকুম ফিহিন্না'— এ কথার অর্থ (হে রসুল) আপনি বলে দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাঁর হুকুম বর্ণনা করছেন মেয়েদের সম্পর্কে আল্লাহ্র কিতাবে অর্থাৎ তিনি উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এ রকম হতে পারে যে, এখানে 'মা ইউত্লা' উদ্দেশ্য এবং 'ফিল কিতাব' বিধেয়। এভাবে কথাটির অর্থ হবে— যে হুকুম তোমাদেরকে শোনানো হচ্ছে তা কিতাবের মধ্যে (লাওহে মাহ্ফুজে) সুরক্ষিত আছে। এখানে 'মা ইউত্লা' এর কর্মপদ হিসেবে একটি উহ্য ক্রিয়াও থাকা সম্ভব। যদি তাই হয় তবে উহ্য ক্রিয়া সহযোগে অর্থ হবে এ রকম—— যে হুকুম শোনানো হচ্ছে তার বর্ণনাকারী আল্লাহ্।

'ফি ইয়াতামান নিসায়ি' অর্থ পিতৃহীনা নারী। এই পিতৃহীনা নারী সম্পর্কে নির্দেশ হচ্ছে— তাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান করো না। এখানে তাদের প্রাপ্য অর্থ মীরাস, মোহর ইত্যাদি। এরপর বলা হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও। এ কথার অর্থ তোমরা একবার তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, আরেকবার পিছিয়ে যাও। এখানে প্রথম অর্থের মধ্যে (একবার বিয়ে করতে চাও) 'ফি' এবং দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে (আরেকবার পিছিয়ে যাও) 'আন' শব্দ দু'টো উহ্য রয়েছে। ইবনে মুনজির বলেছেন, প্রথম অর্থটি করেছেন হাসান এবং দ্বিতীয়টি করেছেন ইবনে সিরিন। কিন্তু ইবনে আবী শায়বা বলেছেন দ্বিতীয়টি হাসানের।

অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে— এই অসহায় শিশুদেরকে মূর্খতার যুগে মীরাস দেয়া হতো না। অভিভাবকেরাই তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করতো। এতিম শিশু সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'এতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও।' আর এই আয়াতে দেয়া হচ্ছে পিতৃহীনদের প্রতি ন্যায়বিচারের নির্দেশ। অর্থাৎ বলা হচ্ছে, তাদেরকেও তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও।

শেষে বলা হচ্ছে, যে কোনো সৎকাজ তোমরা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। এখানে 'যে কোনো সৎকাজ' অর্থ পিতৃহীন নারী ও পিতৃহীন শিশুদের জন্য যে কোনো কল্যাণজনক কর্ম। আল্লাহ্পাক সকল সৎকর্ম সম্পর্কেই সবিশেষ অবহিত এবং তিনি সেগুলোর যথাবিনিময় প্রদান করবেন।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী, আবু দাউদ, হাকেম এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি লিখেছেন, জননী সাওদা হয়ে পড়েছিলেন বিগত যৌবনা। তিনি আশংকা করলেন, রসুল স. হয়তো তাঁকে পরিত্যাগ করবেন। এ কথা ভেবে তিনি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, আমি আপনার সঙ্গে রাত্রিযাপনের অধিকার আয়েশাকে দিয়ে দিলাম। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

❑ কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা আপোষ নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন দোষ নাই, এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ লোভ হেতু স্বভাবতঃ কৃপণ; এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও সাবধান হও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

দাম্পত্য জীবনে জটিলতা দেখা দিলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আপোষরফা করাতে কোনো দোষ নেই। এই আয়াতে যে জটিলতার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে— স্বামী যদি দুর্ব্যবহার করে অথবা উপেক্ষা করে— যেমন দাম্পত্য সম্পর্ক শিথিল হওয়া, কথাবার্তা কম হওয়া ইত্যাদি; এমতাবস্থায় সন্ধির উদ্দেশ্যে স্ত্রী যদি মোহরানার দাবি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ছেড়ে দেয়, অবশ্য পরিশোধ্য খোরপোষের দাবি শিথিল করে অথবা রাতের স্বামীসঙ্গের অধিকার (পালা) পরিত্যাগ করে, তবে তা অতি উত্তম। এ রকম অবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কিছু সম্পদও প্রদান করতে পারে। বাগবী লিখেছেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তোমার বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে। এবার আমি কোনো যুবতী সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করতে চাই এবং বিবাহের পর তোমার চেয়ে তাকেই পালা বেশী করে দিতে চাই। এই সিদ্ধান্তে তুমি যদি প্রসন্ন হও, তবে আমার কাছে থাকতে পারো। আর যদি অপ্রসন্ন হও তবে চলে যেতে পারো। স্বামীর এই সিদ্ধান্তে যদি স্ত্রী সম্মত হয় তবে এটা হবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুগ্রহ। এ রকম ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর উপর কোনো জুলুম করতে পারবে না। আর স্ত্রী সম্মত না হলে স্বামীকে তার হক পুরোপুরি আদায় করতে হবে (পালা কম কিংবা পরিত্যাগ করা যাবে না)। অন্যথায় স্বামী তার স্ত্রীকে শিষ্টাচারের সঙ্গে মুক্ত করে দিবে। স্বামী যদি এমতাবস্থায় স্ত্রীকে মুক্তি না দেয় এবং অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর হক পুরাপুরি আদায় করে, তবে সেটা হবে স্ত্রীর প্রতি তার অনুগ্রহ। অর্থাৎ স্ত্রী তার হক ছেড়ে দিয়ে এক সঙ্গে থাকতে চাইলে সে হবে স্বামীর প্রতি অনুগ্রহকারিণী আর স্বামী তার হক ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে রাখতে চাইলে সে হবে স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহকারী। এভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করা সৎকর্মপরায়ণতার নিদর্শন। আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়।'

মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, বৃদ্ধা স্ত্রীর স্বামী কোনো যুবতী রমণীকে বিবাহের পর যদি প্রথম স্ত্রীকে বলে, এই শর্তে আমি তোমাকে কিছু সম্পদ প্রদান করবো যে, তুমি তোমার পালার অধিকার শিথিল করবে (কমিয়ে দেবে)। অর্থাৎ

তোমার পালা অধিকাংশ কিংবা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিবে আমার নতুন স্ত্রীর জন্য— এ কথায় বৃদ্ধা স্ত্রী যদি সম্মত হয় তবে তা অতি উত্তম। আর যদি সম্মত না হয়, তবে পালার ক্ষেত্রে স্বামীকে সমতা রক্ষা করে চলতেই হবে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে হজরত আলী বলেছেন, যদি কোনো স্বামী তার কুরূপা অথবা যৌবনহীনা স্ত্রীকে সুনজরে না দেখে, স্ত্রীও যদি তার স্বামী থেকে পৃথক হতে না চায় এবং দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য স্ত্রী যদি তার স্বামীকে কিছু সম্পদ প্রদান করে, তবে ওই সম্পদ স্বামীর জন্য হালাল। সম্পদ না দিয়ে স্ত্রী যদি তার পালার অধিকার ছেড়ে দেয়, তবুও তা সিদ্ধ হবে।

'সুল্‌হা' অর্থ সন্ধি। 'বাইনাহুমা' অর্থ নিজেদের (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে)। 'বাইনাহুমা সুল্‌হা' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাম্পত্য বিষয়ক জটিলতার সংবাদ স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উত্তম। জটিলতার নিরসনও নিজেরা করা ভালো। দাম্পত্য জীবনের গোপন কথা অন্য কেউ যেনো জানতে না পারে।

'ওয়াস্‌ সুল্‌হু খইর' অর্থ (এবং সকল অবস্থায় আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়)। ঝগড়া বিবাদ কখনই উত্তম নয়। বিবাদ মিটানোর নিমিত্তে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু সম্পদ দান করে তবে তাকে বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে কেউ যেনো ঘুষ মনে না করে। এ রকম অপধারণার নিরসনার্থে এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে 'আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়'।

বিশেষভাবে স্বামী-স্ত্রীর সন্ধির উদ্দেশ্যে এই আয়াতটি নাজিল হলেও এর নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। তাই সকল প্রকার আপোষ নিষ্পত্তি বা সন্ধি এই আয়াতের নির্দেশের আওতাভূত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে।

সন্ধির প্রকারভেদঃ সন্ধি তিন প্রকার। ১.স্বীকারোক্তির সঙ্গে সন্ধি। ২. মৌনতাসহ সন্ধি। ৩. দাবি অস্বীকার করার সঙ্গে সন্ধি।

আলোচ্য আয়াতের সন্ধির হুকুমটি একটি সাধারণ হুকুম। তাই ইমাম শাফেয়ী ছাড়া অন্য ইমামগণ সকল প্রকার সন্ধিকে সিদ্ধ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সন্ধির শেষোক্ত প্রকার দু'টি নাজায়েয। কেননা রসুলুল্লাহ্‌ স. এরশাদ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সকল প্রকার সন্ধি জায়েয। কিন্তু ওই সন্ধি নাজায়েয যা হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে দেয়। মুসলমানেরা সন্ধির শর্ত মান্য করতে বাধ্য। কিন্তু ওই শর্তকে মানতে তারা বাধ্য নয়, যা হালালকে হারাম করে দেয়। হাকেম। হাদিসটির ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট কিছু দাবি করে বসলো। দাবিটি মিথ্যা। এমতাবস্থায় দু'জনের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলো। সন্ধির শর্তানুযায়ী দাবিদারের দাবি (আংশিক হলেও) প্রত্যর্পণ করতে হবে। এমতাবস্থায় দাবিদারের মিথ্যা দাবি সত্যে পরিণত হলো। আর যার উপর দাবি করা হয়েছে তাকেও আত্মসমর্পণ করতে হলো মিথ্যার নিকট। বিবাদ মেটানোর জন্য এভাবে মিথ্যা পরিণত হলো সত্যে এবং সত্য পরিণত হলো মিথ্যায়। আর দাবিদারকে (আংশিক বা সম্পূর্ণ) যে সম্পদ দেয়া হলো তা হলো এক ধরনের উৎকোচ। উৎকোচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে বলে এই নিয়মে সম্পাদিত সন্ধি নাজায়েয।

ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত অন্য ইমামত্রয় বলেছেন, বর্ণিত হাদিসটি আমাদের অভিমতের বিরুদ্ধে নয়। বরং আমাদের অভিমতটি প্রমাণিত হয়েছে এ হাদিসের মাধ্যমেই। কেননা রসুল স. বলেছেন, পূর্ব শর্ত ব্যতীত সকল সন্ধি জায়েয। যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালে পরিণত করে, তাতো সকল অবস্থায় নাজায়েয। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে— কোনো ব্যক্তি তার এক স্ত্রীর সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করলো যে, সে তার অপর স্ত্রীকে সম্ভোগ করবে না অথচ স্ত্রীর সপত্নীর সঙ্গে সহবাস হালাল। এ ধরনের সন্ধি বাতিল। আবার কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে স্ত্রী যদি তার স্বামীর সঙ্গে এ কথা বলে সন্ধি করে নেয় যে, আমি আমার সহবাসের পালা আমার সপত্নীকে দিলাম— তবে এ ধরনের সন্ধি ঐকমত্যানুসারে বিশুদ্ধ হবে। কেননা সন্ধির পূর্বে পালাবণ্টনের ক্ষেত্রে একজনকে অপরজন অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান ছিলো হারাম। কিন্তু সন্ধি সম্পাদনের পর এ রকম অগ্রাধিকার দান হালাল। নীরবতা এবং অস্বীকৃতির পর কিছু দেয়া নেয়ার উপর সন্ধি করা জায়েয। কেননা এক্ষেত্রে দাবিদার তার ধারণা মোতাবেক আপন হক আদায় করবে এবং যার উপর দাবি প্রয়োগ করা হয়েছে সে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য কিছু দিতে সম্মত হবে। এ রকম করা জায়েয। জীবন রক্ষার জন্য সম্পদ প্রদান জায়েয। অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ঘুষ প্রদান করা মোবাহ্ (বৈধ)। দাবিদার তার অধিকার প্রমাণ করতে অক্ষম হলেও দাবিকৃত ব্যক্তি যদি জানে যে দাবিদারের দাবি সঠিক—তৎসত্ত্বেও তা স্বীকার না করে দাবির কিছু অংশ প্রদানের মাধ্যমে যদি সন্ধি স্থাপিত হয় তবে, দাবির বাকী অংশ রইলো আল্লাহ্র অধিকারে। মিথ্যা দাবির মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পদ ভক্ষণ হালাল নয়। কারণ, জেনেশুনে কারো অধিকার আত্মসাত করা নাজায়েয। তবে যদি দাবি সম্পর্কিত মূল বিবাদকে এড়িয়ে কিছু লেনদেনের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন করতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে যায় তবে তা জায়েয— ইমামত্রয় এ কথা বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন নাজায়েয।

মাসআলাঃ স্বীকারোক্তির দাবি উত্থাপনের পর সন্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু সম্পদ দেয়া হলে তাকে বিক্রয় মনে করতে হবে (যদি সম্পদের দাবি হয়)। যে সম্পদের দাবি করা হয়েছে, সে সম্পদ দিতে স্বীকৃত হলে তার মূল্যকে বিক্রয় মূল্য বলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে শোফা'র নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় দোষত্রুটি অবলোকনের অধিকার, শর্তের অধিকার এবং দেখার অধিকার থাকবে। পণ্যবিনিময় যদি অজ্ঞাতসারে হয় তবে স্বীকারোক্তির সন্ধি বতিল হয়ে যাবে। কিন্তু দাবিকৃত সামগ্রী উপস্থিত না করলে স্বীকারোক্তির সন্ধি বাতিল হবে না। কেননা এক্ষেত্রে পণ্য পরিশোধের বিষয়টিতো রহিতই ছিলো। আদায় করা হয় নি। (রহিত বিষয়ের হক সম্পর্কে না জানা দূষণীয় নয় এবং তা বিবাদের কারণও হতে পারে না)। তবে এক্ষেত্রে যে দাবির মাল দিতে সম্মত হয়েছে, তার পণ্য পরিশোধের ক্ষমতা থাকতে হবে।

মালের দাবির বিনিময়ে যদি দাবিদারকে কিছু শ্রম দিতে হয় তবে তা হবে ইজারা বা ভাড়াতুল্য। এমতোক্ষেত্রে ইজারার মতো শ্রমদানের সময় নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এ রকম শর্তে সন্ধি স্থাপনের প্রাক্কালে দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে স্বীকারোক্তির সন্ধি বাতিল বলে গণ্য হবে।

মাসআলাঃ নীরবতা ও অস্বীকৃতিসূচক সন্ধির ক্ষেত্রে যার উপর দাবি প্রয়োগ করা হয়েছে সে কসম খাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। (সন্ধি না হলে তাকে কসম করতে হতো। কেননা কসমের মাধ্যমে অস্বীকৃতি জানাতে হয়) এবং দাবিদারও তার প্রাপ্য পেয়ে যাবে। ঘরের দাবি উত্থাপিত হলে কিছু অর্থ দিয়ে যদি দাবিদারের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়া হয়, তবে ওই ঘরের উপর শোফা বা প্রিএমসন ওয়াজিব নয়। কিন্তু দাবিদারকে ওই ঘর ফিরিয়ে দেয়া হলে শোফা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ ঘরের দাবিদারকে ঘরের একাংশ দিয়ে সন্ধি করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এমতো ক্ষেত্রে দাবিদার ঘরের যে অংশটুকু পাবে সেটা তার নিজের পুরো দাবির একটি অংশ। সুতরাং পুরো অংশের উপরই তার দাবি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তবে দাবিকৃত ব্যক্তি যদি এর সঙ্গে কিছু অর্থ দিতে সম্মত হয় অথবা দাবিদার যদি অবশিষ্ট অংশের দাবি থেকে বিরত থাকবে বলে ঘোষণা দেয়, তবে সন্ধি বিশুদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় দাবিদারের কোনো প্রকার দাবি আর অবশিষ্ট থাকবে না।

মাসআলাঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রেও সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন সিদ্ধ। কেননা এটাও মানুষের অধিকার সমূহের মধ্যে একটি অধিকার। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, অতঃপর যাকে প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে কিছু মাফ করা হয়, তবে বাকীটুকু ন্যায়সঙ্গতভাবে যেনো তাগাদা করে এবং হত্যাকারী যেনো তা সৎভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।'

কোনো পুরুষ যদি কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছে বলে দাবি করে এবং কিছু সম্পদ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। কেননা এটা হচ্ছে খোলা সদৃশ (মালের বিনিময়ে তালাক)।

কেউ যদি কারো উপর এমতো দাবি উত্থাপন করে বলে যে, তুমি আমার গোলাম। তখন দাবিকৃত ব্যক্তি যদি দাবিদারকে কিছু সম্পদ প্রদান করে সন্ধি স্থাপন করে, তবে তা সিদ্ধ হবে অথবা সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে সে স্বাধীন হয়ে যেতেও পারবে।

মাসআলাঃ যদি কেউ কারো উপর ঋণের দাবি করে বসে, তবে দাবিকৃত ব্যক্তি কিছু অর্থকড়ি দিয়ে সন্ধি করলে দাবি শুদ্ধ হবে। তখন ব্যাপারটি হবে এ রকম— যেনো দাবিদার তার পাওনার কিছু অংশ আদায় করে নিয়ে অবশিষ্ট অংশ ক্ষমা করে দিয়েছে। কেউ যদি উন্নতমানের এক হাজার মুদ্রার দাবিদার হয় এবং অনুন্নতমানের পাঁচ শত মুদ্রার বিনিময়ে সন্ধিবদ্ধ হতে সম্মত হয় তবে এ ধরনের সন্ধি নির্দোষ হবে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে যে, দাবিদার তার উন্নতমানের অর্থের অধিকার পরিত্যাগ করেছে এবং মুদ্রার সংখ্যাও কম করে দিয়েছে। আবার মুদ্রা পরিশোধের জন্য অবকাশও দিয়েছে।

অচল হাজার মুদ্রার দাবির ক্ষেত্রে সচল পাঁচ শত মুদ্রা আদায়ের শর্তে সন্ধি সিদ্ধ নয়। নগদ বা বাকী যেভাবেই অর্থ পরিশোধ করা হোক না কেনো। কেননা পাওনা ছিলো অচল মুদ্রা এবং সন্ধি হয়েছে সচল মুদ্রা পরিশোধের উপর। সুতরাং

এক্ষেত্রে অচল হাজার মুদ্রার বিনিময়ে অচল হাজার মুদ্রাই পরিশোধ্য। তাই এক্ষেত্রে সচল পাঁচশত মুদ্রা দিলে তা হবে সুদ।

রূপার টাকার দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধের মাধ্যমে যদি সন্ধি হয়ে যায়, তবে তা হবে পণ্য বিক্রয়তুল্য। সুতরাং এক্ষেত্রে সন্ধিস্থল পরিত্যাগের পূর্বেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দাবিদারকে হস্তগত করতে হবে (যেমন নগদ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে)।

হজরত সাঈদ বিন মানসুর এবং হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেছেন, মোহাম্মদ বিন মোসলেমার কন্যা রাফে বিন খাদীজের বিবাহবদ্ধা ছিলেন। রাফে তাঁর স্ত্রীর কোনো কথাই পছন্দ করতেন না। কিন্তু অপছন্দের কোনো কারণও তাঁর জানা ছিলো না (যেমন স্ত্রী বৃদ্ধা বা অন্য কোনো দোষযুক্তা)। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, আমাকে তালাক দিও না। আমার সহবাসের পালা তোমার ইচ্ছাধীন। তুমি যা ইচ্ছা তাই আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। হাকেম হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের এই বর্ণনার পক্ষে কতিপয় সাক্ষী উপস্থাপন করেছেন, যার কারণে হাদিসটি হয়েছে মুত্তাসিলসনদবিশিষ্ট (সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতাসম্পন্ন হাদিসকে বলে মুত্তাসিল)।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওম্‌রা সম্পর্কে। এ রকমও বর্ণনা এসেছে যে, খুয়াইলা বিনতে মোহাম্মদ বিন মুসলেমা এবং তার স্বামী আসআদ বিন রবীকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। অথবা হজরত রাফে বিন খাদীজ ছিলেন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য, যিনি মোহাম্মদ বিন মোসলেমার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের সময় খুয়াইলা ছিলেন যুবতী। তার বয়স বেড়ে গেলে হজরত রাফে আরেকটি বিয়ে করলেন এবং প্রথম স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীকেই অগ্রাধিকার দিতে শুরু করলেন। খুয়াইলা তখন রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, মাতা আয়েশা বলেছেন, ওয়াস্ সুলহু (আপোষ নিষ্পত্তি শ্রেয়) আয়াতটি নাজিল হয়েছে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে যার ছিলো এক স্ত্রী ও এক সন্তান। লোকটি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করতে চাইলো। স্ত্রী তার স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য বললো, তুমি শুধু আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও, পালার দাবি আমি করবো না।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এক লোকের স্ত্রী হয়ে পড়েছিলো বৃদ্ধা। কয়েকটি সন্তান সন্ততিও ছিলো তার। সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করতে চাইলো। স্ত্রী বললো, আমাকে তালাক দিও না, সন্তান সন্ততিদের সঙ্গে থাকতে দাও। ইচ্ছে করলে দুই মাস অন্তর আমার জন্য একটি পালা নির্ধারণ করে দিও। যদি ইচ্ছা না হয়, তবে তাও দিও না। লোকটি বললো, তোমার এই প্রস্তাবে আমি সম্মত। লোকটি রসুল স. এর দরবারে গিয়ে এ কথা জানালো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে...' তখন ওই মহিলা বললো, এখন আমার খরচের অংশ পুনঃনির্ধারণ করো। ইতোপূর্বে মহিলাটি তার খরচের পালা ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলো এবং এ

কথাও বলেছিলো যে, আমাকে তালাক দিও না– ইচ্ছে করলে তুমি আমার কাছে নাও আসতে পারো। তার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো 'লোভ হেতু স্বভাবতঃ কৃপণ'।

সিহাহ্ এবং কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'শুহ্হা' অর্থ লোভ, কৃপণতা। শব্দটির মাধ্যমে মানুষের স্বভাবজ লালসা ও কার্পণ্যের কথা বলা হয়েছে এবং এরপরে এই অসৎ স্বভাব অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই যেমন স্বামী তার স্ত্রীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না এবং তার অধিকার আদায়ে কার্পণ্য করবে না, তেমনি স্ত্রীর পক্ষেও তার স্বামীর অধিকার আদায় না করা হবে অসমীচীন।

আয়াতের প্রথমাংশে সন্ধির প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং শেষ অংশে স্বভাবগত একগুয়েমি থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও সাবধান হও, তবে তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।' 'ওয়া ইন তুহ্সিনু '(এবং যদি সৎকর্মপরায়ণ হও) এ কথার মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি নম্র হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যেনো পারস্পরিক অধিকারকে সম্মান জানাতে সচেষ্ট হয়— অপ্রিয় হলেও যেনো ন্যায়ানুগতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

ওয়া তাত্তাকু অর্থ 'এবং সাবধান হও।' অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ে সাবধান হও। অসদাচরণ, উপেক্ষা ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্ভীতির কারণে সতর্ক হও।

সবশেষে বলা হয়েছে, তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। এ কথার অর্থ তোমাদের উত্তম ও অনুত্তম সকল কর্ম সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত। তাই তিনি তোমাদের কর্মের যথোপযুক্ত বিনিময় দান করবেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৯

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

❒ এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না; যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে একাধিক স্ত্রীধারীদের জন্য। এখানে বলা হয়েছে, সকল স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার অসম্ভব। তারপরেই বলা হয়েছে 'তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পোড়োনা ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না।' এ কথার মাধ্যমে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, খোরপোষ, কথাবার্তা,

সহবাসের পালাবণ্টন, —এ সকল ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু একজন অপেক্ষা অন্যজনের প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকলে দূষণীয় হবে না। কেননা ভালোবাসার প্রসঙ্গটি হৃদয়ঘটিত ব্যাপার, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। রসুল স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমার নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে তার মধ্যে আমি সমতা রক্ষা করেছি। কিন্তু আমার হৃদয় তোমারই অধিকারে। তাই হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে যদি আমি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে অসমর্থ হই, তবে এর জন্য তুমি আমাকে অভিযুক্ত কোরো না। আহমদ, সিহাহ্ রচয়িতা চতুষ্টয়, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আর মাতা আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণনা করেছেন সুনান প্রণেতা চতুষ্টয় (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা) এবং দারেমী।

একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ার অর্থ তার জন্য অতিরিক্ত পালা নির্ধারণ, অতিরিক্ত মেলামেশা কিংবা অধিক খোরপোষ প্রদান। অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখার অর্থ অপর স্ত্রীর খোরপোষ, আলাপচারিতা ও পালা সংক্রান্ত অধিকার ক্ষুণ্ন করা। আয়াতে এ রকম সাম্যবিহীনতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দুই স্ত্রীর অধিকারী ব্যক্তি একজনের প্রতি বিমুখ হয়ে অপর জনের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়লে সে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হবে কোমর ভাঙা অবস্থায়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় এবং দারেমী।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করো ও সাবধান হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সমতা রক্ষা সংক্রান্ত যে অনাচার সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন না— যদি তোমরা এখন থেকে সংশোধিত আচরণে অভ্যস্ত হও (আয়াতের এই নির্দেশকে মান্য করে চলো)। আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। তাই তিনি তোমাদের অতীত পাপসমূহকে দয়া করে মার্জনা করবেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩০

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

❐ যদি তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যায় তবে আল্লাহ্ তাঁহার প্রাচুর্য দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে অভাব মুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

দাম্পত্যজটিলতার কারণে স্বামী স্ত্রীকে যদি পৃথক হয়ে যেতেই হয়, তবে এতে করে কারো জন্য দুশ্চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এ রকম হলে আল্লাহ্পাক তাদের দু'জনকেই প্রাচুর্য দান করবেন। পরস্পরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিরাপদ রাখবেন। অর্থাৎ স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী এবং পুরুষকে দ্বিতীয় স্ত্রী দান করবেন।

এভাবে পুনঃ পরিণয়ের মাধ্যমে তাদেরকে নিশ্চিন্ত করে দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়— এ কথার অর্থ তাঁর রহমত অতি প্রশস্ত, সীমাহীন। আর তিনি হাকিম (প্রজ্ঞাময়)। তাই এ কথা নিশ্চিত যে, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ ও কর্মকাণ্ড পরম প্রজ্ঞামণ্ডিত।

মাসআলাঃ কোরআন মজীদের আলোচ্য আয়াত এবং রসুল স. এর সুন্নত অনুসারে এ বিষয়টি সুসাব্যস্ত যে, স্ত্রীদের পালা বণ্টন ও খোরপোষ প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যে এ রকম করবে না, সে আল্লাহ্পাকের অবাধ্য। কাযীর উপরও ওয়াজিব কর্তব্য হচ্ছে, যে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে— তার পক্ষে রায় দেয়া। তবে মনে রাখতে হবে, পালা বণ্টনে সমতা ওয়াজিব হলেও সহবাসে সমতা জরুরী নয়। কেননা রতিকর্মের ইচ্ছা একটি হৃদয়ঘটিত বিষয় যা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

যে ব্যক্তির একজন স্বাধীনা স্ত্রী এবং একজন ক্রীতদাসী থাকে তাকে দুই অনুপাত এক— এই নিয়মে পালা বণ্টন করতে হবে। সম্মানিত সাহাবীবৃন্দ থেকে এ রকমই বর্ণনা এসেছে।

হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হজরত আলী এ রকম হুকুম দিয়েছেন। হজরত আলীর সিদ্ধান্তরূপে ইমাম আহমদও এই দলিলটি পেশ করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনে হাজম। কারণ, এই বর্ণনাসূত্রভূত মানহাল বিন ওমর এবং ইবনে আবী লাইলা বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইবনে হাজমের এই মন্তব্যকে অবশ্য গ্রাহ্য করা হয়নি। কারণ, উল্লেখিত বর্ণনাকারীগণ প্রকৃতপক্ষে দুর্বল ছিলেন না। ছিলেন সিকাহ্ (বলিষ্ঠ) এবং হাফেজ।

নতুন স্ত্রী এবং পুরাতন স্ত্রীর পালা সম্পর্কিত অধিকার সমান। হাদিস শরিফেও এ রকম বলা হয়েছে । ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এ রকম। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন, কুমারী অবস্থায় নতুন স্ত্রীকে বিবাহ করা হলে গৃহে আনার পর স্বামী তার কাছে একাদিক্রমে এক সপ্তাহ রাত্রিযাপন করবে। আর কুমারী অবস্থায় বিয়ে করা না হলে অতিবাহিত করবে একাধারে তিন রাত্রি। এভাবে এক সপ্তাহ্ বা তিন রাত নতুন স্ত্রীর সঙ্গে শয্যাগ্রহণের পর নতুন ও পুরাতন স্ত্রীর পালার অধিকার সমান হয়ে যাবে। তখন পুরাতন স্ত্রী সাত বা তিন দিনের পালা পরিশোধের দাবি তুলতে পারবে না।

আবু কালাবার বর্ণনায় রয়েছে— হজরত আনাস বলেছেন, দ্বিতীয় স্ত্রীকে কুমারী অবস্থায় বিয়ে করে ঘরে আনলে তার কাছে এক টানা সাত রাত থাকবে। আর বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা অবস্থায় বিয়ে করে আনলে তার কাছে থাকবে একটানা তিন রাত। এরপর উভয় স্ত্রীর পালা সমান সমান হয়ে যাবে। বর্ণনাটি উদ্ধৃতির পর আবু কালাবা বলেছেন, আমি ইচ্ছে করলে এ কথা বলতে পারি যে, হজরত আনাসের বর্ণনাটি রসুল স. এরই নির্দেশ। বোখারী, মুসলিম।

সফরে বহির্গত হলে স্ত্রীদের পালার হক আর থাকে না। তখন যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে সফরে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সফরসঙ্গিনীদের এই নির্বাচন লটারীর মাধ্যমে হওয়া মোস্তাহাব। লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই সঙ্গে নিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, স্ত্রী বা স্ত্রীদের সম্মতি ব্যতীত তাদের কোনো একজনকে ভ্রমণের সহযোগিণী করা সিদ্ধ নয়। ইমাম মালেক থেকে সিদ্ধ এবং সিদ্ধ নয়— দুই রকম অভিমতই এসেছে। যদি স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সম্মতি ব্যতীত অথবা লটারী ছাড়া কোনো একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে অপর স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে পরে তার বা তাদের প্রাপ্য পালা পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক এ রকম করাকে ওয়াজিব বলেননি। ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমত প্রমাণার্থে মাতা আয়েশার ওই বর্ণনাটিকে উপস্থাপন করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. সফরের প্রাক্কালে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে লটারী করতেন। লটারীতে যাঁর নাম উঠতো তাকেই সঙ্গে নিতেন। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পত্নীগণের মন রক্ষার জন্য রসুল স. এ রকম করেছেন। এ রকম করা তাঁর জন্য ওয়াজিব ছিলো না। ছিলো ঐচ্ছিক। প্রকৃত কথা এই যে, সফরের সময় স্ত্রীগণের পালার অধিকার থাকে না। লক্ষ্যণীয় যে, পুরুষ ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে একাই সফর করতে পারে। কাজেই সে স্ত্রীদের যে কোনো একজনকে সঙ্গে নিতে পারে। তবে ইমাম শাফেয়ীর স্বপক্ষে এ রকম বলা যেতে পারে যে, একা সফরে গেলে স্ত্রীদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া বা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু একজনকে নিলে অপরের মনে প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

কোনো স্ত্রী তার পালার অধিকার তার সপত্নীকে দিয়ে দিলে তার পালার অধিকার রহিত হয়ে যায়। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, জননী সাওদা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আমার পালা আয়েশাকে দিলাম। তিনি এ রকম বলেছিলেন বলে রসুল স. জননী আয়েশার প্রকোষ্ঠে পর পর দু'দিন শয্যাগ্রহণ করতেন। একদিন জননী আয়েশার পালার অধিকার পূরণার্থে এবং অন্যদিন জননী সাওদার পালার পরিবর্তে। বোখারী, মুসলিম।

সপত্নীকে প্রদত্ত পালার অধিকার পালা প্রদাত্রী পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে। কেননা পালার দিন এলেই কেবল পরিত্যক্ত পালা কার্যকর করা ওয়াজিব হয়। সুতরাং পালার দিন আসার পূর্বে পরিত্যাক্ত পালা ফিরিয়ে নিলে তা বিশুদ্ধ হবে। কারণ তখন পর্যন্ত পালার ওয়াজিব কার্যকারিতা শুরু হয়নি।

সোলায়মান বিন ইয়াসারের বর্ণনা থেকে বাগবী লিখেছেন, 'লা জুনাহা আলাই হিমা' (আয়াত ১২৮) আয়াতটি সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, স্ত্রী তার খোরপোষ অথবা পালার অধিকার পরিত্যাগের পর পুনরায় অধিকার ফিরিয়ে নিতে পারবে (যদি সে পুনরায় চায়)। এ রকম করা জায়েয।

মাসআলাঃ রোগগ্রস্তা হওয়ার কারণে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তার পালা রহিত করে দেয়া জায়েয নয়। স্ত্রী যদি সম্মতি প্রদান করে, তবে জায়েয। উম্মত জননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, পরলোকগমণের কয়েকদিন আগে রসুলুল্লাহ্ স. মাঝে মাঝে বলেছিলেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকবো। তাঁর কথায় সকলে বুঝতে পারলেন, তিনি স. হজরত আয়েশার ঘরে থাকতে চান। এ কথা বুঝতে পেরে তাঁর অন্য সহধর্মিণীগণ বললেন, আপনি যার প্রকোষ্ঠে ইচ্ছা রাত্রিযাপন করতে পারেন (এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই)। পত্নীগণের অনুমতি প্রাপ্তির পর রসুল স. হজরত আয়েশার কামরায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। কয়েকদিন পর সেখানেই সংঘটিত হলো তাঁর পবিত্র মহাতিরোধান।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩১. ১৩২

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

❐ আস্‌মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই; তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ও তোমাদিগকেও নির্দেশ দিয়াছি যে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে এবং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিলেও আস্‌মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহেরই এবং আল্লাহ্ অভাব মুক্ত, প্রশংসা-ভাজন।

❐ আস্‌মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই এবং কর্ম-বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

আস্‌মান জমিনের সকল কিছুর মালিক আল্লাহ্। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়। আকাশ ও পৃথিবীর অন্তর্ভূত বিশাল সৃষ্টির মালিকানা সেই প্রাচুর্যময়তারই একটি নিদর্শন। এই নিদর্শন উপস্থাপনের পর পূর্ববর্তী উম্মত এবং বর্তমান উম্মতকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে সকল আসমানী গ্রন্থ ও সহিফার (পুস্তিকার) কথা। 'তোমাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছি' — এ কথার মধ্যে 'তোমাদেরকে' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর উম্মতকে। এভাবে পূর্বাপর সকল নবীর উম্মতকে একটি সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে— তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে (আনিত্তাক্কুল্লা)। এই ভয় করার অর্থ শিরিক (অংশীবাদিতা) থেকে মুক্ত থাকা।

'তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করলে'— এ কথার অর্থ কুফরী করলে। কুফরী অর্থ অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা। এভাবে 'ওয়াইন তাকফুরু' কথাটির অর্থ হবে যদি তোমরা অবাধ্য হও অথবা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এরপর বলা হয়েছে, (তবে জেনে রাখো) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কেবলই আল্লাহ্‌র। এই সত্য যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান করো, তবে এতে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানে সক্ষম। তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করার সাধ্য কারো নেই। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌পাকের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিষয়টিকে অস্বীকার করো তবে জেনো, আল্লাহ্‌পাক সকল কিছু থেকে বেপরোয়া। আর তোমরা অস্বীকার করলেও আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতামণ্ডলী তাঁর পূর্ণ অনুগত ও নিরন্তর উপাসনারত। এ রকম অর্থ হওয়াও সম্ভব যে, আল্লাহ্‌পাক সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী (বেনিয়াজ)। তোমাদের স্বীকৃতি ও ইবাদত তাঁর কোনো উপকারে আসে না। তেমনি তোমাদের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা তাঁর কোনো অপকার সাধনে সক্ষম নয়। উপকার ও অপকারের মুখাপেক্ষী তোমরাই। তিনি দয়া করে তোমাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সৎকর্মের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অসৎকর্মসমূহকে নিষিদ্ধ করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে, 'অকানাল্লহু গনিয়ান হামিদা' (আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন)। অর্থাৎ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আর সকল প্রশংসার একক অধিকারী তিনিই। সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করুক কিংবা নাই করুক— সকল অবস্থায় তিনিই প্রকৃত প্রশংসাভাজন।

পরের আয়াতে (১৩২) পুনরায় বলা হয়েছে 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিষয়টি যে মেনে নিবে সে আল্লাহ্‌পাককেই তার কর্ম বিধায়করূপে যথেষ্ট মনে করবে এবং তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হবে।

কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট— এ কথাটির সম্পর্ক সম্ভবত 'আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন' (১৩০) আয়াতটির সঙ্গে। অর্থাৎ কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তাই তিনি তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা নারী পুরুষ সকলকে অভাবমুক্ত করেন। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, যারা বিশ্বাসী তারা যেনো তাদের সকল কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌পাককেই প্রকৃত কর্মবিধায়ক রূপে যথেষ্ট বলে মেনে নেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৩

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ○

❐ হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে ও অপরকে আনিতে পারেন; আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আল্লাহ্পাকের অতুল ও অপার ক্ষমতার নিদর্শন বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। 'আইয়্যুহান্নাস' বলে সকল মানুষকে লক্ষ্য করে আচরণে সংযত ও বিশ্বাসে সংহত করার নিমিত্তে বলা হয়েছে, তিনি ইচ্ছে করলে মুহূর্ত মধ্যে তোমরা বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তোমাদের স্থলে আনা হবে নতুন কোনো সৃষ্টিকে। যারা তোমাদের মতো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হবে না, হবে বিনয়াবনত, পূর্ণ অনুগত। আল্লাহ্পাক এ রকম করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসুল স. তাঁর পবিত্র হস্ত হজরত সালমান ফারসীর পৃষ্ঠদেশে রেখে বললেন, এই ব্যক্তিই ওই সম্প্রদায়ভূত (আয়াতে যাদেরকে মানুষের স্থলাভিষিক্ত করার কথা বলা হয়েছে)। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে এ রকমই। যেমন অন্য একটি স্থানেও এরশাদ করা হয়েছে 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আল্লাহ্ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন।' বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা জুমআর এই আয়াতটি— 'আর (উপস্থিতগণ ব্যতীত) অন্যান্য লোকদের জন্যও যারা তাদের সাথে শামিল হবে কিন্তু এখনও শামিল হয়নি।' আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল, আয়াতে উল্লেখিত লোক কারা? রসুল স. তাঁর হস্ত মোবারক হজরত সালমান ফারসীর উপরে রেখে বললেন, ইমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের মতো দূরত্বেও থাকে (পৃথিবীতে ইমান বলে যদি কিছু নাও থাকে) তবুও এই ব্যক্তির সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক ইমান অর্জন করতে সমর্থ হবে। (আকাশে যে সাতটি তারা একত্রে দৃষ্ট হয় সেগুলোর মধ্যেই রয়েছে সুরাইয়া নক্ষত্র)। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. তেলাওয়াত করলেন 'আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন।' সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, তাদের পরিচয় কী? তিনি স. তাঁর পবিত্র হাত হজরত সালমানের উরুদেশে স্থাপন করে বললেন, এই ব্যক্তি এবং তার সম্প্রদায়। ধর্ম যদি সুরাইয়া নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক দূরবর্তী হয়, তবে কতিপয় পারস্যবাসী সেখান থেকে ইমান ছিনিয়ে আনবে।

জ্ঞাতব্যঃ শায়েখ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, শায়েখ জালালউদ্দিন সুয়ুতী বলেছেন, এই হাদিসে ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর সহচরবৃন্দের কথা বলা হয়েছে। শায়েখ সালেহী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, শায়েখ সুয়ুতীর বক্তব্যটিতে সন্দেহ মাত্র নেই। কেননা ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের মতো পারস্যবাসীর অন্য কেউ প্রজ্ঞার পূর্ণত্ব পর্যন্ত পৌছতে পারেননি। আর হজরত সালমান ফারসী ছিলেন ইমাম আবু হানিফার ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ।

তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স. এর সম্মুখে অনারব সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিলো। তখন রসুল স.

বলেছিলেন, আমি তাদের প্রতি (অথবা বলেছিলেন তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন জনের প্রতি) তোমাদের চেয়ে (অথবা বলেছেন তোমাদের কোনো কোনো লোকের চেয়ে) অধিক ভরসা রাখি।

আমি বলি, সম্ভবত বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে শায়েখ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. এবং তাঁর মতো মা অরা উন্নাহারের অন্যান্য শায়েখগণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওই শায়েখগণ পিতৃপুরুষের দিক থেকে অনারব না হলেও অধিবাসী হিসেবে ছিলেন অনারব। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন রসুল স. এবং সাহাবায়ে কেরামের বংশধর। তাঁরাই রসুল স. এর বিস্মৃত সুন্নতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা কখনই বেদাতে সাইয়া অথবা বেদাতে হাসানাকে পছন্দ করেননি। এমনও হতে পারে যে, মা অরা উন্নাহারের মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং ফুকাহায়ে এজামের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এ হাদিসে। যেমন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ বোখারী প্রমুখ।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৪

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

❒ কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিলে সে জানিয়া রাখুক যে আল্লাহের নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

এই আয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ কামনার দিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দুনিয়া ধ্বংসশীল। আর আখেরাত অবিনাশী। সুতরাং সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করতে হলে উভয় জগতের প্রার্থী ও প্রয়াসী হতে হবে। বলতে হবে 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরতি হাসানাহ্' (হে আমার প্রভুপ্রতিপালক আমাদেরকে দান করো পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ)। বিশুদ্ধ নিয়তে যে জেহাদ করে সে দুনিয়ায় গণিমত পায় এবং আখেরাতের সওয়াবও লাভ করে। আখেরাতের বিনিময়ের তুলনায় পৃথিবীর প্রাপ্তি কিছুই নয়।

শেষে বলা হয়েছে 'অকানাল্লহু সামিয়াম বাসিরা'— এ কথার অর্থ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তিনি মানুষের অন্তরের অভিপ্রায় সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। তাই তিনি নিয়ত অনুসারে প্রত্যেককে বিনিময় প্রদান করবেন। রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো রমণীকে বিবাহ করার অভিপ্রায়ে যে হিজরত করে, তার হিজরত তারই কাম্যবস্তুর সঙ্গে। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে।

ইবনে আবি হাতেম এবং সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার দু'জন লোক তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। তাদের একজন

ছিলো বিত্তশালী এবং অন্যজন ছিলো দরিদ্র। দরিদ্র ব্যক্তিটির দিকেই রসুল স. এর হৃদয়ে সহানুভূতি জাগ্রত হলো। তিনি স. ভাবলেন, কোনো দরিদ্র কোনো বিত্তবানের উপর জুলুমতো করতেই পারে না। এ রকম ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তোমরা সাক্ষ্য দিবে আল্লাহের উদ্দেশ্যে যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করিতে কামনার অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে জানিয়া রাখ যে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

এই আয়াতে বিশ্বাসীগণকে ন্যায়বিচারে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে। তাই বিচারকের প্রতি এই কর্তব্যটি ওয়াজিব যে, তিনি দাবিদার এবং দাবিকৃত ব্যক্তি উভয়ের সঙ্গে সমান আচরণ করবেন। একজনকে অপরজন অপেক্ষা অগ্রগণ্য মনে করবেন না। কারো দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়বেন না।

হজরত উম্মে সালমার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি কাযী হবে সে যেনো বাদী বিবাদী উভয়ের উপবেশনের স্থান, ইশারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমতা রক্ষা করে। একজন অপেক্ষা অন্যজনের সঙ্গে যেনো অধিক আলাপচারিতা না করে। এ রকম বলেছেন ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ ও দারা কুতনী।

এরপর বলা হয়েছে, তোমরা সাক্ষ্য দিও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। এ কথার অর্থ আল্লাহ্র ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য দিও। আত্মপ্রসাদ কিংবা অন্য কোনো কারণে নয়।

'নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়'— এ কথার অর্থ সত্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে যেয়ে কার পক্ষে গেলো না গেলো সে কথা ভাবা যাবে না। কারণ, সত্য গোপন করা মহাপাপ। তাই নিজের, পিতা-মাতার এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও সত্যকে প্রকাশ করতেই হবে। এক্ষেত্রে

বিত্তবানদের বিত্তের প্রভাবে এবং বিত্তহীনদের অসহায়ত্বের সমবেদনায় সত্যকে গোপন করা যাবে না। সত্য সাক্ষ্যদাতার কর্তব্য হচ্ছে— সে ধনের প্রতাপকে যেমন অগ্রাহ্য করবে, তেমনি অস্বীকার করবে দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতার প্রভাবকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী প্রমুখ এ রকম বলেছেন।

'ফাল্লহু আউলা বিহিমা'— এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক উভয়ের (ধনী ও দরিদ্রের) যোগ্যতর অভিভাবক। তিনি ধনী ও দরিদ্র উভয়ের স্রষ্টা। উভয়কে সংশোধন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। সত্য সাক্ষ্য যদি সংশোধনের প্রতিকূল হতো, তবে আল্লাহ্পাক সাক্ষ্য প্রদানের পদ্ধতির প্রচলন করতেন না। আল্লাহ্পাক চান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনী গরীব দু'জনেই পরিশুদ্ধ হোক। কারণ, তিনি দু'জনেরই স্রষ্টা, রিজিকদাতা। তাই সাক্ষীগণের প্রতি এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সকল অবস্থায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে।

একটি ধারণাঃ 'বিহিমা' শব্দটি দ্বিবচন বিশিষ্ট। সর্বনামটি ধনী ও দরিদ্র উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে সংযোজক অব্যয় হিসেবে 'ওয়াও' (এবং) এর উল্লেখ নেই। বরং এখানে রয়েছে 'আও'। ধনী ও দরিদ্র উভয়কে যখন এখানে একত্রিত করা হয়নি, তাই এখানে প্রয়োজন ছিলো একবচনসূচক সর্বনাম ব্যবহারের।

উত্তরঃ এখানে সর্বনামটি কেবল ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং এখানে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ধনী সম্প্রদায় এবং দরিদ্র সম্প্রদায়। তাফতাজানী লিখেছেন, এখানে একবচনসূচক সর্বনামকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিবচনসূচক সর্বনাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, এখানে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে **'ফাল্লহু'**। একবচন সূচক সর্বনাম ব্যবহৃত হলে এ রকম ধারণার সৃষ্টি হতো যে, সর্বনামটি বোধ হয় আল্লাহ্র সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। তাফতাজানীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ রকম আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, একবচনসূচক সর্বনাম ব্যবহৃত হলেই এখানে তা বিশেষভাবে প্রথমোক্ত শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে— এ কথা ঠিক নয়। (অনির্ধারিত কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে 'বিশেষভাবে' ধারণাটির সৃষ্টি হতে পারে না)। ইমাম রাজী লিখেছেন, উদ্ধৃত দু'টো বস্তুর যদি পারস্পরিক সংযোগ থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে একবচনসূচক কিংবা দ্বিবচনসূচক—দু'রকম সর্বনাম ব্যবহার করা সিদ্ধ হবে।

আমি বলি, এখানে দ্বিবচনসূচক সর্বনামটির সম্পর্ক ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে হবে না। বরং সম্পর্ক হবে ওই দু'জনের সঙ্গে যাদের পক্ষে এবং বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করে। যদিও এখানে প্রকাশ্যতঃ এ কথার উল্লেখ নেই। কিন্তু বক্তব্যের ক্রমধারা এখানে এ কথাই প্রমাণ করে যে, সাক্ষ্য প্রমাণের নিয়ম জারী করার মধ্যে রয়েছে উভয়ের (যে দাবি তুলেছে এবং যার উপর দাবি করা হয়েছে) কল্যাণ। সাক্ষ্য যার পক্ষে যাবে বিচারের রায়ও হবে তার অনুকূলে। আর যার বিরুদ্ধে যাবে সেও হয়ে যাবে 'হক্কুল ইবাদ' (বান্দার অধিকার) থেকে দায়মুক্ত। তাই বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্তায়ালা উভয়ের যোগ্যতর অভিভাবক'।

'শুহাদাআ লিল্লাহ্' (সাক্ষ্য দিও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে)— কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্র এককত্ব, তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণত্ব, আসমানী কিতাব সমূহ, পয়গম্বরগণের সততা এবং সত্য নিদর্শনাবলীর সাক্ষী হয়ে যাও— সে সাক্ষ্য তোমাদের আপন সত্তা, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও। সত্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যদি জীবন বিপন্ন হয়, সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা বিত্তহীন হয়ে পড়ার আশংকা থাকে, তবুও সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে পশ্চাদাপসরণ কোরো না। কারণ, বিশ্বাসীদের নিকট জীবন ও সম্পদ অপেক্ষা আল্লাহ্পাকের হুকুমের মূল্য অধিক।

'তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না'—এ কথার অর্থ প্রবৃত্তির তাড়নায় তোমরা ন্যায় বিচারের মহান কর্তব্য প্রতিপালন থেকে বিমুখ হয়ো না। ইনসাফের উপরেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকো।

'যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও'— এ কথার অর্থ যদি তোমরা বক্র পথ অন্বেষণ করো অর্থাৎ সাক্ষীর প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাও এবং সত্য সাক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথার অর্থ— যদি তোমরা আপন সাক্ষ্যকে অন্যের উপর ন্যস্ত করে দাও অর্থাৎ সাক্ষ্য আদায় করাকে করে দাও অন্যের অধীন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই নির্দেশটির লক্ষ্য হাকিম বা বিচারকগণ। তাদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে, তোমরা যদি পক্ষ প্রতিপক্ষের যে কোনো একজনের অনুরক্ত হও— একদিকে ঝুঁকে পড়ো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন। সুতরাং অপকর্মের শাস্তি থেকে তোমাদের অব্যাহতি নেই।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

☐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহে, তাঁহার রসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস কর; এবং কেহ আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রসূল এবং পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করো। এই বিশ্বাসের প্রকৃত তত্ত্ব ও পূর্ণত্ব এই— ইমানদার ব্যক্তি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এ কথা উত্তমরূপে অবগত হবে যে, আল্লাহ্পাকই প্রকৃত অস্তিত্ব, তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি চূড়ান্ত কল্যাণ এবং অকল্যাণের নিশ্চিতকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর মধ্যে প্রকৃত পূর্ণত্ব ও সৌন্দর্য্য নেই। সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু পূর্ণত্ব ও রূপ সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়, তা আল্লাহ্পাকেরই অনুগ্রহসিক্ত অনুদান। বিশ্বাসের এই প্রকৃত পরিচিতি লাভের পর বিশ্বাসীদের ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা ও প্রকৃত আকৃষ্টি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে থাকে না। সত্তা তখন রঞ্জিত হয় আল্লাহ্তায়ালার অক্ষয় ভালোবাসায়। তাঁর আদেশ ও নিষেধকে মান্য করা তখন আর প্রয়াসনির্ভর থাকে না। আনুগত্যের বিষয়টি তখন হয়ে পড়ে স্বভাবনির্ভর। এই পর্যায়ে উন্নীত বিশ্বাসীরা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ অপেক্ষা পাপকর্ম সম্পাদনকে অধিক অপ্রিয় মনে করে থাকে।

বাগবী, আবুল আলীয়া এবং আলেমদের একটি দল বলেছেন, বিশ্বাসীদেরকে যে বিশ্বাসের প্রতি আহবান করা হয়েছে সেই আহবানের অর্থ এই — তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও। এই তাফসীরের মূল মর্মটি আমরা শুরুতেই সন্নিবেশিত করেছি (মূল কথাটি হচ্ছে— তোমরা যারা ইমানের অবয়বকে অবলম্বন করেছো তারা ইমানের প্রকৃত তত্ত্ব পর্যন্ত উপনীত হও)।

জুহাক লিখেছেন, এখানে 'হে বিশ্বাসীগণ' বলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ওই সকল লোককে আহবান করা হয়েছে, যারা হজরত মুসা এবং হজরত ঈসার প্রতি ইমান এনেছিলেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আয়াতটির মর্ম দাঁড়াবে এ রকম—মুসা এবং ঈসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হে জনতা, তোমরা এবার মোহাম্মদকে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে বিশ্বাস করো। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে হে বিশ্বাসীগণ বলে আহবান করা হয়েছে মুশরিক সম্প্রদায়কে। এই দৃষ্টিভঙ্গিসূত্রে আহবানের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম—লাত ও উজ্জার প্রতি আস্থা স্থাপনকারী হে মূঢ় জনতা! তোমরা এবার আল্লাহ্, মোহাম্মদ এবং কোরআনের প্রতি ইমান আনো। কেউ আবার বলেছেন, এখানের এই আহবান মুনাফিকদের প্রতি প্রযোজ্য। এ কথা মেনে নিলে আহবানের অর্থ হবে এ রকম—মুখে মুখে স্বীকৃতি প্রদানকারী হে কপট জনতা! তোমরা এবার আল্লাহ্, রসুল এবং কোরআনকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করো। এ সকল ব্যাখ্যা অবশ্য দুর্বলতাদুষ্ট। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখানে 'ইয়া আইওহাল্লাজিনা আ'মানু (হে বিশ্বাসীগণ!) বলে ইহুদী, খৃষ্টান মুশরিক কিংবা মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। কারণ বিশ্বাস অর্থ প্রকৃত বিশ্বাস— যার মূল সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। সুতরাং বুঝতে হবে প্রকৃত বিশ্বাসের বলয়ভূত ব্যক্তিরাই এখানে সম্বোধিত হয়েছেন।

কালাবী সূত্রে বাগবী—আবু সালেহের বর্ণনারূপে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, (ছা'লাবীও হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তির বর্ণনাকারী), এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমিটি এই—হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম, হজরত আসাদ বিন কা'ব, হজরত উসাইদ বিন কা'ব, হজরত সা'লাবা বিন কয়িস, হজরত আব্দুল্লাহ বিন সালেমের ভাগিনেয় সালাম এবং ভ্রাতুষ্পুত্রি সালমা এবং হজরত ইয়ামিন বিন ইয়ামিন একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা বিশ্বাস করেছি আপনাকে, আপনার উপর অবতীর্ণ কিতাবকে, হজরত মুসার তওরাতকে এবং হজরত উযায়েরকে। এছাড়া আমরা আর কোনো কিতাব এবং পয়গম্বরকে মানি না। ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আগত এ সকল নতুন মুসলমানের বর্ণিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

এখানে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে— আল্লাহ্কে, রসুল স. এর প্রতি ক্রমাগত অবতীর্ণ কোরআনকে এবং কোরআনের পূর্বে একবারে অবতীর্ণ (ক্রমাগতভাবে নয়) অন্য সকল কিতাবকে (তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং অন্য সকল কিতাব ও সহিফা সমূহকে)। শেষে বলা হয়েছে, যে আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব, রসুল এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে, সে হবে চরম পথভ্রষ্ট। সুতরাং বিশ্বাসীদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, রসুলে বিশ্বাস অর্থ সকল নবী রসুলে বিশ্বাস। এবং কিতাবে বিশ্বাস অর্থ সকল আসমানী কিতাব ও সহিফায় বিশ্বাস। এক বা একাধিক রসুল কিংবা কিতাবকে অবিশ্বাস করলে সকল রসুল ও কিতাবকে অবিশ্বাস করা হবে। আর সকল রসুল এবং সকল কিতাবকে অবিশ্বাস করা তো চরমতম পথভ্রষ্টতা।

আমি বলি, আল্লাহ্র সিফাতকে (গুণাবলীকে) অস্বীকার করাও চরম পথভ্রষ্টতা। যেমন মুতাজিলা সম্প্রদায় কোরআনকে আল্লাহ্র কথা বলে বিশ্বাস করে না এবং মানুষের কর্মকান্ডের স্রষ্টা যে আল্লাহ্তায়ালা সে কথা স্বীকার করে না। তারা এ রকমও অপমন্তব্য করে থাকে যে, আল্লাহ্ এমন কিছু অভিপ্রায় করে থাকেন, যেগুলো বাস্তবায়িত হয় না। এ সকল অপবিশ্বাসের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র গুণাবলী ও অবিসংবাদিত সৃজনক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন, মুতাজিলারা মানুষকে তার আপন কর্মের স্রষ্টা বলে জানে। আর মানুষের স্রষ্টা হিসেবে মান্য করে আল্লাহ্কে। তারা মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্কে মেনে নিতে সম্মত হলেও হতে পারে কিন্তু তারা আল্লাহ্কে হেদায়েতদানকারী হিসেবে কিছুতেই মানে না। মনে করে মানুষ নিজের চেষ্টায় হেদায়েত লাভ করে থাকে। এ যুগের সাধারণ জনতার বিশ্বাস তো মুতাজিলাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। অধিকাংশ জনতার বিশ্বাস এখন এ রকম— পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের প্রতিক্রিয়াতেই চূড়ান্ত উপকার অথবা অপকার সাধিত হয় (যেমন বিষই প্রকৃত মৃত্যুদাতা, তরইয়াব বা বিষ বিনষ্টকারী পদার্থই প্রকৃত

জীবনদাতা—রাজা বা প্রশাসকই প্রকৃত উদ্ধারকারী ইত্যাদি)। সুতরাং এই জামানায় অপবিশ্বাসের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হলে সূফীগণের তরিকা গ্রহণ করতেই হবে। তাঁদের যথানুসরণ করলে দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাবে উদাসীনতার যবনিকা এবং অর্জিত হবে প্রকৃত বিশ্বাস।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝

❐ যাহারা বিশ্বাস করে ও পরে সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আবার বিশ্বাস করে, আবার সত্য প্রত্যাখ্যান করে, অতঃপর তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না, এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না।

কাতাদা বলেছেন, এ আয়াতের লক্ষ্য ইহুদীরা। তারা প্রথমে হজরত মুসার উপরে ইমান এনেছিলো। পরে তারা গো-বৎসের উপাসনা করে কাফের হয়ে যায়। এরপর তারা মোহাম্মদ স. সহ অন্য নবীদেরকেও অস্বীকার করে বসে। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এই আয়াত ওই সকল আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে যারা তাদের নিজ নিজ নবীকে বিশ্বাস করার পর পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে বসে। অর্থাৎ তাদের জন্য অবতীর্ণ কিতাবের নির্দেশ তারা পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়। এরপর শেষ রসুল মোহাম্মদ স. কে অস্বীকার করে তারা পৌঁছে যায় কুফরীর (সত্য প্রত্যাখ্যানের) চরম পর্যায়ে। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতে বলা হয়েছে ওই সকল ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদদের) কথা যারা মুসলমান হওয়ার পর ধর্মত্যাগ করেছিলো। তাদের কেউ কেউ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়েছে। আয়াতে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা পুনঃ পুনঃ ধর্ম গ্রহণ ও বর্জন করে আল্লাহ্পাক তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না। হজরত আলী বলেছেন, এ রকম লোকদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ্পাক এদেরকে ক্ষমা করবেন না বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু ঐকমত্যায়িত অভিমত এই যে, মৃত্যু পর্যন্ত তওবার তোরণ সতত উন্মুক্ত (যতোবার তওবা করতে চায় ততোবার তওবা গৃহীত হবে)। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়'— অর্থ তারা মৃত্যু পর্যন্ত অবিশ্বাসে অনড় থাকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ক্ষমাহীনতার ঘোষণাটি প্রযোজ্য হবে তাদের উপর, যারা ইমান থেকে বহু দূরে অবস্থানের কারণে চিরভ্রষ্ট। তাদের অন্তর জরাজীর্ণ, সত্য গ্রহণের অধিকার ও যোগ্যতারহিত। তাদের অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ। তাই তারা সত্যপথ দেখতে এবং সত্যমত বুঝতে অপারগ।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৮,১৩৯,১৪০

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ
لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ
بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ
اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

❒ মুনাফিকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে!

❒ বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহারা কি উহাদের নিকট শক্তি চায়? সমস্ত শক্তি তো আল্লাহেরই।

❒ কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহের কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন, যে-পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না, অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে। মুনাফিক এবং সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করিবেন।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে মুনাফিকদের জন্য নির্ধারিত মর্মন্তুদ শাস্তির কথা বলা হয়েছে। শাস্তির সংবাদ অবশ্যই দুঃসংবাদ। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে মুনাফিকদেরকে শুভসংবাদ দাও। এই বাকভঙ্গিটি বিদ্রূপাত্মক। এ রকম বলেছেন জুজায। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যে সংবাদ শোনার পর মুখমণ্ডলে প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়, সেই সংবাদই প্রকৃত সংবাদ। সেই সংবাদ শুভ অশুভ দু'টোই হতে পারে। এখানে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ওই সকল লোককে যারা সাহাবীগণের সামনে বলতো, আমরা ইমানদার এবং তাদের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হলে বলতো, আমরা তো মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য ওরকম বলি। এভাবে তারা সবসময় সমাজে অনাসৃষ্টির চেষ্টায় থাকতো।

পরের আয়াতে (১৩৯) বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি চায়—শক্তি, সহযোগিতা, সম্মান? এখানে প্রশ্নাকারে মুনাফিকদের অভিলাষকে ব্যর্থ করে দিয়ে বলা হয়েছে 'সমস্ত শক্তি তো আল্লাহ্‌রই', প্রশ্নটির মাধ্যমে বিদ্রূপ এবং বিস্ময়ও প্রকাশ করা হয়ে থাকতে পারে।

'ফাইন্নাল ইজ্‌জাতা লিল্লাহি জামিয়া'—এ কথার অর্থ সমস্ত শক্তি (মর্যাদা) আল্লাহ্‌রই। তিনি সকল সম্মানের একক অধিকর্তা। আর তিনিই সম্মান দান করেছেন তাঁর প্রিয় রসুলকে এবং রসুলের অনুসারীগণকে।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্‌র কোনো আয়াত প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং আয়াতকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন প্রত্যাখ্যানকারী ও বিদ্রূপকারীদের সঙ্গে তোমরা উপবেশন কোরো না, যদি না তারা প্রসঙ্গান্তর ঘটায়।

উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে উপবেশন করা নিষিদ্ধ নয়। প্রয়োজনবশতঃ তাদের কাছে যাওয়া আসা করা বা উপবেশন করা জায়েয। প্রয়োজন না পড়লে বসা মাকরূহ্‌। হাসান বলেছেন, কাফের ও মুনাফিকেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেও তাদের সঙ্গে বসা নাজায়েয।

এই আয়াতটি মর্মের দিক দিয়ে সুরা আনআ'মের একটি আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে এরশাদ করা হয়েছে— 'আর যখন তুমি তাদেরকে আমার আয়াতের দোষান্বেষণ করতে দেখবে তখন তাদের নিকট থেকে দূরে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করে'। জুহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিয়ামতের দিন বেদাতী সম্প্রদায়গুলো এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

'অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌র আয়াতের সঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার সময় যদি তোমরা কাফের ও মুনাফিকদের সঙ্গে বসো, তবে তোমরা হবে তাদের মন্তব্যসমূহের নীরব সম্মতিদানকারী। এভাবে (ধীরে ধীরে) তোমরাও হয়ে যাবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী অথবা মুনাফিক।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'মুনাফিক এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই আল্লাহ্‌ জাহান্নামে একত্র করবেন'—এ কথার অর্থ পৃথিবীতে মুনাফিক, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রতি মৌন সমর্থনদানকারীরা যেমন বন্ধুত্ব সূত্রে একত্র ছিলো, তেমনি তাদেরকে চিরস্থায়ী আবাস প্রজ্জ্বলিত নরকেও সম্মিলিত করে দেয়া হবে।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝

❐ যাহারা তোমাদের শুভাশুভের প্রতীক্ষায় থাকে তাহারা আল্লাহের অনুগ্রহে তোমাদের জয় হইলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' এবং ভাগ্য যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অনুকূল হয়, তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদিগকে বিশ্বাসীদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিবেন এবং আল্লাহ্ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কোন পথ রাখিবেন না।

মুনাফিকদের চরিত্রের একটি অন্ধকার দিক উন্মোচন করা হয়েছে এই আয়াতে। সুযোগ সন্ধানী মুনাফিকেরা মুসলমান ও কাফের বাহিনীর যুদ্ধের সময় অপেক্ষা করে দেখতে থাকে—মুসলমানদের জয় হলো না পরাজয় ঘটলো। মনেপ্রাণে তারা চাইতো মুসলমানদেরই পরাজয় ঘটুক। কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে মুসলমানেরা জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বলতে শুরু করতো, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? (আমরাই তো ছিলাম তোমাদের সাথী ও সমর্থক)। সুতরাং আমাদেরকেও গণিমতের অংশ দাও। কাফেরেরা জয়ী হলে তারা কাফেরদের নিকটে গিয়ে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে বিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করি নি (আমরাইতো তোমাদেরকে মুসলমানদের গোপন সংবাদ প্রদান করে সাবধান করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে জয়লাভে সমর্থ হও)। এই আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে 'মোবাররাদ' বলেছেন, কাফেরদের প্রতি মুনাফিকদের বক্তব্য ছিলো এ রকম—তোমরাতো যুদ্ধ সম্পর্কে দোদুল্যচিত্ত ছিলে। আমরাই তো তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছি। এভাবে তোমাদেরকে রক্ষা করেছি বিশ্বাসীদের হাত থেকে।

'আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন'—এ কথার অর্থ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক এই মর্মে সিদ্ধান্ত দান করবেন যে, বিশ্বাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং মুনাফিকরা যাবে দোজখে।

বোখারী, মুসলিম ও হাকেম বর্ণিত একটি দীর্ঘ বর্ণনায় রয়েছে— হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা দিতে থাকবে, হে মানুষ! তোমরা আপন আপন উপাস্যের পশ্চাতে সমবেত হও। এই ঘোষণার পর প্রত্যেকে তাদের আপনাপন উপাস্যের পশ্চাতে সমবেত হবে। দাঁড়িয়ে থাকবে কেবল বিশ্বাসীরা। আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছো (কার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছো তোমরা)? বিশ্বাসীরা বলবেন, আপনার জন্য। আল্লাহ্পাক তৎক্ষণাৎ যবনিকামুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। আল্লাহ্কে দেখা মাত্র প্রকৃত বিশ্বাসীরা পড়ে যাবে সেজদায়। আর যারা লোক দেখানোর জন্য কিংবা সুখ্যাতির জন্য ইবাদত করেছিলো, তারা সেজদা করতে পারবে না। তাদের পিঠ হয়ে যাবে কাঠের তক্তার মতো, যার কারণে তারা মস্তক অবনত করতে পারবে না। হাকেমের বর্ণনায় এ কথাটিও রয়েছে যে, তারা সামনের দিকে ঝুঁকে সেজদা করতে চাইবে, কিন্তু পড়ে যাবে পিছনের দিকে।

'এবং আল্লাহ্ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না'—এ কথার অর্থ বিশ্বাসীদের উপর আধিপত্য বিস্তারের কোনো পন্থা আল্লাহ্পাক অবিশ্বাসীদেরকে দান করবেন না। হজরত আলী বলেছেন, আল্লাহ্পাক আখেরাতে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদেরকে বিজয় দান করবেন না। ইবনে জারীর। এক বর্ণনাসূত্রে এসেছে হজরত ইবনে আব্বাসও এ রকম বলেছেন। কিন্তু হজরত ইকরামা এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, দলিল প্রমাণের দিক দিয়ে আল্লাহ্পাক কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবেন না। বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর, আবদ বিন হুমাইদ এবং সুদ্দী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ— সাহাবায়ে কেরামের উপর তাদের শত্রুরা কখনোই প্রবল হতে পারবে না। পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের উপর কাফেরদের আধিপত্য বিস্তারের যে ঘটনা পরিলক্ষিত হয়— তা সংঘটিত হতে পেরেছে কেবল মুসলমানদের বিশ্বাসগত দুর্বলতা ও অবাধ্যতার কারণে। এখানে আল্লাহ্পাক মুসলমানদের উপর কাফেরদেরকে প্রবল না করার যে অঙ্গীকার দান করেছেন সেই অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে— আল্লাহ্পাক কখনোই প্রকৃত বিশ্বাসীদের উপর কাফেরদেরকে আধিপত্যবিস্তারের সুযোগ দিবেন না। দুর্বল ইমানদার এবং অবাধ্য মুসলমানদের জন্য এই অঙ্গীকার কার্যকর নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'আলাল মু'মিনিনা সাবিলা।' 'সাবিলা' অর্থ পথ। এখানে পথ শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে বলা হয়েছে, কাফেরেরা এমন পথ পাবে না, যার মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়।

এই আয়াতের দলিল উপস্থাপন করে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কোনো কাফের যদি মুসলমান গোলাম খরিদ করে, তবে তার খরিদসত্ব বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বেচাকেনা শুদ্ধ হবে। কেননা কাফের এখানে স্বীকারোক্তিকারী এবং মুসলমান গোলাম বিক্রয়পণ্য। কিন্তু এই আয়াতের

বর্ণনানুসারে কাফের ওই গোলামের মালিক হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে কাফের তার ক্রয়কৃত গোলামকে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানিফা এই দলিলটি উত্থাপন করেছেন যে, স্বামী ধর্মত্যাগী হলে মুসলমান স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। বিবাহ বাতিল হবে স্বামীর ধর্মত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৪২,১৪৩,১৪৪.১৪৫

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۝ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝

❒ মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করিতে চাহে; বস্তুতঃ তিনিই তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকেন এবং যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য, এবং আল্লাহ্‌কে তাহারা অল্পই স্মরণ করে;

❒ দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে! এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।

❒ হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

❒ মুনাফিকগণ তো অগ্নির নিম্নতম স্তরে রহিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবে না।

মুনাফিকেরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতারণা করতে চায়। কিন্তু তাদের প্রতারণার প্রতিফল তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই প্রতারণার প্রকৃতি সম্পর্কে সুরা বাকারার প্রথম দিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেখানে ব্যাখ্যাটি ভালোভাবে দেখে নেয়া যেতে পারে।

'তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সঙ্গে দাঁড়ায়'— এ কথার অর্থ মুনাফিকেরা নামাজে দাঁড়ায় আলস্য ও অসন্তুষ্টি সহকারে। নামাজের বিনিময়ে সওয়াবের ইচ্ছা তারা রাখে না। যথানিয়মে নামাজ সম্পাদন না করলে অথবা নামাজ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্‌পাক যে শাস্তি দান করবেন— সে ভয়ও তারা করে না।

'কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তারা অল্পই স্মরণ করে'— এ কথার অর্থ লোকে যেনো তাদেরকে নামাজী মনে করে সে কারণে তারা নামাজে দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্‌র ইবাদত তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই তাদের নামাজে নিবিষ্টচিত্ততা নেই। আল্লাহ্‌ভীতিও নেই। তারা এ কথা জানে না এবং মানে না যে, আল্লাহ্‌র জিকিরবিহীন নামাজ নামাজই নয়।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আবু ইয়া'লী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে নামাজ উত্তমরূপে পাঠ করে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে যথানিয়মে পড়ে না, সে নামাজের মর্যাদাহানি করে। এই প্রকৃতির নামাজ দ্বারা ওই ব্যক্তি তার প্রতিপালককে অবমাননা করে।

'দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে'—এখানে বলা হয়েছে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোদুল্যমানতার কথা। দোদুল্যমানতা বুঝাতে এখানে 'মুজাব যাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যাকে দু'দিক থেকে ধাক্কা দেয়া হয়, ওই ব্যক্তিকে বলে মুজাব যাব। সে কোনো দিকেই স্থির হতে পারে না। ওই সকল লোকের সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে, না এদিকে না ওদিকে। অর্থাৎ একবার বিশ্বাসের দিকে, আরেকবার অবিশ্বাসের দিকে। তারা পথভ্রষ্ট। তাদের পথপ্রাপ্তির আর কোনো আশাই নেই। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না।' এ প্রসঙ্গে অন্য একটি আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে, 'আর আল্লাহ্‌ যাকে নূর দান না করেন, তার জন্য কোনো নূর নেই।' হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, মুনাফিকদের উদাহরণ হচ্ছে ওই স্ত্রী ছাগলের মতো যে— তাকে ডাকতে থাকা দু'টি পুরুষ ছাগলের ডাকে একবার এর কাছে দৌড়ে যায়, আরেকবার দৌড়ে যায় ওর কাছে। মুসলিম।

মুনাফিকদের অসৎ স্বভাবসমূহের পরিচিতি দানের পর আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসীদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এভাবে— হে বিশ্বাসীরা! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। যদি করো, তবে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। এরপর বলা হয়েছে 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?'

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্‌পাকের এই অমোঘ প্রশ্নের প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে আব্বাসের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এ রকম— কোরআনের প্রতিটি আয়াত আল্লাহ্‌পাকের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

'মুনাফিকগণ তো অগ্নির নিম্নতর স্তরে থাকবে'—এখানে নিম্নতর স্তর বুঝাতে 'দারকিল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি দারকাতুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ স্তরসমূহ অথবা মঞ্জিলসমূহ। নিম্নস্তর বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর বিপরীতার্থক শব্দ 'দারাজাত'। 'দারাজাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ঊর্ধ্বস্তর বুঝানোর জন্য। এ রকম বলেছেন আল্লামা সুয়ূতী। ইবনে মোবারক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ এ বাক্যটির তাফসীর সম্পর্কে বলেছেন, দোজখের নিম্নস্তরে থাকবে লোহার সিন্দুক। সেই সিন্দুকে মুনাফিকদেরকে বন্দী করে রাখা হবে। বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, ওই সিন্দুকের ভিতর মুনাফিকেরা বন্দী অবস্থায় থাকবে। আর ওই সিন্দুকের উপরে ও নিচে থাকবে জ্বলন্ত হুতাশন।

ইবনে ওয়াহাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, দোজখে একটি কূপের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দোজখ সৃষ্টির প্রথম থেকেই ওই কূপের ভয়াবহ উত্তাপ থেকে দোজখ নিজেই আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করে। ওই কূপই দোজখের নিম্নতম স্তর। ওই নিম্নস্তরে মুনাফিকেরা অবস্থান করবে এ কারণে যে, তারা কাফেরদের চেয়েও বেশী অপবিত্র। অন্তরে তাদের অবিশ্বাসতো ছিলোই, তার উপরে তারা আল্লাহ্, রসুল, ইসলাম প্রসঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতো এবং মুসলমানদেরকে ধোকা দিতো। প্রকৃত কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথিবীতে হত্যা ও জিজিয়ার আওতামুক্ত থাকতে পেরেছিলো। কিন্তু আখেরাতে এ রকম সুযোগ নেই। কাফের হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে সুবিধা ভোগ করেছিলো বলেই তারা আখেরাতে হবে জাহান্নামের নিম্নতর স্তরের অধিবাসী। সবশেষে তাই এ মর্মে চূড়ান্ত ঘোষণা এসেছে যে, '(হে আমার প্রিয় রসুল), তাদের জন্য আপনি কখনও কোনো সহায় পাবেন না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৪৬.১৪৭

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ○ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ○

❐ কিন্তু যাহারা তওবা করে, নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহের উদ্দেশ্যে তাহাদের দ্বীনকে নির্মল করে তাহারা বিশ্বাসীদের সংগে থাকিবে এবং বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কার দিবেন।

❐ তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহের কী কাজ? আল্লাহ্ পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ।

প্রকৃত তওবাকারীদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। প্রকৃত তওবাকারী তারাই যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে নেয়। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দ্বীনকে

নির্মল করার অর্থ এখলাস অর্জন করা। এখলাস অর্জন করার অর্থ বিশুদ্ধ নিয়তে (উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্‌র উপাসনা করা। ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবু ইদ্রিস বলেছেন, এখলাস অর্জিত হবে ওই সময়ে যখন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য আমল করা হবে—মানুষের প্রশংসার জন্য নয়। ইমাম আহমদ ও ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে এসেছে— আবু সুমামা বলেছেন, হাওয়ারীগণ হজরত ঈসাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে রুহুল্লাহ্! এখলাসের অধিকারী কে? তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি মুখলিস (এখলাসের অধিকারী) যে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য আমল করে এবং তার আমলের জন্য মানুষের প্রশংসাকে পছন্দ না করে। নাওয়াদিরুল উসুল গ্রন্থে হজরত যায়েদ বিন আরকাম থেকে হাকেম ও তিরমিজি লিখেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। নিবেদন জানানো হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এখলাসের সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ার অর্থ কী? রসুল স. বললেন, ওই কলেমা, যার পাঠকারী নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকে (এ রকম ব্যক্তি কর্তৃক পঠিত কলেমাই এখলাসের কলেমা)।

হজরত মুআজ বিন জাবালের বর্ণনায় এসেছে (হজরত মুআজ বলেন), রসুল স. যখন আমাকে ইয়েমেনের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, তখন আমি নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে কিছু নির্দেশনা দান করুন। তিনি স. বললেন, ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা কোরো। তাহলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। হাকেম, বায়হাকী।

ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া 'আল এখলাস' গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে লিখেছেন— হজরত সাওবান বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, মুখলিসদের জন্য শুভসমাচার। তারা হবে পথনির্দেশনার প্রদীপ। সেই প্রদীপের মাধ্যমে ফেৎনার অন্ধকার অপসৃত হবে।

'তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে'—এ কথার অর্থ তারা থাকবে জান্নাতের পথে অগ্রগামী বিশ্বাসীদের সঙ্গে। ফাররা বলেছেন, মাআল মু'মিনিন (বিশ্বাসীদের সঙ্গে) কথাটির অর্থ হবে মিনাল মু'মিনিন (বিশ্বাসীদের মধ্যে)।

'বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দিবেন'—কথাটির অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাসীদেরকে তিনি মহাপুরস্কার দানে ধন্য করবেন। সেই মহাপুরস্কার হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের দীদার, সন্তোষ, নৈকট্য এবং জান্নাত।

শাস্তি দেয়া যে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নয়, শেষ আয়াতটিতে (১৪৭) সে কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে চাইলে হতে হবে কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী। প্রশ্নাকারে উল্লেখিত বাক্যটির মূল মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌পাক তাঁর শোকর গুজার ও বিশ্বাসী বান্দাকে শাস্তি দিবেন না। শাস্তি দিলে তাঁর ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি হয় না, তেমনি শাস্তি না দিলে তাঁর প্রতাপ ক্ষুণ্ন হওয়ারও কোনো কারণ ঘটে না। সৃষ্টির মুখাপেক্ষী তিনি নন। শাস্তি দিলে তাঁর কোনো উপকার হবে এবং না দিলে ক্ষতি হবে— এ রকম ধারণা থেকেও

তিনি পবিত্র। তাঁর নির্ধারিত বিধান এই যে, সকল কিছুর পরিণামকে তিনি সবব বা কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এই বিধানানুসারে শাস্তিদানও কার্যকর হবে। শারীরিক নিয়মের ভারসাম্য নষ্ট হলে যেমন পীড়া সৃষ্টি হয়, তেমনি বিশ্বাসহীনতা এবং অকৃতজ্ঞতার কারণে হৃদয়ে জমাট বাঁধে নেফাক বা অপবিত্রতা— যা শাস্তিকে অবধারিত করে দেয়। বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞচিত্ততার মাধ্যমে কেবল সেই শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ সম্ভব।

বাগবী লিখেছেন, এখানে শব্দ ব্যবহারে অগ্রপশ্চাৎ ঘটেছে। 'ইনশাকারতুম ওয়া আমানতুম' (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও বিশ্বাস করো) এর স্থলে 'ইন আমান তুম ওয়া শাকারতুম' (বিশ্বাস করো ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো) বললে ধারাবাহিকতা রক্ষা হতো। আমি বলি, এ রকম মন্তব্যের কোনো প্রয়োজনই নেই। কেননা 'ওয়াও' বা 'এবং' ব্যবহৃত হয় শব্দসংযোজনের জন্য, ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নয়। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, এখানে ইমানের পূর্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, মানুষ যেনো আল্লাহ্পাকের বিশাল অনুগ্রহরাজি অবলোকন করে প্রথমে কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়। তারপর গভীরতর উপলব্ধির মাধ্যমে অনুগ্রহসম্ভারের মহান দাতা আল্লাহ্পাকের প্রতি ইমান আনে। আমি বলি, সম্ভবত এখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতা অর্থ রূপক বিশ্বাস (ইমানে মাজাজী), যা রূপক অবিশ্বাসের বিপরীত। আর ইমান অর্থ প্রকৃত ইমান (ইমানে হাকিকি)। ইমানে মাজাজী আবার ইমানে হাকিকির প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য। এই প্রকাশ্য সৌন্দর্যের পথ ধরে মানুষ অন্তর্নিহিত প্রকৃত বিশ্বাস পর্যন্ত উপনীত হয়। এ কারণেই এখানে শোকরকে ইমানের আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষ বাক্যটি এই— 'ওয়া কানাল্লহু শাকিরান আ'লিমা।' এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক মানুষের কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী। আর তিনি সর্বজ্ঞও। তিনি ভালো করেই জানেন কে কৃতজ্ঞচিত্ত এবং কে নয়। মানুষের কৃতজ্ঞতার বিনিময় বা পুরষ্কার দান করেন তিনি। গ্রহণ করেন অল্প এবং তার বিনিময় দান করেন অধিক। আর প্রকৃত ইমানদার কে— তাও তিনি ভালো করেই জানেন।

ষষ্ঠ পারা

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৪৮,১৪৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۞ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۞

❒ মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালবাসেন না; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করিলে অথবা গোপনে করিলে অথবা দোষ ক্ষমা করিলে আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।

'জাহ্রা বিস্সুয়ি' কথাটির অর্থ মন্দ কথার প্রচারণা। এই আয়াতে মন্দ কথার প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রচারণা ভালোবাসেন না। সে প্রচারণা উচ্চ স্বরে হোক অথবা অনুচ্চস্বরে। তবে উচ্চ স্বরের প্রচারণা অনুচ্চস্বরের প্রচারণার চেয়ে অধিকতর অনভিপ্রেত। মজলুম (অত্যাচারিত) ব্যক্তি অবশ্য এর ব্যতিক্রম। মজলুমেরা জালেমের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানাতে পারে এবং তাদের জন্য বদদোয়াও করতে পারে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে মন্দ কথা অর্থ গালি দেয়া। কাউকে গালি দেয়া নিষেধ। কিন্তু মজলুম ব্যক্তি গালি দিতে পারবে। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'এবং উৎপীড়িত হওয়ার পর যদি কেউ তার উৎপীড়নের সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে তবে তাতে কোনো দোষ নেই।'

হজরত আনাস এবং হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, একে অপরের প্রতি গালি বর্ষণকারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম গালিদাতাই দোষী, যতোক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় গালিদাতা তার প্রত্যুত্তরে সীমালংঘন না করে। মুসলিম।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে অতিথি সম্পর্কে। কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগত ব্যক্তির অতিথি সৎকার যদি

না করা হয় তবে অতিথি সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে পারবে তার প্রতি যেমন আচরণ করা হয়েছে।

কিতাবু জুহদ গ্রন্থে হান্নাদ লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, মদীনার এক লোকের বাড়িতে একজন মেহমান এলো। কিন্তু গৃহকর্তা উত্তমরূপে মেহমানদারী করলো না। মেহমান তখন তার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা মানুষের নিকট প্রচার করে দিলেন। তার ওই প্রচারণার সমর্থনে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আবদুর রাজ্জাক, আবদ্ বিন হুমাইদ এবং ইবনে জারীর লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন— এক লোক একটি মহল্লায় মেহমান হিসেবে হাজির হলো। মহল্লার লোকেরা মেহমানের পানাহারের ব্যবস্থা করলো না। মেহমান তাদের এই অনাদরের কথা জনসমক্ষে প্রচার করে দিলো। মহল্লার লোকেরা তখন তাকে পাকড়াও করলো। অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হজরত উকবা বিন আমের বলেছেন, আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমাদেরকে বিভিন্নস্থানে ধর্মপ্রচারে এবং ধর্মযুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন আমরা কখনো কখনো এমন জনপদে গিয়ে উপস্থিত হই, যারা অতিথি বৎসল নয়। তাদের প্রতি আমরা কেমন আচরণ করবো? রসুল স. বললেন, তোমরা কোথাও মেহমান হিসেবে উপস্থিত হলে সেখানকার লোকেরা যদি মেহমানদারী না করে তবে তোমরা মেহমানের হক (বলপূর্বক) আদায় করে নিবে। বোখারী ও মুসলিম।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াকানাল্লহু সামিয়ান আলিমা' (এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ) —এ কথার অর্থ তিনি সর্বশ্রোতা বলেই অত্যাচারিতের অভিযোগ ও অপপ্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং সর্বজ্ঞ বলেই তিনি অত্যাচারীর সকল কর্মকাণ্ডের সংবাদ উত্তমরূপে অবগত রয়েছেন। পরের আয়াতে সৎকর্ম বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'খইর' শব্দটি। শব্দটির অর্থ অনুসরণ, অনুগমন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে যদি তোমরা অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে প্রচার করো কিংবা তাদের দোষ ক্ষমা করে দাও তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।

এখানে 'খইর' বা সৎকর্ম প্রকাশ্যে ও গোপনে করার অর্থ প্রকাশ্যে ও গোপনে দান খয়রাত করা— কোনো কোনো আলেম এ রকম অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।

'দোষ ক্ষমা করলে'—এ কথার অর্থ অত্যাচারীর সঙ্গে শিষ্ট আচরণ করতে না পারলেও অত্যাচারের স্মৃতি অন্তর থেকে মুছে দিলে ও তাকে ক্ষম্য মনে করলে। বায়যাবী বলেছেন, 'দোষ ক্ষমা করলে'— এ রকম বলে অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যারা এ রকম করবে তাদেরকে লক্ষ্য করে জানানো হচ্ছে— 'আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান'। এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং যখন খুশী তখন তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তৎসত্ত্বেও তিনি পাপীদেরকে ক্রমাগত ক্ষমা করতে থাকেন। তোমরাও আল্লাহ্পাকের ক্ষমাপ্রদর্শনের এই মহৎ গুণটি কর্মায়ত্ত করতে সচেষ্ট হও। যদি এ

রকম করো, তবে আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে তোমরা অনেক সওয়াব লাভ করবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরের আয়াতে উৎসাহিত করা হয়েছে ক্ষমা প্রদর্শনের উচ্চতর আদর্শকে অবলম্বন করতে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন— রসুল স. এর নিকট প্রশ্ন করা হলো, পরিচারককে (খাদেমকে) কতোবার ক্ষমা করা যাবে? তিনি স. বললেন, প্রতিদিন সত্তরবার (অসংখ্যবার)। আবু দাউদ, তিরমিজি, আবুল ইয়া'লী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৫০, ১৫১, ১৫২

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

❒ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলদিগকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহে বিশ্বাস ও তাঁহার রসূলে বিশ্বাসের ব্যাপারে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে প্রত্যাখ্যান করি,' এবং ইহাদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করিতে চাহে,

❒ প্রকৃত পক্ষে ইহারাই সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী, এবং সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

❒ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না। উহাদিগকেই তিনি পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর প্রথম দু'টি (১৫০, ১৫১) অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে। বাগবী এ রকম বলেছেন। ইহুদীরা প্রথমে রসুল মোহাম্মদ স., কোরআন এবং রসুল ঈসা আ. এবং ইঞ্জিলকে অস্বীকার করলো। পরে সকল নবী

রসুলকে অস্বীকার করে বসলো। কারণ, তাঁরা ছিলেন একে অপরের সত্যায়নকারী। আল্লাহ্পাক সকল নবী ও রসুলকে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের সকলকে নবী ও রসুল বলে স্বীকার করতে হবে। তাঁদের যে কোনো এক জনকে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্পাকের নির্দেশকে অস্বীকার করা। এ অস্বীকৃতি মূলতঃ আল্লাহ্র প্রতি অস্বীকৃতি।

মুশরিকেরা আল্লাহ্র নির্দেশ মানে না। ইহুদীরাও আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্যকারী। তারা হজরত মুসাকে তাদের নিজস্ব অপবিশ্বাসের নিরিখে মান্য করে। আর সরাসরি অমান্য করে হজরত ঈসা, হজরত মোহাম্মদ স. ও অন্য নবীগণকে। তওরাতের প্রতি তারা আংশিক বিশ্বাসী। আর সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী কোরআন ও ইঞ্জিলের প্রতি। তারা বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করি। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করতে চায়। যারা এ রকম করে তারা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)। কেননা ইমান ও কুফরের মধ্যবর্তী কোনো মত ও পথ নেই। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে যা রয়েছে তা হচ্ছে অপবিশ্বাস বা বিকৃত বিশ্বাস, যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর। তাই এ কথা সন্দেহাতীত যে, এ রকম অপবিশ্বাসীরা কাফের।

নবী ও রসুলগণ ছিলেন সকলেই বিশ্বাসভাজন ও অনুসরণীয়। যুগের চাহিদা অনুসারে তাঁদের শরিয়তের শাখা-প্রশাখায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও তাঁরা ছিলেন মূলতঃ এক। তাঁদের মূল বিশ্বাসের বাইরে সত্য বলে কোনো কিছু নেই, যা আছে তা ভ্রষ্টতা। কেবলই ভ্রষ্টতা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসীদের কথা। যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলগণকে বিশ্বাস করে এবং তাঁদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য করে না। (একজনকে মানবো অপরজনকে মানবো না— এ রকম বলে না)। এ রকম প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকেই তিনি পুরস্কৃত করবেন। এখানে 'সাওফা' শব্দটির মাধ্যমে পুরস্কার প্রদানের দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'উলায়িকা সাওফা ইউ'তিহিম উজুরাহুম' (তোমাদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন)। শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াকানাল্লহু গফুরর রহিমা' (এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)। এ কথার মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করবেন। তাঁদের পুণ্য অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

মোহাম্মদ বিন কাব কারাজী থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, হজরত মুসার উপর তওরাত নাজিল হয়েছিলো এক সঙ্গে (ধারাবাহিকভাবে নয়)। আপনিও তেমনি তওরাতের প্রস্তর ফলকগুলোর মতো এক সঙ্গে লিখিত কোরআন নিয়ে আসুন যাতে আমরা আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি। বাগবী বলেছেন, প্রশ্নকারী ইহুদীরা ছিলো কাব বিন আশরাফ, ফাখাজ বিন আজুরা প্রমুখ। ইহুদীদের ওই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত ।

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا
مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ
وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا
لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم
مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ
الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيمًا ۝

❐ কিতাবীগণ তোমাকে তাহাদের জন্য আস্‌মান হইতে কিতাব অবতীর্ণ করিতে বলে; কিন্তু তাহারা মূসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবী করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদিগকে আল্লাহ্ দেখাও।' তাহাদের সীমালংঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল; অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল; ইহাও ক্ষমা করিয়াছিলাম, এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম।

❐ তাহাদের অংগীকারের জন্য 'তুর' পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম 'নত শিরে দ্বার প্রবেশ কর'। এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'শনিবারে সীমালংঘন করিও না'; এবং তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অংগীকার লইয়াছিলাম।

❐ এবং তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের অংগীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাহাদের এই উক্তির জন্য; যদিও তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্ উহা মোহর করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্পই বিশ্বাস করে।

❐ এবং তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যানের জন্য ও মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদের জন্য,

---

অবিমৃশ্য ইহুদীদের অসমীচীন আবদারের কারণে মনঃক্ষুণ্ণ রসুল স. কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্পাক এখানে এরশাদ করেছেন, (হে প্রিয় রসুল!) আপনি মূর্খ ও অবাধ্য ইহুদীদের অসুন্দর কথায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না, ইহুদীদের স্বভাব এ রকমই। এ অভ্যাস তাদের নতুন নয়। রসুল মুসাকে তারা এর চেয়েও বেশী জঘন্য আবদার জানিয়ে অপ্রস্তুত করেছিলো। তারা আপনাকে আসমান থেকে একই সঙ্গে সম্পূর্ণ কোরআন নাজিল করতে বলে। আর রসুল মুসাকে বলেছিলো প্রকাশ্যে আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাও। হজরত আবু উবাইদা বলেছেন, এ কথার অর্থ—বনী ইসরাইলেরা প্রকাশ্যে বলেছিলো, আল্লাহ্কে দেখিয়ে দাও। এ কথা বলেছিলো বনী ইসরাইলের ওই সত্তরজন নেতা যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হজরত মুসা তুর পর্বতে গমন করেছিলেন। ওই নেতাদের আল্লাহ্কে দেখাতে চাওয়ার আবদারটি ছিলো একটি অসম্ভব আবদার। পৃথিবীতে আল্লাহ্ দর্শন সম্ভব নয়। কারণ, এটা আল্লাহ্পাকের বিধান ও হেকমতের পরিপন্থী। কিন্তু এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ্র দর্শন কোনো দিনই ঘটবে না। মুতাজিলারা বলে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে দীদারে এলাহী অসম্ভব। তাদের ধারণা ঠিক নয়। প্রকৃত কথা এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্র দর্শন অসম্ভব হলেও আখেরাতে সম্ভব। সেখানে প্রকৃত বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র দীদার লাভে ধন্য হবেন।

বনী ইসরাইলের নেতারা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে দেখতে চেয়ে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ করেছিলো। বজ্রাঘাতের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাদের এ জঘন্য অপরাধের শাস্তি দিয়েছিলেন। আকাশ থেকে আগত একটি বজ্রাগ্নির মাধ্যমে ভস্মীভূত হয়েছিলো তারা। স্পষ্ট প্রমাণ তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা সংযত হয়নি। পুনরায় অবাধ্য হয়েছিলো। শুরু করেছিলো গো-বৎসের উপাসনা। পরে অবশ্য তারা তওবা করেছিলো। আর সে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমাও করেছিলেন। তওবার শর্তটি ছিলো অত্যন্ত কঠিন। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তারা একে অপরকে হত্যা করবে। তারা তা করেছিলোও। এভাবে অনেকে নিহত হবার পর আল্লাহ্পাক তাদের তওবা কবুল করেছিলেন। তাদের সম্প্রদায়কে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেননি। এ তওবা ও ক্ষমার কথাটির মধ্যে এ ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, রসুল স.এর যুগের ইহুদীরাও যেনো ওই ভয়াবহ ঘটনাটির কথা স্মরণ করে তওবা ও ক্ষমার পথে ধাবিত হয়।

'এবং মুসাকে স্পষ্ট প্রমাণ (সুলতানাম মুবিনা) প্রদান করেছিলাম'—এ কথার অর্থ তওবা কবুলের শর্ত হিসেবে প্রদত্ত হত্যাকাণ্ডের হুকুম (বনী ইসরাইলেরা যে হুকুমটি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেছিলো)। অথবা এখানে 'সুলতানাম মুবিনা' অর্থ অন্য কোনো নতুন মোজেজা (যে মোজেজার বিবরণ সম্পর্কে এখানে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি)।

বনী ইসরাইলের সীমালংঘনের ঘটনা দুই একটি নয়। অনেক। তারা তওরাতকে মান্য করতে চায়নি। তখন আল্লাহ্পাক তুর পর্বতকে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলেন। পর্বত পতনের ভয়ে বাধ্য হয়ে তারা তওরাতকে মেনে নিয়েছিলো। এভাবে তারা আরো অনেক সীমালঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। আল্লাহ্পাক তাদেরকে একটি শহরে প্রবেশের হুকুম দিয়েছিলেন এভাবে— 'নত শিরে দ্বার প্রবেশ করো।' তারা তা করেনি। আরও বলেছিলেন, 'শনিবারে সীমালংঘন কোরো না।' কিন্তু তারা ওই নিষেধাজ্ঞাটিও অমান্য করেছিলো। শনিবারে সীমালংঘন কোরো না— কথাটি আল্লাহ্পাকের নির্দেশ হিসেবে হয়তো বনী ইসরাইলদেরকে বলেছিলেন, হজরত মুসা অথবা হজরত দাউদ। কারণ, হজরত মুসার সময় থেকেই বনী ইসরাইলদের সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন ছিলো শনিবার। হজরত দাউদের সময়ও তারা শনিবারের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে মৎস শিকার করেছিলো। সীমালংঘনের কারণে তখন তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো চেহারা পরিবর্তনের শাস্তি। তারা হয়ে গিয়েছিলো বানর। অথচ তারা ছিলো আল্লাহ্পাকের সঙ্গে অংগীকারাবদ্ধ। তারা এই মর্মে অংগীকার করেছিলো যে— আমরা আল্লাহ্পাকের নির্দেশ মান্য করবো, শনিবারে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করবো না ইত্যাদি।

ইহুদীরা অভিশপ্ত। তারা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে অংগীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহ্র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য। তাদের উক্তি ছিলো—'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।' এখানে যে আয়াত প্রত্যাখ্যানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— তওরাত শরীফের ওই আয়াত যেগুলোতে রসুল মোহাম্মদ স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ রয়েছে। আয়াতিল্লাহ বা আল্লাহ্র আয়াত বলে এখানে কোরআন মজীদ ও ইঞ্জিল শরীফের আয়াতের কথাও বলা হয়ে থাকতে পারে। ইঞ্জিল ও কোরআনের আয়াতগুলোকেও ইহুদীরা প্রত্যাখ্যান করে থাকে। নবীহত্যাও তাদের অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার আরেকটি মোক্ষম কারণ।

'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'— কথাটির মাধ্যমে ইহুদীরা বুঝাতে চেয়েছে, আমরা জ্ঞানী। আমাদের হৃদয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ। নতুন কোনো জ্ঞান ধারণ করার স্থান সেখানে নেই। সুতরাং নতুন ধর্ম ইসলামের আহবান আমাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে না। তাদের এই বক্তব্যটি ছিলো সত্য-প্রত্যাখ্যানের একটি চূড়ান্ত প্রকাশ। আল্লাহ্পাক তাই তাদের হৃদয়কে মোহর করে দিয়েছেন। এ কথার অর্থ — তাদের হৃদয়কে করেছেন প্রকৃত প্রজ্ঞা থেকে চিরবঞ্চিত। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে সহায়তাবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করেছেন, আল্লাহ্র আয়াতগুলোর প্রতি মনোনিবদ্ধ করার তৌফিক তাদেরকে দান করেননি। 'সুতরাং তাদের অল্পই বিশ্বাস করে' এ কথার অর্থ তাদের সম্প্রদায়ের অল্পসংখ্যক লোক ইমান আনবে। যেমন, ইমান এনেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম ও তাঁর কতিপয় সঙ্গী। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, তাদের বিশ্বাস অপূর্ণ, তারা

কোনো কোনো নবী এবং কোনো কোনো আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করে। সকল নবী এবং সকল কিতাবকে মান্য করে না, এ রকম অপূর্ণ বিশ্বাসকে বিশ্বাস বলে গ্রহণ করা যায় না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সাধারণভাবে সকল ইহুদী যে ইমান আনবে না—এখানে সে কথাই বলা হয়েছে (আরবী বাকভঙ্গি অনুসারে 'অল্পই বিশ্বাস করে' অর্থ বিশ্বাসই করে না)।

আলোচ্য আয়াতগুলোর শেষটিতে ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হিসেবে সত্য-প্রত্যাখ্যানসহ আরও একটি জঘন্য অপরাধের কথা বলা হয়েছে। এখানে সত্য-প্রত্যাখ্যানের কথা পুনঃ উল্লেখের কারণ এই যে, এই আয়াতে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বিশেষভাবে হজরত মরিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত। অথবা পুনঃ পুনঃ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে বলে এখানে পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা প্রত্যাখ্যান করেছে হজরত মুসাকে, হজরত দাউদকে, হজরত সুলায়মানকে, হজরত ঈসাকে এবং সবশেষে হজরত মোহাম্মদ স. কে। হজরত মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দিয়েছিলো তারা। তাঁকে বলেছিলো ব্যভিচারিণী (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৫৭, ১৫৮

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ○ بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

❐ আর 'আমরা আল্লাহের রসূল মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ্কে হত্যা করিয়াছি' তাহাদের এই উক্তির জন্য। তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই ও ক্রুসবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ মনে হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল, এবং এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।

❐ না, আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন, এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইহুদীরা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্র রসুল বিশ্বাস করতো না। অথচ আয়াতে তাদের উক্তি হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে 'আমরা আল্লাহ্র রসুল মরিয়ম তনয় ঈসা

মসীহ্‌কে হত্যা করেছি।' এতে করে বুঝা যায়, তারা তাঁকে রসুল বলতো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এ রকমও হতে পারে যে, তারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্‌র রসুল না বলে অন্য কোনো মন্দ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করতো। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক এখানে তাদের উক্তিটি উদ্ধৃতি করলেও তাদের মন্দ সম্বোধনের পরিবর্তে হজরত ঈসাকে আল্লাহ্‌র রসুল বলে সম্মানিত করেছেন। এ রকম অর্থ করলে বুঝতে হবে, আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি মন্দ সম্বোধন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধের কারণেই ইহুদীরা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। অভিশপ্ত ওই ইহুদীদের ধৃষ্টতামূলক উক্তিটি উল্লেখ করার পরক্ষণেই আল্লাহ্‌পাক জানাচ্ছেন 'তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এ রকম মনে হয়েছিলো।' এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রকৃত ঘটনা ছিলো এ রকম— একদল ইহুদী হজরত ঈসা এবং তাঁর পুত-পবিত্রা জননীকে গালি দিলো। তিনি তখন তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তাঁর বদদোয়ার কারণে আল্লাহ্‌পাক গালিদাতাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করে দিলেন। এই ঘটনা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো ইহুদী সম্প্রদায়। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, হজরত ঈসাকে হত্যা করতে হবে। আল্লাহ্‌পাক তখন হজরত ঈসাকে জানালেন, তোমাকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হবে। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

কতিপয় বর্ণনায় এসেছে—হজরত ঈসা তাঁর সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার আকৃতি বিশিষ্ট হতে চাও, যাকে ইহুদীরা শূলে চড়াবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি চাই। আল্লাহ্‌পাক তখন তাঁর আকৃতি হজরত ঈসার মতো করে দিলেন। ওই ব্যক্তিকেই ইহুদীরা শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে নাসাঈ এ রকম বর্ণনা করছেন। বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক ওই ব্যক্তিকে হজরত ঈসার আকৃতি বিশিষ্ট করে দিলেন। আর ইহুদীরা তাকেই হজরত ঈসা মনে করে ক্রুশবিদ্ধ করলো।

আমরা সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছি যে—ইহুদীদের নেতা ইয়াহুদা হজরত ঈসাকে হত্যার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলো। তার নাম ছিলো তাতিয়ানুস। সে হত্যার উদ্দেশ্যে যখন হজরত ঈসার গৃহে প্রবেশ করলো তৎক্ষণাৎ হজরত ঈসাকে উঠিয়ে নেয়া হলো আকাশে। আর তাতিয়ানুসের চেহারা হয়ে গেলো অবিকল হজরত ঈসার মতো। সে ঘর থেকে বের হয়ে এলে অপেক্ষমান ইহুদী জনতা তাকেই হজরত ঈসা মনে করে বন্দী করলো এবং শূলে চড়ালো। কেউ কেউ বলেছেন, ইহুদীরা হজরত ঈসাকে একটি ঘরে বন্দী করে রেখে দিলো এবং তার জন্য নিযুক্ত করলো এক পাহারাদার। ওই পাহারাদারের চেহারাকে আল্লাহ্‌ হজরত ঈসার মতো করে দিলেন। ইহুদীরা তাকে হজরত ঈসা ভেবে হত্যা করে ফেললো। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

হজরত ঈসার ক্রুশবিদ্ধ হওয়া নিয়ে ইহুদীদের মধ্যেই দেখা দিলো চরম মতবিরোধ। কালাবী বলেছেন, ইহুদীরা বললো, আমরা ঈসাকে হত্যা করেছি।

খৃষ্টানেরা বললো, তাকে কতল করেছি আমরা। খৃষ্টানদের একটি দল এ কথাও বলে বসলো যে, ইহুদী বা খৃষ্টান কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারেনি বরং আল্লাহ্ তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আকাশে উত্তোলনের ঘটনাটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্পাক তাতিয়ানুসের মুখমণ্ডল কেবল হজরত ঈসার মতো করে দিয়েছিলেন। তার শরীরের আকার পরিবর্তন করেননি। ক্রশবিদ্ধ করার পর এই বিষয়টি লক্ষ্য করে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তারা। একদল বললো, ক্রশবিদ্ধ করা হয়েছে হজরত ঈসাকে। আরেকদল বললো, না, ক্রশবিদ্ধ ব্যক্তিটি তাতিয়ানুস—ঈসা নয়। একদল বললো, দেখো! এইতো ঈসার মুখাকৃতি। আরেকদল বললো, কিন্তু শরীরতো তাতিয়ানুসের। সুদ্দী বলেছেন, যদি ক্রশবিদ্ধ ব্যক্তিটি হজরত ঈসা হয়ে থাকেন, তবে আমাদের তাতিয়ানুস কোথায়? আর তাতিয়ানুসকে যদি ক্রশবিদ্ধ করা হয় তবে ঈসা কোথায়?

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিলো'— এখানে 'তাঁর' সর্বনামটির উদ্দেশ্য হজরত ঈসা। হজরত ঈসা সম্পর্কে ইহুদীদের মতবিরোধ ছিলো এ রকম— কেউ বলতো ঈসা মিথ্যাচারী, আমরা তাকে হত্যা করে উপযুক্ত কাজ করেছি। আবার কেউ বলতো, আমরা জানিনা, ঈসা মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী। এ ব্যাপারেও আমরা নিশ্চিত নই যে, তাকে আমরা প্রকৃতই হত্যা করতে পেরেছি কি না। কেউ কেউ আবার এ রকমও বলতো যে, আমাদের সঙ্গে ঈসার দেখা হযেছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা বলে বেড়াতো, হজরত ঈসার আকাশে আরোহণের বিষয়টি সঠিক।

সংশয়যুক্ত ইহুদীরা সর্বজনমান্য কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলো না। তাদের প্রতিটি মতামতই ছিলো অনুমান নির্ভর। আল্লাহ্পাক তাই বলেছেন, 'তাদের কোনো জ্ঞানই ছিলো না।' এ সম্পর্কে আয়াতে সঠিক সিদ্ধান্তটি দেয়া হয়েছে এভাবে —'এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।' এ কথাটি আল্লাহ্পাকের চূড়ান্ত রায় হতে পারে। আবার এটা ইহুদীদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হওয়াও সম্ভব। সংশয়াচ্ছন্নতার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে খেতে তারা হয়তো অবশেষে এই সিদ্ধান্তের উপকূলে উপনীত হতে পেরেছিলো যে, হজরত ঈসা নিহত হননি— এ কথাটি নিশ্চিত। ফাররা বলেছেন, ক্রশবিদ্ধ করার কাজটি যারা করেছিলো তারাই বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, ক্রশবিদ্ধ ব্যক্তিটি হজরত ঈসা।

হজরত ঈসাকে যে ইহুদীরা ক্রশবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারেনি, সে কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে পরের আয়াতে (১৫৮)। আল্লাহ্পাকের এই অমোঘ ঘোষণাটির মাধ্যমে এ বিষয়ে আর সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ মাত্র নেই যে, আল্লাহ্পাক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যারা বলবে তারা মিথ্যুক।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াকানাল্লহু আযিযান হাকিমা' —এ কথার অর্থ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী বলেই তিনি ইহুদীদেরকে যথাশাস্তি দান করতে পূর্ণ সক্ষম। আর তিনি প্রজ্ঞাময় তাই অভিসম্পাতের যোগ্য ইহুদীদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করেছেন। হজরত ঈসার আকাশ আরোহণের বিষয়টিও তাঁর প্রজ্ঞাময়তার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৫৯

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

❐ কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই, এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

এক সময় ইহুদীরা ইমান আনবেই। ইমান আনবে হজরত ঈসার প্রতি, হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রতি এবং আল্লাহ্র প্রতি (আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি)। আল্লাহ্পাকের হুকুম এই যে— সকল নবী-রসুলের প্রতি ইমান আনতে হবে। রসুল ঈসার প্রতি ইমান আনলে ইমান আনতে হবে রসুল মোহাম্মদ স. সহ সকল নবীগণের প্রতি। রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনলেও ইমান আনতে হবে হজরত ঈসা, হজরত মুসা সহ সকল পয়গম্বরের প্রতি। আয়াতে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই। আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, যারা বিশ্বাস করবে না। আলী বিন আবী তালহার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রত্যেক কিতাবীই (ইহুদী ও খৃষ্টান) মৃত্যুর প্রাক্কালে ইমান আনবে। বর্ণনাকারী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, ইহুদীরা যদি অকস্মাৎ গৃহের ছাদ থেকে পতিত হয় (তখন কি তারা হজরত ঈসার রেসালাতকে স্বীকার করবে)? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বাতাসের মধ্যেই (মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই) সে হজরত ঈসার রেসালাতের স্বীকৃতি দেবে। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো, যদি তার কণ্ঠ ছেদন করা হয়? তিনি বললেন, তখন জিহবায় সত্য কলেমা উচ্চারণ করবে। প্রকৃত কথা এই, ইহুদীরা প্রত্যেকেই মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র এককত্ব এবং হজরত মোহাম্মদ স. ও হজরত ঈসার রেসালাতকে মেনে নিবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রত্যেক কিতাবী কোনো না কোনো সময় নিশ্চয়ই ইমান গ্রহণ করবে। জীবদ্দশায় যদি গ্রহণ না করে, তবে মৃত্যুর সময় আযাব দেখে ইমানের স্বীকৃতি দিবে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এই বাক্যটির অর্থ এ রকম— প্রতিটি ইহুদী হজরত মুসা এবং তওরাতকে তো বিশ্বাস করেই। সুতরাং তারা তওরাতের নির্দেশে অবশেষে হজরত ঈসা, হজরত দাউদ, হজরত মোহাম্মদ স. এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল, যবুর ও কোরআনকেও বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা কেবল হিংসাবিদ্বেষের কারণেই ওই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা অপরিণামদর্শী। অবিমৃশ্য। সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী। তাই তওরাতকে মান্য করেও বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে

তওরাতের নির্দেশের। কিন্তু যখন উপায়ন্তর থাকবে না, দাঁড়াতে হবে মৃত্যুর মুখোমুখি, তখন আযাবের ফেরেশতাকে দেখে তাদের হুঁশ হবে। তখনই হবে তাদের হিংসাবিদ্বেষের চির অবসান। বুঝবে, রসুল মোহাম্মদ স. যা কিছু বলেছেন, তা সত্য। আয়াতে তাদের ওই অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— 'কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই।' ইহুদীরা যাতে সত্বর তওবা করে বিশ্বাসীদের দলভূত হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে এই বাক-ভঙ্গিটি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যুর প্রাক্কালে তোমরা তো ইমান আনবেই, কিন্তু ওই সময়ের ইমান গ্রহণীয় হবে না। কারণ, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তওবার দরোজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এখন তওবার তোরণ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। সুতরাং এখনইতো তওবা করার প্রকৃষ্ট সময়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবে' অর্থ হজরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে হজরত ঈসাকে বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ হজরত ঈসা যখন আকাশ থেকে পুনরায় নেমে আসবেন, তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। তখন অবিশ্বাসী বলে আর কেউ থাকবে না। পৃথিবীবাসীরা সকলেই হয়ে যাবে ইসলামের অনুসারী। এই ব্যাখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ, অতি সত্বর মরিয়ম নন্দন তোমাদের মধ্যে হাকিম নির্বাচিত হয়ে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশকে নিশ্চিহ্ন করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং অবলুপ্ত করে দিবেন জিজিয়া। দেখা দিবে বিত্তের প্রাচুর্য। বিত্ত গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওই সময় একটি সেজদার গুরুত্ব হবে পৃথিবীর সকল সামগ্রী অপেক্ষা অধিক। হাদিসটি উদ্ধৃত করার পর হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যদি তোমরা এ কথার প্রমাণ চাও, তবে পড় 'ওয়া ইম্মিন্ আহলিল কিতাবি ইল্লা লা ইয়ু'মিনান্না বিহী ক্বলা মাওতিহি' (কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই)। এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত আবু হোরায়রা এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন তিনবার। হজরত ঈসার অবতরণকালিন ঘটনা প্রসঙ্গে হজরত আবু হোরায়রার মারফু বর্ণনায় এ কথাটিও এসেছে— হজরত ঈসার অবতরণের পর পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মাওকুফরূপে ইবনে জারীর এবং হাকেমও এ রকম বলেছেন। বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করে হাকেম আরও বলেছেন, কিতাবীদের মধ্যে তখন অবিশ্বাসী বলে কেউ থাকবে না।

আমি বলি, কিয়ামতের পূর্বে হজরত ঈসার অবতরণের পর পৃথিবীতে যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না সে কথাটি ঠিক এবং তা বিশুদ্ধ মারফু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এই আয়াতে হজরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে ওই সময়ের ইহুদীরা তাঁকে বিশ্বাস করবে— এ কথাটি ঠিক নয়। হজরত আবু হোরায়রা তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুসারে তখনকার ইহুদীদের ইমান আনার সঙ্গে এই আয়াতটিকে সম্পৃক্ত করেছেন। কোনো বিশুদ্ধ মারফু হাদিসে এ রকম উল্লেখ নেই। এখানে 'কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে' অর্থ সকল যুগের সকল কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে (কেবল হজরত ঈসার অবতরণের পরের কিতাবীদের প্রত্যেকে— এ রকম নয়)। হুকুমটি সাধারণ। আর যদি এটিকে বিশেষ মনে করা হয়, তবে

রসুল স. এর সময়ের ইহুদীদের প্রতি এ বাক্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং হজরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তখনকার প্রতিটি কিতাবী ইমান আনবে— কথাটি ঠিক নয়। কিতাবীরা প্রত্যেকে তার নিজের মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বাস করবে— এই ব্যাখ্যাটিই সঠিক। হজরত উবাই ইবনে কা'বের উচ্চারণরীতির (কেরাতের) মাধ্যমেও এ কথাটি প্রমাণিত হয়। তিনি 'কবলা মাওতিহি' এর স্থলে পড়তেন 'কবলা মাওতিহিম।' এই 'হিম' সর্বনামটি সুস্পষ্টরূপে কিতাবীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত— হজরত ঈসার সঙ্গে নয়।

শেষে বলা হয়েছে, 'এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।' এ কথার অর্থ কিয়ামতের দিন হজরত ঈসা অথবা হজরত মোহাম্মদ স. তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন (কারণ ইহুদীরা এমন সময়ে ইমান এনেছিলো যখন ইমান আনার সময় আর ছিলো না অর্থাৎ তখন তওবার দরোজা হয়ে গিয়েছিলো রুদ্ধ)। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌পাক নিজেও তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাই অন্যত্র বলা হয়েছে— 'ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহিদা' (আর আল্লাহ্‌ই সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যথেষ্ট)। তখন নবী ও রসুলগণ তাঁদের আপনাপন উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবেন। আর রসুল স. সাক্ষী হবেন সকলের জন্য।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬০, ১৬১, ১৬২

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ○ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○ لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

❒ ভাল ভাল যাহা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল তাহা উহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি তাহাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহের পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য,

❒ এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

❏ কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা স্থিতপ্রাজ্ঞ তাহারা ও বিশ্বাসীগণ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাতেও বিশ্বাস করে এবং যাহারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে উহাদিগকেই মহাপুরস্কার দিব।

সীমালংঘন বুঝাতে এখানে 'জুলমিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইহুদীদের সীমালংঘনের তালিকা দীর্ঘ। যেমন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করা, নবীদেরকে হত্যা করা, হজরত মরিয়মের উপর অপবাদ আরোপ করা, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'— এ রকম দর্পপ্রকাশক বাক্য ব্যবহার করা, হজরত ঈসাকে হত্যার দাবী ইত্যাদি। তারা আল্লাহ্র পথে গমনকারীকেও বাধা দেয়। এ সকল কারণে আল্লাহ্পাক অনেক বৈধ বস্তু তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। বৈধ বস্তু অবৈধ করার ঘোষণা সুরা আনআমে দেয়া হয়েছে— 'ওয়া আলাল্লাজিনা হাদু হার্রামনা কুল্লা জি জুফরিন থেকে ওয়া ইন্না লা সদিকুন পর্যন্ত)। বৈধ বা পবিত্র বস্তু বুঝাতে এখানে 'তইয়েবাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'তইয়েবাত' বলে এখানে জান্নাতের পবিত্র নেয়ামত সমূহ বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। পৃথিবীর হালাল রিজিককে 'তইয়েবাত' বলা যায়। ইহুদীরা পৃথিবীর বৈধ ও পবিত্র রিজিক থেকেও বঞ্চিত। তারা সুদখোর। আর সুদকে আল্লাহ্পাক হারাম করে দিয়েছেন। রসুল স. এরশাদ করেন, যে গোশত হারাম রিজিক থেকে সৃষ্ট, দোজখই তার উপযুক্ত স্থান।

সুদ ভক্ষণ করার সাথে সাথে তারা আরেকটি জঘন্য হারাম কাজে অভ্যস্ত। সেটি হচ্ছে অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করা। এ সকল কারণে অবিশ্বাসী ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

কিতাবীদের মধ্যে সকলেই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী নয়। তাদের মধ্যে একটি দল সর্বান্তঃকরণে ইমান ও ইসলামকে গ্রহণ করেছেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীবৃন্দ। আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে এভাবে 'কিন্তু তাহাদের মধ্যে যারা স্থিত প্রাজ্ঞ'। বায়হাকী লিখেছেন, ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আগত ইমানদার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, হজরত উসাইদ বিন শা'বা এবং ছা'লাবা বিন শা'বা প্রমুখ সম্পর্কে। এই সকল ইমানদার এবং মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণকে মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। বলেছেন, তারা কোরআন এবং কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল কিতাবকে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে।

সালাত কায়েম করা বা নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— আল মুক্বিমিনাস্ সলাহ্ (যারা সালাত কায়েম করে)। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আয়েশা এবং হজরত আবান বিন ওসমান বলেছেন, কথাটি লিখতে হতো এভাবে—আল মুক্বিমুনাস্ সলাহ (যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী)। সুরা মায়িদার মধ্যেও এ রকম ভুল রয়েছে। যেমন একস্থানে 'সাবেয়ুন' লেখা হয়েছে। অথচ শব্দটি লেখা উচিৎ ছিলো 'সাবেইন।' আরেকস্থানে লেখা হয়েছে 'হাজানি'— যার

শুদ্ধ লিখিতরূপ 'হাজাইনি।' হজরত ওসমান বলেছেন, কোরআনে এ রকম কিছু কিছু ভুল উচ্চারণের শব্দ লিপিবদ্ধ রয়েছে যেগুলোকে আরববাসীরা পাঠ করার সময় সঠিকভাবে উচ্চারণ করে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনি শব্দগুলোকে শুদ্ধরূপে লেখার ব্যবস্থা করেননি কেনো? উত্তরে হজরত ওসমান বলেছিলেন, এভাবেই থাকতে দাও। এর মাধ্যমে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা হয়নি। প্রকৃত কথা এই যে, এ রকম মন্তব্য অসমীচীন। ঐকমত্যসম্মত মত এই যে, কোরআনে যা কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে তা ঐকমত্যসম্মতভাবেই বিশুদ্ধ। অবশ্য সেগুলোর ব্যাখ্যার বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে। কোরআন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

নামাজ প্রতিষ্ঠার পর বলা হয়েছে জাকাত দেয়ার কথা। শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াল মু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখির' (এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী)। এখানে আল্লাহ্ ও পরকালের বিশ্বাসের কথা শেষে বলার কারণ এই যে—এ বিশ্বাস ইহুদীদের ছিলোই। তারা সকল নবী এবং সকল কিতাবকে বিশ্বাস করতো না এবং নামাজ ও জাকাত প্রতিষ্ঠায় ছিলো অনীহ। আয়াতগুলো ইহুদীদের বিশ্বাস সংশোধনের নিমিত্তেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাই যে বিশ্বাসে তাদের ত্রুটি ছিলো সেগুলোকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে প্রথমে বলা হয়েছে রূপক ইমান এবং অবশ্যমান্য শরিয়তের কথা এবং শেষে বলে দেয়া হয়েছে প্রকৃত বা চূড়ান্ত ইমানের কথা (আল্লাহ্ ও পরকালের কথা)। এভাবে আলোচ্য আয়াতের শেষটিতে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস্য বিষয় এবং শরিয়ত প্রতিষ্ঠার কথা বলে এবং তাদেরকে মহাপুরস্কারদানের ঘোষণা দিয়ে অবাধ্য ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আদি বিন জায়েদ ইহুদী একবার বললো, আমাদের এ কথা জানা নেই যে, হজরত মুসার পর আল্লাহ্পাক কোনো ব্যক্তির উপর কিতাব অবতীর্ণ করবেন। তার কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৩

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ○

❐ তোমার নিকট 'ওহি' প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইব্রাহীম, ইস্মাইল, ইস্হাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আয়ূব, ইউনুস, হারুণ এবং সুলায়মানের নিকট 'ওহি' প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যবুর দিয়াছিলাম।

যে সকল নবী রসুলের উপর কিতাব ও সহিফা অবতীর্ণ হয়েছিলো তার মধ্যে এখানে সর্বপ্রথম নামোল্লেখ করা হয়েছে হজরত নূহের। বলা হয়েছে, তোমার নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি— যেমন নূহ এবং পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সর্বপ্রথম নবী হজরত আদম। কিন্তু এখানে তাঁর নামোল্লেখ না করে হজরত নূহের নামোল্লেখের কারণ এই যে–তিনি মহাপ্লাবনপরবর্তী মানবতার পিতা। মহাপ্লাবনের সময় তাঁর নৌকায় যারা ওঠেনি, তারা সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। রক্ষা পেয়েছিলেন কেবল তিনি ও তাঁর বংশধরেরা। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'ওয়া জায়ালনা জুররিইয়াতাহু হুমুল বাক্বিন (তাঁর বংশকে কেবল আমি অবশিষ্ট রেখেছি)। আরো অনেক বিশেষত্ব ছিলো হজরত নূহের। যেমন— ১. তিনিই প্রথম শরিয়ত প্রবর্তনকারী নবী। ২. সর্বপ্রথম তিনি শিরিকের জন্য আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। ৩. তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাঁর উম্মতের প্রতি নেমে এসেছিলো প্রথম আযাব। ৪. তাঁর অপপ্রার্থনার কারণে তাঁর বিশ্বাসী বংশধর ব্যতীত পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিলো। ৫. নবীগণের মধ্যে তিনিই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী হায়াত পেয়েছিলেন। তাঁর পৃথিবীর সাড়ে নয়শ' বছরের হায়াত ছিলো একটি অনন্য মোজেজা। এই দীর্ঘ হায়াতের মধ্যে তাঁর একটিও দাঁত পড়েনি, চুল শাদা হয়নি, শারীরিক শক্তিও ছিলো অটুট। সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর সম্প্রদায় প্রদত্ত অনেক অত্যাচার তিনি সহ্য করেছিলেন।

এরপর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবীদের তালিকা দেয়া হয়েছে এ রকম—হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, হজরত ঈসা, হজরত আইয়ুব, হজরত ইউনুস, হজরত হারুন, হজরত সুলায়মান এবং হজরত দাউদ। হজরত ইয়াকুবের বংশধর অর্থ তাঁর দ্বাদশ পুত্র। তাঁদের বংশে এসেছিলেন আরো অনেক নবী ও রসুল। এখানে বিশেষভাবে যে সকল নবীদের নামোল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

সবশেষে বলা হয়েছে 'এবং দাউদকে যবুর দিয়েছিলাম, 'ওয়া আতাইনা দাউদা যাবুরা।' বাগবী লিখেছেন, যবুর শরীফে রয়েছে আল্লাহ্পাকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও অত্যুচ্চ মর্যাদার বিবরণ। হজরত দাউদ জনপদ থেকে দূরে অরণ্যের নিকটে দাঁড়িয়ে যবুর পাঠ করতেন। বনী ইসরাইলের আলেমগণ তখন তাঁর পশ্চাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতো। তাঁদের পিছনে দাঁড়াতো সাধারণ জনতা এবং সাধারণ জনতার পশ্চাতে থাকতো জ্বিনেরা। পাহাড়ি পশুরাও সেখানে সমবেত হয়ে তেলাওয়াত শুনে বিমোহিত হয়ে যেতো। উপরে সমবেত হতো উড়ন্ত পক্ষিকূল। হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, আমি তোমার রাতের কোরআন তেলাওয়াত তোমার আগোচরে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম। তোমার কণ্ঠস্বর দাউদ নবীর কণ্ঠস্বরের মতো সুন্দর। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল ! এ কথা জানলে আমি অনেক সময় ধরে কোরআন তেলাওয়াত করতাম।

একবার হজরত ওমর তাঁকে বললেন, হে আবু মুসা! আমাদেরকে কিছু নসিহত করুন (কোরআন পাঠের মাধ্যমে)। হজরত আবু মুসা তখন কোরআন পাঠ করে শোনালেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৪

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝

❐ অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রসূল যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই। এবং মূসার সহিত আল্লাহ্ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

নবী রসুলের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ্পাক জানাননি। এই আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে এভাবে —'অনেক রসুল যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রসুল যাদের কথা তোমাকে বলিনি।' হজরত আবু জর বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বপ্রথম পয়গম্বর কে? তিনি স. বললেন, হজরত আদম। আমি বললাম, তিনি তো নবী ছিলেন। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্পাক তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। আমি বললাম, রসুলের সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন, তিনশত দশের অধিক। হজরত আবু উমামা বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল, নবীগণের মোট সংখ্যা কতো? তিনি স. জবাবে বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তার মধ্যে তিনশত পনেরো জনের একটি বৃহৎ দল ছিলো রসুলের। আহমদ, ইবনে আবী হাতেম। শিথিল সূত্রে আবু ইয়া'লী, হাকেম এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— আল্লাহ্তায়ালা আট হাজার নবী প্রেরণ করেছেন। বনী ইসরাইলের মধ্যে চার হাজার এবং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে চার হাজার।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে আসাকের, তিরমিজি, এবং আবদ বিন হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কতোজন আম্বিয়া প্রেরিত হয়েছেন? রসুল স. বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্, তার মধ্যে রসুলের সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন তিনশত তেরো। তিনি স. পুনরায় বললেন, আদম, শীশ, নূহ, এবং খুনুখ ছিলেন অনারব। খুনুখ ইদ্রিস নবীর নাম। তিনিই সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন। আরবদের নবী চার জন— হুদ, সালেহ্, শীশ, এবং তোমাদের নবী। বনী ইসরাইলের সর্বপ্রথম নবী হজরত মুসা এবং সর্বশেষ হজরত ঈসা। নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত আদম এবং সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন তোমাদের এই নবী।

আয়াতের বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, নবীগণের প্রত্যেকের নাম জানা জরুরী নয়। যদি প্রত্যেকের নাম জানা ইমানের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে আল্লাহ্পাক সকলের নাম জানিয়ে দিতেন। সকল নবী যে আল্লাহ্র নবী এ রকম বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'এবং মুসার সঙ্গে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেছেন'। সরাসরি কথোপকথনের এই মর্যাদা আল্লাহ্পাক হজরত মুসাকেই দান করেছিলেন। কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর মর্যাদা সকল নবী রসুলের সম্মিলিত মর্যাদা অপেক্ষা অধিক। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'অতঃপর নিকটবর্তী হলো—তখন ধনুকের দুই জ্যা ব্যবধান ছিলো অথবা ব্যবধান ছিলো আরো কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর আপন বান্দার প্রতি যা ওহী নাজিল করতে চেয়েছিলেন তা করলেন। তিনি যা দেখলেন, তাঁর হৃদয় তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেনি। তোমরা কি এ বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন হবে যা তিনি দেখেছেন! নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আর একবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছিলেন'।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৫

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

❒ সুসংবাদ-বাহী ও সাবধানকারী রসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে রসূল আসার পর আল্লাহের বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রসুলগণকে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে। তাঁরা মানুষকে পুণ্যকর্মের সুসংবাদ দেন এবং মন্দ কর্ম থেকে সাবধান করে থাকেন। রসুল প্রেরণ করার পর মানুষের অভিযোগ উত্থাপনের আর কোনো উপায় থাকে না। তাই কিয়ামতের দিন কারো এই আপত্তি গ্রহণীয় হবে না যে, আমাদের নিকট কোনো রসুল আসেননি। তাই আমরা সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে কিছু জানি না।

হজরত মুগীরা থেকে বর্ণিত হয়েছে— হজরত সা'দ বিন উবাদা বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর নিকটে কাউকে দেখি তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করবো। তাঁর এই কথা রসুল স. এর নিকট পৌঁছলো। তিনি স. বললেন, তোমরা কি সা'দের লজ্জাবোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছো! আল্লাহ্র কসম, আমার লজ্জাবোধ এর চেয়ে বেশী। আর আমার আল্লাহ্র লজ্জাবোধ আরো বেশী। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ পাপীদের অনুযোগ-অভিযোগ উত্থাপনের কোনো পথই খোলা রাখেননি। তাই

তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও শুভসংবাদবাহী পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। কেউ আত্মপ্রশংসায় মগ্ন হোক আল্লাহ্পাক তা চান না। তাই তিনি বেহেশত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। বোখারী প্রমুখ।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী প্রেরণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্পাক কাউকে শাস্তি দিবেন না। অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে, 'আর আমি কখনও শাস্তি প্রদান করবো না যতোক্ষণ না রসুল প্রেরণ করবো।' হানাফী মতাবলম্বী আলেমগণ বলেছেন, এই আয়াতে যে শাস্তি না প্রদান করার কথা বলা হয়েছে, সে শাস্তি হচ্ছে দুনিয়ার শাস্তি। অর্থাৎ নবীগণের প্রচারিত হেদায়েত যারা অস্বীকার করে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্পাক তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন। নবী রসুল না এলে মানুষ হালাল হারাম সম্পর্কে কোনো কিছুই অবগত হতে পারতো না। তাঁদের প্রচারিত শরিয়ত অস্বীকার করলে পৃথিবীতেই শাস্তি নেমে আসে। কিন্তু মূল তৌহিদ (আল্লাহ্র এককত্ব) সম্পর্কে মানুষ নবী রসুল ছাড়াই জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই বিশাল সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই এক আল্লাহ্র সৃজনশীলতাকে প্রমাণ করছে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করলে আল্লাহ্পাক যে একক স্রষ্টা— সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ওয়াল্লহু আ'লাম।

জ্ঞাতব্যঃ 'আর আমি কখনও শাস্তি প্রদান করবো না যতক্ষণ না রসুল প্রেরণ করবো'—এই আয়াতের মাধ্যমে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে, সে আযাব হবে আখেরাতে—এ কথাও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তখন ওই পাপিষ্ঠদেরকে আযাব দেয়া হবে যাদের প্রতি রসুল প্রেরিত হয়েছিলো। তারা রসুলের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের আদেশ নিষেধ জ্ঞাত হবার পরও পাপকর্ম পরিত্যাগ করেনি বলেই সেখানে শাস্তির উপযুক্ত হবে। আল্লাহ্পাককে একক স্রষ্টা জানার প্রসঙ্গটি অবশ্য ভিন্ন। মানুষকে সাধারণভাবে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, সেই জ্ঞানের যথাচর্চা করলেই তওহীদ বা এককত্বের বিষয়টি আর অনবগত থাকে না।

শেষে বলা হয়েছে 'এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। এ কথার অর্থ তাঁর পরাক্রম অপ্রতিরোধ্য এবং তাঁর প্রজ্ঞা অতুলনীয়। তিনি তাঁর অবিভাজ্য প্রজ্ঞা বলে প্রত্যেক নবীকে প্রত্যাদেশ, মোজেজা এবং ফযীলত দান করেছেন এবং সকল সম্প্রদায়ের নিকট নবী প্রেরণ করেছেন।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার ইহুদীদের এক দলকে উদ্দেশ্য করে রসুল স. বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি আল্লাহ্র রসুল। ইহুদীরা বললো, আমরা জানি না। বাগবী লিখেছেন, মক্কার কয়েকজন জননেতা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে মোহাম্মদ, আমরা ইহুদীদের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার সম্পর্কে তাদের কিতাবে কোনো কিছু লেখা আছে কিনা? ইহুদীরা বলেছে, এ রকম কিছু তাদের কিতাবে লেখা নেই। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا
ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا
لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ○ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا
خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا
حَكِيْمًا ○

❒ তোমার প্রতি আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তিনি জানিয়া শুনিয়া করিয়াছেন। আল্লাহ্ ইহার সাক্ষী এবং ফেরেশ্তাগণও সাক্ষী, এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

❒ যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করে ও আল্লাহের পথে বাধা দেয় তাহারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

❒ যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও সীমালংঘন করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না,

❒ জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে এবং ইহা আল্লাহের পক্ষে সহজ।

❒ হে মানব! রসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য আনিয়াছে; সুতরাং তোমরা বিশ্বাস কর, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। এবং তোমরা সত্য-প্রত্যাখ্যান করিলেও আস্মান ও জমিনে যাহা আছে সব আল্লাহেরই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ইহুদীরা সত্য গোপন করেছে। তওরাত শরীফে রসুল স. সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা অস্বীকার করেছে। সেই গোপন করা সত্যকে প্রকাশ করে দিয়ে আল্লাহ্পাক এখানে জানাচ্ছেন 'তোমার প্রতি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনে শুনে করেছেন'—এ কথার অর্থ (হে প্রিয় রসুল), আপনার উপর যে

মহাগ্রন্থ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই কোরআনই আপনার নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এই কোরআন তিনি অবতীর্ণ করেছেন জেনে শুনে। 'আনযালাহু বি ইলমিহি' অর্থ জেনে শুনে, বিশেষভাবে জেনে শুনে। এই বিশেষ জ্ঞান অর্থ মহাকালের (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের) অদৃশ্য জ্ঞান। কে নবুয়ত লাভের উপযুক্ত, কার উপর কিতাব অবতীর্ণ করতে হবে— সে সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান এবং ওই জ্ঞান যার মাধ্যমে মানুষের জীবন যাপন, পানাহার ও বসবাসস্থলের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ফেরেশতারাও আপনার নবুয়তের সাক্ষী, তারা আপনার সাহায্যকারীও। জেহাদের ময়দানে তারা আপনার সাহায্যের জন্য সমবেত হয়, যেমন বদর যুদ্ধে হয়েছিলো। আল্লাহ্পাকও আপনার সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। 'অকাফা বিল্লাহি শাহিদা'— এ কথার অর্থ আপনার নবুয়তের পক্ষে কোরআন ও ফেরেশতাদের যে সাক্ষ্য আল্লাহ্পাক উপস্থাপন করেছেন সেই সাক্ষ্যই আপনার জন্য যথেষ্ট। অথবা কথাটির অর্থ হবে এ রকম— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক সকল মানুষের বিচার করবেন তখন আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণের কোনো প্রয়োজনই হবে না। বিচারক নিজেই যখন আপনার সাক্ষী, তখন অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন কী?

এর পরে বলা হয়েছে, ইহুদীরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (তওরাতের লিখিত রসুল স. পরিচিতি গোপনকারী)। অন্যদেরকেও তারা সত্য গ্রহণে বাধা দেয় (যেমন, তওরাতে রসুল স. সম্পর্কে কিছু লিখা নেই—একথা বলে মক্কার মুশরিকদেরকে তারা সত্য গ্রহণে বাধা দিয়েছে)। এভাবে তারা নিজেরাও ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। পথচ্যুত করেছে অন্যদেরকেও।

পরে আয়াতে (১৬৮) ইহুদীদের সত্য-প্রত্যাখ্যান ও সীমালংঘনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্পাক জানাচ্ছেন, তিনি কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না। এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'জাহান্নামের পথ ব্যতীত'—এ কথার অর্থ, অবিশ্বাসী ইহুদীদেরকে তিনি ওই পথই দেখাবেন, যে পথ তার পথিকদেরকে নরকে প্রবেশ করায়। ওই নরকই তাদের চিরস্থায়ী আবাস। তাই ঘোষিত হয়েছে 'খলিদিনা ফিহা আবাদা' (সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে)।

জ্ঞাতব্যঃ 'খলিদিনা' শব্দটি অবস্থাবোধক বিশেষ্য। এর অর্থ চিরস্থায়ী বা অনন্তকাল। অবিশ্বাসীরা যে মুহূর্তে নরকে প্রবেশ করবে ওই মুহূর্তটি থেকে অনন্তকাল ধরে তারা বসবাস করবে নরকাগ্নিতে। তাদেরকে প্রদত্ত চিরস্থায়ী হওয়ার হুকুমটিও একটি চিরস্থায়ী হুকুম। সে হুকুমের কার্যকারিতাও থাকবে অনন্তকাল।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াকানা জালিকা আলাল্লাহি ইয়াসিরা' এ কথার অর্থ তাদেরকে নরকে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ। উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসীরা যে কোনো সময় ইমান গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ইমান না এনে যদি

কেউ মৃত্যু পর্যন্ত অবিশ্বাসে অটল থাকে, তবে কেবল সেই হবে নরকের চিরস্থায়ী অধিবাসী। তার উপরেই কার্যকর হবে নরকবাসের এই চিরস্থায়ী নির্দেশটি।

আলোচ্য আয়াতগুলোর শেষটিতে এসে আল্লাহ্‌পাক মানুষকে সত্য পথের দিকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। বলেছেন, রসুলকে বিশ্বাস করো। তিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যসহ আবির্ভূত হয়েছেন। যদি বিশ্বাসকে আশ্রয় করো তবে লাভ করবে অনন্ত কল্যাণ। যদি না করো তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্‌পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর একক অধিকর্তা। এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (ওয়াকানাল্লাহু আলিমান হাকিমা)। সর্বজ্ঞ বলেই তিনি বিশ্বাসীদের বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আর তিনি প্রজ্ঞাময় (হাকিম)। তাই তিনি সত্য ও অসত্যকে কখনও একত্র করবেন না। ফলে তাদের পরিণামও এক রকম হবে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৭১

يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ أَلْقٰهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهٗ أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

❐ হে কিতাবীগণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বলিও। মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ্ আল্লাহের রসূল এবং তাঁহার বাণী যাহা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, ও তাঁহার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলে বিশ্বাস কর এবং বলিও না যে, 'আল্লাহ্ তিন!' নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁহার সন্তান হইবে তিনি ইহার অনেক ঊর্ধ্বে। আস্‌মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই; কর্ম-বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

'হে কিতাবীগণ' বলে এখানে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে— কোনো কোনো আলেম এ রকম বলেছেন। এখানে উভয় দলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি কোরো না। 'গুলু' অর্থ বাড়াবাড়ি করা। ইহুদীরা ছিলো হজরত ঈসার বিরুদ্ধে। তারা হজরত ঈসার

পুতঃপবিত্রা মাতাকে ব্যভিচারিণী বলতো। তাঁর রেসালতের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতো। এটা ছিলো তাদের চরম বাড়াবাড়ি। অপর পক্ষে, খৃষ্টানেরাও চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি করে ধর্মচ্যুত হয়েছে। হজরত ঈসাকে বলেছে— আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র পুত্র।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে। তাদের মধ্যে ছিলো চারটি দল—১. ইয়াকুবীয়া, ২. মালাকায়ীয়া, ৩. নাসতুরীয়া এবং ৪. মারকুযীয়া। ইয়াকুবীয়া ও মালাকায়ীয়ারা বলতো ঈসাই আল্লাহ্। নাসতুরীয়ারা বলতো ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। আর মারকুযীয়াদের বক্তব্য ছিলো—তিন আল্লাহ্র মধ্যে ঈসা তৃতীয়। বুলেস নামক এক ইহুদী তাদেরকে এই অপবিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছিলো। ইনশাআল্লাহ্! সুরা তওবার তাফসীরে এই প্রসঙ্গটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসবে।

'আল্লাহ্র সম্বন্ধে সত্য বলিও'—এ কথার অর্থ তাকে শিরিক মুক্তভাবে বিশ্বাস কোরো। স্বীকার করো যে, তিনি স্ত্রী ও পুত্র পরিগ্রহণ থেকে পবিত্র। তাঁকে শরীর বিশিষ্ট মনে কোরো না। পানাহারের মুখাপেক্ষী বলেও ভেবো না।

ইহুদী ও খৃষ্টান কারো কথাই ঠিক নয়। হজরত ঈসা আল্লাহ্র পুত্রও নন, তিনি মিথ্যাবাদীও নন। তিনি আল্লাহ্র রসুল এবং আল্লাহ্র বাণী (কালিমাতুল্লাহ্)। আর তিনি আল্লাহ্র আদেশ—আল্লাহ্র 'কুন'(হও) আদেশের প্রতিফল। 'হও' আদেশের মাধ্যমে তিনি পিতা ব্যতিরেকেই মানুষ হিসাবে সৃষ্ট হয়েছেন। জন্মলাভ করেছেন সাধ্বী জননীর উদর থেকে। তিনি মানুষ এবং রসুল। তাই তিনি কারো উপাস্য হতে পারেন না। তিনি আল্লাহ্র রূহ্। এখানে তাই বলা হয়েছে 'রূহুম মিনহু'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রূহ্ বা আত্মা। এরকম নয় যে হজরত ঈসা আল্লাহ্র নিজের রূহ্ অথবা আল্লাহ্র নিজের রূহের অংশ। সকল রূহের অধিকারী বা মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ই সকল রূহকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এখানে হজরত ঈসাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে 'রূহুম মিনহু' কথাটি বলা হয়েছে 'হও' আদেশের মাধ্যমে। হজরত ঈসার রূহ আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে সরাসরি স্থাপিত হয়েছিলো মাতৃগর্ভে। তাই এই সম্মানিত সম্বোধন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, হজরত ঈসাকে রূহ বলার কারণ এই যে, তিনি মৃত মানুষকে অথবা মৃত হৃদয়কে জীবিত করে দিতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রূহ অর্থ ওই ফুৎকার যা হজরত জিবরাইল, হজরত মরিয়মের প্রতি নিবদ্ধ করেছিলেন। ওই ফুৎকারের ফলেই গর্ভবতী হয়েছিলেন হজরত মরিয়ম। তাই তাঁর উপাধি রূহুল্লাহ্।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রূহ অর্থ আল্লাহ্র বিশেষ রহমত। তার উপরেই আল্লাহ্র বিশেষ রহমত বর্ষিত হয় যে বিশ্বাসী, নির্দেশ পালনে যত্নশীল। রূহ অর্থ প্রত্যাদেশ (ওহী) —এরকমও বলা যেতে পারে। হজরত মরিয়ম প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শুভসমাচার পেয়েছিলেন এবং হজরত জিবরাইল প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই ফুৎকার করেছিলেন। হজরত ঈসার সৃষ্টি সেই ফুৎকারের পরিণাম। 'হও' আদেশটিও একটি প্রত্যাদেশ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রূহ অর্থ হজরত

জিবরাইলের সংযোগ 'আলক্বা'র উহ্য কর্তার সর্বনামের সঙ্গে। কর্তা ও ক্রিয়াপদের ব্যবধানের কারণে এ রকম অর্থ গ্রহণীয়। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাঁর বাণী (কলেমা) হজরত মরিয়মের দিকে প্রেরণ করলেন। আর আল্লাহ্র হুকুমে বিবি মরিয়মের নিকট সেই কলেমা পৌঁছে দিলেন হজরত জিবরাইল। আল্লাহ্পাক নির্দেশদাতা ও স্রষ্টা। এজন্য নির্দেশদান ও সৃজনের সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে। হজরত জিবরাইল সেই নির্দেশ বহনকারী অথবা নির্দেশ বহনের মাধ্যম। তাই নির্দেশবাহী হিসেবে নির্দেশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত। তাই তিনি রূহুল্লাহ।

হজরত উবাদা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে লা শরীক (অবিভাজ্য) জেনেছে, মোহাম্মদ স.কে আল্লাহ্র বান্দা ও রসুল বলে ঘোষণা করেছে, এ কথাও মেনে নিয়েছে যে হজরত ঈসা আল্লাহ্র বান্দা, রসুল এবং কলেমা, যা আল্লাহ্পাক বিবি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছেন—তিনি ছিলেন আল্লাহ্র দিক থেকে মনোনীত রূহ্ (এবং সে এ রকমও বিশ্বাস রাখে যে) বেহেশত ও দোজখ সত্য—তবে তাকে অবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, তার আমল যে রকমই হোক না কেনো। বোখারী, মুসলিম। এরপর নির্দেশ করা হয়েছে— 'ফাআমিনু বিল্লাহি ওয়া রসুলিহি ওয়ালা তাক্বুলু ছালাছা।' এ কথার অর্থ তোমরা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করো, রসুলগণকে মান্য করো (যে রসুলগণের মধ্যে রয়েছেন হজরত ঈসাও) এবং 'আল্লাহ্ তিন জন' বলা থেকে বিরত হও।

খৃষ্টানদের বিশ্বাস—আল্লাহ্, বিবি মরিয়ম এবং হজরত ঈসা— তিনজনই আল্লাহ্। এ রকম বিশ্বাস করা এবং বলা স্পষ্টতঃই শিরিক। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক এ বিষয়ে হজরত ঈসাকে যে প্রশ্ন করবেন, প্রত্যাদেশের ভাষায় তা হচ্ছে— হে ঈসা! তুমি কি তাদেরকে বলেছিলে আল্লাহ্ সহ আমাকে ও আমার মাতাকে তোমরা উপাস্য হিসাবে স্বীকার করে নাও'।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, খৃষ্টানেরা কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। তাদের ত্রিত্ববাদের (তিন আল্লাহ্র) ধারণাও বিভিন্ন রকমের। এক দলের বিশ্বাস হজরত ঈসাই আল্লাহ্—আল্লাহ্ই হজরত ঈসারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। আরেক দল মনে করে— আল্লাহ্ পিতা, হজরত ঈসা পুত্র এবং হজরত জিবরাইল পবিত্র আত্মা (রূহুল কুদ্দুস)। আরেক দল বলে আল্লাহ্পাকের সত্তায় দু'টি গুণ ছিলো— এলেম এবং হায়াত (জ্ঞান ও জীবন)। তারপর জ্ঞান স্বস্থান থেকে নেমে এসে শক্তিশালী অবয়ব ধারণ করেছে—যার নাম ঈসা। আর হায়াত বা জীবন হয়েছে হজরত জিবরাইল—এ সকল অপবিশ্বাস থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। বলেছেন, যদি নিবৃত্ত হও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

এরপর দেয়া হয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসের বিবরণ। বলা হয়েছে 'সুবহানাহু আঁইয়াকুনা লাহু ওয়ালাদ'— এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাকই তো একমাত্র উপাস্য। তাঁর সন্তান রয়েছে—এ রকম ধারণা থেকে তিনি পুতঃপবিত্র। সন্তানধারীরা সকলেই মরণশীল এবং তুল্যমূল্য বিচারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ অক্ষয়, অব্যয়, তুলনারহিত—আনুরূপ্য থেকে পবিত্র।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এটা তাদের জন্য একটি অত্যন্ত অনুচিত কর্ম। তারা আল্লাহ্‌কে গাল মন্দও করেছে, যা অনভিপ্রেত। তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এ কথা বলে যে—আল্লাহ্ আমাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমন করে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টির চেয়ে প্রথম সৃষ্টিই কঠিন। আর আমাকে গালমন্দ করার অর্থ এই যে—আদম সন্তান বলে, আল্লাহ্ সন্তান ধারণ করেছেন— অথচ আমি এক, অদ্বিতীয় এবং অমুখাপেক্ষী। আমার সমকক্ষ কেউ নেই। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, আদম সন্তানের গালমন্দ করার অর্থ হচ্ছে এই—তারা বলে, আমার স্ত্রী সন্তান আছে। অথচ আমি পরিবার পরিজন থেকে পবিত্র। বোখারী।

এরপর বলা হয়েছে আল্লাহ্‌পাকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারের কথা। বলা হয়েছে, 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই'। সবশেষে বলা হয়েছে 'অকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা (কর্ম বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট)। এ কথার অর্থ তিনিই আকাশ পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টির শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক এবং কর্মবিধায়ক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন (পিতা তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়—সে রকম মুখাপেক্ষিতা থেকে তিনি পবিত্র)। ওয়াল্লহু আ'লাম।

বাগবী এবং ওয়াহেদী কালাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল বললো, হে মোহাম্মদ! আপনারা আমাদের প্রভু ঈসাকে দোষারোপ করে থাকেন। রসুল স. বললেন, কীভাবে? প্রতিনিধিরা বললো, আপনি আমাদের প্রভু ঈসাকে বলেন আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার মধ্যে লজ্জাজনক কিছু নেই (বরং এর মধ্যেই রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান)। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৭২

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

❒ মসীহ্ আল্লাহের দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না, এবং ঘনিষ্ট ফেরেশতাগণও নহে; এবং কেহ তাহার দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট একত্র করিবেন।

আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাস হওয়া কোনো লজ্জাজনক বিষয় নয়। বরং আল্লাহ্‌র দাসত্বই সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বিষয়। দাসত্ব বা বন্দেগীর কারণেই আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্রগণ উচ্চ মর্যাদা লাভ করে থাকেন। আল্লাহ্‌পাক গুণগত পূর্ণত্বের (সিফাতে

কামালিয়তের) রঙে রঞ্জিত হতে গেলে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। যারা আল্লাহ্‌প্রেমিক, আল্লাহ্‌র দাসত্বই তাঁদের জীবনের মূল ব্রত। সুতরাং আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া লজ্জার বিষয় নয়। আনন্দের বিষয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও নয়। একদল আলেম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চান যে, ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, এখানে হজরত ঈসার পর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নস্তরের পর অপেক্ষাকৃত ঊর্ধ্বস্তরে উন্নিত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। তাই সাধারণতঃ নিম্নমর্যাদাধারীর উল্লেখ করার পর তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাধারীর উল্লেখ করা হয়। ভাষার বিবরণরীতি এ রকমই। যেমন—এ বিষয়টিকে জায়েদ হেয় মনে করে না, ওই ব্যক্তিও হেয় মনে করে না যে— জায়েদের চেয়ে উত্তম। এ রকম বলা যায় না যে— ওই কথা বলতে জায়েদ লজ্জিত হয় না, লজ্জিত হয় না তার গোলামও। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতের বিবরণভঙ্গিটি সে রকম নয়। বরং এখানে এই বিবরণভঙ্গিটির মাধ্যমে ওই দুই বাতিল সম্প্রদায়ের অপবিশ্বাসকে প্রতিহত করাই উদ্দেশ্য—যাদের মধ্যে একদল বলে, হজরত ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং অন্যদল বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে বরং ঊর্ধ্বস্তরের উল্লেখের পর নিম্নস্তরের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— যেমন বলা হয়, শ্রেষ্ঠ নেতারাও বিচারককে ভয় করে, প্রজাসাধারণতো করেই।

বায়যাবী লিখেছেন, নিম্ন থেকে উচ্চ—এ বর্ণনারীতিটি যদি মেনেও নেয়া যায়, তবে এখানে এ কথার অর্থ হবে— সকল ফেরেশতা নয়, কেবল ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারা (আরশবাহী ফেরেশতারা) হজরত ঈসা থেকে উত্তম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র দাসত্বকে হেয় জ্ঞান না করার ক্ষেত্রে ফেরেশতারা যে শ্রেষ্ঠ, সে কথা ঠিক নয়। ফেরেশতারা তো দাসত্ব করতে বাধ্য এবং তাঁরা তা করেনও। তাঁরা তাঁদের ইবাদতের সওয়াবও লাভ করে থাকেন। কিন্তু মানুষ ইবাদত করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে— আল্লাহ্‌র মহব্বতে ও ভয়ে। সুতরাং ফেরেশতা অপেক্ষা মানুষই শ্রেষ্ঠ।

আমরা মনে করি প্রকৃত কথা এই যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তবে মানুষের তুলনায় তাঁদের আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। ফেরেশতারা নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে রত থাকতে পারেন। কিন্তু মানুষের সে সুযোগ নেই। মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষা করতে গিয়ে তাকে পানাহার করতে হয়। নিদ্রাভিভূত হতে হয়। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে হয়। কর্মক্লান্ত হলে শ্রান্তি নিরসনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়। তার উপর রয়েছে স্ত্রীসঙ্গ, পরিবার-পরিজন প্রতিপালন। এতো কিছু করে ইবাদত সম্পাদন করতে হয় তাদেরকে। তাদের পৃথিবীর আয়ুও সংকীর্ণ। আর পৃথিবী মানুষের জন্য একমাত্র ইবাদতের স্থান। পক্ষান্তরে ফেরেশতারা ক্লান্তি শ্রান্তিহীন। রোগ শোক, ও

অন্যান্য বিপদের বালাই তাঁদের নেই। তাঁরা কেউ কারো পতি কিংবা পত্নী নন। তাঁরা অপবিত্রতামুক্ত, অধিক আয়ুর অধিকারী। তাঁদের ইবাদত নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্ন, নিখুঁত। আর তাঁরা আল্লাহ্‌র দাসত্বকে হেয় জ্ঞান করেন না। তবে মানুষ আল্লাহ্‌র দাসত্বে হেয় জ্ঞান করবে কেনো? আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হজরত ঈসা-ই বা কেনো আল্লাহ্‌র দাস হওয়াকে লজ্জাজনক মনে করবেন।

খৃষ্টানেরা তাঁকে আল্লাহ্‌র দাস না বলে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। তাদের বিভ্রান্তির কারণ এই যে—হজরত ঈসা অলৌকিকভাবে পিতা ব্যতীত কেবল মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি অন্ধকে দৃষ্টি দান করতেন, কুষ্ঠ রুগীকে নিরাময় করতেন, মৃতকে জীবিত করে দিতেন। কার ঘরে কোন সামগ্রী রয়েছে এবং কে কী পানাহার করে, তাও তিনি বলে দিতে পারতেন। এগুলো ছিলো তাঁর অনন্য মোজেজা, যা আল্লাহ্‌পাক নবী রসুলগণকে দান করে থাকেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা মনে করতো, এ সকল তিনি সম্পাদন করতেন স্বশক্তিবলে। আল্লাহ্‌র দেয়া মোজেজা হিসেবে নয়। আয়াতে তাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনার্থে আল্লাহ্‌পাক তাই জানিয়েছেন, সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে বিরতিহীন ইবাদত করা সত্ত্বেও ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করেন না। হজরত ঈসাও করেন না। কীভাবে করবেন? তিনি তো ভালো করেই জানেন— 'আল্লাহ্‌র দাস' পরিচয়ই সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ট পরিচয়।

খৃষ্টানেরা হজরত ঈসার জন্য অনুচিত উচ্চ স্থান নির্ধারণ করেছিলো। তাই আয়াতে হজরত ঈসার পরে ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে বুঝা যায় ফেরেশতারাই হজরত ঈসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আগেই বলা হয়েছে ফেরেশতারা অংশত শ্রেষ্ঠ, সামগ্রিকভাবে নয়। হজরত মুসা এবং হজরত খিজিরের ঘটনার মধ্যে এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁদের দুই জনের মধ্যে সামগ্রিকভাবে হজরত মুসা এবং অংশত হজরত খিজির শ্রেষ্ঠ। লোকেরা হজরত মুসাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? হজরত মুসা নিরুত্তর রইলেন। আল্লাহ্‌পাক তখন তাঁকে জানালেন, নিশ্চয়ই আছে। আমার বান্দা খিজির তোমার চেয়ে (অংশত) অধিক জ্ঞানী। হজরত খিজিরের সঙ্গে দেখা করার জন্য হজরত মুসা পথ চলতে শুরু করলেন। সফরসঙ্গীকে বললেন, 'আমি অনবরত চলতে থাকবো যতোক্ষণ না দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌছবো'। দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছে তিনি হজরত খিজিরের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁকে বললেন, আমি এই কারণে আপনার সঙ্গ নিতে চাই যে, আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, যারা হজরত ঈসার দাস হওয়াকে হেয় মনে করবে এবং অহংকার করবে তাদের সকলকে আল্লাহ্‌পাক (কিয়ামতের দিন) একত্র করবেন। এ কথার অর্থ কিয়ামতের দিন তিনি অহংকারী ও অপবিশ্বাসী খৃষ্টানদেরকে একত্র করে শাস্তি দান করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবেন; কিন্তু যাহারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাহাদিগকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করিবেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের জন্য তাহারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাইবে না।

❒ হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করিয়াছি।

❒ যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে ও তাঁহাকে অবলম্বন করে তাহাদিগকে তিনি তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন, এবং তাহাদিগকে সরল পথে তাঁহার দিকে পরিচালিত করিবেন।

শুরুতেই বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ্পাক পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন। যেমন পুরস্কার দান করবেন হজরত ঈসাসহ তাঁর সকল প্রিয় বান্দাগণকে এবং ফেরেশতাগণকে। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করেন না। বরং 'আল্লাহ্র দাস' পদবীটিই যে সর্বোচ্চ পদবী, সে কথা বিশ্বাস করেন।

'এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দিবেন'—এখানে যে দানের কথা বলা হয়েছে তাতে ফেরেশতাদের কোনো অংশ নেই। আরো বেশী দান বা অত্যধিক দানের বিষয়টি কেবল মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ্র প্রিয় দাস তাঁরাই অনুগ্রহের প্রাচুর্য লাভের যোগ্য। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত ধর্ম প্রচার করে থাকেন। ফেরেশতারা ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত নন। তাদের হিসাবকিতাব নেই। সওয়াব কিংবা আযাবও নেই। ওয়াল্লহু আ'লাম।

আল্লাহ্পাকের প্রিয় বান্দাগণ তাঁদের ইবাদতের উপযুক্ত সওয়াব তো লাভ করবেনই। তদুপরি অত্যধিক অনুগ্রহ হিসেবে লাভ করবেন নৈকট্যের বিভিন্ন মর্যাদা এবং দীদারে এলাহি। শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী প্রমুখ কর্তৃক এসেছে— দোজখের জন্য উপযুক্ত পাপী বান্দাদেরকে সুপারিশ করবেন পুণ্যবান বান্দাগণ। তাঁদেরকে প্রদত্ত সুপারিশ করার অধিকারটিও আল্লাহ্পাকের একটি অত্যধিক অনুগ্রহ।

এরপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাকের দাস হওয়াকে যারা হেয় জ্ঞান করবে এবং অহংকার করবে তাদেরকে তিনি মর্ম বিদারক শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ্পাক হবেন তাদের প্রতি রুষ্ট। তাই তারা হয়ে পড়বে অভিভাবকহীন ও সহায়হীন। কারণ, আল্লাহ্পাক ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক নেই। সহায়ও নেই। তাই বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের জন্য তারা কোনো অভিভাবক ও সহায় পাবে না'।

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন'— বিনিময়দানের কথা সেখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে পরের আয়াতে (১৭৩)। একত্র করার পর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণকে পুরস্কৃত করা হবে— আর শাস্তি প্রদান করা হবে তাদেরকে যারা আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হীনকর্ম মনে করে। তাদের শাস্তি হবে দ্বিগুণ। একটি হবে আক্ষেপের শাস্তি। কারণ, তাদের সামনেই আল্লাহ্র বান্দাগণকে পুরস্কার দেয়া হবে এবং দান করা হবে অত্যধিক অনুগ্রহ। এই দৃশ্য দেখে আক্ষেপে জর্জরিত হতে থাকবে তারা। আরেকটি শাস্তি হচ্ছে অভিভাবক ও সহায়হীন অনন্ত দোজখবাস।

আমি বলি, আগের আয়াতে বলা হয়েছে 'মসীহ্ আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও নয়' —আর এই আয়াতে (১৭৩) বলা হয়েছে 'তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন'। তেমনি যারা আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে তাদের সকলকে একত্র করার কথা আগের আয়াতে বলে নিয়ে এই আয়াতে বলা হয়েছে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি বিধানের কথা (এভাবে প্রসঙ্গটির পুনঃবিবরণ বিধৃত করা হয়েছে)।

'হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেছি'—এখানে প্রমাণ (বুরহান) অর্থ রসুল স. কে প্রদত্ত মোজেজাসমূহ অথবা তাঁর পবিত্র অস্তিত্ব। এভাবে 'প্রমাণ এসেছে'— কথাটির অর্থ হবে রসুল স. এর অলৌকিক নিদর্শনসমূহ (মোজেজা) প্রকাশিত হয়েছে অথবা মোহাম্মদ স. কে তোমাদের নিকট রসুল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

'স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেছি'—এ কথাটির অর্থ কোরআন অবতীর্ণ করেছি।

'যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে ও তাঁকে অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন'—এখানে দয়া (রহমত) অর্থ জান্নাত এবং সওয়াব, যা তিনি ইমান ও আমলের বিনিময় হিসেবে দান করবেন। এই দানের

ব্যাপারে তিনি অঙ্গীকার করেছেন, যদিও তিনি দান করতে বাধ্য নন। কারণ আল্লাহ্পাক বাধ্যবাধকতা থেকে পবিত্র। মুতাজিলারা বলে থাকে, প্রতিটি পুণ্যকর্মের বিনিময় দান করা আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব। কিন্তু তাদের কথা ঠিক নয়।

'অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন'—এখানে অনুগ্রহ বা ফজল অর্থ আল্লাহ্পাকের ওই অনুগ্রহ যা নির্ধারিত সওয়াবের চেয়ে অতিরিক্ত, উন্নত। যেমন, আল্লাহ্পাকের দীদার ও নৈকট্যের মাকামসমূহ।

'তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন' —এখানে 'তাঁর দিকে' অর্থ তাঁর উদাহরণরহিত (বেমেছাল) অস্তিত্বের (জাতের) দিকে। সরলপথ বা 'সিরাতিম মুসতাক্বিম' অর্থ পৃথিবীতে ইসলামের পথ, আধ্যাত্মিক সাধকবৃন্দের (সুফিয়ানে কেরামের) পথ। আর আখেরাতে জান্নাত, দীদার ও নৈকট্যের স্তরসমূহে উপনীত হওয়ার পথ।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে—হজরত ওমর একবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কালালার (সন্তানহীনের) উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান কী? তাঁর এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৭৬

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

☐ লোকে তোমার নিকট পরিষ্কারভাবে জানিতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন, কেহ মারা যাইলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তাহার এক ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ, এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয় থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

আবু জোবায়েরের মাধ্যমে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন— হজরত জাবের বলেছেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। রসুল স. আমার নিকট আগমন করলেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি আমার বোনদের জন্য আমার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করবো? তিনি স. বললেন, এ রকম যদি করো তবে এটা হবে তাদের প্রতি অনুগ্রহ। আমি বললাম, যদি অধিক করি? তিনি স. বললেন, তবে তা হবে আরো অধিক অনুগ্রহ। এ কথা বলার পর তিনি চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, আমার মনে হয় তুমি এই অসুখে মরবে না। আল্লাহ্‌পাক তোমার এবং তোমার বোনদের সম্পর্কে নির্দেশ অবতীর্ণ করেছেন। তারা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। হজরত জাবের আরো বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমার সম্পর্কে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, এই সুরার প্রথম দিকে এ সম্পর্কে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে, হজরত জাবেরের এই ঘটনাটি তা থেকে পৃথক।

আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সহোদর ভাইবোনদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে। হজরত আবু বকরের বর্ণনাসূত্রে সুরার শুরুতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহোদর ভাইবোন না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। আয়াতে বলা হয়েছে, 'কেউ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই বোন দু'জনেই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। এটা ঐকমত্য।

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির বোন একজন থাকলে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক, দুই বা ততোধিক বোন থাকলে পাবে দুই তৃতীয়াংশ— বোনেরা এই অংশ পাবে তখনই যখন পরলোকগত ব্যক্তির অধঃস্তন সন্তান-সন্ততি না থাকবে। যেমন— পৌত্র, পৌত্রী, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী ইত্যাদি। এক বা একাধিক পৌত্র, একজন প্রপৌত্র অথবা কয়েকজন প্রপৌত্রী থাকলে মৃতব্যক্তির ভাই বোনেরা কিছুই পাবে না। এক বা একাধিক কন্যা, কন্যার দিকের কয়েকজন নাতনী অথবা কয়েকজন প্রপৌত্রী থাকলে ভাইবোনেরা হয়ে যাবে 'আসাবা' (যাবিল ফুরুজদের নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর অবশিষ্ট অংশ থেকে যারা মিরাস পায় তাদেরকে বলে আসাবা)। অর্থাৎ কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী তাদের নির্ধারিত অংশ লাভ করার পর অতিরিক্ত অংশ হবে ভাইবোনদের। এমতোক্ষেত্রে ভাইদের আসাবা হওয়া সম্পর্কে হাদিস শরীফে নির্দেশ দান করা হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, অংশীদারদের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দাও। তারপর যা কিছু অতিরিক্ত থাকবে, তা হবে নিকটতম পুরুষের (ভাইয়ের)। এভাবে ভাই, এক বা একাধিক বোন—এক কন্যা অথবা কয়েকজন কন্যার উপস্থিতিতে আসাবা হবে। রসুল স. বলেছেন, ছেলেদের উপস্থিতিতে বোনদেরকে আসাবা করে দিতে হবে।

শারজীল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হজরত আবু মুসা এবং হজরত সুলায়মান বিন রবিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, এক লোক তার এক কন্যা, কন্যার কন্যা এবং এক সহোদরা বোন রেখে মারা গিয়েছে। তারপর পরিত্যক্ত সম্পত্তি

বণ্টন হবে কীভাবে? তারা দু'জনেই জবাব দিলেন, অর্ধেক পাবে কন্যা এবং অবশিষ্ট অর্ধেক পাবে বোন (কন্যার কন্যা কিছুই পাবে না)। তাঁরা আরো বললেন, তুমি হজরত ইবনে মাসউদকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তিনিও এ রকম বলবেন। লোকটি তখন হজরত ইবনে মাসউদের কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলো। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, তাদের সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি তোমাকে ওই কথাই বলবো, যে কথা বলেছেন রসুলুল্লাহ্ স. তা হচ্ছে—কন্যা পাবে অর্ধেক, কন্যার কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ—এভাবে তারা দু'জনে পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে বোন। বোখারী।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কন্যার বর্তমানে বোন হবে আসাবা, সে নির্ধারিত কোনো অংশ পাবে না। তিনি আরো বলেছেন, এই সিদ্ধান্তটি কোরআনে নেই। রসুল স. ও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। সিদ্ধান্তটি সাহাবায়ে কেরামের সুন্নতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এবং এর উপর ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোরআনে কেবল বলা হয়েছে 'কেউ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক।'

মাসআলাঃ একজন সহোদর ভাইয়ের উপস্থিতিতে বৈপিত্রেয় ভাইবোন কোনো অংশ পাবে না। কেননা হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, সহোদর ভাই একজন অন্য জনের ওয়ারিশ। বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ারিশ হয় না। হারেসের মাধ্যমে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম। হারেস ছিলেন জয়ীফ। কিন্তু তিরমিজি বলেছেন, তিনি ছিলেন ফারায়েজের (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যার) আলেম। তাঁর বর্ণনার উপর আমল করা যায়। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে।

মাসআলাঃ একজন সহোদর বোন থাকলে এক বা একাধিক বৈপিত্রেয় বোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ—যাতে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে যায়। এভাবে এক কন্যা এবং তার সঙ্গে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকলে কন্যা পাবে অর্ধেক এবং পৌত্রী পাবে এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু দুই বোন থাকলে বৈপিত্রেয় বোনেরা কিছুই পাবে না। কেননা সহোদরা বোনেরা ওই সময় পাবে দুই তৃতীয়াংশ। তবে বৈপিত্রেয় বোনদের সঙ্গে তাদের কোনো ভাই থাকলে তাদের ভাইয়ের কারণে তারাও আসাবা হয়ে যাবে এবং 'পুরুষ দ্বিগুণ মহিলা একগুণ'—এ নিয়মে তাদেরকে বণ্টন করে দিতে হবে এক তৃতীয়াংশ।

মাসআলাঃ আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সহোদর ভাই না থাকলে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে বৈপিত্রেয়রা। এই আয়াতের 'আখওয়াত' শব্দটির মধ্যে বোনদেরকেও ধরা হয়েছে (সহোদরা ও বৈপিত্রেয়া—সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত)। কিন্তু হাদিস শরীফের মাধ্যমে সহোদরকে বৈপিত্রেয়ের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওই হাদিস শরীফের মাধ্যমেই। এভাবে কোরআন ও হাদিসের মিলিত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, বহুল প্রচারিত হাদিসের প্রেক্ষিতে আমরা বর্ণিত বিধানটি দিয়েছি—যদিও আয়াতে এর উল্লেখ নেই। সকল অবস্থায় এক বোন অর্ধেক এবং দুই বা

ততোধিক বোন হলে দুই তৃতীয়াংশ দিতে হবে। শুধু এক ভাই হলে সে হবে সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক। আর তার সঙ্গে একাধিক ভাই বা বোন থাকলে সম্পদ বণ্টিত হবে 'পুরুষ দ্বিগুণ মহিলা একগুণ'— এই নিয়মে। পরলোকগত ব্যক্তির পুত্র অথবা প্রপৌত্র কিংবা প্রপৌত্রী অথবা পিতা কিংবা দাদা থাকলে বৈপিত্রেয় ভাইবোনেরা কিছুই পাবে না। মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক কন্যা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়দের উপর ওই বিধান প্রযোজ্য হবে, যে বিধান প্রযোজ্য হয় কন্যাদের বর্তমানে সহোদর ভাইয়ের প্রতি।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন' —এ কথার অর্থ তোমাদেরকে যদি আপন ইচ্ছার উপর চলতে দেয়া হয়, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্পাক এ সম্পর্কে তাঁর বিধান সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তোমরা আপন অভিমত ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র বিধানকে মেনে নিয়ে পথপ্রাপ্ত হতে পারো। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবে সত্য বিধান জানাচ্ছেন। কারণ তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়াকে তিনি পছন্দ করেন না। কুফার আলেমগণের অভিমত এই যে, এখানে 'লা' (না) শব্দটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য শব্দটি সহযোগে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম—আল্লাহ্পাক তাঁর বিধানাবলী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু বিকুল্লি শাইয়িন আলিম'—এ কথার অর্থ বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। পরলোকগত ব্যক্তির এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন বিধানটি কল্যাণকর, তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন।

হজরত বারা বিন আজিব বলেছেন, সবশেষে অবতীর্ণ সুরা হচ্ছে সুরা বারাআত এবং সকলের শেষে অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে সুরা নিসার এই শেষ আয়াতটি। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুদ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সকলের শেষে এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ সুরা হচ্ছে সুরা নসর (ইজা জা—আ নাসরুল্লহি ওয়াল ফাতহ্)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতটি হচ্ছে 'ওয়াত্তাক্বু ইয়াওমান তুরজাউনা ফিহি ইলাল্লহ্ (ওই দিবসকে ভয় করো যে দিবসে তোমরা আল্লাহ্র সমীপে প্রত্যানীত হবে)। এ রকমও বলা হয়েছে যে, সুরা নসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. পৃথিবীর বুকে ছিলেন এক বৎসর। আর সুরা নসর অবতীর্ণ হওয়ার ছয় মাস পরে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা বারাআত। এই সুরাই সর্বশেষ অবতীর্ণ সুরা। এরপর রসুল স. পৃথিবীতে ছিলেন মাত্র ছয় মাস। বিদায় হজের সময় পথিমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য সুরার শেষ আয়াতটি। এই আয়াতটির নাম 'সাইফ' (গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ)। এরপর তিনি স. যখন আরাফাতের প্রান্তরে উপস্থিত হলেন তখন অবতীর্ণ হলো 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম' (অদ্যকার এই দিবসে তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম)। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন একাশি দিন। অতঃপর সুদ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই সর্বশেষ প্রত্যাদেশটি অবতীর্ণ হওয়ার একুশ দিন পর মহাতিরোধান ঘটেছিলো তাঁর।

সুরা বারাআতের পর রসুল স. এর পৃথিবীর জীবন ছিলো ছয় মাস—বর্ণনাটি একটি ধারণাপ্রসূত বর্ণনা। নবম হিজরীতে রসুলুল্লাহ্ স. হজযাত্রীদের আমির নিযুক্ত করে হজরত আবু বকরকে মক্কায় প্রেরণের পর সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি স. এই সুরার চল্লিশটি আয়াত শিক্ষা দিয়ে হজরত আলীকে হজ যাত্রীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেনো এই আয়াতসমূহ সমবেত হজযাত্রীদের সম্মুখে পাঠ করা হয়। এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সুরা বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এর পৃথিবীর হায়াত ছিলো পনেরো মাস অথবা ষোলো মাস।

এ কথাটিও ঠিক নয় যে, রসুল স. সুরা নসর অবতীর্ণ হওয়ার পর এক বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন। মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে সুরা নসর পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন রসুলুল্লাহ্ স.। আর মক্কা বিজিত হওয়ার তিরিশ মাস পর তিনি স. যাত্রা করেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান এবং সুরা নিসা পাঠ করবে সে আল্লাহ্পাকের নিকট জ্ঞানী বলে বিবেচিত হবে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করিবে। যে সব জন্তুর কথা তোমাদিগকে বলা হইতেছে তাহা ব্যতীত চতুষ্পদ আন্আম তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, তবে ইহ্রাম রত অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করিবে না। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা আদেশ করেন।

'আক্বদুন' অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, স্বীকারোক্তি, অঙ্গীকার। 'ওয়াফাআ' এবং 'ইফাআ' অর্থ—প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা। দু'টি বস্তু একত্র করার পর সে দু'টোকে পৃথক করা যখন কঠিন হয়ে পড়ে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় 'আক্বদুন' বা 'আক্বদ'। আয়াতে বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এ কথার অর্থ—তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছো তা অবশ্যই পূর্ণ করবে।

জুজায বলেছেন, সুদৃঢ় অঙ্গীকারের নাম 'আক্বদ'। এখানে 'আউফু বিল উক্বুদ' বলে সুদৃঢ় অঙ্গীকারকে পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। রূহের জগতে সকল রূহ আল্লাহ্পাককে প্রভুপ্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করেছিলো। ওই স্বীকারোক্তিসহ

সকল স্বীকারোক্তি এখানে কথিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে স্বীকার করা, রসুল মোহাম্মদ স. এর রেসালতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান, তাঁর স. বৈশিষ্ট্যাবলী প্রচার প্রসঙ্গে আহলে কিতাবদের কৃত অঙ্গীকার এবং মানুষের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে আমানত রক্ষাসহ সকল প্রকার মৌখিক ও লিখিত স্বীকারোক্তিসমূহ পূর্ণ করতে হবে। শরিয়ত সকল প্রকার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা অপরিহার্য করে দিয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে— অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকদের নিদর্শন। বোখারী ও মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, সকল সুরার শেষে নাজিল হয়েছে সুরা মায়িদা। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা যা কিছু হালাল পাও তাকে হালাল মনে করো এবং যা কিছু হারাম পাও তাকে হারাম করে দাও (অর্থাৎ এই সুরার কোনো হুকুম রহিত হয়নি)। আহমদ, নাসাঈ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, সুরা মায়িদা এবং সুরা আল ফাতাহ্ সকলের শেষে অবতীর্ণ হয়েছে। আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম। বর্ণনাটিকে উত্তম বলেছেন তিরমিজি এবং বিশুদ্ধ বলেছেন হাকেম। হজরত আবু উবাদা থেকে মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বর্ণনা করেছেন, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রসুল স. ছিলেন উষ্ট্রারোহী। প্রত্যাদেশের ভারে তাঁর উষ্ট্রীটি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। তাই তিনি স. তখন অবতরণ করেছিলেন।

ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রবী বিন আনাস এবং আতিয়া বিন কায়েস উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেন সকলের শেষে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা মায়িদা। সুতরাং তোমরা এই সুরায় উল্লেখিত হালালকে হালাল হিসেবে মেনে নাও এবং হারামকে হারাম মনে করে পরিত্যাগ করো। নাসেখ গ্রন্থে আবু দাউদ এবং হাসানের মাধ্যমে ইবনে মুনজির বলেছেন, মায়িদার কোনো অংশ রহিত হয়নি। শা'বীর উক্তিরূপে আবু দাউদ লিখেছেন 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু লা তুহিল্লু শায়ায়িরাল্লহি ওয়ালাশ শাহ্‌রাল হারামা ওয়ালাল হাদ্‌ইয়া ওয়া লাল ক্বালায়িদা'— দ্বিতীয় আয়াতের এই অংশটি ব্যতীত অন্য কোনো অংশ রহিত হয়নি। আবদ্ বিন হুমাইদও এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে হাকেমও এ ধরনের বর্ণনা এনেছেন। তিনি বলেছেন, আরো একটি আয়াতাংশ রহিত করে দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে 'ফাইন জাউকা .... ওয়া ওয়ারাদ্দি আনহুম।'

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে লিখেছেন, মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে'—নির্দেশটির মধ্যে যে অঙ্গীকার পূরণের কথা বলা হয়েছে সেই অঙ্গীকার হচ্ছে—কোরআনের আদেশ ও নিষেধ মেনে নেয়া। মুমিন ও মুশরিকদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং ওই অঙ্গীকার সম্পন্ন করা যা মানুষ একে অপরের সঙ্গে করে থাকে।

এই আয়াত থেকে হানাফিগণ প্রমাণ পেশ করেন যে, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও স্বীকৃতি) পূর্ণ হয়ে গেলে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাবে না। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অধিকার রাখে না, যদি না তাতে কোনো শর্ত থাকে, যেমন— পণ্য দেখার শর্ত,

পণ্যের মধ্যে ক্রটি দৃষ্টি গোচর হলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে—এ রকম শর্ত। ইমাম মালেকও এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দু'টি ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা তাদের ক্রয়বিক্রয়ের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারবে। একটি হচ্ছে — মালামালের বিবরণ ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে যদি বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। আরেকটি হচ্ছে—কথা দেয়া নেয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি কেউ সে স্থান পরিত্যাগ করে। হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত হাকিম বিন হাজম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয়ের অঙ্গীকারনামা কার্যকর থাকে। অর্থাৎ স্বীকারোক্তির মজলিশ থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয় বাতিল হয় না। স্বীকারোক্তিও পূর্ণ হয় না।

'যে সব জন্তুর কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে, সেগুলো ছাড়া চতুষ্পদ 'আন্‌আম' তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো'—এ কথার অর্থ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো বাদে অন্যগুলোর গোশত ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল। এভাবে চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে হারাম ও হালাল—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্যাকরণ বিদগণের বক্তব্য হচ্ছে— এভাবে সাধারণ কোনো কিছুকে বিশেষ কোনো কিছুর সঙ্গে মিলিত করতে গেলে 'লাম' ব্যবহৃত হয়ে থাকে (বাহিমাতুল আনআম—এখানে বাহিমা ও আনআম কে মিলিত করা হয়েছে 'লাম' সহযোগে)। বায়যাবী ও কাশ্‌শাফ রচয়িতা বলেছেন, এ ধরনের সম্পর্ক রচিত হয় 'মিন' (মধ্যে) শব্দের মাধ্যমে। যেমন রূপার আংটি (আংটিসমূহের মধ্যে ওই আংটি যা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত)। এখানেও তেমনি চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে ওই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে বৈধ বলা হয়েছে যেগুলো হারাম নয়। এখানে বৈধ করা হলো— বলে ওই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল করা হয়েছে, মূর্খতার যুগের মানুষ যেগুলোকে হারাম করে নিয়েছিলো। যেমন বাহীরা এবং সায়েবা (যে পশুর দুধ নিজেরা পান না করে প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হয়, ওই পশুকে বলা হয় বাহীরা। আর যে পশু নিজের কাজে না লাগিয়ে দেব দেবীর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়, তাকে বলে সায়েবা। কালাবী বলেছেন, এখানে 'বাহিমাতুল আনআম' বলে ওই চতুষ্পদ জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো জঙ্গলে বাস করে এবং যেগুলো গৃহপালিত পশুদের মতো তৃণভোজী।

বাগবী লিখেছেন, আবু জুবিয়ানের মাধ্যমে এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বাহিমাতুল আনআম অর্থ হুলুআন (পশুর পেট থেকে প্রসব হওয়া বাচ্চা)। শা'বীও এ রকম বলেছেন। এই ব্যাখ্যানুযায়ী এ কথা বলা যায় যে—কোনো মাদী পশু জবাই করার পর তার পেটে শরীরের গঠন পুরোপুরি হয়েছে—এ রকম মৃত বাচ্চা যদি পাওয়া যায় তবে তা জবাই ছাড়াই ভক্ষণ করা হালাল। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এ রকম। ইমাম মালেক এই শর্তটিও জুড়ে দিয়েছেন যে, ওই বাচ্চার শরীরে যদি লোম থাকে। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মাতা পশুর জবাইকে তার উদরস্থ শাবকের জবাই ধরে নেয়া হবে। তবে শর্ত এই

যে, ওই শাবকের শরীরের গঠন পুরোপুরি হতে হবে এবং তার শরীরে পশম থাকতে হবে। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবও এ রকম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই জবাইকৃত পশুর বাচ্চা জবাই করা ছাড়া ভক্ষণ করা যাবে না—তার শরীরে পশম থাকুক কিংবা নাই থাকুক। ইমাম শাফেয়ী এবং তাঁর সঙ্গীবৃন্দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা উটনী, গাভী এবং বকরী জবাই করে থাকি। ওগুলোর পেটে বাচ্চা থাকলে সেগুলো কি আমরা ফেলে দেবো না খেয়ে ফেলবো? তিনি স. বললেন, যদি ইচ্ছে হয় তবে খেতে পারো। তার মাতাকে জবাই করাই তাকে জবাই করা। নতুন জবাইয়ের প্রয়োজন নেই। আবু দাউদ, আহমদ।

হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, পশুমাতাকে জবাই করাই তার উদরস্থ শাবককে জবাই করা। আবু দাউদ, দারেমী। হজরত ইবনে ওমর থেকে দারা কুতনী লিখেছেন, জবাইকৃত পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন, তার মাকে জবাই করার অর্থ তাকে জবাই করা। তার শরীরে পশম থাক বা না থাক। হাদিসটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন দারা কুতনী এবং বলেছেন, হাদিসের শেষ কথাটুকু হজরত ইবনে ওমরের।

ইমাম শাফেয়ী যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এভাবে— পেটের বাচ্চা তার মায়ের অংশ। সে তার মায়ের সঙ্গে সম্মিলিত থাকে। কোনো কিছু দিয়ে কেটে আলাদা না করা পর্যন্ত তাকে পৃথক করা যায় না। মায়ের খাদ্য থেকেই সে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এবং নিঃশ্বাস নিয়ে থাকে মায়ের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে। সুতরাং তার মাকে জবাই করার অর্থ তাকেও জবাই করা। শিকার করার সময় যেমন শিকারকে আঘাত হানা হয়, তেমনি এক্ষেত্রেও তার মাকে আঘাত হানার অর্থ তাকেও আঘাত হানা। ইমাম আবু হানিফা যুক্তি দিয়েছেন, পেটের বাচ্চার রয়েছে স্বতন্ত্র জীবন। মাতার মৃত্যুর পরও তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে স্বতন্ত্র রক্তসম্পন্ন প্রাণী। গোশতকে রক্ত থেকে পৃথক করাই জবাই করার উদ্দেশ্য। মাতা পশুকে জবাই করলে তার শরীর থেকেই কেবল রক্ত প্রবাহিত হয়— তার বাচ্চার শরীর থেকে রক্ত বের হয় না। বিষয়টি শিকার করার সঙ্গেও তুলনীয় হতে পারে না। কারণ, শিকারকে আঘাত করা হলে তার শরীর থেকে কিছু না কিছু রক্ত বের হয়। ওই রক্ত বের হওয়াকেই সম্পূর্ণ রক্ত বের হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। জবাইকৃত পশুর বাচ্চার শরীর থেকে একটুও রক্ত বের হয় না। সুতরাং মাতাকে জবাই করার ফলে ওই বাচ্চা মরে গেলে তা ভক্ষণ করা হারাম হবে। কারণ, কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে মৃত পশু হারাম। জবাইকৃত পশুর পেটের বাচ্চা জবাই ছাড়া ভক্ষণ করা যাবে বলে যে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে, সে হাদিস খবরে আহাদ (একক বর্ণিত)। আর খবরে আহাদ দ্বারা কোরআনের অকাট্য হুকুম অপসারিত করা যায় না। অতএব শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, জবাইকৃত পশুর পেটের বাচ্চাকে জবাই না করলে তার গোশত খাওয়া যাবে না।

'ইল্লা মা ইউত্‌লা আলাইকুম'—এ কথার অর্থ যে সব জন্তুর কথা তোমাদের বলা হচ্ছে সেগুলো ব্যতীত। পরবর্তী আয়াতে সেই সকল হারাম ঘোষিত পশুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে মৃত, শুকরের মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ করে মারা পশু, উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী পশু এবং ওই পশু যার কিছু অংশ কোনো বন্য প্রাণী ভক্ষণ করেছে। এগুলোকে 'বাহিমাতুল আনআম' বলা হয়েছে। এর মধ্যে জবাইকৃত পশুর উদরস্থ শাবকের কথা আসে না। যে পশুগুলোকে হারাম করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— স্বাভাবিকভাবে মৃত অথবা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে মৃত্যুবরণকারী। আর আয়াতে সেগুলোর স্পষ্ট তালিকা দেয়া হয়েছে। সুতরাং হারাম ঘোষিত পশুগুলোর বিপরীতে যে সকল চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে সেগুলোর মধ্যে জবাইকৃত পশুর উদরস্থ শাবক অন্তর্ভুক্ত নয়।

তবে 'এহরামরত অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করবে না'—এ কথার অর্থ হজ বা ওমরার এহরাম পরিহিত অবস্থায় শিকার করা যাবে না। কাশ্‌শাফ প্রণেতা লিখেছেন, 'গইরা মুহিল্লিস্ সইদি' অর্থ— শিকার থেকে বিরত থাকা। তিনি এমনও বলেছেন, যখন শিকার নিষিদ্ধ— তখনও বিভিন্ন চতুষ্পদ জন্তু হালাল, যাতে তোমাদের জন্য বিষয়টি কঠিন না হয়। এরকম ব্যাখ্যা আপত্তিকর। কেননা চতুষ্পদ জন্তুটি হালাল হওয়ার বিষয়টি এহরামের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং চতুষ্পদ পশু সকল অবস্থায় হালাল। এহরামের অবস্থায় হোক অথবা এহরামের অবস্থায় না হোক। সে সকল চতুষ্পদ পশু গৃহপালিত হোক অথবা জংগলের হোক। এহরাম অবস্থায় কেবল জংগলের পশুপাখী শিকার করা নিষেধ বলা হয়েছে। অতএব প্রকৃত অর্থ হবে এই যে, বিভিন্নভাবে মৃত পশু ছাড়া হালাল ঘোষিত পশুসমূহ সকল অবস্থায় হালাল। হারাম কেবল এহরাম অবস্থায় শিকার করা। এখানে 'মুহিল্লি' শব্দটিতে সম্মান প্রকাশের জন্য বহু বচনের 'সিগা' ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আয়াতের প্রকৃত মর্ম হবে এ রকম— 'আমি তোমাদের জন্য বন্য চতুষ্পদ জন্তুকে বৈধ করেছি, কিন্তু এহরামের অবস্থায় শিকারকে বৈধ করিনি।'

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা ইয়াহ্‌কুমু মা ইউরিদ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা আদেশ করেন। অর্থাৎ তিনি যেগুলোকে হালাল করতে চান সেগুলোকে হালাল করে দেন এবং যেগুলোকে হারাম করতে চান সেগুলোকে করে দেন হারাম।

হজরত ইকরামা এবং সুদ্দী থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, হাকাম বিন হিন্দ বিকরী কয়েকটি উটের পিঠে খাদ্যশস্য চাপিয়ে মদীনায় এলো। খাদ্যশস্যগুলো বিক্রয়ের পর সে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বায়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। ফেরার সময় সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছিলো। তখন রসুল স. উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন, এই লোকটি অবিশ্বাসের সঙ্গে এলো এবং প্রতারকদের মতো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে গেলো। এরপর সে ইয়ামামায় পৌঁছে

মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হয়ে গেলো। এভাবে রসুল স. এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হলো। ইয়ামামা থেকে ওই লোকটি তার উটগুলোর উপর কিছু পণ্যসামগ্রী চাপিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলো। এই সংবাদ মদীনায় এলে কতিপয় মুহাজির ও আনসার সাহাবী তার পণ্যবাহী বাণিজ্য বহরটি লুণ্ঠন করতে ইচ্ছা করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, হাতাম সম্পর্কে। তার আসল নাম ছিলো শোরাইহ্ বিন সরিয়ায়ে বিকরী। সে একবার মদীনায় এলো। উটের বহরগুলো একস্থানে রেখে সে একা উপস্থিত হলো রসুল স. এর দরবারে। বললো, আপনি মানুষকে কোন কথার দিকে আহবান করেন? রসুল স. বললেন, আমি মানুষকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' বাক্যটি স্বীকার করতে বলি। আরো বলি নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা এবং জাকাত দেয়ার কথা। সে বললো, উত্তম! কিন্তু আমার সঙ্গে কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রয়েছে, তাদের পরামর্শ ছাড়া আমি কিছু করতে পারবো না। তার এ কথা বলার পূর্বেই রসুল স. সাহাবীগণকে বলেছিলেন, তোমাদের নিকট একটু পরেই রবীয়া গোত্রের এক লোক এসে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে। তাই হলো। শোরাইহ্ মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে রসুল স. এর দরবার পরিত্যাগ করলো। তখন রসুল স. বললেন, সে এসেছিলো অবিশ্বাসী অন্তর নিয়ে। এখন আবার অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হিসেবে পিঠ দেখিয়ে চলে গেলো। শোরাইহ্ মদীনা থেকে চলে যাওয়ার সময় মদীনাবাসীদের কিছু উট ভাগিয়ে নিয়ে গেলো। সাহাবীগণ পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কিন্তু তাকে ধরা গেলো না। পরের বছর সে ইয়ামামা থেকে বনী বকরের হাজীদের সঙ্গে হজ করতে চললো। তখন তার সঙ্গে ছিলো অনেক উটের বাণিজ্য বহর। উটগুলোর গলায় সে পট্টি লাগিয়ে চিহ্ন করে দিয়েছিলো। কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ওই প্রতারকটি হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। নির্দেশ দিন, আমরা তাকে বন্দী করে আনি। রসুল স. বললেন, সে তো কোরবানীর পশু হিসেবে উটগুলোর গলায় পট্টি লাগিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্, আমরা তো মূর্খতার যুগে এ রকম করতাম। রসুল স. কিন্তু তাদেরকে আক্রমণ করার অনুমতি দিলেন না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

ওয়াহেদী বলেছেন, ইয়ামামা থেকে হাতাম রসুল স. এর খেদমতে মদীনায় এসে উপস্থিত হলো। রসুল স. তাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। কিন্তু সে ইসলাম কবুল করলো না। উপরোক্ত যাবার সময় মদীনাবাসীদের উট চুরি করে নিয়ে গেলো। পরে যখন তিনি স. কাজা ওমরা আদায়ের জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন পথিমধ্যে শুনলেন, ইয়ামামার হাজীরা 'লাব্বায়েক' ধ্বনি উচ্চারণ করছে। সাহাবীগণ বললেন, এটা হাতাম ও তার সাথীদের আওয়াজ। হাতাম মদীনা থেকে অপহৃত উটগুলোর গলায় পট্টি লাগিয়ে হজের সময় কোরবানীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহের নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র-গৃহ-অভিমুখীদের পবিত্রতার অবমাননা করিবে না। যখন তোমরা ইহ্রাম মুক্ত হইবে তখন শিকার করিতে পার। তোমাদিগকে মস্জিদুল্ হারামে বাধা দেওয়ার জন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহ্কে ভয় করিবে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, শায়ায়িরিল্লাহ্ (আল্লাহ্র নিদর্শন) অর্থ— 'মানাসেকে হজ' বা হজের নিয়মাবলী এবং মাওয়াক্বিফ কাবা শরীফের তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে 'সায়ি' এবং আরাফা, মুজদালিফা ও মিনায় কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি। হজের সময় করণীয় অন্য সকল কাজও শায়ের বা আল্লাহ্র নিদর্শনের অন্তর্ভূত। যেমন— এহ্রাম, তাওয়াফ, মস্তকমুণ্ডন, কোরবানী ইত্যাদি। এ সকল নিদর্শনকে সম্মানিত করার অর্থ হচ্ছে মুশরিকদেরকে অপদস্থ করা। এ কথা প্রমাণ করা যে, কোরবানীর পশু প্রেরণ মুসলমানদের কাজ আর মুশরিকদের কাজ হচ্ছে— হজে বাধা সৃষ্টি করা। এখানে আল্লাহ্র নিদর্শনকে অবমাননা না করার নির্দেশ দিয়ে মুশরিকদের মতো লুণ্ঠনকর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'শায়ায়ির' শব্দটি 'শায়রাতুন' শব্দটির বহুবচন। বিশেষ কোনো চিহ্ন বা নিদর্শনকে শায়রা বলা হয়ে থাকে। হজের নিয়ম পদ্ধতিকে তাই শায়েরে হজ বলা হয়। হজরত আবু উবাইদা বলেছেন, 'শায়ারিল্লাহ্' অর্থ কোরবানীর ওই সকল পশু যা হাজীগণ হজের সময় মক্কায় প্রেরণ করে থাকেন।

ইশয়ারে আলামতের আভিধানিক অর্থ উটের পৃষ্ঠদেশের সর্বোচ্চ অংশকে কোনো প্রকারে চিরে দেয়া, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। এই কর্মটিও একটি নিদর্শন (আলামত)। কোরবানী করাই যেহেতু উট প্রেরণ করার উদ্দেশ্য— তাই এভাবে উটের রক্ত প্রবাহিত করাকেও আশয়ারে মানাসেক বলা হয়ে থাকে।

মাসআলাঃ কোরবানীর পশু হিসেবে উটকে বিশেষ কোনো প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করাকে মাকরুহ্ বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। অন্য ইমামত্রয়ের নিকট এ রকম করা সুন্নত। সাহেবাঈন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) ও এ রকম বলেছেন। জমহুরের বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে এসেছে মাতা আয়েশা সিদ্দিকার হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, আমি নিজ হাতে রসুল স. এর কোরবানীর পশুদের জন্য কাপড়ের পট্টি বানিয়েছি। তিনি স. ওই পট্টিগুলোকে উটের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। এভাবে সেগুলোকে চিহ্নিত করে মক্কায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উটগুলো রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যে বিষয়গুলো হালাল ছিলো সেগুলো উটের যাত্রার কারণে নিষিদ্ধ হয়নি, অর্থাৎ উটের গলায় লাগানো পট্টিগুলোর কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়নি।

আতীয়ার বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, এহরাম অবস্থায় শিকার কোরো না। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে, যখন এহরাম খুলে ফেলবে তখন শিকার করতে পারবে। এ দু'টি নির্দেশের উদ্দেশ্য একই। এহরাম অবস্থায় শিকার থেকে বিরত থাকা হজের নিয়মাবলীর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকার একটি অংশ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হেরেম শরীফে হত্যাকাণ্ড কোরো না।

'ওয়ালাশ্‌শাহ্‌রাল হারামা' এ কথার মাধ্যমে সম্মানিত মাসের অবমাননা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— নিষিদ্ধ মাস সমূহে যুদ্ধবিগ্রহ করাকে বৈধ মনে কোরো না। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এ কথার অর্থ নিষিদ্ধ ঘোষিত মাসগুলোকে পরিবর্তন কোরো না। মূর্খতার যুগে মুশরিকেরা তাদের ইচ্ছেমতো সম্মানিত মাস নির্ধারণ করতো। এই অপকর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এখানে। রজব, জিলক্বদ, জিলহজ এবং মহররমকে ইসলামপূর্ব যুগে শাহরুল হারাম বা সম্মানিত মাস বলা হতো। এই মাসগুলোতে সর্বসাধারণকে নিরাপত্তা দেয়া হতো। লুণ্ঠন, যুদ্ধ ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকতো বলে, তখন লোকজন চলাফেরা করতো নির্বিঘ্নে। লুণ্ঠনকারীরা অনন্যোপায় হয়ে একবার তাদের নেতাদের নিকট আবেদন জানালো। এ বছর মহররম মাসকে আমাদের জন্য হালাল করা হোক। এর পরিবর্তে সম্মানিত ও নিরাপদ মাস (শাহরুল হারাম) ঘোষণা করা হোক সফর মাসকে। এভাবে তাদের নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একেক বছর একেক নিয়মে সম্মানিত মাসের ঘোষণা আসতে শুরু করলো। এই পরিবর্তনকেই এখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'ওয়ালাল হাদ্‌ইয়া' অর্থ— কোরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু। তখনকার যুগে কোরবানীর জন্য মক্কায় প্রেরণ করা হতো উট, গাই ও বকরী। বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হাদী' অর্থ কোরবানীর পশু—উট, গাই অথবা বকরী। আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্‌র নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও নিদর্শন হিসেবে পুনরায় কোরবানীর পশুর কথা উল্লেখ করে তার অবমাননা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোরবানীর পশু একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। সেই গুরুত্বকে প্রকাশ করার জন্যই পুনরায় এর উল্লেখ এসেছে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, পুনরায় উল্লেখের মাধ্যমে ওই সকল পশুর কথা বলা হয়েছে, যেগুলো লুণ্ঠনের মাধ্যমে আহরিত।

'ওয়ালাল ক্বলাইদা'— ক্বলাইদা শব্দটি 'ক্বলাদাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ গলায় পরানো চিহ্নবিশিষ্ট পশু। মূর্খতার যুগে কোরবানীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত কোনো কোনো পশুর গলায় জুতা অথবা কোনো গাছের ডাল ঝুলিয়ে দেয়া হতো, যেনো এগুলো দেখে সকলেই বুঝে নিতে পারে যে, এগুলো কোরবানীর উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে চলেছে।

এখানে বলা হয়েছে 'আল ক্বলাইদা' এর অর্থ— গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশু। এগুলোও হাদী'র অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ সম্মানের কারণে এখানে বিষয়টিকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। আতা বলেছেন, ক্বলাদা বা গলায় পরানো চিহ্ন বলতে বুঝানো হয়েছে গলায় বিশেষ চিহ্ন ধারণকারী মানুষকে। কেননা, মূর্খতার যুগে যারা হেরেম শরীফ থেকে বের হতো তারা তাদের গলায় বৃক্ষের ছাল ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখতো। তারা এ রকম করতো এই কারণে যে, এগুলো দেখে কেউ যেনো তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হয়। মুতরাফ বিন শাখির এ রকমই অর্থ গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, মক্কায় মুশরিকেরা তাদের গলায় বৃক্ষের ছাল ঝুলিয়ে রাখতো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কোরবানীর পশুগুলোকে অবমাননা না করার কথা বল্মাই উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে গলায় পরানো চিহ্নের অবমাননা না করার কথা। অর্থাৎ গলায় পরানো চিহ্নবিশিষ্ট পশুর অবমাননা করা যাবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে রমণীদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য সেখানে উদ্দেশ্য ছিলো রমণীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া। কিন্তু নির্দেশকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সেখানে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাকেও নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। হাদী ও ক্বলাদার অবমাননার অর্থ কোরবানীর উদ্দেশ্যে মক্কায় গমনকারী সকল পশুকে বাধা দান করা।

'ওয়ালা আম্মিনাল বাইতাল হারাম'—এ কথার মাধ্যমে বাইতুল্লাহ্ শরীফ অভিমুখে গমনকারী মানুষের অবমাননা নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ হজযাত্রীদেরকে হত্যা করা যাবে না এবং তাদের মালামাল লুণ্ঠনও করা যাবে না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাদের মক্কাযাত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভ। এখানে অনুগ্রহ (ফজল) অর্থ ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈধ রিজিক এবং সন্তোষ অর্থ সওয়াব। এভাবে প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় এ রকম—যারা বৈধ ব্যবসা এবং হজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছে তাদেরকে অবমাননা কোরো না।

এখানে হজযাত্রীদের মধ্যে মুশরিক ও মু'মিন উভয় দলই অন্তর্ভূত। কারণ, ওই সময় মু'মিন মুশরিক সকলেই হজ করতো। রসুলুল্লাহ্ স. কাজা ওমরা আদায়ের জন্য মক্কায় যাচ্ছিলেন। হাতামও তখন তার চোরাই উটগুলোকে নিয়ে মক্কায় গমন করছিলো। তখনই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তাই এর মধ্যে মু'মিন ও মুশরিক দুই দলই জড়িত রয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই আয়াতের নির্দেশটি কেবল বিশ্বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য। কারণ, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'মুশরিকদেরকে তোমরা যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো।'

'যখন তোমরা এহ্‌রাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পারো'—এই নির্দেশটির মাধ্যমে এহ্‌রাম মুক্ত অবস্থায় শিকারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আদেশ নয়। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বের আয়াতে এহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিলো। এখানে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়ে শিকারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এখানে নির্দেশটি একটি অনুমতি, যদিও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আদেশসূচক ক্রিয়ার সিগা। প্রথমে 'কোরো না' বলার পর যদি 'কোরো' বলা হয় তবে সেটি আদেশ না হয়ে অনুমতি হবে। অর্থাৎ 'কোরো' অর্থ হবে করতে পারো। এক স্থানে এরশাদ হয়েছে—'ফাইজা কুদ্বিয়াতুস্ সলাতু ফাংতাশিরু (যখন নামাজ শেষ হয়, তখন তোমরা বের হয়ে পড়ো)। এখানে বের হয়ে পড়ো অর্থ বের হয়ে যেতে পারো। এখানে অবশ্য অনুমতিজ্ঞাপক এই আদেশটি কোনো নিষেধের পরেও আসেনি। এ রকম দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে। যেমন—'মা মানায়াকা আন তাস্‌জুদা ইজ আমার তুকা' (কে তোমাকে সিজদা করতে নিষেধ করলো যখন আমি তোমাকে আদেশ করলাম) — এখানে আমারতুকা (আদেশ করলাম) অর্থ উসুল বিশারদগণের নিকট ইজাব বা কবুল।

'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে বাধা দেয়ার জন্য কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেনো কখনোই সীমালজ্মনে প্ররোচিত না করে।' বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে প্ররোচিত না করে কথাটির অর্থ— উত্তেজিত না করে। ফাররা বলেছেন, এখানে 'ক্বওমুন' (কোনো সম্প্রদায়) অর্থ মক্কাবাসী। 'বিদ্বেষ' অর্থ মক্কাবাসীদের প্রতি বিদ্বেষ। ইতোপূর্বে মুসলমানেরা হজ করতে এসেও মক্কায় পৌঁছতে পারেন নি। হুদাইবিয়া প্রান্তরে মুশরিকদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো তাঁদেরকে। সে সময়ে সম্পাদিত চুক্তির একটি শর্তানুযায়ী মদীনায় ফিরে যেতে হয়েছিলো। সেই কারণে মুসলমানদের অন্তরে ছিলো ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের কথাই উল্লেখ করে এখানে দেয়া হয়েছে বিদ্বেষের কারণে সীমালজ্মন না করার নির্দেশ। ইবনে জারীর লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হুদাইবিয়ার ঘটনার পর। এখানে সীমালজ্মন অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা লুণ্ঠন। হজরত যায়েদ বিন আসলাম থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ইতোপূর্বে মুশরিকেরা রসুল স. এর হজযাত্রাকে বাধা প্রদান করেছিলো। রসুল স. তখন অবস্থান করছিলেন হুদাইবিয়ায়। ওই সময় পূর্বাঞ্চলের কিছু মুশরিক ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাচ্ছিলো। তাদেরকে দেখে সাহাবীগণ বললেন, মক্কার মুশরিকেরা যেমন আমাদেরকে বাধা দিয়েছে, তেমনি আমরা এই মুশরিক হজযাত্রীদেরকে বাধা দেবো, যাতে তারাও আমাদের মতো ওমরা করতে না পারে। তাঁদের এহেন মনোভাবের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে'। এখানে আলবির্ অর্থ আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিপালন এবং তাক্‌ওয়া অর্থ আত্মসংযম।

'পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরের সাহায্য করবে না'—এখানে পাপ অর্থ নিষিদ্ধ কার্য সম্পাদন। আর 'উদ্‌উয়ান' অর্থ সীমালঙ্ঘন, জুলুম। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করা। প্রতিশোধ স্পৃহাকে প্রশ্রয় দেয়া।

হজরত নাওয়াস বি সামআন আনসারী বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'বির' এবং 'ইসমুন' শব্দ দু'টোর অর্থ কী? তিনি স. বললেন, 'বির' অর্থ উত্তম চরিত্র এবং 'ইসমুন' অর্থ ওই খটকা যা তোমাদের মনে সৃষ্ট হয়। এবং যে খটকার কথা লোকে জানুক তা তোমাদের পছন্দ নয়। বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি।

হজরত আবু ছা'লাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, ওই কথাকে বির্ বলে যে কথা শুনে তোমাদের হৃদয় প্রশান্ত হয় যদিও মুফতীর ফতওয়া ওই কথার বিরুদ্ধে যায়। আহমদ। আমি বলি, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারীদেরকে। তারাই প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারী যাদের অন্তর মোতমাইন (প্রশান্ত)।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াত্তাকুল্লহা ইন্নাল্লহা শাদিদুল ইক্বব'—আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর (তাঁর শাস্তি অত্যন্ত ভয়ংকর)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

❒ তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মড়া, রক্ত, শূকর মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু আর গলা চাপিয়া মারা জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যাহা তোমরা জবেহ দ্বারা পবিত্র করিয়াছ তাহা ব্যতীত, আর যাহা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তাহা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এইসব পাপকার্য; আর সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে

হতাশ হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইলে তখন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছিলো 'ইল্লা মা ইউত্লা আলাইকুম' (যে সব জন্তুর কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে)—সেই হারাম ঘোষিত জন্তুগুলোর কথা এই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মড়া। মড়া অর্থ স্বাভাবিকভাবে মৃত প্রাণী। কিতাবুস্ সাহাবা গ্রন্থে ইবনে মান্দা লিখেছেন, হজরত ইবনে হাইয়ান বিন আল জাবর বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তখন মৃত পশুর গোশত ভর্তি একটি পাত্রের নিচে আমি আগুন দিয়ে জ্বাল দিচ্ছিলাম। ওই সময় মড়া হারাম হওয়ার এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। আমি তৎক্ষণাৎ গোশতের হাড়িটি উল্টিয়ে দিলাম। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এটাই হুকুম আহকাম সম্পর্কিত সর্বশেষ আয়াত। হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ সুরা আন'আমের মধ্যে মড়া হারাম করা হয়েছিলো। সুতরাং এ রকম কিছুতেই সম্ভব নয় যে, হারাম ঘোষণার পরেও সাহাবীগণের কেউ মৃত জন্তুর গোশত রান্না করবেন। বরং বলা যেতে পারে যে, হজরত ইবনে হাইয়ানের এই ঘটনাটি হিজরত পূর্ব সময়ের যখন সুরা আনআমের মাধ্যমে মড়া হারাম করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটির সঙ্গে ওই ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

'ওয়াদ্দামু' অর্থ রক্ত। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ওয়াদ্দামু অর্থ প্রবাহিত রক্ত। মূর্খতার যুগে অনেকেই প্রবাহিত রক্ত পান করতো। এখানে সেই রক্ত পানকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

'ওয়া লাহ্মুল খিনজির' অর্থ শূকরের গোশত। শূকরের শরীরের সকল অংশই অপবিত্র। সকল অংশই হারাম। কিন্তু এখানে কেবল গোশত খাওয়া হারাম বলা হয়েছে এ কারণে যে, আহার্য বস্তুর মধ্যে গোশতের ভূমিকাই প্রধান।

'ওয়া মা উহিল্লালি গইরিল্লাহি বিহি'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু। মুশরিকেরা পশু জবাইয়ের সময় চিৎকার করে তাদের কল্পিত লাত ও উজ্জা দেবতার নাম উচ্চারণ করতো। আবু তোফায়েলের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলীকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. কি বিশেষ কোনো অসিয়ত অথবা গোপনীয় কোনো হুকুম রেখে গিয়েছেন? হজরত আলী বললেন, জনসাধারণের উপর প্রযোজ্য নয়— এ রকম কোনো হুকুম আমার উপরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে হ্যাঁ, আমার তলোয়ারের পৃষ্ঠদেশে একটি মূল্যবান লিপি রয়েছে। এ কথা বলে তিনি তলোয়ারের পৃষ্ঠদেশ দেখালেন। দেখা গেলো সেখানে লেখা রয়েছে—ওই লোকের উপর আল্লাহ্র লানত যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর জন্য জবেহ্ করে (জবেহ্ করার সময় আল্লাহ্ নামের সঙ্গে অন্যের নাম যুক্ত করে অথবা কেবল অন্যের নামে জবেহ্ করা)। আল্লাহ্র লানত ওই ব্যক্তির

উপর যে জমিনের চিহ্নরেখা সমূহ চুরি করে। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে অর্থাৎ জমিনের বিভক্ত রেখা গুলোকে পরিবর্তন করে। ওই লোকের উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত যে তার আপন পিতাকে লানত করে। ধর্মের মধ্যে নতুন কথা আবিষ্কারকারীর বিরুদ্ধে যে না দাঁড়ায়, তার উপরের আল্লাহ্‌র লানত। মুসলিম।

মাসআলাঃ জবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এ রকম নাম উল্লেখ করা মাকরূহ্‌ — হারাম নয়। যেমন, জবেহের সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠের পর সাথে সাথে কেউ যদি বলে আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান (হে আল্লাহ্‌, তুমি অমুকের নিকট থেকে এই কোরবানী কবুল করো) — এ রকম বলা। বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ার পরক্ষণে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌ পড়লেও মাকরূহ্‌ হবে। কিন্তু মিলিয়ে পড়লে হবে হারাম। যেমন, বিস্‌মিল্লাহি ওয়া ইসমিফুলান, বিস্‌মিল্লাহি ওয়া মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌। এ রকম করলে আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে অন্যকে শরীক করা হয়। তবে জবাইয়ের জন্য পশুকে শোয়ানোর পর বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠের পূর্বে গাইরুল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করাতে দোষ নেই। তেমনি জবেহ্‌ করার পর কোনো দোয়া অথবা অন্য কোনো বাক্য উচ্চারণ করলে মাকরূহ্‌ হবে না। এক বর্ণনায় এসেছে, জবেহ্‌ করার পর রসুল স. বলতেন, 'হে আল্লাহ্‌, তুমি একে মোহাম্মদ স. এর উম্মতের দিক থেকে কবুল করো— যারা তোমার এককত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে।

'ওয়াল মুনখনিকৃতু' অর্থ শ্বাসরূদ্ধ করে মারা জন্তু।

'ওয়াল মাউকুজাত' অর্থ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী জন্তু। মূর্খতার যুগের লোকেরা লাঠি ও পাথর দ্বারা পশুকে আঘাত করে মেরে ফেলতো। তারপর তার গোশত খেতো।

'ওয়াল মুতারদ্দিয়াত' অর্থ পতনে মৃত জন্তু। অর্থাৎ উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে কিংবা কূপে পড়ে গিয়ে যে পশু মারা যায়।

'ওয়ান্নাতিহাত' অর্থ শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু। পশুরা সংঘর্ষে লিপ্ত হলে একে অপরকে শিং দ্বারা আঘাত করে। সেই আঘাতে মরে যাওয়া পশুই হচ্ছে শৃংগাঘাতে মৃত পশু।

'ওয়ামা আকালাস্‌ সাবুউ ইল্লা মা জাক্‌কাইতুম' — এবং হিংস্র পশুকে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা জবেহ্‌ দ্বারা পবিত্র করেছো। এ কথায় বুঝা যায়, শিকারী জানোয়ার যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, আর ওই অবস্থায় পশুটি যদি মরে যায়, তবে তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে না। তবে মৃত্যুর পূর্বে জবাই করে নিলে তার গোশত খাওয়া যাবে। এখানে জবেহ্‌ দ্বারা পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র করা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'তায্‌কিয়াতুন' শব্দটি। সৃষ্টিগতভাবে সকল পশুর রক্ত অপবিত্র। এই অপবিত্রতা দূর করতে গেলে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে জবাই করতে হবে এবং জবাইও করতে হবে শরিয়ত নির্ধারিত নিয়মে—কণ্ঠনালী ও তার কিনারের দু'টি রগ কেটে রক্ত প্রবাহিত করে দিতে

হবে। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নাওফেল বিন ওয়ারাকা খাজায়ীকে তাঁর উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে মিনা প্রান্তরে উপস্থিত হলেন এবং সকল হাজীদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন, জবেহ্ ও নহর করতে হবে কণ্ঠনালী এবং তার পার্শ্বস্থ রগগুলোর মধ্যে। দারা কুতনীর পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জাওজী।

মাসআলাঃ হিংস্র প্রাণী কর্তৃক আহত অথবা ভক্ষিত পশু তখনই হালাল হবে, যখন মরার পূর্বে সেটিকে জবাই করে নেয়া হবে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। যদি হিংস্র প্রাণী জখম করার কারণে শিকারের অবস্থা মৃতবৎ হয়ে যায়— তবে ওই অবস্থায় জবেহ্ করলেও সে শিকারের গোশত খাওয়া যাবে না। (মৃতবৎকে মৃতই ধরে নিতে হবে)। মুতারাদ্দিয়া, নাতিহা ও মাউকুজা — এগুলোর হুকুম একই। যদি আঘাত পাওয়ার কারণে জবেহ সদৃশ হয়— তবু ওগুলো খাওয়া হারাম হবে (মরার পূর্বে জবাই করে নিলেও)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ইল্লা মা জাক্কাইতুম (জবেহ্ দ্বারা পবিত্র করেছো) —এই হুকুমটির সম্পর্ক কেবল হিংস্র প্রাণী কর্তৃক ভক্ষিত পশুর সঙ্গে। কেননা, ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হওয়ার পর নতুন কোনো প্রসঙ্গ এলে তা সর্বশেষ বিষয়টির সঙ্গেই সম্পর্কিত হয় — সকল বিষয়ের সঙ্গে নয়। এখানেও তাই জবেহ্ করার শর্তটি কেবল সর্বশেষে উল্লেখিত হিংস্র পশু ভক্ষিত জন্তুর সঙ্গেঁ যুক্ত। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, প্রহারে, পতনে ও শৃংগাঘাতে মৃত জন্তুদের ব্যাপারে জবেহ করার অবকাশই নেই। বর্ণিত চার অবস্থার প্রাণী জীবিত থাকলেও তা জবেহ করলে হালাল হবে না। হালাল হবে কেবল ওই জন্তু যা হিংস্র পশু কর্তৃক ভক্ষিত হওয়ার পর জীবিত থাকে এবং জীবিত অবস্থায় সেটিকে জবাই করা হয়।

মাসআলাঃ জবেহ করার রগ চারটি — ১. হুলকুম (শ্বাসনালী), ২. মেরী (খাদ্যনালী) এবং দু'টি আদওয়াজ (রক্তনালী)। ইমাম মালেকের মতে চারটি রগ কাটাই জরুরী। ইমাম আহমদের একটি অভিমতও এ রকম। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেবল শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী কাটলেই চলবে। ইমাম আহমদের দ্বিতীয় অভিমতটিও এ রকম। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে কোনো তিনটি রগ কাটতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ প্রথমদিকে এ রকমই বলেছেন। পরে তিনি এই মত থেকে সরে গিয়ে বলেছেন — কাটতে হবে শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং যে কোনো একটি রক্তনালী। এক বর্ণনায় ইমাম মোহাম্মদের অভিমত এ রকম ছিলো বলা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে — চারটি রগেরই বেশীর ভাগ অংশ কাটতে হবে। আর এক বর্ণনায় তাঁর অভিমতকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে। সকল অবস্থায় ইমাম মোহাম্মদের মূল কথা হচ্ছে — চারটি রগ কাটাই জরুরী। চারটি রগের অধিকাংশ কর্তিত হলেও তাকে সম্পূর্ণ কর্তিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতের (শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং যে কোনো একটি রক্তনালী) উদ্দেশ্য এই যে, রক্ত প্রবাহ যেনো নিশ্চিত হয়। তাই তিনি শ্বাসনালী, খাদ্যনালীসহ যে কোনো একটি রক্তনালী

কাটার কথা বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অধিকাংশকেই সম্পূর্ণ ধরা হয়। কাজেই চারটির মধ্যে যে কোনো তিনটি কাটলেই সবগুলো রগ কাটা হয়েছে মনে করতে হবে। এ রকম করলেই আসল উদ্দেশ্য (রক্ত প্রবাহিত করা) পূর্ণ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ রক্ত প্রবাহিত করা যায় এবং রগ সমূহ কাটা যায় — এ রকম যে কোনো অস্ত্র জবাইয়ের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সে অস্ত্র লৌহ নির্মিত হতে পারে, আবার প্রস্তর নির্মিতও হতে পারে। কিংবা বংশ নির্মিতও হতে পারে। দাঁত নখ এবং শিং দ্বারাও জবাই করা যায়, কিন্তু শর্ত হচ্ছে — এগুলো শরীর সংলগ্ন হওয়া যাবে না। শরীর সংলগ্ন দাঁত, নখ ও শিং দ্বারা জবাই করা নাজায়েয। আরেকটি শর্ত হচ্ছে জবাইয়ের সকল অস্ত্রই ধারালো হতে হবে। ইমামে আজম বলেছেন, শরীর থেকে পৃথক দাঁত, নখ ও শিং দ্বারা জবাই করা মাকরূহ্। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন, নাজায়েয — এগুলো দ্বারা জবাই করলেও জবাইকৃত পশু মৃত বলে গণ্য হবে — তাই তার গোশতও খাওয়া যাবে না। হেদায়া।

হজরত রাফে বিন খাদিজ বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! পশু জবাইয়ের জন্য আমাদের কাছে কোনো ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ছিলকা দিয়ে জবাই করতে পারবো? তিনি স. বললেন, যে অস্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করা যায় এবং জবাইয়ের সময় আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়, সেই জবাইকৃত পশু হালাল। কিন্তু দাঁত ও নখকে জবাইয়ের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কেননা, দাঁত হচ্ছে হাড় এবং নখ হচ্ছে হাবশীদের ছুরি। বোখারী, মুসলিম। হজরত কাব বিন মালেক বলেছেন, আমার বকরীগুলো চারণ ভূমিতে চরে বেড়াচ্ছিলো। একটি বকরী ছিলো মৃত্যুপথ যাত্রী। আমার এক ক্রীতদাস একটি প্রস্তর খণ্ডকে ধারালো করে নিয়ে ওই বকরীটিকে জবাই করে ফেললো। আমি রসুল স. সকাশে গিয়ে ঘটনাটি জানালাম। রসুল স. বললেন, হালাল। বোখারী। হজরত আদী বিন হাতেম বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল, হঠাৎ শিকার মিলে গেলো। কাছে কোনো ছুরি নেই। এমতাবস্থায় পাথর অথবা লাঠিকে ধারালো করে নিয়ে ওই শিকারকে কি জবাই করতে পারবো? তিনি স. বললেন, রক্ত প্রবাহিত করে দাও -- যে অস্ত্র দ্বারাই হোক না কেনো। কিন্তু জবাই করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে। আবু দাউদ, নাসাঈ।

বনী হারেসার এক ব্যক্তির ঘটনা — আতা বিন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন এভাবে — উহুদ পাহাড়ের উপরে তার কয়েকটি উষ্ট্রি চরে বেড়াচ্ছিলো। একটি উষ্ট্রি ছিলো মরণোন্মুখ। সে ইচ্ছে করলো, মরার আগেই উটনীটিকে জবাই করতে হবে। কিন্তু তার কাছে কোনো ছুরি ছিলো না। সে তখন একটি লাকড়িকে ধারালো করে নিয়ে উটনীটিকে নহর (জবাই) করলো। রক্ত প্রবাহিত হলো। রসুল স.কে এ কথা জানালে তিনি স. তাঁকে ওই উটনীর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিলেন। আবু দাউদ, মালেক। অন্য বর্ণনায় লাকড়ির পরিবর্তে বলা হয়েছে

সাজ্জাজ (সাজ্জাজ উটের পিঠে বোঝা বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়)। ইমাম আবু হানিফা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, রসুল স. সাধারণভাবে নহর করা পশুর গোশত খাওয়াকে হালাল বলেছেন এবং সাধারণভাবে এ কথাও বলেছেন যে, 'ইহ্রিক্বিদ্দাম বিমা শি'তা' (যেভাবে ইচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করো) — এ কথায় বুঝা যায় নখ এবং দাঁতও জবাইয়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ। অন্য ইমামত্রয় ধরেছেন রসুল স. এর ওই উক্তিটি — 'লাইসা সিননু ওয়াজজুফরু' (দাঁত এবং নখ নয়)। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ কথার অর্থ ওই দাঁত এবং নখ নয় যা শরীর সংলগ্ন। হাবশীরা হাতের নখ দিয়ে জবাই করতো। তাই রসুল স. বলেছেন, নখ হচ্ছে হাবশীদের ছুরি। তিনি স. দাঁতকে বলেছেন হাড়। সুতরাং দাঁত নয় — এ কথার অর্থ হবে ওই দাঁত যা শানিত নয়।

এটা ঐকমত্য যে, কোনো অবস্থাতেই শরীরলগ্ন দাঁত ও নখকে জবাইয়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এভাবে জবাই করলে জবাইকৃত পশু হয়ে যাবে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা পশুর মতো — যা হারাম।

মাসআলাঃ জবাই করার পূর্বে ছুরি ধার করে নেয়া মোস্তাহাব। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক প্রতিটি কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই জবাইও করতে হবে সুন্দর ও সুচারুরূপে। ছুরি ধারালো করে নিতে হবে। যেনো জবাইয়ের পশু কষ্ট কম পায়। হজরত শাদ্দাদ বিন আউস থেকে মুসলিম এ রকম বর্ণনা করেছেন।

মাসআলাঃ উড়ন্ত পাখিকে তীরবিদ্ধ করার পর যদি পাখিটি মাটিতে পড়ে মারা যায়, তবে তা হালাল। শর্ত হচ্ছে মাটিতে বা সরাসরি সমভূমিতে পড়তে হবে। পানিতে, পাহাড়ে অথবা গাছের উপরে পড়ে মারা গেলে হালাল হবে না। তখন তা হবে এই আয়াতে বর্ণিত 'পতনে মৃত জন্তু' তুল্য — যা হারাম। তবে যদি তীরটি পাখির গলায় বা জবাই করার স্থানে লাগে তবে হালাল হবে — যেখানেই পড়ুক না কেনো। এ রকম তীরবিদ্ধ পাখি জবাইকৃত পাখি তুল্য যা হালাল।

'ওয়ামা জুবিহা আ'লান নুসুবি' — এ কথার অর্থ আর যা মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, কাবা শরীফের আশে পাশে তিন শত সাতটি পাথর ছিলো। মুশরিকেরা সেগুলোকে সম্মান করতো এবং কোরবানীর পশুগুলোকে ওই সকল স্থানে বসিয়ে রাখতো। কেউ কেউ বলেছেন, তিন শত সাতটি পাথর নয়, বরং তিনশত সাতটি মূর্তি ছিলো সেখানে। কাতরাব বলেছেন, এই আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত 'অমা উহিল্লালি গইরিল্লাহি বিহি (আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু) এবং আলোচ্য বাক্য (আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়) এর উদ্দেশ্য একই। আমি বলি, এ কথা দু'বার যখন উল্লেখ করা হয়েছে তখন মনে করতে হবে উদ্দেশ্য বা বক্তব্যও এখানে দু'রকম। সুতরাং এক্ষেত্রে মুজাহিদ ও কাতাদার বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। তাঁরা বলেছেন, কাবা শরীফের আশে পাশে ছিলো তিন শত সাতটি পাথরের বেদী। মূর্খতার যুগের লোকেরা ওই বেদীগুলোর উপর ইবাদত মনে করে পশু বলি দিতো।

'ওয়া আন তাস্‌তাক্বসিমু বিল আজলাম'—এ কথার অর্থ, এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা। আজলাম শব্দটি জালমুন শব্দের বহুবচন। এখানে যে জুয়ার তীরের কথা বলা হয়েছে সেই তীরগুলো বাইতুল্লাহ্‌র সেবকের নিকট রক্ষিত থাকতো। তীর ছিলো মোট সাতটি। তীরগুলোর কোনোটির গায়ে লেখা থাকতো 'হাঁ' কোনোটির গায়ে থাকতো 'না।' কেউ সফর, বিবাহ বিষয়ে কী করণীয় তা জানতে চাইলে হোবল নামক সবচেয়ে বড় প্রতিমাটির নিকট হাজির হতো। সেখানে তারা কাবার সেবককে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিতো। সেবক তার তুন থেকে একটি তীর টেনে বের করতো। সেই তীরের গায়ে 'হাঁ' লেখা দেখতে পেলে কল্যাণজনক মনে করে বিবাহ, সফর ইত্যাদি করতো। আর 'না' বিশিষ্ট তীর বের হয়ে এলে অকল্যাণ মনে করে অন্ততঃ এক বৎসরের মধ্যে তারা আর বিবাহ কিংবা সফরে অগ্রসর হতো না। বংশগত ভাগ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে কাউকে নির্বাচন করলে যদি দেখতো, 'হাঁ' লেখা তীর বের হয়েছে, তবে নির্বাচিত ব্যক্তিকে তারা খুব সম্মান করতো। আর 'না' লেখা তীর বের হয়ে এলে তারা মনোনীত ব্যক্তিকে বংশগত কেউ বলে মনেই করতো না। দিয়ত বা রক্তপণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিলেও তারা এভাবে জুয়ার তীর দ্বারা বিষয়টি নিষ্পত্তি করতো। হাঁ সূচক হলে পুরোপুরি রক্তপণ দিতো। আর না সূচক হলে পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষা করতো এবং তীরের গায়ে যা লেখা থাকতো, সেই মোতাবেক আমল করতো। এই আয়াতের মাধ্যমে জুয়ার তীরের এ রকম ভাগ্য পরীক্ষাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই অপকর্মটিসহ এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত সকল অপকর্মগুলো পাপ।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, 'আজলাম' অর্থ কতোগুলো শাদা রঙের তীর— যেগুলোর মাধ্যমে মূর্খতার যুগের লোকেরা ভাগ্য পরীক্ষা করতো। মুজাহিদ বলেছেন, এ কথার অর্থ পারস্যবাসী এবং রোমবাসীদের গুটি, যদ্দারা তারা জুয়া খেলতো। সুফিয়ান বিন ওয়াকিয় বলেছেন, এ কথার অর্থ শতরঞ্জ খেলা। বত্রিশটি মোহর এবং চৌষট্টিটি গুটির মাধ্যমে শতরঞ্জ খেলা হয়। শায়বী প্রমূখ বলেছেন, আরববাসীদের আজলাম এবং অনারবদের গুটি একই নির্দেশের মধ্যে পড়ে।

আমি বলি, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যতোরকম উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সে সকল উপকরণই আজলামের অর্ন্তভূক্ত। যেমন পাশা খেলা, ভাগ্য গণনা, বাজি ধরা। এ ধরনের সকল কিছুই ভাগ্য নির্ধারক তীরের মতোই।

হজরত আবুদ্ দারদা বলেছেন, রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি গণকের মাধ্যমে কিছু জানতে চায়, ভাগ্য গণনা করে অথবা সফর করার উত্তম সময় জানতে চায়—— সেই ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জান্নাতে দেখা যাবে না। কাবিসা থেকে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন বাগবী। রসুল স. আরো বলেছেন, পাখির নাম, তিন বার তার আওয়াজ অথবা চলাচলের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা করা এবং কোনো কাজের উত্তম সময় সম্পর্কে জানতে চাওয়া অথবা প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হার জিৎ কিংবা কোনো কিছু করা না করার নির্দেশ জানা কুফুরীর (অবিশ্বাসের) অর্ন্তভুক্ত। বিশুদ্ধ সূত্রে এই বর্ণনাটি এনেছেন আবু দাউদ।

আল ইয়াওমা ইয়াইসাল্লাজিনা কাফারু মিন দিনিকুম ফালা তাখ্‌শাও হুম ওয়াখ শাওনি—এ কথার অর্থ আজ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় কোরো না। শুধু আমাকে ভয় করো। এখানে আল ইয়াওমা বা আজ অর্থ আজকের দিন নয়। বরং এ কথার অর্থ হচ্ছে— এই মুহূর্ত থেকে চিরদিন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে আজ অর্থ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিন। আর এখানে কাফেরদের হতাশ হওয়ার অর্থ এখন থেকে অবিশ্বাসীরা ইসলামের উপরে বিজয় লাভ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ। তাদের আরেকটি চরম নৈরাশ্য এই যে, মুসলমানেরাও আর তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে না।

'তাদেরকে ভয় কোরো না'—এ কথার অর্থ হে মুসলমানেরা তোমরা আর এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ো না যে, অবিশ্বাসীরা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে।

'শুধু আমাকে ভয় করো' এ কথার অর্থ— আমি তোমাদেরকে সকল ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছি, সুতরাং অন্য সকলের ভয় পরিত্যাগ করো। কেবল ভয় করো আমাকে।

আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম)। এখানে দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দেয়ার অর্থ সকল বিধিবিধানকে চূড়ান্ত করে দেয়া। যেমন — আকায়েদ, ফারায়েজ, ওয়াজিবাত, সুনান, মুসতাহিব্বাত, হালাল, হারাম, মাকরূহাত, মুফসিদাত, ইত্যাদি। মুফসিদাত্ বা বিনষ্টকারীর বিধানও বিভিন্নরূপে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। যেমন, রোজা বিনষ্টকারী, নামাজ বিনষ্টকারী, ক্রয়-বিক্রয় বিনষ্টকারী ইত্যাদি। নসের (কোরআন ও হাদিসের) সুস্পষ্ট বর্ণনার বাইরের বিষয়গুলোও ইজতেহাদের মাধ্যমে জেনে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে ধর্মের পূর্ণতা অর্থ রসুল স. এর চূড়ান্ত মর্যাদা লাভ। যে মর্যাদা পূর্বাপর কারো পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাঁর স.এই পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভের কারণে আল্লাহ্‌পাক তাঁর উম্মতের সকল পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন। ক্ষমা করে দিবেন তাদের— ছোট-বড় সকল অপরাধ, রক্তপাত, জুলুম ইত্যাদি। কখনো শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করার পর, কখনো অনুতাপ জর্জরিত তওবার পর, আবার কখনো আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ ফজল বা অনুগ্রহের মাধ্যমে।

হজরত আব্বাস বিন মারদাস বর্ণনা করেছেন, আরাফার দিন বিকেলে রসুল স. তাঁর উম্মতের পাপ মার্জনার জন্য দোয়া করেছেন এবং তাঁর দোয়া গৃহীতও হয়েছে। দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আমি পারস্পরিক জুলুমকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রতিশোধ আমি অত্যাচারীর নিকট থেকে অবশ্যই গ্রহণ করবো। রসুল স. নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক, আপনি যদি ইচ্ছে করেন তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির অত্যাচারের বিনিময়ে তাকে জান্নাতের এক অংশ দিয়ে দিন এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করে

দিন। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না। পর দিন সকালে মুজদালিফায় তিনি স. পুনরায় একই প্রার্থনা জানালেন। তখন তাঁর দোয়া কবুল করে নেয়া হলো। তিনি স. মৃদু হাসলেন। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, আমরা আপনাকে প্রফুল্লচিত্ত দেখছি। আপনার পবিত্র মুখে লেগে রয়েছে নির্মল হাসির চিহ্ন। অনুগ্রহপূর্বক এর কারণ বর্ণনা করুন। রসুল স. বললেন, আমার দোয়া কবুল হয়েছে বুঝতে পেরে ইবলিস তার মাথায় মাটি মাখতে মাখতে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে। তার এই দিশেহারা অবস্থা দেখে আমি হেসে ফেলেছি। ইবনে মাজা, বায়হাকী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতের পর হালাল, হারাম, ফারায়েজ, সুনান, হুদুদ এবং অন্য কোনো বিধি বিধান সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। যদি সন্দেহ করা হয় যে, হজরত ইবনে আব্বাস তো এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, এরপর অবতীর্ণ হয়েছে সুদের আয়াত। তবে আমি তার উত্তরে বলবো, যদি বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েই যায়, তখন বুঝতে হবে, সুদ হারাম হওয়ার হুকুম যদিও এই আয়াতের আগে এসেছে কিন্তু তা অবতীর্ণ হয়েছে সুরা বাকারার শেষ আয়াতটি (২৭৫) অবতীর্ণ হওয়ার পর। হজরত জাবের কর্তৃক বিদায় হজ সম্পর্কিত বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, মূর্খতার যুগের সকল সুদকে রহিত করে দেয়া হলো এবং আমিই প্রথম আমার পিতৃব্য হজরত আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের সুদের দাবি পরিত্যাগ করলাম।

'দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম'— এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, কথাটির অর্থ আমি এখন তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। এবার কোনো মুশরিক তোমাদের সঙ্গে হজ করেনি। তিনি এ রকমও অর্থ করেছেন যে, সকল বাতিল ধর্মের উপর তোমার সত্য ধর্মকে আমি বিজয়ী করে দিলাম এবং শত্রু থেকে চিরনিরাপত্তা দান করলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিদায় হজের সময় আরাফা প্রান্তরে জুমার দিন আসরের নামাজের পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। রসুল স. ওই সময় তাঁর উষ্ট্রির উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। ওহীর (প্রত্যাদেশের) ভারে উষ্ট্রিটি তখন মাটিতে বসে পড়েছিলো। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, একবার এক ইহুদী হজরত ওমরকে বললো, হে মুসলমানদের নেতা! আপনাদের কিতাবে চরম সুসংবাদ সম্পর্কিত একটি আয়াত রয়েছে। ওই আয়াতটি যদি আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো, তবে আমরা অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদ হিসেবে মান্য করতাম। হজরত ওমর বললেন, কোন আয়াত? ইহুদী বললো, 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম।' হজরত ওমর বললেন, তোমরা জানো, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি কোন দিন ছিলো এবং অবতীর্ণ হওয়ার স্থানটি ছিলো কোথায়? আরাফা প্রান্তরে জুমআর দিবসে উষ্ট্রারোহী অবস্থায় রসুলুল্লাহ্ স. এর উপর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত ওমরের কথার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওই দিবসটি ছিলো দু'টি খুশীর দিবস—একটি জুমআর দিবস এবং অন্যটি আরাফার দিবস।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, অবতীর্ণ হওয়ার পর এই আয়াতের আবৃত্তি শুনে হজরত ওমর কেঁদে ফেললেন। রসুল স. বললেন, ওমর কাঁদছো কেনো? হজরত ওমর বললেন, হে প্রিয়তম রসুল! এই আয়াত আমাকে কাঁদিয়েছে। এতোদিন আমাদের দ্বীন ছিলো ক্রমঅগ্রসরমান উন্নতির দিকে। কিন্তু আজ পূর্ণতার ঘোষণা দেয়া হলো। তিনি স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের সংবাদ। তাই হয়েছিলো। এই ঘটনার একাশি দিন পর এগারো হিজরীর বারোই রবিউল আউয়াল সোমবারে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়ার পর শেষতম নবী রসুল মোহাম্মদ স. যাত্রা করেছিলেন তাঁর পরম প্রভু প্রতিপালকের সান্নিধ্যে।

'আর আমি তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিলাম আমার নেয়ামত রাশি।' আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত এই নেয়ামতের পূর্ণতা দু'ধরনের — (১). দ্বীনের পূর্ণতা (২) হেদায়েতের পূর্ণতা। বক্তব্য হচ্ছে, দ্যাখো আমার পরিপূর্ণ নেয়ামতের নিদর্শন— তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ। মক্কা বিজয়ও সংঘটিত হয়েছে। বিদূরিত হয়েছে মূর্খতার যুগের তমাসাবৃত নিশীথ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সার্বজনীন শান্তি। এখন নীরবে নির্বিঘ্নে একাকী হজ সমাধা করতে পারে যে কোনো ব্যক্তি।

'আর তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি দ্বীন ইসলাম', যা সকল ধর্মের উপর, মনোনীত একমাত্র ধর্ম।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন— আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, হজরত জিবরাইল আমার নিকট আল্লাহ্‌পাকের বার্তা পৌঁছিয়েছেন। ইসলাম একটি ধর্ম। আমি তা মনোনীত করেছি আমার নিজের জন্য। দানশীলতা ও উত্তম চরিত্র এই ধর্মের বিশেষত্ব। কাজেই যতোদিন এই ধর্মের বাহক থাকতে চাও, ততোদিন দানশীলতা ও উত্তম চরিত্রের দ্বারাই সম্মান বৃদ্ধি কোরো এই ধর্মের।

'অনন্তর যে ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে যাবে, পাপপ্রবণতা ব্যতীত।' এ আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে আলোচ্য নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর সাথে। মধ্যখানে এমন কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যেগুলো নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের থাকাই সঙ্গত। অর্থাৎ ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও পূর্ণতায় পর্যবসিত করা।

'মাখমাসাতুন' অর্থ শূন্য উদর। 'মুতাজানিফ' অর্থ আকৃষ্ট হওয়া। আয়াতের মর্ম হচ্ছে— যে ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে নিষিদ্ধ বস্তুগুলো ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। উপভোগের নিমিত্তে নয় বরং জীবন ধারণের তাগিদে। সীমাতিক্রম না করে যদি এমতাবস্থায় কেউ নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে নেয়—

'তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌পাক ক্ষমাশীল করুণাময়।' এ কথার অর্থ— তিনি ক্ষমা করে দিবেন স্বীয় করুণা বশে। বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সুরা বাকারায়।

হজরত আবু ওয়াকেদ লাইসি থেকে বাগবী লিখেছেন, এক লোক নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা কখনো কখনো এমন ভূখন্ডে গিয়ে উপস্থিত

হই, যেখানে পানাহারের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। তখন কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছলে আমাদের জন্য মৃত জন্তু হালাল হবে? তিনি স. বললেন, সকালে যদি তোমরা কোনো কিছু পান না করে থাকো, পর দিনও যদি কিছু পানাহারের ব্যবস্থা না করতে পারো এবং ভূমি খনন করেও যদি কোনো খাদ্যবস্তুর সন্ধান না পাও, তবে মৃত পশু ভক্ষণের অনুমতি পাবে। ওয়াল্লহু আলা'ম।

হজরত আবু রাফে থেকে তিবরানী, হাকেম ও বায়হাকী লিখেছেন, একবার হজরত জিবরাইল রসুল স. এর নিকট আগমন করে দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুল স. অনুমতি দিলেন, কিন্তু হজরত জিবরাইল দরবারে প্রবেশ করলেন না। রসুল স. তখন তাঁর পবিত্র শরীরে চাদর জড়িয়ে নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখলেন, হজরত জিবরাইল দরজার পাশে দণ্ডায়মান। রসুল স. বললেন, আমি তো আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছি। হজরত জিবরাইল বললেন, আমি তো ওই ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে জীবন্ত কোনো কিছুর প্রতিকৃতি অথবা সারমেয় থাকে। এ ঘটনার পর তিনি স. হজরত আবু রাফেকে নির্দেশ দিলেন মদীনার সকল কুকুর নিধন করো। একটিও যেনো অবশিষ্ট না থাকে। এমন সময় কিছুসংখ্যক লোক উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ ধরনের জন্তুগুলোর মধ্যে কোন কোন জন্তু আমাদের জন্য হালাল। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

❐ লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কী কী বৈধ করা হইয়াছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে এবং শিকারী পশু-পক্ষী যাহাদিগকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়াছ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, উহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে আল্লাহের নাম লইবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, রসুল স. যখন হজরত আবু রাফেকে কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি মদীনা শহরের সকল কুকুরকে হত্যা করতে করতে শহরের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌছলেন। হজরত আসেম বিন আদী, হজরত সা'দ বিন হাতাম, হজরত উয়াইমির বিন সায়েদা প্রমুখ

সাহাবী রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আমাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? তখন অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত। হজরত মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স. যখন কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন তখন লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোন ধরনের শিকারী কুকুর রাখা আমাদের জন্য হালাল? হজরত আদী বিন হাতেম থেকে শা'বীর মাধ্যমে ইবনে জারীর আরো লিখেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, কুকুরের মাধ্যমে শিকার করা যাবে কি না? তিনি স. নিশ্চুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এ আয়াত।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, হজরত আদী বিন হাতেম তা'ঈ এবং হজরত জায়েদ বিন মুহাল তা'ঈ রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা কুকুর এবং বাজপাখি দ্বারা শিকার করে থাকি। আর জরীহ্ গোত্রের কুকুর নীল গাই ও হরিণ শিকার করে আনে। আল্লাহ্‌পাক আমাদের জন্য মৃত জন্তু ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন, এখন তাহলে আমাদের জন্য কোন ধরনের শিকার হালাল? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত। এখানে এমতো প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশ্য এই কথা বলা যে, ককুর দ্বারা আমরা কোন প্রকার উপকার লাভ করতে পারি এবং কুকুরের শিকার করা কোন প্রকার জন্তু খেতে পারি। এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে, 'লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী বৈধ করা হয়েছে?' পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'বলো, সমস্ত ভালো জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।' এ কথায় বুঝা যায়, পবিত্র বস্তুগুলোকেই আল্লাহ্‌পাক হালাল করে দিয়েছেন আর নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন অপবিত্র বস্তুগুলোকে।

'ওয়ামা আল্লামতুম মিনাল জাওয়ারিহি' (এবং শিকারী পশু-পক্ষী যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছো)। এখানে 'আলজাওয়ারিহি' অর্থ শিকারী পশু অথবা পাখি। যেমন কুকুর, চিতা, বাজ, শুকরা (বাজী ধরার জন্য একপ্রকার শিকারী পাখি), শাহীন এবং শাদা বর্ণের শিকারী পাখি ইত্যাদি।

'জুরুহ্' অর্থ রোজগার করা। যেমন, 'ফুলানুন জারিহাতুন আহ্লাহু' অর্থ অমুক ব্যক্তি তার গৃহবাসীদের জন্য উপার্জন করে। মানুষ হাত-পায়ের মাধ্যমে কাজ করে উপার্জন করে তাই মানুষকে বলা হয় জাওয়ারীহ্। শিকারী পশু-পাখিরাও তেমনি তাদের মালিকের জন্য শিকার করে থাকে। তাই সেগুলোকেও এখানে জাওয়ারেহ্ বলা হয়েছে। অথবা জুরুহ্ অর্থ জখম করা। শিকারী প্রাণীরা শিকারকে জখম করে থাকে। তাই সেগুলোকে বলা হয়েছে জাওয়ারীহ্। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটির দিকে লক্ষ্য করে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ এবং অধিকাংশ আলেম বলেছেন, শিকারকে জখম করা শিকারীর জন্য জরুরী। যদি কোনো শিকারী প্রাণী শিকারকে হত্যা না করে গলা চেপে ধরে মেরে ফেলে, তবে তা হবে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা জন্তুর মতো—যা ভক্ষণ করা হারাম। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শিকারী কর্তৃক শিকারকে জখম করা জরুরী নয়। তাই তাঁর মতে জখম ছাড়াই যদি কোনো

শিকার শিকারীর আক্রমণে মারা যায়, তবে তা হালাল হবে। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, বর্ণিত ব্যাখ্যা দু'টোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি 'জুরুহ্' অর্থ উপার্জন ধরে নেয়া হয় অথবা এর অর্থ জখম করা ধরা হয়, তবে সকল অবস্থায় জখমের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী হবে। কেফায়া গ্রন্থে ফখরুল ইসলাম বায়যাবী উল্লেখ করেছেন, যদি 'না' সূচক নির্দেশের মধ্যে উপকার গ্রহণের ব্যাপারে মতোবিরোধ দৃষ্ট হয় এবং ঐকমত্য সম্ভব না হয়, তবে যে কোনো একটি অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। আর যদি উপকার গ্রহণের ব্যাপারে কোনো মতোবিরোধ দৃষ্ট না হয়, তবে সবকিছুই গ্রহণ করা যাবে।

একটি সন্দেহঃ এখানে উপার্জন এবং জখম দু'টোকে সাধারণভাবে একাকার করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইমামে আজম এ রকম সাধারণ অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতি নন কেনো?

সন্দেহের অপনোদনঃ সাধারণভাবে বহু অর্থ বিশিষ্ট শব্দ বক্তার উভয় প্রকার বক্তব্যকেই প্রকাশ করে যেনো শ্রোতাও নিশ্চিত বুঝতে পারে যে, দু'টো অর্থই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে দু'রকম অর্থ সম্পন্ন বাক্য বলা এবং শোনাকেই বহু অর্থ বিশিষ্ট বাক্য ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, জাওয়ারীহ্ শব্দটির আসল অর্থ কোনটি। সুতরাং এখানে উপার্জন ও জখম দু'টো অর্থকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা কেবল এখানে সতর্কতার দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছি। বলেছি, জখম জরুরী। অর্থাৎ শিকার হালাল হওয়ার জন্য জবেহ অথবা নহর জরুরী হবে। কিন্তু যেখানে এ রকম করা সম্ভব হবে না, সেখানে কোনো অস্ত্র দ্বারা শিকারের শরীরের যে কোনো স্থানে জখম করতেই হবে। যদি শিকারী জানোয়ার তার শিকারের কোনো অঙ্গকে ছিঁড়ে ফেলার পর তার মৃত্যু হয়, তবে তা হালাল হবে—এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম আবু হানিফার মত এ রকম। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে তাঁর অভিমত হচ্ছে, এ রকম অঙ্গহীন শিকার মৃত জন্তু তুল্য— যা হারাম। এখানে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু অঙ্গহানি করে রক্তপ্রবাহ করা ঠিক হয়নি। তাই এখানে অঙ্গহানিকেই প্রধান বিবেচ্য বিষয় ধরে নিয়ে মৃত জন্তুটিকে মনে করতে হবে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা জন্তু। রসুল স. বলেছেন, অস্ত্র দ্বারা রক্ত প্রবাহ করা হলে এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে।

তীর দ্বারা শিকার করার ক্ষেত্রে জখম হওয়া জরুরী। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। হজরত আদী বিন হাতেম বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি চেপটা তীর দ্বারা শিকার করি। তিনি স. বললেন, তীর যদি শিকারের শরীরে প্রবেশ করে এবং শিকারের শরীর কেটে যায় তবে সেটিকে খেতে পারবে। আর যদি তীরের চেপটা অংশের আঘাতে শিকারটি মরে যায় তবে সেটিকে খেতে পারবে না (তখন তা হবে প্রহারে মৃত জন্তু তুল্য—যা হারাম)। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ সকল প্রকার শিকারী জানোয়ার দ্বারা শিকার করা সিদ্ধ। ইমাম আবু ইউসুফ বাঘ এবং বাঘের মতো হিংস্রপ্রাণীকে শিকারী বলে গণ্য করেননি।

কেউ কেউ চিলকেও শিকারী বলেন না। আর শুকর দ্বারা শিকার করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। কেননা, শুকর অস্তিত্বগতভাবে অপবিত্র। সুতরাং শুকরের মাধ্যমে কোনো প্রকার উপকার গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

আমি বলি— বাঘ, হিংস্রপ্রাণী এবং চিলকে শিকারী গণ্য না করার কোনো কারণ নেই। এগুলোকেও শিকারের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে তবে এমনিতেই সেগুলো শিকারীর তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, ঘোর কালো কুকুরের শিকার হালাল নয়। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল বলেছেন, রসুল স. বলেন, উম্মতের অন্য পশুর মতো কুকুর যদি একটি উম্মত না হতো, তবে আমি সেগুলোকে মেরে ফেলার ঢালাও নির্দেশ দিতাম। এখন থেকে এতোটুকুই বলি, তোমরা ঘোর কালো কুকুরকে হত্যা করে ফেলো। আবু দাউদ, তিরমজি, দারেমী। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর সেই নির্দেশটি স্থগিত করেছেন এবং বলেছেন— দুই ভ্রূতে বিশেষ চিহ্নবিশিষ্ট কালো কুকুরকে হত্যা করে ফেলো। নিশ্চয়ই ওগুলো শয়তান। কিন্তু আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করে জমহুর বলেছেন, সকল প্রকার কুকুরের শিকার হালাল।

'মুকাল্লাবিন' অর্থ শিকারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যে ব্যক্তি কুকুরকে শিকার শিক্ষা দেয়, তাকে বলে মুকাল্লাব। শব্দটি এসেছে 'কালবুন' থেকে। কুকুর প্রভুভক্ত প্রাণী। তাই 'কালবুন' শব্দটি 'তাকলিবুন' ক্রিয়ামূল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ কুকুরকে শিকার শিক্ষা দেয়া। পরবর্তীতে সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, সকল প্রকার হিংস্র প্রাণীই 'কালবুন।' তাই শব্দটি সকল হিংস্রপ্রাণীকে শিকার শিক্ষা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে— প্রতিটি চিৎকার প্রবণ হিংস্র প্রাণীকে কালবুন বলা হয়।

উত্‌বা বিন আবু লাহাব রসুল স.কে গাল মন্দ করতো। রসুল স. তার জন্য বদদোয়া করলেন। হে আমার আল্লাহ্, তোমার কুকুরগুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি কুকুরকে (যে কোনো হিংস্র প্রাণীকে) তার উপর চড়াও করে দাও। উত্‌বা একবার সফরের উদ্দেশ্যে শাম দেশের দিকে যাত্রা করলো। মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েই সে তার সাথীদেরকে বললো, আমি মোহাম্মদের বদদোয়াকে ভয় করি (তোমরা আমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে সতর্ক থেকো)। সাথীরা তাদের সকল অস্ত্র শস্ত্রসহ সব সময় উত্‌বাকে পাহারা দিতে শুরু করলো। কিন্তু তাদের সতর্ক প্রহরাতেও কোনো কাজ হলো না। একদিন হঠাৎ একটি বাঘ এসে উতবাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে হজরত আবু আকরাবের মাধ্যমে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ বিশুদ্ধ।

'তুআল্লিমুনা হুন্না মিম্মা আল্লামাকুমুল্লহ্' — অর্থ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ কথায় বুঝা যায়, সকল জ্ঞানের মতো শিকার করার জ্ঞানও আল্লাহ্পাকই দিয়েছেন। সেই জ্ঞানানুযায়ী শিকারী জন্তুকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিকারী জন্তুর উপরে থাকতে হবে তার মালিকের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ। মালিক বাধা

দিলে থেমে যাওয়া, ডাকলে ফিরে আসা, শিকারকে আটকে রাখা, শিকারকে নিজে ভক্ষণ না করা—এ সকল কিছু যাতে শিকারী জন্তু যথাযথভাবে মান্য করে, সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। যে শিকারী জন্তু তার মালিকের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণকে যথানিয়মে মান্য করে চলে সেই শিকারীকেই সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী বলে মনে করা যেতে পারে।

আল্লাহ্‌পাকই একমাত্র জ্ঞানদাতা। এলমে তাসাব্বুরি, এলমে তাসদিকি, এলমে বদহি, এলমে নজরি—এ সকল জ্ঞান তিনিই এল্‌কা করে থাকেন। চিন্তা ভাবনা জ্ঞানার্জনের মূল কারণ নয়। মূল কারণ হচ্ছে, এলকা হওয়া। ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোনো বিষয়ে চিন্তা ভাবনার পর আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এলকার সাহায্য ছাড়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞানের স্তরান্তর ও ক্রমবিকাশ আল্লাহ্‌তায়ালার অদৃশ্য সাহায্যের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে চলে। তাই এ কথাটি অবশ্য মান্য যে, আল্লাহ্‌পাকই জ্ঞান দাতা।

কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার নিয়মপদ্ধতি আল্লাহ্‌পাক কোরআনে উল্লেখ করেননি। হাদিস শরীফের মাধ্যমেও এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। বিষয়টি শরিয়তের জ্ঞানের মধ্যেও পড়ে না। কিন্তু এ কথাটি অবশ্য স্বীকার্য যে, আল্লাহ্‌পাকই সকল জ্ঞানের অধিকারী। তিনি না দিলে কোনো জ্ঞানই অর্জন করা সম্ভব নয়। সে জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমেই হোক অথবা শ্রুতির মাধ্যমে হোক। পরীক্ষা নিরীক্ষা, অনুমান, উপমা, অনুসন্ধিৎসা, যুক্তিপ্রমাণ—এ সকল কিছু জ্ঞানের উপকরণ, কারণ অথবা মাধ্যম—প্রকৃত জ্ঞান নয়। চেতন, অবচেতন, অধিচেতন–যে কোনো অবস্থায় জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা হোক না কেনো, আল্লাহ্‌পাক দান না করা পর্যন্ত নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না। মনীষা, অন্তর্দৃষ্টি, সজ্ঞা, আত্মবিনাশন— এ সকল কিছু জ্ঞানার্জনের মোক্ষম উপকরণ মাত্র, যেগুলোর মাধ্যমে অভিজ্ঞানের অসীম আকাশে উড়াল দেয়া যায় কিংবা ডুব দেয়া যায় প্রজ্ঞার অতলস্পর্শী জলধির অন্তর্তরঙ্গে। কিন্তু প্রাপ্তির নিশ্চিতি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টি এক প্রকার সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। এ জ্ঞান আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। এর সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানও আল্লাহ্‌ই দিয়ে থাকেন।

'ফাকুলু মিম্মা আমসাকনা আলাইকুম' (তারা যা তোমাদের জন্য ধরে তা ভক্ষণ করবে) —এ কথার অর্থ তোমরা ওই শিকার ভক্ষণ করতে পারো, যাকে তোমাদের শিকারী পশু ধরেছে। কিন্তু নিজে ভক্ষণ করেনি। এই ব্যাখ্যাটি সংকলিত হয়েছে হজরত আদী বিন হাতেম থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যদি তোমরা বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে তোমাদের শিকারী কুকুরকে ছাড়ার পর সে কোনো শিকারকে জীবিত পাকড়াও করে তবে তোমরা সেটিকে জবাই করে খেতে পারবে। যদি শিকারী কুকুর সেটিকে হত্যা করে নিজে কোনো অংশ ভক্ষণ না করে, তবে ওই শিকারকেও তোমরা খেতে পারবে। আর যদি কুকুর তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তোমরা সেটিকে খেয়ো না। তখন বুঝতে হবে কুকুর নিজে খাওয়ার জন্য শিকারটিকে ধরেছে। বোখারী, মুসলিম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. বলেন, কুকুর ও বাজপাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহ্‌র নামে সেগুলোকে তোমরা শিকারের জন্য ছেড়েছো। তাই

তাদের পাকড়াও করা শিকার তোমরা ভক্ষণ করতে পারবে। হজরত আদী বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি তারা শিকারকে হত্যা করে ফেলে। তিনি স. বললেন, হত্যা করে ফেললেও। তবে শর্ত হচ্ছে শিকারীর কোনো অংশ যেনো তারা না খায়। যদি খায় তবে তোমরা খেয়ো না। কারণ, ওই শিকার তারা নিজেদের জন্য ধরেছে। আবু দাউদ ও বায়হাকী এ বর্ণনাটি এনেছেন মোজলেদ থেকে। মোজলেদ বর্ণনা করেছেন শা'বী থেকে। বায়হাকী লিখেছেন, মোজলেদের বর্ণনায় রয়েছে কেবল বাজপাখির কথা। অন্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় রয়েছে কেবল কুকুরের কথা। বাজপাখির কথা সেগুলোতে নেই। হজরত আদী বর্ণিত হাদিসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শিকারী পশুপাখি যদি শিকার করা পশুর কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে ওই শিকার ভক্ষণ হালাল হবে না।

ইমাম আহমদও এই বক্তব্যটির সমর্থক। ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে বিশুদ্ধতর বর্ণনাটি এই বক্তব্যটির অনুরূপ। বাগবী লিখেছেন— আতা, তাউস, শা'বী, সাওরী এবং ইবনে মোবারকও এ রকম বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এ রকম বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণ লিখেছেন, শিকারী কুকুরকে পর পর তিনবার শিকারের জন্য ছাড়তে হবে। তিন বারই যদি সে শিকারকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ না করে, তবে তাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলা যাবে। ওই কুকুর দ্বারা চতুর্থবার শিকার ধরে খাওয়া জায়েয হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, ইমামে আজম তৃতীয়বার ধৃত শিকার খাওয়াকেই জায়েয বলেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, শিকারী কুকুর যদি শিকারের গোশত খেয়েও ফেলে, তবুও তা হালাল। এক বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর, হজরত সালমান ফারসী এবং হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের অভিমতও এ রকম ছিলো। হজরত আমর বিন শোয়াইবের পিতামহের বর্ণনায় রয়েছে, আবু ছা'লাবা নামক এক ব্যক্তি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর রয়েছে। সেটিকে দিয়ে আমি শিকার করাই। রসুল স. বললেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার খেতে পারো। আবু ছা'লাবা বললেন, জবাই করে, না, না জবাই করে? তিনি স. বললেন, যেভাবে খুশী। আবু ছা'লাবা বললেন, যদি কুকুর তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে? তিনি স. বললেন, তবুও। আবু দাউদ।

আমি বলি, বায়হাকী হাদিসটিকে মোয়াল্লাল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং হজরত আদী বিন হাতেমের হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও একমত হয়েছেন। হজরত আদী এবং মোজলেদের বর্ণনা অনুসারে যে সকল শর্ত শিকারী জন্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সে সকল শর্তই প্রযোজ্য হবে শিকারী পাখিদের বেলায়। কোনো কোনো ফিকাহ্বিশারদগণের মাসআলা এ রকমই। ইমাম আবু হানিফার নিকট শিকারী জন্তু কর্তৃক শিকারের গোশত ভক্ষণ করা না করার প্রসঙ্গটি শিকারী পাখির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, শিকারী পাখি আঘাত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু হিংস্র চতুষ্পদ জন্তু আঘাত সহ্য করতে পারে। আবদ বিন হুমাইদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— যদি কুকুর তার শিকারকৃত প্রাণীর কিছু অংশ

খেয়ে ফেলে, তবে তোমরা ওই শিকার খেয়ো না। কিন্তু শুকরা পাখি যদি তার শিকারকৃত প্রাণীর কিছু অংশ খায়, তবে তার বাকী অংশ খাওয়া যাবে। কারণ এই যে, কুকুর আঘাত সহ্য করতে পারে। কিন্তু শুকরা পাখি পারে না।

এই সিদ্ধান্তটির মধ্যে এ রকম সন্দেহ অনুচিৎ যে, কোরআন ও হাদিসের বিপরীতে এটি একটি কিয়াসী দলিল যা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, কোরআনের মধ্যে এমন কোনো শব্দ নেই যদ্বারা শিকারী জন্তু কর্তৃক শিকারভূত জন্তুর গোশত খাওয়া নিষেধ বুঝা যায়। বরং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা যা তোমাদের জন্য ধরে তা ভক্ষণ করবে'। এখানে শিকারের কিছু অংশ না খাওয়ার কোনো উল্লেখই নেই। অবশ্য হাদিস শরীফের মাধ্যমে এ রকম শর্তের কথা বলা হয়েছে। আর মোজলেদের একক বর্ণনাটির মধ্যে এসেছে বাজ পাখির কথা— যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তা হাদিস ও কিয়াসের বিরুদ্ধে।

'ওয়াজকুরুস্ মাল্লহি আলাইহি' (এতে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে) —এ কথার অর্থ তোমরা যখন শিকারী জানোয়ারকে শিকারের জন্য ছাড়বে তখন বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে নেবে। অতএব কুকুর, বাজপাখি, ইত্যাদি শিকারের জন্য ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া জরুরী। ঠিক তেমনি তীর নিক্ষেপের সময়ও বিসমিল্লাহ্ পড়া জরুরী— যেমন জবাই করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া জরুরী। জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হয় ছুরি বা যে কোনো ধারালো অস্ত্র ধরে। আর শিকারের সময় করতে হয় তীর বা শিকারী জন্তু ছেড়ে। এইভাবে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হবে প্রতি জবাইয়ের এবং প্রতি শিকারের প্রাক্কালে। যদি কোনো ছাগলকে শোয়ানো অবস্থায় বিস্‌মিল্লাহ্ বলে জবাই করতে গিয়েও জবাই না করে, ওই বিস্‌মিল্লাহ্‌র মাধ্যমে যদি অন্য কোনো ছাগল জবাই করে, তবে তা নাজায়েয হবে। কিন্তু কোনো পাখিকে শিকারের উদ্দেশ্যে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তীর ছুড়লে যদি ওই তীর বিদ্ধ হয়ে অন্য পাখি মারা যায় তবে তা হালাল হবে। যদি কোনো বকরীকে শুইয়ে একটি ছুরি হাতে নিয়ে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে জবাই করতে গিয়েও জবাই না করে হাতের ছুরি ফেলে দেয় এবং অন্য একটি ছুরি হাতে নিয়ে জবাই করে তবে তা হালাল হবে। যদি একটি তীর ছোঁড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে, তারপর ওই তীর না ছুঁড়ে যদি অন্য একটি তীর ছোঁড়ে তবে দ্বিতীয় তীরবিদ্ধ শিকার হালাল হবে না। বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হয় জবাই করার সময়। শিকারের ক্ষেত্রে এ রকম সম্ভব নয় বলে, শিকারী জন্তু ছাড়ার সময় অথবা তীর নিক্ষেপের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়লেই যথেষ্ট হবে। এভাবে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে শিকারী জন্তু এবং তীর ছাড়ার পর যদি শিকার জীবিত অবস্থায় হাতে এসে পড়ে, তবে পুনরায় সেটিকে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে জবাই করা ওয়াজিব হবে। পুনঃ জবাই না করলে ওই শিকার হালাল হবে না। ধৃত শিকার মৃতপ্রায় হলেও জবাই করতে হবে। এ রকম অবস্থায় জবাই না করলে এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে— হালাল নয়। দ্বিতীয় বর্ণনানুসারে হালাল। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, জবাই করা সম্ভব অথচ জবাইয়ের অস্ত্র হাতের কাছে না থাকার কারণে যদি জবাই না করতে পারে, তবে তা হালাল হবে না। আর যদি জবাই করা সময় না পাওয়া যায় তবে তা হালাল হবে। ইমাম আবু হানিফাও এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন এর বিপরীত।

মাসআলাঃ শিকারী জন্তু অথবা তীর ছোঁড়ার সময় যদি স্বেচ্ছায় বিস্‌মিল্লাহ্ ছেড়ে দেয়, জবাই করার সময় ইচ্ছে করে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ না করে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সঙ্গে যদি অপ্রশিক্ষিত কুকুর অথবা অগ্নিপূজকদের কুকুর কিংবা বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ ছাড়া ছেড়ে দেয়া কুকুর একত্রিত হয়, তবে ওই শিকার খাওয়া হালাল নয়। কারণ, শিকার হালাল হওয়ার জন্য আয়াতে যে শর্তগুলো এসেছে সেগুলো এক্ষেত্রে লংঘিত হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, 'ওয়ালা তাকুলু মিম্মা লাম ইয়াজকুরিস্‌মাল্লহ্' (যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করা হয়নি তাকে ভক্ষণ কোরো না)। হজরত আদী বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আমার কুকুর ছেড়ে দেই। তখন কখনো কখনো অন্যের কুকুর মিলিত হয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রসুল স. বললেন, এভাবে শিকার করলে খেয়ো না। কেননা, তুমি তোমার কুকুর ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছো ঠিকই কিন্তু তুমি তো অন্যের কুকুরের বেলায় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়োনি। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আদী আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাকে বলেছেন, তুমি তোমার কুকুর ছাড়ার সময় আল্লাহ্‌র নাম নাও। এরপর তোমার কুকুর যদি কোনো শিকারকে জীবন্ত ধরে ফেলে, তবে তুমি সেটিকে জবাই করে খেতে পারবে। আর শিকারকে যদি এমনভাবে মৃত অবস্থায় পাও যে, কুকুর তার কোনো অংশ খায়নি— তবুও তুমি সেই শিকার খেতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ হাদিস শরীফের মাধ্যমে এই নির্দেশগুলো এসেছে যে— শিকারী কুকুর তার শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেললে ওই শিকার তোমরা খেয়ো না। কেননা, বুঝতে হবে শিকারী জন্তু ওই শিকার ধরেছে তার নিজের জন্য। তোমাদের বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে ছেড়ে দেয়া কুকুরের সঙ্গে যদি অন্য কুকুর মিলিত হয়ে কোনো শিকারকে হত্যা করে, তবে সেই শিকার তোমরা খেয়ো না। কারণ, তোমরা এ কথা জানো না যে, কোন কুকুরটি হত্যাকারী। আর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে তীর ছোঁড়ার পর তীরবিদ্ধ শিকার একদিন পর মৃত অবস্থায় হস্তগত হলে যদি তাতে তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোনো চিহ্ন নেই দেখতে পাও, তবে তা খেতে পারবে।

আর যদি তুমি শিকারকে পাও পানিতে ডুবন্ত অবস্থায়, তবে খেয়ো না। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে যে শিকার হস্তগত করেছো, সেই শিকার খেতে পারবে। বিস্‌মিল্লাহ্ বলে প্রশিক্ষিত কুকুরের মাধ্যমে যে শিকার পাবে তাকেও খেতে পারবে। আর প্রশিক্ষিত কুকুরের মাধ্যমে জীবিত শিকার পেলেও তা জবাই করে খেতে পারবে। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না—এ রকম বলেছেন, ইমাম আহমদ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হালাল হবে। ইমাম মালেকও এ রকম বলেছেন। মালেকিয়া নামক গ্রন্থেও এ রকম বলা হয়েছে। ইমাম আহমদের একটি অভিমতও অনুরূপ। তাঁর দ্বিতীয় অভিমতটি এ রকম— জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে

হালাল হবে; কিন্তু শিকারী জন্তু ছাড়ার সময় এবং তীর নিক্ষেপের সময় ভুলে গেলে হবে হারাম। তাঁর তৃতীয় অভিমত হচ্ছে—তীর নিক্ষেপের সময় বিস্মিল্লাহ্ পড়ার কথা ভুলে গেলে শিকার হালাল হবে। কিন্তু কুকুর ও চিতা ছাড়ার সময় ভুলে গেলে হারাম হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সকল অবস্থায় বিস্মিল্লাহ্ পাঠের কথা ভুলে গেলে হালাল হবে। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এ রকম। আবুল কাশেম মালেকীও এ রকম বলেছেন। যদি বিস্মিল্লাহ্ ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করে অথবা পড়তে ভুলে গিয়ে থাকে—জবাইয়ের সময় হোক অথবা কুকুর ও তীর ছাড়ার সময়— কিন্তু কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। প্রশিক্ষণদাতা মুসলমান হোক অথবা কিতাবী— যদি অপ্রশিক্ষিত কুকুর হয় কিংবা অগ্নিউপাসকের কুকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিকার করে তবে সে শিকার হারাম হবে।

সাধারণ নিয়ম এই যে, বিস্মিল্লাহ্ না পড়লে জবাই বা শিকার হালাল হয় না। হজরত আয়েশার হাদিসে রয়েছে, কতিপয় লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! কেউ কেউ আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানিনা যে, জবাই করার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলা হয়েছিলো কিনা। তিনি স. বললেন, তোমরা বিস্মিল্লাহ পড়ে খেয়ে নিও। হজরত আয়েশা বলেছেন, মূর্খতার যুগ দেখছি এখনো যায় নি। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে রয়েছে, এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের কেউ কেউ জবাই করার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলতে ভুলে যায়। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র নাম প্রত্যেক মুসলমানের মনে থাকে। দারা কুতনী।

হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে ভুলে যায়, তবে পরে পাঠ করে নিবে এবং বিসমিল্লাহ্ বলে খেয়ে নিবে। দারা কুতনী। হজরত সলত্ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, মুসলমানের জবাই হালাল। বিসমিল্লাহ্ বলুক কিংবা নাই বলুক। আবু দাউদ এই হাদিসটি তার মারাসিল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। বায়হাকী এ হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে লিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদিসটির সূত্র পরম্পরায় দুর্বলতা রয়েছে। বিশুদ্ধ কথা এই যে, হাদিসটি আসলে হজরত ইবনে আব্বাসের নিজস্ব মতামত।

বর্ণিত হাদিসগুলো পর্যালোচনান্তে বলা যেতে পারে যে, প্রথমোক্ত হাদিসে বিসমিল্লাহ্ পাঠের কথা বলাই হয়নি। দ্বিতীয় হাদিসের সূত্রসংযুক্ত মারওয়ান বিন সালেম সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। নাসাঈ এবং দারাকুতনীও তাকে পরিত্যক্ত বলেছেন। তৃতীয় হাদিসের এক বর্ণনাকারী মা'কাল অখ্যাত।

চতুর্থ বর্ণনাটি মুরসাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদিসে ভুলে বিস্মিল্লাহ্ বাদ পড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। সুতরাং তা ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সহায়ক নয়। চতুর্থ হাদিসে ভুলে বিসমিল্লাহ্ বাদ পড়ার জন্য হালাল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্ ছেড়ে দিলে হালাল হবে— এ

রকম কথা ঐকমত্যবিরোধী। আর ইমাম শাফেয়ীর পক্ষ থেকেও এ রকম বলা হয়নি। ভুলে বিসমিল্লাহ্ বাদ পড়ে গেলে হালাল হবে কিনা সে সম্পর্কে সলফে সালেহীনের মধ্যেই মতবিরোধ ছিলো। ভুলবশতঃ বাদ পড়ে গেলেও হারাম হবে— এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে ওমর। আর হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আলী বলেছেন, হালাল হবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্ পরিত্যাগ করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এক্ষেত্রে ইজতেহাদের কোনো সুযোগ নেই। আর যদি বিচারক (কাযী) এ ধরনের জবাইকৃত পশু বিক্রয়কে জায়েয বলে, তবে তার অভিমত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এই অভিমত ঐকমত্যের বিরুদ্ধে।

মাসআলাঃ গৃহপালিত পশুকে জবাই করা জরুরী। জঙ্গলের উট, গাই ইত্যাদিকে জখম করে দিলেই চলবে। যে বকরী উদভ্রান্ত হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়, তাকেও জখম করে দিলে হালাল হবে। আর উদভ্রান্ত বকরী যদি জঙ্গলে না গিয়ে লোকালয়ে বিচরণ করে, তবে তাকে জবাই করা জরুরী হবে। অর্থাৎ আওতার বাইরে চলে গেলে জখম এবং আওতার মধ্যে থাকলে জবাই—এই নিয়মই সকলক্ষেত্রে প্রতিপালনীয়। তাই জঙ্গল থেকে ধরে আনার পর কোনো পশু গৃহপালিত পশুর মতো হয়ে গেলে সেটিকেও করতে হবে জবাই। কারণ তা আওতার মধ্যে চলে এসেছে। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, কোনো চতুষ্পদ জন্তু কুয়ার মধ্যে পড়ে গেলে সেটিকে জবাই করা যদি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তবে জখম করে দেয়া যাবে। ইমাম মালেক বলেছেন, গৃহপালিত পশুকে নিয়মানুযায়ী জবাই করতে হবে অর্থাৎ তার খাদ্যনালী ও রক্তনালী কর্তন করতে হবে। এ রকম না করলে ওই পশু পালিয়ে গিয়ে অরণ্যবাসী হয়ে যেতে পারে। তখন তাকে ধরা বা জখম করাও সহজ হবে না।

হজরত রাফে বিন খাদিজের হাদিসটি আমাদের অভিমতের দলিল, যেখানে বলা হয়েছে আমরা গণিমতের মাল হিসেবে কয়েকটি উট পেলাম। ওগুলোর মধ্যে একটি জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। তখন এক ব্যক্তি সেটিকে তীর মেরে থামিয়ে দিলো। রসুল স. বললেন, এ ধরনের উটের মধ্যে কিছু জংলী উটও থাকে। সুতরাং জংলী উটের মতই দূর থেকে সেগুলোকে জখম করা যাবে। বোখারী, মুসলিম। আবুল আশয়ার বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল, হলক এবং লুব্বা কর্তন ছাড়া কি অন্য উপায়ে জবাই করা যায় না? তিনি স. বললেন, উরুদেশে বল্লম বিদ্ধ করলেই যথেষ্ট হবে। আহমদ, সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়, দারেমী। আবু দাউদ বলেছেন, উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া পশুকেও এভাবে বল্লম বিদ্ধ করা যাবে। তিরমিজি লিখেছেন, জরুরী কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে এ রকম করা যায়। মসনদে আবুল আশয়ারের মধ্যে হাফেজ আবু মুসা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেন, যদি তোমরা তার রান, বাহু অথবা বগলে বল্লম বিদ্ধ করো এবং আল্লাহ্‌র নাম নাও তবে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, এক উট কুয়ার মধ্যে পড়ে গেলো। তখন তার বগলে বল্লম বিদ্ধ করে দেয়া হলো। হজরত ইবনে ওমরকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

মাসআলাঃ তীরবিদ্ধ শিকারের কোনো অঙ্গ যদি পৃথক হয়ে যায় তবে তা খাওয়া হালাল হবে। কিন্তু কর্তিত অংশটি খাওয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মূল এবং কর্তিত উভয় অংশই খাওয়া হালাল— তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে শিকার যদি মরেও যায়। কেননা ওই শিকার আওতাভূত ছিলো না বলে দূর থেকে তাকে জখম করতে হয়েছে। শিকারটি যেহেতু হালাল তাই তার মূল এবং কর্তিত অংশ দু'টোই হালাল। কিন্তু আমাদের অভিমতটিই পুরোপুরি হাদিসসম্মত। রসুল স. বলেছেন, জীবিত পশু থেকে যে অংশ পৃথক হয়ে যায় তা মৃত বা মরা— যা হালাল নয়।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্কে ভয় করার কথা বলে তিনি যে সত্ত্বর সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ওয়াত্তাকুল্লহা ইন্নাল্লহা সারিউল হিসাব (আল্লাহ্কে ভয় করো, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

❒ আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হইল, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের খাদ্য দ্রব্য তাহাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের মোহর প্রদান কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপ-পত্নী গ্রহণের জন্য নহে। কেহ ইমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

'তইয়েবাত' অর্থ পবিত্র। আয়াতের শুরুতেই উহিল্লা লাকুমুত তইয়েবাত বলে পবিত্র বা ভালো ভালো বস্তু হালাল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই ঘোষণা কার্যকর থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কারণ দ্বীন এখন পূর্ণ। ইতোপূর্বে এ কথা বলাও হয়েছে (আয়াত-৩)। পূর্ণতার সঙ্গে সংযোজন বা বিয়োজনের কোনো সুযোগ নেই। তাই এখানে বলা হলো, আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো ভালো জিনিস

বৈধ করা হলো। এ কথার অর্থ এই বৈধতা আর কখনও রহিত হবে না। এখন কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। এই সুস্পষ্ট বিধিবিধানের বাইরে যদি কিছু পড়ে তবে তার হুকুম সম্পর্কে কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ প্রকৃত কথা এই যে, কোরআনের বক্তব্যই মূল বক্তব্য। আর হাদিস ওই বক্তব্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এর বাইরে কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে দেখতে হবে কোরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কিত কোনো মূলনীতি বা কারণের উল্লেখ রয়েছে কিনা। যদি থাকে তবে সেই নীতিমালার আলোকেই নতুন সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে হবে। যদি কোরআন ও হাদিসে সে রকম কিছু না পাওয়া যায়, তবে মুজতাহিদ ইমামগণ কোরআন ও হাদিসের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার আলোকে অভিনিবেশী গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করবেন। অবশেষে সে সিদ্ধান্তটি তাঁরা দাঁড় করাবেন কোরআন ও হাদিসের মূল মর্মের অনুকূলে কিয়াসরূপে। এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উসুলে ফিকাহের গ্রন্থগুলোতে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এখন থেকে কোরআন ও হাদিসের যেগুলোকে তইয়েবাত (পবিত্র) বলা হয়েছে সেগুলোই পবিত্র। আর যেগুলোকে 'খাবাসাত' (অপবিত্র) বলা হয়েছে সেগুলোই অপবিত্র। যেমন এহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম। কোরআনে এ কথাটি সুস্পষ্ট। কিন্তু হাদিস শরীফে বলা হয়েছে কিছু ব্যতিক্রমের কথা। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এহরাম অবস্থায় হেরেমের অভ্যন্তরে পাঁচ প্রকার জন্তু কতল করলে কোনো গোনাহ্ হবে না। সেগুলো হচ্ছে, ইঁদুর, কাক, চিতা, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর। বোখারী, মুসলিম। হজরত আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী ফাসেক বা অপবিত্র অর্থাৎ কষ্টদায়ক। হেরেমের অভ্যন্তরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে সেগুলোকে হত্যা করা যাবে। যেমন, সাপ, ইঁদুর, কাক, দংশনপ্রবণ কুকুর ও চিল।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সাপের সঙ্গে আমাদের সর্বাত্মক যুদ্ধ। কখনও আমরা তার সঙ্গে সন্ধি করিনি। যে ব্যক্তি ভয়ে সর্প হত্যা পরিত্যাগ করে সে আমাদের অন্তর্ভূত নয়।

হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সাপ দেখলেই মেরে ফেলো। যারা সাপ মারতে ভয় পায় তারা আমাদের সঙ্গী নয় (আমার উম্মত নয়)। আবু দাউদ, নাসাঈ।

কিন্তু যে বিষয়গুলো নসের (কোরআন ও হাদিসের)। সুস্পষ্ট নির্দেশের আওতাভূত নয়, সেগুলোকে কিয়াসের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে। যেমন, নসের সুস্পষ্ট নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও সাহাবীগণ মৃত পশুর ক্ষুরকে অপবিত্র জ্ঞান করেছেন। এ রকম বর্ণনা এসেছে নাখয়ীর পদ্ধতিতে ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে। এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতেই জমহুর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, মৃত ভক্ষণকারী পশু ও পাখি হারাম। সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই নীতিটি মেনে চলতে হবে।

অতএব কোনো পশু হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ পেলে বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সেটিকে হারাম বা মাকরূহ বলবো। তিনজন ইমাম এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নিধন নিষিদ্ধ পশুকে হারামই বলতে হবে, মাকরূহ নয়। হুদহুদ এবং ময়ুরের ব্যাপারেও এই নীতিটি কার্যকর।

মাসআলাঃ ফেঁড়ে চিরে খায় এমন প্রাণী মাকরূহ এ রকম বলেছেন— ইমাম মালেক। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন হারাম। যেমন সিংহ, চিতা, বাঘ, কুকুর, বিড়াল, শেয়াল। যে সকল পাখি থাবা মারে, সেগুলোও ইমাম মালেকের নিকট মাকরূহ এবং অন্য তিন ইমামের নিকট হারাম। যেমন বাজ, শুকরা, চিল ইত্যাদি। ইমাম মালেক বলেছেন, কোরআনে এসেছে— 'কুল লাআজিদু ফিমা উহ্য়িয়া ইলাইয়া মুহাররামান আলা তইমিন ইয়াত আমহু' (আপনি বলে দিন আমার প্রতি যা খাদ্য প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছু পাইনি যা বস্তু হিসেবে হারাম)। কাজেই কোরআনে যা হারাম বলা হয়নি তা হারাম হবে না, হবে মাকরূহ। এটাই ইমাম মালেকের প্রমাণ। আমরা বলি এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে সকল পশু-পাখি হারাম করা হয়েছিলো সেগুলো প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানানো হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে যে হারাম করা হয়নি, সে কথার প্রমাণ এই আয়াতে নেই। আয়াতের তাফসীর হিসেবে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের মাধ্যমে হালাল হারাম সম্পর্কে অধিকতর ব্যাখ্যা আসাই স্বাভাবিক। সে সকল ব্যাখ্যাকে উম্মতগণ গ্রহণও করেছেন। যেমন হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. শিকারী দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং নখর বিশিষ্ট থাবার অধিকারী পাখিকে খেতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেন, শিকারী দাঁত বিশিষ্ট প্রাণী খাওয়া হারাম। মুসলিম। ইবনে আবদুল বার লিখেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ জিয়াদাতে মসনদ গ্রন্থে হজরত আলী থেকে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এ রকম রয়েছে যে, রসুল স. বিড়াল ও তার বিক্রয় মূল্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিজি।

মাসআলাঃ ইমাম আজমের নিকট উদ এবং শেয়াল হারাম। ইমাম মালেকের নিকট মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের নিকট হালাল। এক বর্ণনায় এসেছে ইমাম আহমদের নিকট শৃগাল হালাল নয়। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, বর্ণিত প্রাণী দু'টো হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। বেফায়া গ্রন্থে রয়েছে, কথিত প্রাণী দু'টো বড় বড় দন্ত বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বাঘের মতো তারা আক্রমণপ্রবণ। তাই এ দু'টোকে খাওয়া বৈধ নয়।

ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন, হজরত জাবেরকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো উদ কি শিকাররূপে গণ্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, উদ কি খাওয়া যাবে? তিনি বললেন, যাবে। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, এ কথাটি আপনি

রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় (তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা) ও ইমাম শাফেয়ী এই বর্ণনাটি এনেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আবু দাউদ এ রকম বর্ণনা করেননি। বায়হাকীও করেননি। বোখারী ও তিরমিজি বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এই সূত্রের এক বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন আবী আম্মারাকে মুয়াল্লাল বলেছেন ইবনে আবদুল বার। কিন্তু আবু জারআ এবং নাসাঈ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনেছেন। ইমাম শাফেয়ী এ রকমও বলেছেন যে, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে উদের গোশত বেচাকেনা করা হয়। অন্য কোথাও হয় না। আবু দাউদের বর্ণনায় এ কথাটিও রয়েছে যে, হজরত জাবের বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল, উদ কি শিকার? তিনি স. বললেন, হাঁ। যদি এহরামধারী ব্যক্তি উদ শিকার করে তবে তাকে দুম্বা কোরবানী দিতে হবে।

আমি বলি, উদ শিকার করলে দুম্বা কোরবানী করতে হবে— এ কথায় প্রমাণিত হয় না যে উদ হালাল। এহরাম পরিহিত ব্যক্তি— যার গোশত হারাম এ রকম প্রাণীকে বধ করলেও দুম্বা কোরবানী ওয়াজিব হবে। শিকার বলা হয় ওই সকল জন্তুকে যে সকল জন্তু অরণ্যবাসী। সেগুলো হালালও হতে পারে, আবার হারামও হতে পারে। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যে সকল প্রাণী হিংস্র সে সকল প্রাণী হারাম। ওই হাদিস উদ হালাল হওয়ার হাদিস অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ। আর উদও একটি হিংস্র প্রাণী। হালাল ও হারামের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিদৃষ্ট হলে সতর্কতা প্রতিপালনার্থে হারামকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়। কারণ এই যে, হারামের হুকুম বার বার রহিত হয় না। সুতরাং এখানে দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে হারামকেই অগ্রগণ্য মনে করতে হবে।

খুজাইমা বিন জারীরের মাধ্যমে তিরমিজির বর্ণনায় এ রকম প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে 'উদ কি কেউ খায়?' বর্ণনাটি দুর্বল। কারণ এই বর্ণনাসূত্র সংযুক্ত বর্ণনাকারী আবদুল করিম বিন উমাইয়া ঐকমত্যসম্মতভাবে দুর্বল।

মাসআলাঃ মাটিতে বিচরণরত পোকা-মাকড় ইমাম মালেকের নিকট মাকরূহ। অন্য ইমামত্রয়ের নিকট হারাম। যেমন, মাক্কুরে (এক প্রকার বড় পোকা), ইঁদুর, গিরগিটি (সূর্যকিরণের মাধ্যমে যার রং পরিবর্তিত হয়) ইত্যাদি। ইমামত্রয় (আয়েম্মায়ে ছালাছা) দলিল গ্রহণ করেছেন হজরত উম্মে শারীকের হাদিস থেকে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. গিরগিটিকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই অভিশপ্ত প্রাণীটি হজরত ইব্রাহিমের অগ্নিকুণ্ডবাসের সময় আগুনকে উসকে দেয়ার জন্য ফুঁ দিয়েছিলো। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. গিরগিটিকে হত্যা করতে বলেছেন। আরো বলেছেন, গিরগিটি ফাসেক (দূষিত)। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই গিরগিটিকে মারতে পারবে তার জন্য রয়েছে একশত পুণ্য। দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করলে পুণ্য হবে এক শতের কম এবং তৃতীয় আঘাতে হত্যা করলে আরো কম। মুসলিম।

ইঁদুরকেও নিধন করার নির্দেশ এসেছে এবং ইঁদুর যে দূষিত (ফাসেক) সে কথাও হাদিসে বিবৃত হয়েছে। তাই গিরগিটি ও ইঁদুরের মাপকাঠিতে বিচার করে মাটির মধ্যে গর্ত করে বাস করে— এ রকম সকল পোকা মাকড় হারাম করে দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী ধেড়ে ইঁদুরকে হালাল বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন হারাম। কারণ এগুলো হচ্ছে মৃত্তিকাবাসী পোকামাকড়। ঈসা বিন নুমাইলার পিতার মাধ্যমে আবু দাউদ লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমরের নিকট এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তিনি তৎক্ষণাৎ পাঠ করলেন এই আয়াত, 'কুল লা আজিদু ফিমা আওহা ইলা......। সেখানে উপস্থিত এক বৃদ্ধ বললেন, আমি রসুল স.কেও এ রকম বলতে শুনেছি। তিনি স. বলেছেন, জমিনের পোকা অপবিত্র। হজরত ইবনে ওমর বৃদ্ধের কথা শুনে বললেন, রসুল স. যখন এ কথা বলেছেন, তখন তা এ রকমই। বায়হাকী লিখেছেন, এই বর্ণনাটির সূত্র দুর্বল। আবার অন্য কোনো সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়নি।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গুইসাপ ও ঘুঁছ (এক প্রকার বড় ইঁদুর) হারাম। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন হালাল। ইমাম আহমদ বলেছেন, গুই সাপ হালাল এবং ঘুঁছ সম্পর্কে রসুল স. থেকে হালাল ও হারাম দু'রকম বর্ণনাই রয়েছে। গুইসাপকে যারা হালাল বলেছেন, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন হজরত ইবনে ওমরের হাদিসটিকে— যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. বলেছেন, গুইসাপ খাই না কিন্তু একে হারামও বলি না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত খালেদ বিন ওলিদ বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে জননী মায়মুনার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত ছিলাম। উম্মত জননী হজরত মায়মুনা ছিলেন হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত খালেদ বিন ওলিদের খালা। জননী মায়মুনা গুইসাপের ভুনা করা গোশত রসুল স. এর সামনে উপস্থিত করলেন। রসুল স. হাত গুঁটিয়ে নিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল গুইসাপ কি হারাম? তিনি স. বললেন, না। কিন্তু প্রাণীটি তো এদেশে পাওয়াই যায় না। আর আমি একে পছন্দও করি না। হজরত খালেদ বলেছেন, এ কথা শুনার পর আমি গোশতের পাত্রটি আমার দিকে টেনে নিলাম এবং খেতে শুরু করলাম। তিনি স. নীরবে আমার খাওয়া দেখে যাচ্ছিলেন। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গুইসাপ মাটির পোকা মাকড়ের মধ্যে গণ্য। আর প্রকাশ্য নস দ্বারা মাটির সকল পোকা-মাকড় হারাম প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে আমল করা যায় না। হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে, যখন হজরত আয়েশা গুইসাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন রসুল স. তার গোশত খেতে নিষেধ করলেন। গ্রন্থকার বলেছেন, আমার তো হাদিসটি জানাও নেই।

জ্ঞাতব্যঃ বর্ণিত হাদিসটি রয়েছে মেশকাতে। যা খাওয়া হালাল এবং যা হালাল নয়— অধ্যায়ে আবদুর রহমান বিন শিলের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. গুইসাপের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ মৃত টিড্ডি খাওয়া হালাল— যেভাবেই মরে থাকুক না কেনো। ইমাম মালেক বলেছেন, কেবল ওই টিড্ডি খাওয়া যাবে না, যা বাইরের কোনো কারণে মরে গিয়েছে। এ রকম টিড্ডি খাওয়া মাকরূহ। জমহুর দলিল পেশ করেছেন হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস থেকে, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. এরশাদ করেন, আমাদের জন্য দু'টি মৃত ও রক্ত হালাল। একটি টিড্ডি এবং অপরটি মাছ। দুই প্রকার রক্তের মধ্যে একটি কলিজা এবং অপরটি পিত্ত। আবদুর রহমান বিন জায়েদ বিন আসলামের মাধ্যমে এই বর্ণনাটি এনেছেন শাফেয়ী, আহমদ, ইবনে মাজা, দারা কুতনী ও বায়হাকী। কিন্তু বর্ণনাকারী হিসেবে আবদুর রহমান বিন জায়েদ দুর্বল ও পরিত্যাজ্য। দারা কুতনী জায়েদ বিন আসলামের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এ বক্তব্যটি হজরত ইবনে ওমরের। এ কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। আবু জুরাআ এবং আবু হাতেম ও একে মাওকুফ হিসেবে বিশুদ্ধ বলেছেন। খতিব বর্ণনা করেছেন এভাবে— মুসাওয়ার বিন সলত জায়েদ বিন আসলাম থেকে, তিনি আতা বিন ইয়াসার থেকে এবং তিনি হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। এই বর্ণনাসূত্রভূত মুসাওয়ারকে মিথ্যুক বলেছেন ইমাম আহমদ। আবার ইবনে হাব্বান বলেছেন, তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেয়া যায়।

মাসআলাঃ তিন ইমাম বলেছেন, গাধা ও খচ্চরের গোশত হারাম। ইমাম মালেক বলেছেন, মাকরূহ। হজরত আবু ছা'লাবার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করেছেন। বোখারী, মুসলিম। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন— যে ব্যক্তি আমাকে রসুল বলে স্বীকার করে, সে যেনো জেনে রাখে গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম। হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে খাইবার যুদ্ধের সময় রসুল স. গৃহপালিত গাধা, খচ্চর, শিকারী দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং পায়ের থাবা দিয়ে শিকার করে এ রকম পাখির গোশতকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি গরীব।

ইমাম আহমদ কর্তৃক আনীত বর্ণনাগুলোর মধ্যে রয়েছে— রসুল স. গৃহপালিত গাধা, শেয়াল, শিকারী দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং নখর বিশিষ্ট থাবা বিস্তারকারী পাখির গোশতকে হারাম করে দিয়েছেন। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে ঘোড়ার গোশত খেতে বলেছেন এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিরমিজি, নাসাঈ। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, খায়বরের দিন রসুল স. প্রতিটি হিংস্র প্রাণী ও পালিত গাধার গোশত হারাম করে দিয়েছেন। আহমদ। হজরত বারা বিন আজিব বলেছেন, খায়বরের দিন আমাদের কাছে গাধার গোশত এলো। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে রসুল স. এর আহবানকারী ঘোষণা করলেন, গোশতের হাঁড়িগুলো

উল্টিয়ে দাও। বোখারী, মুসলিম। হজরত আলী বলেছেন, খায়বরের বৎসর মুত্আ বিবাহ এবং পালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। এ রকম কথা আরো বলেছেন হজরত আবু সলিত, হজরত আনাস, হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত সালমা বিন আকওয়া হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবী আউফা। হজরত খালেদ বিন ওলিদ, হজরত আমর বিন শোয়াইবের দাদা, হজরত মেকদাম বিন মাদি করব এবং হজরত আমর বিন দিনার।

মাসআলাঃ জমহুরের নিকট ঘোড়ার গোশত হালাল। সাহেবাঈনও এ রকম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, মাকরূহ (তাহরিমী অথবা তানজিহী)। হেদায়া রচয়িতা বলেছেন, মাকরূহে তাহরিমী হওয়াই অধিকতর বিশুদ্ধ। জমহুরের দলিল হজরত জাবেরের ওই হাদিসটি— যেখানে ঘোড়ার গোশত ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে। আরেকটি হাদিস তাঁরা উল্লেখ করেছেন হজরত আসমা থেকে। হজরত আসমা বলেছেন, আমরা রসুল স. এর জীবদ্দশায় মদীনায় একটি ঘোড়া জবাই করে খেয়েছি। বোখারী, মুসলিম। ইমাম আহমদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, আমরা এবং রসুল স. এর গৃহবাসীগণ।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপণ করেছেন এই আয়াতকে—'তিনি অশ্ব, খচ্চর এবং গাধাকে বাহন ও সৌন্দর্যের বস্তুরূপে সৃষ্টি করেছেন।' এখানে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে আহার্য বস্তু রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে বলা হয়নি। বলা হয়েছে এগুলোর সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি— বাহন ও সৌন্দর্য। হজরত খালেদ বিন ওলিদের হাদিসের মাধ্যমেও বিষয়টি সুপ্রমাণিত, যেখানে বলা হয়েছে; রসুল স. বলেছেন, গৃহপালিত গাধা ও ঘোড়ার গোশত হারাম। ইমাম আহমদও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসা বিন হারূণ বলেছেন, এই সূত্র সংযুক্ত বর্ণনাকারী সালেহ্ বিন ইয়াহ্ইয়া এবং ইয়াহ্ইয়া বিন মিকদাম প্রসিদ্ধ নয়। কেবল পরোক্ষভাবে হজরত মিকদামের নামোল্লেখের কারণে হাদিসটির কিছুটা পরিচিতি ঘটেছে। নতুবা বর্ণনাটি সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ থেকে যেতো। দারা কুতনীও বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, খায়বর যুদ্ধের সময় রসুল স. ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করেছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন, হজরত খালেদ মুসলমান হয়েছিলেন খায়বর যুদ্ধের পর (সুতরাং হাদিসটি দুর্বলই বটে)।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নেউল বা বেজি মাকরূহ্।

মাসআলাঃ তিন ইমামের নিকট রাখম (মিসরী শকুন), বিগাছ (সাদা ও সবুজ রঙ মিশ্রিত এক প্রকার পাখি), আব্কা (দাঁড় কাক) এবং শকুন মাকরূহ। কারণ, এ সকল পাখি মড়া খায়। শস্য ক্ষেতের কাক খাওয়া যেতে পারে। আকআক (পাতিকাক) ও খাওয়া যায়। কেননা, তাদের খাদ্য মিশ্র প্রকৃতির (শস্যদানা ও মৃতের গোশত)। এরা মুরগীর মতো। ইমাম আবু ইউসুফ এদেরকে মাকরূহ বলেছেন। কারণ, এদের বেশীর ভাগ খাদ্যই মৃতের গোশত।

মাসআলাঃ নাপাক ক্ষুর বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু ও নাপাক নখর বিশিষ্ট পাখির গোশত, ডিম ও দুধ হারাম— এ রকম বলেছেন ইমাম আহমদ। জবাইয়ের পূর্বে এগুলোকে কিছু দিন আটকে রাখতে হবে। পাখিকে তিন দিন, উটকে চল্লিশ দিন, গাভীকে তিরিশ দিন, বকরীকে সাত দিন এবং মুরগীকে তিন দিন আটকে রাখতে হবে। এক বর্ণনায় রয়েছে, সবগুলোকেই তিন দিন আটকে রাখতে হবে। তিনজন ইমামের নিকট ময়লা ভক্ষণকারী পশুর গোশত ও দুধে যদি দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, তবে তা খাওয়া মাকরূহে তাহরীম হবে। ওগুলোকে ততদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে, যতদিন না অপবিত্রতার দুর্গন্ধ দূর হয়। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. অপবিত্র ভক্ষণকারী পশুর গোশত এবং দুধ খেতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. নাপাকী ভক্ষণকারী বকরীর দুধ খেতে নিষেধ করেছেন। আহমদ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসের বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. নাপাক ক্ষুর বিশিষ্ট উটের গোশত খেতে, দুধ পান করতে এবং তার উপর আরোহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এগুলোকে চল্লিশ দিন আটকে রাখতে হবে এবং ঘাস দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। বায়হাকী, দারা কুতনী। এ বর্ণনা সূত্রের অন্তর্ভূত ইসমাইল বিন ইব্রাহিম ছিলেন মোহাজির। ইসমাইল ও ইব্রাহিম দু'জনকেই দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন ইবনে জাওজী। আমর বিন শোয়াইবের দাদা থেকে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. পালিত গাধা এবং নাপাকী ভক্ষণকারী পশুর গোশত খেতে এবং তার উপর আরোহী হতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে মাছ ব্যতীত অন্য কিছু হালাল নয়। ইমাম মালেক বলেছেন, সকল সামুদ্রিক প্রাণী হালাল— কাঁকড়া, সামুদ্রিক কুকুর, এমন কি সামুদ্রিক শুকরও। কিন্তু সামুদ্রিক শুকর ইমাম মালেকের নিকট মাকরূহ। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি এগুলোর হালাল হারামের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, তিমি ও কুসেজ ব্যতীত ব্যাঙ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী হালাল। কিন্তু মাছ ব্যতীত অন্যগুলোকে জবাই করা জরুরী। ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের কারো কারো অভিমত ইমাম মালেকের অভিমতের মতো। আবার কারো কারো অভিমত ইমাম আবু হানিফার অনুকূল। কেউ কেউ বলেছেন, সমুদ্রের যে সকল প্রাণী স্থলভাগের প্রাণী বা পশুর আকৃতির মতো সেগুলো খাওয়া যাবে না। যেমন, সামুদ্রিক কুকুর, শুকর, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ইত্যাদি। আর যেগুলোর আকৃতি স্থলভাগের প্রাণীর মতো নয়, সেগুলো খাওয়া যাবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ব্যাঙ, তিমি, সামুদ্রিক সর্প, বৃশ্চিক, কাঁকড়া, কুঁচো হারাম। বাকীগুলো হালাল। ইমাম মালেকের দলিল এই আয়াতটি— 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হয়েছে।' রসুল স. বলেছেন, সমুদ্রের প্রাণী পাক এবং সমুদ্রের মৃত প্রাণী জবাই করা ব্যতিরিকেই হালাল। এ

প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বর্ণিত আয়াতটিতে 'সায়দুন' শব্দটির অর্থ শিকার করা। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম অবস্থায় থাকো, ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলজ প্রাণী শিকার করা হারাম।' উল্লেখ্য যে এখানে 'সায়েদুন' অর্থ শিকার করা। শিকারযোগ্য জন্তু মৃত হতে পারে না। কেননা যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধেনি, সে যদি এহরামধারীর সাহায্য ব্যতীত স্থলভাগের কোনো হালাল প্রাণী শিকার করে, তবে তার গোশত খাওয়া এহরামধারীর পক্ষে হালাল হবে (তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এ রকম হতে পারে না যে, স্থলভাগের প্রাণীর গোশত, এহরামধারীদের জন্য সাধারণভাবে নাজায়েয)। আর হাদিস শরীফের 'সমুদ্রের মাছ জবাই করা ছাড়াই হালাল' —কথাটির অর্থ সমুদ্রের মাছ জবাই করা ছাড়াই হালাল। দারা কুতনী বর্ণিত হজরত জাবেরের আরেকটি হাদিসে এসেছে, রসুল স, বলেছেন, সমুদ্রের প্রাণী এমন নয় যাকে আল্লাহ্পাক আদম সন্তানের জন্য পবিত্র করেননি। অর্থাৎ জবাই করা ব্যতীত হালাল করে দেননি। উল্লেখ্য যে, এ হাদিসে বর্ণিত প্রাণী হচ্ছে মাছ— সকল সামুদ্রিক প্রাণী নয়। কেননা অন্য একটি হাদিসে এসেছে, প্রতিটি নুন বনী আদমের জন্য জবিহা (জবাই তুল্য)। নুন এর একটি অর্থ মাছ। হাদিসের বর্ণানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, সকল সামুদ্রিক প্রাণীকে জবাই বহির্ভূত করা হয়নি। আসল যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে— মাছকে জবাই করার প্রয়োজন নেই।

হজরত জাবেরের বর্ণনার মাধ্যমে অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী হালাল হওয়ার কথা জানা যায়। তিনি বলেছেন, আমি জাইশুল খাবত নামক সমুদ্র উপকূলে এক সেনাদলের সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেনাপতি ছিলেন হজরত আবু উবাদা। আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। হঠাৎ আমরা পেলাম একটি বিশাল মৃত মৎস। মৎসটির নাম আম্বর। আমরা অর্ধ মাস ধরে ওই মৎসটি ভক্ষণ করেছি। হজরত আবু উবাদা মৎসটির বুকের একটি হাড় তোরণের মতো খাড়া করে ধরলেন। এক ব্যক্তি তার ভিতর দিয়ে উটে সওয়ার হয়ে অনায়াসে চলে গেলো। আমরা এই সংবাদটি রসুল স. এর নিকট প্রেরণ করলাম। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র দেয়া রিজিক। খাও। যদি অবশিষ্ট থাকে তবে আমার জন্য কিছু প্রেরণ করো। আমরা তখন ওই মৎসটির কিছু অংশ মদীনায় রসুল স. নিকট পাঠিয়ে দিলাম। তিনি স. তা ভক্ষণ করেছিলেন। বোখারী, মুসলিম। এ সম্পর্কে হানাফিগণ বলেছেন, আম্বর এক প্রকার বিশাল আকৃতির মৎস। আর মৃত মৎস ভক্ষণ হালাল। কিন্তু ব্যাঙ এবং তার মতো অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীগুলো অত্যন্ত অসুন্দর। তাই রুচি বিগর্হিত। স্বভাবগত অনীহাই ওগুলো ভক্ষণের প্রতিবন্ধক। কোরআন মজীদেও বলা হয়েছে 'তাদের জন্য অপবিত্র বস্তু হারাম করে দেয়া হয়েছে।' হজরত আবদুর রহমান বিন ওসমান কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. এর সম্মুখে এক চিকিৎসক কিছু ঔষুধের বিবরণ দিলেন। ওগুলোর মধ্যে ব্যাঙও ছিলো। কিন্তু রসুল স. ব্যাঙকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী। বায়হাকী লিখেছেন, ব্যাঙ নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনাটি একটি শক্তিশালী বর্ণনা।

মাসআলাঃ পানির উপর ভেসে ওঠা মৃত মাছ ইমাম আবু হানিফার নিকট মাকরূহ। জমহুরের নিকট মাকরূহ নয়। জমহুর তাঁদের মতের স্বপক্ষে আম্বর মাছের ঘটনা সম্পর্কিত হজরত জাবেরের হাদিসটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন-যেখানে বলা হয়েছে, মাছটি মৃত অবস্থায় সাগর তীরে পড়েছিলো। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে ওই হাদিস— হুওয়াল হিল্লু মাইতাতু (ওই মৃত হালাল)। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে সমুদ্র তীরে একটি মাছ পড়ে ছিলো। সমুদ্রতরঙ্গ কর্তৃক তীরভূমিতে ঠেলে দেয়া এ রকম মৃত মাছ তো ঐকমত্যানুসারে হালাল। কিন্তু ওই মাছ হালাল হতে পারে না, যা তটভূমিতে আসার আগে সমুদ্রের মধ্যে কোনো রোগের কারণে মরে ভেসে উঠেছে। হানাফিগণ তাঁদের পক্ষে হজরত জাবেরের একটি বর্ণনা তুলে ধরেছেন— যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. বলেন, ওই মাছ খেয়ো না যা মরে পানিতে ভেসে উঠে। ওই মাছ খাও সমুদ্র যাকে রেখে চলে যায়। এ কথার অর্থ জোয়ারের সময় সাগর স্রোতে যে মাছ বেলাভূমির দিকে ভেসে আসে কিন্তু ভাটার সময় তীরে আটকা পড়ে মরে থাকে সেই মাছ খেতে পারবে। আবু আহমদ জুবাইরীর নিয়মে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। দারা কুতনী আরো বলেছেন, জুবাইরির পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে হাদিসটি মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়নি। বর্ণনাটিকে ওয়াকেদী, আবদুর রাজ্জাক, এবং মোয়াম্মেল প্রমুখও মারফু হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। আরো উল্লেখ করেছেন আবু আইয়ুব সিজিসতানী, আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন জারীহ্, হাম্মাদ বিন সালমা, জুহাই প্রমুখ হজরত আবু জোবায়ের থেকে। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

অন্য এক পদ্ধতিতে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন সমুদ্র (জোয়ারের সময়) যে মাছ নিয়ে চলে যায় এবং যে মাছ বেলাভূমিতে ফেলে যায় ওই মাছ খাও। আর পানিতে মৃত অবস্থায় ভাসমান মাছকে খেয়ো না। দারা কুতনী লিখেছেন, হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কেবল আবদুল আজিজ ওয়াহাবের সূত্রে। আর আবদুল আজিজ দুর্বল এবং তার দলিল গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। ইমাম আহমদও তাকে দুর্বল বলেছেন এবং বর্ণনাটিকে অশুদ্ধ বলে চিহ্নিত করেছেন। নাসাঈও বলেছেন, গ্রহণীয় নয়।

ভিন্ন সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, সমুদ্র যে মাছকে কিনারায় নিক্ষেপ করে রেখে যায় ওই মাছ খাও। আর যে মাছ সমুদ্রের অভ্যন্তরে মরে গিয়ে পানিতে ভাসতে থাকে ওই মাছ খেয়ো না। এই বর্ণনার সূত্রস্থ ইসমাইল বিন উমাইয়া পরিত্যাজ্য। আবু দাউদ লিখেছেন, হাদিসটি সুফিয়ান, আইয়ুব এবং হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন আবু জোবায়ের থেকে। কিন্তু তারা সকলে বর্ণনাটিকে হজরত জাবেরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। মারফু বলেননি।

মাসআলাঃ খরগোশ হালাল—অভিমতটি ঐকমত্যসঞ্জাত। হজরত আনাস বলেছেন, আমি মারউজ জাহ্রান নামক স্থানে একটি খরগোশ ধরলাম। খরগোশটি নিয়ে আমি উপস্থিত হলাম আবু তালহার নিকট। আবু তালহা সেটিকে জবাই করে রানের গোশত পাঠিয়ে দিলেন রসুল স. এর নিকট এবং তিনি স. গ্রহণও করলেন। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু মুসার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. মুরগীর গোশত খেয়েছেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সাফিনা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে ডাহুকের গোশত খেয়েছি। আবু দাউদ।

'ওয়া তোয়ামুল্লাজিনা উতুল কিতাবা হিল্লুল্লাকুম' (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ) —এখানে 'তাদের খাদ্যদ্রব্য' অর্থ তাদের জবাই করা খাদ্যদ্রব্য। এখানে কিতাবীদের জবাই করা খাদ্য মুসলমানদের জন্য বৈধ বলে দেয়া হয়েছে। এই কিতাবী হচ্ছে ইহুদী, নাসারা ও সাবেয়ী। নক্ষত্রপূজারী একটি সম্প্রদায়ও এর অন্তর্ভুক্ত। যারা কোনো নবী প্রবর্তিত ধর্মের উপর এবং কোনো কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে। এ বিশ্বাস বিবর্জিত তারকা পূজারীরা সাবেয়ী নয়। এখানে কিতাবী বা আহলে কিতাবের আরেকটি অর্থ ওই সকল কিতাবী যারা হরবী (অমুসলিমদের রাজ্যে বসবাসকারী), জিম্মি (মুসলিম দেশে বসবাসকারী), আজমী (অনারব) অথবা আরবীদের অধীনস্থ।

ইমাম আজম এ রকম বলেছেন। কিন্তু অন্য তিনজন ইমাম বলেছেন, অধিকৃত নাসারাদের জবাই করা পশুপাখির গোশত হালাল নয় (কারণ, তারা প্রকৃতপক্ষে মুশরিক)। ইবনে জাওজী লিখেছেন, আমাদের সিলসিলার দিকপালগণ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আরবের ঈসায়ীদের (নাসারাদের) জবীহা খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ইবনে জাওজীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, বনী তাগলিবের ঈসায়ীদের জবীহা (জবাই করা পশু) খেয়ো না। তারা শরাব পান করা ব্যতীত অগ্রগামী নাসারাদের কাছ থেকে অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করেনি। ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, নাসারাদের জবীহা খাওয়া এবং তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা মাকরূহ। ইব্রাহিম নাখয়ীর পদ্ধতিতে আবদুর রাজ্জাকও এ রকম বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি কোনো মারফু হাদিস পাইনি। যদি কোনো মারফু হাদিস থাকেও তবে তা হবে খবরে আহাদ (এককবর্ণিত)। আর খবরে আহাদ কোরআনকে রহিত করতে পারে না।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতের বক্তব্য এই যে, রসুল স. এর আবির্ভাবপূর্ব সময়ের সকল কিতাবীদের জবীহা ছিলো হালাল। কিন্তু তাঁর স. আবির্ভাবের পরেও যারা ঈসায়ী অথবা ইহুদী হয়ে আছে তাদের জবীহা হালাল নয়।

আমি বলি, মন্তব্যটি অতিরঞ্জিত। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, মোরতাদের (ধর্ম পরিত্যাগকারীর) জবীহা হালাল নয়। এ কথার অর্থ — যে মুসলমান ইসলাম ছেড়ে দিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী, অগ্নি উপাসক অথবা মূর্তিপূজারী হয়ে গিয়েছে তাদের জবীহা খেয়ো না। কারণ, তাদের কোনো ধর্ম নেই। তারা আপন ধর্মেও সুস্থির নয়। তবে এক কিতাবী যদি অন্য কোনো কিতাবী সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রহণ করে তবে তাকেও কিতাবী ধরে নিতে হবে। তার অতীতের ধর্ম পরিচিতি তখন থাকবে না। কেফায়া রচয়িতা লিখেছেন, যদি কোনো ইহুদী অথবা ঈসায়ী অগ্নিপূজক হয়ে যায়, তবে তার জবীহা হালাল হবে না। কিন্তু যদি কোনো অগ্নিপূজারী ইহুদী কিংবা ঈসায়ী হয়ে যায়, তবে তার জবীহা এবং শিকার হালাল।

মাসআলাঃ কোনো ইহুদী হজরত উযায়েরের নামে এবং কোনো ঈসায়ী হজরত ঈসার নামে জবাই করলে সেই জবীহা হালাল হবে না। কেফায়া গ্রন্থে রয়েছে, আল্লাহ্‌র নামে জবাই করলেই কেবল কিতাবীদের জবীহা হালাল হবে। উযায়ের, মসীহ্ ইত্যাদির নামে জবাই করলেও হালাল হবে না। মুসলমানও যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করে, তবে সেই জবীহা হালাল নয়। কারণ, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'অমা উহিল্লাবিহি লিগইরিল্লাহ্।'

বাগবী লিখেছেন, এই মাসআলায় আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। হজরত ইবনে ওমর বলেন, কিতাবীদের জবীহা হালাল নয়। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে হালাল বলার পক্ষপাতী। শা'বী, আতা খোরাসানী এবং মাকহুলের অভিমতও এ রকম। একবার শা'বীকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ঈসায়ী যদি মসীহের নামে জবাই করে তবে কী হবে? শা'বী বললেন, হালাল হবে। কারণ, আল্লাহ্‌পাক ঈসায়ীদের জবীহাকে হালাল করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌পাকতো জানতেনই যে ঈসায়ীরা জবাইয়ের সময় কী বলে।

হাসান বসরী বলেছেন, যদি তোমরা শুনতে পাও কোনো ইহুদী অথবা ঈসায়ী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো নাম উচ্চারণ করে জবাই করেছে, তবে তোমরা তা খেয়ো না। আর যদি সেখানে উপস্থিত না থাকো এবং স্বকর্ণে না শোনো তবে খেয়ে নাও। কারণ, আল্লাহ্‌পাক একে হালাল করে দিয়েছেন।

আমি বলি, আমাদের নিকট প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধ। যদি কোনো কিতাবী সম্পর্কে এ কথা নিশ্চিত জানা যায় যে, তারা আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য কোনো নামে জবাই করতে অভ্যস্ত, তবে তাদের জবীহা খাওয়া যাবে না। আরবের ঈসায়ীদের জবীহা হালাল না হওয়ার এটাই কারণ। হজরত আলী বনী তাগলীবের ঈসায়ীদের সম্পর্কে এ কথা জানতেন যে, তারা জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয় না অথবা গায়রুল্লাহ্‌র নামে তারা জবাই করে থাকে। তাই তিনি তাদের জবীহাকে খেতে নিষেধ করেছেন। অনারব ঈসায়ীদের সম্পর্কেও একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ অনারব কিতাবীরাও যদি আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে অথবা গায়রুল্লাহ্‌র নামে জবাই করে তবে তা খাওয়া যাবে না। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই, ওই সময়ের ঈসায়ীরা জবাই করতো না—আঘাত বা প্রহারের মাধ্যমে পশু বধ করতো (তাই তাদের জবীহা হারাম বলা হয়েছে)।

'ওয়া তোয়ামুকুম হিল্লুল্লাহুম'—এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ—এ কথার অর্থ মুসলমানদের জবীহা কিতাবীদের জন্য বৈধ।

একটি প্রশ্নঃ রসুলপাক স. প্রেরিত হয়েছেন সকল মানুষের জন্য। তবে কোনো কোনো মানুষের জন্য বৈধ আবার কোনো কোনো মানুষের জন্য অবৈধ এ রকম নির্দেশ দেয়ার কারণ কী? (নির্দেশের এই বিভিন্নতা আরোপ করা হয়েছে কেনো?)।

উত্তরঃ কোনো কোনো বস্তু সকলের জন্য হালাল। যেমন সমুদ্রের পানি। আবার কোনো বিষয় হালাল হওয়া শর্তসাপেক্ষ। যেমন, নামাজের জন্য ওজু শর্ত।

অথবা ইবাদতের জন্য আল্লাহ্ ও রসুলের উপর ইমান ও এখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত) শর্ত। সম্পদ হালাল হওয়ার জন্য তা নিজের হওয়া শর্ত অথবা তা ভোগ করতে গেলে মালিকের অনুমতি থাকা শর্ত। এখানে তাই 'তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ'—এ কথা বলে মুসলমানদের জবাইকৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে কাফেরদেরকে। এই জবীহা খাওয়ার জন্য আখেরাতে তাদেরকে আযাব ভোগ করতে হবে না। যেমন ওই সকল কাজ করার কারণে আযাব হবে না, যা সকল মানুষের জন্য বৈধ এবং যার জন্য ইমানের শর্ত নেই। অগ্নিউপাসকদের জবীহা মৃত পশু তুল্য যা সকলের জন্য হারাম। তাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করলে কাফেরদেরও আযাব হবে। যেমন, ইমান গ্রহণ করা ফরজ এবং ইমান তরক করলে আযাব হয়। ইমানের সঙ্গে সম্পর্কিত ফরজ বিধানসমূহ পালন না করলেও আযাব হবে এবং যা কিছু হারাম করে দেয়া হয়েছে তা অস্বীকার করলেও শাস্তি পেতে হবে। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন '(তখন প্রশ্ন করা হবে) কোন জিনিস তোমাদেরকে দোজখে প্রবেশ করালো।' তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না, দরিদ্রকে আহার করাতাম না। এখানে মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য কাফেরদের জন্য বৈধ এ কথা বলার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য কাফেরেরাও খেতে পারবে বটে, কিন্তু তারা মুসলমান মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারবে না (মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে কেবল মুসলমান— একটু পরেই সে কথা শুরু হবে)।

জুজায বলেছেন, এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে। বলা হচ্ছে— 'তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ।' এ কথায় বুঝা যায় কিতাবীদের আহার করানো তোমাদের জন্য হালাল। বায়যাবী বলেছেন, এ কথার অর্থ কিতাবীদেরকে আহার করালে এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে তোমাদের কোনো গোনাহ্ হবে না। যদি মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য কিতাবীদের জন্য হালাল না হোতো তবে তাদের খাদ্যদ্রব্যও মুসলমানদের জন্য হালাল হোতো না। এতো কিছু ব্যাখ্যার পরেও এই ব্যাখ্যাটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে—আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ কথা বলা, মুসলমানদের জবীহা খেতে হলে ইমান থাকা শর্ত নয় কিন্তু মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতে হলে ইমানদার হতেই হবে।

'ওয়াল মুহসানাতু মিনাল মু'মিনাতি ওয়াল মুহ্সানাতু মিনাল্লাজিনা উতুল কিতাবা মিন ক্বব্লিকুম (এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সৎ চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো) – – খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তইয়েবাত (পবিত্র) এবং রমণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে মুহ্সানাত (সচ্চরিত্রা) অর্থাৎ আল্লাহ্পাক বৈধ করেছেন পবিত্র খাদ্য সামগ্রীকে এবং বৈধ করেছেন সচ্চরিত্রা নারীকে। বাগবী লিখেছেন, 'আল মুহ্সানাত' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তবে অধিকাংশ আলেমের নিকট শব্দটির অর্থ স্বাধীনা নারী—ক্রীতদাসী নয়। তারা বিশ্বাসিনী হতে পারে অথবা হতে পারে কিতাবিনী। চরিত্রবতী কিংবা দুশ্চরিত্রা যাই হোক না

কেনো, আসল অর্থ হচ্ছে স্বাধীনা। মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কিতাবী ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, 'যারা তোমাদের অধিকৃত ক্রীতদাসীদের মধ্য থেকে এমন রমণীকে বিবাহ করে যে বিশ্বাসবতী'—এখানে ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করতে গেলে তাকে বিশ্বাসবতী হতে হবে বলা হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মুহ্‌সানাত' অর্থ সতী-সাধ্বী ললনাকুল। তারা স্বাধীনা বিশ্বাসবতী হতে পারে, আবার ক্রীতদাসীও হতে পারে। তেমনি হতে পারে স্বাধীনা কিতাবিনী কিংবা ক্রীতদাসী। সুতরাং মুসলমান স্বাধীনা, ক্রীতদাসী অথবা কিতাবী স্বাধীনা ক্রীতদাসী যদি অসচ্চরিত্রা হয়, তবে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম হবে। হাসান বসরী এ রকম বলেছেন। শা'বী বলেছেন, কিতাবী সচ্চরিত্রা নারী অর্থ— ব্যভিচার থেকে পবিত্র কিতাবিনী। এবং যারা জানাবাতের গোসল করে (বৈধ সহবাসের পর বা অন্য কোনো কারণে রেতঃপাত হওয়ার পর অপবিত্র হলে যারা গোসল করে নেয়)।

আমি বলি, বাগবীর বক্তব্যটি আয়াতের উদ্দেশ্যের পূর্ণ অনুকূল নয়। কারণ, আয়াতে মুসলমান ও কিতাবী উভয় সম্প্রদায়ের সচ্চরিত্রা রমণীদেরকে বিবাহ করা বৈধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সচ্চরিত্রা ও স্বাধীনা রমণী বিবাহ করা বৈধ। এতে করে বুঝা যায়, ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করা যাবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এ কথা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, অসৎ স্বভাবা কিতাবী ক্রীতদাসীদেরকেও বিয়ে করা যাবে। কারণ, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া উহিল্লালাকুম মা ওয়ারায়া জালিকুম' (আর ওই নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে)। অসৎস্বভাবা কিতাবী রমণীগণও এই অনুমতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী'—এ কথায় অন্য নারীদেরকে যে বিবাহ করা যাবেই'না— তা প্রমাণিত হয় না। তাই বায়যাবী লিখেছেন, এখানে বিশ্বাসী সচ্চরিত্রাদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ রকম করা উত্তম কিন্তু অন্যদেরকেও (অসচ্চরিত্রা, স্বাধীনা, বিশ্বাসিনী, কিতাবী, ক্রীতদাসী) বিবাহ করা যাবে। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত। অর্থাৎ সাধারণভাবে এখানে এ কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে, অমুসলিম দেশের কিতাবী নারীদেরকেও বিবাহ করা বৈধ। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অমুসলিম কিতাবী রমণীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। হজরত ইবনে ওমর কিতাবী রমণীদের সঙ্গে কোনোক্রমেই বিবাহবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী নন— সে রমণী স্বাধীনা হোক অথবা বাঁদী। জিম্মি হোক অথবা হরবী। কারণ, কিতাবী মহিলারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তা। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, 'ইহুদীরা উযায়েরকে এবং নাসারারা মসীহ্‌কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকে।' যারা এ রকম বলে, তারা মুশরিক (অংশীবাদী)। আর অংশীবাদীদের সঙ্গে বিবাহ হারাম। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'যতোক্ষণ পর্যন্ত মুশরিক মহিলাগণ ইমান গ্রহণ না করে, তাদেরকে বিবাহ কোরো না।' হজরত ইবনে ওমর আরো বলেছেন, এখানে 'আল মুহ্‌সানাত' অর্থ সতী সাধ্বী মুসলিম রমণী। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি ভুল। কেননা,

এখানে স্পষ্ট করে তাদেরকে বিবাহ্ করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। স্বাধীনা কিতাবী রমণীকে বিবাহ করা জায়েয—সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। মতোবিরোধ রয়েছে কেবল কিতাবী ক্রীতদাসীকে বিবাহ করার ব্যাপারে। সুরা নিসার তাফসীরে বিষয়টি বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে ঐকমত্যসম্মতরূপে কিতাবী রমণীদেরকে বিবাহ করা জায়েয হলেও মাকরূহ। এ রকম করা হলে অবিশ্বাসী নারীর সঙ্গে সর্বক্ষণ বসবাস করা ও তাকে ভালোবাসা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সন্তান-সন্ততি হলে তাদের উপরও তার অবিশ্বাসী মায়ের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। কারণ, মায়ের সঙ্গেই থাকে তাদের লালন পালনের প্রত্যক্ষ সংযোগ। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হজরত হুজায়ফা, হজরত তালহা এবং হজরত কা'ব বিন মালেক কিতাবী রমণীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন। হজরত ওমর এজন্য তাঁদের উপর রাগান্বিত হন। তখন তাঁরা বললেন, হে বিশ্বাসীদের অগ্রণী! আমরা তালাক দিয়ে দিচ্ছি। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ করা দুরস্ত নয়। কিন্তু দুরস্ত যদি নাই হবে তবে তালাক দেয়ার কথা উঠবে কেনো। অতএব বলতে হবে এ রকম— বিবাহ জায়েয কিন্তু মাকরূহ। আর মাকরূহ বলেই হজরত ওমর রাগান্বিত হয়েছিলেন। হজরত ওমর বলেছেন, মুসলমান পুরুষ ঈসায়ী মহিলাদেরকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু ঈসায়ী পুরুষ মুসলমান রমণীকে বিয়ে করতে পারবে না।

সাবায়ী রমণীদেরকে বিবাহ করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। ইমামে আজম বলেন, সাবায়ীরা যবুর কিতাবকে মান্য করে। তাই তারা কিতাবী। আর কিতাবীকে বিয়ে করা জায়েয। সাহেবাইনের বক্তব্য হচ্ছে— তারা তারকা পূজারী, তাই তারা মুশরিক। আর মুশরিক রমণীকে বিয়ে করা যায় না (যবুর কিতাবকে মান্য করলেও)। হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে, ইমামে আজম এবং তাঁর দুই প্রধান ছাত্রের মতোবিরোধের কারণ— সাবায়ীদের সম্পর্কে তাদের ধারণার ভিন্নতা। হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত শীশের সহীফার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মহিলাদেরকেও বিয়ে করা যাবে বলে ইমামে আজম মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

মাসআলাঃ মুসতাসফি গ্রন্থে বলা হয়েছে, মসীহ্‌কে যদি আল্লাহ্ না মনে করে তবে ঈসায়ী মহিলাদেরকে বিবাহ করা যাবে। আর যে মসীহ্‌কে ইলাহ্ বা উপাস্য বলে বিশ্বাস করে তাকে বিয়ে করা যাবে না। আল মাবসুত প্রণেতা শায়খুল ইসলাম বলেছেন, যদি কিতাবীরা মসীহ্ অথবা উযায়েরকে উপাস্য মনে করে, তবে তাদের জবীহা খাওয়া যাবে না এবং তাদের মহিলাদেরকে বিয়ে করা যাবে না (কারণ, তারা মুশরিক)। কোনো কোনো আলেম এই সিদ্ধান্তের উপরই ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কিতাবীদের জবীহা খাওয়া এবং তাদের মহিলাদেরকে বিবাহ করা জায়েয বলে মানতে হবে (মুসলিম জগতের শায়েখদের সর্বশেষ অভিমত এটাই)। ইবনে হুম্মাম শাইখুল ইসলামের অভিমত গ্রহণ করে লিখেছেন, প্রতিটি ঈসায়ীর জবীহা হালাল—তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হোক অথবা না হোক। কারণ, আলোচ্য আয়াতে কিতাবীদের জবীহাকে শর্তবিহীন হালাল করে দেয়া হয়েছে।

আমি বলি, আয়াতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, কিতাবী অর্থ ওই সকল কিতাবী যারা মুশরিক নয়। মুশরিক রমণীদেরকে বিবাহ করা আল্লাহ্‌পাকই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ইমান গ্রহণ করা ব্যতীত তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ কোরো না।' আবার এখানে বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।' অতএব কিতাবীদের মধ্যে যারা শিরিক করে না তাদের মেয়েদের বিয়ে করা বৈধ, আর যারা শিরিক করে (হজরত ঈসা এবং হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে) তাদেরকে বিয়ে করা যাবে না। কারণ, তারা মুশরিক। জ্ঞানীদের অভিমত এই যে, প্রতিমা পূজারীর শিরিক এবং কিতাবীদের শিরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উল্লেখ্য যে, ইহুদীদের একটি ক্ষুদ্র দল হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকে। তেমনি ঈসায়ীদের একটি ক্ষুদ্র দল হজরত ঈসাকে ইবনুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র সন্তান বলে। এই দল দু'টোর এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, আমাদের দেশের ইহুদীরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌কে হজরত উযায়েরের পিতা হওয়া থেকে পবিত্র মনে করে থাকে। তবে ঈসায়ীদের মধ্যে এমন কোনো লোক আমরা পাইনি যে, হজরত ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে না। হজরত আলী বনী তাগলিবের খৃষ্টানদের জবীহা খেতে এবং তাদের নারীদেরকে বিবাহ করতে এ কারণেই নিষেধ করে দিয়েছেন।

ইজা আতাইতুমু হুন্না উজুরাহুন্না (যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান করো বিবাহের জন্য) —এ কথার মাধ্যমে বিবাহের মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে মোহর প্রদানের অর্থ বিবাহের জন্য মোহর জরুরী এবং নির্ধারিত মোহর পরিশোধ করতেই হবে। যেমন বলা হয়, লজ্জাস্থানকে হালাল করার জন্য বিবাহ করো। তেমনি এ রকম বলা যেতে পারে, বিবাহ করতে হলে মোহর অবশ্যই প্রদান করো।

সম্ভোগের জন্য নারীকে অর্থ প্রদান করার নামই মোহর নয়। কেউ কেউ ব্যভিচার করার জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে, আবার কেউ কেউ উপপত্নী বা রক্ষিতার জন্য অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু বিবাহ বৈধ এবং ব্যভিচার অবৈধ। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান করো বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়।'

শেষে বলা হয়েছে, 'কেউ ইমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'—এ কথার অর্থ ইমানই মূল সম্পদ। ইমান পরিত্যাগ করলে যত সৎ কর্মই করা হোক না কেনো, কোনো সৎকর্মই কবুল করা হবে না। আমল কবুল হওয়ার জন্য ইমান থাকা অপরিহার্য একটি শর্ত। আর পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ তার সকল পুণ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে (যা পরকালের একমাত্র সম্বল)। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখ-মন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাইবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করিবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত সংগত হও এবং পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করিবে এবং উহা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাইবে; আল্লাহ্ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না, বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চাহেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

কাসেমের বর্ণনাসূত্রে বোখারী লিখেছেন, হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.এর সঙ্গে মদীনায় আসছিলাম। পথিমধ্যে আমার গলার হার হারিয়ে গেলো। এ কথা জানতে পেরে রসুল স. কাফেলার যাত্রা স্থগিত করে দিলেন। লোকেরা হারানো হার অনুসন্ধান করতে লাগলো। তিনি স. আমার কোলে মাথা রেখে নিদ্রাভিভূত হলেন। এমন সময় আমার পিতা হজরত আবু বকর এসে আমাকে বললেন, তুমি একটি হারের জন্য পুরো কাফেলাকে থামিয়ে রেখেছো। একটু পরে রসুল স. জাগ্রত হলেন। ফজর নামাজের সময় হয়ে গেলো। কিন্তু ওজুর জন্য কোনো পানি পাওয়া গেলো না। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। হজরত উসাইদ বিন হুদ্বাইর বললেন, হে আবু বকর তনয়া! আপনাদের পরিবারের অসিলায় আল্লাহ্পাক মানুষকে বরকত দান করেছেন (এজন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ)।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মাতা আয়েশা সিদ্দিকার গলার হার হারিয়ে যাওয়ার কারণে। সুরা নিসার একটি আয়াতের তাফসীরে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে এই ঘটনাটিকেই উল্লেখ করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ছিলো এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। যদি এমন না হতো তবে হজরত আবু বকর এ কথা বলতেন না যে, তুমি পুরো কাফেলাকে থামিয়ে দিয়েছো। ওজুর পানি না থাকার কথাও তাহলে আসতো না। আর হজরত উসাইদও হজরত আয়েশাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেন না।

তিবরানীও হজরত আয়েশা থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে (এই ঘটনার কারণে) তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো এবং হজরত আবু বকর তাঁর কন্যা হজরত আয়েশাকে বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি বরকতের অধিকারিণী।

'ক্বুম তুম' অর্থ দন্ডায়মান হবে বা দণ্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা করবে। এখানে অর্থ হবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে বা নামাজ পাঠের জন্য প্রস্তুত হবে। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, ওয়া ইজা ক্বারাতাল কুরআনা ফাস্‌তাইজ বিল্লাহ্ (যখন তুমি কোরআন পাঠ করবে তখন আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে)। এখানে কোরআন পাঠ করা অর্থ কোরআন পাঠের ইচ্ছা করা। এভাবে 'কুনতুম ইলাস্‌সলাতি' বাক্যটির অর্থ হবে যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হবে।

'ফাগছিলু উজুহাকুম' অর্থ মুখমণ্ডল ধৌত করবে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে বুঝা যায় যে, যে নামাজ পড়তে ইচ্ছে করবে তার জন্য ওজু করা ওয়াজিব। (যার ওজু নেই তার উপর ওজু ওয়াজিব এবং যার ওজু আছে তার জন্য পুনঃ ওজু মোস্তাহাব)। বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. কয়েক ওয়াক্তের নামাজ এক ওজু দ্বারা পড়েছেন এবং চামড়ার মুজার উপর মসেহ করেছেন। এর পূর্বে তিনি স. প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে ওজু করে নিতেন। হজরত ওমর নিবেদন করলেন, আজ আল্লাহ্‌র রসুল এমন আমল করলেন যা ইতোপূর্বে করেননি। রসুল স. বললেন, ওমর আমি ইচ্ছাপূর্বক এ রকম করেছি। হজরত বুরাইদা থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়।

'নামাজ পড়তে চাইলে ওজু করা ওয়াজিব'—প্রথম দিকে এই বিধানই কার্যকর ছিলো। পরে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। পরে এই নিয়ম জারী হয়ে যায় যে, নামাজের প্রাক্কালে ওজু না থাকলে ওজু করা ওয়াজিব। আর ওজু থাকলে নতুন ওজু করা মোস্তাহাব। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হানযালার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করতেন। ওজু থাকুক কিংবা নাই থাকুক। যখন এই আমলটি রসুল স. এর উপর কঠিন হয়ে গেলো, তখন প্রতি নামাজের আগে শুধু মেসওয়াক করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, হাকেম।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, ওজু থাকলেও নামাজের আগে ওজু করা মোস্তাহাব। কেউ বলেছেন সুন্নত। কারণ, হজরত আনাসের হাদিসে রয়েছে রসুল স. প্রত্যেক নামাজের জন্য তাজা ওজু করতেন। সুতরাং আলেমগণ এব্যাপারে একমত যে, ওজু থাকলেও প্রতি নামাজের আগে ওজু করা সুন্নত। কমপক্ষে মোস্তাহাব।

মোস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে হজরত ওমরের হাদিসে। সেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র থাকা সত্ত্বেও ওজু করবে সে দশটি নেকী পাবে। শিথিল সূত্রসহযোগে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতে নামাজের প্রাক্কালে ওজু করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে— কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। (এ কথা বলা হয়নি যে, ওজু না থাকলে ওজু করবে, থাকলে করবে না)। কিন্তু নির্দেশটির প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম—যদি বেওজু অবস্থায় থাকো তবে নামাজের পূর্বে ওজু করে নাও। হুকুমটি ওয়াজিব। সুতরাং এ কথা মানতে হবে যে, বেওজু অবস্থায় নামাজ পড়লে আল্লাহ্পাক তার নামাজ কবুল করবেন না। হাদিস শরীফে এ রকম বলা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, এ আয়াতটির অর্থ—নিদ্রার পর তোমরা যখন শয্যা ত্যাগ করে নামাজের জন্য উঠবে তখন ওজু করে নিবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসুল স. কে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপর ওই সময় ওজু ওয়াজিব যখন তোমরা নামাজ পাঠের ইচ্ছা করো, অন্য কোনো আমলের জন্য ওজু ওয়াজিব নয়। কেননা, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, নামাজ ব্যতীত অন্য আমলগুলো বেওজু অবস্থাতেও করা যাবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পাদনের পর আমাদের নিকট এলেন। তাঁর সম্মুখে আহার্য বস্তু রাখা হলো এবং বলা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল, আপনি কি ওজু করবেন? তিনি স. বললেন, আমি নামাজ পড়তে চাই। এ কথা বলে তিনি ওজু করে নিলেন।

দ্রষ্টব্যঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকেই ওজু ওয়াজিব ছিলো। যেমন বোখারীর বর্ণনা দৃষ্টে এ কথা বুঝা যায় যে, এখানে ওজুর প্রসঙ্গ এসেছে তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন করার কারণে। মাতা আয়েশার গলার হার হারিয়ে যাওয়ার পর একস্থানে কাফেলা থেমে গিয়েছিলো। ইত্যবসরে নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ওজুর পানি ছিলো না। তাই রসুল স. সহ সকল সাহাবী পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, সকল সাহাবী এ কথা জানতেন যে, নামাজ ফরজ হওয়ার পর থেকেই রসুল স. কখনো বেওজু অবস্থায় নামাজ পড়েননি। সাহাবীগণও পড়েননি। কারণ, ওজু ফরজ হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিলো নামাজ ফরজ হওয়ার সঙ্গেই। এই তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা

সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনার পূর্বে কারো নামাজই ওজুবিহীন ছিলো না। এ কথাটি মেনে নিলে প্রমাণিত হবে যে, ওজু কেবল ফরজ নামাজের জন্য। আমি বলি, এখানে ওজুর উল্লেখ করা হয়েছে তায়াম্মুমের বিবরণ প্রসঙ্গে। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

'ফাগসিলু উজুহাকুম'—এ কথার অর্থ মুখ-মণ্ডল ধৌত করো। ইমামত্রয়ের মতে মুখ-মণ্ডল ধৌত করতে হলে পানি পাওয়া শর্ত। ইমাম মালেক বলেছেন, পানি পাওয়া জরুরী। কিন্তু কোরআনে পানির কথা নেই। তাই ইমাম মালেকের কথাটি অপ্রমাণিত। ওয়াজহুন অর্থ চেহারা বা মুখমণ্ডল। শব্দটি এসেছে 'মাওজেহাত' থেকে। চেহারা বা মুখমণ্ডলের সীমা রেখা হচ্ছে কপালের চুল থেকে চিবুকের নিম্নরেখা পর্যন্ত এবং এক কান থেকে দ্বিতীয় কান পর্যন্ত। দাড়ি আবৃত অংশ যদি না ধোয়া হয় তবে ইমাম মালেক ব্যতীত অন্য তিন ইমামের মতে ওজু হবে না। ইমাম মালেকের মতে চোখের ভ্রূ থেকে গোঁফ দাড়ি পর্যন্ত পানি পৌছানো জরুরী। যদি দাড়ি পাতলা হয় এবং দাড়ির অভ্যন্তরে চামড়া দৃষ্টিতে আসে তবে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌছানো জরুরী। আর যদি দাড়ি ঘন হয়, চামড়া দেখা না যায় তবে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌছানো জরুরী নয়। যেমন মাথার চুলের উপর মসেহ্ করলে মাথা মসেহ্ হয়ে যায়। তাঁর এই বক্তব্যটি আলেমগণের ঐকমত্যের মাধ্যমে প্রমাণিত। দ্বিতীয় আমল হচ্ছে— রসুল স. এক আঁজলা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। তাঁর স. পবিত্র শ্মশ্রু ছিলো অত্যন্ত ঘন। কাযী আয়াজ এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার সমর্থনে বহুসংখ্যক সাহাবীর বক্তব্য রয়েছে। সেগুলো বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র শ্মশ্রু ছিলো খুব ঘন। আমি বলি, ঘন শ্মশ্রুর গোড়া পর্যন্ত পানি পৌছানো অসম্ভব। তাই চামড়া নয়, দাড়ির উপরের অংশ ধুয়ে নেয়া জমহুরের নিকট ওয়াজিব, যেমন মাথার চামড়ার বদলে চুলের উপর মসেহ করা ওয়াজিব। এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আজমের অভিমতও এ রকম। জহিরীয়া গ্রন্থে এ রকমই ফতওয়া দেয়া হয়েছে। বাদায়ে গ্রন্থে অন্য একটি ফতওয়া ইমাম আজম থেকে সংকলিত হয়েছে। এক বর্ণমায় রয়েছে ইমামে আজম বলেন, এক চতুর্থাংশ দাড়ি মসেহ করা ওয়াজিব। আরেক বর্ণনায় এসেছে, এক তৃতীয়াংশ মসেহ করা ওয়াজিব। অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, দাড়ি না ধোয়াই ওয়াজিব। ঐকমত্যানুসারে দাড়ির ভিতরের চামড়া ধৌত করার বিষয়টি রহিত হয়ে গিয়েছে। ঐকমত্যসূত্রে এ কথাও এসেছে যে, রসুল স. এক আঁজলা পানি দ্বারা তাঁর পবিত্র মুখ-মন্ডল ধৌত করে নিতেন। আর মসেহ করার বর্ণনায় এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, দাড়ির গোড়ার চামড়া ধোয়া ওয়াজিব নয়। চুলের উপর মসেহ করলেও যখন মস্তক মসেহ করা ধরা হয়, তখন দাড়ির ভিতরের চামড়া না ধোয়া হলেও মুখ-মণ্ডলের সঙ্গে দাড়িও ধোয়া হয়েছে ধরতে হবে। নতুবা শাখাগত আমলকে মূল আমল

অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেয়া জরুরী হবে। আর হাদিস শরীফেও এ কথা পরিষ্কার বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, রসুল স. এক আঁজলা পানি দ্বারা তাঁর পবিত্র মুখ-মণ্ডল ধৌত করতেন। অতএব দাড়ির চামড়ার গোড়ায় পানি না পৌছলেও মুখমণ্ডল ধৌত করা হয়েছে ধরতে হবে। এই অভিমতের সমর্থনে যেমন ঐকমত্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিয়াস এবং হাদিস।

'ওয়া আইদিকুম ইলাল মারাফিক'—অর্থ হাত কনুই পর্যন্ত (ধৌত করবে)। হাত অঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে বগল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু পরিষ্কার করে কনুই থেকে হাতের আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত অংশ ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম চতুষ্টয় তাই কনুই পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব বলেছেন। জমহুরের বক্তব্যও এ রকম। কিন্তু ইমাম শা'বী এবং মোহাম্মদ বিন জারীরের মতে, কনুই ধৌত করা ওয়াজিব নয়। ইমাম জোফারও এ রকম বলেছেন। কেননা, 'ইলা' অর্থ পর্যন্ত। এই 'পর্যন্ত' অর্থ কনুই যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই পর্যন্ত। এ রকম অর্থ করলে কনুই 'পর্যন্ত' কথাটির বাইরে থেকে যায়। যেমন, অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে, 'তোমরা রোজাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ করো।' এখানে রাতের কোনো অংশ নির্দেশের আওতায় আসেনি। রোজার সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে রাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। আর একটি কথা এই যে, আরবের প্রধান আলেমগণ বলেন 'ইলা' শব্দটি কেবল শেষ সীমা প্রকাশক। সীমাবহির্ভূতকে শেষ সীমানা অন্তর্ভূত করে না। এই ব্যাখ্যার আলোকে এখানে 'ইলাল মারাফিক্ব' অর্থ (কনুই পর্যন্ত) এবং কনুই সহ—দু'রকমই হতে পারে। অতএব, এর কোনো একটি অর্থকে অবশ্য গ্রহণীয় মনে করে অন্য অর্থটিকে অবশ্য বর্জনীয় মনে করা যাবে না।

আমি বলি, এখানে 'ইলা' অর্থ সহ। অর্থাৎ কনুই সহ। 'আল উম' গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওজুর সময় হাত কনুই (সহ) ধৌত করতে হবে—এই মতের বিপক্ষে কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে সকলে একমত যে, কনুই (সহ) ধৌত করা ওয়াজিব। শা'বী, মোহাম্মদ বিন জারীর এবং ইমাম জোফারের ভিন্ন মত যদি কোনো বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়ও, তবুও তা হবে ঐকমত্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। ইমাম মালেক থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি কনুই ধৌত করতে হবে না বলেছেন। শুধু আশহাব বলেছেন, পর্যন্ত ও সহ—দু'টো অর্থই সমশক্তিসম্পন্ন। আর এ বিষয়ের ঐকমত্যটি (কনুই সহ ধৌত করতে হবে) সনদবিহীনও নয়। এ ব্যাপারে রসুল স. এর আমলও প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। উত্তম সনদ সহযোগে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান এতো অতিরিক্ত ধৌত করতেন না যাতে বাহুমূল পর্যন্ত পৌছে যেতো। রসুল স. এর ওজু এ রকমই ছিলো। হজরত জাবের থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কনুইয়ের উপর পর্যন্ত পানি পৌছে দিতেন। এই বর্ণনাসূত্রটি অবশ্য দুর্বল। হজরত ওয়ায়েল বিন হাজর থেকে মারফু সূত্রে বায্যার ও তিবরানী বলেছেন, রসুল স. উভয় হস্ত কনুই যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই পর্যন্ত ধৌত করতেন। হজরত ছা'লাবা বিন উবাদা তাঁর পিতা থেকে মারফু সূত্রে তাহাবী ও

তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. কনুইয়ের উপর পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিতেন। তিনি স. এবং সাহাবীগণের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি ওজুর সময় কনুই এবং পায়ের গ্রন্থি (টাখনু) পর্যন্ত না ধৌত করতেন। এই আমলের মধ্যেই কোরআনের আলোচ্য নির্দেশটির প্রমাণ রয়েছে। তাই তাফসীরকারগণ বলেছেন, 'ইলাল মারাফিক্ব' এবং 'ইলাল কা'বাইন' এর ইলা (পর্যন্ত) শব্দটির অর্থ হবে সহ (মাআ)। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে আরো কয়েকটি আয়াতে। যেমন—১. 'ওয়া ইয়ানজিরকুম ক্বওয়াতান ইলা ক্বওয়াত' (এবং তোমাদেরকে শক্তির সাথে শক্তি বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। ২. 'ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাহুম ইলা আমওয়ালিকুম' (এবং তোমরা তাদের সম্পদ তাদের সম্পদের সঙ্গে মিলিয়ে খেয়ো না)। ৩. 'মান আনসারি ইলাল্লহ' (কে এমন আছো যে আমাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে সাহায্য করবে বা সঙ্গে থাকবে)।

'ওয়ামসাহু বিরুউসিকুম'—অর্থ মাথায় হাত বুলাবে বা মাথা মসেহ করবে। মাথা মসেহ করা ওয়াজিব (ফরজ)। তবে মস্তকের কতোটুকু অংশ মসেহ করতে হবে সে সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করা ওয়াজিব। কেননা, বলা হয়েছে মস্তক মসেহ করার কথা— কোনো অংশ বিশেষের উল্লেখ এখানে নেই। 'বিরুউসিকুম' শব্দটিতে 'বা' বর্ণটিও অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। কাজেই সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করাই ওয়াজিব। যেমন মুখমন্ডল ধৌত করার অর্থ সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করা। তায়াম্মুমের সময়ও সম্পূর্ণ মুখমন্ডল মসেহ করা ফরজ। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদের বর্ণনায় রয়েছে—রসুল স. উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক মসেহ করতেন। দুই হাত সম্মুখের দিক থেকে নিয়ে যেতেন পশ্চাতের দিকে পুনরায় পিছন থেকে নিয়ে আসতেন সামনে। তারপর দুই হাত স্থাপন করতেন গ্রীবাদেশে। সেখান থেকে হাত নিয়ে আসতেন ওই স্থানে— যেখান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'বিরুউসিকুম' এর 'বা' অক্ষরটি প্রকৃত মিলিত অর্থে ব্যবহৃত। তাই এখানে প্রকৃত অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করার কারণ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় উপকরণগত বা কারণগত। মাফহুল বা কর্মকারক হয় না। তাই এখানে মস্তক মসেহ করার অর্থ সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করা হবে না। যেমন স্থানের সঙ্গে মিলিত করার অর্থে এমন বলা হয়—মাৱারতু বিস্‌সুক্ব (আমি বাজারে গিয়েছিলাম)। এখানে বাজার অর্থ বাজারের সম্পূর্ণ পরিসর নয়। তেমনি এই আয়াতেও মস্তক মসেহ অর্থ সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করা নয়। রসুল স. এর আমল থেকেও এ কথাটি প্রমাণিত। হজরত মুগিরা বিন শো'বা বলেছেন, রসুল স. ওজু করলেন। তখন মস্তকের সম্মুখভাগের উপর, পাগড়ীর উপর এবং মোজার (চামড়া নির্মিত) উপর মসেহ করলেন। মুসলিম।

আতা থেকে মুরসালরূপে ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন, রসুল স. ওজু করলেন এবং পাগড়ী উঠিয়ে মাথার সম্মুখভাগ মসেহ করলেন। এই মুরসাল বর্ণনাটির সমর্থনে আর একটি মুত্তাসিল বর্ণনাও রয়েছে, যে বর্ণনাটি আবু দাউদ লিখেছেন হজরত আনাস থেকে। তবে এই সূত্রভূত এক বর্ণনাকারী মা'কাল অপরিচিত।

সাঈদ বিন মানসুর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওসমানের নিকট একবার ওজুর নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি ওজু করে দেখালেন। মসেহ করলেন মস্তকের সামনের অংশে। এ বর্ণনাসূত্রভূত খালেদ বিন ইয়াজিদ বিন আবী মালেক ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির লোক। হাফেজ ইবনে হাজারের বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে মুনজির প্রমুখ লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর মাথার কিছু অংশ মসেহ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। ইবনে হাজম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাহলে সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করাকে মোস্তাহাব বলা যায়। কারণ, সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আয়াতে মাথা মসেহ করার নির্দেশটির অর্থ এ রকম নয় যে, সম্পূর্ণ মাথা মসেহ করতে হবে। কিন্তু মাথার কতোটুকু অংশ মসেহ করতে হবে সে কথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মাথার একটি অথবা তিনটি চুলের উপরে মসেহ করলেই চলবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নির্দেশটি ব্যাপক অর্থবোধক। হজরত মুগীরার হাদিসটিও ব্যাপকতার পোষকতা করেছে। তাই আমরা বলি, মস্তকের এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ওয়াজিব। অবশ্য মস্তক অর্থ যদি মস্তকের ন্যূনতম অংশ ধরা হয়, তবে দু'একটি চুল মসেহ করলেই চলবে। কেননা, এটা আসরে বদহী (যার জন্য সুনির্দিষ্ট দলিলের প্রয়োজন হয় না)। সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করলেই মস্তকের সম্মুখভাগের কিছু চুল মসেহ হয়েই যায়। কিন্তু এখানে মস্তক মসেহ করার কথা বলা হয়েছে পৃথকভাবে— (সুতরাং এক চতুর্থাংশ মসেহ ওয়াজিব বলাই শ্রেয়)।

'ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কা'বাইন' (এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে)। ক্বারী নাফে, ইবনে আমের, কুসাই, ইয়াকুব এবং হাফস 'আরজুলাকুম' শব্দটিকে পড়েছেন 'আরজুলিকুম' (লাম অক্ষরটিকে যের সহযোগে)। এভাবে কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করার সঙ্গে গ্রন্থি (টাখনু) পর্যন্ত পা ধোয়ার সংযোগ সাধিত হয়েছে। কাজেই হাতের কনুই এবং পায়ের গ্রন্থি ধৌত করতে হবে। আর পায়ের গ্রন্থি ধৌত করার প্রসঙ্গটি যদি মাথা মসেহ করার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তবে বিষয়টি হয়ে পড়বে অনির্ধারিত। অর্থাৎ মাথা অর্থ যেমন সম্পূর্ণ মাথা নয়, পায়ের গ্রন্থি অর্থও তেমনি সম্পূর্ণ পা বা পায়ের গ্রন্থি বুঝা যাবে না।

অন্য ক্বারীগণ শব্দটিকে পড়েছেন 'আরজুলাকুম' (লাম অক্ষরটিকে যবর সহযোগে)। এ রকম উচ্চারণ করলেও হাতের কনুই ধৌত করার সঙ্গেই এর সংযোগ স্থাপন করেছেন তাঁরা। অন্য আয়াতেও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন 'ইন্নি আখাফু আলাইকুম আযাবা ইয়াওমিন আলীম' (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের

যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির দিনের আশংকা করি)। এখানে 'আলীম' শব্দটির 'লাম' অক্ষরটিতে রয়েছে 'যের।' এভাবে যন্ত্রনাদায়ক শব্দটির সরাসরি সংযোগ শাস্তির সঙ্গে হলেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ইয়াওমিন' (দিন এর সঙ্গে)। এই আয়াতেও তেমনি 'রুউসিকুম' (মাথায়) এর পরে 'আরজুলাকুম' উচ্চারিত হলেও ধৌত করার ব্যাপারটি কনুই ধৌত করার সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করতে হবে।

একটি ধারণাঃ অধিকাংশ ব্যাকারণবিদ নৈকট্য বা সম্পৃক্তি স্থাপনের জন্য 'যের' হরকতের ব্যবহারকে অসিদ্ধ বলেছেন। যারা সিদ্ধ বলেছেন, তাদের রয়েছে দু'টি শর্ত—১. সংযোজক অব্যয় বা অক্ষর মাঝখানে থাকা যাবে না (কিন্তু এখানে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' রয়েছে)। ২. দ্ব্যর্থবোধকতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। কিন্তু এখানে 'লাম' অক্ষরে 'যের' হরকত যোগ করলে বিষয়টি হয়ে পড়ে সন্দেহযুক্ত। অর্থাৎ এ কথা নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, 'আরজুলিকুম' শব্দটির সংযোগ 'রুউসাকুম' এর সঙ্গে না 'আইদিকুম' এর সঙ্গে (পায়ের গ্রন্থি কি মাথার মতো মসেহ করতে হবে, না কনুইয়ের মতো ধৌত করতে হবে)।

উত্তরঃ অধিকাংশ ব্যাকরণবিদ সম্পৃক্তিসূচক 'যের'কে অসিদ্ধ বলেছেন—এ কথা মেনে নেয়া যায় না। যের হরকতের এ রকম ব্যবহার কোরআন মজীদের অনেক আয়াতে রয়েছে। অলংকার শাস্ত্রবিদগণের বাক্যাবলীতেও এ রকম প্রমাণ রয়েছে অনেক। সুতরাং একে অস্বীকার করা হঠকারিতার নামান্তর। এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, 'ইলাল কা'বাঈন (পা গ্রন্থি পর্যন্ত)। সুতরাং বিষয়টি আর সন্দেহ যুক্ত নয়। তবে এ কথা ঠিক— সংযোগকারী অব্যয় মাঝখানে না থাকলে মতপার্থক্যের অবকাশ থাকবে। কোনো কোনো আলেম তাই এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। কেনন, সংযোগকারী অব্যয় সংযোজিত প্রসঙ্গগুলোকে দূরবর্তী করে দেয়। আবার সংযুক্তও করে। ইবনে মালেক এবং খালেদ আজহারী বলেছেন 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টির বিশেষত্ব রয়েছে এগারোটি— যার মধ্যে রয়েছে পার্শ্বস্থ বাক্যের প্রভাব, যা প্রতিষ্ঠিত থাকে সংযোজক 'ওয়াও' এর সঙ্গে।

আমি বলি, মাঝখানে 'ওয়াও' আসার পর নৈকট্যের প্রভাব বাকী থাকার যদি কোনো অতিরিক্ত দলিল না থাকে তবে পা ধৌত করা যে ওয়াজিব— সে কথা প্রমাণিত হয়। উপরে সে কথা বলাও হয়েছে। অর্থাৎ 'আরজুলিকুম' সম্পর্কিত 'আইদিকুম'—এর সঙ্গে। রুউসিকুমের সঙ্গে নয়। কারণ, ধৌত করতে হয় কনুই ও পায়ের গ্রন্থি। আর মসেহ করতে হয় মাথা। হাদিস শরীফসমূহে এ কথা বিবৃত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সংঘটিত হয়েছে ঐকমত্যও। কাজেই সংযোজক অব্যয়ের উপস্থিতিতেও শাব্দিক নৈকট্যের চেয়ে প্রসঙ্গের নৈকট্যের প্রভাবই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর একটি কথা এই যে, পায়ের গ্রন্থি অর্থ ওই দু'টি হাড় যেখানে মিলিত হয়েছে মূল পা এবং পায়ের পাতা। আর এ কথা কেউই বলেন না যে, পা মসেহ করার অর্থ— ওই দু'টি হাড় মসেহ করা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আরজুলিকুম' এর সংযোগ যদি 'আইদিকুম' এর সঙ্গে হয়, তবে সংযোগ লিপিটি হবে এ রকম—'দ্বরাব্তু জাইদান আও

আমরান ওয়া আকরামতু বাকরা'ওঁ ওয়া খালিদা' (আমি প্রহার করেছি জায়েদকে অথবা আমরকে এবং আমি সম্মান করেছি বকর এবং খালেদকে)। এখানে খালেদকে জায়েদের সঙ্গে সংযুক্ত করলে ভুল হবে। তবে এখানে খালেদের সঙ্গে সংযোগ ঘটতে পারে বকরের।

কেউ কেউ বলেছেন, যদি খবর সহযোগে 'আরজুলাকুম' পড়া হয় তবুও তা সংযুক্ত হবে 'রুউসিকুম'—এর সঙ্গে। রুউসিকুমই যবরের স্থান। অথবা এ রকমও বলা যায় যে, এখানে যের কে অপসারণ করে যবর বসানো হয়েছে। এ কথাটিও ভুল। কেননা, রীতিবিরুদ্ধ ও অকারণ সংযোজনকে বিশুদ্ধ বলা যায় না। কেউ আবার বলেছেন, আরজুলাকুম এর পূর্বে 'আমসাহু' (মসেহ করো) শব্দটি উহ্য রয়েছে। এ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, বিশেষ কোনো ক্রিয়ার রীতিবিরুদ্ধ পরিবর্তন বৈধ নয়। মূল উদ্দেশ্যের প্রতি যাতে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়— সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। কোনো কোনো আলেম 'ওয়া আরজুলাকুম' এর 'ওয়াও' এর অর্থ ধরে নিয়েছেন 'সঙ্গে'। কিন্তু এই ধারণাটিও ভুল। 'মাফউলেমায়াহু' (সংগতাজ্ঞাপক কর্ম) এর জন্য কেবল ক্রিয়াকে মিলিত করাই যথেষ্ট নয়—স্থান ও কালকেও মিলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কালের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ধারণাটিও একটি অবাস্তব ব্যাপার। কেননা, সংযোজনরীতির মধ্যেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। আর মাথা ও পা নিশ্চয়ই এক সঙ্গে ধৌত বা মসেহ করা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই একটি আগে এবং অপরটি পরে হবে। অথবা এখানে সাধারণ ক্রিয়াই হবে উদ্দেশ্য। তখন আর সময়ের কথা উঠবে না। ধারাবাহিকতা ও ধারাবাহিকতাহীনতা কোনোটিই তখন ধর্তব্য বলে গণ্য হবে না। আর স্থানের সম্মিলন প্রসঙ্গে এ কথা বলতে হয় যে, একই স্থানে দু'টি মসেহ (মাথা ও পা) কারোর নিকটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি উপরে বর্ণিত দুর্বল ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিয়ে 'রুউসিকুম' এর সঙ্গে সংযোগ হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে ওই 'বা' (বিরুউসিকুম) শব্দটির প্রথমে সংযুক্ত থাকার কারণে 'রুউস' (মাথা) শব্দটির অর্থ হবে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির মতো অনির্দিষ্ট। অর্থাৎ মাথার অর্থ হবে মাথার কিয়দংশ (সম্পূর্ণ মাথা নয়)। তাই অধিকাংশ ফকীহ্ মাথার কিছু অংশ মসেহ করতে হবে বলেছেন। কিন্তু 'আরজুলাকাম' শব্দটির অর্থ সে রকম অনির্দিষ্ট হবে না। অর্থাৎ 'আরজুলাকুম' (পা গ্রন্থি পর্যন্ত) অর্থ হবে সম্পূর্ণ পা। কিন্তু সম্পূর্ণ পা মসেহ করা ওয়াজিব—এ কথা কেউই বলেননি। ইমামীয়া সম্প্রদায়ের নিকট 'আরজুলাকুম' এর সংযোগ রয়েছে 'রুউসিকুম' এর সঙ্গে। তাই তারা ওজুর সময় পা ধৌত না করে মসেহ করে থাকে। নিঃসন্দেহে তাদের ব্যাখ্যা দুর্বল এবং ভুল।

হজরত আমর বিন আমবাসার ওজুর ফযীলত সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদিস আমাদের অভিমতের প্রমাণ— যার শেষাংশে বলা হয়েছে, রসুল স. বললেন, দুই পা ধুয়ে নাও, যেমন আল্লাহ্পাক হুকুম দিয়েছেন। এই পা ধোয়ার কথাটি হাদিস শরীফে পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হয়েছে। বর্ণনাকারীগণ সকলেই পা ধৌত করার কথাই

বলেছেন। পা মসেহ করার কথা কেউই বলেননি। পা ধৌত করার বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাহাবীগণের ঐকমত্য। কেবল হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আনাসের বর্ণনায় পা মসেহ করার কথা রয়েছে। কিন্তু তাঁরাও অবশেষে পা ধৌত করার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী শব্দটিকে পড়তেন 'আরজুলিকুম।' হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হজরত আলী এই উচ্চারণের প্রেক্ষিতে পা ধৌত করার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। আবু আবদুর রহমান সালামীর বর্ণনায় রয়েছে, একবার হজরত ইমাম হাসান এবং হজরত ইমাম হোসাইন পাঠ করলেন 'ওয়া আরজুলিকুম।' তাদের পাঠ শুনে হজরত আলী বললেন, এই আয়াতে কিছু শব্দের অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। যেমন এখানে 'ওয়াআরজুলিকুম' হুকুমটি হবে 'রুউসিকুমের' পূর্বে, যদিও এখানে 'ওয়া আরজুলিকুম' এসেছে 'বিরুউসিকুম' এর পরে (অর্থাৎ ধৌত করতে হবে দুই হাত কনুই পর্যন্ত, দুই পা গ্রন্থি পর্যন্ত এবং মসেহ করতে হবে মস্তক)। ওই সময় হজরত আলী জনতার একটি বিবাদের মীমাংসা করে দিচ্ছিলেন। ইবনে জারীর। পা ধৌত করার বিষয়ে সকল সাহাবী একমত—আবদুর রহমান বিন আবি লাইলীর এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন সাঈদ বিন মানসুর। ইবনে আবী শায়বাও বলেছেন, রসুল স. এবং মুসলমানদের রীতি হিসেবে সুদূর অতীত থেকে পা ধৌত করার এই নিয়মটি চলে এসেছে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, আতা বলেছেন, আমি কাউকেই পা মসেহ করার কথা বলিনি। তাহাবী এবং ইবনে হাজম দাবী করেছেন, প্রথমে মসেহ করার হুকুমই দেয়া হয়েছিলো। পরে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, কোরআনে প্রকাশ্যে মসেহের হুকুমই দেয়া হয়েছে এবং সুন্নত বা হাদিসে এসেছে পা ধৌত করার হুকুম। হজরত আনাস আরো বলেছেন, কোরআনে রয়েছে মসেহ করার প্রমাণ। কিন্তু রসুল স. পা ধৌত করতেন। আর রসুল স. এর এমন আমল করা ওই সময়ে সম্ভব, যখন আয়াতের উদ্দেশ্য হবে পা ধৌত করা অথবা মসেহ করার হুকুমটি রহিত হওয়া।

আমাদের অভিমতের সমর্থনে রয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বর্ণিত হাদিসটি— যেখানে তিনি বলেছেন, এক সফরের সময় রসুল স. ছিলেন কিছুটা পশ্চাদবর্তী। তিনি স. যখন আমাদের নিকট পৌছলেন, তখন নামাজের সময় শুরু হয়েছিলো। আমরা ওজু করছিলাম। শেষে মসেহ করলাম পা। রসুল স. তখন উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলেন, শুষ্ক পদসমূহের জন্য রয়েছে ওয়ায়েল দোজখ অথবা দোজখের শাস্তি। বোখারী, মুসলিম।

এক বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা কতিপয় লোককে ওজু করতে দেখে বললেন, ওজু পূর্ণ করো। আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, শুকনো পায়ের জন্য রয়েছে দোজখের আযাব। বোখারী, মুসলিম। এরূপ বক্তব্য এসেছে হজরত জাবের এবং মাতা আয়েশা সিদ্দিকার হাদিসেও।

যাঁরা পা মসেহ করার পক্ষপাতি তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এই হাদিসটিকে—হজরত উয়াইস বিন আবী উয়াইস বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং দেখেছি রসুল স. ওজু করলেন এবং শেষে মসেহ করলেন তাঁর পবিত্র পাদুকার উপর। তারপর নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জুতা এবং পায়ের উপর মসেহ করলেন।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিসের পবিত্র পাদুকা বা নালাইন ছিলো চামড়ার মোজার মতো— যা সম্পূর্ণ পা আবৃত করে থাকে। মোজার উপর যেমন মসেহ করা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি, তিনি স. তাঁর পবিত্র পাদুকার উপর মসেহ করেছিলেন। ইয়া'লীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ওজু করলেন এবং উভয় পায়ে মসেহ করলেন। বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ইয়া'লী থেকে বর্ণনাটি এনেছেন হাইসাম। আর ইমাম আহম্মদ হাইসামকে তাদলীসকারী বলেছেন (পণ্য বিক্রয়ের সময় যে পণ্যের দোষ-ক্রটি গোপন করে তাকে বলে তাদলীস)। সুতরাং বুঝতে হবে হাইসাল নিশ্চয়ই অন্য কোনো বর্ণনাকারীর নিকট শুনে তার কথা গোপন করে বলেছে— আমি ইয়া'লী থেকে শুনেছি। অথবা বর্ণনাটির প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম—রসুল স. তাঁর পবিত্র পা মসেহ করেছেন ওই সময়, যখন তাঁর পবিত্র পদযুগল ছিলো মোজার ভিতরে এবং তিনি মোজার উপরেই মসেহ করেছিলেন। আর এই মসেহকেই পা মসেহ করেছেন বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ সাধারণ কথাবার্তায় এ রকম বলে থাকে, আমি যখনই আমিরের নিকটে যাই, তখনই তার পদচুম্বন করি— এ কথার অর্থ হয়— যদি তখন আমিরের পায়ে মোজা না থাকে তবে পদচুম্বন করি। আর যদি তিনি মোজা পরিহিত অবস্থায় থাকেন তখন চুম্বন করি তার মোজা। উভয় অবস্থাকে পদচুম্বন বলা যায়। কিন্তু মোজার উল্লেখ না থাকলে আমিরের পা মোজা আবৃত ছিলো এ কথা প্রমাণ করা যায় না। মোজা আবৃত পায়ের কথাটি প্রমাণ করা তখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে (উপরোক্ত হাদিসে বর্ণিত পা মসেহের কথাটিকে তেমনি মোজার উপরে মসেহ প্রমাণ করা দুঃসাধ্য)। এর উত্তরে এই বলা যেতে পারে যে, দু'টি আয়াত অথবা দু'টি উচ্চারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে উভয়টি আমল করার একটি পদ্ধতি বের করা ওয়াজিব। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি এই—বর্ণিত আমল দু'টোর সময় এবং অবস্থা পৃথক পৃথক করে দিতে হবে। দু'টো অবস্থার উল্লেখ করা তখন জরুরী হবে অন্যথায় নিশ্চয়ই কোনো কারণ প্রদর্শন করা জরুরী হবে। যেমন এই আয়াতটি—'ওয়ালা তাক্বরাবুহুন্না হাত্তা ইয়াত্হুরনা' (এবং তোমরা তোমাদের পত্নীদের নিকট ঋতুবতী অবস্থায় গমন কোরো না, যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়)। এখানে পবিত্র হওয়া সম্পর্কে দু'টো উচ্চারণ রীতি (ক্বেরাত) রয়েছে। একটি হচ্ছে 'ইয়াত্হুরনা' এবং অন্যটি 'ইয়াত্তাহারনা।' প্রথম উচ্চারণ অনুসারে অর্থ হবে, যখন ঋতুর পুরো দশ দিন অতিবাহিত হবে এবং দশ দিনের পর যখন পবিত্র হয়ে যাবে। দ্বিতীয় উচ্চারণ অনুসারে অর্থ হবে— যখন দশ দিনের কম সময়ে ঋতুস্রাব শেষ হবে এবং তারা পবিত্র হবে। যদি এখানে এ

রকম বলা হয় যে, রসুল স. এর সময়ে চামড়ার মোজা ব্যবহারের প্রচলন ছিলো খুব কম, তবে আমরা বলবো পা মসেহ করার বর্ণনাটি গ্রহণ না করাই সমীচীন।

'ইলাল মারাফিক্ব ' অর্থ যেমন কনুই পর্যন্ত তেমনি 'ইলাল কা'বাঈন' অর্থ পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত। পায়ের গ্রন্থি অর্থ ওই গ্রন্থি যা পায়ের উভয় দিকে একটু করে উঁচু হয়ে থাকে। হাঁটুকে পায়ের গ্রন্থি বলা যায় না। আবার জুতার ফিতা বাঁধার স্থানকেও গ্রন্থি বলা হয় না। 'কা'বাঈন' শব্দটি দ্বিবচন বিশিষ্ট। এক বচন হচ্ছে কা'ব। এখানে পায়ের গ্রন্থি বুঝাতে দ্বিবচনসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, প্রতিটি পায়ের গ্রন্থিতে দু'টো হাড় দু'পাশে বেরিয়ে থাকে। তাই এখানে পায়ের গ্রন্থি বুঝাতে একবচন বা বহুবচন ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচন।

মাসআলাঃ পুরোপুরি ওজু করে (পা ধৌত করা সহ) চামড়ার মোজা পরিধান করার পর ওজু ভেঙে গেলে, পুনঃ ওজু করার সময় সব শেষে পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার উপর মসেহ করলেই যথেষ্ট হবে। সফরে এবং গৃহবাসে এ রকম করা যাবে বলে জমহুর অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, গৃহবাসী (মুকিম) অবস্থায় মোজার উপরে মসেহ করা যাবে না। মুসাফির অবস্থায় যাবে।

আবু বকর বিন দাউদ এবং ইমামীয়া গোত্রের নিকট মোজার উপর মসেহ সকল অবস্থায় নাজায়েয। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন 'আরজুলাকুম' পড়া হলে সংযোগ হবে 'আইদিকুম' এর সঙ্গে এবং তখন পা ধোয়া হবে ওয়াজিব। আর 'আরজিলুকুম' পড়লে সংযোগ হবে 'রুউসিকুম' এর সঙ্গে এবং তখন পা মসেহ করা হবে ওয়াজিব— কিন্তু পা থাকতে হবে মোজার ভিতরে। কেননা, দু'টি উচ্চারণ (ক্বেরাত) রয়েছে দু'টি আয়াতের মতো। একটি ক্বেরাতের লক্ষ্য প্রকৃত এবং অন্যটির লক্ষ্য রূপক। প্রতিটি ক্বেরাতের তরতীব এবং শব্দের পরিমাণ অপর ক্বেরাতের তরতীব এবং শব্দের পরিমাণ থেকে পৃথক হবে। প্রথম ক্বেরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে পা ধৌত করা এবং দ্বিতীয় ক্বেরাতের রূপক উদ্দেশ্য হবে পায়ের উপর মসেহ করা (মোজার উপর মসেহ করা)। যদি একটির তাফসীর এ রকম করা হয়, তবে মোজার উপরে মসেহ করার নির্দেশটি হবে প্রসিদ্ধ— যদ্দারা কোরআনের নির্দেশ রহিত হওয়া জায়েয হবে। হাফেজে হাদিসের একটি দল বলেছেন, মোজার উপর মসেহের নির্দেশটি বহুজনবিদিত। মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা আশি জনেরও বেশী। তাদের মধ্যে আশারায়ে মোবাশারা (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী)ও রয়েছেন। ইবনে আবী শায়বা প্রমুখ লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আমার নিকট সত্তরজন সাহাবী মোজার উপর মসেহ করার হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি মোজার উপর মসেহের সমর্থক হবো না। আবার তিনি এ কথাও বলেছেন, যে ব্যক্তি মোজার উপর মসেহকে জায়েয না বলে, তার সম্পর্কে আমি কুফরীর (অবিশ্বাসের) আশংকা করি। ইমাম আহমদ বলেছেন, আমার হৃদয়ে মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে কোনো দ্বিধা নেই। এ সম্পর্কে সাহাবীগণের চল্লিশটি হাদিস

বর্ণিত হয়েছে। হাদিসগুলোর কোনো কোনোটি মারফু আবার কোনো কোনোটি মাওকুফ। ওই হাদিসগুলো থেকে দু'টো হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। একটি এই—হজরত মুগীরা বিন শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমি এক সফরে রসুল স. এর একান্ত সঙ্গী ছিলাম। এক স্থানে তিনি স. আমার নিকট পানির পাত্র চাইলেন। আমি পানিপূর্ণ একটি পাত্র এনে দিলাম। তিনি স. সেটি নিয়ে চলতে চলতে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের পর পুনরায় ফিরে এলেন আমার কাছে। আমি পানির পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম। নামাজের পূর্বে যেভাবে ওজু করতে হয়, তিনি সেভাবে ওজু করলেন এবং শেষে পা না ধুয়ে মোজার উপর মসেহ করলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত মুগীরার এই হাদিসটি কমপক্ষে ষাটটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি সূত্রে বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছেন ইবনে মান্দা।

দ্বিতীয় হাদিসটি এই— হজরত জারীর বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসুল স. প্রস্রাব করার পর ওজু করেছেন এবং মোজার উপর মসেহ করেছেন। ইব্রাহিম বলেছেন, এ হাদিসটি ছিলো অত্যন্ত জনপ্রিয়। হজরত জারীর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সুরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার অনেক পরে। আলোচ্য আয়াতটির নির্দেশ দৃষ্টে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, প্রথম দিকে তিনি স. অত্যাবশ্যকরূপে পা ধৌত করতেন। পরে (কখনো কখনো) মসেহ করতেন। পরবর্তীকালে এই অবস্থার কথাই বর্ণিত হয়েছে হজরত জারীরের হাদিসে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। ইবনে আবদুল বার মালেকী বর্ণনা করেছেন, কোনো ফেকাহ্শাস্ত্রবিদই মোজার উপর মসেহ জায়েয হওয়াকে অস্বীকার করেননি। অস্বীকৃতিসূচক বক্তব্য এসেছে কেবল ইমাম মালেকের পক্ষ থেকে। কিন্তু বিশুদ্ধ সূত্রে এ রকমও প্রমাণিত হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তিনিও মোজার উপর মসেহকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সাহাবীগণের মধ্যে এ রকম কেউ ছিলেন না যিনি মোজার উপর মসেহকে অস্বীকার করেছেন। অস্বীকৃতি এসেছে কেবল হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা এবং জননী আয়েশা থেকে। কিন্তু পরে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবু হোরায়রা তাঁদের মত পরিবর্তন করেছিলেন। বিশুদ্ধ সূত্রে এ কথা এসেছে, তাঁরাও শেষে অন্যান্য সাহাবীর অভিমতকে গ্রহণ করেছিলেন। আর জননী আয়েশা সম্পর্কে মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে— একবার শোরাইহ্ বিন হানী মাতা আয়েশা সিদ্দিকাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইবনে আবী তালেবকে জিজ্ঞেস করো। তিনি রসুল স. এর সঙ্গে অনেক সফর করেছেন। শোরাইহ্ তখন হজরত আলীর নিকটে গিয়ে এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হজরত আলী বললেন (মোজা মসেহের জন্য) রসুল স. মুসাফিরকে তিন দিন তিন রাত এবং মুকিমকে এক রাত এক দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান। জননী আয়েশা সিদ্দিকা থেকে দারা কুতনীও মোজার উপর মসেহ জায়েয হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা এনেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আলী বলতেন, মোজার উপর মসেহ করা এবং আমার গাধার পিঠের উপর মসেহ করা একই কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আয়েশা বলেন, মোজার উপর মসেহ করার চেয়ে পা কেটে ফেলাই আমার নিকট উত্তম—এ সকল কথা ভিত্তিহীন ও ভুল। হাদিসের হাফেজগণ এগুলোর যথা ব্যাখ্যাদান করেছেন।

মাসআলাঃ মুসাফির তিন দিন তিন রাত্রি এবং মুকিম এক দিন এক রাত্রি মোজার উপর মসেহ করতে পারবে। হজরত আবু বকরের বর্ণনায় রয়েছে, মুসাফির তিন দিন এবং মুকিম এক দিন মোজার উপর মসেহ করতে পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে, মোজা পরিধান করতে হবে পবিত্রাবস্থায়। তিরমিজি, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, ইবনে জারুদ, শাফেয়ী, ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী, দারা কুতনী। বায়হাকী লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর নিকট অভিমতটি বিশুদ্ধ। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত মুগীরার হাদিসটিতে এ কথাও রয়েছে যে, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি কি আপনার মোজা খুলে দেবো। তিনি স. বললেন, যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকতে দাও। পবিত্র অবস্থায় আমি মোজা পরিধান করেছি। ইবনে জাওজী তাঁর আত্তাহ্কিক গ্রন্থে এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আলী, হজরত সাফওয়ান বিন আস্সাল, হজরত ওমর বিন খাত্তাব। হজরত আমর বিন আবী উমাইয়া জামরী, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত খুজাইমা বিন সাবেত থেকে আমরা ওই হাদিসগুলো মিনারুল আহ্কাম গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। হাদিসগুলোতে মসেহের সময়সীমা সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। ইমাম মালেক মুকিমকে মোজার উপর মসেহ করার অনুমতি দেননি। মুসাফিরকে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করেননি। উপরোক্ত হাদিসগুলো তাঁর এই অভিমতের বিরুদ্ধে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার নিকট ওজুর মধ্যে তরতিব (ধারাবাহিকতা) এবং তাওয়ালী (দ্রুত অঙ্গ ধৌত করা) জরুরী নয়। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেকের নিকট তরতিব ও তাওয়ালী দু'টোই শর্ত। ইমাম মালেক বলেছেন, তরতিব ও তাওয়ালী জরুরী। ইমাম শাফেয়ীর প্রথম দিককার বক্তব্যও এ রকম। আমরা আমাদের অভিমত প্রমাণার্থে এ কথা বলি যে, আয়াতে 'ওয়াও' (এবং) সহযোগে ওজুর অঙ্গগুলো ধৌত এবং মসেহ করার কথা বলা হয়েছে। এই 'ওয়াও' বা 'এবং' দ্বারা এক বা একাধিক বিষয়কে একত্র করা হয় মাত্র। এতে করে তরতিব বা তাওয়ালী কোনোটিই প্রমাণিত হয় না। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এ বিষয়টি আমার নিকট লক্ষণীয় নয় যে, আমি কোন অঙ্গ থেকে ওজু শুরু করবো।

ইমামত্রয় হজরত উবাই বিন কা'ব এবং হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস থেকে তাঁদের অভিমতের পক্ষে দলিল গ্রহণ করেছেন। ওই হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. ওজুর পানি চেয়ে নিয়ে ওজুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করলেন। তারপর বললেন, এভাবে ওজু করতে হয়। এভাবে ওজু না করলে আল্লাহ্পাক নামাজ কবুল করবেন না। এরপর তিনি স. দু'বার করে ওজুর অঙ্গগুলো ধৌত

করলেন এবং বললেন, এটাই আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের ওজু। যারা এ রকম করবে আল্লাহ্পাক তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দিবেন। অতপরঃ তিনি স. তিনবার অঙ্গসমূহ ধৌত করলেন। দারা কুতনী। এ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. তরতিব ও তাওয়ালীর সঙ্গে ওজু করেছেন এবং বলেছেন, এ রকম ওজু না করলে আল্লাহ্পাক নামাজ কবুল করবেন না। অতএব তরতিব ও তাওয়ালী ফরজ। কিন্তু আমরা বলি, এভাবে আহরিত দলিল নির্ভুল নয়। কারণ— ১. হজরত উবাই বিন কা'ব বর্ণিত হাদিসের এক বর্ণনাকারী যায়েদ বিন আবীল জাওয়ারীকে অপদার্থ বলেছেন ইয়াহ্ইয়া। দুর্বল বলেছেন আবু জুরায়া। আরেক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ বিন ওরওয়া সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া মন্তব্য করেছেন, সে কিছুই না। বোখারী বলেছেন, তার বর্ণনা পরিত্যাজ্য।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটির এক বর্ণনাকারী মুসাইয়্যেব বিন ওয়াজেহ্ ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ২. তরতিব ও তাওয়ালী প্রমাণের জন্য যদি তার বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়, তবে আমরাও তার বিরুদ্ধে এ রকম দলিল উপস্থিত করে বলতে পারি যে, রসুল স. ডান দিক থেকে ওজু শুরু করেছেন, বাম দিক থেকে মেসওয়াক করেছেন অথবা করেননি, নাক ঝেড়েছেন অথবা ঝাড়েননি। এ রকম বিপরীত কার্যকলাপগুলোর মধ্যে নিশ্চয় যে কোনো একটি রীতিকে ওয়াজিব প্রমাণ করতে হবে—কিন্তু এ রকম করা কি সম্ভব? ৩. বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য আসলে এ কথা প্রমাণ করা যে, একবার করে অঙ্গ ধৌত কলেই ওজু হয়ে যাবে। এর চেয়ে কম করলে হবে না। এর চেয়ে কম যারা করবে, তাদের নামাজ আল্লাহ্পাক কবুল করবেন না।

হজরত আমর বিন আব্বাসের হাদিসের মাধ্যমেও তরতিব ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি একটি পাত্রে ওজুর পানি নিয়ে কুলি করে ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করে তার মুখ ও নাকের গোনাহ্ পানির সাথে ঝরে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন গোনাহ্ ঝরে যায় তার দাড়ির সমপরিমাণ। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিলে ঝরে যায় হাতের গোনাহ্সমূহ। মাথা মসেহ করলে মাথার চুলের পরিমাণ গোনাহ্ চলে যায়। আর পায়ের গ্রন্থি (টাখনু) পর্যন্ত ধৌত করলে ঝরে যায় পায়ের গোনাহ্। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় 'ফা' (অতঃপর) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তরতিবের জন্য।

আমরা বলি, গোনাহ্ মাফের সুসংবাদ প্রদান করাই ছিলো বর্ণিত হাদিসের প্রধান উদ্দেশ্য। তরতিব প্রমাণ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তরতিব না রক্ষা করা হলে ওজু হবে না বা মাগফেরাত হবে না এ রকম কোনো বক্তব্য হাদিসটিতে নেই।

'তাওয়ালী' জরুরী— এ কথা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে আরেকটি হাদিসের মাধ্যমে— যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি নামাজের জন্য ওজু করলো। তার পায়ের উপরের দিকে নখ পরিমাণ স্থান শুকনো রয়ে গেলো। রসুল স. তা দেখে বললেন, পুনরায় ওজু করো। ওই ব্যক্তি পুনরায় ওজু করলো। তারপর নামাজ

পাঠ করলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও আবু দাউদ হজরত আনাস থেকে এবং মুসলিম হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে। কিন্তু এখানে তাওয়ালী ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ আসলে নেই। কেননা, উত্তমরূপে ওজু করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাদ পড়ে যাওয়া অংশটুকু পুনরায় ধৌত করা। এভাবে ওজু পূর্ণ হয়। সেই পূর্ণ করার কথাই বলা হয়েছে হাদিসে। তাওয়ালীর প্রমাণ তাহলে কোথায়?

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে এ রকম—হজরত ওমর বলেছেন, রসুল স. তাকে দ্বিতীয়বার ওজু করার নির্দেশ দিলেন। এই বর্ণনার সূত্রসংযুক্ত ইবনে লেহিয়া ছিলো বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে একজন বর্ণনা করেছেন, এক লোক নামাজ পড়ছিলো। তার পায়ের উপরে দেরহাম পরিমাণ অংশ ছিলো শুকনো। সেদিকে লক্ষ্য করে রসুল স. তাকে পুনরায় ওজু করার নির্দেশ দিলেন। এই হাদিসের সনদেও দুর্বলতা দৃষ্ট হয়। এ সূত্রের এক বর্ণনাকারী বাকীয়াহ্ ছিলো মুদাল্লাস। বলিষ্ঠ কোনো বর্ণনাকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে তার বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা যায় না।

'তাওয়ালী' জরুরী না হওয়ার প্রমাণ রয়েছে জননী উম্মে মায়মুনা বর্ণিত ওই হাদিসে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. গোসল করলেন। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে ধৌত করলেন পবিত্র পদযুগল। বোখারী।

হজরত নাফে থেকে ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন (বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ইমাম শাফেয়ীর আল উম গ্রন্থে), মদীনার বাজারের এক স্থানে হজরত ইবনে ওমর ওজু করলেন। তখনো তাঁর পা মসেহ করা হয়নি। জানাযার কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ লোকদের সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন জানাযার স্থানে। তারপর মোজার উপর মসেহ করলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, অন্যান্য অঙ্গের ওজুর পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর হজরত ইবনে ওমর একবার পা ধৌত করেছেন।

ইমাম আজমের মতে ওজুর নিয়ত জরুরী নয়। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন জরুরী। তাঁদের কথা হচ্ছে ওজু ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত— এ কথাটি ঐকমত্যসম্মত। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিইয়' বুদুল্লহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন (তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি— তাঁরা বিশুদ্ধতার সঙ্গে আল্লাহ্র ইবাদত করবে)। হাদিস শরীফে এসেছে, ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত' (নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়ত নির্ভর)। আমরা বলি, এখানে ওজু হবে দু'রকম। একটি হচ্ছে— ওজু ইবাদত। যার কারণে ওজুর মাধ্যমে গোনাহ্ মাফ হয়। এ রকম নিয়তে ওজু করলে নিয়ত জরুরী হবে কেননা ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত। ওজুর আরেকটি ধরন হচ্ছে এ রকম—ওজু নামাজের চাবি—এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, নামাজের শর্তসমূহের মধ্যে ওজুও একটি শর্ত। আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরী নয়। নামাজের অন্যান্য শর্তের জন্য যেমন নিয়ত জরুরী নয়— তেমনি ওজুর জন্যও নিয়ত জরুরী নয়।

মাসআলাঃ জমহুরের অভিমত হচ্ছে—ওজুর জন্য বিসমিল্লাহ্ বলা, কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া শর্ত নয়। ইমাম আহমদের মতে বর্ণিত তিনটি কাজই ওজুর রোকন (স্তম্ভ) এবং তিনটিই জরুরী। কারণ, রসুল স. বলছেন, যে ব্যক্তি বিস্‌মিল্লাহ্ বলবে না, তার ওজু হবে না। ইমাম আহমদসহ হাদিস বিশারদগণের একটি দলও কাসীর বিন জায়েদের মাধ্যমে বর্ণনাটি এনেছেন। বর্ণনাসূত্রটি এ রকম—কাসীর বিন জায়েদ—রমীহ বিন আবদুর রহমান—আবদুর রহমান বিন হজরত আবু সাঈদ খুদরী। হজরত আবু সাঈদ খুদরী ছিলেন রমীহের পিতামহ। তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনাটি এনেছেন সাঈদ বিন জায়েদের মাধ্যমে। বর্ণনাসূত্রটি এ রকম—সাঈদ বিন জায়েদ—আবদুর রহমান বিন হারমেলা—আবু সীফাল রেবাহ্—তার পিতা—তার পিতা। ইমাম আহমদ এবং সুনান রচয়িতাগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এই বর্ণনাসূত্রটির মধ্যে ইয়াকুব বিন সালমাও রয়েছেন। দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি ওজু করলো এবং বিসমিল্লাহ্ পড়লো, সে তার সম্পূর্ণ শরীরকে পবিত্র করে নিলো এবং যে বিসমিল্লাহ্ ছাড়া ওজু করলো সে পবিত্র করে নিলো তার ওজুর অঙ্গসমূহ।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. যখন ওজুর জন্য উঠতেন, তখন ওজুর পূর্বেই বিসমিল্লাহ্ পড়তেন। তিরমিজি, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আদ্দি। হজরত খাসীফের বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল স. এর সামনে বিসমিল্লাহ্ না পড়েই ওজু করে ফেললো। রসুল স. বললেন, তুমি পুনরায় ওজু করো। সে পুনরায় বিসমিল্লাহ্ না বলে ওজু করলো। তিনি স. বললেন, তুমি আবার ওজু করো। তৃতীয়বার সে বিসমিল্লাহ্ বলে ওজু করলো। রসুল স. বললেন, এবার তুমি সঠিক ওজু করেছো এবং কল্যাণ লাভ করেছো।

পর্যালোচনাঃ ওপরে বর্ণিত সব কয়টি হাদিসই দুর্বল। হজরত খাসীফ থেকে বর্ণিত হাদিস তো পুরোটাই বানানো এবং ভিত্তিহীন। আবু বকর আসরাম বলেছেন, আমি ইমাম আহমদকে বলতে শুনেছি, কোনো সূত্রেই বিসমিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে কাসীর বিন জায়েদের হাদিসটিই দীর্ঘ। কিন্তু কাসীর দুর্বল। আবদুর রহমান বিন হারমেলাও দুর্বল। তার হাদিস প্রামাণ্য নয়— এ রকম বলেছেন আবী হাতেম। বোখারীর নিকটেও সে অবলিষ্ঠ। আবু সীফাল রেবাহ্—এরাও প্রসিদ্ধ নয়। আর রেবাহের পিতামহীর নাম-পরিচয় অজ্ঞাত। আবী হাতেম ও আবু জুরায়া এ রকম বলেছেন। ইয়াকুব বিন সালমা সম্পর্কে বোখারী লিখেছেন, ইয়াকুব—সালমা—হজরত আবু হোরায়রা—সূত্রটি অজ্ঞাত।

হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসের সূত্রভূত হারেসাও দুর্বল। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইবনে আদ্দির মাধ্যমে এ রকম একটি বর্ণনা এসেছে হজরত আলী থেকে। কিন্তু এই বর্ণনাটির সনদও সঠিক নয়। হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী আবদুল মালেক অত্যন্ত দুর্বল এবং হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত

হদিসের বর্ণনাকারী আবু বকর দাহের পরিত্যক্ত। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বিন হাশেমুস্শামশাদও পরিত্যক্ত। মুরসালরূপে হাদিসটি আবানের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই হাদিটিও দূর্বল। সার কথা হচ্ছে বিস্মিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোনো হাদিসই নেই। এ সকল কারণে ইমাম আহমদ বলেছেন, যে বিসমিল্লাহ্ না পড়ে ওজু করে, তাকে আমি পুনরায় ওজু করতে বলি না। আমার বিশ্বাস, তার ওজু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমদ এ কথা বলে জয়ীফ হাদিসের তুলনায় তাঁর কিয়াসকেই (অনুমানকেই) অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, উপর বর্ণিত দুর্বল হাদিসগুলো একে অপরের সাহায্যে কিছুটা হলেও শক্তি অর্জন করেছে— যদ্দারা কমপক্ষে এতোটুকু বুঝা যায় যে, নিশ্চয়ই এর কিছুটা ভিত্তি থাকা সম্ভব।

'বিসমিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হজরত আবু হোরায়রার মারফু হাদিসটির ভাষ্য এ রকম—রসুল স. বলেছেন, যে কাজ বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত আরম্ভ করা হয় না, সে কাজে কোনো বরকত থাকে না। আমরা বলি, এই হাদিসের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় না। যদি হতো তবে প্রত্যেক কাজের শুরুতে হামদ্ (আল্লাহ্র প্রশংসাবাণী) উচ্চারণ করাও ওয়াজিব হতো। ওজুর পূর্বে তো ওয়াজিব হতোই। কেননা, হামদ্ সম্পর্কে এ রকম হাদিস রয়েছে।

এ সম্পর্কে হজরত আবু জাহীমের বিশুদ্ধ হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. জামাল কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি স. তৎক্ষণাৎ সালামের জবাব দিলেন না। এগিয়ে গেলেন একটি প্রাচীরের নিকটে। প্রাচীর গাত্র স্পর্শ করে তায়াম্মুম করার পর ওই ব্যক্তির সালামের উত্তর দিলেন.। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সালামে রয়েছে আল্লাহ্র নাম। এবং রসুল স. পবিত্র হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা সমীচীন মনে করেননি। যদি তাই হয়, তবে ওজুর পবিত্রতার পূর্বে বি্সমিল্লাহ্ পড়া যেতে পারে কিরূপে? যদি এ কথা বলা যায়, হাদিস শরীফে ওজুর সময় বিসমিল্লাহ্ পড়ার কথা এসেছে। তবে তাকে ওয়াজিব না বলে মোস্তাহাব বলা সঙ্গত হবে। হাদিস শরীফে উল্লেখিত 'বিসমিল্লাহ' না পড়লে ওজু হবে না' কথাটির অর্থ তখন হবে বিসমিল্লাহ ব্যতিরেকে ওজুর পূর্ণত্ব অর্জিত হবে না (ওজু যে হবেই না—এ রকম নয়)।

কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ রূপে জননী আয়েশা এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওজুর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া গত্যন্তর নেই। অথবা বলেছেন, এগুলো ছাড়া ওজু পূর্ণ হয় না। হজরত আবু হোরায়রার এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. কুলি করতে ও নাকে পানি দিতে বলেছেন। এই বর্ণনা তিনটি লিপিবদ্ধ করেছেন দারা কুতনী। বর্ণনাগুলো সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য এই যে, হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসের সূত্রভূত সুলায়মান বিন মুসাকে পরিত্যক্ত বলে অভিহিত করেছেন বোখারী এবং নাসাঈ তাকে বলেছেন দুর্বল। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত জাবের জু'ফীকে আইয়ুব সেজেস্তানী এবং জায়েদা মিথ্যুক বলেছেন। নাসাঈ বলেছেন, পরিত্যক্ত। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসের বর্ণনাকারী হুদ্বাহ্ এবং দাউদ বিন মোজের উল্লেখ করেছেন যে, হাম্মাদের

মাধ্যমে আম্মার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন মুরসালরূপে। ইবনে জাওজী বলেছেন, হুদ্‌বাহ্ ছিলেন নির্ভরযোগ্য। বোখারী ও মুসলিমে তাঁর বর্ণনা এসেছে। যদি তিনি এই মুরসাল বর্ণনাকে মারফু হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন, তবে বলতে হয়—নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর কিঞ্চিত অতিরিক্ততাও গ্রহণযোগ্য। অবশ্য মুরসাল বর্ণনাও দোষের কিছু নয়। মুরসালও প্রমাণ হিসেবে গণ্য।

নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব—এ কথার প্রমাণ হিসেবে হজরত আবু হোরায়রার একটি হাদিসে এসেছে—রসুল স. বলেছেন, যে ওজু করে সে যেনো নাকের ছিদ্রপথে পানি দেয় এবং নাক ঝাড়ে। মুসলিম। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, সে যেনো নাকে পানি দেয় এবং নাক ঝেড়ে ফেলে। বোখারী, মুসলিম। ইবনে জাওজী লিখেছেন, হজরত ওসমান বিন আফফান, হজরত সালমান বিন কায়েস এবং হজরত মিকদাম বিন মাদী করবের হাদিসেও এ রকম বলা হয়েছে। মারফুরূপে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তায়লাসী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'বার অথবা তিনবার খুব করে নাক ঝাড়ো। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ওজু করে সে যেনো নাক ঝাড়ে দু'বার অথবা তিনবার। হাদিসটি হাসান। আমরা বলি, বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে নাসিকার অভ্যন্তরে পানি পৌঁছানো এবং নাসিকা প্রক্ষালনের যে নির্দেশ এসেছে তা ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাড়া যেহেতু এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই তা হবে সমগুরুত্বসম্পন্ন। আর এভাবে তা মোস্তাহাবই হবে। কেননা, নাক ঝাড়া ওয়াজিব এ কথা কেউই বলেন নি। আর দেখুন, হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওজুর সময় নাক ঝাড়লে উত্তম, না ঝাড়লে ক্ষতি নেই। অতএব বিসমিল্লাহ্ বলা, নাকে পানি দেয়া এবং নাক ঝাড়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোকে যদি বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়াও যায়, তবে সেগুলোকে ওয়াজিব হওয়ার দলিল বলা যাবে না, বলতে হবে মোস্তাহাব। ইমাম আবু হানিফা এ রকমই বলেছেন। কারণ, তাঁর মতে কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশের সঙ্গে হাদিস শরীফের নির্দেশাদিকে সমগুরুত্বপূর্ণ মনে করা বৈধ নয়। অত্যাবশ্যক হিসেবে অতিরিক্ত সংযোজন রহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, হাদিস কখনো কোরআনকে রহিত করতে পারে না। কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে যে, ওজুর রোকন চারটি (হাত, মুখ ও পা ধৌত করা এবং মাথা মসেহ করা)। এই চারটি রোকন সম্পাদিত হলেই ওজু হয়ে যাবে এবং ওই ওজু দিয়ে নামাজও পড়া যাবে। এর সঙ্গে যদি হাদিসের নির্দেশগুলোকে ওয়াজিব হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে কোরআনের নির্দেশ (চারটি রোকন) রহিত হয়ে যাবে—যা অসম্ভব। হাদিসে আহাদের মাধ্যমে কখনো কোরআন রহিত হয় না। আল্লাহ্পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

দ্রষ্টব্যঃ ওজুর সুন্নতগুলো হচ্ছে — ১. নিয়ত ২. ওজুর প্রারম্ভে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, ৩. কুলি করা, ৪. নাকে পানি দেয়া ৫. নাক ঝাড়া (নিয়তের পরে আমলগুলো করতে হবে তিনবার করে)। ৬. ধৌতযোগ্য অঙ্গগুলোকে তিনবার করে ধৌত করা ৭. একবার মাথা মসেহ করা ৮. তরতিব (ধারাবাহিকতা) এবং ৯. তাওয়ালী (আমলগুলো অবিচ্ছিন্নরূপে সম্পাদন করা)।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদের নিকট একবার নিবেদন করা হলো— রসুল স. কিভাবে ওজু করতেন তা আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তিনি পানির পাত্র আনতে বললেন। পাত্র আনা হলো। প্রথমে তা থেকে পানি নিয়ে দুই হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধুয়ে ফেললেন। তারপর কুলি করলেন তিনবার এবং নাকে পানি দিলেন তিনবার তারপর তিনবার ধৌত করলেন মুখ-মণ্ডল। তারপর দুই কনুই পর্যন্ত দুই হাত। এরপর দুই হাতে মাথা মসেহ করলেন এভাবে—প্রথমে হাত নিয়ে গেলেন পিছনের দিকে তারপর পিছন থেকে সামনের দিকে। শেষে দুই পা ধৌত করলেন টাখনু পর্যন্ত এবং বললেন, রসুল স. এভাবে ওজু করতেন। বোখারী, মুসলিম। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন তিনবার করে, তিন চউল পানি দ্বারা। হজরত আলীর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কুলি করলেন তিনবার, নাকে পানি দিলেন তিনবার, মুখাবয়ব ধৌত করলেন তিনবার, কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন তিনবার এবং মাথা মসেহ করলেন একবার। শেষে পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে দাঁড়িয়ে পাত্রে রক্ষিত অবশিষ্ট পানি পান করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে রসুল স. এর ওজুর নিয়ম দেখিয়ে দেয়ার জন্যই এ রকম করেছি। তিরমিজি, নাসাঈ। দারা কুতনী লিখেছেন, এ রকম কোনো হাদিস পাওয়া যায়নি— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. নিয়ত, তরতিব এবং তাওয়ালীর মধ্য থেকে কোনো একটি আমল বাদ দিয়েছেন। অতএব এ তিনটি কাজ সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তিনবার মাথা মসেহ করা সুন্নত।

হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদ, হজরত সালমা বিন আকওয়া, হজরত আনাস, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত বারা বিন আজীব, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে এসেছে— রসুল স. মাথা মসেহ করেছেন একবার। অতএব একবার মসেহ করাই সুন্নত, তিনবার নয়।

তিনবার মাথা মসেহ করার প্রমাণ হিসেবে বোখারী বর্ণিত হজরত ওসমানের একটি হাদিসকে উপস্থাপন করেছেন ইমাম আহমদ—যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. ওজু করতেন তিনবার করে। এই তিনবার ওজু করার অর্থ হচ্ছে—ওজুর অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করা এবং তিনবার মাথা মসেহ করা। হজরত আলী থেকেও এ রকম একটি বর্ণনা রয়েছে। তিরমিজি।

আমরা বলি, এখানে তিনবার ওজু করার অর্থ ধৌতব্য অঙ্গগুলো তিনবার ধৌত করা। আবু দাউদ বলেছেন, হজরত ওসমান থেকে বর্ণিত সকল বিশুদ্ধ হাদিসে একবার মস্তক মসেহ করার কথা এসেছে। কিন্তু হজরত আলীর বর্ণনায় এসেছে— তিনি ওজু করলেন, মাথা এবং উভয় কান মসেহ করলেন তিনবার। এ কথার অর্থ তিনি হাত নিয়ে গেলেন মস্তকের পশ্চাতভাগে এবং অগ্রভাগে। এর জন্য তিনি একাধিকবার পানি ব্যবহার করেছেন—সে কথা প্রমাণিত হয়নি। পানি নিয়েছিলেন তিনি একবার তারপর কয়েকবার সামনে পিছনে করে মাথায় হাত বুলিয়েছেন। এভাবে মসেহ করলে একবারই মসেহ করেছেন বলা উচিত। তাছাড়া হজরত

আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদের বর্ণনায় এসেছে, তিনি উভয় হাত নিয়ে গেলেন মস্তকের পশ্চাদ্দিকে, তারপর নিয়ে এলেন সামনের দিকে, পুনরায় পিছনের দিকে, সেখান থেকে আবার সামনের দিকে— যেখান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন (এভাবে মসেহ করাকে এক বারই মসেহ করা বলাই সমীচীন, তিনবার নয়)।

দুই কান মসেহ করাও সুন্নত। হজরত আবু উমামা বাহেলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তাঁর মস্তকের অংশ তিনি স. মসেহ করতেন একবার। আহমদ ও সুনান রচয়িতাগণ দু'বার মসেহ করার কথা বলেছেন। মারফুরূপে হজরত মিকদাম বিন মাদি করব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ওজু করলেন এবং দুই হাতের তর্জনী কানে প্রবেশ করালেন। নাসাঈ এবং ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী ওজু করলেন এবং মাথা ও কান মসেহ করলেন তিনবার। শেষে বললেন, রসুল স. এর ওজু ছিলো এ রকম।

একটি প্রশ্নঃ অধিকাংশ হাদিসে কান মসেহের উল্লেখ নেই কেনো?

উত্তরঃ কান মসেহের বর্ণনা এসেছে হজরত আবু উমামা এবং হজরত আলীর হাদিসে। অন্যান্য হাদিসে কান মসেহের উল্লেখ নেই। কিন্তু তাতে করে কান মসেহ করা যাবে না—এ কথা প্রমাণিত হয় না। রসুল স. বলেছেন, কান মস্তকের অংশ। সে কারণেই হয়তো কান মসেহের কথা পৃথকভাবে উল্লেখিত হয় নি)।

হাতের আঙ্গুল দ্বারা দাড়ি খিলাল করা সুন্নত। হজরত ওসমান বলেছেন, রসুল স. (ওজুর সময়) তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু খিলাল করতেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে খুজাইমা, হাতেম, ইবনে হাব্বান। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনাতে দাড়ি খিলালের কথা এসেছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, দারা কুতনী এবং বায়হাকী। ইবনে সুকুন বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

মুখ-মন্ডল ধৌত করার সময় গণ্ডদেশ মর্দন করা সুন্নত। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. তাঁর পবিত্র গণ্ডদেশ কিছুক্ষণ মর্দন করতেন। ইবনে মাজা ও দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি হাসান। ইবনে সুকুন বলেছেন বিশুদ্ধ।

বিসমিল্লাহ্র সঙ্গে ওজু করা মোস্তাহাব। ইতোপূর্বে উল্লেখিত এ সম্পর্কিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এ রকমই প্রমাণিত হয়। ডান দিক থেকে ওজু শুরু করা মোস্তাহাব। কিন্তু এই আমলটি সুন্নত হওয়াই সমীচীন। কেননা, রসুল স. সব সময় এ রকম করতেন। কিন্তু এ আমলটিকে কেউ সুন্নত বলেননি। কারণ, এটা ছিলো তাঁর পবিত্র অভ্যাস। ইবাদত নয়। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. সাধারণতঃ ওজু করা, জুতা পরিধান করা, চিরুণী করা ইত্যাদি কাজকে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। বোখারী, মুসলিম। তিনি স. এ কথা বলেছেন যে, যদি ওজু করতে চাও তবে দক্ষিণ অঙ্গ থেকে শুরু কোরো। আহমদ, আবু দাউদ।

ওজু শেষে এই দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব—আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু। আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত্তাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাহ্হিরিন (আমি

সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ স. তার বান্দা ও রসুল। হে আল্লাহ্—আমাকে তওবাকারী, এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো)। হজরত ওমর থেকে হজরত উকবা বিন আমেরের মাধ্যমে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ওজুর পরে বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করবে তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে বেহেশতের সকল দরোজা। সে যে কোনো একটি দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। অন্য একটি সূত্রে তিরমিজির বর্ণনাতেও অতিরিক্ত বাক্যটি (আল্লাহুম্মাজ আলনি....) রয়েছে। ওজুর পরে এই দোয়াটিও পাঠ করা যায়—সুব্হানাকা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আংতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা (হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি—তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তোমারই নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং প্রত্যাবর্তন করি তোমার দিকেই)। এরপর দুই রাকাত তাহ্ইয়াতুল ওজুর নামাজ পড়া যায়। ইবনে মাজা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করলো এবং সুব্হানাকা শেষ পর্যন্ত পড়লো—তার ওই আমলকে লিপিবদ্ধ করে একটি ঝুলিতে রেখে মুখ বন্ধ করে রাখা হবে। কিয়ামত পর্যন্ত ওই থলির বন্ধ মুখ আর খোলা হবে না। নাসাঈ এই হাদিসকে মাওকুফ হিসেবে বিশুদ্ধ এবং মারফু হিসেবে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু মাওকুফ ও মারফু একই প্রকৃতির।

মাসআলাঃ মেসওয়াক করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। মাওকুফরূপে হজরত আনাস থেকে বোখারী লিখেছেন, তোমরা অত্যধিক মেসওয়াক করবে। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে—হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. ঘরে এলে প্রথমে মেসওয়াক করতেন। হজরত উম্মে সালমা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জিবরাইল সব সময় আমাকে মেসওয়াক করতে বলেন। আমার ভয় হলো (মেসওয়াক করতে করতে) হয়তো আমার দাঁতই পড়ে যাবে। হাদিস গ্রন্থগুলোতে এ রকম হাদিস রয়েছে অনেক—যেগুলোর বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন হজরত সহল বিন সা'দ, হজরত আবু উমামা, হজরত জোবায়ের বিন মুতয়েম, হজরত আবু তোফায়েল, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মোত্তালিব, হজরত আয়েশা এবং হজরত আনাস। শয্যাত্যাগের পর মেসওয়াক করা অত্যন্ত জরুরী। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. যখনই শয্যা ত্যাগ করতেন তখনই মেসওয়াক করতেন।

প্রতি নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করা মোস্তাহাব। রসুল স. এরশাদ করেছেন, উম্মতের কষ্ট না হলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের সময় মেসওয়াক করতে বলতাম। মুসলিম, আবু দাউদ। জননী আয়েশার মারফু বর্ণনায় রয়েছে, মেসওয়াকসহ নামাজ, মেসওয়াকবিহীন নামাজের চেয়ে সত্তরগুণ অধিক উত্তম। আহমদ, ইবনে খুজাইমা, হাকেম। মেসওয়াক ওজুর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা হজরত ওসমান, হজরত আলী এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন জায়েদের মাধ্যমে ওজু সম্পর্কিত অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেগুলোতে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কথা বলা হলেও মেসওয়াক করার কথা বলা হয়নি।

ওয়া ইন কুনতুম জুনুবান ফাত্তাহ্হারু—এ কথার অর্থ, যদি তোমরা অপবিত্র (জুনুব) থাকো তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে (স্ত্রী সম্ভোগ অথবা অন্য কোনো কারণে যার রেতঃপাত হয়, তাকে বলে জুনুব বা অপবিত্র)। জানাবাত বা অপবিত্রতার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে সুরা নিসার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও বলা হয়েছে 'বিশেষভাবে পবিত্র হবে'—এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা ওয়াজিব। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াও ওয়াজিব। বিশেষভাবে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ দেয়ার কারণেই মুখগহবর ও নাসিকার অভ্যন্তর ধৌত করাকে আমরা সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করার অঙ্গীভূত করে নিয়েছি। কিন্তু ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী ওজুর মতো গোসলের মধ্যেও কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াকে সুন্নত বলেছেন।

উম্মত জননী উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি শক্ত করে চুল বেঁধেছি, এখন ফরজ গোসল করলে চুল খুলতে হবে কি? তিনি স. বললেন না, মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে দাও। সেই পানি শরীরের সকলস্থানে উত্তমরূপে পৌঁছিয়ে দাও। তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। আমরা বলি, জননী উম্মে সালমার প্রশ্নটি ছিলো মাথা ধৌত করা সম্পর্কে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, বেনীবদ্ধ অথবা খোঁপাবদ্ধ কেশ উন্মুক্ত করতে হবে কিনা। রসুল স. উত্তরে বলেছেন, না। এখানে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কথা তো উল্লেখই করা হয়নি।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা রসুল স. সকাশে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় সুরভিত পরিচ্ছদাবৃত এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইসলাম কী? রসুল স. বললেন, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রমজান শরীফের রোজা রাখা, হজ করা এবং জানাবতের (অপবিত্রতা) গোসল করা। লোকটি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। আবদ্ বিন হুমাইদের বর্ণনায় রয়েছে ওহাব যমারী বলেছেন, যবুর শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে—যে ব্যক্তি জানাবতের গোসল করলো, নিশ্চয় সে ব্যক্তি আমার বান্দা। আর যে করলো না, সে আমার নিশ্চিত শত্রু।

মাসআলাঃ পুরুষ ও নারী উভয়কেই চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে। এ রকম করা ওয়াজিব। দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানোও জরুরী। ওজুর সঙ্গে তুলনা করে ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় এসেছে, দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। আমরা বলি, ওজু ও ফরজ গোসল এক কথা নয়। গোসলের জন্য বিশেষভাবে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ এসেছে। ওজুর জন্য এ রকম নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, শরীরের চামড়া ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। হজরত আলী বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি জানাবাতের গোসলের সময় বিন্দু পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলেও তাকে দোজখে প্রবেশ করানো হবে। হজরত আলী আরো বলেছেন, এ কারণেই আমি আমার চুলের সঙ্গে শত্রুতা করেছি (তিনি মস্তক মুন্ডন করতেন)। আবু দাউদ ও ইবনে মাজা বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিশুদ্ধ বলাই ঠিক। মারফু বলা ঠিক নয়। আমরা বলি, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বলেই হাদিসটি মারফু। কারণ, যিনি সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য বা বলিষ্ঠ) তাঁর অতিরঞ্জনও গ্রহণীয়। সুতরাং এই মাওকুফ বর্ণনাটি মারফু হিসেবে গ্রহণ করাই সমীচীন। কেননা, এখানে এসেছে দোজখের আযাবের কথা। প্রত্যাদেশ ছাড়া আযাবের কথা বলা যায় না। সাহাবীগণও এ রকম বলতেন না। অতএব, বুঝতে হবে এখানে দোজখের শাস্তির কথাটি রসুল স. এর। কারণ রসুলের উপরেই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, সাহাবীগণের উপরে হয় না। অতএব সাহাবীর মুখে উচ্চারিত হলেও কথাটি মূলতঃ রসুল স. এর। এভাবে বর্ণনাটি তাঁর স. সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে বলেই হাদিসটি মারফু বলাই সঙ্গত।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারীর মারফু বর্ণনায় রয়েছে, জানাবত হচ্ছে আমানত (গোসলের মাধ্যমেই এই আমানতের দায়ভার থেকে মুক্ত হতে হবে)। প্রতিটি চুলের গোড়ায় জানাবাত বা অপবিত্রতা থাকে। ইবনে মাজা এই বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন। বোখারী ও মুসলিমে জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হাতের আঙ্গুলে পানি নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। জননী আয়েশা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, আমার বোন (হজরত আসমা) ঋতু পরবর্তী গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসুল স. বললেন, খুব ভালো করে মর্দন করবে, যাতে করে প্রতিটি পশমের গোড়ায় পানি পৌছে যায়। মুসলিম। হজরত আবু জর গিফারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, পানি পেলে ভালো করে ত্বক মর্দন করবে। আহমদ।

মাসআলাঃ জমহুরের নিকট শরীর মর্দন করা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেকের নিকট ওয়াজিব। জমহুরের দলিল এই—আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'হাত্তা তাগ্তাসিলু।' 'ইগতিসাল' অর্থ ধৌত করা বা পানি প্রবাহিত করে দেয়া। এর মধ্যে শরীর মর্দনের কথা নেই। তাছাড়া হজরত জোবায়ের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, অতঃপর আমি আঁজলা ভরে পানি মাথার উপর ঢালতাম। এরপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করে দিতাম। বোখারী, মুসলিম। গোসল সম্পর্কিত কোনো হাদিসেই এ রকম কিছু উল্লেখ করা হয়নি যার মাধ্যমে শরীর মর্দন ওয়াজিব বুঝা যায়।

মাসআলাঃ মেয়েদের খোঁপা এবং বেনীবদ্ধ চুল ধৌত করা ওয়াজিব নয়। বুদ্ধি বলে, স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্য বেনী, জটা ইত্যাদি ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া উচিৎ। কেননা, গোসলের মধ্যে বিশেষভাবে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ এসেছে। আর এই নির্দেশ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু শরিয়তের বিধান নস্ নির্ভর, বুদ্ধি নির্ভর নয়। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে জননী উম্মে সালমার হাদিসে বলা হয়েছে—চুলের বেনী খুলতে হবে না। হজরত উবায়েদ বিন উমায়ের বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আয়শা জানতে পারলেন, হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর মেয়েদেরকে বলেন, গোসলের সময় চুলের খোঁপা ও বেনী খুলে ফেলতে হবে। এ কথা শুনে হজরত আয়শা বললেন, তিনি মেয়েদেরকে মস্তক মুণ্ডনের নির্দেশ দেন না কেনো। আমি এবং রসুল স. একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তখন তিনবার মাথার উপরে পানি ঢালতাম। এর বেশী কিছু করতাম না।

পুরুষদের জট ধৌত করার হুকুম রহিত হয়নি। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি চুলের নিচে জানাবাত বা অপবিত্রতা থাকে। তাই তোমরা কেশ ধৌত করো এবং ত্বক পরিষ্কার করো। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, বায়হাকী। বর্ণনাটি দুর্বল। কারণ এই হাদিসের সূত্রভূত বর্ণনাকারী হারেস বিন দাহীয়া অত্যন্ত দুর্বল। দারা কুতনী বলেছেন, কেবল মালেক বিন দিনার থেকে মুরসালরূপে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এভাবে সাঈদ বিন মানসুর ইউনুস থেকে, তিনি হাসান থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসটি মাওকুফ। এটি হজরত আবু হোরায়রার নিজস্ব বচন। তাই সকল অবস্থায় হাদিসটি হবে বিশুদ্ধ মুরসাল অথবা বিশুদ্ধ মাওকুফ । মুত্তাসিল সনদ বিশিষ্ট বর্ণনা মারফু নয় কিন্তু মনে রাখতে হবে মুরসাল বর্ণনাও দলিল রূপে গণ্য।

দ্রষ্টব্যঃ গোসলের মধ্যে নিয়ত করা এবং গোসলের নিয়মশৃংখলা রক্ষা করা সুন্নত। প্রথমে ওজু করতে হবে (পা ধৌত করা বাদে), গোসল শেষে একটু সরে গিয়ে পা ধুয়ে নিতে হবে। এ রকম করা সুন্নত। ওজুর মতো গোসলের নিয়ত করা সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। গোসলের নিয়মশৃংখলা প্রমাণিত হয়েছে রসুল স. এর সার্বক্ষণিক আমল থেকে। অন্য কাজগুলো সুন্নত প্রমাণিত হয়েছে জননী মায়মুনার হাদিস থেকে। জননী বলেছেন, আমি রসুল স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি স. ফরজ গোসল করলেন। প্রথমে পাত্রটি বাম হাত দিয়ে একটু কাত করে ডান হাতে পানি নিলেন। সেই পানি দিয়ে দুই হাত ধৌত করলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেন তিনবার। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। শেষে স্থান পরিবর্তন করে দুই পা ধৌত করলেন। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশা বলেছেন, ফরজ গোসলের সময় রসুল স. প্রথমে হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর নামাজের পূর্বে যেভাবে ওজু করা হয় সেভাবে ওজু করতেন কিন্তু পা ধৌত করতেন না। এরপর আঙ্গুলে পানি নিয়ে চুলের গোড়ায় খিলাল করতেন। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ শরীরের কোথাও যদি অপবিত্রতা (নাজাসাতে হাকিকি) লেগে থাকে তবে তা দূর করা ওয়াজিব। তাই এই কাজটিকে গোসলের সুন্নতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। যেমন, ওজুর সুন্নতের মধ্যে শৌচকর্মের (এস্তেঞ্জার) উল্লেখ করা হয় না। আর তিন বার সমস্ত শরীর ধৌত করার দলিল আমাদের জানা নেই।

'ওয়া ইনকুনতুম মারদ্বা আওআ'লা সাফারিন আওজায়া আহাদুন মিনকুম মিনাল গয়িতি আওলামাস্ তুমুন্ নিসায়া ফালাম্ তাজিদু মাআন ফা তাইইয়াম্মামু সায়িদান তৈয়েবান ফানসাহু বি উজু হিকুম ওয়া আইদিকুম মিনহু'—এ কথার অর্থ তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আগমণ করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করিও এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে।— এখানে শেষের 'মিনহু' শব্দটি বাদে অবশিষ্ট নির্দেশটি সুরা নিসায় বর্ণনা করা

হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, মিনহু শব্দটির মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় মসেহ করতে হবে মাটি দ্বারা। আমি বলি, বাগবীর বক্তব্য তখনই গ্রহণীয় হবে, যখন 'মিনহু' শব্দটি ভিন্ন অর্থবোধক হবে। ইমাম আবু ইউসুফ তাই বলেছেন, মাটি জাতীয় সকল বস্তু দ্বারা ওই সময় তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হবে, যখন সেই বস্তুর উপরে মাটি থাকবে (মাটি না থাকলে তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হবে না)।

এ সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদের দু'টি অভিমত রয়েছে— মাটি হওয়া জরুরী অথবা মাটি জাতীয় হওয়াই যথেষ্ট—তার উপর মাটি থাকুক অথবা না থাকুক। আমরা বলি, এখানে 'মিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রারম্ভিকা হিসেবে। আংশিক অথবা বর্ণনামূলক যদি হতো তবে তা হতো রূপক অর্থবোধক, যা ধাবিত হতো ধারাবাহিকতার দিকে। আল্লামা তাফ্তাজানী শাফেয়ী লিখেছেন, কোনো কোনো শাফেয়ী ফিকাহ্বিদ বলেছেন, 'মিন' ব্যবহৃত হয়েছে আংশিক অর্থের জন্য, যাতে করে বহু অর্থবোধক অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে না হয়। অর্থাৎ আংশিক অর্থ বুঝানো হলে সেটাই হবে তার আসল কারণ। আর শুরু করাকে আসল কারণ মনে করা হলে, তা প্রকৃত কারণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং নিয়মানুযায়ী যতদূর সম্ভব বহুঅর্থবোধক হওয়ার দিকে না যাওয়াই সমীচীন। কিন্তু শাফেয়ীগণের বর্ণিত ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, অভিধান বিশারদগণের ঐকমত্য এই যে, শুরু শেষ বুঝানোর জন্যই এখানে মিন দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে।

আমি বলি, এখানে আংশিক অর্থ গ্রহণযোগ্য হতেই পারে না। আংশিক বুঝাতে গেলে মিন এর পরিবর্তে আংশিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করাই হতো সঙ্গত। কিন্তু এ স্থানে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। অতএব বাক্যটির উদ্দেশ্য হবে— মুখমণ্ডলে এবং হস্তদ্বয়ে হাত বুলিয়ে নাও। এই হাত বুলিয়ে নেয়ার অর্থই মসেহ করা। এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ করা অনাবশ্যক। যদি মিনকে এব্তেদা বা শুরু বলা হয় তবে অর্থ হবে এ রকম—পবিত্র মাটি দ্বারা মসেহ শুরু করো অর্থাৎ মাটি স্পর্শ করে অথবা মাটির উপরে হাত রেখে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে মসেহ করে নাও। এই অর্থটিই স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন।

যদি বলা হয়, কাশ্শাফ রচয়িতা বলেছেন, মানুষ মনে করে 'মিন' প্রকৃত পক্ষে ইব্তেদায়ে গায়েত বা প্রান্তসীমার জন্য এসেছে। যেমন, মাসাহ্তু বি রাসি মিনাদ্দুহ্নি (আমি আমার মাথা প্রান্তসীমা পর্যন্ত তৈল দ্বারা মসেহ করেছি। অথবা 'মিনাল মায়ি' (পানি দ্বারা) অথবা 'মিনাত্তুরাবি' (মাটি দ্বারা)। —এ গুলোর দ্বারা আরববাসীরা আংশিক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ বুঝে না। এর উত্তরে আমরা বলি, বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে আংশিক উদ্দেশ্য বুঝা যায় বুদ্ধিগতভাবে। কিন্তু 'মিন'—এর অর্থ এ রকম নয়। লক্ষণীয় যে, মাথার উপর হাত বুলিয়ে তেল, পানি বা মাটি দ্বারা মসেহ শুরু করা যাবে। কিন্তু বর্ণিত বাক্যগুলো দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় না যে— তেল, পানি, মাটি হাতে লাগিয়ে নেয়া হয়েছে, না হাতে লাগানোই ছিলো। কিন্তু যদি বলা হয়, আমি আমার মাথা পাথর দ্বারা মসেহ করেছি তবে এর

দ্বারা সুনির্দিষ্ট অবস্থাটি প্রকাশ পাবে। আংশিক অর্থ বুঝা যাবে না। সুতরাং এখানে 'মিন' শব্দটি বসেছে শেষ সীমা বুঝানোর জন্যেই। এবং এ কথাও স্পষ্ট হবে যে, পাথর দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ যদিও তার উপর মাটি না থাকে। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

'মা ইউরিদুল্লহু লি ইয়াজ্য়ালা আলাইকুম মিন হারজ'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না। অর্থাৎ ওজু, গোসল ও তায়াম্মুমের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না।

'ওয়া ইউরিদু লিইউত্বহ্হিরাকুম'—এ কথার অর্থ বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। হজরত আমর বিন আম্বাসা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা রসুল স. এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, ওজুর সময় কুলি করলে এবং নাকে পানি দিলে, মুখ ও নাকের গোনাহ্ পানির সঙ্গে ধুয়ে চলে যায়। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওসমান ওজুর সময় তিনবার করে অঙ্গ ধৌত করার পর বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার ওজুর মতো ওজু করবে তার মুখ, হাত ও পা থেকে পাপ অপসৃত হবে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়ালি ইউতিম্মা নি'মাতাহু আলাইকুম লায়াল্লাকুম তাশকুরুন'—এ কথার অর্থ, এবং তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।' এই শুভসংবাদটির মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের এ অভিলাষ প্রকাশিত হয়েছে যে—আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য এমন বিধান নির্ধারণ করে দিতে চান যা পালন করলে তোমরা শরীরের অপবিত্রতা এবং পাপের পংকিলতা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এবং মেরাজ তুল্য নামাজের চাবি তোমাদের হস্তগত হবে। কারণ, বেহেশতের চাবি যেমন নামাজ তেমনি নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা (ওজু, গোসল, তায়াম্মুম)। রসুল স. এরশাদ করেছেন, পূর্ণ অনুগ্রহ লাভকারী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে আবী শায়বা এবং তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে রয়েছে, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মুখমণ্ডল ও হাত-পা হবে ওজুর কারণে সমুজ্জ্বল। যারা সেই সমুজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে চায় তারা যেনো পূর্ণরূপে ওজু করে। বোখারী।

'লিইয়াজয়ালা', 'লিইউত্ব'হ্হিরা' এবং 'লিইউতিম্মা' শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর 'লাম' অতিরিক্ত। লামের পরে একটি 'আন' শব্দ উহ্য থাকার কারণে শব্দগুলো 'জবর' যুক্ত হয়েছে। 'ইয়ুরিদু' ক্রিয়ার কর্মপদ হিসেবে শব্দ তিনটি ধাতুগত অর্থ প্রদান করেছে। ব্যাকরণবিদ ইবনে হাজিবের সূত্রানুসারে কাযী বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'আন' উহ্য হবে না। কিন্তু তাঁর ধারণাটি ভুল। ইমাম রাযী এবং আল্লামা জামাখশরী 'আন' শব্দটির উহ্য হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন— 'লাম' অক্ষরটির অতিরিক্ত সংযোজন সত্ত্বেও।

কাযী বায়যাবী বলেছেন, আয়াতে বর্ণিত দু'টি ইয়ুরিদু ক্রিয়ার কর্মপদই উহ্য। আর লাম অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে কারণ হিসেবে। এই ধারণানুসারে তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এ রকম—আল্লাহ্পাক চান না যে, পবিত্রতার বিধানের কারণে তোমরা বিব্রত হও। বরং তিনি তোমাদেরকে এ উদ্দেশ্যেই পবিত্রতার বিধান দিতে ইচ্ছে করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন। ব্যাখ্যাটি এ কারণে অসংগত যে, প্রথমে বিধান দেয়া হলো। অথচ কারণ দর্শানো হলো না। পরে আবার বিধান দানের অভিলাষ প্রকাশের সঙ্গে কারণ দর্শানো হলো। কিন্তু বিধান দানের সঙ্গে কারণ দর্শানোই হতো সুসংগত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৭

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

❒ তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর। এবং তোমরা যখন বলিয়াছিলে, 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' তখন তিনি তোমাদিগকে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন উহাও স্মরণ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর; অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

এখানে 'মিসাক্ব' অর্থ ওই অঙ্গীকার যা রসুল স. তাঁর সাহাবীগণের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। অঙ্গীকার নামাটি ছিলো এ রকম—সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আমরা আনুগত্যে অটল থাকবো, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করবো না। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, আকাবা প্রান্তরে গভীর রাতে আনসারদের নিকট থেকে রসুল স. যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সে অঙ্গীকারের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। অথবা এখানে ওই অঙ্গীকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা সংঘটিত হয়েছিলো হোদায়বিয়ায়। সে অঙ্গীকারের কথা কোরআন মজীদেও বিবৃত হয়েছে (সুরা ফাতাহে)।

মুজাহিদ ও মুকাতিলের নিকট এখানে ওই 'মিসাক্ব' বা অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্পাক সকল আদম সন্তানকে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে গ্রহণ করেছিলেন। সেই অঙ্গীকারনামাটি ছিলো এ রকম—আমরা শ্রবণ করলাম এবং মান্য করলাম।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়াত্তাকুল্লহ্ (আল্লাহকে ভয় করো)। এ কথার অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা বিস্মৃত হওয়া থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে আল্লাহ্র ভয়ে বিরত হও।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা আলিমুম বিজাতিস্সুদুর' (অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত)। —এ কথার অর্থ তোমাদের হৃদয়ে যে সকল ভালো কিংবা মন্দ ধারণার উদ্ভব হয়, সে সকল কিছুই আল্লাহ্পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাভূত। তিনি সে সকল সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আয়াতের প্রথমে আল্লাহ্র অনুগ্রহের বিস্মরণ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের মতো প্রকাশ্য অপকর্ম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে এবং পরে অপ্রকাশ্য ও অসৎ হৃদয়ানুভূতি সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের জন্য উত্তম বিনিময় দানের শুভসংবাদ এবং অবিশ্বাসী ও পাপিষ্ঠদের জন্য শাস্তিদানের কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যেহেতু মানুষের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কিছুই জানেন, তাই নিশ্চয়ই তিনি পুণ্য কর্মের যথাবিনিময় এবং অপকর্মের যথাশাস্তি নিশ্চিত করবেন।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

❑ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহের উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার না করায় প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় করিবে; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে এই আয়াতের শুরুতেই এই নির্দেশটি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকতে হবে। বিদ্বেষবশতঃ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার না করার প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ সুবিচার আত্মসংযমের (তাকওয়ার) নিকটতর। শেষে বলা হয়েছে 'এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে; তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা জানেন'।

'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেনো কখনও সুবিচার না করায় প্ররোচিত না করে'— এ কথাটির অর্থ, তোমাদের শত্রু অবিশ্বাসীদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে তোমরা যেনো ন্যায়চ্যুত না হও। যেনো তাদের প্রতি এমন আচরণ না করো যা তোমাদের জন্য অবৈধ। যেমন, নিহত অবিশ্বাসীদের নাক, কান কেটে ফেলা। অবিশ্বাসিনীদেরকে হত্যা করা। সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত তাদেরকে ব্যভিচারিণী হিসেবে অভিযুক্ত করা, তাদের সঙ্গে কৃত সন্ধির শর্ত লংঘন করা ইত্যাদি।

ই'দিলু অর্থ সুবিচার করবে। বিদ্বেষবশতঃ সুবিচার না করা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দানের পরেও বলা হয়েছে 'ই'দিলু' (সুবিচার করবে)। সুবিচারকে অত্যধিক গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই এসেছে এই পুনঃনির্দেশ।

'হুয়া আকুরাবু লিত্তাকুওয়া' অর্থ এটা (সুবিচার) আত্মসংযমের (তাকওয়ার) নিকটতম। 'তাকওয়া' অর্থ আল্লাহ্ অপ্রসন্ন হোন এমন চিন্তা ও কর্ম থেকে প্রবৃত্তিকেও বাঁচিয়ে রাখা। মুক্ত থাকা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ থেকে। এটাই আত্মসংযম। আর এই আত্মসংযম ন্যায়ানুগতা বা সুবিচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। সুবিচারের মাধ্যমেই মানুষের পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত হয়। আর পারস্পরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এই নিশ্চিতি আত্মসংযমেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। তাই সুবিচারকে তাকওয়ার নিকটতম বলা হয়েছে।

'ওয়াত্তাকুল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করবে। তাঁর অতুলনীয় ও অসীম পরাক্রম ও শক্তিমত্তার কথা স্মরণ করে শংকিত চিত্তে প্রতিপালন করবে তাঁর আদেশ এবং নিষেধ।

'ইন্নাল্লহা খবিরুম্ বিমা তা'মালুন' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার সংবাদ রাখেন। এই ব্যাক্যটির মাধ্যমে পূন্যবানকে দেয়া হয়েছে পুণ্যপ্রাপ্তির সুসংবাদ এবং পুণ্যরহিতদেরকে দেখানো হয়েছে শাস্তির ভয়। পুনঃ পুনঃ এ রকম বলা হয়েছে সুবিচারকে নিশ্চিত করার জন্য। সুবিচারকারীকে উৎসাহ দান এবং অবিচারকারীদেরকে সংযত হওয়ার জন্য।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯, ১০

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরষ্কার আছে।

❒ যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।

আলোচ্য আয়াত দু'টোতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম সম্পর্কে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতিশ্রুতি এই যে—তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার। আর যারা অবিশ্বাসী, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী এবং যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা হবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অধিবাসী। ওই অগ্নিবাস থেকে তারা কখনোই পৃথক হবে না। আল্লাহ্পাকের পবিত্র বাণীবিন্যাসের রীতি এই যে, পাশাপাশি শাস্তি স্বস্তির কথা উল্লেখ করা হয়। আলোচ্য আয়াত দু'টোতেও তেমনি করা

হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বাসীদের উত্তম বিনিময় লাভের কথা এবং অবিশ্বাসীদের নিকৃষ্ট প্রতিফলের কথা। ক্ষমা ও পুরস্কার (জান্নাত) পাবে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানেরা এবং অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী এবং আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন— মুজাহিদ, ইকরামা, কালাবী এবং ইবনে বাশ্শার বলেছেন, রসুলুল্লহ্ স. হজরত মুনজির বিন ওমর সায়াদীকে তিরিশজন মুহাজির ও আনসার সাহাবীর সঙ্গে বনী আমেরের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা সকলে পথ চলতে চলতে বনী আমের জনপদে একটি পানির ঝরনার নিকটে উপস্থিত হলেন। স্থানটির নাম ছিলো বীরে মাউনা। সেখানে বনী আমের বিন তোফায়েলের সঙ্গে তাঁদেরকে মোকাবিলা করতে হলো। কুচক্রী বনী আমেরেরা ধর্মপ্রচারক সাহাবীগণকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন হজরত মুনজির এবং তাঁর সঙ্গীগণ। তিনজন সাহাবী হারানো উট খুঁজতে গিয়ে দল ছুট হয়ে পড়েছিলেন। ওই তিনজনের একজন ছিলেন হজরত আমর বিন উমাইয়া দ্বামেরী। সাহাবীত্রয় দেখলেন, আকাশে কয়েকটি পাখি উড়ছে। তাদের চক্ষু থেকে ঝরে পড়ছে রক্তের ফোটা। এক সাহাবী বললেন, নিশ্চয় আমাদের সাথীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এ কথা বলে তাঁরা তিনজন দ্রুত রওনা হলেন মূল দলের দিকে। পথিমধ্যে সশস্ত্র শত্রুদলের একজন তাঁদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। শুরু হলো আঘাত। প্রত্যাঘাত। সাহাবীদের একজন গুরুতর আহত হয়ে পড়লেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি অলৌকিক নিদর্শন দেখে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর। আল্লাহ্র কসম, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। অন্য সাহাবীদ্বয় সেখান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বনী সুলাইম গোত্রের দু'জন লোককে শত্রু মনে করে হত্যা করে ফেললেন তাঁরা। বনী সুলাইম ছিলো বনী আমেরেরই একটি শাখা। তাই তাদেরকে বনী আমেরের লোক মনে করেই সাহাবীদ্বয় হত্যা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বনী সুলাইম রসুল স. এর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলো। তাই তারা রক্তপণের (দিয়তের) দাবি নিয়ে উপস্থিত হলো রসুল স. এর দরবারে। কিন্তু তখন রসুল স.এর নিকটে রক্তপণ পরিশোধের মতো অর্থ বা উপকরণ ছিলো না। তাই তিনি স. হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত তালহা এবং হজরত আবদুর রহমান বিন আউফকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন বনী নাজিরের কা'ব বিন আশরাফ ইহুদীর নিকটে। রক্তপণ পরিশোধের কিছু উপকরণ সংগ্রহ করাই ছিলো তাঁর স. এর উদ্দেশ্য। রসুল স. এর সঙ্গে ইহুদীরা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো যে, মদীনার ইহুদী এবং মুসলমান কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রক্তপণ পরিশোধের জন্য ইহুদীরা সাহায্য করবে। রসুল স. এর আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ইহুদীরা বললো, হে আবুল কাশেম, আপনার প্রয়োজনের কথা বলে ভালোই করেছেন। উপবেশন করুন। আগে আমাদের সঙ্গে কিছু আহার করুন। তারপর

আপনি যা চাইবেন, তাই দেয়া হবে। রসুল স. উপবেশন করলেন। ইহুদীরা আড়ালে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো—এটাই সুযোগ, এ রকম সুযোগ আর আসবে না। এখন যদি কেউ গৃহের ছাদের উপর থেকে একটি বড় পাথর তার উপর ফেলে দিতে পারো তবে চিরদিনের জন্য আমরা নিরাপদ।

আমর বিন জাহাশ বললো, আমি পারবো। এ কথা বলে সে তৎক্ষণাৎ ছাদে উঠতে শুরু করলো। কিন্তু অদৃশ্য থেকে নিরস্ত করা হলো তাকে। ইতোমধ্যে হজরত জিবরাইল রসুল স. কে ইহুদীদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। রসুল স. সেখান থেকে উঠে এলেন। হজরত আলীকে বললেন, তুমি স্থান ত্যাগ কোরো না। ইহুদীরা এলে বোলো, আমি বাড়ীতে চলে গিয়েছি। হজরত আলী সেখানেই বসে রইলেন। অন্য সাথীদেরকে নিয়ে রসুল স. ফিরে এলেন স্বগৃহে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের হাত সংযত করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর আর আল্লাহেরই প্রতি বিশ্বাসীগণ নির্ভর করুক।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপরে যে বর্ণনা রয়েছে সেই বর্ণনাটি মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ইবনে আমর এবং ইবনে সা'দও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, সালাম বিন মুশকাম ইহুদী অন্য ইহুদীদেরকে রসুল স.কে হত্যার চক্রান্ত করতে নিষেধ করেছিলো এবং বলেছিলো তোমরা এ রকম করলে এ কথা অবশ্যই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, আমরা সন্ধিভঙ্গকারী। আমরা তো মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। সুতরাং এমন কোরো না। ইবনে জারীর, ইকরামা, ইয়াযিদ বিন যিয়াদ, আবদুল্লাহ বিন আবু বকর, আসেম বিন ওমর বিন কাতাদা, মুজাহিদ, আবদুল্লাহ্ বিন কাসীর এবং আবু মালেকের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. তখন হজরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন। আল হাদিস। এই বর্ণনায় হজরত মুনজির এবং তার সঙ্গীগণের শহীদ হওয়ার বিবরণ নেই।

আবু নাঈম তাঁর দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে হাসান বসরীর নিয়মে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, বনী মহারেবের এক লোকের নাম ছিলো গুয়াইরিস বিন হারেস। সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, আমি এখনই গিয়ে মোহাম্মদকে হত্যা করবো। এই বলে সে রসুল স .এর সামনে এলো। রসুল স. তখন উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। পাশেই রক্ষিত ছিলো তাঁর তরবারী। গুয়াইরিস বললো, আমি আপনার তরবারীটি একটু দেখতে চাই। রসুল স. বললেন, দেখো। সে তরবারীটি হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করলো। দেখতে লাগলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর বললো, আমার হাতে উন্মুক্ত তরবারী। আপনার কি একটুও ভয় করছে না? তিনি স. বললেন, না। সে বললো, তলোয়ার তো আমার হাতে। রসুল স. বললেন, তোমার হাত থেকে আল্লাহ্পাক আমাকে রক্ষা করবেন। এ কথা শুনে গুয়াইরিস খোলা তলোয়ারটি কোষবদ্ধ করে রসুল স.কে ফিরিয়ে দিলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. ওই সময় বনী গাতফানদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম আউফীর নিয়মে লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে হজরত ইবনে আব্বাস লিখেছেন, কতিপয় ইহুদী একবার রসুল স. এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে আহারের আমন্ত্রণ জানালো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমন্ত্রণের নামে ডেকে এনে তারা রসুল স.কে হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ইহুদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিতি দান করলেন। রসুল স. আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন না। নিমন্ত্রিত সাহাবীগণও নিমন্ত্রণগমন থেকে বিরত রইলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। কিন্তু সে বর্ণনায় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা নেই।

বায়হাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে হজরত কাতাদা থেকে লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই আরব গ্রোত্র সম্পর্কে যারা প্রতারণা করে রসুল স.কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো। এক বেদুইনকে প্রেরণ করেছিলো তারা। বেদুইনটি রসুলে পাক স. এর নিকটে যখন পৌঁছলো তখন তিনি স. ছিলেন শায়িত অবস্থায়। বেদুইন বললো, এখন আমার আক্রমণ থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্! এ কথা শোনার সাথে সাথে তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেলো। এতদ্সত্ত্বেও রসুল স. তাকে শাস্তি দেননি।

এই আয়াতে রসুল স. এর হত্যাকারীদেরকে আল্লাহ্পাকই যে প্রতিহত করেছিলেন, সে কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন।' বিশ্বাসীগণকে সম্বোধন করে তাঁদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের এই অপার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে বলেছেন আল্লাহ্পাক। অবশেষে বলেছেন, ভয় করো, আর আল্লাহ্রই প্রতি বিশ্বাসীগণ নির্ভর করুক।' এ কথার অর্থ বিশ্বাসীগণের উচিত তারা যেনো পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হয়। কারণ, তিনিই কল্যাণদাতা। এবং তিনিই অকল্যাণ থেকে প্রকৃত রক্ষাকর্তা।

لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

❒ আল্লাহ্ বনি ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও, আমার রসুলগণকে বিশ্বাস কর ও উহাদিগকে সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই মোচন করিব এবং নিশ্চয় তোমাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহার পরও কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে সে সরল পথ হারাইবে।

ফেরাউন এবং তার বাহিনীর সলিল সমাধির পর আল্লাহ্পাক তওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। ওই সময় বনী ইসরাইলেরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো। সেই অঙ্গীকারের কথাই এই আয়াতের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে।

বারোটি গোত্রে বিভক্ত ছিলো বনী ইসরাইলেরা। সেই বারোটি গোত্রের বারো জন নেতা নিযুক্ত করেছিলেন আল্লাহ্পাক। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, তারা তাদের আপনাপন গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ্পাকের নির্দেশ মান্য করে চলতে বলবে। রসুল মুসার আনুগত্যে অটল থাকার নির্দেশ দিবে, কল্যাণকর্মে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মন্দকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে উৎসাহিত করবে।

আয়াতে বলা হয়েছে, সে দ্বাদশ নেতাকে আল্লাহ্পাক বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি (অক্বালাল্লহু ইন্নি মায়াকুম)'। এ কথার অর্থ যতোক্ষণ তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার মান্য করে চলবে, ততোক্ষণ আল্লাহ্পাক থাকবেন তোমাদের সঙ্গে। সৃষ্টি একে অপরের সঙ্গে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে থাকা সে রকম নয়। এই সঙ্গে থাকার প্রকৃত প্রকৃতি অবর্ণনীয়। আল্লাহ্পাক অতুলনীয় অবিভাজ্য ও উদাহরণরহিত। তাঁর সঙ্গে থাকার বিষয়টিও তেমনি অতুলনীয় যা— অবোধ্য, জ্ঞানাতীত। তবে তাঁর সঙ্গে থাকার

পরিণাম এবং প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভব্য এবং বোধ্য। আল্লাহ্পাক সঙ্গে থাকার পরিণাম এই যে—শরিয়তের আদেশ ও নিষেধ মান্য করা সহজ হয়, বক্ষ সম্প্রসারিত হয়, হৃদয় ও প্রবৃত্তি হয় প্রশান্ত।

এরপর শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। কারণ, বাক্যের শুরুতে রয়েছে লামে এবতেদায়ী (প্রারম্ভিকা প্রকাশক লাম)। বাক্যটি শুরু হয়েছে এভাবে—লাইন আক্বমতুমুস সলাহ্ (যদি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো...)। এই বাক্যটির শেষাংশে বলা হয়েছে 'তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই মোচন করবো।' যে নির্দেশগুলো পালন করলে আল্লাহ্পাক অবশ্যই দোষ মোচন করবেন বলেছেন, সেগুলো হচ্ছে—সালাত প্রতিষ্ঠা, জাকাত প্রদান, রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) প্রদান। এই নির্দেশগুলো যথাপ্রতিপালনের মধ্যেই রয়েছে পাপমোচন ও মুক্তি। নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদান তো করতেই হবে। তার সঙ্গে থাকতে হবে সকল নবী রসুলদের প্রতি নিষ্কলুষ আস্থা। তাঁদের সকলকেই দিতে হবে যথাবিহিত সম্মান। পূর্বাপর নবী রসুলগণের কাউকে মান্য করবে, কাউকে করবে না, কাউকে জানাবে সম্মান আবার কারোর প্রতি প্রদর্শন করবে অসম্মান—এ রকম কিছুতেই করা যাবে না। কারণ পাপমোচনের পথ এটা নয়।

ওয়া আক্বরদ্বতুমুল্লহা ক্বরদ্বান হাসানা (আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করো)। আল্লাহ্কে ঋণ প্রদান করার অর্থ কল্যাণের পথে অর্থ ব্যয় করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে সকল প্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা। অথবা অর্থ হবে এ রকম— আল্লাহ্কে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্তদেরকে দান করা। গ্রহীতাকে অনুগ্রহ করা হোলো—এ রকম অহংবোধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। লোক দেখানো মনোভাব থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। নতুবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে দানের উদ্দেশ্য হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

পাপমোচনের পর সুগম হবে জান্নাতের পথযাত্রা। জান্নাত লাভ হবে নিশ্চিত। আল্লাহ্পাক তাই জানাচ্ছেন, 'ওয়া লাউদ্খিলান্নাকুম জান্নাতিন্ তাজরি মিন্ তাহ্তিহাল আন্হার (এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে দাখিল করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান স্রোতস্বতী)।'

শেষে বলা হয়েছে, 'ফামান কাফারা বা'দা জালিকা মিনকুম ফাক্বদ্ দ্বল্লা সাওয়া আস্সাবিল' (এর পরও কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে সে সরল পথ হারাবে)। আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলের মাধ্যমে ক্রমাগত সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশ করে চলেছেন। সুতরাং পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে আত্মরক্ষা যারা করতে চায়, লাভ করতে চায় সফলতা, তাদেরকে তো বিশ্বাস ও সৎ কর্মের পথে আসতেই হবে। অন্যথায় পথচ্যুতি অনিবার্য। সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তাই শাশ্বত সরলপথটি (সাওয়া আস্ সাবিল) হারাতেই হবে— যে পথ পাপ মুক্তির, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

❑ তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি; তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে; তুমি সর্বদা উহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাঘাতকতা করিতে দেখিতে পাইবে। সুতরাং উহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

অঙ্গীকারভঙ্গের অপরাধ একটি গুরুতর অপরাধ। এই গুরুত্বকে প্রকাশ করার জন্য এখানে 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে, 'তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি।' আতা বলেছেন, অভিসম্পাত (লানত) অর্থ আল্লাহ্পাকের রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন বা বহিষ্কার করা। হাসান এবং মুকাতিল বলেছেন, অভিসম্পাত অর্থ আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জিজিয়া নির্ধারণ করা। আয়াতটির প্রকৃত উদ্দেশ্য এ রকম—খৃষ্টানেরা মোহাম্মদ স. কে রসুল বলে স্বীকার করেনি এবং ইহুদীরা অস্বীকার করেছে হজরত ঈসাকে, হজরত মোহাম্মদ স কে এবং অন্য নবীগণকে। তারা আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আল্লাহ্পাকের আনুগত্য থেকে। তাই আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি।

'তাদের হৃদয় কঠিন করেছি।' 'ক্বাসিয়াহ্' অর্থ কঠিন। শব্দটি এসেছে 'ক্বিস্ওয়াতুন্' থেকে। যার অর্থ হৃদয়ের কাঠিন্য। যেমন বলা হয়— 'হাজারুন ক্বাসিয়াতুন' (কঠিন প্রস্তর)। সিহাহ্ গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ক্বাসিয়াহ্ অর্থ শুষ্কতা, চরম শুষ্কতা। কোনো কোনো ক্বারী শব্দটিকে পড়েছেন 'ক্বাসিয়াতান। বাগবী লিখেছেন, শব্দ দু'টো সমার্থক। বায়যাবী লিখেছেন, ক্বাসিয়াহ্ অথবা ক্বাসিয়াতান থেকে মোবালেগার সিগা হয়েছে অথবা এর অর্থ খারাপ। যেমন, দিরহামুন ক্বাসিউন (অচল মুদ্রা)। আমি বলি, যেভাবেই বলা হোক না কেনো শব্দটির অর্থ হবে কঠিন বা কাঠিন্য। অচল মুদ্রার মধ্যে শুষ্কতা ও কাঠিন্য দু'টোই থাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে হৃদয় কঠিন করার অর্থ— হৃদয়ে বিশুদ্ধ বিশ্বাস থাকবে না, থাকবে অচল বা ময়লা মুদ্রার মতো অবিশ্বাস (কুফর) ও অপবিত্রতা (নেফাক)।

'তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে'—এ কথার অর্থ তারা আল্লাহ্‌র কালামের বিকৃত অর্থ করে। তাহরিফ অর্থ বিকৃত করা বা স্থানচ্যুত করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর অর্থ রসুল স. এর গুণাবলীকে পরিবর্তন করা। কেউ কেউ বলেছেন, ভুল ধারণার সৃষ্টি করা, শব্দের যথা অর্থ না করা।

'এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিলো তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে' —এখানে ভুলে যাওয়ার অর্থ পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ তওরাত শরীফে হজরত মোহাম্মদ স. এর আনুগত্যের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, বনী ইসরাইলেরা তা পরিত্যাগ করেছে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, বনী ইসরাইল তাদেরকে প্রদত্ত সদুপদেশ পরিত্যাগ করেছে। ইতোপূর্বে তারা হজরত মুসার আনুগত্যও পরিত্যাগ করেছিলো। এখন পরিত্যাগ করছে রসুল স. এর আনুগত্য।

প্রথমে বলা হয়েছে, অর্থবিকৃতি (তাহ্‌রিফ) এর কথা। পরে উল্লেখ করা হয়েছে বিস্মৃতি (নেসিয়ান) বা পরিত্যাগের কথা। বিস্মৃতি অপেক্ষা বিকৃতি গুরুতর। তাই বিকৃতির বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সিগা এবং এর উল্লেখ এসেছে প্রথমে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বিকৃতি ও বিস্মৃতির সম্মিলিত অর্থ হবে এ রকম—অর্থ বিকৃতির অপরাধে তারা যা স্মরণে রেখেছিলো তাও ভুলে গিয়েছে। জুহুদ পুস্তকে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি ধারণা করি, মানুষ পাপ করলে জানা বিষয়ও ভুলে যায়, এ কথা বলে তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন।

'তুমি সর্বদা তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে।'—এখানে 'খয়েনাহ্‌' অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা। শব্দটি 'ফায়েলাহ্‌' এর ওজনে ধাতুগত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, কাযেবাহ্‌—কিয্‌বুন-এর এবং লায়েনাহ্‌—লা'নুন এর অর্থ প্রকাশক। অথবা এ ধরনের শব্দগুলো কর্তার ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলোর বিশেষ্য উহ্য। যেমন, বিশ্বাসঘাতক (খেয়ানতকারী) দল। অথবা বিশ্বাসঘাতকতার স্বভাব কিংবা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যকলাপ। এমনও বলা যায় যে, খয়েনাহ্‌ এর মধ্যে 'হা' অব্যয়টি আধিক্য প্রকাশক। তাই অর্থ হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

'খাইনাতিম্‌ মিনহুম'—এখানে 'মিনহুমের' 'হুম' (তাদের) সর্বনামটি সকল বনী ইসরাইলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অতীতের এবং বর্তমানের অধিকাংশ বনী ইসরাইল বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকতা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তাদের পূর্ব পুরুষেরা যেমন তাদের নবীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তেমনি বর্তমানের ইহুদীরাও বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সঙ্গে। সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করেছে তারা। সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছে মুশরিকদের দিকে। রসুল স. কে হত্যার পরিকল্পনাও তারা করেছে—যাদুর মাধ্যমে, বিষ পান করানোর মাধ্যমে, এ অপপ্রচেষ্টায় তারা নিরন্তর।

'ইল্লা ক্বলিলাম্‌ মিন্‌হুম' অর্থ তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত। এ কথার অর্থ—তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল সত্যের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ। তাঁরা হজরত মুসার অনুগত ছিলেন। হজরত ঈসাকেও মান্য করেছিলেন তাঁদের একটি দল। শেষ নবী

রসুল স.কেও বনী ইসরাইলের কতিপয় ব্যক্তি মান্য করেছেন। তাঁর প্রতি ইমান এনেছেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, এই অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁরাই, যাঁরা 'তাদের হৃদয় কঠিন করেছি'—এই অভিশাপ থেকে মুক্ত। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ 'তাদের হৃদয় কঠিন করেছি'—এ কথা বলা হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করে যারা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। আয়াতে এ কথাটি সুস্পষ্ট।

'সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো'—এ কথার অর্থ, হে আমার প্রিয় রসুল! ইহুদীরা অবিমৃশ্য ও অর্বাচীন। সুতরাং আপনি তাদেরকে মার্জনা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তারা ক্রমাগত আপনাকে কষ্ট দিয়ে চলেছে, আপনাকে হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে—তবুও আপনি তাদেরকে মার্জনা করুন (কারণ আপনি মহান)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এ রকম—যদি তারা তওবা (প্রত্যাবর্তন) করে এবং ইমান আনে অথবা সন্ধি করতে সম্মত হয় এবং জিজিয়া প্রদান করতে চায়, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কেউ কেউ বলেছেন, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে ক্ষমা অথবা উপেক্ষা করার এই নির্দেশটিকে রহিত করে দেয়া হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা ইউহিব্বুল মুহ্সিনিন' (আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন)। এ কথার মাধ্যমে অপরাধীকে ক্ষমা করার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিশ্বাসঘাতক অবিশ্বাসীকেও মার্জনা করা উত্তম।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১৪

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

❒ যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান' তাহাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখিয়াছি; তাহারা যাহা করিত আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।

খৃষ্টানেরা নিজেরাই নিজেদেরকে খৃষ্টান বা নাসারা নামে অভিহিত করেছে। আয়াতের শুরুতে তাই বলা হয়েছে, যারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম—এ কথার অর্থ, আমি ইনজিল শরীফ এবং হজরত ঈসার মাধ্যমে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। ইঞ্জিল তওরাতকে প্রত্যয়ন করেছে এবং এই শুভসমাচার দিয়েছে যে, হজরত ঈসার পরে মোহাম্মদ নামে একজন রসুল আসবেন। সেই নবীকে তোমরা অবশ্যই মান্য করবে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর সমসাময়িক খৃষ্টানদের সম্পর্কে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, হে খৃষ্টান সম্প্রদায়, তোমাদের মতো তোমাদের পূর্ব পুরুষেরাও নিজেদেরকে খৃষ্টান বা নাসারা বলতো (দাবি করতো আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী)। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ রকম ছিলোও। আমি তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। তোমরা তাদেরকে মান্য করার দাবি করে থাকো। তাই তোমরাও আমার এই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।

'কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিলো, তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে'—এ কথার অর্থ, ইঞ্জিলের মাধ্যমে এই উপদেশ দেয়া হয়েছিলো যে, মোহাম্মদ স. আর্বিভূত হলে (তোমরা অথবা তোমাদের অধঃস্তনেরা) তাঁকে বিশ্বাস করবে। কিন্তু তোমরা তা করোনি। বরং তাঁর আর্বিভাবের পূর্বেই তোমরা হয়ে পড়েছো বিভক্ত। কেউ হয়েছো মাল্‌কানীয়াহ্‌ কেউ নিস্‌তুরিয়াহ্‌, আবার কেউ হয়েছো ইয়াকুবিয়াহ্‌। কেউ বলছো— আল্লাহ্‌ তিনজন, কেউ বলছো— মসীহ্‌ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পুত্র। আবার কেউ বলছো মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌। 'সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি'— কাতাদা বলেছেন, এখানে 'তাদের মধ্যে' অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে। কিন্তু রবী বিন আনাস বলেছেন, এ কথার অর্থ—খৃষ্টানদেরই বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা ছিলো পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। খৃষ্টানদের দল উপদলগুলোর মধ্যেও ছিলো চরম হিংসাবিদ্বেষ। আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাকই তাদের মধ্যে এই শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগ্রত রেখেছেন। কারণ, তারা সম্প্রীতিকামী নয়—বিদ্বেষদুষ্ট।

'তারা যা করতো আল্লাহ্‌ তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন'— এখানে 'তারা যা করতো' তা হচ্ছে অবিশ্বাসপ্রসূত পাপ, আসমানী কিতাবের অবমাননা ইত্যাদি। এই সকল অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দিবেন। তখন তাদের উপর শাস্তি আরোপ করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট, তোমাদের কার্যকলাপ ছিলো অত্যন্ত গর্হিত। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

ইকরামার মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রজম, সঙ্গেসার (প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড) সম্পর্কে জানতে চাইলো। রসুল স. বললেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কে? (তাকে উপস্থিত করো)। ইহুদীরা ইবনে সুরীয়াকে দেখিয়ে দিলো। রসুল স. আল্লাহ্‌র শপথ করে বললেন, যিনি হজরত মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তুর পর্বতকে মাথার উপর উত্তোলন করে বনী ইসরাইলের নিকট থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, সেই আল্লাহ্‌পাকের শপথ। রজমের শাস্তির কথা রয়েছে তোমাদের কিতাবেই। ইবনে সুরীয়া বললো, হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের মধ্যে যখন ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচলন শুরু হলো, তখন সঙ্গেসার করা হয়ে পড়লো অত্যন্ত কঠিন। তখন আমরা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করলাম একশত দোর্‌রা এবং মস্তক মুণ্ডন। এই কথোপকথনের পর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ۝ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

❒ হে কিতাবীগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে উহার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করিয়া থাকে। আল্লাহের নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

❒ যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

এখানে 'ইয়া আহ্‌লাল কিতাব' (হে কিতাবীগণ) বলে ইহুদী ও খৃষ্টান দু'দলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দটি এখানে একবচন। শব্দটি বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয় (যেমন মানুষ অর্থ মনুষ্য জাতি)। তাই ইহুদী ও খৃষ্টানদের কিতাব পৃথক পৃথক হলেও একবচনবোধক কিতাব এর মাধ্যমে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। ইয়া আহ্‌লাল কিতাবের অর্থ হয়েছে, হে আহলে কিতাব (হে কিতাবীগণ)।

'আমার রসুল তোমাদের নিকট এসেছে'—এ কথার অর্থ, শেষ নবী মোহাম্মদ স. তোমাদের সামনে উপস্থিত। তিনি আল্লাহ্‌পাকের সত্য রসুল।

'তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে'—এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক নির্দেশ গোপন করেছো। আমার রসুল সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশ করে দিচ্ছেন। যেমন— রজমের আয়াত, তওরাতে উল্লেখিত রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রশংসাসূচক বিবরণ, ইঞ্জিলে বিবৃত শেষ রসুলের আগমনের শুভসমাচার ইত্যাদি।

'এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকে'—এ কথার অর্থ, আমার রসুল তোমাদের অনেক অপরাধ মার্জনা করে দেন, উপেক্ষা করেন।

শেষে বলা হয়েছে, 'ক্বদজায়াকুম মিনাল্লাহি নুরুঁউ ওয়া কিতাবুম্ মুবিন' (আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে)। এখানে জ্যোতি (নূর) অর্থ, রসুল মোহাম্মদ স. এর পবিত্র অস্তিত্ব অথবা ইসলাম।

এবং 'কিতাব' অর্থ কোরআন মজীদ। 'নূর' অর্থ এখানে কোরআন মজীদও হতে পারে। এভাবে আয়াতের মর্ম এ রকম হতে পারে যে, আলো যেমন অন্ধকারকে দূর করে তেমনি রসুল স. এবং কোরআন মজীদ এই দুই আলোর মাধ্যমে অবিশ্বাসের অন্ধকার দূরীভূত হয়।

এর পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে 'যারা আল্লাহ্র সন্তোষ চায়'— এর দ্বারা 'তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।' এখানে 'এর দ্বারা' অর্থ রসুল স. এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ এই কিতাব দ্বারা। এখানে 'বিহি' সর্বনামটি এক বচন হলেও এর অর্থ দ্বিবচনবোধক। রসুল স. এবং কোরআনের অনুসরণ মূলতঃ একই। তাই এ রকম একবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে 'শান্তির পথ' (সুবুলুস্ সালাম) অর্থ নিরাপত্তার পথ অর্থাৎ যে পথের পথিকেরা আল্লাহ্র আযাব থেকে নিরাপদ, সেই পথ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্পাকের একটি মহাপবিত্র নাম হচ্ছে 'আস্সালাম'। সেই সালাম বা শান্তির পথেই আল্লাহ্পাক তাদেরকে পরিচালিত করেন অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তোষ প্রার্থীদেরকে কিতাবের মাধ্যমে পথনির্দেশনা দেন। এভাবেই তাদেরকে পরিচালিত করেন শান্তির পথে।

'এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান'— —এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক তাদেরকে যথানির্দেশনার মাধ্যমে অবিশ্বাসী অন্ধকার থেকে মুক্ত করেন এবং পরিচালিত করেন বিশ্বাসী আলোর দিকে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইয়াহ্দি বিহিম ইলা সিরাতিম্ মুসতাক্বিম'—এ কথার অর্থ, এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। এই সরল পথ (সিরাতল মুস্তাক্বিম) অর্থ ইসলামের পথ।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১৭

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

❒ যাহারা বলে, 'মরিয়ম-তনয় মসীহ্ই আল্লাহ্', তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই। বল, আল্লাহ্ মরিয়ম-তনয় মসীহ্, তাহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে! আস্মান ও জমিনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয় সর্বশক্তিমান।

খৃষ্টানদের ইয়াকুবিয়া সম্প্রদায় মনে করতো, হজরত ঈসা নিজেই আল্লাহ্। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ রকম বিশ্বাস ইয়াকুবিয়ারা মনে মনে করতো, মুখে প্রকাশ করতো না। প্রকাশ্যে তারা ছিলো তৌহিদের দাবিদার। আল্লাহ্পাক এখানে তাদের অন্তর্নিহিত অপবিশ্বাসটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আয়াতের শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন, তারা মরিয়ম তনয় হজরত ঈসাকে (মনে মনে) আল্লাহ্ বলে। সুতরাং তারা নিশ্চিত সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)।

এরপর রসুল স.কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক এক জবাবহীন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এভাবে— 'হে রসুল, আপনি বলুন আল্লাহ্পাক যদি হজরত ঈসা, তাঁর মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে ধ্বংস করতে চান, তবে এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে কে?' এই প্রশ্নটির মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অন্য সকলের মতো হজরত ঈসা এবং তাঁর জননী সম্ভাব্য জগতের (দায়রায়ে এমকানের) অন্তর্ভূত। আর সম্ভাব্য জগৎ ধ্বংসশীল। 'ওয়াজিবুল ওজুদ' (অনিবার্য অস্তিত্ব) আল্লাহ্পাকই কেবল শাশ্বত, চিরন্তন। তাঁর ক্ষমতা অপার। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন কেউই নেই। থাকতেও পারে না।

এরপর বলা হয়েছে. 'আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।'—এখানে 'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন (ইয়াখ্লুক্কু মা ইয়াশাউ)' কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্পাকের অপ্রতিদ্বন্দ্বি ইচ্ছাশক্তিকে। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি সৃষ্টি করেন। নির্ধারিত কোনো বিধান তিনি মানতে বাধ্য নন। কারণ বিধান তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টিলীলা বিচিত্র, বিস্ময়কর। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম ঘটে বৃক্ষের। কিন্তু আল্লাহ্পাক এই বিশাল গগনমণ্ডল ও ধরিত্রীমণ্ডলকে কোনো বীজ বা বৃক্ষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিক্রমী বিধানও প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে— পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে মানব শিশুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে— পিতা-মাতা ছাড়াই। আবার সাধারণ বিধানানুসারে মানব শিশু ভুমিষ্ঠ হয় নারীর উদর থেকে। তাঁর প্রদত্ত এই সাধারণ বিধানকেও তিনি ভেঙেছেন এভাবে— হজরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমের বক্ষের অস্থি থেকে। তেমনি তিনি কেবল মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন হজরত ঈসাকে। এ সকল কিছু হচ্ছে তাঁর নিরঙ্কুশ ও চিরমুক্ত অভিপ্রায়ের নিদর্শন। 'ইয়াখলুক্কু মা ইয়াশাউ' (তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন) কথাটি সেই নিরঙ্কুশ ও সমকক্ষতাহীন অভিপ্রায়ের প্রমাণ।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদির' (আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান) — এ কথাটি চিরসত্য। সুতরাং সৃষ্টির বৃত্তবাসী যারা তারা কীভাবে স্রষ্টার মতো হয়? সৃষ্টি মুখাপেক্ষী। আর তিনি অমুখাপেক্ষী। অতএব এ কথা নিশ্চিত যে, যারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্ বলে, তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার ইহুদী নোমান বিন হুয়াই, বাহ্‌রী বিন আমর এবং শায বিন আদ্দী রসুল পাক স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করলে রসুল স. সেগুলোর যথা-উত্তর দিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন ও তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় দেখালেন। তারা বললো, হে মোহাম্মদ! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখান? আমরা তো আল্লাহ্‌র ও তার পুত্রের প্রিয় পাত্র (সুতরাং তিনি আমাদেরকে শাস্তি দিবেন কেনো)। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১৮

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

❒ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহের পুত্র ও তাঁহার প্রিয়। বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন? না, তোমরা মানুষ তাহাদেরই মতো যাহাদিগকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন।' যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন; আসমান ও জমিনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই আর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই দিকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়'— ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ কথার অর্থ, তারা মনে করতো—আল্লাহ্ আমাদের প্রতি পিতার মতো দয়ার্দ্র এবং আমরা তাঁর সন্তানের মতো স্নেহাস্পদ। তাই কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকেই আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কধারী।

ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, ইহুদীরা দেখেছিলো, তওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'হে আমার আহ্‌বারের সন্তানগণ,' (ইহুদী আলেমদেরকে বলা হয় আহ্‌বার)। তারা এই 'আহ্‌বার' শব্দটিকে মনে করতো 'ইব্‌কার' (কুমারী নারী)। এই ধারণায় তারা নিজেদেরকে মনে করতো—আল্লাহ্ আমাদেরকে কুমারী রমণীর সন্তান করেছেন। তাই আমাদের প্রকৃত পিতা হবে আল্লাহ্। এ কথা তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াতো। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, তাদের 'আবনাউল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র পুত্র) কথাটির অর্থ ছিলো, আমরা আল্লাহ্‌র পয়গম্বরের সন্তান (সুতরাং আমাদের উপর আযাব কিভাবে হবে)। কেউ কেউ বলেছেন, তারা হজরত উযায়ের এবং হজরত ঈসাকে বলতো আল্লাহ্‌র সন্তান এবং নিজেরা ছিলো হজরত

উযায়ের এবং হজরত ঈসার বংশধর হওয়ার দাবিদার। এই সূত্রে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে দাবি করতো। 'তবে কেনো তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন'—এ কথার অর্থ পিতা কখনো পুত্রকে শাস্তি দেন না। কিন্তু তোমাদেরকে অতীতেও শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। এখনো দেয়া হচ্ছে। এর পরেও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলো কীভাবে? হত্যা, বন্দী, অপমান, লাঞ্ছনা, আকৃতি পরিবর্তন—ইত্যাকার অনেক শাস্তি আরোপিত হয়েছে তোমাদের উপর। তাছাড়া তোমরা নিজেরাই স্বীকার করো, আখেরাতে কিছুদিনের জন্য তোমাদেরকে দোজখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। (পিতা কি কখনো সন্তানকে এতো শাস্তি দেয়)।

'না, তোমরা মানুষ তাদেরই মতো, যাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন'—এ কথার অর্থ অন্যান্য সৃষ্টির মতো তোমরাও সৃষ্ট। আর আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান সকলের জন্য এক। পুণ্যবানেরা উত্তম বিনিময় লাভ করবে এবং অবাধ্যরা পাবে শাস্তি— তোমরাও এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভূত (তোমাদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র বিধান নেই)।

'যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায় চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। ক্ষমা করতে কিংবা শাস্তি দিতে তিনি বাধ্য নন (বাধ্য বাধকতা থেকে তিনি চিরমুক্ত)।

'আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্‌পাকই নিখিল সৃষ্টির একক অধিকর্তা। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর অধীন। তিনি সৃষ্টির জনক নন—প্রভূপ্রতিপালক।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইলাইহিল মাসির'— এ কথার অর্থ 'আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।'—এ কথার মাধ্যমে পুণ্যবানদেরকে দেয়া হয়েছে সওয়াবের অঙ্গীকার এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছে আযাবের ভয়। অর্থাৎ পুণ্যবান, পাপী সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করবেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। কিন্ত তারা সাড়া দিলো না। তখন হজরত মুআজ বিন জাবাল এবং হজরত সা'দ বিন উবাদা বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্‌র শপথ তোমরা ভালো করেই জানো যে, মোহাম্মদ মোস্তফা স. আল্লাহ্‌র রসুল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তোমরাই এ কথা আমাদেরকে বলেছো এবং তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসাও করেছো। এ কথা শুনে ইহুদী রাফে বিন হারমেলা এবং ওহাব বিন ইয়াহুদা বললো, না। আমরা এ রকম বলিনি। হজরত মুসার পরে আল্লাহ্‌পাক কাউকে রসুল হিসেবে প্রেরণ করেননি। কোনো কিতাবও অবতীর্ন করেননি। ইহুদীদের এই অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۟

❐ হে কিতাবীগণ! রসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছে; সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতেছে যাহাতে তোমরা বলিতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নাই, এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আসিয়াছে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

দীর্ঘ বিরতির পর রসুল প্রেরণ করা হয়েছে। এ আয়াতে কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে এই শুভসমাচারটি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর এসেই পড়েছেন। তিনি স. তোমাদের নিকট স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে চলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মাদর্শ ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান, প্রকাশ করে চলেছেন হেদায়েতের নিদর্শনসমূহ যাতে করে তোমরা কিয়ামতের দিন এ অভিযোগটি উত্থাপন করতে না পারো, 'আমাদের নিকট কোনো শুভসমাচার প্রদাতা এবং সতর্ককারী আসেনি।'

শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'—এ কথার অর্থ একের পর এক রসুল প্রেরণ তাঁর অপার ক্ষমতার নিদর্শন। তাই দীর্ঘ বিরতির পর তিনি হজরত মুসার পরে হজরত ঈসা এবং হজরত ঈসার পরে হজরত মোহাম্মদ স. কে রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

রসুল মুসার পনেরো শত অথবা সতেরো শত বৎসর পর প্রেরিত হয়েছেন রসুল ঈসা। এর মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এক হাজার নবী। ইবনে সা'দ, জুকায়ের বিন বিকার এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় রয়েছে, কালাবী বলেছেন হজরত মুসা বিন ইমরান এবং হজরত ঈসার জননী মরিয়ম বিনতে ইমরানের মধ্যে ব্যবধান ছিলো এক হাজার সাত শত বছরের। তাঁদের বংশধারাও এক ছিলো না। হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসার মধ্যে ব্যবধান ছিলো এক হাজার পাঁচ'শ বছরের। হজরত আ'মাসের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসার মধ্যবর্তীতে এক হাজার নবী এসেছিলেন। কিন্তু হজরত ঈসার পরে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. পর্যন্ত কোনো নবী প্রেরিত হননি। হজরত কাতাদার মাধ্যমে ইবনে আসাকের এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত

মোহাম্মদ স. প্রেরিত হয়েছেন হজরত ঈসার ছয়'শ বছর পর। কিন্তু মোয়াম্মারের পদ্ধতিতে আব্দুর রাজ্জাক, আবদ বিন হুমাইদ এবং ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত কাতাদা বলেছেন—হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ স.এর মধ্যে ছিলো পাঁচ'শ ষাট বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে কোনো নবী আগমন করেননি।

আলোচ্য আয়াতে 'রসুল প্রেরণে বিরতির পর আমার রসুল তোমাদের নিকট এসেছে'— এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের বিপুল অনুগ্রহের কথা বিবৃত হয়েছে। কারণ, রসুল প্রেরণ আল্লাহ্পাকের রহমত। রসুলগণের প্রতি অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্পাকের প্রত্যাদেশ। সেই প্রত্যাদেশ দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত ছিলো। শেষ নবী মোহাম্মদ স. কে প্রেরণের মাধ্যমে পুনরায় খুলে দেয়া হয়েছে সেই রহমতের বেহেশতি প্রস্রবণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আমি পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে রসুল ঈসার সর্বাপেক্ষা নিকটে। সকল নবী ও রসুল ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের সকলের ধর্মাদর্শ এক। বিধিবিধান (শরিয়ত) ভিন্ন। আর রসুল ঈসা ও আমার মধ্যে অন্য কোনো নবী আগমন করেননি। বোখারী, মুসলিম।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২০

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَٰلَمِينَ

❒ স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী করিয়াছিলেন ও তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাহাকেও যাহা তিনি দেন নাই তাহা তোমাদিগকে দিয়াছিলেন।'

এখন থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে হজরত মুসা ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে। বলা হয়েছে, হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো—তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে নবী করেছিলেন।' —এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক তোমাদের মধ্যেই প্রেরণ করেছেন সবচেয়ে বেশী নবী ও রসুল। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্পাক এতো নবী প্রেরণ করেননি। এই নবী প্রেরণ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্পাকের বিপুল অনুগ্রহের প্রমাণ।

'তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দিলেন'— এ কথার অর্থ, ফেরাউনের সলিল সমাধির পর বনী ইসরাইলের মধ্যে অনেকেই হয়েছিলেন রাজা। সেই রাজাদের রাজত্ব অবলুপ্ত হয়ে গেলো তখনই, যখন তারা হজরত ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা করলো

এবং হজরত ঈসাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে রাজা অর্থ ওই ব্যক্তি যার রয়েছে বহুসংখ্যক পরিচারক ও পরিচারিকা। হজরত কাতাদা বলেছেন, সর্বপ্রথম বনী ইসরাইলেরাই খেদমতের জন্য পরিচারক ও পরিচারিকা নিয়োগ করে। তাদের পূর্বে এই প্রথাটি ছিলো না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে কেউ স্ত্রী পরিচারক ও বাহনের অধিকারী হলে তাকে বলা হতো রাজা। এই মারফু হাদিসের সহায়করূপে হজরত জায়েদ বিন আসলামের মুরসাল বর্ণনায় এসেছে, আব্দুর রহমান হাবালী বলেছেন, আমার সম্মুখে এক ব্যক্তি হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি ফকির ও মুহাজির নই? হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বললেন, তোমার কি স্ত্রী রয়েছে যার সঙ্গে তুমি বসবাস করো। সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তো তুমি বিত্তশালী। সে বললো, আমারতো একটি পরিচারকও রয়েছে। হজরত ইবনে আমর বললেন, তবে তো তুমি রাজা।

সুদ্দী বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো'—এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমরা ছিলে কিব্‌তীদের ক্রীতদাস। আল্লাহ্পাক সেই অভিশাপ থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। সেই বিশেষ অনুগ্রহের কথা তোমরা স্মরণ করো। জুহাক বলেছেন, বনী ইসরাইলদের বসতবাটি ছিলো বড় ও প্রশস্ত। কেউ কেউ বসতবাটির ভিতর দিয়েই প্রবাহিত করে দিতো প্রবহমান নহর। এ রকম নহরবিশিষ্ট বসতবাটির অধিকারীদেরকে বলা হতো রাজা।

শেষে বলা হয়েছে, 'বিশ্বজগতে অন্যকে যা তিনি দেননি, তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, বিপুলসংখ্যক নবী আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে দিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা পেয়েছে আল্লাহ্পাকের নৈকট্য ও পৃথিবীর সম্মান। দেখেছে অনেক অলৌকিক নিদর্শন। যেমন, সমুদ্রের বুক চিরে সৃষ্ট পথ, ফেরাউনের সলিল সমাধি ইত্যাদি। এ রকম নিয়ামত আল্লাহ্পাক অন্য কোনো সম্প্রদায়কে দেননি।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২১

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

❐ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না, করিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।'

হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিলেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্ধারণ করেছেন, সেই পবিত্র ভূমিতে (আরদ্বাল মুকাদ্দাসা) প্রবেশ

করো। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে পবিত্র ভূমির অর্থ তুর পর্বত ও তার সন্নিহিত ভূখণ্ড। জুহাক বলেছেন, এর অর্থ ইলিয়া এবং বাইতুল মাকদিস। ইকরামা ও সুদ্দী বলেছেন, আরীহা। কালাবীর মতে দামেস্ক, ফিলিস্তিন এবং জর্দানের কিছু অংশ। কাতাদার অভিমত হচ্ছে— এখানে পবিত্র ভূমি অর্থ সম্পূর্ণ শাম দেশ (সিরিয়া)। হজরত কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহ্র কিতাব তওরাতে দেখেছি— পৃথিবীতে শাম আল্লাহ্পাকের ধনভাণ্ডার। আর শামের অধিবাসীরা অন্যান্য মানুষের তুলনায় ধনভাণ্ডার তুল্য। এ স্থানটিকে পবিত্রভূমি বলা হয়েছে এ কারণে যে, বহু সংখ্যক নবী এবং তাঁদের অনুসারীরা এই এলাকার অধিবাসী ছিলেন।

'যে পবিত্র ভূমি আল্লাহ্পাক নির্ধারণ করেছেন'—এ কথার অর্থ, যে পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ্পাক তোমাদের বসবাস ফরজ করে দিয়েছেন। এ রকম বলেছেন কাতাদা ও সুদ্দী। তাঁদের মতে নামাজ, রোজা যেমন ফরজ, বনী ইসরাইলের জন্য তেমনি ওই স্থানে বসবাস করা ফরজ।

'পশ্চাদপসরণ কোরো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে'— কোনো কোনো আলেম এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্পাক লাওহে মাহফুজে এ কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, আরদ্বাল মুকাদ্দাসা (পবিত্র ভূমি) তোমাদের বাসস্থান— এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে এখানে একটি শর্ত উহ্য রয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। তখন অর্থ হবে এ রকম— তোমরা যদি বিশ্বাসী ও অনুগত হও তবে লাওহে মাহফুজে এ পবিত্র ভূমিকে আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য বাসস্থান নির্ধারণ করে দিবেন। এখানে বিশ্বাস এবং আনুগত্যের শর্তটি উহ্য রয়েছে মনে করতে হবে। কারণ, বিশ্বাস ও আনুগত্যের শর্তটি প্রতিপালিত না হওয়ার কারণে পরবর্তীতে আল্লাহ্পাক এই ভূখণ্ডটিকে বনী ইসরাইলের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, 'ক্বলা ফাই'ননাহা মুহার্‌রমাতুন আলাইহিম আরবায়িনা সানাতা (আল্লাহ্ বললেন, তবে এটা চল্লিশ বছর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ রইলো। —আয়াত ২৬)।

আলোচ্য আয়াত এবং ২৬ নং আয়াতটির সামঞ্জস্য বিধান— বিশ্বাস ও আনুগত্যের উহ্য শর্তটির মাধ্যমে করা সম্ভব। অর্থাৎ কথাটি এভাবে বুঝে নিতে হবে যে, এই আয়াতে লাকুম (তোমাদের জন্য) বলে বুঝানো হয়েছে পুণ্যবান বনী ইসরাইলকে। আর ২৬ নং আয়াতে আলাইহিম (তাহাদের জন্য) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অবাধ্য বনী ইসরাইলকে। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত এ পবিত্র ভূমির বসবাস পুণ্যবানদের জন্য ফরজ এবং অবাধ্যদের জন্য হারাম। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, বনী ইসরাইলের জন্য ওই ভূখণ্ডটি চল্লিশ বছরের জন্য ছিলো নিষিদ্ধ। তারপর আল্লাহ্পাক তাদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ওই পবিত্র ভূখণ্ডটিকে।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এখানে 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক ওই পবিত্র ভূমি তোমাদেরকে দান করেছেন। তাই ওই দান অবশ্যই তোমাদের হস্তগত হবে।

কালাবী বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম যখন লেবাননের পর্বতশীর্ষে আরোহন করলেন, তখন আল্লাহ্পাক তাঁকে বললেন, দূরে দৃষ্টিপাত করো। যতোদূর তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হবে ততদূরই 'আরদ্বাল মুকাদ্দাসা' (পবিত্র ভূমি)। ওই ভূমির অধিকারী হবে তোমার পরবর্তী বংশধর।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত মুসার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলেন— তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায়কে পবিত্র ভূমির অধিকার দেয়া হবে। ওই পবিত্র ভূমি অর্থ সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পূর্বে সেখানে বসবাস করতো অত্যাচারী কেনানীরা। ফেরাউনের সলিল সমাধির পর মিসরে গিয়ে পুনঃবসবাস করতে লাগলো বনী ইসরাইলেরা। তখন আল্লাহ্পাক এ আয়াতের নির্দেশটি অবতীর্ণ করলেন। এখানে শাম দেশের পবিত্র ভূমি আরীহায় গমনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন আরীহায় ছিলো এক হাজার বসতি। প্রতি বসতিতে ছিলো এক হাজার উদ্যান। আমি বলি, এখানে এক হাজার অর্থ অনেক। ঠিক গুণে গুণে এক হাজার নয়। আল্লাহ্পাকের নির্দেশটি ছিলো এ ধরনের— হে আমার রসুল মুসা! তুমি এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য আমি সিরিয়ার পবিত্র ভূমিকে বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছি। সুতরাং তোমরা সকলে সেখানে যাও এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আমি তোমাদেরকেই বিজয় দান করবো। তোমার সম্প্রদায়ের বারোটি গোত্রের জন্য নির্ধারণ করো বারোজন নেতা। তারাই হবে তাদের আপন আপন গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষক ও ব্যবস্থাপক। তারাই দেখবে, তাদের গোত্রভূতরা আল্লাহ্পাকের নির্দেশের যথাপ্রতিপালন করে চলেছে কিনা। এরপর হজরত মুসা বারোটি গোত্রের জন্য নিযুক্ত করলেন বারো জন নেতা। এরপর সকলকে নিয়ে চললেন আরীহার দিকে। শহরের উপকণ্ঠে স্থাপন করলেন সমরশিবির। বারোজন নেতাকে পাঠালেন শত্রুর গতিবিধি জেনে আসার জন্য। দ্বাদশ নেতা বাইতুল মাকদিসের অদূরে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন। আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকটি ছিলো সুবিশাল শরীরবিশিষ্ট। দেহের উচ্চতা তিন হাজার তিনশত তেত্রিশ হাত। সে পানি পান করতো উড়ন্ত মেঘমালা থেকে। আর সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে মাছ ধরে নিয়ে সূর্যালোকে সিদ্ধ করে খেতো। এক বর্ণনায় রয়েছে, প্লাবনে পাহাড় নিমজ্জিত হলে পানি পৌছতো তার উরুদেশ পর্যন্ত। নাম তার উজ। মাতার নাম অনুক। অনুক ছিলো হজরত আদমের কন্যা। তার উপবেশনের জন্য প্রয়োজন হতো এক জরীব জমীনের (হিন্দুস্তানের হিসেবে ষাটগজ এবং ইংরেজদের হিসেবে পঞ্চাশ গজ জমি মাপার শিকলকে বলা হয় জরীব)। তিন হাজার বছর বেঁচে ছিলো উজ। শেষে হজরত মুসার মাধ্যমে

আল্লাহ্পাক তাকে ধ্বংস করে দেন। ঘটনাটি ছিলো এ রকম— সে হজরত মুসার সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে দাবিয়ে দিতে পারে, এ রকম এক বিশাল পাথর উত্তোলন করলো। এমন সময় আল্লাহ্পাকের নির্দেশে একটি হুদহুদ পাখি তার ঠোঁট দিয়ে পাথরের মাঝখানে সৃষ্টি করে দিলো একটি সুড়ঙ্গ। ওই পাথর শেষে গিয়ে পড়লো তার নিজের উপরেই। সুড়ঙ্গ পথে প্রবিষ্ট হলো তার মস্তক। সে আর অগ্রসর হতে পারলো না, মাটিতে পড়ে গেলো। তখন হজরত মুসা তাকে হত্যা করলেন। এই উজেরই মুখোমুখি হলো দ্বাদশ নেতা। উজের মাথায় তখন ছিলো বিশাল লাকড়ির বোঝা। সে দ্বাদশ নেতাকে ধরে তার কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিলো তারপর বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীর সামনে নেতাদেরকে দাঁড় করিয়ে বললো, দেখো! এই লোকগুলো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। আমি এদেরকে পদতলে পিষ্ট করবো। স্ত্রী বললো, না। এদেরকে ছেড়ে দাও। এরা যা কিছু দেখলো, তা তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গিয়ে জানাবে। স্ত্রীর কথা শুনে উজ তাদেরকে ছেড়ে দিলো। এক বর্ণনায় রয়েছে। উজ দ্বাদশ নেতাকে তার আস্তিনে ভরে নিয়ে তাদের বাদশাহ্র নিকট উপস্থিত হলো। বাদশাহ্ দ্বাদশ নেতাকে দেখলো। বললো, তোমরা যা কিছু দেখেছো তা তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে জানাও। দ্বাদশ নেতা দেখলো, দুর্ধর্ষ আমালিকাদের সকল কিছুই বিশালাকৃতির। তাদের আঙ্গুরের খোসা উঠাতেও লাগে পাঁচ জন মানুষ। আনারের খোসাও এত বড় যে, অনায়াসে সেখানে পাঁচটি মানুষ ঢুকে যেতে পারে। আমি বলি, উজ বিন উনুক সম্পর্কিত বাগবীর বর্ণনাটি অতিরঞ্জিত, সুস্থ জ্ঞান এ সকল বিবরণকে গ্রহণ করে না। হাদিস বিশেষজ্ঞগণ এই অলিক ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা কেবল এতোটুকু স্বীকার করেছেন যে, আমালিকা সম্প্রদারের লোকেরা ছিলো বিশাল বপুধারী এবং শক্তিশালী। আর তাদের মধ্যে উজ ছিলো অপেক্ষাকৃত অধিক বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ও শক্তিমান।

ভীত ও বিস্মিত দ্বাদশ নেতা ফিরে এসে হজরত মুসার নিকটে সব কিছু খুলে বললো। হজরত মুসা বললেন, এ সকল কথা কাউকে জানিও না, সেনাপতিদেরকেও নয়। নতুবা সকলে হতোদ্যম হয়ে পড়বে। এই দ্বাদশ নেতার মধ্যে দু'জন মাত্র হজরত মুসার নির্দেশ মান্য করলেন। বাকী দশ জন তাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সকলের নিকট ভয়ংকরদর্শন আমালিকাদের কথা জানিয়ে দিলো। একান্ত অনুগত ওই দু'জন ছিলেন ইউশা বিন নুন বিন আফ্রাহিম বিন ইউসুফ এবং কালেব বিন উকান্না। ইউশা ছিলেন হজরত মুসার একান্ত অনুচর। তেইশ নং আয়াতে 'তাদের মধ্যে দু'জন'—এ কথা বলে এ দু'জনের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কালেব ছিলেন হজরত মুসার বোন মরিয়ম বিন ইমরানের স্বামী এবং ছিলেন ইয়াহুদার বংশধর।

আমালিকাদের বিবরণ শুনে বনী ইসরাইলেরা বিলাপ শুরু করে দিলো। বললো, মনে হয় আর আমরা বাঁচবো না। মিসরেই শেষে আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেনো যে আমরা এখানে এলাম। মনে হয় মৃত্যু এসেই গিয়েছে।

হায়! আমাদের পরিবার পরিজন ও সহায় সম্পদ এখনই হয়তো হয়ে যাবে আমালিকাদের গণিমত। কেউ কেউ বললো, এসো, অন্য কাউকে আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করি এবং হজরত মুসাকে পরিত্যাগ করে এখান থেকে চলে যাই।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

❒ তাহারা বলিল, 'হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রহিয়াছে এবং তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না; তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলে আমরা প্রবেশ করিব।'

❒ যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা বলিল, 'তোমরা প্রবেশ দ্বারে তাহাদের মুকাবিলা কর, প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে আর তোমরা বিশ্বাসী হইলে আল্লাহের উপরই নির্ভর কর।'

❒ তাহারা বলিল, ' হে মূসা! তাহারা যতদিন সেখানে থাকিবে ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না; সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই, সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।'

এখানে 'দুর্দান্ত সম্প্রদায়' অর্থ আমালিকা সম্প্রদায়। বনী ইসরাইল তাদেরকেই 'ক্বওমান জাব্বারিন' (দুর্দান্ত সম্প্রদায়) বলেছে। যে জোর করে অন্যকে নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করে তাকে বলে জাবের এবং জাব্বার। বাগবী লিখেছেন,

জাব্বার বলে তাকে— যে অজেয়, অপ্রতিরোধ্য। যেমন বলা হয়, 'নাখলাতুন জব্বারাতুন' (ওই দীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষ যা আওতা বহির্ভূত)। আমি বলি, তারা দুর্দান্ত ছিলো শারীরিক শক্তির কারণে। অথবা বিপুল সৈন্য, সম্পদ এবং অস্ত্র সম্ভারের কারণে। বাগবী আরো লিখেছেন, আমালিকারা ছিলো আদ সম্প্রদায়ের অধঃস্তন পুরুষ। আদ, সামুদ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে বলা হতো 'বায়েদা' (ধ্বংস প্রাপ্ত)। তাদের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

বনী ইসরাইলেরা বললো, আমালিকারা বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা ওই শহরে প্রবেশ করবোই না। তারা বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রবেশ করবো সেখানে। এ কথা বলে তারা মিশরে ফিরে যেতে মনস্থ করলো। হজরত মুসা এবং হজরত হারুণ সেজদাবনত হলেন। ইউশা এবং কালেব ক্ষোভে দুঃখে নিজেদের পরিধেয় ছিঁড়তে শুরু করলেন। তাদের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে। 'তাদের মধ্যে দুইজন— যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন।' কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'দুইজন'— ইউশা এবং কালেব ছিলেন না। ওই দুই জন ছিলেন আমালিকা সম্প্রদায়ের। তাঁরা হজরত মুসার ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আয়াতের অর্থ হবে এ রকম— 'ওই সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি, যাদেরকে বনী ইসরাইল ভয় করছিলো, তারা বললো.......'। হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের ক্বেরাতে এই অর্থটি পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি আয়াতের 'ইয়াখাফুনা' শব্দটিকে পড়েছেন 'ইউখাফুন'। ইবনে জারীর এ রকম বলেছেন হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের থেকে এবং হাকেম বলেছেন— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। ওই দু'জন সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন' (আন্‌আমাল্লাহু আলাইহিমা)। তাঁরা বললেন, 'তোমরা প্রবেশ দ্বারে তাদের মোকাবিলা করো; প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে আর তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করো'। এ কথার অর্থ— তোমরা অতর্কিতে তাদের উপর চড়াও হও। এবং তাদেরকে বন্দী করো— যাতে তারা জঙ্গলের বা প্রান্তরের দিকে পালিয়ে যেতে না পারে। যদি তোমরা হঠাৎ এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, তবে তোমরাই জয়ী হবে। কারণ, তাদের শহরের পরিসর সংকীর্ণ। তাই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি তাদের হবে না। তারা শারীরিক শক্তিমত্তার অধিকারী হলেও অন্তরের দিক থেকে শক্তিশালী নয়। আর আল্লাহ্পাক তোমাদেরকেই বিজয়দানের অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে বিশ্বাস করো। বাগবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলেরা আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত ওই দু'জনকে প্রস্তরনিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করতে চাইলো। তারা রোষান্বিত হয়ে বললো, হে মুসা, তারা যতোদিন সেখানে থাকবে ততোদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবোই না; সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো (আয়াত ২৪)।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, বনী ইসরাইলেরা এ কথা বলেছিলো, ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে। আল্লাহ্ এবং তার রসুলের প্রতি তারা মোটেও অনুগত ছিলো না। আমি বলি, কথাটি ভুল। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ভর্ৎসনা কুফরীকে (অবিশ্বাসকে) অবধারিত করে। কিন্তু তারা কাফের ছিলো না। কাফের হলে তারা হজরত মুসার সঙ্গে থাকতে পারতো না। মান্না ও সালওয়া তাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো না। মেঘমালার ছায়া, প্রস্তর নিঃসৃত পানির প্রস্রবণ—এগুলোও তারা লাভ করতো না। সুতরাং এখানে তাদের বক্তব্যের অর্থ হবে এ রকম—আপনি অগ্রসর হোন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক আপনাকে সাহায্য করবেন। আমরা বরং এখানেই অপেক্ষা করি।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন, এ রকম একটি দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছেন হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ। আমি যদি সে রকম সুযোগ পেতাম, তবে তা হতো আমার নিকট পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। রসুল স. একবার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহবান জানালেন। আহবান শোনা মাত্র হজরত মিকদাদ দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আমরা হজরত মুসার সম্প্রদায়ের মতো নই— যারা বলেছিলো, আপনি এবং আপনার আল্লাহ্ যুদ্ধ করুন। আমরা আমাদের রসুল স. এর দক্ষিণে, বামে, অগ্রে ও পশ্চাতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো। তাঁর এ কথা শুনে রসুল স. অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে ফুটে উঠলো খুশীর ঝলক।

ভীত ও দ্বিধান্বিত বনী ইসরাইলের কথা শুনে এবং ইউশা ও কালেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা জানতে পেরে হজরত মুসা রোষতপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই; সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও' (আয়াত ২৫)। —এখানে 'অপর কারোর উপর আমার আধিপত্য নেই' অর্থ কারো অবাধ্যতা দূর করার ক্ষমতা আমার নেই। 'আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত'—এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমি ও আমার ভ্রাতা হারুণ ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাসী নয়। কারণ, ইউশা এবং কালেবসহ একটি ক্ষুদ্র দল ছিলো হজরত মুসার পূর্ণ অনুগত। হজরত মুসা রোষতপ্ত ছিলেন বলে অধিকাংশ ভীত বনী ইসরাইলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছিলেন, 'আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।' অতএব প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম— হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাদের এবং অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিন। অর্থাৎ যারা অনুগত তাদেরকে দান করুন সওয়াব এবং যারা অবাধ্য তাদের প্রতি আপতিত করুন আযাব। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— আমাদেরকে অবাধ্যদের সংসর্গ থেকে পৃথক করে দিন।

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

❐ আল্লাহ্ বলিলেন, 'তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল; তাহারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে; সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।'

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ করো।' নির্দেশটি ছিলো হজরত মুসার। তাঁর নির্দেশের অবমাননার কারণে এই আয়াতে বলা হলো, তবে এটা চল্লিশ বৎসর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইলো'—এ কথার অর্থ, বনী ইসরাইলকে চল্লিশ বছরের জন্য ওই শহরের বসবাস থেকে বঞ্চিত করা হলো। চল্লিশ বছর পর বনী ইসরাইলেরা যখন হজরত মুসার নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলো, তখন হজরত মুসা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আরীহা বিজয় সম্পন্ন করলেন। হজরত ইউশা হলেন প্রধান সেনাপতি। আমালিকাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করার পর হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরীহায় বসবাস করতে শুরু করলেন। সেখানেই সাঙ্গ হলো তাঁর পৃথিবীর জীবন। কেউ জানে না তাঁর পবিত্র সমাধি কোথায়। বাগবী লিখেছেন, বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে এ কথাটি প্রমাণিত যে, হজরত মুসা-ই হত্যা করেছিলেন উজ বিন উনুককে। অভিমতটি ঐকমত্যসঞ্জাত। আমি বলি, এই ঘটনাটি সুরা বাকারার একষট্টি নম্বর আয়াতের তাফসীরে বিবৃত হয়েছে। হজরত মুসার নির্দেশের অবমাননার কারণে বনী ইসরাইলকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো তীহ্ প্রান্তরে। সেখানে তাদের সঙ্গে হজরত মুসাও ছিলেন। চল্লিশ বছরের বন্দীত্ব শেষে বিজিত হয়েছিলো আরীহা।

'তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে'— এ কথার অর্থ, তাদের প্রান্তরের বন্দী জীবন হবে সার্বক্ষণিক। তারা কখনো তাদের জন্য নির্দিষ্ট পবিত্র ভূমি আরীহায় প্রবেশ করতে পারবে না। উদভ্রান্ত হয়ে তারা যেদিকেই গমন করুক না কেনো— তীহ্ প্রান্তরের মধ্যেই নির্ধারিত থাকবে তাদের গমনাগমন। তাই হয়েছিলো। তারা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রবেশ করতে পেরেছিলো তাদের পরবর্তী বংশধরেরা। চল্লিশ বৎসরে মৃত্যুবরণ করার পর তাদের সন্তানেরা হজরত ইউশা ইবনে নুনকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হলো। হজরত মুসা এবং হজরত হারুন ইন্তেকাল করলেন ওই তীহ্ প্রান্তরেই। তাঁদের মহাপ্রয়ানের পর হজরত ইউশা নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন প্রতিশ্রুত পবিত্র ভূমিতে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম।

বাগবী লিখেছেন, ঘটনাটি ছিলো এ রকম—হজরত মুসা পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন। অতিক্রান্ত হলো চল্লিশটি বছর। আল্লাহ্‌পাক হজরত ইউশাকে নবুয়ত দান করলেন। তিনি বনী ইসরাইলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে আমালিকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ পালন করতেই হবে। বনী ইসরাইলের নতুন প্রজন্ম আল্লাহ্‌র নির্দেশকে সর্বান্তঃকরণে মান্য করলেন এবং জেহাদের বায়াত গ্রহণ করলেন। হজরত ইউশার নেতৃত্বে সকলে এগিয়ে চললেন আরীহার দিকে। তাঁদের সঙ্গে ছিলো তাবুত (ওই অলৌকিক সিন্দুক যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা বাকারার ২৪৮ নং আয়াতের তাফসীরে)। বনী ইসরাইল বাহিনী আরীহা অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় কেটে গেলো ছয়টি মাস। সপ্তম মাসের শুরুতেই শিংগায় ফুৎকার দেয়া হলো। আল্লাহু আকবর বলে বীর বিক্রমে বনী ইসরাইল বাহিনী ঢুকে পড়লো শহরের অভ্যন্তরে। শুরু হলো আমালিকা নিধন পর্ব। পরাজিত হলো দুর্ধর্ষ আমালিকা সম্প্রদায়। যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো জুম্মার দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হলো। পরদিন শনিবার পুনরায় শুরু হলো যুদ্ধ। হজরত ইউশা আগের দিন সূর্যকে সংযত করার নিমিত্তে বলেছিলেন, 'হে আমার আল্লাহ্! আপনি সূর্যকে আমার প্রতি ফিরিয়ে দিন। তারপর সূর্যকে বললেন, তুমি যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ পালন করছো, আমিও তেমনি নিয়মিত নির্দেশ পালন করে থাকি। তুমি বিলম্বে অস্ত গেলে আমি আল্লাহ্‌র শত্রুদের নিধন পর্ব সমাপ্ত করতে পারতাম। পরদিন আল্লাহ্‌পাক সূর্যের অস্তগমন একঘণ্টা বিলম্বিত করে দিলেন। সেই সুযোগে হজরত ইউশা আমালিকা নিধন পর্ব সমাপ্ত করলেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইউশা শামদেশের সকল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তিনি একত্রিশ জন রাজাকে হত্যা করলেন এবং সম্পূর্ণ শাম সাম্রাজ্য অধিকার করলেন। প্রশাসক নিযুক্ত করলেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে। তারপর যুদ্ধলব্ধ গণিমতের সকল সম্পদ উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্র করলেন। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলেন, আকাশ থেকে কোনো আগুন নেমে এলো না (পূর্ববর্তী নবীগণের সময়ের নিয়ম ছিলো—গণিমত কেউ ভোগ করতে পারবে না, উন্মুক্ত প্রান্তরে স্তূপিকৃত করে রাখতে হবে গণিমতের সকল সম্পদকে। তখন আকাশ থেকে আগুন এসে সকল সম্পদকে ভস্মিভূত করে দেবে। এটাই ছিলো জেহাদ ও কোরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন)। আগুন নেমে না আসায় হজরত ইউশা পেরেশান হয়ে পড়লেন। বললেন, আল্লাহ্‌পাকই জানেন কী অপরাধ আমরা করেছি। আল্লাহ্‌পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন—এক ব্যক্তি গণিমতের মাল চুরি করেছে। বনী ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেনো নতুন করে তোমার কাছে বায়াত গ্রহণ করে। তিনি বায়াত গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। সকলেই বায়াত গ্রহণ করলেন। এক ব্যক্তি শুধু বায়াত গ্রহণ করতে পারলো না। সে হস্ত প্রসারিত করলো বটে, কিন্তু তার হাত আপনাআপনি ফিরে এলো। হজরত ইউশা বললেন, তোমার কাছে কী আছে বের করো। লোকটি নিয়ে এলো একটি

মনিমুক্তা শোভিত স্বর্ণনির্মিত গাভীর মস্তক। হজরত ইউশা সেটিকে গণিমতের মালের স্তূপে রেখে দিলেন। চোরটিকেও রেখে দিলেন মালের সঙ্গে। একটু পরেই আকাশ থেকে অগ্নির লেলিহান শিখা নেমে এসে ওই লোকটিসহ সকল গণিমতের মাল ভস্মিভূত করে দিয়ে গেলো। এর কিছুদিন পর হজরত ইউশা পরবর্তী পৃথিবীর দিকে যাত্রা করলেন।

ইফরাইম পাহাড়ের এক গুহায় তাঁকে সমাহিত করা হলো। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো এক শত ছাব্বিশ বছর। হজরত মুসার মহাঅন্তর্ধানের পর তিনি ছাব্বিশ বছর ধরে বনী ইসরাইলদেরকে পরিচালনা করেছিলেন।

'সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কোরো না'— এ কথা বলে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুল হজরত মুসাকে এই মর্মে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন যে, অবাধ্যরা শাস্তির উপযুক্ত। তীহ্ প্রান্তরে তাদেরকে চল্লিশ বছর ধরে আটকে রাখা হলো। এ শাস্তি তাদের প্রাপ্য। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! অবাধ্যরা শাস্তি পেয়েছে বলে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে ছয় ফরসখ (তিন মাইলে এক ফরসখ—এই হিসেবে তিনশত চব্বিশ বর্গমাইল) এলাকার মধ্যে চল্লিশ বছর ধরে বনী ইসরাইলদেরকে বন্দী করে রেখেছিলেন আল্লাহ্পাক। তীহ্ প্রান্তরের ওই নির্ধারিত সীমানার মধ্যে চলাফেরা করতে বাধ্য হতো বনী ইসরাইলেরা। সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টাই তাদের ফলপ্রসূ হতো না। অন্যত্র গমনের উদ্দেশ্যে কেউ সকালে পথ চলতে শুরু করলেও বিকেল বেলা সেখানেই এসে পৌঁছুতো যেখান থেকে তার যাত্রারম্ভ হয়েছিলো। আবু শায়েখ তাঁর আল উজমা গ্রন্থে ইবনে জারীর ও ওহাব বিন মোনাববাহ্ সূত্রে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনায় ছয় ফরসখের কথাটি নেই।

বাগবী আরো লিখেছেন, বনী ইসরাইলের ছিলো ছয় লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে— হজরত মুসা এবং হজরত হারুন ওই সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, তাঁরাও বনী ইসরাইলের সঙ্গে তীহ্ প্রান্তরে বসবাস করতেন। তাঁদের জন্য ওই বসবাস শাস্তিমূলক ছিলো না। ছিলো আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ। শাস্তি ছিলো শুধু অবাধ্য বনী ইসরাইলের জন্য। এতদসত্ত্বেও বাধ্য অবাধ্য নির্বিশেষে সকলেই সেখানে পেতো মেঘপুঞ্জের ছায়া— যা বিস্তৃত হতো ছয় ফরসখ সীমানা জুড়ে। হজরত রবী বিন আনাস থেকে ইবনে জারীর এ রকম বর্ণনা করেছেন। রাতে সেখানে প্রকাশিত হতো আলোর একটি স্তম্ভ— যার ফলে আলোকিত হয়ে পড়তো পুরো এলাকা। খাদ্য হিসেবে নিয়মিত অবতীর্ণ হতো মান্না ও সালওয়া। আর পানির প্রয়োজন মিটতো ওই অলৌকিক প্রস্তর খণ্ডটি থেকে— হজরত মুসার যষ্টির আঘাতে যা থেকে নির্গত হতো বারোটি গোত্রের জন্য বারোটি স্বচ্ছ তোয়প্রবাহ।

এক সময় তীহ্ প্রান্তরের বন্দী জীবনের অবসান ঘটলো। পুনঃনির্দেশ এলো— ওই জনপদের দিকে এগিয়ে চলো। হজরত মুসা তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সুসম্পন্ন করলেন আরীহা বিজয়। নির্দেশ দিলেন শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে শহরাভ্যন্তরে প্রবেশ করো।

হজরত হারুনের মহাপ্রয়ানঃ সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে প্রত্যাদেশ করলেন— 'আমি হারুনকে মৃত্যু দান করতে চাই। তুমি তাঁকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে এসো। হজরত মুসা নির্দেশানুসারে হজরত হারুনকে নিয়ে নির্ধারিত পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, একটি বিস্ময়কর বৃক্ষ ও প্রাসাদ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সুন্দর সিংহাসন। মনোরম ফরাশ বিছানো সেই সিংহাসন থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অপার্থিব সুবাস। হজরত হারুন সিংহাসনটিকে খুবই পছন্দ করলেন। বললেন, মুসা! আমি এই সিংহাসনে শয়ন করতে চাই। হজরত মুসা বললেন, বেশতো, শয়ন করুন। হজরত হারুন বললেন, গৃহকর্তা যদি অপ্রসন্ন হোন। হজরত মুসা বললেন, আমি গৃহকর্তাকে বুঝিয়ে বলবো। হজরত হারুন বললেন, আপনিও আমার পাশে শয়ন করুন। গৃহকর্তা যদি অপ্রসন্ন হোন তবে আমাদের দু'জনের প্রতিই অপ্রসন্ন হবেন (আমরা তখন সম্মিলিতভাবে জবাবদিহি করতে পারবো)। নবী ভ্রাতৃদ্বয় সিংহাসনে শয়ন করলেন। শয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে হজরত হারুন বুঝলেন, তিনি এবার মৃত্যুর মুখোমুখি। বললেন, মুসা! আমার চোখ দু'টো বন্ধ করে দিন। এ কথা বলার পরক্ষণেই ইন্তেকাল করলেন হজরত হারুন। আর বৃক্ষ, প্রাসাদ এবং সিংহাসনসহ হজরত হারুন উঠে গেলেন আকাশে। নিঃসঙ্গ হজরত মুসা ভ্রাতৃবিরহে ভারাক্রান্ত হয়ে ফিরে এলেন আপন সম্প্রদায়ের নিকট। তাঁকে একাকী দেখে বনী ইসরাইলেরা বললো, আমরা হজরত হারুনকে অত্যধিক ভালোবাসি। তাই হজরত মুসা তাঁকে হত্যা করে একা ফিরে এসেছেন। হজরত মুসা বললেন, হে অবুঝ হতভাগ্যের দল! হারুন তো আমার সহোদর ভ্রাতা। তোমরা কি মনে করো আমি ভ্রাতৃ হন্তারক? এ কথার জবাব না দিয়ে লোকেরা একই কথা বার বার বলতে লাগলো। হজরত মুসা দুই রাকাত নামাজ পড়লেন এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মুহূর্তেই প্রকাশিত হলো প্রার্থনার ফল। নেমে এলো সেই অলৌকিক সিংহাসন। লোকেরা বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলো, আকাশে ভাসমান সিংহাসনে শায়িত রয়েছেন হজরত হারুন। এ দৃশ্য দেখে তারা হজরত মুসার প্রতি আরোপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলো।

হজরত আলী বিন আবু তালেব বলেছেন, একটি পাহাড়ে আরোহণ করলেন মুসা ও হারুন। সেখানে হজরত হারুন পরলোকগমন করলেন। বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসাকে বললো, তুমিই হারুনকে হত্যা করেছো। তখন আল্লাহ্পাকের নির্দেশে ফেরেশতারা হারুনের পবিত্র মরদেহ বনী ইসরাইলের নিকট নিয়ে এলেন এবং তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করলেন। বনী ইসরাইলেরা তখন হজরত হারুনের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হলো এবং হজরত মুসাকে নির্দোষ বলে মেনে নিলো। ফেরেশতারা তখন হজরত হারুনের জানাযা আদায় করলেন এবং একস্থানে সমাধিস্থ করলেন। তাঁর সমাধি কোথায় তা 'রখম' ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কিন্তু আল্লাহ্পাক রখমকে মুক ও বধির করে দিয়েছেন (এক প্রকার গাধার নাম রখম)।

হজরত আমর বিন মায়মুনা বলেছেন, তীহ্ প্রান্তরেই বসবাস করতেন হজরত মুসা ও হজরত হারুন। তাঁরা দু'জনে একদিন একটি পাহাড়ের গুহায় উপস্থিত হলেন। সেখানে ইন্তেকাল করলেন হজরত হারুন। হজরত মুসা তাঁকে সমাহিত করে ফিরে এলেন। বনী ইসরাইলেরা বললো, আমরা হারুনকে ভালোবাসি। তাই বিদ্বেষবশতঃ আপনি তাঁকে হত্যা করেছেন। বনী ইসরাইলেরা অবশ্য হজরত হারুনকে খুবই ভালোবাসতো। হজরত মুসা আল্লাহ্পাকের দরবারে জানালেন বিনম্র প্রার্থনা। আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন—বনী ইসরাইলদেরকে হারুনের কবরের নিকট নিয়ে যাও। হজরত মুসা সকলকে নিয়ে হজরত হারুনের কবরের পাশে পৌঁছলেন। হজরত হারুনকে নাম ধরে ডাকলেন তিনি। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মস্তক আন্দোলিত করে কবর থেকে বেরিয়ে এলেন হজরত হারুন। হজরত মুসা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আপনাকে হত্যা করেছি? হজরত হারুন বললেন, না। স্বাভাবিক নিয়মেই ইন্তেকাল হয়েছে আমার। হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে, আপনি এবার প্রস্থান করুন। হজরত হারুন সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন কবরের আড়ালে। স্বগৃহে ফিরে এলো বনী ইসরাইলেরা।

হজরত মুসার মহাঅন্তর্ধানঃ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত মুসা মৃত্যুকে পছন্দ করতেন না। আল্লাহ্পাক চাইলেন হজরত মুসা যেনো মৃত্যুকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন। তিনি তাই ইউশা ইবনে নুনকে নবী নির্ধারণ করলেন। তিনি সকাল বিকাল হজরত মুসার নিকট গমন করতেন। হজরত মুসা একদিন বললেন, হে আল্লাহ্র নবী, আল্লাহ্পাক কি আপনার নিকট কোনো নতুন পয়গাম প্রেরণ করেছেন? হজরত ইউশা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, আমিতো দীর্ঘদিন ধরে আপনার পবিত্র সংসর্গে রয়েছি। আমি কখনোই নতুন প্রত্যাদেশ এসেছে কিনা সে সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। আপনি সব সময় আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ প্রচার করেছেন। এ কথা শুনে হজরত মুসা জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর প্রতি তাঁর আসক্তি গেলো বেড়ে।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা একদিন হজরত মুসার নিকটে এসে বললেন, আপনার প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দিন। হজরত মুসা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইলকে সজোরে চপেটাঘাত করলেন। এর ফলে তাঁর একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়ে গেলো। তিনি আল্লাহ্পাকের দরবারে গিয়ে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আপনি আমাকে আপনার এমন এক দাসের নিকট পাঠিয়েছেন— যে মরতে চায় না। আপনার সেই রোষান্বিত প্রেমিক আমার দৃষ্টিশক্তিকে বিনষ্ট করেছেন। আল্লাহ্পাক হজরত আজরাইলের চোখ ভালো করে দিয়ে বললেন, তুমি পুনরায় তার নিকট গমন করো। তাকে বলো, পৃথিবীর জীবনই যদি আপনার পছন্দ হয়, তবে আপনার হাত কোনো গাভীর পৃষ্ঠদেশে রাখুন। আপনার হাত ওই গাভীর যতোগুলো পশম স্পর্শ করবে, ততো বৎসর আপনাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে দেয়া হবে। হজরত আজরাইল আল্লাহ্র এই পয়গাম পৌঁছে দিলেন হজরত মুসার নিকটে। তিনি

বললেন, ঠিক আছে তা না হয় করলাম। তারপর? হজরত আজরাইল বললেন, তারপর তো মৃত্যুবরণ করতেই হবে। হজরত মুসা বললেন, তাহলে আর বিলম্ব করে কী লাভ। তিনি প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে পবিত্র ভূমির (আরদ্বাল মুকাদ্দাসের) অতি সন্নিকটে পৌঁছে দিন। রসুলপাক স. বলেছেন, সেখানে উপস্থিত হলে আমি তোমাদেরকে ওই লাল টিলার সন্নিকটে রাস্তার পাশে হজরত মুসার সমাধি দেখিয়ে দিতে পারবো। বোখারী, মুসলিম।

ওহাবের বর্ণনায় রয়েছে, একবার হজরত মুসা কোনো এক কাজের উদ্দেশ্যে পথ চলছিলেন। পথ চলতে চলতে একস্থানে দেখলেন, ফেরেশতাদের একটি দল একটি কবর খনন করে চলেছে। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। এতো সুন্দর কবর তিনি আর কখনো দেখেননি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র ফেরেশতাবৃন্দ! এই কবর কার জন্য খনন করা হয়েছে? ফেরেশতারা বললেন, আল্লাহ্র এমন এক বান্দার জন্য যিনি আল্লাহ্র নিকট অত্যধিক সম্মানার্হ। হজরত মুসা বললেন, সত্যি তাই। এতো অপরূপ শয়নকক্ষ আমি আর কখনও দেখিনি। ফেরেশতারা বললেন, হে কলিমুল্লাহ্! এই শয়নকক্ষটি কি আপনার মনে ধরেছে? হজরত মুসা বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ বললেন, তবে এখানে শয়ন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবদ্ধ করুন। হজরত মুসা নির্দ্বিধায় শুয়ে পড়লেন কবরে। পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলেন আল্লাহ্র প্রতি। ধীরে ধীরে তাঁর নিঃশ্বাস হয়ে এলো শ্লথ। আল্লাহ্পাক তাঁর মহান প্রেমিকের প্রাণ হরণ করলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো এক শত বিশ বছর।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২৭

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○

❐ আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাহাদিগকে যথাযথভাবে শোনাও যখন তাহারা উভয়ে কোরবানী করিয়াছিল তখন এক জনের কোরবানী কবুল হইল এবং অন্য জনের কবুল হইল না। তাহাদের একজন বলিল, 'আমি তোমাকে হত্যা করিবই।' অপরজন বলিল, 'আল্লাহ্ সংযমীদিগের কোরবানী কবুল করেন,

---

হজরত আদমের দুই পুত্র কাবিল ও হাবিলের বৃত্তান্ত উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। কাবিল ও হাবিল দু'জনেই আল্লাহ্পাকের সন্তোষ সাধনার্থে তাদের কোরবানী পেশ করেছিলো। কিন্তু হাবিলের কোরবানী কবুল

হয়েছিলো। কাবিলের হয়নি। এ সম্পর্কে আলেমগণ উল্লেখ করেছেন—হজরত হাওয়া প্রতি প্রসবে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দিতেন। এভাবে বিশ বারে চল্লিশ জন সন্তান প্রসব করেছিলেন তিনি। বিশটি পুত্র এবং বিশটি কন্যা, প্রথম প্রসবে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন কাবিল এবং আকলিমা। দ্বিতীয় প্রসবে হাবিল ও লিমুজা। সর্বশেষ প্রসবে ছিলেন আবুল মুগীছ ও উম্মুল মুগীছ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আদম পৃথিবীতে থাকতেই তাঁর অধঃস্তন বংশধরদের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছিলো চল্লিশ হাজারে। বিভিন্ন ইসরাইলী আলেমের মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, কাবিল ও তার সহজন্মের বোন আকলিমার জন্ম হয়েছিলো হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার বেহেশতবাসের সময়। তাই তখন হজরত হাওয়াকে ঋতুস্রাব, গর্ভধারণের বিড়ম্বনা, প্রসব বেদনা — কোনো কিছুই ভোগ করতে হয়নি। এ সকল কষ্ট তিনি প্রথমে পেয়েছিলেন হাবিল ও তার সহজন্মের বোন লিমুজার পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পৃথিবীতে অবতরণের একশ' বছর পর হজরত আদম ও হজরত হাওয়া সম্ভোগ সুখ আস্বাদন করেছিলেন এবং বেহেশতে নয়, পৃথিবীতেই তাঁরা হয়েছিলেন সন্তান সন্ততির পিতা ও মাতা। কাবিল ও আকলিমা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন পৃথিবীতেই। এর দু'বছর পর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন জোড়া জন্মের হাবিল ও তার বোন। কালাবী।

হজরত আদমের সন্তানেরা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন এক জন্মের পুত্রের সঙ্গে অন্য জন্মের কন্যার বিবাহ দেয়া হলো। তৎকালে আল্লাহ্পাকের বিধান ছিলো হজরত আদমের পুত্রেরা নিজের জোড়া জন্মের বোন ব্যতীত অন্য যে কোনো জোড়ার বোনকে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করলো কাবিল। সে হয়ে উঠলো আল্লাহ্পাকের বিধান বিরোধী। হজরত আদম স্থির করলেন তিনি হাবিলের সঙ্গে কাবিলের জোড়া বোন আকলিমাকে এবং কাবিলের সঙ্গে হাবিলের জোড়া বোন লিমুজাকে বিবাহ দিবেন। হাবিল পিতার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু কাবিল হলো না। তার জোড়া বোন আকলিমা ছিলো পরমাসুন্দরী। তাই সে তার সহজন্মের বোনটিকে ছাড়তে অস্বীকার করলো। বললো, আমরা দু'জন জান্নাতে জন্মগ্রহণ করেছি। হাবিল ও তার জোড়া বোন জন্মগ্রহণ করেছে পৃথিবীতে। হজরত আদম বললেন, তোমার জোড়া বোন তোমার জন্য বৈধ নয়। এটাই আল্লাহ্তায়ালার বিধান। কাবিল বললো, না, এটা আল্লাহ্পাকের বিধান নয়। এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত। হজরত আদম বললেন, ঠিক আছে। তবে তোমরা দু'জনেই কোরবানী করো। যার কোরবানী গৃহীত হবে, সেই লাভ করবে আকলিমাকে। তখন কোরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিলো এই— কোরবানীর বস্তু পাহাড়ে বা প্রান্তরে রেখে দিলে, আকাশ থেকে শাদা আগুন নেমে এসে ভস্মীভূত করে দিতো কোরবানীকে। এটাই ছিলো কোরবানী কবুল হওয়ার প্রমাণ। আগুন নেমে না এলে বুঝা যেতো কোরবানী কবুল করা হয়নি।

একটি পাহাড়ে কোরবানী নিয়ে উপস্থিত হলেন কাবিল ও হাবিল। কৃষিকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতো কাবিল। তাই সে উপস্থিত করলো তার জমির ফসল। মনে মনে ভাবলো, কোরবানী কবুল হোক বা না হোক আমার কোনো পরোয়া নেই। হাবিলের সঙ্গে আকলিমার বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। হাবিলের পেশা ছিলো পশুপালন। তিনি তার পশুপালের মধ্য থেকে একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দুম্বা পেশ করলেন কোরবানী হিসেবে। মনে মনে নিয়ত করলেন—এই কোরবানী কেবল আল্লাহ্পাকের সন্তোষ সাধনার্থে নিবেদিত। হজরত আদম দোয়া করলেন। একটু পরেই আকাশ থেকে নেমে এলো শাদা আগুন। সে আগুনে ভস্মীভূত হলো হাবিলের বিশুদ্ধ নিয়ত সংবলিত কোরবানী। অসৎ উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত কাবিলের কোরবানীতে সে আগুন স্পর্শই করলো না। এ রকম স্পষ্ট নিদর্শন দেখেও কাবিলের জ্ঞানোদয় ঘটলো না। সে রাগে ফুঁসতে লাগলো। তার সব রাগ গিয়ে পড়লো হাবিলের উপর। সিদ্ধান্ত নিলো— যে করেই হোক হাবিলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকলো সে। কাঙ্খিত সুযোগ এসে পড়লো অল্প কিছুদিন পরেই। হজরত আদম হজ সম্পাদনের জন্য পবিত্র মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। পিতাবিহীন হাবিলকে একা পেয়ে তখন কাবিল বললো, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো। হাবিল বললো, কেনো? কাবিল বললো, আল্লাহ্পাক তোমার কোরবানী কুবল করেছেন। তুমি আমার সুন্দরী জোড়া বোনকে বিয়ে করলে লোকে বলবে তুমি আমার চেয়ে উত্তম। আর তোমার সন্তান সন্ততিরাও এ নিয়ে গৌরব বোধ করবে। হাবিল বললেন, এতে আমার অপরাধ কোথায়? আল্লাহ্পাকতো সংযমীদের (মুত্তাকীদের) কোরবানী কবুল করে থাকেন। হাবিলের এই কথার মধ্যে এই উপদেশটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, ইবাদত হতে হবে বিশুদ্ধ সংকল্প সংবলিত। আর যারা মুত্তাকী তারাই অন্তরে বিশুদ্ধ সংকল্প (নিয়ত) ধারণ করতে সক্ষম। বিদ্বেষ কলুষিত হৃদয়ের অধিকারীরা এই বিশুদ্ধতা আস্বাদনে অপারগ। 'ইন্নামা ইয়াতাক্বাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাক্বিন (আল্লাহ্ সংযমীদের কোরবানী কবুল করেন) —আলোচ্য আয়াতের এই শেষ বাক্যটির ব্যাখ্যা রূপে ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জুহাক বলেছেন, এখানে মুক্তাকী অর্থ ওই সকল লোক, যারা শিরিক থেকে মুক্ত।

আমি বলি, কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে—ওই ব্যক্তিরই কোরবানী গৃহীত হবে, যে অধিকতর সত্যাধিষ্ঠিত। যে সত্যাশ্রিত নয় তার কোরবানী গৃহীত হয় না। মুসা বিন আইনের নিকট এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এখানে মুত্তাক্বিন অর্থ ওই সকল লোক, যারা হালালকে আশ্রয় করে হারামের আশংকা থেকে মুক্ত হয়। ইবনে আবীদ্দুনিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, তাকওয়া (সংযম) সংবলিত ক্ষুদ্র আমলও ক্ষুদ্র নয়। যে আমল গৃহীত হয় তাকে কীভাবে ক্ষুদ্র বলা যেতে পারে? ইবনে আবীদ্দুনিয়ার বর্ণনায় আরও রয়েছে, ওমর বিন আবদুল আজিজ এক ব্যক্তিকে লিখলেন, আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের জন্য সদুপদেশ দান করছি। তাকওয়া ছাড়া কোনো আমল গৃহীত হয় না। সেই ব্যক্তির উপরেই রহমত বর্ষিত হয়, যে তাকওয়ার অধিকারী। আর প্রতিদান লাভ হবে কেবল তাকওয়ারই।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি যদি জানতে পারতাম আমার একটি নামাজ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয়েছে, তবে আমি এই সংবাদটিকে পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল বৈভবাপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করতাম। কেননা, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ কেবল তাকওয়ার অধিকারীদের আমলই কবুল করে থাকেন। ইয়াহ্ইয়া থেকে তাঁর পুত্র হিসামের মাধ্যমে ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার এক যাঞ্চাকারী হজরত ইবনে ওমরের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, প্রার্থীকে একটি দিরহাম দাও। হজরত ইবনে ওমরের পুত্র তাই করলেন। তারপর পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভিক্ষুকটি আপনার দিরহাম গ্রহণ করেছে। হজরত ইবনে ওমর বললেন, আমি যদি জানতাম আল্লাহ্পাক আমার একটি সেজদা অথবা আমার এক দিরহাম সদকা কবুল করেছেন, তবে মৃত্যুই হতো আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। হে বৎস! তুমি কি জানো, আল্লাহ্পাক কার আমল কবুল করে থাকেন। তিনি কেবল গ্রহণ করেন তাকওয়া অবলম্বনকারীদের আমল। ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় আরও রয়েছে— হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি যদি জানতাম আমার কোনো একটি আমল আল্লাহ্পাক কবুল করেছেন, তবে এ সংবাদটি আমার নিকট হতো পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণের চেয়ে অধিকতর প্রিয়। মৃত্যুর সময় সন্নিকটবর্তী হলে হজরত আমের বিন আবদুল্লাহ্ কাঁদতে শুরু করলেন। লোকেরা বললো, কাঁদছেন কেনো? আপনি তো অনেক ইবাদত বন্দেগী করেছেন। তিনি বললেন, আমি জানি আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক কেবল মুত্তাকীদের (সাবধানীদের) আমল কবুল করে থাকেন (আমি জানি না আমার আমল তাকওয়ার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে কিনা। আমার রোদন সেই অনিশ্চিতির কারণেই)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২৮

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

❒ 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না; আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি।'

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, কাবিলের চেয়ে হাবিলই ছিলেন অধিক শক্তিশালী। কিন্তু তিনি কেবল আল্লাহ্র ভয়ে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, আমাকে হত্যার জন্য তুমি হস্ত উত্তোলন করলেও, আমি তোমাকে হত্যার জন্য হস্ত উত্থাপন করবো না; আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। হাবিলের এ রকম বলার প্রকৃত কারণ এই যে, ওই সময় প্রতিবাদ ছিলো অসিদ্ধ।

মুজাহিদ বলেছেন, ওই জামানার বিধান ছিলো—হত্যাকারীকে প্রতিহত করা যাবে না। নিজেকে কেবলই ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। এ রকমও হতে পারে যে, হয়তো প্রতিবাদ সিদ্ধ ছিলো, কিন্তু ধৈর্য অবলম্বনই ছিলো শ্রেয়। আর হাবিল শ্রেয়তর পন্থাটিকেই অবলম্বন করেছিলেন।

রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্র জন্য প্রাণপাতকারী হয়ো—হন্তারক হয়ো না। ইবনে সা'দের এই বর্ণনাটি এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ বর্ণিত হাদিস থেকে। আমাদের শরিয়তেও এ রকম আমল সিদ্ধ। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান এ রকম করেছিলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি অবরুদ্ধ ওসমানের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই (যেরূপ নির্দেশ করবেন আমি সেরূপই করবো)। মহান খলিফা বললেন, প্রিয় আবু হোরায়রা! তুমি কি অবরোধকারী সকল মানুষকে হত্যা করতে চাও? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, একজনকে হত্যা করলে সকল মানুষকে হত্যা করা হয়।

আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হাসান বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, হজরত আদমের দুই পুত্রের বর্ণনা এখানে এ কারণে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যেনো ভালো মন্দ বিচার করে কাবিলের মতো মন্দ কর্মের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকো এবং অনুসারী হও হাবিলের মতো উত্তম আমলের।

লক্ষণীয় যে, হাবিল এখানে এ রকম কথা বলেন নি যে, তোমাকে আমি হত্যা করবো না। বলেছেন, তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলবো না। এ কথায় প্রমাণিত হয়েছে, মন্দ কর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক অসন্তোষ। তাই তিনি যে হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে হত্যা সংঘটিত হয়, সেই হস্ত উত্তোলনকেই পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। বলেছেন, হত্যা তো দূরের কথা, হত্যার জন্য হাত পর্যন্ত আমি উত্তোলন করবো না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২৯, ৩০

إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ۝

❒ 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও ইহাই আমি চাহি এবং ইহা জালিমদিগের কর্মফল।'

❒ অতঃপর তাহার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল এবং সে তাহাকে হত্যা করিল; ফলে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

কাবিলকে লক্ষ্য করে হাবিল এখানে বলছেন, ঠিক আছে, তুমি তোমার জিঘাংসা চরিতার্থ করো। আর এভাবে তোমার নিজের ও আমার পাপের ভার আপন স্কন্ধে স্থাপন করো এবং চিরস্থায়ী অগ্নিবাসী হও—এটাই আমার কাম্য। মুজাহিদ থেকে আয়াতের এ রকম অর্থ বর্ণনা করেছেন ইবনে নাজীহ্।

'এটাই জালেমদের কর্মফল'—এ কথার মাধ্যমে কিয়ামত দিবসে অত্যাচারীদের শোচনীয় পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেদিন অত্যাচারীর পুণ্যসমূহ অত্যাচারিতকে দেয়া হবে। যদি তার পুণ্য না থাকে তবে অত্যাচারিতের পাপগুলো চাপিয়ে দেয়া হবে অত্যাচারীর উপর। শেষে অত্যাচারীকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে।

রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি হবে সবচেয়ে গরীব, যে দুনিয়া থেকে নামাজ, রোজা, জাকাত, ইত্যাদির সঙ্গে নিয়ে আসবে অনেক পাপ, যেমন—সে হয়তো কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে দিয়েছে অপবাদ কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করেছে অথবা কাউকে হত্যা করেছে। তখন তার পুণ্যসমূহ দিয়ে দেয়া হবে তাদেরকে, যাদের প্রতি সে জুলুম করেছে। এভাবে তার সকল পুণ্য শেষ হয়ে যাবে। এরপরেও পাপের ক্ষতিপূরণ না হলে অত্যাচারিতের পাপগুলো চাপিয়ে দেয়া হবে তার উপর এবং শেষে তাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। মুসলিম।

একটি সন্দেহঃ বিশ্বাসীদের জন্য এ রকম বৈধ নয় যে, তারা আপন ভ্রাতাকে পাপী হতে বলবে। তাহলে হাবিল কি করে বললেন, আমি চাই তুমি তোমার ও আমার পাপের বোঝা বহন করো।

সন্দেহের অপনোদনঃ হাবিলের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ রকম নয়। তিনি তো কখনোই চাননি যে কাবিল তাকে হত্যা করুক এবং পাপী হয়ে থাক। কিন্তু যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, কাবিল তাকে হত্যা করবেই তখন তিনি হত্যার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে কাবিলকে এভাবে সতর্ক করে দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, এভাবে বললে হয়তো আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে কাবিল পাপ পথ থেকে ফিরে আসবে। পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে, উত্তেজিত কাবিল ভ্রাতৃহত্যার পথেই অগ্রসর হলো। সে তার জিঘাংসা চরিতার্থও করলো। এভাবেই সে হয়ে গেলো ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূত। 'ফা তৃওয়াত লাহু নাফসুহু ক্বতলা আখিহ্' অর্থ অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করলো। এখানে 'লাহু' শব্দটির মাধ্যমে হত্যার উত্তেজনাকে অধিকতর অনড়রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে—হাফিজ্তু লিজায়েদিন মালাহু (আমি জায়েদের মালের সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছি)। কাবিল যখন বুঝলো হাবিল তাকে প্রতিহত করবে না, তখন সে আরো অধিক উত্তোজিত হয়ে পড়লো। সে ভাবলো, হাবিল তো তাকে বরং হত্যার আহবান জানালো। উদ্বুদ্ধ করলো। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, 'তাওয়াত' অর্থ উদ্বুদ্ধকরণ। মানুষ এ রকম উদ্বুদ্ধ হয়েই সাধারণতঃ ঝুঁকিপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করে।

কাবিল হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হলো বটে, কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না—হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হবে কীভাবে। হত্যার ধারণা ইতোপূর্বে তো কেউ কখনো করেনি। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, শয়তান তখন তার রূপ পরিবর্তন করে কাবিলের সামনে একটি পাখিকে ধরে পাথরের উপরে রেখে অন্য একটি পাথর

দিয়ে আঘাত হানলো। এভাবে পাখিটির মস্তক পিষ্ট হলো। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হলো পাখিটির জীবন। কাবিল বুঝলো, এভাবেই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে হয়। সে হাবিলকে ঠিক এভাবেই হত্যা করলো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কাবিলের কথামত হাবিল নিজেই পাথরের উপরে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাবিল একস্থানে নিদ্রিত ছিলেন। তখন কাবিল প্রস্তরাঘাতে তাঁর মস্তক চূর্ণ করে ফেললো।

পৃথিবীতে সংঘটিত হলো প্রথম ভ্রাতৃহত্যা। মৃত্যুকালে হাবিলের বয়স হয়েছিলো বিশ বছর। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কাবিল হাবিলকে কোহে নূর পর্বতের পাদদেশে হত্যা করেছিলো (সম্ভবতঃ পাহাড়টির নাম কোহে সওর— কোহে নূর নয়। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন)। কেউ কেউ বলেছেন, হেরা পর্বতের আশেপাশে নিহত হয়েছিলেন হাবিল। নিহত হওয়ার পর তাঁর পবিত্র মরদেহ খোলা আকাশের নিচে পড়ে রইলো। কাবিল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না, ভাইয়ের লাশ নিয়ে এখন সে কী করবে। ওদিকে মানুষের প্রথম মরদেহ ভক্ষণ করতে এগিয়ে আসতে চাইছে হিংস্র প্রাণীকূল। উপায়ান্তর না দেখে ভাইয়ের লাশ ঘাড়ে নিয়ে কাবিল উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথ চলতে শুরু করলো। এভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ালো সে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, এভাবে কাবিল ঘুরে বেড়ালো এক বছর ধরে। পশু পাখিরা তার অনুসরণ করতে লাগলো। তারা ভাবলো কাবিল সরে গেলেই হাবিলের লাশ ভক্ষণের সুযোগ পাওয়া যাবে। একদিন কাবিল দেখলো তার সামনে দু'টি কাক প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। কাবিলকে শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহ্পাকই কাক দু'টো পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধরত কাক দু'টির একটি অপরটিকে এক সময় হত্যা করে ফেললো। তারপর তার ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো সে। এভাবে গর্ত করে মৃত কাকটিকে সেই গর্তে শুইয়ে দিলো হন্তারক কাকটি। তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিলো তার মরদেহ। নিম্নের আয়াতে এই ঘটনাটির বিবরণ রয়েছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩১

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۝

❑ অতঃপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠাইলেন, যে তাহার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপণ করা যায় ইহা দেখাইবার জন্য মাটি খনন করিতে লাগিল। সে বলিল, 'হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ গোপণ করিতে পারি?' অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল।

আল্লাহ্ প্রেরিত কাকটিকে মাটি খুঁড়তে দেখে বোধোদয় হলো কাবিলের। সে বললো, আমি তো কাকের মতোও (বুদ্ধিমান) নই। 'আরাদাত' শব্দটির অর্থ ইচ্ছা করা হলেও এখানে শব্দটির অর্থ হবে শিক্ষা দেয়া। কাকটি ইঙ্গিতে লাশ দাফন করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছিলো। হাবিলের লাশকে দাফন করে লাশ দাফনের নিয়ম দেখিয়ে দেয়নি। এখানে 'সাওয়াতা' শব্দটির অর্থ কুৎসিৎদর্শন। মৃতদেহ বুঝাতে এখানে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ মৃতদেহ দেখতে অসুন্দর। কাক এখানে কাবিলের পথপ্রদর্শক। ঘটনাটির মাধ্যমে এই কথাটিই ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কাবিল কাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ কাবিল হন্তারক। হন্তারকেরা মানুষ হলেও প্রাণীকূলের চেয়ে নিকৃষ্ট।

কাবিল বুঝলো, সে সত্যিই নিকৃষ্ট। তাই আক্ষেপ করে বললো, হায়! আমি কি তবে এই কাকের মতোও নই। যাতে আমার ভাইয়ের শবদেহ গোপন করতে পারি। এ কথাটি তার একটি বিস্ময়বোধক প্রশ্ন। এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাপবোধ জাগ্রত হলো তার। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।

কেউ কেউ বলেছেন, এক বৎসর ধরে ভাইয়ের লাশ পিঠে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনুতাপ এসেছিলো কাবিলের। কেউ আবার বলেছেন, ভাইয়ের লাশ দাফনের পর সে অনুতাপ জর্জরিত হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হত্যার পর পরই সে অনুতপ্ত হয়েছিলো। অনুতাপ জর্জরিত কাবিল বুঝতে পেরেছিলো আমি পাপী। ভ্রাতৃহন্তারক। আমি পিতা-মাতাকেও অপ্রসন্ন করেছি। হায়! আমার তো আর পাপস্খলনের উপায়ও নেই।

মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ্ বিন হানতাবের বর্ণনায় রয়েছে, কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করলো, তখন পৃথিবী প্রকম্পিত হলো। পৃথিবীর মাটি হলো প্রথম রক্ত রঞ্জিত। পৃথিবী সেই তাজা রক্ত নিঃশেষে পান করে নিলো (মাটিতে রক্তের চিহ্ন আর রইলো না)। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ হলো তোমার ভাই কোথায়? কাবিল উত্তর দিলো, আমি জানি না। পুনঃ আওয়াজ হলো, মাটি তার রক্ত শোষণ করে নিয়েছে। কাবিল বললো, কই, কোথাও তো রক্তের চিহ্ন নেই। এরপর থেকে নিঃশেষে রক্তপানকে আল্লাহ্পাক পৃথিবীর জন্য নিষিদ্ধ করলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, ভ্রাতৃহত্যার পর কাবিলের শরীর হয়ে গেলো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের। হজরত আদম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হাবিল কোথায়? সে বললো, আমি তার সংরক্ষক নই। হজরত আদম বললেন, এ রকম বলছো কেনো? নিশ্চয়ই তুমি তাকে হত্যা করেছো। তাই তোমার শরীর হয়েছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। হজরত আদম কাবিলের প্রতি অপ্রসন্ন হলেন। পুত্রশোকে জর্জরিত হলেন তিনি। এক বৎসরের মধ্যে তিনি আর কখনও হাসেন নি।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে মুকাতিল বিন সুলায়মান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কাবিলের ভ্রাতৃ হত্যার সময় হজরত আদম ছিলেন মক্কায়। হাবিলের শাহাদতের পর কোনো কোনো বৃক্ষ হয়ে পড়লো কণ্টাকীর্ণ। আহার্য বস্তু হয়ে পড়লো স্বাদহীন। ফলবান বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো ফলের সম্ভার। পানির স্বাদ হলো লবণাক্ত। পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ড হয়ে পড়লো বালুকাময়। তাঁর শাহাদতের পূর্বে কোনো বৃক্ষই কণ্টকযুক্ত ছিলো না। কোনো আহার্য বিনষ্ট হতো

না, ফলন্ত বৃক্ষ থেকে ফল ঝরে পড়তো না। পানি ছিলো না লবণাক্ত। মাটি ছিলো না বালুকাময়। এ সকল পরিবর্তন দেখে হজরত আদম আপন মনে বললেন, নিশ্চয়ই পৃথিবীতে কোনো অঘটন ঘটেছে। তিনি হিন্দুস্তান অভিমুখে ফিরে চললেন। গৃহে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন, কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে। পুত্রবিরহে কাতর হয়ে তিনি একটি কবিতা (শোকগাথা) আবৃত্তি করলেন। ওই কবিতাটি পৃথিবীর প্রথম কবিতা। কবিতাটির মর্ম ছিলো এ রকম—পৃথিবীবাসীরা তাদের রূপ পরিবর্তন করেছে। দেখো না— পৃথিবী কেমন ধূসর, অসুন্দর। আহার্য হয়ে পড়েছে স্বাদহীন, পরিবর্তিত হয়েছে নিসর্গের রঙ। সুন্দর যা কিছু তা হয়ে পড়েছে ক্ষণজন্মা। মায়মুনা বিন মোহরানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে বলে হজরত আদম কবিতা রচনা করেছেন, সে মিথ্যুক। মোহাম্মদ স. যেমন কাব্য রচয়িতা ছিলেন না, তেমনি হজরত আদমসহ কোনো নবী রসুল কাব্য রচনা করেননি। তবে তিনি পুত্রবিরহে কাতর হয়ে কিছু শোকবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যার ভাষা ছিলো সুরইয়ানী। পরবর্তী সময়ে তিনি হজরত শীশকে বলেছিলেন, হে প্রিয় বৎস! আমার অসিয়ত শ্রবণ করো। আর আমার এ শোকবাণীকে স্মরণে রেখো। এই শোকবাণী যেনো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচারিত হয়। আর সকলে যেনো এ উচ্চারণের মাধ্যমে হাবিলের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে পারে। এরপর থেকেই ওই শোকবাণী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে। ইয়ারেব বিন কাহাতান ছিলেন সুরইয়ানী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনিই প্রথম আরবী বর্ণমালা লিপিবদ্ধ করেন। প্রখ্যাত কবি ছিলেন তিনি। হজরত আদমের শোকবাণীকে কিঞ্চিত রূপান্তরের মাধ্যমে তিনিই কাব্যরূপ দিয়েছেন। সেই কাব্যরূপের দু'টি পংক্তির মর্ম এ রকম—

'কী কারণে আমি তার জন্য অশ্রুপাত করতে কার্পণ্য করবো? প্রিয় হাবিল এখন মৃত্তিকার অন্তরালে। আমিতো সারা জীবন ধরে তার বিচ্ছেদকাতরতাকেই মনে করবো আমার সন্তাপ ও সান্ত্বনা।

হাবিলের শাহাদাতের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলো। হজরত আদমের বয়স তখন একশত তিরিশ। তিনি পুনরায় এক পবিত্র পুত্র সন্তানের পিতা হলেন। মাতা হাওয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন হজরত শীশ। তিনি হাবিলের স্থলাভিষিক্ত হলেন বলে তাঁর অপর নাম হেবাতুল্লাহ্। আল্লাহ্পাক তাঁকে রাত ও দিনের সময় পরিমাপের জ্ঞান দান করলেন। ঘণ্টার হিসেব ধরে তিনি আল্লাহ্পাকের ইবাদত করতে শুরু করলেন। আল্লাহ্পাক তাঁর উপর পঞ্চাশটি সহিফা অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন হজরত আদম পরবর্তী নবী।

কাবিলের উপর নেমে এলো অভিশাপ। তাকে বলে দেয়া হলো— যাও! বিভ্রান্তের মতো যত্রতত্র বিচরণ করো। কোথাও তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে না। কাবিল তখন তার সহজন্মের বোনকে নিয়ে ইয়ামেনের এডেন নামক অঞ্চলে চলে গেলেন। সেখানে ইবলিস তার সুহৃদ সেজে তাকে বললো, হাবিল ছিলো অগ্নিউপাসক। তাই আগুন সদয় হয়ে আকাশ থেকে নেমে এসে তার কোরবানীকে ভস্মীভূত করে ফেলেছিলো। তুমিও অগ্নিপূজার প্রচলন করো। তাহলে আগুনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তোমার এবং তোমার বংশধরের একচ্ছত্র অধিকার।

ইবলিসের পরামর্শকে সৎ পরামর্শ হিসেবে গ্রহণ করলো কাবিল। অচিরেই অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে সর্বপ্রথম সে উপাসনা করলো আগুনের। তার সন্তানেরা তৈরী করলো বিভিন্ন খেলাধুলার উপকরণ ও সঙ্গীতযন্ত্র। যেমন— মুরলী, বাঁশী, ঢোল, তানপুরা ইত্যাদি। তারা সকলে খেলাধুলা, মদ্যপান, ব্যভিচার, অগ্নিউপাসনা— এসবের মধ্যেই ডুবে গেলো। পরবর্তী সময়ে হজরত নূহের মহাপ্লাবনের মাধ্যমে কাবিলের সকল বংশধরকে সলিল সমাধি দেয়া হয়েছিলো। প্লাবনপরবর্তী পৃথিবীতে রয়ে গিয়েছিলো কেবল হজরত শীশের বংশধরেরা।

হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর পাপের একাংশ হজরত আদমের প্রথম পুত্র কাবিলের স্কন্ধে আপতিত হয়। কারণ, কাবিলই প্রথম হন্তারক। বোখারী।

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ঈমানে হজরত ইবনে ওমর থেকে লিখেছেন, দোজখ থেকে শাস্তির অর্ধাংশ ভোগ করবে হজরত আদমের জ্যেষ্ঠ সন্তান কাবিল (সকল দোজখীর অর্ধেক আযাব ভোগ করবে সে)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আসাকের লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় এক বৎসর অতিবাহিত করবে, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্পাকের সম্মুখে কাবিলের পাপের বোঝা বহন করবে। দোজখে প্রবেশ করার আগে সে আর কাবিল থেকে পৃথক হতে পারবে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সে হবে কাবিলের সাথী। কিন্তু দোজখে তার অবস্থান হবে কাবিলের অবস্থান থেকে পৃথক। কারণ, কাবিলের শাস্তি হবে সুকঠিন ও সুদীর্ঘ।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩২

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝

❒ এই কারণেই বনি ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল, আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। তাহাদের নিকট তো আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রহিয়া গেল।

নরহত্যা এবং ধ্বংসাত্মক কার্য — এই দুই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো কারণে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে— তবে সে হবে দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যাকারীর মতো। আর কেউ যদি কারো প্রাণ রক্ষা করে তবে সে হবে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণরক্ষাকারীর মতো। বনী ইসরাইলের প্রতি এই বিধানটি আল্লাহ্পাক এখানে জানিয়ে দিয়েছেন। কেবল বনী ইসরাইলদেরকে লক্ষ্য করে বলা হলেও বিধানটি কিন্তু চিরন্তন। পূর্বাপর সকল উম্মতের জন্য বিধানটি অবশ্য পালনীয়। হত্যা করা যাবে কেবল ওই ব্যক্তিকে যে নরহত্যা করেছে, লুণ্ঠন করেছে এবং বিবাহিত জীবনে ব্যভিচার করেছে। ধ্বংসাত্মক কার্য বলতে এখানে অবশ্য বুঝানো হয়েছে কাফেরদের সৃষ্ট বিভিন্ন অশান্তি ও বিশৃংখলাকে।

বাগবী লিখেছেন, বিভিন্নজন বিভিন্নরূপে এই আয়াতটির অর্থ করেছেন। ইকরামার বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি নবী অথবা তার খলিফার যুগে নরহত্যা করে, সে যেনো সকল মানুষকেই হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি নবী অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে সাহায্য করে, সে যেনো রক্ষা করে সকল মানুষের জীবন। মুজাহিদ বলেছেন, অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যাকারী ব্যক্তি এমনভাবে দোজখে প্রবেশ করবে, যেমনভাবে দোজখে প্রবেশ করে সকল মানুষের হত্যাকারী। আর যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করা থেকে রক্ষা করে, সে যেনো সকল মানুষকে হত্যা থেকে রক্ষা করে। হজরত কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাক এই আয়াতে একজন মানুষকে হত্যা করার পাপ যে কতো ভয়াবহ এবং হত্যা না করার মর্যাদা যে কতো অধিক তা প্রকাশ করেছেন। আয়াতের মূল বক্তব্য এই যে, যদি কেউ একজন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে হালাল মনে করে, তবে সে সকল মানুষকে হত্যাকারীর মতো গোনাহ্গার হবে।

'আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেনো দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো'—এ কথার অর্থ, যে ব্যক্তি কোনো একজনকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে অথবা কাউকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করবে। যেমন, অন্যায়ভাবে নরহত্যা থেকে কাউকে বিরত রাখবে কিংবা অগ্নিকাণ্ড থেকে, দেয়াল চাপা পড়া থেকে কাউকে বাঁচাবে, সে হবে সকল মানুষের জীবন রক্ষাকারীর মতো মহাপুণ্যের অধিকারী। হাসান বলেছেন, একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তার উপর ওইরূপ কিসাস ওয়াজিব হবে যেমন কিসাস ওয়াজিব হয় সকল মানুষকে হত্যা করলে। আর কেউ যদি কিসাস ওয়াজিব হয়েছে— এ রকম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়, কিসাস (খুনের বদলা) না নেয় তবে সে যেনো সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো।

উপরোক্ত বিবরণগুলোর মূল মর্ম এই যে, জীবন সংহার কতো ভয়াবহ এবং জীবন রক্ষা কতো মর্যাদামণ্ডিত তা সকলে জেনে নাও এবং সৃষ্টির জীবন রক্ষার ব্যাপারে সদাসচেষ্ট হও।

জ্ঞাতব্যঃ আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতটি সুরা নিসার ওই আয়াতের মতো— যেখানে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোনো বিশ্বাসীকে ইচ্ছাপূর্বক বধ করবে, তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম, তার অগ্নিবাস হবে চিরস্থায়ী। তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। জাহান্নামের ভয়ংকর আযাবের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাদেরই জন্য— —অর্থাৎ সকল মানুষকে হত্যা করলে যে আযাব হবে, একজনকে হত্যা করলেও সে রকম আযাবই ভোগ করতে হবে।

হজরত বারা বিন আজিবের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবী ধ্বংস করাও একজন মানুষকে হত্যা করার চেয়ে আল্লাহ্‌পাকের নিকট কম অন্যায়। হাসান সূত্রে এই বর্ণনাটি এনেছেন ইবনে মাজা। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী একযোগে একজন মুমিনের হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্‌পাক তাদের সকলকে দোজখে প্রবেশ করাবেন। বায়হাকীর অন্য একটি বর্ণনায় 'হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে'— এর স্থলে 'অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করে' কথাটি এসেছে। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাজার হাদিসের অনুরূপ। হজরত বোরায়দা থেকে নাসাঈ লিখেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট ইমানদারের হত্যা সারা পৃথিবী ধ্বংস করার চেয়েও বড় অপরাধ।

ইবনে মাজা লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, আমি একবার দেখলাম রসুল স. কাবা শরীফ তাওয়াফ করছেন এবং বলছেন, হে কাবা! তুমি কত পবিত্র, কত সুবাসিত। তোমার সম্মান কতো উচ্চ, মর্যাদা কতো সীমাহীন। কিন্তু আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ করে আমি বলি, মুমিনের সম্পদ, রক্ত ও মর্যাদা তোমার মর্যাদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সোলায়মান বিন আলী বলেছেন, আমি হাসান বসরীকে এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেছিলাম, হে আবু সাঈদ, এই আয়াতটি কি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য না কেবল বনী ইসরাইলদের জন্য? তিনি বললেন, নিশ্চয় আমাদের জন্যও। কসম ওই অবিভাজ্য সত্তার, আল্লাহ্‌পাকের নিকট আমাদের রক্ত অপেক্ষা বনী ইসরাইলের রক্ত অধিক সম্মানার্হ নয়।

'তাদের নিকট তো আমার রসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিলো, এর পরেও তাদের অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেলো।'—এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, বনী ইসরাইলেরা আমার প্রেরিত পুরুষদেরকে দেখেছে। তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণ (মোজেজা)। এতদসত্ত্বেও তাদের অনেকে সীমালংঘনের উপরে অনড় রইলো। সীমালংঘন বুঝাতে এখানে 'ইসরাফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দসহযোগে শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রয়ে গেলো' (ফিল আরদ্বি লা মুসরিফুন)।

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

❐ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে তাহাদের শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অর্থ আল্লাহ্র বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথই নিরাপত্তার পথ। যাঁরা রসুলের স্থলাভিষিক্ত অথবা পুণ্যবান প্রশাসক—তাঁরাই রসুলের প্রতিনিধি। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করাও আল্লাহ্পাকের বিরুদ্ধাচরণ সমতুল্য। এখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ। আল্লাহ্পাকের হুকুমেই মানুষের জীবন ও সম্পদকে সম্মানার্হ করে দেয়া হয়েছে। তাই মানুষের জীবন এবং সম্পদ লুণ্ঠন হারাম। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে যুদ্ধ অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, রাহাজানি। কামুস অভিধানে রয়েছে, এখানে যুদ্ধের আসল অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন। বায়যাবীর বক্তব্যানুযায়ী এখানে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা বলা না হলেও কামুস গ্রন্থের ভাষ্যানুসারে সকল প্রকার বিরুদ্ধাচরণকেই এখানে যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

'দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে'—এ কথার অর্থ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। বিশৃঙ্খলা বুঝাতে এখানে 'ফাসাদান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ বর্ণনা রয়েছে। যায়েদ বিন আবী হাবিবের মাধ্যমে ইবনে জারীর লিখেছেন, আবদুল মালেক বিন মারওয়ানকে আরীজা নামক স্থানে হজরত আনাসের নিকট প্রেরণ করা হলো। তিনি হজরত আনাসের নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হজরত আনাস তখন লিখিতভাবে জানালেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উরায়নার অধিবাসীদের সম্পর্কে। তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে রসুল স. এর রাখালদেরকে হত্যা করেছিলো এবং তাদের উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। হজরত জারীর থেকে ইবনে জারীর এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদুর

রাজ্জাক এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে বাগবীও এ রকম বলেছেন। বোখারী প্রমুখ হজরত আনাস থেকে লিখেছেন, উকাল গোত্রের কিছু লোক রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে গেলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিলো না। তাই রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তোমরা মদীনার বাইরে যেখানে সদকার উট রাখা হয়েছে, সেখানে গিয়ে থাকো এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করো। তারা নির্দেশ পালন করলো এবং সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপর হঠাৎ একদিন তারা ধর্মত্যাগী হয়ে রাখালদেরকে হত্যা করে তাদের উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেলো। রসুল স. তাদেরকে ধরে আনবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দল পাঠালেন। তারা ধর্মত্যাগীদেরকে বন্দী করে নিয়ে এলো। রসুল স. তাদের হাত পা কেটে দিলেন এবং সুরমাদণ্ড তপ্ত করে তাদের চোখ অন্ধ করে দিলেন। তারা চিৎকার করে পানি প্রার্থনা করলো। কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হলো না। এ অবস্থাতেই তারা মৃত্যুবরণ করলো। আবু কালাবা বলেছেন, তারা যুদ্ধ করেছিলো, সম্পদও লুট করেছিলো। পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিলো বিশৃঙ্খলা। তাদের এই অপকর্মকেই এই আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ খারাবেতী তাঁর মাকারিমুল আখলাক্ব গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রসুল স. এর নিকটে এসে মুসলমান হয়ে গেলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের সহ্য হচ্ছিলো না। তাদের হাত পা শুকিয়ে যেতে লাগলো। চেহারা হয়ে গেলো হলদে এবং দেখা দিলো উদরস্ফীতি। রসুল স. তাদেরকে সদকার উটের পালের সঙ্গে চারণভূমিতে থাকতে বললেন এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা নির্দেশ প্রতিপালন করলো। এভাবে রোগমুক্ত হয়ে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলো তারা। তারপর হঠাৎ একদিন রসুল স. এর রাখালদেরকে হত্যা করে উটের পাল নিয়ে পলায়ন করলো এবং মোরতাদ হয়ে গেলো। হজরত জিবরাইল রসুল স.কে এ কথা জানালেন এবং পরামর্শ দিলেন— তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য লোক পাঠিয়ে দিন। রসুল স. তৎক্ষণাৎ কয়েকজনকে নির্দেশ দিলেন যাও, ধর্মত্যাগীদেরকে বন্দী করে আনো। হজরত জিবরাইল বললেন, এই দোয়া পাঠ করুন— হে আল্লাহ্, আকাশ তোমারই আকাশ এবং পৃথিবী তোমারই পৃথিবী। আর পূর্ব পশ্চিম সকল দিক তোমারই। হে আল্লাহ্, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দাও, তাদেরকে এনে দাও আমার আওতায়। রসুল স. দোয়াটি পাঠ করলেন। পলায়নপর ধর্মত্যাগীরা ধরা পড়ে গেলো। পশ্চাতে প্রেরিত বাহিনী তাদেরকে বন্দী করে আনলেন রসুল স. এর দরবারে। তখন অবতীর্ণ হলো 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে.....।' হজরত জিবরাইল রসুল স.কে বললেন, এদের মধ্যে যে লোক হত্যা ও লুণ্ঠন করেছে তাকে শুলে চড়িয়ে দিন। যে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করুন। আর যে কেবল সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তার হাত পা কেটে দিন—একদিকের হাত-পা নয়, একটি ডানদিকের ও অপরটি বাম দিকের।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যদি কারো ক্রীতদাস পলায়ন করে অথবা পশু কিংবা মানুষ হারিয়ে যায়, তবে সে যেনো এই দোয়াটি পাঠ করে এবং কোনো কিছুতে দোয়াটি লিখে পাক পবিত্র স্থানে পুঁতে রাখে। এ রকম করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক পালিয়ে যাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া মানুষ কিংবা পশু তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

উরায়না গোত্রের লোকদের শাস্তি সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের মধ্যে বর্ণিত শাস্তি রহিত হয়ে গিয়েছে। শাস্তিস্বরূপ কারো নাক কান কেটে ফেলা জায়েয নয়। কেউ কেউ বলেছেন, চক্ষু অন্ধ করে দেয়া এবং নাক কান কাটা জায়েয না হলেও অন্য শাস্তিগুলো এখনও কার্যকর। কিন্তু এ কথা ওই সময়ে কার্যকর হবে, যখন বিচারক বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে আয়াতের নির্দেশের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হবেন। হজরত কাতাদা লিখেছেন, এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তি শরিয়তের শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আগের। আবু জিনাদ বলেছেন, রসুল স. এই আয়াতের নির্দেশানুযায়ী শাস্তি কার্যকর করেছেন এবং 'মুসলা' (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন) নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর থেকে আর কখনও কারো মুসলা করা হয়নি। হজরত কাতাদা বলেছেন, আমরা সংবাদ পেয়েছি, এর পর থেকে রসুল স. সদকার জন্য উৎসাহ দান করতে লাগলেন এবং মুসলা করতে নিষেধ করলেন। হজরত আনাস থেকে সুলায়মান তাইমী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ওই ধর্মত্যাগীদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন এ কারণে যে, তারা রাখালদেরকে হত্যার পূর্বে তাদের চোখ উপড়ে ফেলেছিলো। লাইস বিন সা'দ বলেছেন, এই আয়াতের নির্দেশানুযায়ী রসুল স. শাস্তি কার্যকর করেছিলেন। এটা ছিলো অপরের জন্য শিক্ষা। শিক্ষাটি এ রকম— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য— করে তাদেরকে এভাবে শাস্তি দিতে হবে; কিন্তু মুসলা করা যাবে না।

জুহাক বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিতাবীদের একটি গোত্র সম্পর্কে। তারা রসুল স. এর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলো। তারপর সন্ধি ভঙ্গ করে তারা পৃথিবীতে শুরু করেছিলো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড।

কালাবী লিখেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, বেলাল বিন উয়াইমির গোত্র সম্পর্কে। ওই গোত্রের আবু বারাজা আসলামীর সঙ্গে রসুল স. এর এই মর্মে সন্ধি ছিলো যে, তারা রসুল পাক স.কে যেমন সাহায্য করবে না, তেমনি সাহায্য করবে না তাঁর শত্রুদেরকেও। আর ওই গোত্রের কোনো লোক যদি রসুল স. এর নিকটে আসে, তবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদেরকে আক্রমণ করা হবে না, প্রতিশোধও গ্রহণ করা হবে না। একবার কেনানা গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের মানসে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করলো। পথিমধ্যে তাদের সাক্ষাৎ ঘটলো আসলামী উপগোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে। উপগোত্রটি ছিলো হেলাল বিন উয়াইমির গোত্রভূত। হেলাল তখন ছিলো অনুপস্থিত। সেই সুযোগে বনী আসলামের লোকেরা মদীনাযাত্রী কেনানীদের উপর আক্রমণ করে বসলো। সম্পদ লুণ্ঠন করলো এবং তাদেরকে হত্যা করে ফেললো। এ সংবাদসহ আয়াতটি নিয়ে হজরত জিবরাইল উপস্থিত হলেন রসুল স. এর দরবারে।

দ্রষ্টব্যঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াতের মুহারিবিন এবং মুফসিদিন অর্থ রাহাজানি ও ডাকাতি। মুসলমান অথবা জিম্মী (কাফের) সকলেই এই বিধানের অন্তর্ভূত। এ অভিমতটিও ঐকমত্যসম্মত— কেউ যদি শহরের বাইরে গিয়ে কাউকে ভয় দেখানোর জন্য অস্ত্র উত্তোলন করে তবে সে হবে মুহারীব (আল্লাহ্ ও তার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী)। তার উপর এই আয়াতের বিধান কার্যকর করা যাবে।

শহরের অভ্যন্তরে অথবা হেরা ও কুফা— এই দু'টি জনপদের মধ্যবর্তী স্থানে কেউ যদি রাতে অথবা দিনে লুটতরাজ চালায় তবে তার শাস্তি কী হবে— সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন— এ ধরনের রাহাজানিও মুহারিব পদবাচ্য। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, লুণ্ঠনকারীর উপর এই বিধান প্রযোজ্য হবে তখন, যখন লুণ্ঠনকর্ম সংঘটিত হবে শহর থেকে দূরবর্তী এমনস্থানে যেখানে কোনো সাহায্যকারীর উপস্থিতি সম্ভব নয়। বাগবী লিখেছেন, শহরের অভ্যন্তরে লুণ্ঠনকারীর উপরও এই আয়াতের বিধান প্রয়োগ করা যাবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওজায়ী এবং লাইস বিন সা'দও এ রকম বলেছেন। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মাজহাবেও এই অভিমতটি গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর ওয়াজিজুল মাসায়েল গ্রন্থে রয়েছে— যে ব্যক্তি শহরের মধ্যে জোর পূর্বক কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিবে, সে অবশ্যই লুণ্ঠনকারী। ইমাম মোহাম্মদের ছয়টি গ্রন্থের কোনো একটিতে রয়েছে— ইমামে আজম বলেছেন, শহর ও লুণ্ঠনস্থানের দূরত্ব হতে হবে সফরের দূরত্বের সমপরিমাণ। এ রকম দূরবর্তী স্থানে যে রাহাজানি করবে, তাকে শাস্তিদান করা ওয়াজিব। কারণ, সেখানে কোনো সাহায্যকারী পৌঁছুতে পারে না। বনেজঙ্গলে লুট পাট কারীরা অধিকতর অপরাধী। এ সম্পর্কে ইমাম মালেকের দু'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, জনবসতি থেকে এক মাইল দূরত্বের লুণ্ঠনকর্মের কথা। অপরটিতে বলা হয়েছে তিন মাইল। আরো বলা হয়েছে, লুণ্ঠনের সময় আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো প্রকার সাহায্য পাবার সম্ভাবনা যেখানে না থাকে।

ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল এই মাসআলা প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ হাম্বলীগণের অভিমত এই—রাহাজানির স্থান হতে হবে এমন স্থানে, যেখানে কোনো প্রকার সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই। ইমাম আবু ইউসুফের এক বর্ণনায় এসেছে—নগরাভ্যন্তরে দিবাভাগে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে, তা হবে লুণ্ঠনকর্ম। আর কাষ্ঠ খণ্ড, পাথর ইত্যাদি দ্বারা আক্রমণ করলে তাকে রাহাজানি বলা যাবে না। তবে এভাবে রাতে আক্রমণ করলে তা হবে রাহাজানি। কেননা দিনে সাহায্যকারী পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সাহায্যকারী পৌঁছার পূর্বে লুণ্ঠনকারীরা তাদের কার্যসিদ্ধ করে ফেলতে পারে। তাই দিবসের সশস্ত্র আক্রমণ লুটতরাজ হিসেবে গণ্য। রাতের অবস্থা অন্য রকম। তখন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আক্রমণকারীরা তাদের কার্যসিদ্ধ করতে পারে। কারণ, রাতের সাহায্য সুলভ্য

নয়। তাই রাতের আক্রমণ সশস্ত্র না হলেও তা লুণ্ঠনকর্ম হিসেবে গণ্য। তাহাবী ব্যাখ্যাতা বলেছেন, ফতোয়া দান করতে হবে ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্যানুসারে। হেদায়া রচয়িতা বলেছেন, ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য কিয়াসের অনুরূপ। কেননা, জোরপূর্বক সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকেই রাহাজানি, লুণ্ঠন বা লুটতরাজ বলে (যদিও তা নগরমধ্যে সংঘটিত হয়)। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অভিমতটি বিবেচনা সুলভ। কারণ, তিনি বিবেচনায় এনেছেন— সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে। নগরে অথবা নগরের সন্নিকটে সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। তাই তিনি নগর থেকে দূরবর্তী স্থানকে নগরের সমান্তরাল করেননি। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তির বিধান রাহাজানির পারিভাষিক অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা। শহরের মানুষ থাকে সংঘবদ্ধ ও সুসজ্জিত। সুতরাং অতর্কিত আক্রমণ সাধারণতঃ নগর সীমানার বাইরেই সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এই বাইরের স্থানটি সফরের (তিন দিনের) দূরত্বে হওয়াও জরুরী নয়। কোরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বের কথা বলা হয়নি। উরায়নাবাসীরা যে উটের বাথানে হত্যা ও লুণ্ঠন করেছিলো, তা ছিলো মদীনার নিকটেই, তিন দিনের দূরত্বে নয়।

মাসআলাঃ লুণ্ঠনকারী বা ডাকাত একজন হোক বা একাধিক—তাদেরকে শক্তিশালী হতেই হবে। শক্তি হতে হবে এ রকম— তারা যাত্রীদলের পিছন থেকে আক্রমণ করে লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে পলায়ন করতে যেনো সক্ষম হয়। আর যদি আক্রমণকারীর শক্তিমত্তা প্রদর্শনার্থে যাত্রীদের কিছুসংখ্যক লোকের উপর হামলা করে, তবে ব্যাপারটিকে তখন রাহাজানি বলা যাবে না। রাহাজানির অর্থ লুণ্ঠন। শুধুই আক্রমণ নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। আয়াতেও এ কথা বলা হয়েছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা না থাকলে ধ্বংসাত্মক কর্মসম্পাদন করা সম্ভবই নয়।

'তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।'— এখানে চার প্রকার শাস্তির বিবরণ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, বিদ্রোহী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে এই চার প্রকার শাস্তির যে কোনো একটি শাস্তি দেয়া যাবে। বিষয়টি বিজ্ঞ ইমামের সিদ্ধান্তাধীন। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এ রকমই। এখানে 'আও' শব্দটির মাধ্যমে আল্লাহ্পাক বিচারকদেরকে শাস্তি নির্বাচনের অধিকার দিয়েছেন। তাঁরা এই চার প্রকার শাস্তির মধ্যে যে শাস্তিটিকে উপযুক্ত মনে করবেন, তা কার্যকর করতে পারবেন। এ রকম বলেছেন সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, আতা, দাউদ, হাসান বসরী, জুহাক, নাখয়ী, মুজাহিদ এবং আবু সওর। ইমাম মালেক বলেছেন, বিচারক বা প্রশাসক ইজতেহাদের (গভীর বিশ্লেষণের) মাধ্যমে শাস্তি নির্বাচন করবেন। বিদ্রোহী যদি শক্তিশালী ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ হয়, তবে তাকে হত্যা করে ফেলবে। যদি রাজনীতিই তার বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে তাকে করতে হবে ক্রুশবিদ্ধ। সে যদি বলশালী না হয় এবং ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার মনোবৃত্তি তার না থাকে, তবে

তার হাত ও পা কেটে দিতে হবে (কাটতে হবে ডান হাত ও বাম পা)। নির্বাসন সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেছেন, বিদ্রোহী যদি যুদ্ধংদেহী না হয়, তবে তাকে দেশান্তর করতে হবে। দেশান্তরী অবস্থাতেও তাকে বন্দী করে রাখতে হবে। সেখানেও তাকে মুক্ত রাখা যাবে না। মোহাম্মদ বিন জোবায়েরও এ রকম বলেছেন। ইমাম মালেকের নিকট আরেকটি শর্ত এই যে, লুণ্ঠিত সামগ্রী নেসাব পরিমাণ হতে হবে। তবে লুণ্ঠনকারীদের বণ্টিত অংশ নেসাব পরিমাণ হওয়া জরুরী নয়। ইমামে আজম, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আওজায়ীর মতে আয়াতের উল্লেখিত 'আও' শব্দটি লুণ্ঠনকারীদের বিভিন্ন অবস্থাকে প্রকাশ করেছে (অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে তাদের জন্য শাস্তি নির্বাচন করা হয়েছে)। যদি ডাকাতেরা ভয় দেখায়, হুমকি দেয়, সম্পদ না নেয়, হত্যাকাণ্ড না ঘটায়— তবে তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিতে হবে। এ বহিষ্কার করার অর্থ তাদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে— যতোক্ষণ না তারা তওবা করে। এই শাস্তি আরোপিত হলে তার মন্দ প্রভাব থেকে দেশের সমগ্র ভূখণ্ড মুক্ত হয়ে যাবে।

মাকহুলের বর্ণনায় এসেছে, সর্ব প্রথম হজরত ওমর একদল ডাকাতকে জেলখানায় বন্দী করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে ওই সময় পর্যন্ত বন্দী করে রাখবো, যতোক্ষণ না তোমরা তওবা করো। তোমাদেরকে অন্য কোনো শহরেও আমি পাঠাবো না। এ রকম করলে তোমরা অন্য শহরের বাসিন্দাদেরকেও কষ্ট দেবে। মোহাম্মদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এক বস্তির ডাকাতকে অন্য বস্তির জেলখানায় বন্দী করে রাখতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে একই সঙ্গে প্রকৃত ও রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হয়। তাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, বিচারক সময় বেঁধে দিয়ে বন্দীকে বিভিন্ন বস্তির জেলখানায় ক্রমাগত স্থানান্তরের নির্দেশ দিবে, যেনো সে কোথাও স্থায়ী হতে না পারে।

ভয় দেখিয়ে মুসলমান অথবা জিম্মির (জিজিয়া পরিশোধকারী কাফেরের) সম্পদ ছিনতাই করলে এবং হত্যাকাণ্ড না ঘটালে যদি দেখা যায় লুণ্ঠিত দ্রব্য বণ্টনের পর প্রত্যেক ডাকাতের অংশে লুণ্ঠনের নেসাব পরিমাণ সামগ্রী রয়েছে, তবে ডাকাতদের হাত পা কেটে দেয়া যাবে (ইমাম আজমের মতে লুণ্ঠনের নেসাব দশ দিরহাম। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে এক চর্তুথাংশ দিনার অথবা তিন দিরহাম)। যদি ডাকাতেরা সম্পদ লুণ্ঠন না করে কেবল হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ক্ষমা করে দিলেও ওই ডাকাতকে হত্যা করতে হবে। এটাই শরিয়তের বিধান।

যদি একজন সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটায়— তার দলের অন্য কেউ যদি তার কাজে অংশ গ্রহণ না করে তবুও সকলকে শরিয়তসম্মত শাস্তি দিতে হবে। ইমামে আজম এ রকম বলেছেন। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের বক্তব্যও অনুরূপ। হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারী ডাকাতের সঙ্গীরাও সমঅপরাধী। কারণ তারা, সকলেই এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্যধারী। তাই তাদের সকলকে একে একে শাস্তি দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অপরাধীর সহযোগীদেরকে কেবল বন্দী করে দেশান্তর করতে হবে।

যদি ডাকাতেরা একই সঙ্গে হত্যা ও লুণ্ঠন করে— তবে ইমামে আজম ও ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত হচ্ছে, এক্ষেত্রে হাকিম তার যথেচ্ছ অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। প্রথমে হাত পা কর্তন, তারপর হত্যা, তারপর ক্রুশবিদ্ধ করা অথবা শুধু হত্যা কিংবা শুধু ক্রুশবিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, এক্ষেত্রে অঙ্গপ্রতঙ্গ কর্তন করা যাবে না। শুধু হত্যা করবে এবং শূলদণ্ড দিবে। আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য এ রকমই। আয়াতে একটি শাস্তির সঙ্গে অপর শাস্তি যুক্ত হয়েছে 'অথবা' শব্দের মাধ্যমে। সুতরাং একই অপরাধের দু'রকম শাস্তি দেয়া যায় না। হত্যাকাণ্ড একটি বৃহৎ অপরাধ। সুতরাং বৃহৎ অপরাধের শাস্তির মধ্যেই ক্ষুদ্র অপরাধের শাস্তি অন্তর্ভূত রয়েছে বুঝতে হবে। যেমন চুরির শাস্তি হস্তকর্তন এবং ব্যভিচারের শাস্তি রজম। এ দু'টো অপরাধ একত্রিত হলে— সঙ্গেসারের (প্রস্তর নিক্ষেপের) মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে কেবল রজম। চুরির শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন তখন আর থাকবে না।

ইমামে আজমের বক্তব্যের ব্যাখ্যা এ রকম— অপরাধ কঠিন হলে শাস্তিও হবে কঠিন। কারণ, হত্যা ও ছিনতাই দু'টো অপরাধই গুরুতর। তাই এ দু'টো অপরাধে অপরাধীদেরকে দিতে হবে কঠিন শাস্তি। বড় ধরনের চুরি বা ছিনতাইয়ের শাস্তি হাত ও পা কর্তন মূলত একটিই শাস্তি। আর ছোট ধরনের চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটা একটি শাস্তি এবং পা কাটা আরেকটি শাস্তি। অপরাধ যদি এক ধরনের হয় তবে শাস্তিও হবে একধরনের। একধরনের শাস্তির মধ্যে অন্য ধরনের শাস্তি প্রবিষ্ট হতে পারে না।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধীকে হত্যা, ক্রুশবিদ্ধ— দু'টোই করতে হবে। কেননা, কোরআনে দু'টো শাস্তির কথাই বলা হয়েছে। এ রকম গুরুত্ব সহকারে শাস্তি দেয়া হলে মানুষ সদুপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ইমামে আজম বলেছেন, আসল শাস্তি তো হত্যা। এর পরে শূলদণ্ড দেয়া হলে শাস্তির গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যাবে, ফলে জনগণেরা নসিহত লাভের সুযোগ পাবে অধিক। সুতরাং বিষয়টি হবে বিচারকের ইচ্ছাধীন (তিনি হত্যার নির্দেশ দিবেন অথবা শূলিতে চড়াবেন)। ইমাম শাফেয়ী আরও বলেছেন, শূলিতে চড়াতে হবে হত্যা করার পর। আর একটি বর্ণনায় তাঁর অভিমত এসেছে এ রকম— অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় শূলদণ্ড দিতে হবে। তারপর তীর ও বল্লমের আঘাতে তাকে মেরে ফেলতে হবে।

ইমামে আজমের বক্তব্যও দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর একটি অভিমতকে গ্রহণ করেছেন তাহাবী— যেখানে বলা হয়েছে মুসলা (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন) করা যাবে না। তাঁর দ্বিতীয় অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন কারখী। এই অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কেননা, এতে রয়েছে হত্যা অথবা শূলিতে চড়ানোর কথা। আর 'আও' (অথবা) শব্দটি দু'টো শাস্তির একত্র হওয়ার অন্তরায়।

ইমামে আজম বলেছেন, লাশ ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তিন দিনের অধিক রাখা যাবে না। তিন দিনের বেশী রাখলে লাশ পঁচতে শুরু করবে এবং মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, লাশ আপনাআপনি পঁচে গলে না পড়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্রুশবিদ্ধ অবস্থাতেই রাখতে হবে— যাতে করে জনসাধারণ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। আমরা বলি, সর্ব সমক্ষে ক্রুশবিদ্ধ করলেই নসিহতের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা দীর্ঘায়িত করার কোনো কারণ নেই।

জমহুর আলেম আয়াতের তাফসীর গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ডাকাত সর্দারেরা যদি হত্যা ও লুণ্ঠন দু'টোই করে, তবে তাদেরকে হত্যা ও শূলদণ্ড দু'টোই দেবে। শুধু হত্যা করলে তাদেরকে কেবল হত্যা করবে, শূলে চড়াবে না। আর হত্যা না করে কেবল মাল লুট করলে তার যেকোনো একটি হাত ও একটি পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবে। আর পথচারীকে শুধু ভয় দেখালে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

মোহাম্মদ বিন সা'দ আউফির নিয়মে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিদ্রোহীরা যদি যুদ্ধ করে ও হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তবে তাদেরকে বন্দী করে হত্যা করতে হবে। তারা যদি এর সঙ্গে সম্পদ লুণ্ঠনও করে, তবে তাদেরকে শূলিতেও চড়াতে হবে। হত্যা না করে শুধু লুণ্ঠন করলে বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলতে হবে তার যে কোনো একটি হাত ও পা। আর যুদ্ধোদ্যত হলে এবং মুসাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলে তাদেরকে দিতে হবে দেশান্তর।

আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবীর নিয়মে ইমাম মোহাম্মদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. আবু বুরদা হেলাল বিন উয়াইমির আসলামীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিলেন। চুক্তি সম্পাদনের কিছু দিন পর মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু লোক মুসলমান হওয়ার ইচ্ছায় মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করলো। পথিমধ্যে আবু বুরদার সাথীরা তাদের মালমাত্তা লুণ্ঠন করলো এবং তাদেরকে হত্যাও করলো। অতঃপর হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে এই আয়াতের শাস্তির বিধানগুলো অবতীর্ণ হয়েছে— যে ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন করেছে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করবে, যে ব্যক্তি কেবল হত্যা করেছে তাকে হত্যা করে ফেলবে আর যে কেবল লুণ্ঠন করেছে তার যে কোনো একটি হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবে। আর সে যদি বন্দী হওয়ার পূর্বে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার ইসলাম পূর্ব জীবনের সমস্ত পাপ মার্জনা করা হবে। আতিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি পথচারীদেরকে কেবল ভীতি প্রদর্শন করে, তার শাস্তি দেশান্তর। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর তাফসীরে বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

অপরাধের তারতম্য অনুসারে শরিয়তে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। হাকিমকে এ রকম কোনো অধিকার দেয়া হয়নি যে, তিনি ইচ্ছে মতো শাস্তি নির্বাচন করবেন। এ রকম অধিকার দেয়া হলে লঘু অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড

এবং গুরু অপরাধের জন্য লঘু শাস্তির অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে। তাই হাকিমকে শরিয়ত সমর্থিত শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। এখানেও তাকে কোরআনের নির্দেশানুযায়ী হত্যার পরিবর্তে হত্যা, সম্পদ লুণ্ঠনের পরিবর্তে হস্তপদ কর্তন এবং উভয় অপরাধে অপরাধী হলে হত্যার পর ক্রুশবিদ্ধও করতে হবে। ইমাম আবু হানিফার শেষ অভিমতটিতে বলা হয়েছে, হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করতে হবে, শূলে চড়ানো যাবে না—তিনি এ রকম বলেছেন কেবল উরায়নাবাসীদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। তারা উটের রাখালদেরকে হত্যা করেছিলো এবং তাদের উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু রসুল স. তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করেননি (অন্যথায় বুদ্ধি তো এ কথাই বলে যে—ক্রুশবিদ্ধ করাই ছিলো সমীচীন)।

মাসআলাঃ ডাকাতেরা যদি হত্যা ও লুণ্ঠন— কোনো কিছু না করে কেবল আহত করে থাকে, তবে তাদের আঘাতের বদলা (কিসাস) নিতে হবে। আর যদি জখমের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে তাদের সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা আদায় করতে হবে। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সে ইচ্ছে করলে বদলা কিংবা জরিমানা নিতে পারবে— আবার ক্ষমাও করে দিতে পারবে। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, শরিয়তে এ ধরনের অপরাধের কোনো শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি। এ ধরনের অপরাধ বান্দার হক বিনষ্টের অন্তর্ভুক্ত। তাই আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার হক আদায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী। হেদায়া প্রণেতার এ বক্তব্যটি অবশ্য গ্রহণীয় নয় যে, শরিয়তে এ ধরনের কোনো শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি। কারণ, এখানে রয়েছে হুমকি, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি। যার জন্য শরিয়ত দেশান্তরের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মাসআলাঃ ডাকাতদল যদি সম্পদ লুণ্ঠন ও আঘাত দু'টোই করে, তবে লুণ্ঠনের কারণে তার হাত পা কাটতে হবে, আঘাতের জন্য পৃথক শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা, শরীর বান্দার নিজের অধিকারে এবং সম্পদের অধিকার আল্লাহ্‌র। তাই শরিয়তসম্মত শাস্তি নির্ধারণের পর বান্দার পক্ষ থেকে আর কোনো অধিকার থাকে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, উভয় অধিকার পৃথক পৃথকরূপে কার্যকর থাকবে। আল্লাহ্‌র অধিকার নষ্ট করার কারণে শাস্তি দেয়া সত্ত্বেও বান্দার অধিকার নষ্ট করার অপরাধের শাস্তি দেয়া যাবে। অর্থাৎ আহত ব্যক্তি বদলা (কিসাস) নিতে পারবে।

ইমামে আজম ও ইমাম শাফেয়ীর এই মতবিরোধ হবে ওই অবস্থায় যখন হত্যার অপরাধে ডাকাতদেরকে হত্যা করা হবে অথবা সম্পদ লুণ্ঠনের কারণে তাদের হাত পা কাটা হবে এবং লুণ্ঠিত সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথবা অপরাধীরাই সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলবে। এমতাবস্থায় লুণ্ঠিত সম্পদের জন্য কোনো জরিমানা সাব্যস্ত করা যাবে না। ইমামে আজম এ রকমই বলেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেন, অপরাধীদেরকে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অথবা বিনষ্ট করে ফেলা মালের জরিমানা দিতে হবে। অবশ্য আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, লুণ্ঠিত মাল যদি বিনষ্ট না হয়, তবে তা ফেরৎ দিতে হবে। চুরি সম্পর্কিত অধ্যায়ে এই মতবিরোধের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা।

মাসআলাঃ ডাকাতদের দলে যদি কোনো মহিলা থাকে যে হত্যা করেছে এবং সম্পদ লুট করেছে, তাকেও হত্যা করতে হবে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এ রকমই বলেছেন। এই শাস্তি কার্যকর হবে শরিয়ত সম্মতভাবে (নিহত ব্যক্তির অভিভাবকেরা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারবে না)। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ওই মহিলাকে হত্যার বদলে হত্যা করা যাবে। ছিনতাই করা মালের জরিমানাও আদায় করা যাবে (কিন্তু নিহত ব্যক্তির অভিভাবকেরা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারবে)।

মাসআলাঃ ডাকাত দলে শিশু অথবা উন্মাদ থাকলে তাদেরকে কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না। তিন ইমাম এ রকম বলেছেন। ইমামে আজম এবং ইমাম জোফারের মতে অন্য লোকদের উপর থেকে শরিয়তের শাস্তি (হদ) রহিত হয়ে যাবে (বাকী থাকবে কেবল কিসাসের হক)। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যদি কেবল সুস্থ মস্তিষ্ক লোকেরা অপরাধ করে (হত্যা ও লুণ্ঠনে যদি শিশু ও উন্মাদেরা অংশগ্রহণ না করে থাকে) তবে শিশু ও উন্মাদ বাদে অন্য লোকদের উপর হদ জারী করে দিবে। আর যদি শিশু ও পাগলেরাও অপরাধ সংঘটনে শরিক থাকে, তবে সকলের উপর থেকে হদ রহিত হয়ে যাবে, বাকী থাকবে কেবল কিসাস। এই মতবিরোধ দেখা দিবে তখনই, যখন ডাকাতের দলে থাকবে তাদের মুহ্‌রিম (যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) আত্মীয়স্বজন।

ইমামে আজমের দলিল এই যে—অপরাধ একটিই, যা সবার উপর প্রযোজ্য হবে (যদি অপরাধী একজন এবং তার সহযোগী অন্য সকলে হয়)। এমতোক্ষেত্রে সবাইকে অপরাধী বলে সন্দেহ করা জরুরী হয়। আর সন্দেহের অবস্থায় হদ জারী হতে পারে না। জমহুর বলেছেন, সন্দেহকে অধিক গুরুত্ব দিলে হদের (শরিয়তসম্মত শাস্তির) অবকাশ আর থাকবে না।

মাসআলাঃ যদি কোনো দলের সদস্য একে অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করে, তবে হদ ওয়াজিব হবে না। কারণ, দলের সকলেই নিরাপত্তার দিক থেকে একই অধিকারভূত। যেমন, এক বাড়ীর দু'জন সদস্যের মধ্যে একে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করলে হদ জারী করা যায় না। তবে হদ ওয়াজিব না হলেও কিসাস ও সম্পদ বিনিময় ওয়াজিব হবে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য সম্পাদনকারীদের শাস্তির বিবরণ দানের পর, আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। সুতরাং মনে রাখতে হবে দুনিয়ার শাস্তিই তাদের শেষ শাস্তি নয়, আখেরাতেও তাদের জন্য রাখা হয়েছে কঠোর শাস্তি।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

❐ তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তওবা করিবে তাহাদের জন্য নহে। সুতরাং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বাগবী লিখেছেন, যে সকল আলেম মনে করেন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কাফেরদের সম্পর্কে, তাঁদের মতে এর অর্থ হবে 'মুজরিম' (হত্যাকারী, ছিনতাইকারী) কাফেরেরা গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে যদি শিরিক থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের উপর হদ জারী করা যাবে না এবং কাফের অবস্থায় তারা খুন, ছিনতাই যা কিছু করে থাকুক না কেনো— তারজন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

আমি বলি, এই নিয়মেই কোনো 'হরবী' (অমুসলিম দেশের কাফের) বন্দী হওয়ার পর যদি শিরিক থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে মুসলমান হওয়ার পর তার বিগত অপরাধের ব্যাপারে তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। অন্যান্য আয়াতেও এই বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে। তেমনি মুসলমান অথবা জিম্মি (মুসলিম দেশের কাফের) যদি ডাকাতি অথবা ছিনতাই করার পর গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করে নেয়, তবে তার উপরেও হদ জারী হবে না। তবে আল্লাহ্র বান্দার হক সম্পর্কে সে অভিযুক্ত হবে। কারো কারো মতে তাও হবে না। তওবার পর বিগত অপরাধের অভিযোগ আর থাকে না। তবে তওবাকারী ছিনতাইকারীর নিকট যদি ছিনতাইয়ের মাল বিদ্যমান থাকে, তবে তা ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে।

এক বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলীর খাদেম হারেসা বিন বদর পালিয়ে গিয়ে ডাকাত হয়ে গেলো। সে খুন করলো। লুণ্ঠনও করলো। কিছু দিন পর গ্রেফতার হওয়ার আগেই সে তওবা করে নিজে নিজেই হজরত আলীর দরবারে উপস্থিত হলো। হজরত আলী তার নিকট থেকে কোনো কৈফিয়ত চান নি। শা'বী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে আবীদ্দুনিয়া, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। ইবনে আবী শায়বা এবং আবদ বিন হুমাইদ আশয়াসের মাধ্যমে হজরত আবু মুসা থেকেও এ রকম বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাসূত্রে আশয়াস ও হজরত আবু মুসার মধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি রয়েছেন।

জমহুরের নিকট হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) রহিত হয় না। তাই খুন এবং ছিনতাইয়ের পর গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করলেও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা কিসাস (বদলা) অথবা ক্ষমা করার অধিকার রাখবে। আর ছিনতাইয়ের মাল

মওজুদ থাকুক অথবা বিনষ্ট হয়ে যাক কিংবা ডাকাতেরা নষ্ট করে দিয়ে থাকুক বা ব্যয় করে থাকুক—সকল অবস্থায় পরিশোধ করতে হবে (মওজুদ থাকলে ঐকমত্যানুসারে ফেরৎ দিতে হবে এবং বিনষ্ট হয়ে থাকলে দিতে হবে জরিমানা)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হদ ওয়াজিব এবং সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র হক। আল্লাহ্‌র হকই অগ্রগণ্য। তাই আল্লাহ্‌র হক প্রতিষ্ঠা করলে বান্দার হক রহিত হয়ে যায়। সে কারণেই কিসাস ও জরিমানা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু পৃথক আয়াতে তওবার কথা বলা হয়েছে বলে তওবার পর হদ ওয়াজিব থাকবে না। তাই বান্দার হকও রহিত হয়ে যাবে। বাকি থাকবে কেবল জরিমানা। অন্য আয়াতেও এর প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং এই আয়াতের হুকুমটি রহিত হওয়ার প্রমাণ যখন নেই, তখন এই হুকুমটি কার্যকর থাকবে। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্‌তায়ালাই অবগত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে সংগ্রাম কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

'ওয়াব্‌তাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা' (নৈকট্যলাভের উপায় অন্বেষণ করো) — কথাটির অর্থ, আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য অন্বেষণ করো। হজরত হুজায়ফা থেকে হাকেম এ রকম বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ফারইয়ানি, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, এখানে নৈকট্য অর্থ সত্তাগত (জাতী) নৈকট্য— যা বাহ্যিক নৈকট্যের অনেক ঊর্ধ্বে। কামুস অভিধানে বলা হয়েছে, শব্দটির অর্থ শাহী নৈকট্য, মর্যাদা, অবস্থান ইত্যাদি। 'ওয়াসিল'—এর প্রকৃত অর্থ আগ্রহান্বিত হওয়া। সীহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে 'ওয়াসিলা'(সিন সহযোগে) উৎসারিত হয়েছে বিশেষভাবে 'ওয়সিলা'(ছোয়াদ সহযোগে) থেকে। 'ওয়াসিলা' অর্থ আগ্রহের সঙ্গে কোনো গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছানো। আর (ছোয়াদ সহযোগে) ওয়াসিলা অর্থ মিলিত হওয়া। প্রথম অর্থটিতে রয়েছে ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের অনুপ্রবেশ।

হাদিস শরীফে এসেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ওয়াসিলার একটি স্তর রয়েছে। ওই স্তরের ঊর্ধ্বে আর কোনো স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই বলে প্রার্থনা করো; হে আমার আল্লাহ্, আমাদেরকে ওই উচ্চ স্তর দান করো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আহমদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা মুয়াজ্জিনের উচ্চারণের অনুরূপ কথায় আজানের জবাব দিবে এবং আজান শেষে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। যে ব্যক্তি একবার আমার উপর রহমতের দোয়া করবে, আল্লাহ্পাক তাঁর উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করবেন। অতঃপর যে আমার নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা জানাবে, তার জন্য আমার শাফায়াতের দরোজা উন্মুক্ত হবে।

একটি সন্দেহঃ হাদিস সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্পাকের নৈকট্য অন্বেষণের একটি বিশেষ স্তর রয়েছে। ওই স্তরটি সর্বোচ্চ। নস (কোরআন ও হাদিস) এবং উম্মতের ঐকমত্যের মাধ্যমে এ কথাটিও সুসাব্যস্ত যে, ওই সর্বোচ্চ স্তরটি কেবল রসুল স. এর জন্য সুনির্দিষ্ট। যদি তাই হয়, তবে এ আয়াতের মাধ্যমে অন্যদেরকে নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ দেয়া হলো কেনো? তবে কি বুঝতে হবে অন্যরাও ওই সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম?

সন্দেহের অপনোদনঃ আমি বলি, রসুল স. এর জন্য ওই সর্বোচ্চ নৈকট্যের স্তর অন্য কারো মাধ্যম ব্যতিরেকেই বিশেষভাবে নির্ধারিত। কিন্তু তাঁর উম্মতের আওলিয়া, কামেল ব্যক্তিরাও তাঁর স. এর মাধ্যমে ওই স্তরে পৌছুতে সক্ষম। রসুল স. এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ওই স্তরে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীরা পৌছতে পারবেন না—এ রকম কথা কোথাও বলা হয়নি। হাদিস শরীফে কেবল বলা হয়েছে, ওই স্তরের উপর রসুল স. এর মাধ্যমবিবর্জিত সুনির্দিষ্ট অধিকারের কথা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. এর মকতুবাত শরীফ পাঠ করতে হবে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ওয়াসিলা বা নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। নৈকট্যের পথ পরিক্রমার প্রতিটি স্তরই ওয়াসিলা। ওই স্তরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরটির অধিকার কেবল রসুল স. এর। অন্য সকল ওয়সিলা ওই সর্বোচ্চ ওয়সিলা অপেক্ষা নিম্নমানের। আল্লাহ্পাক সমধিক জ্ঞাত।

দ্রষ্টব্যঃ জুহুরী তাঁর সীহাহ্ গ্রন্থে লিখেছেন, অন্বেষণের আগ্রহ ও প্রেম ওয়াসিলার অভিলাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, প্রেমভালোবাসা ছাড়া নৈকট্যের সুউচ্চ শিখরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এ কথার সমর্থন রয়েছে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী কাদ্দাসা সিররুহুর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'সায়ের' বা আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণের পথে অকল্পনীয় নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তর রয়েছে। ওই স্তরের উর্ধ্বে আর কোনো স্তর নেই। ওই স্তর সম্পর্কে রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে আমার একটি বিশিষ্ট সময় রয়েছে। ওই সময় আমার সঙ্গে কোনো নৈকট্যধারী ফেরেশতা কিংবা নবী রসুল অংশগ্রহণ করেন না (আমি সেখানে এককভাবে ফয়েজ আহরণকারী)। এই সায়েরটি কেবল মহব্বতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। (কেবল প্রেমমহব্বতের মাধ্যমেই ওই উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়)। ওই প্রেম ভালোবাসা সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসরণের প্রতিফল। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, কুল ইন্‌কুনতুম তুহিব্বুনাল্লহা

ফাত্তাবিয়ুনি ইউহ্বিব্ কুমুল্লাহ্ (আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসারী হও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন)। রসুল স. এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুসরণের মাধ্যমে ওই অমূল্য প্রেম আল্লাহ্পাকের দয়াতেই কেবল অর্জন করা যায়।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া জাহিদু ফি সাবিলিল্লাহিলা আল্লাকুম তুফলিহুন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, সে শত্রু নফস, শয়তান অথবা কাফের যেই হোক না কেন। আল্লাহ্পাকের সন্তোষ অর্জনার্থে তাঁর সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হও। যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো। অর্থাৎ এখলাসের (বিশুদ্ধতার) সঙ্গে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করে পূর্ণ তাকওয়া এবং ওয়াসিলা অন্বেষণের মাধ্যমে সফলতার শিখর স্পর্শ করে ধন্য হতে পারো।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে যদি তাহাদের তাহার সমস্ত থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

❒ তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে; কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।

যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) তারা আল্লাহ্পাকের অভিসম্পাতগ্রস্ত ও চিরবঞ্চিত। তাই আখেরাতে তাদের কঠোর আযাব হবে। কোনো কিছুর বিনিময়েও সেই আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। যদি ধরে নেয়া যায়— তাদের সন্তান সন্ততি, ধন-সম্পদ এবং প্রিয় বস্তুসমূহ সেদিন তাদের অধিকারে থাকে এবং সেগুলোকে যদি সেখানে দ্বিগুণ করে দেয়া হয়– আর কাফেরেরা যদি সে সকল কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে, তবু তাদের বিনিময় গৃহীত হবে না। কারণ, আখেরাত আমলের স্থান নয়, আমলের প্রতিফল লাভের স্থান। তাই শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া লাহুম আযাবুন আলিম'

(এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে)। এ কথার মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায়, আখেরাতে কাফেরদের শাস্তি কোনো কিছুর বিনিময়ে রহিত তো হবেই না, লঘু শাস্তির সুযোগও তারা সেখানে পাবে না। বরং তাদের শাস্তি হবে কল্পনাতীতরূপে কঠিন।

হজরত আনাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত দোজখীকে আল্লাহ্পাক বলবেন, যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর অধিকারী হতে, তবে শাস্তি থেকে অব্যাহতির জন্য তুমি কি ওই সমূদয় বস্তু দিয়ে দিতে? দোজখী বলবে, নিশ্চয়ই। আল্লাহ্পাক বলবেন, তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট থেকে ছোট্ট একটি কথা আশা করেছিলাম। কথাটি এই —আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি পৃথিবীতে পদার্পণের পর সেই শিরিকেই আমস্তক নিমজ্জিত ছিলে। বোখারী, মুসলিম।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা নরকাগ্নি থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু পারবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তারা দোজখ থেকে বের হতে উদ্যত হলে তাদেরকে দোজখের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। এ কথার অর্থ তারা পরিত্রাণের প্রার্থনা জানাবে। বলবে, রব্বানা আখরিজনা' মিনহা (হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দোজখ থেকে বের করে দিন)। এই আয়াতে তাদের প্রার্থনার অনড় জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে—ওয়া মাহুম বিখরিজিনা মিন হা (কিন্তু তারা তা থেকে বের হবার নয়)। পরক্ষণেই স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে— তাদের নরকমুক্তি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। দোজখই তাদের চিরকালিন আবাস। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি (ওয়া লাহুম আযাবুম মুক্বিম)। আলোচ্য আয়াত দু'টোর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হচ্ছে এই— কোনো কিছুর বিনিময়ে কাফেরদের দোজখমুক্তি যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব তাদের শাস্তি লঘু হওয়া এবং আযাব চিরস্থায়ী না হওয়া।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩৮

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

❐ পুরুষ কিংবা নারী চুরি করিলে তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর; ইহা উহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহের নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

পুরুষ কিংবা নারী— যে কেউ চুরি করুক না কেনো, তার হস্ত কর্তন করতে হবে—এটাই চুরির শাস্তি। এ শাস্তি আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড বিধান। দণ্ড বিধানের অধিকার তাঁর। কারণ, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় পরাক্রমের অধিকারী ও প্রজ্ঞাময়।

কোরআনের অধিকাংশ বিধানে রমণীদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। পুরুষদের উপর প্রদত্ত বিধানে স্বাভাবিকভাবে রমণীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে চুরির দণ্ডাদেশ দানের সময় এবং অন্য আয়াতে ব্যভিচারের দণ্ডাদেশ উল্লেখের প্রাক্কালে নারী ও পুরুষের কথা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হয়েছে। এখানে পুরুষের উল্লেখ এসেছে নারীর আগে। কারণ, চুরি করতে গেলে প্রয়োজন হয় কৌশল ও সাহসের—যা নারীর তুলনায় পুরুষের মধ্যে থাকে অধিক। আর ব্যভিচারের দণ্ডাদেশ বর্ণনার সময় নারীর উল্লেখ এসেছে পুরুষের আগে। কারণ, পুরুষ অপেক্ষা নারীর কামপ্রবৃত্তি অধিক।

চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন। কারণ, হাতই চুরির প্রধান অঙ্গ। ব্যভিচারের শাস্তির বেলায় কিন্তু ব্যভিচারের প্রধান অঙ্গ কর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়নি। কারণ, তা বংশ বিস্তারেরও অঙ্গ।

কাঁধ থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত পুরো অঙ্গটিকেই বলা হয় হাত। খারেজীরা তাই বলে, চুরির শাস্তি স্বরূপ কাঁধ পর্যন্ত পুরো হাতই কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু ইসলামের শুরু থেকে সকল উম্মত এই আমলটি করে চলেছেন যে—চুরি করলে হাত কাটতে হবে কব্জি পর্যন্ত। এই অভিমতটি ঐকমত্যাগত। ঐকমত্যটি এতোই প্রসিদ্ধ যে, এর জন্য কোনো দলিল উপস্থাপনের প্রয়োজনই নেই। কারণ, সকল উম্মত কখনো কোনো ভুলের উপর একমত হতে পারে না। তাছাড়া বিশেষভাবে কতিপয় হাদিসেও চুরির শাস্তি হিসেবে কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলার কথা এসেছে।

হজরত সাফওয়ানের চাদর চুরির ব্যাপারে দারা কুতনী একটি বর্ণনা এনেছেন— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. চোরের কব্জি পর্যন্ত হাত কাটার হুকুম দিয়েছিলেন। এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী আযরীকে অবশ্য দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। কামেল গ্রন্থে ইবনে আদী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে। এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত আবদুর রহমান বিন সালমা সম্পর্কে ইবনে কাত্তান মন্তব্য করেছেন আমি জানি না তিনি দুর্বল না অপরিচিত।

রেজা বিন হায়াতের মাধ্যমে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এক ব্যক্তির হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দিয়েছিলেন। বর্ণনাটি মুরসাল। ইবনে আবী শায়বা এ কথাটিও লিখেছেন যে, হজরত ওমর এবং হজরত আলী চোরের কব্জি পর্যন্ত হাত কেটে দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, হাত বলতে কব্জি পর্যন্ত হাত এবং কাঁধ পর্যন্ত হাত—দু'টোই বুঝায়। তবে কব্জি পর্যন্ত হাতকেই প্রকৃত পক্ষে হাত বলে। যদিও সম্পূর্ণ হাতকেও হাত বলা হয়। সুতরাং হাত বলতে কব্জি পর্যন্ত হাত এই অর্থটি গ্রহণ করা উচিত। এর অধিক হওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ।

হজরত ইবনে মাসউদ 'আইদিহিমা'—এর পরিবর্তে পড়তেন 'আইমানিহিমা।' সুতরাং আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে. 'আইদি' অর্থ ডান হাত। আর হজরত ইবনে মাসউদের কেরাতটিই বিখ্যাত এবং আয়াতের সম্পর্ক হুকুমের সঙ্গে। ঘটনাও এখানে এক। সুতরাং হুকুমের সঙ্গে যদি আয়াতের সম্পর্ক হয় এবং প্রকৃত ঘটনাও এ রকম হয়, তবে মশহুর হাদিসে আলোচিত সীমারেখা দ্বারা সীমিত করা সিদ্ধ। এটা কোনো সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নয়। কেননা, এখানে সংক্ষিপ্ত বলে কিছু নেই।

রসুল স. এবং তাঁর সাহাবীগণ চোরের ডান হাত কেটে দিতেন। যদি আয়াতের মর্ম সাধারণ হতো তবে রসুল স. ও সাহাবীগণ নিশ্চয়ই ডান হাত কাটতেন না। কাটতেন বাম হাত। আর সেটাই ছিলো সহজতর বিধান। কারণ, ডান হাতই বাম হাতের চেয়ে বেশী কাজে লাগে। কিন্তু রসুল স. এ রকম করেননি। তিনি স. কেটেছিলেন ডান হাত। আর সাহাবীগণও ছিলেন তাঁর যথার্থ অনুসারী।

চুরি (সরাক্বাহ্) বলে ওই অপকর্মকে যা সংরক্ষিত স্থান থেকে চুপিসারে নিয়ে নেয়া হয়। কামুস গ্রন্থে রয়েছে—সরাক্বা মিনহু শাইয়া ওয়াসতারাক্বহু (গোপনে সুরক্ষিত স্থানে গিয়ে সেখান থেকে অন্যের মাল নিয়ে আসা)। অর্থাৎ গোপনে সুরক্ষিত স্থান থেকে অন্য কারো সম্পদ নিয়ে আসার নাম চুরি। তাই চুরির জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো জরুরী।

১. সম্পদ হতে হবে কোনো ব্যক্তির বা দলের মালিকানার অধীন। যে গোপনে ওই সম্পদ চুরি করে নিয়ে যাবে, ওই সম্পদের মধ্যে তার (চোরের) কোনো স্বত্ব থাকা যাবে না, স্বত্ব আছে এ রকম সন্দেহও থাকা যাবে না।

২. সম্পদ সংরক্ষিত অবস্থায় থাকতে হবে। সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকা চলবে না।

ইমাম আবু হানিফার নিকট কোনো একটি বস্তু হেফাজতে থাকলে অন্য সকল বস্তু হেফাজতে আছে বলে ধরে নেয়া যাবে। কিন্তু অন্য তিন ইমামের নিকট বিভিন্ন প্রকার সম্পদের বিভিন্নভাবে হেফাজত করতে হবে। সম্পদগুলো আলাদাভাবে চিনতে পারলেই হলো। যেমন, ঘোড়ার আস্তাবল অথবা বকরির ঘর হতে মনিমুক্তা চুরি হলে ইমাম আজমের মতে চোরের হাত কাটা যাবে। অন্য তিন ইমামের মতে যাবে না। আস্তাবল এবং বকরি রাখার স্থান নির্মিত হয় ঘোড়া ও বকরির জন্যই, মনিমুক্তার জন্য নয়। গৃহ নির্মিত হয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্তেই। গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য এটাই। যেমন অর্থশালা, ব্যাংক ভবন ইত্যাদি। কখনো আবার কেবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষিত হয়। যেমন, কোনো লোক রাস্তা অথবা মসজিদে নিজের মাল সামান রেখে তার উপর নজর রাখতে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে কেবল দেখাশুনার মাধ্যমে সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

হজরত সাফওয়ান একবার মসজিদে শায়িত ছিলেন। এক লোক তখন তার মস্তকের নিচে রক্ষিত চাদর চুরি করে নিয়ে গেলো। রসুল স. ওই চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন। ইমাম মালেক এ ঘটনাটি তাঁর মুয়াত্তা'য় লিপিবদ্ধ করেছেন। আহমদ, হাকেম, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তানকীহ্ রচয়িতা লিখেছেন, এই হাদিসটি বিভিন্নরূপে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর বক্তব্যেও রয়েছে বিভিন্নরূপ। সেগুলোর কোনো কোনো সূত্র সুদৃঢ় এবং কোনো কোনো সূত্র দুর্বল (কিন্তু ঐকমত্যানুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধরূপে বিবেচিত)।

দিবাভাগে চুরির প্রথম ও শেষ অবস্থা গোপন থাকা জরুরী। আর রাতের চুরির প্রথম অবস্থা গোপন থাকাই যথেষ্ট। যেমন, চোর হয়তো দেয়ালে সিঁদ কাটতে শুরু করলো। এ কাজ তাকে করতে হবে গোপনে। পরে সে জেগে ওঠা গৃহকর্তার নিকট থেকে বলপূর্বক মালমাত্রা নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। চোর যা চুরি করবে, তার উপর তার সার্বিক কিংবা আংশিক মালিকানা যেনো না থাকে এবং সম্পদ যেনো থাকে সংরক্ষিত অবস্থায়। এই শর্ত দু'টো মারফু হাদিস থেকে সংকলিত হয়েছে। হজরত আয়েশা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন শাফেয়ী, তিরমিজি, হাকেম এবং বায়হাকী। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। রসুল স. বলেছেন, যতোদূর সম্ভব মুসলমানদের উপর হদ (শরিয়তসম্মত শাস্তি) অপসারণের চেষ্টা করো। শাস্তি থেকে অব্যাহতির কোনো উপায় বের করতে পারলে তাকে ক্ষমা করে দাও। শাস্তিদানের ক্ষেত্রে বিচারকের ভুল অপেক্ষা ক্ষমা করে দেয়ার ভুল উত্তম (বিচারকের আওতায় আসার পূর্বেই ক্ষমা করে দাও)।

উত্তমসূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত ইবনে মাজার মারফু হাদিসে রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, শাস্তি রহিত করার কোনো উপায় বের করতে পারলে তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর থেকে শাস্তি রহিত করো। হজরত আলীর মারফু বর্ণনায় রয়েছে, হুদুদ (শাস্তি) রহিত করে দাও, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার পর বিচারক শাস্তি রহিত করতে পারবে না, শাস্তিকে লঘুও করতে পারবে না। উত্তম সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, দারা কুতনী ও বায়হাকী।

শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আদী বর্ণিত মারফু বর্ণনায় রয়েছে— সন্দেহ দেখা দিলে হুদুদকে রহিত করে দাও এবং মানুষের ভুলকে ক্ষমা করে দাও। হাদিসটির প্রথমাংশ ওমর বিন আবদুল আজিজের মাধ্যমে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন, আবু মুসলিম কাহী এবং ইবনে সামানী। আর মাওকুফ হিসাবে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন মোসাদ্দাদ। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সন্দেহ দেখা দিলে হুদুদকে রহিত করা যাবে।

চুরির শর্তসমূহ সম্পর্কে এতোক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা করলাম। এবার বর্ণনা করা হচ্ছে— চুরি সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল।

মাসআলাঃ যারা লুটপাট ও রাহাজানি করে তাদের হাত কাটা যাবে না। কারণ, এরা প্রকাশ্যে সম্পদ লুণ্ঠন করে, গোপনে চুরি করে না। খেয়ানতকারী বা আমানত অস্বীকারকারীদের হাত কাটা যাবে না। কারণ তারা চোর নয়। তাদেরকে সম্পদের মালিক স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদ আমানত হিসেবে অর্পণ করে। আমানত গ্রহণকারী আমানত দাতার সম্পদের সংরক্ষক। কিন্তু চোর গৃহকর্তার সম্পদের সংরক্ষক নয়। হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ছিনতাইকারীদের উপর হস্তকর্তনের শাস্তি নেই। কিন্তু তারা আমাদের দলভূত নয় (ছিনতাইকারীরা আমি ও আমার সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত নয়)। আবু দাউদ। হজরত জাবেরের দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, ছিনতাইকারীদের উপর হস্তকর্তনের শাস্তি নেই। আমানত আত্মসাতকারী, প্রতারক ও কৌশলে

সম্পদ হস্তগতকারীর উপরেও নেই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমী। তিরমিজি হাদিসটিকে বলেছেন উত্তম ও বিশুদ্ধ। এই হাদিসের সমর্থনে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে মাজাও একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে জুহুরীর পদ্ধতিতে আওসাত গ্রন্থে তিবরানীও এ রকম হাদিস এনেছেন। এ রকম আরো বর্ণনা করেছেন আল এলাল গ্রন্থে ইবনে জাওজী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

ইমাম আহমদ বলেছেন, ঋণ গ্রহণ করার পর অস্বীকার করলে তার হাত কাটা ওয়াজিব। জননী আয়েশার হাদিসে এসেছে, মাখজুমী গোত্রের এক মহিলা মানুষের নিকট থেকে কিছু জিনিসপত্র কর্জ হিসেবে গ্রহণ করে কর্জকে অস্বীকার করলো। রসুল স. তার হাত কেটে ফেলার হুকুম দিলেন। তখন ওই মহিলার আপনজনেরা হজরত উসামা বিন জায়েদের নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হলো। হজরত উসামা সুপারিশের উদ্দেশ্যে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। তিনি স. বললেন, উসামা! আমি চাই তোমরা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত হদের ব্যাপারে যেনো কিছু না বলো। এরপর তিনি স. বহির্বাটিতে গমন করলেন এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের পূর্ব যুগের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো। যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, তবে আমি তার হাতও কেটে দিবো। এ কথা বলে তিনি স. মাখজুমী মহিলার হাত কেটে দিলেন। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, মাখজুমী সম্প্রদায়ের এক রমণী এক লোকের নিকট থেকে ঋণ স্বরূপ কিছু সামগ্রী গ্রহণ করার পর ঋণ পরিশোধ করতে অসম্মত হলো। রসুল স. তার হস্তকর্তনের নির্দেশ দিলেন।

এই হাদিস সম্পর্কে জমহুর বলেছেন, ওই মাখজুমী মহিলা ঋণ অস্বীকারের কারণে ছিলো কুখ্যাত। হজরত আয়েশার হাদিসে তাই ঋণ অস্বীকারের কথাটি উল্লেখিত হয়েছে। কারণ, তার ঋণ অস্বীকারের বিষয়টিই ছিলো সুবিদিত। একবার সে চুরিও করলো। সেই অপরাধেই তার হাত কেটে নেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রসুল স. তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, অতীত যুগের লোকেরা ধ্বংস হয়েছিলো এ কারণে যে, চুরি করলেও তারা প্রভাবশালী লোককে ছেড়ে দিতো এবং দুর্বল ব্যক্তির হস্ত কর্তন করতো। এই ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ওই মাখজুমী মহিলা চুরিও করতো। নতুবা কেবল ঋণ অস্বীকারের কথা বলা হতো, চুরির কথা উঠতো না। তাছাড়া রসুল স. তাঁর ভাষণে বলেছিলেন— ফাতেমা চুরি করলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম। তাঁর এ কথায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ওই মহিলাটি চুরিও করতো। চুরি না করলে উপস্থিত লোকেরা নিশ্চয়ই বলে উঠতেন, ইয়া রসুলাল্লাহ, মহিলাটি তো চুরি করেনি। সে অস্বীকার করেছে ঋণ। অথচ আপনি তার উপর চুরির শাস্তি আরোপ করছেন। লক্ষ্যণীয় যে, হজরত আয়েশার হাদিসে মাখজুমী মহিলাটির ঋণ অস্বীকারের সাধারণ দুর্নামটির কথা

বলা হয়েছে। বিশেষভাবে প্রমাণিত কোনো ঘটনার কথা তিনি বলেননি। যতো দুর্নামই থাক, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কারো প্রতি কি শাস্তি আরোপ করা যায়? সুতরাং এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, মহিলাটি চুরি করেছিলো এবং তা প্রমাণিতও হয়েছিলো। তাই রসুল স. তার হস্তকর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাদিসটিকে প্রকাশ্যতঃ মেনে নিলে হজরত জাবের বর্ণিত ওই হাদিসটিকেও গ্রহণ করতে হবে— যেখানে বলা হয়েছে, আমানত খেয়ানতকারীর হাত কাটা যায় না। হজরত জাবেরের হাদিসটিকেই উম্মতেরা গ্রহণ করেছেন। অতএব জননী আয়েশার হাদিসটি রহিত বলে ধরে নিতে হবে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না। কারণ, কাফনের কোনো ওয়ারিশ নেই। আর কাফন সুসংরক্ষিতও নয়। কাফন দাফনের পর ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত পূর্ণ করে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোরআনের বিধানানুসারে বণ্টন করতে হয়। কিন্তু কাফন বণ্টন করা যায় না। কারণ, উত্তরাধিকারীরা কাফনের মালিক নয়। মৃত ব্যক্তিও কাফনের মালিক হতে পারে না। মৃতদেহের মালিক হওয়ার কোনো যোগ্যতাই নেই। আর কবরও সম্পদ সংরক্ষণের স্থান নয়। এ রকম অরক্ষিত স্থান থেকে কিছু নিয়ে আসা চুরি হিসেবে গণ্য নয়। কবরস্থানে মানুষ সচরাচর চলাচল করে না। কবরের জন্য তালাচাবি, পাহারাদার কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সেখান থেকে কেউ কিছু নিয়ে এলে তাকে চোর সাব্যস্ত করে হাত কেটে ফেলা হবে কেনো?

ইমাম মালেক, ইমান শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, কাফন চোরের হস্তকর্তন করা যাবে। কেননা, রসুল স. বলেছেন, যে কাফন চুরি করবে আমি তার হাত কেটে দিবো। বায়হাকী। হাদিসটি পরিত্যক্ত। হজরত বারা বিন আজিব হাদিসটির বর্ণনাকারী। বায়হাকী লিখেছেন, এই হাদিসের সূত্রভূত এক বর্ণনাকারী অপরিচিত। বোখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, হাইশামের বর্ণনায় রয়েছে, সহল বলেছেন— আমার সামনে হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের এক কাফন চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু সহল বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। আতা বলেছেন, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বর্ণনায় রয়েছে, হাসান বসরী ও ইবনে সিরিন বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে। মুয়াবিয়া বিন ফারদাহ্ও বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদিসগুলোর কোনোটিই মারফু পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইব্রাহিম নাখয়ী এবং শায়বী বলেছেন, বায়তুল মাল থেকে কেউ কিছু চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে। ইমাম মালেকও বলেছেন, যাবে।

আমরা বলি, বায়তুল মালের মালিক সাধারণ জনগণ। চোরও ওই সাধারণ জনতার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বায়তুল মালে তারও কিছু না কিছু অংশ রয়েছে। ইবনে

আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, বায়তুল মালে চোরেরও কিছু অধিকার রয়েছে (সুতরাং তাকে হস্তকর্তনের শাস্তি দেয়া যাবে না)। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল মাল থেকে চুরি করবে, তার হাত কাটার নির্দেশ জারী করা যাবে না। ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জাকাত আদায়কারী এক গোলামকে গণিমতের সম্পদ থেকে চুরির অভিযোগে রসুল স. নিকট উপস্থিত করা হলো। তিনি স. তার হাত কাটতে বলেন নি। বলেছেন, আল্লাহ্র এক মাল অন্য মালকে চুরি করে নিয়েছে। এক ব্যক্তি বায়তুল মাল থেকে কিছু অপহরণ করলো। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ তখন বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ এমন কেউ নেই, বায়তুল মালের মধ্যে যার অংশ নেই।

মাসআলাঃ এক শরীক অন্য শরীকের সুসংরক্ষিত সম্পদ অপহরণ করলে তার হাত কাটা যাবে না।

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে কিছু ঋণ প্রদান করলো। তারপর ঋণদাতা যদি ঋণ গ্রহণকারীর সম্পদ থেকে প্রদত্ত ঋণের সমপরিমাণ চুরি করে নেয়, তবে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, সে শুধু নিজের অধিকারটুকু আদায় করে নিয়েছে। যদি প্রদত্ত ঋণ অপেক্ষা অতিরিক্ত চুরি করে, তবুও তার হাত কাটা যাবে না। কারণ, চুরি করা সম্পদে রয়েছে ঋণদাতা ও গ্রহিতার সম্মিলিত মালিকানা।

মাসআলাঃ মাতা-পিতা এবং তাঁদের উপরের স্তরের মূল ও শাখা প্রশাখার লোকেরা যদি তাদের অধঃস্তন সন্তান-সন্ততির সম্পদ চুরি করে, তবে তাদের হাত কাটা যাবে না। রসুল স. বলেছেন, তোমাদের অস্তিত্ব ও সম্পদ— সবই পিতার (পিতৃপুরুষদের) অধিকারভূত। ঠিক তেমনি, সন্তান যদি তার মাতা-পিতা এবং উর্ধ্বস্তরের এবং তাদের উর্ধ্বতনদের কারো সম্পদ চুরি করে, তবে ইমামত্রয়ের মতে, তার হাত কাটা যাবে না। কেবল ইমাম মালেক বলেছেন, যাবে।

মুহ্‌রিম আত্মীয় (যাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ), যেমন ভাই-বোন অথবা চাচার সম্পদ চুরি করলে তিন ইমামের মতে তার হাত কাটা যাবে। কেবল ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যাবে না। কেননা, মুহ্‌রিম আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি থাকে অপূর্ণ। মুহ্‌রিমেরা একে অপরের গৃহে প্রবেশের অধিকার রাখে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের নিজেদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগ্নীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতুলদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে— যার চাবি রয়েছে তোমাদের হাতে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে।' এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মুহ্‌রিমেরা একে অপরের গৃহে প্রবেশ করতে পারবে এবং তাদের ঘরে পানাহারও

করতে পারবে। পারবে না—এ রকম দলিল প্রমাণ হাজির করা হলেও বৈধতার অবকাশ থাকবেই। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আংতা ওয়া মালুকা লিআবীকা' (তুমি ও তোমার সম্পদ, তোমার পিতার)।

একটি সন্দেহঃ উল্লেখিত আয়াতের ভাষ্যানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, বিনা অনুমতিতে বন্ধুগৃহে পানাহার সিদ্ধ। সুতরাং বন্ধু গৃহ থেকে কিছু চুরি করলে নিশ্চয় হাত কাটা যাবে না।

সন্দেহের অপনোদনঃ বন্ধুগৃহে পানাহার করলে সে বন্ধুই থাকে। বরং এ রকম করলে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা প্রগাঢ় হয়। কিন্তু বন্ধুর সম্পদ চুরি করলে বন্ধুত্ব আর অটুট থাকে না। বন্ধু হয়ে যায় তখন শত্রু। তাই বন্ধুগৃহে চুরি করলে চোরের হাত কাটা ওয়াজিব হবে।

মাসআলাঃ যদি কেউ তার মুহ্‌রিম আত্মীয়ের ঘরে রক্ষিত অন্য কারো সম্পদ চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু অন্য কারো ঘরে রক্ষিত মুহ্‌রিম আত্মীয়ের মাল চুরি করলে ইমাম আবু হানিফার মতে হাত কেটে দিতে হবে। কারণ প্রথম অবস্থায় সম্পদের নিরাপত্তা ছিলো অপূর্ণ (মুহ্‌রিমের ঘরে তার প্রবেশাধিকার ছিলো)। দ্বিতীয় অবস্থায় সম্পদ ছিলো সুরক্ষিত (সেখানে তার প্রবেশাধিকার ছিলো না)। সুতরাং প্রথম অবস্থায় হাত কাটা যাবে না, দ্বিতীয় অবস্থায় যাবে।

মাসআলাঃ স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রী, স্ত্রীর ঘর থেকে স্বামী অথবা তাদের সম্মিলিত বসবাসের গৃহ থেকে যদি কেউ কারো সম্পদ চুরি করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে হাত কাটা যাবে না। ইমাম আহমদও এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম মালেক বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বসবাস করে এ রকম কোনো ঘর থেকে অপরিচিত কোনো ব্যক্তির মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীর ঘর থেকে এবং স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে অপরিচিত কোনো ব্যক্তির মাল চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে। ইমাম শাফেয়ীর প্রকৃত অভিমতও এ রকম। এক বর্ণনানুসারে, ইমাম আহমদও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীর ঘর থেকে কিছু চুরি করে তবে তার হাত কাটা যাবে। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, রসুল স. আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকে বলেছিলেন, তুমি কি তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হবে—এ রকম সম্পদ আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে নিয়েছো?

ইমামে আজমের দলিল এই—এতে করে বুঝা যায় স্ত্রীর ঘরে স্বামী এবং স্বামীর ঘরে স্ত্রী অনুমতি ছাড়াই যাওয়া আসা করতে পারে। কাজেই, এখানে সুরক্ষার ব্যাপারটি অপূর্ণ।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা'য় লিখেছেন, হজরত ওমরের নিকট এক ক্রীতদাসকে ধরে আনা হলো— যে তার প্রভুপত্নীর আয়না চুরি করেছে। হজরত

ওমর বললেন, এর উপর কোনো শাস্তি নেই। তোমাদেরই খাদেম তোমাদের মাল চুরি করেছে। এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হলো যে, স্বামীর ক্রীতদাসের হাত কাটা যাবে না। সুতরাং স্বামীর হাত কর্তিত হবে কীভাবে?

মাসআলাঃ যদি ক্রীতদাস তার প্রভুর অথবা প্রভুপত্নীর কিংবা উভয়ের সম্পদ অপহরণ করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, প্রভু ও প্রভুপত্নীর ঘরে তার প্রবেশাধিকার রয়েছে।

গৃহকর্তার অতিথি তার গৃহে অবস্থানের সময় চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, গৃহকর্তার গৃহে তার রয়েছে স্বাগত প্রবেশাধিকার।

সাধারণজনের প্রবেশাধিকার যেখানে, সেখানে চুরি সংঘটিত হলে চোরের হাত কাটা যাবে না। যেমন, দিনের বেলা কোলাহল মুখর বাজারের দোকান। এ রকম দোকানে ক্রেতা বা ক্রেতারূপী মানুষের রয়েছে অবাধ প্রবেশাধিকার।

মাসআলাঃ যদি চোর নেসাব পরিমাণ মাল চুরি করে, তারপর যদি তা খরিদ করে অথবা মালিক তাকে তা দান করে দেয় কিংবা মীরাস স্বরূপ তা চোরের মালিকাধীনে এসে যায় এবং এ সকল কিছু যদি কাযীর নিকট মোকাদ্দমা পেশের পূর্বে হয়ে থাকে অথবা মোকাদ্দমা পেশের পর এবং রায় প্রদানের পূর্বে অথবা রায়ের পরও যদি হয়—সকল অবস্থায় ইমামে আজম এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে, তার হাত কাটা যাবে না। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যাবে। কেননা, চুরি সকল অবস্থায় পূর্ণ ও প্রমাণিত। এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই।

এছাড়া হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলেছেন, আমি মসজিদে চোখ বুঁজে শুয়ে ছিলাম। চোর এসে আমার মাথার নিচ থেকে চাদর বের করে নিয়ে যেতে শুরু করলো। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে ফেললাম। তারপর রসুল স. এর নিকটে গিয়ে বললাম, এই লোক আমার কাপড় চুরি করেছে। রসুল স. চোরের হাত কাটতে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমিতো এ রকম চাইনি। আমি চাদরটি তাকে দান করলাম। রসুল স. বললেন, আমার কাছে আসার আগে কেনো এমন করোনি। ইমাম মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসাঈ। কেবল নাসাঈর বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথাটি রয়েছে যে, অতঃপর রসুল স. তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তোমরা একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দিও। যখন আমার নিকট কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধীকে উপস্থিত করা হয়, তখন তার উপর হদ জারী করা আমার উপর হয়ে যায় ওয়াজিব।

হানাফীগণের পক্ষ থেকে ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হজরত সাফওয়ানের হাদিসের সূত্রসংযুক্ত একজন বর্ণনাকারী দুর্বল। ইতোপূর্বে সে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত সাফওয়ান বলেন, আমি এ চাদর তাকে দিয়ে দিয়েছি। চাদরের মূল্য তার উপর ঋণস্বরূপ ছেড়ে দিয়েছি। কোনো কোনো বর্ণনায় আবার এ কথাগুলো আসেনি। এতোটুকু এসেছে যে,

হজরত সাফওয়ান বলেন, আমি এ রকম চাই না যে, তিরিশ দিরহামের জন্য একজন আরববাসীর হস্ত কর্তিত হোক। সকল অবস্থায় হাদিসের শেষ বর্ণনাগুলো এ রকম এলোমেলো পরিদৃষ্ট হয়। এ রকম এলোমেলো কথা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার অন্তরায়। এটা এক ধরনের দুর্বলতা। শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে চোরকে চুরি করা মালের মালিক বানিয়ে দিলে শাস্তি আরোপের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। আর সন্দিগ্ধাবস্থায় হদ ওয়াজিব হয় না।

দ্রষ্টব্যঃ চোরের হাত কাটার পূর্বে দেখতে হবে চুরির মাল নেসাব পরিমাণ কিনা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যানুসারে নেসাবের ব্যাপারটি জরুরী। কিন্তু খারেজী, দাউদ জাহেরী, ইবনে নবত্ এবং শাফেয়ীর নিকট নেসাব জরুরী নয়। হাসান বসরীও এ রকম বলেছেন। কেননা, আয়াতে নেসাবের কথা বলা হয়নি। তাছাড়া হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, চোরের উপর আল্লাহ্র লানত। রশি অথবা ডিম চুরি করলেও হাত কেটে দিতে হবে। বোখারী, মুসলিম।

আমরা বলি, আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, যদিও আয়াতে নেসাবের কথা বলা হয়নি, তবু নেসাব না থাকাকে নিষেধও করা হয়নি। অন্য শর্তগুলোর উল্লেখও আয়াতে নেই। তবু সেগুলোকে সকলে গ্রহণ করেছেন। যেমন, চুরি করা সম্পদে চোরের কোনো প্রকার মালিকানা না থাকা, সম্পদ অরক্ষিত অবস্থায় না থাকা, ইত্যাদি। খারেজীদের বক্তব্যকে গ্রহণ করা যাবে না। আর ঐকমত্য ছেড়ে দিয়ে দাউদ জাহেরী এবং হাসান বসরীর বক্তব্যও গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

মাসআলাঃ একদল চোর চুরির মাল নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়ার পর, যদি দেখা যায় তাদের একক অংশে নেসাব পূর্ণ হচ্ছে না, তবে কারো হাত কাটা যাবে না। এ রকম বলেছেন, ইমামে আজম ও ইমাম শাফেয়ী। তাঁদের মতে প্রত্যেকের অংশে নেসাব পরিমাণ মাল থাকা জরুরী। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন, জরুরী নয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই হাত কাটা যাবে। হজরত আবু হোরায়রার হাদিস থেকে এ রকম অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, চুরির মাল যদি এক নেসাব পরিমাণ হয় এবং একজন লোক যদি তা চুরি করে এবং তা স্থানান্তরিত করার সময় যদি পরস্পরের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে, তবে সকলের হাত কাটা যাবে। এ রকম না হলে কারো হাত কাটা যাবে না, যতোক্ষণ না প্রত্যেকের অংশ নেসাব পরিমাণ হয়।

মাসআলাঃ ইমাম আজমের মতে চুরির নেসাব দশ দেরহাম অথবা এক দিনার কিংবা তার মূল্যমানের সমান। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে, চুরির নেসাব দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তিন দেরহাম অথবা ওই সম্পদ, যার মূল্য এ দু'টোর যে কোনো একটির সমান। ইমাম শাফেয়ীর মতে, এক দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তার মূল্যমানের সমান। জননী আয়েশার মারফু হাদিসে রয়েছে, চুরির মাল দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা এর অধিক হলে হাত কাটা যাবে। ভিন্নসূত্রের বর্ণনায় রয়েছে, হাত কাটা যাবে না। কিন্তু নেসাব দিনারের চার ভাগের এক ভাগই হবে। বোখারী, মুসলিম।

এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এর যুগে ঢালের চেয়ে কম মূল্যের কোনো সামগ্রী চুরি হলে হাত কাটা হতো না। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হাত কাটা যাবে না। কিন্তু এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ অথবা এর চেয়ে বেশী মূল্যের বস্তু চুরি হলে হাত কাটা যাবে।

মসনদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশার হাদিসে এসেছে, দিনারের চার ভাগের এক ভাগ মূল্যের সামগ্রী চুরি করলে হাত কাটো। এর চেয়ে কম মূল্যের হলে কেটো না। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. একবার ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের সামগ্রী চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (অর্থাৎ তিন দেরহাম মূল্যের চুরির জন্য হাত কেটে দিয়েছিলেন)। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা'য় উমরা বিনতে আবদুর রহমান সূত্রে লিখেছেন, হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় এক প্রকার ফল চোরকে ধরে নিয়ে আসা হলো। হজরত ওসমান ফলের মূল্য নিরুপণ করার নির্দেশ দিলেন। ফলের মূল্য নির্ধারিত হলো তিন দেরহাম। তখন হজরত ওসমান চোরের হাত কেটে দিলেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হদ রহিত হওয়ার জন্য কোনো না কোনো অসিলা থাকা জরুরী (সামান্য সন্দেহ দেখা দিলেও হদ রহিত হয়ে যায়)। চুরির নেসাব অধিক ধরাই যুক্তিযুক্ত। আর ঢালের মূল্য তিন দেরহাম অপেক্ষা অধিক। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে মুজাহিদের মাধ্যমে আইমান থেকে লিখেছেন, রসুল স. এর সময়ে চুরির মাল ঢালের চেয়ে কম মূল্যের হলে হাত কাটা হতো না। ওই সময় ঢালের মূল্য ছিলো এক দিনার এবং দশ অথবা বারো দেরহাম।

হজরত আমর বিন শোয়াইব থেকে আহমদ, শাফেয়ী ও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর জামানায় ঢালের মূল্য ছিলো দশ দেরহাম। ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নিফ গ্রন্থে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের মাধ্যমে মোজায়েনা গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, চুরি করা সামগ্রী যদি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে চোরের হাত কেটে দেবে। আর ঢালের মূল্য দশ দেরহাম। দারা কুতনী, আহমদ, সালেম বিন কুতাইবাহ্, জোফার বিন হুজাইল। হাজ্জাজ বিন আরতাদ, আমর বিন শোয়াইব—তিনি শোয়াইব থেকে—তিনি তাঁর দাদার সূত্রে—তিনি তাঁর পিতামহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রসুল স. বলেছেন, দশ দেরহাম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের সামগ্রী চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না। আবদুর রাজ্জাক, তিবরানী এবং কাশেম বিন মোহাম্মদের মাওকুফ বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, এক দিনার অথবা দশ দেরহামের চেয়ে কম মূল্যের মাল চুরি করলে হাত কাটার হুকুম নেই। হাদিসটির ধারাবাহিকতা অবশ্য পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়নি। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে কাসেম বিন মোহাম্মদের হাদিস শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং হাদিসটি মুনকাতে।

প্রকৃত কথা এই যে, যে হাদিস থেকে জমহুর দলিল পেশ করেছেন, তা সম্পূর্ণতই বিশুদ্ধ। আর তাঁদের সময় অতি সতর্কতার সঙ্গে মাসআলা চয়ন করা হতো। জমহুর যে হাদিসগুলোকে গ্রহণ করেননি, সেগুলো দুর্বল। আমর বিন শোয়াইবের হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে ইসহাক, সালেম, জোফার এবং হাজ্জাজ বিন আরতাদ—সকলেই বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তাঁদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর যুগে ঢালের মূল্য ছিলো দশ দেরহাম। এ কথাটি ছিলো তাঁদের নিজস্ব ধারণা। প্রকৃত কথা হচ্ছে—তখন ঢালের মূল্য কখনও ছিলো তিন দেরহাম, কখনও দশ দেরহাম আবার কখনও দশ দেরহামের চেয়ে বেশী। গুণগত তারতম্যের কারণে ঢালের মূল্যের তারতম্য ঘটতো। এ রকম না হলে রসুল স. এর যুগে ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরি হলে চোরের হাত কাটা হতো না—কথাটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হতো। দিনারের এক চতুর্থাংশ হলে হাত কাটা যাবে কিংবা যাবে না—এ বর্ণনার বিপক্ষে দশ দেরহামের কম হলে চোরের হাত কাটা যাবে না—এ রকম বর্ণনাও রয়েছে। কিন্তু বর্ণনাটি মারফু নয়। তাই এটিকে মারফু হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। বিরোধ পরিদৃষ্ট হলে মাওকুফ বর্ণনাকে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না। এটাই ঐকমত্যসম্মত মাসআলা।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, হাদিস শরীফে রয়েছে, এক চতুর্থাংশ দিনার এবং এর চেয়ে অধিক মূল্যের সামগ্রী চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তারপর তিনি কেমন করে বলেন যে, দশ দেরহাম এবং ততোধিক মূল্যের সামগ্রী চুরি করলে হাত কাটা যাবে, এর কম হলে যাবে না।

ইমাম মোহাম্মদ মুজাহিদের মাধ্যমে হজরত আইমান থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আইমান ছিলেন হজরত উমামা বিন জায়েদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুজাহিদের জন্মের পূর্বে হজরত আইমান হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে মুজাহিদ হাদিস বর্ণনা করতে পারেন না। মুজাহিদ ছিলেন তাবেয়ী। আর তিনি রসুল স. এর যুগ তো দূরের কথা, তাঁর খলিফার যুগও পাননি।

আমি বলি, হজরত আইমানের মাতা রসুল স. কে কোলে বসিয়ে পানাহার করিয়েছেন। তিনি ছিলেন রসুল স. এর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর পুত্র কোনো খলিফার যুগেও জন্মগ্রহণ করেন নি—তা কেমন করে হতে পারে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আইমান নামে দু'জন তাবেয়ী ছিলেন। একজন ইবনে জোবায়ের (জোবায়েরের পুত্র)। অন্যজন ছিলেন ইবনে আবী আমরের মুক্ত করা ক্রীতদাস। ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে হাব্বান তাঁদের দু'জনকে একই ব্যক্তি মনে করেছেন। মোট কথা এই যে, তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস জননী আয়েশা এবং হজরত ইবনে ওমরের বিপরীতে গ্রহণীয় নয়।

মাসআলাঃ যে দেশে যে বস্তু মূল্যহীন, সে বস্তু গ্রহণ করাকে চুরি বলা যায় না। তাই ইমাম আজম বলেছেন, এ সকল বস্তু নিলে হাত কাটা যাবে না। যেমন—– লাকড়ি, শুকনা ঘাস, বাঁশ, মাছ, পাখি, অরণ্যের পশু, চুনাপাথর, ইত্যাদি। যে সকল আহার্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। যেমন রান্না করা তরকারী, দুধ, সুপক্ক ফল, পাকা খেজুর ইত্যাদি। অন্য তিন ইমাম বলেছেন,

বর্ণিত বস্তুগুলো সংরক্ষিত অবস্থা থেকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপকাত্মক। সুতরাং এ ধরনের বস্তুও চুরির বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আজম বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপকাত্মক হলেও এক্ষেত্রে আলেমগণের ঐকমত্যের বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। যেমন, নেসাবের চেয়ে কম পরিমাণকে চুরি গণ্য করা যাবে না। কাজেই মূল্যহীন অথবা প্রায় মূল্যহীন বস্তু চুরি করলেও তা চুরি হিসেবে গণ্য হবে না। এই অভিমতটির পোষকতা রয়েছে জননী আয়েশার হাদিসে। তিনি বলেছেন, রসুল স. এর জামানায় তুচ্ছ বস্তু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হতো না। হাদিসটি হজরত আয়েশা থেকে হিশাম বিন ওরওয়ার মাধ্যমে আবদুর রহমান বিন সুলায়মান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং এই সূত্রে ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নিফ গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। মুরসাল সূত্রে ওরওয়া থেকে হিশাম বিন ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন ওয়াকী। আবদুর রাজ্জাকের মুসান্নিফে উল্লেখিত সূত্রটি এ রকম— ইবনে জারীহ্— হিশাম—ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্—ঈসা বিন ইউনুস হিশাম। ইবনে আদ্দির কামেল গ্রন্থে বর্ণিত সূত্রটি হচ্ছে, আবদুল্লাহ বিন কাবীছাহ্ ফাজায়ী— হিশাম বিন ওরওয়া–হজরত আয়েশা। ইবনে আদ্দি আবদুল্লাহ বিন কাবীছাহ্ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেননি। তিনি শুধু এতোটুকু বলেছেন, তাঁকে কেউ অনুসরণ করেননি। কিন্তু পূর্ব যুগের মনীষীরা তাঁর সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এই নির্দেশটি সুসাব্যস্ত যে, মুরসাল হাদিস দলিল হওয়ার উপযুক্ত। ইবনে আবী শায়বা একে মাওসুল (মিলিত) রূপে বর্ণনা করেছেন। স্বসূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন— আবদুল্লাহ্ বিন ইয়াসার বলেছেন, ওমর বিন আবদুল আজিজের দরবারে এক মুরগী চোরকে হাজির করা হলো। তিনি চোরের হাত কাটতে উদ্যত হলেন। তখন সালমা বিন আবদুর রহমান বলছেন, হজরত ওসমান জিন্নুরাইন বলেছেন, পাখি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এই সূত্রভূত এক বর্ণনাকারীর নাম জাফর জো'ফী।

ইয়াযিদ বিন হাফসা—জুহাইর বিন মোহ্ম্মদ—আবদুর রহমান বিন মাহদী সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, ওমর বিন আবদুল আজিজের দরবারে এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো। সে কয়েকটি পাখি চুরি করেছিলো। ওমর বিন আবদুল আজিজ সায়েব বিন ইয়াযিদের নিকট এ সম্পর্কে ফতোওয়া জানতে চাইলেন। সায়েব বললেন, পাখি চুরি করার অপরাধে হাত কাটা যাবে—এ কথা কখনও আমি শুনিনি। হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন।

আবু দাউদ তাঁর মারাসীল পুস্তকে জারীর বিন হাযেমের মাধ্যমে হাসান বসরী থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আহার্য চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। শায়েখ আবদুল হকও এ হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং তিনি মুরসাল হওয়া ব্যতীত হাদিসটির অন্য কোনো ক্রটি বর্ণনা করেননি। কিন্তু মুরসাল আমাদের নিকট দলিল হিসেবে গণ্য।

হজরত রাফে বিন খাদিজের হাদিসে রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। সুফিয়ান বিন উয়ায়না থেকে তিরমিজি, লাইস বিন সা'দ, নাসাঈ, ইবনে মাজা এবং লাইস ও সুফিয়ান উভয়ে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ থেকে, তিনি মুহম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন হাব্বান থেকে, তিনি তাঁর চাচা ওয়াসেয় ইবনে হাব্বান থেকে— বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যদি কোনো বর্ণনা মুনকাতে এবং মাউসুল হওয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তবে সেটিকে মাউসুল করে দেয়াই উত্তম। কেননা, মাউসুলের মধ্যে অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং সিকাহ্ বর্ণনাকারীদের নিকট তা গ্রহণীয়।

তাহাবী লিখেছেন, হাদিসটিকে সকল উম্মত গ্রহণ করেছেন। আলেমগণ লিখেছেন, এই হাদিসের 'ছামারাত' শব্দটির অর্থ ওই ফল যা বৃক্ষসংযুক্ত থাকে। অরক্ষিত অবস্থায় ওই ফল কেউ গ্রহণ করলে তার হাত কাটা যাবে না। আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতামহ হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স. বললেন, বৃক্ষের ফল ছিঁড়ে কেউ যদি খেয়ে ফেলে (ঝুলির মধ্যে করে নিয়ে না যায়) তবে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু ওই ফল পেড়ে কেউ যদি অন্যত্র নিয়ে যায়, তবে তাকে দিতে হবে দ্বিগুণ জরিমানা। বৃক্ষ থেকে পাড়া ফল কোথাও শুকাতে দিলে সেখান থেকে যদি কেউ ফল চুরি করে, তবে ওই চুরি করা ফল যদি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। আবু দাউদ এই হাদিসটি লিখেছেন— ইবনে ওজলান, ওলিদ বিন কাসীর, ওবায়দুল্লাহ্ বিন আখনাস এবং মোহাম্মদ বিন ইসহাকের মাধ্যমে এবং এই চারজন বর্ণনা করেছেন আমর বিন শোয়াইবের মাধ্যমে। ইমাম নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এই সূত্রে, ওহাব—আমর বিন হারেস—হিশাম বিন সায়াদ—আমর বিন শোয়াইব। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, কাবিলায়ে মুজাইনার এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট ওই সকল বকরি চুরি সম্পর্কে বিধান জানতে চাইলেন, যেগুলো রাতে গৃহে ফিরে আসতো না, চারণভূমিতেই থেকে যেতো। রসুল স. বললেন, ওখান থেকে চুরি করলে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে এবং চোরকে প্রহার করতে হবে এমনভাবে যাতে তা অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। আর গৃহস্থের বসতবাটী থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তার মূল্য হতে হবে ঢালের মূল্যের সমান্তরাল।

একবার সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই সকল ফল সম্পর্কে কী হুকুম, যা ঘরে রাখা হয়েছে। তিনি স. বললেন, যদি ফল কেউ খেয়ে ফেলে, পুটলী বেঁধে না নিয়ে যায় তবে তার উপর কোনো জরিমানা ও শাস্তি নেই। আর কেউ যদি ওই ফল বেঁধে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়, তবে তাকে দিতে হবে দ্বিগুণ মূল্য। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে তাকে মারপিটও করতে হবে। আর ফল শুকাবার স্থান থেকে ফল অপহরণ করলে তার উপর হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আহমদ, নাসাঈ।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, বৃক্ষসংলগ্ন ফল ছিঁড়ে নিয়ে গেলে কী হুকুম? তিনি স. বললেন, গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে নিলে হাত কাটার শাস্তি নেই। কিন্তু ফল শুকাবার স্থান থেকে ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে। ঢালের মূল্যের চেয়ে কম হলে দিতে হবে দ্বিগুণ জরিমানা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে পেতে হবে প্রহার। হাকেমও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমাদের ইমাম ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্র অভিমত এই যে, আমর বিন শোয়াইবের হাদিস বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হোন, তবে তাকে গ্রহণ করতেই হবে। যেমন আইয়ুব, নাফে, ইবনে ওমর, ইবনে আবী শায়বা এই হাদিসকে সংযুক্ত করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমরের সঙ্গে। অর্থাৎ হাদিসটিকে তারা মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বলেছেন, ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না— যদি না তা ফল শুকানোর স্থান থেকে অপহরণ করা হয়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, সুসংরক্ষিত স্থানের ফল চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব হবে। বর্ণিত হাদিসটি তাঁদের অভিমতের অনুকূল। হজরত ওসমানের হাদিসেও তাঁদের অভিমতের পোষকতা রয়েছে, যে হাদিসটি ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা'য় লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদিসটি এই— হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় একজনের কিছু ফল চুরি হলো। হজরত ওসমান ফলের মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন। মূল্য নিরুপিত হলো তিন দিরহাম এবং সিদ্ধান্ত হলো, এক দিনার অথবা বারো দিরহাম চুরি করলে চোরের হাত কেটে দিতে হবে। ইমাম মালেক ফল বলতে ওই সাধারণ ফলকে বুঝিয়েছেন, যা মানুষ ভক্ষণ করে থাকে। হানাফীগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনাটির জবাব দান করেছেন। যেমন— ১. বর্ণিত হাদিসটির বক্তব্য কোরআনের আয়াতের প্রতিকূল। তাই এ হাদিসের উপরে আমল করা যাবে না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'তারা তোমাদের প্রতি যতোটুকু সীমাতিক্রম করেছে তোমরাও ততোদূর করো।' কিন্তু বর্ণিত হাদিসে ফল ও চারণভূমির বকরি চোরের দ্বিগুণ জরিমানার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই হাদিসের উপর আমল না করাই ওয়াজিব। ২. বর্ণিত হাদিস দু'টোর মধ্যে রয়েছে মতবিরোধ। এক হাদিসে এসেছে— ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এটি একটি সাধারণ হুকুম। তাই ফল শুকানোর স্থান থেকে নিলে অথবা বাগানে পড়ে থাকা ফল নিলে হাত কাটা না যাওয়াই উচিত। কিন্তু অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, সংরক্ষিত স্থান থেকে এবং ফল শুকানোর স্থান থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে— ভেজা ফল চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি নেই, কিন্তু শুকনো ফল চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব। অথবা হাত না কাটাকে কাটার উপর অগ্রাধিকার দিতে হয় (শুষ্ক ও ভেজা কোনো প্রকার ফল চুরির জন্য হাত কাটা ওয়াজিব করে দেয়া যাবে না)। এ রকম করলে আবার হুদুদকে রহিত করে দেয়া হবে। যে খাদ্য চুরির জন্য হাত কাটা যাবে না বলা হয়েছে, তা হচ্ছে ওই খাদ্য— যা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

কেননা, আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, গম এবং শুষ্ক ফল চুরি হাত কাটাকে ওয়াজিব করে। এই নিয়মে চিনি চুরি করলেও হাত কাটা যাবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কারণ, এ ধরনের চুরি সাধারণতঃ জীবন রক্ষার জন্য করা হয়।

রসুল স. বলেছেন, ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে চুরি করলে হাত কাটার হুকুম নেই। হজরত ওমর বলেছেন, দুর্ভিক্ষের সময় হাত কাটা যাবে না (তখন মানুষ চুরি করে জীবন বাঁচানোর জন্য)।

মাসআলাঃ প্রথম চুরির শাস্তিস্বরূপ ডান হাত কাটার পর যদি কেউ দ্বিতীয়বার চুরি করে অথবা কোনো কারণে কারো প্রথমে ডান হাত কাটা থাকে তবে দ্বিতীয় চুরির জন্য চোরের বাম পা কাটা যাবে। এটা ঐকমত্য। বাম পা কাটার হুকুম কিন্তু এ আয়াতে নেই। আয়াতে কেবল বলা হয়েছে হাত কাটার কথা। হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাত অনুসারে কাটতে হবে ডান হাত। প্রথম চুরির শাস্তি হিসেবে ডান হাত কাটা পড়লে দ্বিতীয় চুরির শাস্তি হিসেবে তাহলে কোন হাত কাটতে হবে? এ সম্পর্কে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত এই যে, এক্ষেত্রে হাত নয়, কাটতে হবে চোরের বাম পা।

আগে থেকেই যদি চোরের ডান হাত ও বাম পা কাটা হয়ে থাকে অথবা দুই বার চুরির কারণে প্রথমবার ডান হাত এবং দ্বিতীয়বার বাম পা কাটা থাকে তবে এই ব্যক্তি তৃতীয়বার চুরি করলে হাত কিংবা পা কাটার শাস্তি তাকে দেয়াই যাবে না। তাকে বন্দী করতে হবে জেলখানায়। ইমাম আজম এবং ইমাম আহমদ এ রকম বলেছেন।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত এবং চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে দিতে হবে। পঞ্চমবার চুরি করলে তাকে জেলখানায় বন্দী করতে হবে। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদ এ রকম অভিমত পোষণ করেছেন।

আতা, হজরত আমর বিন আস, ওমর বিন আবদুল আজিজ এবং হজরত ওসমান বলেছেন, পঞ্চমবার চুরি করলে চোরকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী তাদের অভিমত প্রমাণার্থে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্র হাদিসটিকে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. এর দরবারে এক চোরকে উপস্থিত করা হলো। তিনি স. তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। কিছু দিন পর সে আবার চুরি করলো। রসুল স. তখন তার দ্বিতীয় হাতটি কাটার নির্দেশ দিলেন। আবারও সে চুরি করলো। তখন রসুল স. কেটে দিতে বললেন তার দ্বিতীয় পা। পঞ্চমবার চুরি করার পর রসুল স. তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। দারা কুতনী। এই হাদিসের বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত মোহাম্মদ বিন ইয়াযিদ বিন সেনান দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত।

আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, এক চোরকে রসুল স. সকাশে উপস্থিত করা হলো। তিনি স. বললেন, ওকে হত্যা করো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সেতো চুরি করেছে। রসুল স. বললেন, হাত কেটে

দাও। নির্দেশ মোতাবেক তার হাত কাটা হলো। দ্বিতীয়বার চুরির অপরাধে পুনরায় তাকে উপস্থিত করা হলো রসুল স. এর নিকটে। তিনি স. বললেন, তাকে হত্যা করো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, সেতো চুরি করেছে। তখন রসুল স. বললেন, তার বাম পা কর্তন করো। লোকটি তৃতীয়বারও চুরি করলো। তাকে ধরে এনে রসুল স. এর সামনে হাজির করা হলে তিনি স. বললেন, তাকে হত্যা করে ফেলো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল, সেতো চুরি করেছে। রসুল স. বললেন, তার দ্বিতীয় হাতটি কর্তন করো। যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। চতুর্থবারও সে চুরি করে ধরা পড়লো। রসুল স. এর দরবারে তাকে হাজিরও করা হলো। তিনি স. বললেন, তাকে হত্যা করো। সাহাবীগণ বললেন, সেতো চোর। তিনি স. বললেন, দ্বিতীয় পা কেটে দাও। তাই করা হলো। পঞ্চমবারও তাকে চুরির অভিযোগে হাজির করা হলো রসুল স. এর দরবারে। তিনি স. নির্দেশ দিলেন, হত্যা করো। হজরত জাবের শেষে বর্ণনা করেছেন, আমরা তাকে উটের আস্তাবলে নিয়ে গেলাম এবং তাকে সেখানে চিৎ করে শুইয়ে হত্যা করলাম। তারপর তার লাশ টেনে নিয়ে একটি কূপে ফেলে দিলাম এবং তার উপর চাপা দিলাম পাথর। এই হাদিসের বর্ণনাকারী মুসআব বিন সাবেতকে ইমাম নাসাঈ বলেছেন দুর্বল।

চোরকে হত্যা করা সম্পর্কিত একটি হাদিস হারেস বিন হাতেব জাহাবীর মাধ্যমে নাসাঈ এবং আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদের মাধ্যমে হাকেম বর্ণনা করেছেন। আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া নামক পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনে আবদুল বার লিখেছেন, চোরকে হত্যা করার হাদিসটি মুনকার —যার কোনো মূল্য নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাদিসটি রহিত হয়ে গিয়েছে। আর এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। ইবনে আবদুল বার আরও বলেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজরত ওসমান এবং ওমর বিন আবদুল আজিজ সম্পর্কে আবু মোসায়াবের বর্ণনাটি ভুল। কারণ, বর্ণনাটির কোনো মূল্য নেই। আর বর্ণনাটি ঐকমত্যবিরোধীও।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। পুনরায় চুরি করলে জোড়া পর্যন্ত পা কেটে দাও। আবার চুরি করলে কেটে দাও দ্বিতীয় হাত। পুনরায় চুরি করলে কেটে দাও তার দ্বিতীয় পা। দারা কুতনী। এই সূত্রভূত বর্ণনাকারী ওয়াকেদীকে অসত্যভাষী আখ্যা দিয়েছেন ইমাম আহমদ। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসটি ভিন্ন সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং আসমা বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও বায়হাকী। কিন্তু সূত্রটি শিথিল। দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার সম্মুখেই হজরত ওমর বিন খাত্তাব একে একে চোরের হাত, পা এবং অন্য হাত কেটে দিয়েছেন। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা'য় আবদুর রহমান বিন কাসেমের মাধ্যমে, কাসেম থেকে বর্ণনা করেছেন, ইয়ামেনের এক হাত ও এক পা কাটা এক লোক হজরত আবু

বকরের নিকট এসে বললো, ইয়ামেনের প্রশাসক আমার উপর জুলুম করেছে। লোকটি রাত্রি জেগে নামাজ পড়তো। হজরত আবু বকর বললেন, তোমার পিতার শপথ! তোমার রাত তো চুরির রাত নয়, ইবাদতের রাত। কিছুদিন পর হজরত আবু বকরের স্ত্রীর গলার হার হারিয়ে গেলো। সকলে হার অনুসন্ধান করতে শুরু করলো। ইয়ামেনের লোকটিও হারের খোঁজ করতে লাগলো এবং দোয়া করলো, হে আল্লাহ্! যে লোক এই পুণ্যবান ঘরে রাতে চুরি করেছে তাকে বন্দী করে দেয়ার দায়িত্ব তোমার উপরেই অর্পণ করলাম। খুঁজতে খুঁজতে অলংকারটি পাওয়া গেলো স্বর্ণকারের কাছে। স্বর্ণকার বললো, ওই হাত কাটা লোকটির কাছ থেকেই সে অলংকারটি পেয়েছে। তখন হজরত আবু বকর লোকটির বাম হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ প্রতিপালিতও হলো। হজরত আবু বকর বললেন, লোকটির দোয়া তার চুরির চেয়ে তাকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ বর্ণনাসূত্রের এক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে। বর্ণনাটি এনেছেন আবদুর রাজ্জাক।

ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন, জুহুরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা বলেছেন, যে ব্যক্তি হজরত আবু বকরের সহধর্মিনীর অলংকার চুরি করেছিলো, তার ডান হাত ছিলো কর্তিত। তাই হজরত আবু বকর তার বাম পা কেটে দিয়েছিলেন। ইমাম মোহাম্মদ আরো বলেছেন, এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম জুহুরী অন্যদের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন।

আমাদের দলিল ওই হাদিসটি— যা ইমাম মোহাম্মদ কিতাবুল আসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা আমরের মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ বিন সালমা থেকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, কেউ যদি চুরি করে তবে আমি তার ডান হাত কেটে দেবো। দ্বিতীয়বার চুরি করলে কাটবো বাম পা। এরপর চুরি করলে আমি তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখবো যাতে সে সৎকর্মশীল হওয়ার সুযোগ পায়। আল্লাহ্পাকের দরবারে আমি এই ভেবে লজ্জিত যে, আমি তাকে এমন অবস্থায় ফেলবো, যাতে করে তার নিকট পানাহার শৌচকর্ম এবং চলাফেরা করার মতো কোনো অঙ্গ থাকবে না।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নিফে লিখেছেন, হজরত জাবের থেকে মুয়াম্মারের মাধ্যমে শায়বী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী প্রথম চুরির জন্য এক হাত এবং দ্বিতীয় চুরির জন্য এক পা কাটতেন। তৃতীয়বার চুরি করলে তাকে বন্দী করতেন জেলখানায় এবং বলতেন, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ্কে লজ্জা করি (হাদিসের শেষ পর্যন্ত)।

ইবনে আবী শায়বা মুসান্নিফ গ্রন্থে হজরত আলীর আমল এবং নির্দেশ ইমাম জয়নাল আবেদীন, ইমাম জাফর, হাতেম বিন ইসমাইল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন সালমা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলীর দরবারে এক চোরকে ধরে আনা হলো। তিনি তার হাত কেটে দিলেন। পুনরায় তাকে চুরির অপরাধে ধরে আনা হলে তখন তিনি কেটে দিলেন তার পা। তৃতীয়বারও তাকে চুরির অপরাধে পাকড়াও করে আনা হলো। তখন তিনি

বললেন, আমি কি তার দ্বিতীয় হাতটিও কেটে দেব? তবে সে শৌচকর্ম সমাধা করবে কীভাবে। পানাহারই বা করবে কেমন করে। দ্বিতীয় পা যদি কেটে দেই তবে সে কিসের উপর ভর করে চলবে। আমি আল্লাহ্পাকের নিকট লজ্জিত— এ কথা বলে তিনি চোরকে কিছু প্রহার করলেন এবং জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

তানকীহে আবদুল হাদীর মধ্যে রয়েছে, আবু সাঈদ মাকবারী বলেছেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হজরত আলীর দরবারে ওই লোকটিকে উপস্থিত করা হলো। তার এক হাত ও এক পা ছিলো কাটা। এরপরেও সে চুরি করেছিলো। হজরত আলী উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন, এর বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী? তাঁরা বললেন, হাত কেটে দিন। হজরত আলী বললেন, তবে তো আমি তাকে হত্যাই করলাম। এ রকম করলে সে পানাহার করবে কীভাবে? নামাজের জন্য ওজু করবে কোন অঙ্গ দিয়ে। ফরজ গোসলই বা করবে কীভাবে। কীভাবে মেটাবে অন্যান্য প্রয়োজন। এ কথা বলে হজরত আলী তাকে কিছু দিনের জন্য জেলে পাঠালেন। কিছু দিন পর সেখান থেকে তাকে বের করে এনে পুনরায় সাহাবীগণের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন। তাঁরা আগের মতই হাত কাটার পরামর্শ দিলেন। হজরত আলীও উচ্চারণ করলেন আগের কথাগুলো। এরপর তাকে কঠোর শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

আবদুর রহমান বিন আমের—সিমাক বিন হারব—আবুল আহ্ওয়াস—আবু সাঈদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবদুর রহমান বলেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাবের দরবারে এক লোককে উপস্থিত করা হলো যার এক হাত এবং এক পা ছিলো কাটা। সে পুনরায় চুরি করেছিলো। হজরত ওমর তার পা কাটার নির্দেশ দিলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত আলী বললেন, আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে......।' আপনি তো চুরির দায়ে ইতোপূর্বে তার এক হাত ও এক পা কেটে দিয়েছেন, এখন অপর পাটি কেটে ফেললে সে তো হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিরহিত। আপনি বরং তাকে অন্য শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিতে পরেন। এ কথা শুনে হজরত ওমর চোরটিকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন। বায়হাকী।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নিফে সিমাক বিন হারব সূত্রে লিখেছেন, হজরত ওমর ওই চোর সম্পর্কে সাহাবীগণের পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা সকলে তখন হজরত আলীর অভিমতটিকে সমর্থন জানালেন।

মাকহুলের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। আবার চুরি করলে কেটে দাও পা। এরপরও যদি সে চুরি করে তবে তার দ্বিতীয় হাতটি আর কেটো না। কারণ, ওই হাত দিয়ে সে পানাহার করবে এবং শৌচকর্ম সমাধান করবে। কিন্তু ওই চোরকে মুসলমানদের বসতি থেকে দূরে কোথাও বন্দী করে রাখো (যাতে মুসলমানদের মধ্যে সে কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে)।

ইবনে শায়বা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও তাঁর বক্তব্যে হজরত আলীর অভিমতকে সমর্থন করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজরত আলীর সিদ্ধান্তের উপরেই ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। এবং হজরত ওমরও তাঁর কথা মেনে নিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী যে প্রমাণ পেশ করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই। অথবা বর্ণনাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। সাহাবীগণ যদি জানতেন, হজরত আলী রসুল স. এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁরা হজরত আলীকে সমর্থন করতেন না। আর হজরত আলীও এমন বলতেন না যে, আল্লাহ্র নিকট আমি লজ্জাবোধ করি। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন—আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে শৈথিল্য যেনো না হয়।

হজরত আলীর নিদের্শানুসারে এ রকম মাসআলাও এসেছে যে, যে ব্যক্তির বাম হাত অথবা বাম হাতের আঙ্গুল কিংবা বাম পা কাটা অথবা শুষ্ক, সে প্রথমবার চুরি করলে তার বাম হাতই কাটতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হবে হত্যাতুল্য শাস্তি। কাজেই, তার উপর আর হত্যার শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। আল্লাহ্পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

মাসআলাঃ হস্ত কর্তনের পর দাগ লাগিয়ে দিতে হবে, যাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ীর মতে দাগ দেয়া মোস্তাহাব। হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এর দরবারে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, সে চাদর চুরি করেছিলো। রসুল স. বললেন, আমার মনে হয় সে চুরি করেনি। চোর বললো, কেনো নয় (নিশ্চয়ই আমি চুরি করেছি)। রসুল স. নির্দেশ করলেন ওকে নিয়ে যাও এবং হাত কেটে দাও। তারপর দাগ লাগিয়ে দাও, তারপর আমার কাছে নিয়ে এসো। নির্দেশের যথাপ্রতিপালনের পর পুনরায় তাকে উপস্থিত করা হলো রসুল স. এর দরবারে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র নিকট তওবা করো। লোকটি বললো, আমি আল্লাহ্র নিকট তওবা করছি। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, তিনি তোমার তওবা কবুল করেছেন এবং তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন রহমত। হাকেম বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুসারে হাদিসটি বিশুদ্ধ। আবু দাউদ তাঁর মারাসীল পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কাশেম বিন সালাম বলেছেন, হাদিসটি গরীব। দারা কুতনী বলেছেন মাওকুফ। তাঁর বর্ণনায় এ কথাটিও রয়েছে—হজরত আলী তার হাত জোড়া থেকে কেটে দিয়েছিলেন। তারপর দাগ দিয়েছিলেন।

মাসআলাঃ ইমাম আজম, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে— চোর একবার চুরির কথা স্বীকার করলেই তার হাত কাটা ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইবনে আবী লায়লা, জোফার এবং ইবনে শুবরামার অভিমত হচ্ছে— চোর দু'বার চুরির স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত তার হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ

বলেছেন, দু'বার স্বীকৃতি দিতে হবে দু'টি মজলিশে। তিনি দলিল পেশ করেছেন—
— হজরত আবু উমাইয়া মাখজুমীর বর্ণনা থেকে। একটু আগেই বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বললেন, আমার মনে হয় তুমি চুরি করোনি। চোর বললো, কেনো নয় (নিশ্চয়ই আমি চুরি করেছি)। রসুল স. 'আমার মনে হয় তুমি চুরি করোনি'—এ কথা দুই অথবা তিনবার বললেন। চোরও বার বার একই কথা উচ্চারণ করলো। তখন তিনি স. হাত কাটার হুকুম দিলেন। লক্ষ্যণীয় যে, তিনি স. হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন পুনঃপুনঃ স্বীকৃতি দানের পর। পুনঃপুনঃ স্বীকৃতি দানের পূর্বে তিনি হস্ত কর্তনের হুকুম দেননি।

স্বসূত্রে তাহাবী লিখেছেন, হজরত আলীর সামনে এক ব্যক্তি দুইবার তার চুরি করার কথা স্বীকার করলো। তিনি বললেন, তুমি নিজেই তোমার বিরুদ্ধে দু'বার সাক্ষ্য দিয়েছো। এ কথা বলে তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং কর্তিত হাত ঝুলিয়ে দিতে বললেন তার গলায়।

চুরি ও ব্যভিচারঃ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ব্যভিচারীর একাধিক স্বীকৃতি জরুরী। একাধিক স্বীকৃতি স্বাক্ষীদের স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া হয়েছে। তবে কি ব্যভিচারের সঙ্গে তুলনা করে চুরির ক্ষেত্রেও একাধিক স্বীকৃতিকে জরুরী বলা হয়েছে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আবু উমাইয়া মাখজুমীর বর্ণনা সম্পর্কে খাত্তাবী লিখেছেন, তাঁর বর্ণনা সূত্রে কিছু অতিরিক্ত কথা রয়েছে। খাত্তাবী এ কথাও বলেছেন যে, বর্ণনাসূত্রে অপরিচিত কোনো বর্ণনাকারী থাকলে তা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং ওই বর্ণনানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব নয়। ব্যভিচার ও চুরি তো দু'টি পৃথক অপরাধ। ব্যভিচারের জন্য সাক্ষীদের সংখ্যা একটি জরুরী বিষয়। কারণ, সেখানে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। সম্ভবতঃ সাক্ষ্যদাতা মিথ্যা বললে অপরাধী যদি নিজেই তার অপরাধের স্বীকৃতি দেয়, তবে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। (এ রকম ধারণাও করা যায় না যে, চোর একবার মিথ্যা বলবে, পরক্ষণেই তা স্বীকার করে নেবে)।

ব্যভিচারের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির সংখ্যাধিক্য জরুরী এ জন্যে যে, কোরআন একে জরুরী করে দিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো সুযোগ নেই। ব্যভিচারকে মিথ্যার শাস্তি এবং কিসাসের সঙ্গে তুলনা করা যায় না (মিথ্যার শাস্তি এবং কিসাসের ক্ষেত্রে স্বীকৃতির সংখ্যাধিক্য যেমন জরুরী নয়, তেমনি চুরির ক্ষেত্রেও জরুরী নয়)। ইমাম আজমের অভিমতের প্রমাণ রয়েছে হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. শুধু একবার স্বীকারোক্তি শুনে চোরের হাত কেটে দিয়েছেন এবং হাত কাটার পর দাগ দিয়েছেন।

'যাযাআম বিমা কাসাবা নাকালাম মিনাল্লাহ্'—এ কথার অর্থ, এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত আদর্শদণ্ড। বাক্যটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি কঠোর সাবধানবাণী। 'যাযাআ' এবং 'নাকালাম' এখানে যথাক্রমে হেতু নির্দেশক কর্ম এবং সাধারণ কর্মকারক। বাগবী শব্দ দু'টোকে কর্তৃকারক বিশেষ্য

অর্থে প্রকাশ করেছেন। 'ফাক্বতাউ' (হস্তচ্ছেদন) এখানে অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ। মাদারেক রচয়িতা 'যাযাআন' (বিনিময়) এর সর্বনামকে হেতু নির্দেশক কর্ম এবং 'নাকালান' (আদর্শ দণ্ড) এর স্থলবর্তী করে দিয়েছেন।

কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'নাকালা' ও 'তানকিলা' অর্থ এমন কাজ যা অন্যের জন্য আদর্শ বা দৃষ্টান্ত হয়। আল্লামা তাফতাজানী লিখেছেন, এখানে 'নাকালান' শব্দটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, হস্তচ্ছেদন যেনো এমন দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়, যাতে করে অপরাধী নিজে ও অন্যেরা এধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। আমি বলি, নিশ্চয়তার ভিত্তি হিসেবে এটাই উপযুক্ত যে— 'কৃতকর্মের ফল' এবং 'হস্তচ্ছেদন' কে হেতুনির্দেশক কর্ম বলা যাবে। আর 'আদর্শ দণ্ড'কে করে দিতে হবে 'কৃতকর্মের ফল' এর কারণ। কোনো কোনো বিশ্লেষণকারী বলেছেন, পৃথকভাবে 'আদর্শ দণ্ড' এবং 'কৃতকর্মের ফল' উল্লেখ করে উভয়টিকে হস্তচ্ছেদনের কারণ করা হয়েছে। 'কৃতকর্মের ফল' শব্দটি বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং 'আদর্শদণ্ড' সম্পৃক্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে। এ দু'টোর সম্মিলিত কারণ হচ্ছে হস্তচ্ছেদন।

মাসআলাঃ ইমামে আজম বলেছেন, হস্তচ্ছেদন করলে চুরি করা মালের ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ চুরি করা মাল তার মালিককে ফেরৎ দেয়া তখন তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না (যদি ওই মাল নষ্ট হয়ে যায় অথবা নষ্ট করে দেয়া হয়)। অন্য তিন ইমাম বলেছেন, হাত কাটা হলেও চোরাই মালের জরিমানা রহিত হবে না। হস্তচ্ছেদন ও জরিমানা দু'টোই এক সঙ্গে কার্যকর করতে হবে। চুরির মাল যদি চোরের নিকট মওজুদ থাকে (নষ্ট না হয়) তবে তা মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে—হাত কাটার আগে হোক বা পরে। এই অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। কিন্তু চোরাই মাল নষ্ট হয়ে গেলে অথবা খরচ করে ফেললেও তিন ইমামের মতে জরিমানা দিতে হবে।

চুরিকৃত সম্পদের দণ্ডস্বরূপ—হস্তকর্তনের পর চুরিকৃত সম্পদ ফেরৎ দেয়া হলো মালিককে। সে সম্পদ পুনরায় চুরি করলো চোর। এ চুরির প্রতিবিধানে পুনরায় চোরের হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, প্রথম চুরির দণ্ড বিধানের পর ওই সম্পদের সংরক্ষণযোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। অন্য ইমামত্রয়ের মতে হস্তকর্তন করতে হবে। কারণ, সম্পদের সংরক্ষণযোগ্যতা রহিত হয়নি।

ইমাম আবু হানিফার দলিলসমূহঃ

১. আলোচ্য আয়াতে শাস্তির স্থলে 'জাযা' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। শাস্তির স্থলে জাযার উল্লেখ করা হয় তখনই, যখন আল্লাহ্‌পাকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়; এবং তার প্রতিবিধানে শাস্তি নির্ধারিত হয়। অনুরূপ আল্লাহ্‌র অধিকারে হস্তক্ষেপ করার পরিণামে 'নাকাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। তাহলে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে নিছক আল্লাহ্‌র অধিকারের ক্ষেত্রে। তাই হাত

কাটাও আল্লাহ্‌র অধিকারভূত। আল্লাহ্‌র অধিকারে অপরাধ তখনই বিযুক্ত হয়, যখন অপরাধক্ষেত্র সত্তাগতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ থাকে। যেমন সত্তাগত হারামের কারণে মদ্য নিষিদ্ধ। জাযা অর্থ পুরোপুরি বা যথেষ্ট। চুরির প্রতিবিধানে জাযা অর্থ উল্লেখ হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, শাস্তি পুরোপুরি দেয়া হয়েছে। আর শাস্তির পূর্ণত্ব তখনই অর্জিত হয়েছে যখন চুরিকৃত বস্তু সত্তাগতরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ। চুরিকৃত বস্তু যদি সত্তাগত হারাম হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের পর সে বস্তুর সংরক্ষণযোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। যেমন, চুরিকৃত মদ্য ও শুকর বিনষ্ট হওয়ার পর তার বিনিময়ে জরিমানা বিধিবদ্ধ হয় না।

২. যদি হস্ত কর্তনের পর জরিমানা বিধিবদ্ধ করা হয়, তবে জরিমানা আদায় করার পর চুরিকৃত বস্তু চোরের অধিকারে আসে। পুনরায় চুরি করলে তো সে নিজের সম্পদই চুরি করেছে। তবে হাত কাটার প্রশ্ন উঠবে কেনো?

৩. হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ডান হাত কাটার পর চোরের উপর সম্পদগত ক্ষতিপূরণ (মালি জরিমানা) নেই। দারা কুতনী। নাসাঈর বর্ণনাটি এ রকম— চোরের উপর হদ প্রয়োগ করলে তাকে আর অন্য শাস্তি দিতে হবে না। বায্যারের বর্ণনায় রয়েছে, শাস্তি কার্যকর করার পর চোর তার চোরাই মালের জন্য দায়ী হবে না। এই বর্ণনাটি এনেছেন সাঈদ বিন ইব্রাহিম তাঁর ভাই মাসওয়ার বিন ইব্রাহিম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ থেকে—তিনি তাঁর পিতামহ হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন। দারা কুতনী বলেছেন, সাঈদ বিন ইব্রাহিম অপরিচিত এবং মাসওয়ার হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের কোনো বর্ণনা উল্লেখ করেননি। পদ্ধতিগত দিক থেকে বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, সাঈদ বিন ইব্রাহিম জুহরী ছিলেন মদীনার কাযী। বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য।

শাফেয়ীগণ হানাফীগণের দলিলের জবাব দিয়েছেন এভাবেঃ

১. জাযা হচ্ছে পূর্ণ শাস্তির দাবিদার। পূর্ণ অপরাধ হলো— আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক যুগপৎ বিনষ্ট করা। আমরা এ-ও মেনে নিতে পারি যে, হস্ত কর্তন নিছক আল্লাহ্‌র হক। এর থেকে অপরাধের ক্ষেত্র সত্তাগতভাবে হারাম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয় না। নিশ্চিত হয় না জরিমানাও। হস্ত কর্তন শরিয়তের বিধান। চোর শরিয়ত লংঘন করাতে তার উপর প্রযোজ্য হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হস্ত কর্তনের বিধান। কারণ, চোর এমন সম্পদে হস্তক্ষেপ করেছে যাতে সংরক্ষিত রয়েছে অন্যের অধিকার। যেমন এহরামধারী ব্যক্তি কারো অধিকারভুক্ত জন্তু শিকার করলে সেই জন্তুর জরিমানা তো দিতেই হবে, উপরোক্ত কোরবানীও অবধারিত হবে তার উপর। আমরাও অপরাধের ক্ষেত্র নিষিদ্ধ মেনে নিয়েছি। কিন্তু এ নিষিদ্ধতা সত্ত্বাগত নয় —বিধানগত। যদি সত্তাগত হতো তবে হস্ত কর্তনের পর চুরিকৃত সম্পদ ফেরত দিতে হতো না। সম্পদ যদি বর্তমান থাকে তাহলে এ

সম্পদ মালিকের জন্য হালাল হবে না। কাজেই অপরাধের ক্ষেত্র সত্তাগত নয় বরং বিধানগত। আবার সত্তাগত নিষিদ্ধতা মেনে নিলে হাত কাটার পর মওজুদ সম্পদ মালিক ফেরত নিতে পারবে না। এ সম্পদ তার জন্য হালাল হবে না। যেহেতু সম্পদ চুরির প্রতিবিধানে কাটা হয়েছে চোরের হাত তাহলে মালিক তার সম্পদ ফেরত নিবে কিভাবে? আর যদি চুরিকৃত সম্পদ মদ্য বা মৃতের মতো সত্তাগত হারাম ধরে নেয়া যায় তাহলে মদ্য বা মৃত বস্তু চুরির প্রতি বিধানে যেমন ওয়াজিব হবে না হস্ত কর্তন, তেমনি কোনো সম্পদের চুরিতেও কাটা যাবে না চোরের হাত। এতে প্রমাণিত হয় যে, চুরিকৃত সম্পদ সত্তাগতরূপে হারাম নয়

চুরিকৃত সম্পদ সত্তাগত হারাম নয় । আপত্তিকর দিকটি হচ্ছে এ রকম—যদি দুই অথবা তিন ধরনের হারাম মিশ্রিত হয়, যেমন—রমজান মাসের রোজা অবস্থায় কোনো জিম্মির কৃতদাস মদ্য পান করেছে অথবা রোজা অবস্থায় অপরের দাসীর সাথে ব্যভিচার করেছে। একে তো রোজা, তদুপরি অন্যের দাসী, পরিশেষে, ব্যভিচারের অপরাধ; তাও আবার জিম্মির দাসী। এক্ষেত্রে প্রতিবিধান কী হবে?

শাফেয়ীদের পক্ষ থেকে হানাফিগণের দ্বিতীয় দলিলের জবাব দেয়া যেতে পারে এভাবে—চুরিকৃত বস্তুর জরিমানা আদায়ের পর ওই বস্তুর মালিক হয়ে যায় চোর। তা কেমন করে হয়? কারণ সম্পদ বিনষ্ট করলে বা করালে প্রশ্ন আসে জরিমানার। তখন তো সম্পদ বর্তমানই থাকে না। সেখানে মালিকানা আবার কিসের?

হানাফিগণের তৃতীয় দলিলের জবাব দেয়া যায় এভাবে—তাদের পেশকৃত দলিল দুর্বল। যদি বিশুদ্ধ হিসেবে মেনেও নেয়া যায়, তবে কোরআনের আয়াত 'ফা'তাদু আলাইহি বিমিসলি মা'তাদা আলাইকুম' (তোমরা তাদের প্রতি তেমনিই সীমা অতিক্রম করো, যেমন সীমা অতিক্রম করেছে তারা) এর প্রতিকূলে দাঁড়ায় আলোচ্য হাদিসগুলো। উপরোক্ত শাফেয়ীগণ জরিমানার অপরিহার্যতার সমর্থনে পেশ করেন এই হাদিসটি— রসুল স. এরশাদ করেন— চোরের উপর দায়িত্ব হলো সে যা হস্তগত করেছে তা প্রত্যার্পণ করা। প্রয়োজনে ক্রয় করে দিবে। আহমদ, বিশুদ্ধ সনদসহ সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়, হাকেম।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু আযিযুন হাকিম'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তাঁর হুকুমের মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই। আর তাঁর প্রতিটি হুকুম হেকমতময়।

আহমদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বলেছেন, রসুল স. এর জমানায় এক মহিলা চুরি করলো। তার ডান হাত কেটে দেয়া হলো। মহিলাটি তখন নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার তওবা কবুল হবে কি? রসুল স. বললেন, অদ্যকার তওবা দ্বারা তুমি এমনভাবে পাপমুক্ত হয়ে যাবে যেমন ছিলে জন্মগ্রহণের দিন। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

❒ কিন্তু সীমালংঘন করার পর কেহ তওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ তুমি কি জান না যে. আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই; যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

তওবা অর্থ কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার অঙ্গীকার করা। নিজেকে সংশোধন করার অর্থ আপন আমলকে বিশুদ্ধ করে নেয়া। তওবার আরেক অর্থ ফিরে আসা (পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করা)। তওবার পর 'আলা' শব্দ এলে এবং আল্লাহ্র সঙ্গে তওবার সম্পর্ক করা হলে এর অর্থ হবে তওবা কবুল হওয়া। যেমন 'ইয়াতুবু আলাইহি'। যতো পাপই করা হোক না কেনো খাঁটি তওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্পাক তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিবেন। পরকালে তাকে শাস্তি দিবেন না। সে কথাই আয়াতে পরিষ্কার রূপে বলে দেয়া হয়েছে।

তওবা করলে কি পৃথিবীর শাস্তি রহিত হয়ে যায়? এর উত্তরে ইমাম আহমদ বলেছেন, তওবা করলে সকল প্রকার পার্থিব শাস্তি (হদ্দে শরয়ী) রহিত হয়ে যায়। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে কোরআনের এমন একটি আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, যেখানে তওবা কবুল হওয়ার কোনো শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া অন্য একটি আয়াতে রয়েছে 'এবং তোমাদের মধ্যে যে দু'জন, অর্থাৎ নারী ও পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান করো। অতঃপর যদি তারা তওবা করে এবং তাদের কর্মধারাকে পরিবর্তন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।' রসুল স. এরশাদ করেছেন, পাপ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এই যে, তওবা করার পর এক বৎসর অতিবাহিত হলে হদ বা শাস্তি রহিত হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, তওবা করলেও পৃথিবীর শাস্তি রহিত হবে না। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অভিমতও এ রকম। তবে রাহাজানির শাস্তি এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ তওবা করলে রাহাজানির শাস্তি রহিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে এ রকমই বলা হয়েছে। ইমাম আহমদের প্রথমোক্ত দলিল দু'টি সম্পর্কে হানাফি ও মালেকীগণের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই আয়াত দ্বারা শাস্তি রহিত হওয়া বুঝা যায় না। উল্লেখ্য যে হজরত মায়েযা

এবং গামেদীয়া ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেছিলেন। তওবাও করেছিলেন। এর পরেও তাঁদেরকে সঙ্গেসার (প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা) করা হয়েছিলো।

মাসআলাঃ বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করার পূর্বে চোর যদি তার চুরির মাল মালিককে ফিরিয়ে দেয় তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, এ রকম করলেও তার হাত কাটা যাবে। মামলা দায়েরের পূর্বে হাত কাটা যাবে না— এ কথা বলার কারণ এই যে, চুরি হওয়া মালের দাবি পেশ করা জরুরী। তার এই দাবি পেশ করতে হবে বিচারকের নিকট। সুতরাং তাঁর নিকট দাবি পেশের পূর্বেই যদি মালিককে তার মাল ফেরৎ দেয়া হয়, তবে দাবি পেশ করার কোনো অবকাশ থাকে না। তবে মামলার মাধ্যমে দাবি পেশের পর, সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করার পর এবং বিচারকের রায় ঘোষণা দেয়ার পর চুরির মাল ফেরৎ দেয়া হলে চোরের হাত কাটা জরুরী হবে। রায় ঘোষণার পূর্বে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশের পর মাল ফেরৎ দিলেও চোরের হাত কাটা যাবে। কেননা, সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে বিচারকের নিকট ততক্ষণে চুরি প্রমাণিত হয়েছে এবং এর আগে দাবিও পেশ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ চোরের হস্তচ্ছেদন করলে আখেরাতে কি তার গোনাহ্ মাফ হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে মুজাহিদ বলেছেন, হ্যাঁ। আখেরাতে তার গোনাহ্ থাকবে না। হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন রসুল স. একদিন কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তিনি সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার হাতে এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করো—তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং পুণ্য কর্মে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করবে মহাপুরস্কার। আর যে ব্যক্তি এ সকল পাপের কোনো একটিতে লিপ্ত হবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে পৃথিবীতে। ওই শাস্তি হবে তার পাপের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ)। আর যে ব্যক্তি এ সকল অপরাধের কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তা গোপন করে রাখবেন (যে কারণে তার শাস্তি হবে না)— এ রকম অবস্থা আল্লাহপাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচছা করলে তাকে মার্জনা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। বোখারী, মুসিলম। বাগবী লিখেছেন, বিশুদ্ধ কথা এই যে, হস্তকর্তন হচ্ছে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ শরিয়তের বিধান। শাস্তি আরোপ করা হলেও তওবা করতে হবে। এ কথার প্রমাণ রয়েছে হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে— যেখানে বলা হয়েছে, হাত কাটা এবং দাগ দেয়ার পর রসুল স. এক লোককে বলেছিলেন, আল্লাহর নিকট তওবা করো। ওই লোক বলেছিলো আমি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করছি। তখন রসুল স. বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক তোমার তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তি নিশ্চিত। সে কথাই আয়াত শেষে বলা হয়েছে এভাবে, 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (ইন্নাল্লহা গফুরুর রহিম)।

আল্লাহ্‌পাকই সমস্ত সৃষ্টির একক অধিকর্তা। সে কথা পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে এভাবে, 'তুমি কি জানো না যে আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব

আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন'। কবীরা, সগীরা– সকল গোনাহ্‌র শাস্তি দেয়া ন্যায়সংগত। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক অনুগ্রহ করে সে সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিতে পারেন। গোনাহর জন্য তওবা করা হোক অথবা নাই হোক।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদির'— এ কথার অর্থ, 'এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান'। তিনি যেমন শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতাবান, তেমনি ক্ষমতাবান ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারেও। কিন্তু কোনোটিই করতে বাধ্য নন তিনি।

এই আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, শাস্তিদানের কথা, তারপর বলা হয়েছে ক্ষমা করার কথা। এ রকম বলার কারন এই যে, অপরাধীরা শাস্তির উপযুক্ত হয়— ক্ষমার পূর্বে। আরেকটি কারণ এই, আল্লাহ্‌পাকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে শাস্তি দানের ক্ষেত্রেই। ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রকাশ ততটা প্রকট নয়। শাস্তিপ্রাপ্তদের দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু যাদেরকে ক্ষমা করা হয় তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কোনো অবকাশই নেই। শাস্তি দিতে গেলে শাস্তিদাতাকে হতে হবে ক্ষমতাশালী। কিন্তু ক্ষমা করতে গেলে তেমন পরাক্রমের প্রয়োজন পড়ে না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

❒ হে রসুল! যাহারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করিয়াছি', কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নহে ও যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানে তৎপর তাহাদের আচরণ যেনো তোমাকে দুঃখ না দেয়। উহারা মিথ্যা শ্রবনে অত্যন্ত

আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসে নাই উহারা তাহাদের জন্য কান পাতিয়া থাকে। শব্দগুলি যথাযথ বিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাহারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে; তাহারা বলে, 'এই প্রকার বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা বিকৃত না হইলে বর্জন করিও।' এবং আল্লাহ্ যাহার পথচ্যুতি চাহেন তাহার জন্য আল্লাহের নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদেরই হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করিতে চাহেন না, তাহাদের জন্য আছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও পরকালে মহা শাস্তি।

হজরত বারা বিন আজিব থেকে আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদীকে তাদের নেতারা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে চাবুক মেরেছিলো। সে মুখে কালিমাখা অবস্থায় রসুল স. এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি স. তাকে বললেন, তোমাদের কিতাবে কি ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে এভাবে প্রহার করার কথা বলা আছে? সে বললো, হ্যাঁ। রসুল স. তখন এক ইহুদী আলেমকে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে ওই আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, যিনি মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন। বলো, তোমাদের কিতাবে কি প্রহার করাই ব্যভিচারের শাস্তি? ইহুদী আলেম বললো, না। আল্লাহ্‌র কসম না দিলে আমি আপনার নিকট সত্য কথা স্বীকার করতাম না। তওরাতে বলা হয়েছে, ব্যভিচারের শাস্তি সঙ্গেসার (প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মেরে ফেলা)। কিন্তু আমাদের প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে যখন ব্যাপকভাবে ব্যভিচার শুরু হলো, তখন আমরা তাদের প্রতি আর শাস্তি আরোপ করতে পারতাম না। শাস্তি প্রয়োগ করতাম কেবল দুর্বল লোকদের উপর। এ রকম করা ঠিক হচ্ছে না ভেবে, একদিন আমরা সকলে মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ধনী-দরিদ্র সকলের উপরে একই বিধান হওয়াই সমীচীন। সুতরাং আমাদেরকে এমন একটি বিধান উদ্ভাবন করতে হবে— যা আমরা বিত্তশালী, বিত্তহীন নির্বিশেষে সকলের উপর প্রয়োগ করতে পারি। তখন সকলে মিলে আমরা ঠিক করলাম, এখন থেকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রহার করা ও মুখে কালি মাখানো। এ কথা শুনে রসুল স. বললেন, হে আমার আল্লাহ্, এ সকল লোক তোমার বিধানকে মিটিয়ে দিয়েছে। আমি তোমার বিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবো। এরপর তিনি স. ওই ব্যভিচারী ইহুদীকে সঙ্গেসার করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতের 'ইয়া আইয়্যুহার রসুলু' থেকে 'হুমুজ জলিমুন' (৪৫ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

বাগবী লিখেছেন, খায়বরের প্রভাবশালী ইহুদীদের মধ্যে একজন বিবাহিত পুরুষ এবং একজন বিবাহিত নারী ব্যভিচার করেছিলো। সেখানকার ইহুদী নেতারা তাদের উপর ব্যভিচারের শাস্তি (সঙ্গেসার করা) প্রয়োগ করা সমীচীন মনে করলো না। তারা মদীনার বনী কুরায়জার ইহুদীদের নিকট বলে পাঠালো, তোমরা মোহাম্মদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাস করো— বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি কী হবে? তিনি চাবুক মারার কথা বললে তার কথা মেনে নিও, কিন্তু সঙ্গেসারের কথা বললে মেনো না। এ প্রস্তাব শুনে বনী কুরাইজা ও

বনী নাজিরের লোকেরা বলে পাঠালো, আল্লাহ্র কসম, তিনি তো এমন সিদ্ধান্ত দিবেন, যা তোমাদের পছন্দ হবে না। এরপর কা'ব বিন আশরাফ, সাঈদ বিন আমর, মালেক বিন যইফ এবং লুবাবা বিন আবিল হাকিক ইহুদী রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তার শাস্তি কি হবে বলুন? তিনি স. বললেন, তোমরা কী আমার সিদ্ধান্ত পছন্দ করবে? তারা বললো, হ্যাঁ। তৎক্ষণাৎ সঙ্গেসারের আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হবে সঙ্গেসার। ইহুদীরা শুনলো, কিন্তু এই বিধানকে গ্রহণ করলো না। হজরত জিবরাইল রসুল স. কে ইবনে সুরিয়া নামক এক ইহুদী আলেমের কথা জানালেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইহুদীদের বলুন, তারা কি ইবনে সুরিয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত? রসুল স. বললেন, তোমরা কি শাদা বর্ণের ওই যুবককে চেনো, যার এখনো দাড়ি গোঁফ উঠেনি। যে ফদকের অধিবাসী। তার এক চোখ অন্ধ। নাম ইবনে সুরিয়া। ইহুদীরা বললো, হ্যাঁ, তাকে আমরা ভালো করেই চিনি। তিনি স. বললেন, তার সম্পর্কে তোমাদের ধারনা কি? ইহুদীরা বললো, বর্তমানে ইহুদীদের যতো আলেম রয়েছেন, তাদের মধ্যে ইবনে সুরিয়াই শ্রেষ্ঠ। রসুল স. বললেন, তোমরা কী এ ব্যাপারে ইবনে সুরিয়ার সাক্ষ্য মানতে সম্মত আছো? ইহুদীরা বললো, হাঁ। রসুল স. বললেন, তবে তোমরা তাকে ডেকে আনো। তারা ইবনে সুরিয়াকে ডেকে আনলো। রসুল স. তাকে বললেন, তুমিই কি ইবনে সুরিয়া? সে বললো, লোকেরা এ রকমই বলে থাকে। রসুল স. বললেন, আমি তোমাকে ওই আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, যিনি মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমাদেরকে মিসরের বন্দী জীবন থেকে উদ্ধার করেছেন, সমুদ্রবক্ষে সৃষ্টি করেছেন পথ, সলিল সমাধি দিয়েছেন ফেরাউনকে, তীহ্ প্রান্তরে তোমাদেরকে দিয়েছেন মেঘমালার ছায়া— এবার বলো, আল্লাহ্পাক কি তোমাদের কিতাবে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে সঙ্গেসারকে বিধিবদ্ধ করে দেননি? ইবনে সুরিয়া বললো, হ্যাঁ, দিয়েছেন। শপথ ওই পবিত্র সত্তার, যার কথা আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন— তওরাত যদি লিপিবদ্ধরূপে না থাকতো এবং মিথ্যা বলে পার পাবার উপায় যদি আমার থাকতো, তবে নিশ্চয়ই আমি এ কথা স্বীকার করতাম না। হে মোহাম্মদ! এবার আপনি বলুন, আপনার কিতাবে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর ব্যভিচারের শাস্তি কী? রসুল স. বললেন, চারজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যদি এ রকম সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তাঁরা কোনো পরপুরুষ ও পরস্ত্রীকে এভাবে দেখেছেন— যেনো অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সুরমাদানীর মধ্যে সুরমাদণ্ড, তবে তাদেরকে সঙ্গেসার করা ওয়াজিব হবে। ইবনে সুরিয়া বললো, হজরত মুসার প্রতি যিনি তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! তওরাত শরীফেও এ রকম বলা হয়েছে। রসুল স. বললেন, তবে তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ পরিত্যাগ করেছো কেনো? ইবনে সুরিয়া বললো, বিত্তশালী লোকের প্রভাবে আমরা এ রকম করেছি।

আমরা বিত্তশালী ব্যভিচারীকে ছেড়ে দিতাম। আর সঙ্গেসার কার্যকর করতাম দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের উপর । এই সুযোগে বিত্তশালীরা ব্যাপকভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়লো। আমাদের বাদশাহ্‌র পিতৃব্যপুত্রও ব্যভিচার করেছিলো। কিন্তু তার উপরেও সঙ্গেসার কার্যকর করা হয়নি। তখন এক দরিদ্র ব্যভিচারীকে শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ নিতেই তার গোত্রের লোকেরা প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। তারা বলে বসলো, বাদশাহর পিতৃব্যপুত্রকে সঙ্গেসার না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের লোককে সঙ্গেসার করতে দেবো না। অবস্থা বেগতিক দেখে আলেমগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করলো— এখন থেকে এমন কোনো লঘু শাস্তি প্রচলন করা প্রয়োজন যা ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলের উপর কার্যকর করা যায়। তারা অবশেষে শাস্তি নির্ধারণ করলো এ রকম— ব্যভিচারীকে চাবুকের মাধ্যমে প্রহার করতে হবে এবং তার মুখে লাগিয়ে দিতে হবে কালি। এই ঘটনার পর রসুল স. সঙ্গেসারের হুকুম দিলেন। মসজিদের দরজার পাশেই সঙ্গেসার কার্যকর করা হলো। তিনি স. বললেন, হে আমার আল্লাহ্! এ সকল লোক তোমার বিধান মিটিয়ে দিয়েছিলো। আমিই তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলাম। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমাদের এক পুরুষ ও মহিলা জেনা করেছে। তাদেরকে কী শাস্তি দিতে হবে? তিনি স. বললেন, এ সম্পর্কে তোমাদের কিতাবে কী বিধান রয়েছে? ইহুদীরা বললো, তাদেরকে অপদস্থ করতে হবে এবং চাবুক দিয়ে প্রহার করতে হবে। সেখানে উপস্থিত হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম বলে উঠলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছো। তওরাতে রয়েছে, তাদেরকে সঙ্গেসার করতে হবে। লোকেরা তৎক্ষণাৎ তওরাত আনলো এবং তাদের মধ্যে একজন তওরাত খুলে পাঠ করতে শুরু করলো। যখন রজমের (সঙ্গেসারের) আয়াত এলো, তখন সে ওই আয়াতের উপর হাত রেখে তারপর থেকে পড়ে যেতে লাগলো। হজরত আবদুল্লাহ বললেন, যে আয়াত হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছো, সেই আয়াত পড়ো। পাঠকারী তার হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা গেলো, সেখানে স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে রজমের বিধান। বাধ্য হয়ে ইহুদীরা তখন রসুল স. কে সত্যবাদী বলে মেনে নিলো। রসুল স. তখন তাদের ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেছেন, আমি দেখলাম, প্রস্তরনিক্ষেপের সময় ব্যভিচারী পুরুষটি ব্যভিচারিণীটিকে প্রস্তরবর্ষণ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে।

ইমাম আহমদ তাঁর মসনদে লিখেছেন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বলেছেন, ফদকের এক লোক ব্যভিচার করলো। ফদকবাসীরা মদীনার ইহুদীদেরকে লিখে জানালো— তোমরা মোহাম্মদের নিকট ব্যভিচারের শাস্তি কি তা জেনে নাও। যদি তিনি চাবুক মারার নির্দেশ দেন তবে মেনে নিও আর সঙ্গেসারের নির্দেশ দিলে মেনো না। ইহুদীরা এই মাসআলাটি রসুল স. এর

নিকট থেকে জেনে নিয়েছিলো। ইতোপূর্বে আহমদের ও মুসলিমের বর্ণনাতেও এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। রসুল স. তাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, তাদেরকে সঙ্গেসার করতে হবে। তাঁর নির্দেশ কার্যকর করাও হয়েছিলো। এরপর অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বায়হাকী তাঁর দালায়েল পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিসাস সম্পর্কে। ঘটনাটি ছিলো এই— বনী নাজিরেরা ছিলো বনী কুরায়জার চেয়ে অধিক সম্মানিত। বনী কুরায়জার লোকেরা একদিন রসুল স. কে বললো, আমরা এবং বনী নাজির একই পিতার সন্তান। আমাদের ধর্ম একটি। আমাদের নবীও একজন। কিন্তু বনী নাজিরেরা আমাদের কোনো লোককে হত্যা করলে কিসাস (বদলা) নিতে দেয় না। তারা রক্তপণ হিসেবে কেবল সত্তর ওয়াসক খেজুর দেয়। আর যদি আমরা তাদের লোককে হত্যা করি, তবে তারা আমাদের লোকের উপর কিসাস নেয় (তাকে হত্যা করে) এবং আমাদের নিকট থেকে আদায় করে দ্বিগুণ রক্তপণ (একশত বিশ ওয়াসক খেজুর)। তাদের মহিলাকে হত্যা করা হলে তারা আমাদের পুরুষকে হত্যা করে। একজন পুরুষকে হত্যা করলে, তারা হত্যা করে আমাদের দু'জন পুরুষকে। ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তারা আমাদের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে। তাদের কোনো লোককে প্রহার করলে তারা আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে দ্বিগুণ বিনিময়। আপনি এখন তাদের এবং আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদের দু'টি গোত্র সম্পর্কে। মূর্খতার যুগে তাদের এক দল ছিলো অপর দল অপেক্ষা প্রবল। তাদের মধ্যে চুক্তি ছিলো এ রকম বিজয়ী দল যদি পরাস্ত দলের কোনো লোককে হত্যা করে, তবে তাকে রক্তপণ (দিয়ত) হিসেবে দিতে হবে পঞ্চাশ ওয়াসক খেজুর। আর পরাস্ত দলের কেউ যদি বিজয়ী দলের কাউকে হত্যা করে, তবে সে দিয়ত হিসেবে দিবে একশত ওয়াসক খেজুর। রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই চুক্তি অনুসারে আমলও করা হতো। রসুল স. এর মদীনায় আগমণের পর পরাস্ত দলের একজন বিজয়ী দলের এক ব্যক্তিকে মেরে ফেললো। রক্তপণ হিসেবে বিজয়ী দল চেয়ে বসলো একশত ওয়াসক খেজুর। পরাস্ত দলের লোকেরা বললো এ অবিচার আমরা মেনে নেবো কেনো? আমাদের দুই গোত্রের বংশ এক। আমাদের দেশ এক। ধর্ম এক। এতদসত্ত্বেও আমাদের দুই গোত্রের দিয়তের ব্যাপারে এ রকম বৈসাদৃশ্য থাকবে কেনো? আমরা এতদিন এই অনাচার মেনে নিয়েছিলাম জুলুমের ভয়ে। এখন মদীনায় এসেছেন মোহাম্মদ। সুতরাং এখন থেকে আমরা এ অনিয়ম মানবো না। এ নিয়ে দুই গোত্রের মধ্যে শুরু হলো প্রচণ্ড বিতণ্ডা। দু'দলই হয়ে উঠলো যুদ্ধংদেহী। শেষ পর্যন্ত দু'টো গোত্রই বিষয়টি ফয়সালার জন্য রসুল স.

এর শরণাপন্ন হতে সম্মত হলো। তারা কিছুসংখ্যক লোককে (মুনাফিককে) রসুল স. এর দরবারে পাঠালো এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আগাম বুঝতে চেষ্টা করবে, রসুল স. এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিতে চান। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ওই মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যারা মুখে বলে বিশ্বাস করেছি, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয়'।

আরো বলা হয়েছে, 'যারা ইহুদী হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানে তৎপর তাদের আচরণ যেনো তোমাকে দুঃখ না দেয়।' এ কথার অর্থ, হে রসুল! ওই সকল ইহুদী মুনাফিকদের আচরণে আপনার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই, তারা বিশ্বাসবিচ্যুত হয়ে ইহুদী হয়েছে এবং তারা সত্য প্রত্যাখ্যানে সদা তৎপর।

এরপর বলা হয়েছে 'তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল'— এ কথার অর্থ ইহুদী আলেমেরা মিথ্যা শ্রবণে অভ্যস্ত। মিথ্যাচারিতাই তাদের আমলের ভিত্তি। তারা আপনার কথা এ উদ্দেশ্যেই শোনে, যেনো আপনার কথাকে তারা বিকৃত করে আপনার উপর অপবাদ দিতে পারে।

'যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসে নাই, তারা তাদের জন্য কান পেতে থাকে'— এ কথার অর্থ খায়বরবাসী ইহুদীরা আপনার নিকট আসে নাই, কিন্তু মদীনার বনী কুরায়জারা তাদের গুপ্তচর হিসেবে আপনার কথা শোনে ও আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

'শব্দগুলো যথাযথ বিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে'— এ কথার অর্থ তওরাতে উল্লেখিত রজম, কিসাস ইত্যাদি বিধানকে তারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। আল্লাহ্পাকের বাণী সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত। তবু তারা শব্দ বদলের মাধ্যমে অথবা অর্থ বিকৃতির মাধ্যমে অবতীর্ণ বিধানাবলীর রূপান্তর (তাহরীফ) ঘটায়।

এরপর বলা হয়েছে 'তারা বলে, এই বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ কোরো এবং তা বিকৃত না হলে বর্জন কোরো'— এ কথার অর্থ ইহুদীরা বলে, মোহাম্মদ স. যদি আমাদের মনমতো মীমাংসা না করে, তবে তোমরা তা গ্রহণ কোরো না।

'আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছু করার নেই— এ কথার অর্থ হে রসুল! আল্লাহ্পাক যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আপনাকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, আপনি আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যকে অবদমন করতে পারেন।

মোতাজিলারা বলে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় নয়। কিন্তু এ বাক্যটি তাদের অভিমতের বিরুদ্ধে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়।

'তাদেরই হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক ইহুদী মুনাফিকদের অন্তরকে কুফরী থেকে পবিত্র করতে চান না। মোতাজিলারা বলে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ইমান, কুফরী নয়। কিন্তু এ বাক্যটি তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মোতাজিলারা হুকুম ও ইচ্ছার মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তারা বলে, আল্লাহ্পাক ইমানের নির্দেশ দিয়েছেন, কুফরীর নির্দেশ দেননি। কিন্তু তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে মানুষ কুফরী ও গোনাহ্ করে থাকে।

এ পৃথিবীতে এভাবে অবিশ্বাসীরা হয়ে ওঠে বিরুদ্ধাচারী। কিন্তু আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়, তারা ইমান গ্রহণ করুক। সুতরাং নির্দেশ ও অভিপ্রায় এক নয়। বরং পৃথক। আশায়েরাগণ বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন করতে পারে। বরং করেই চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ভালো ও মন্দ উভয়কে বেষ্টন করে রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ের বাইরে ভালো কিংবা মন্দ কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্পাক যদি চান কারো কল্যাণ হোক, তবে সে অকল্যাণের পথে যেতেই পারে না। আর যদি চান কারো অকল্যাণ হোক, তবে তার পক্ষেও কল্যাণের পথে আসা সম্ভব নয়। আলোচ্য বাক্যটিকে আল্লাহ্পাকের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরিবর্তনীয় অভিপ্রায়ের কথাই বলা হয়েছে। যে অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কারো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই (নবী রসুলগণেরও নেই)। সুতরাং প্রমাণিত হলো, নির্দেশ ও অভিপ্রায়— পৃথক দু'টি বিষয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহা শাস্তি'— এ কথার অর্থ ইহকালে তাদেরকে কখনও নিহত হতে হবে, কখনও হতে হবে বন্দী। আবার কখনও জিজিয়া প্রদানে বাধ্য হয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্সত্ত্বেও মুসলমানদের ভয়ে থাকতে হবে সদাশংকিত। আর তাদের পরকালের মহাশাস্তি হচ্ছে দোজখের অনন্ত আযাব। ওই চিরস্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে ইহুদীদের জন্য, মুনাফিকদের জন্য— অর্থাৎ উভয়ের জন্য।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

❐ তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও; তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায় বিচার করিও; আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

❒ তাহারা তোমার উপর কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে যখন তাহাদের নিকট রহিয়াছে তওরাত— যাহাতে আল্লাহের আদেশ আছে? ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহারা বিশ্বাসী নহে।

ইহুদী মুনাফিকেরা মিথ্যা শ্রবণে (গুপ্তচরবৃত্তিতে) আগ্রহী এবং হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত। 'সুহ্‌তা' অর্থ হারাম রিজিক। শব্দটির প্রকাশ্য অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'ফাই সহিতাকুম বিআযাব'— এ কথার অর্থ লিইউহ্‌লিকাকুম (তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য)। আখফাশ বলেছেন, সকল অবৈধ উপার্জনকে বলা হয় সুহ্‌তা।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কা'ব ইবনে আশরাফ এবং তার মতো অন্য ইহুদী প্রশাসক সম্পর্কে। ওই সকল প্রশাসক ঘুষ গ্রহণ করে ঘুষ দাতার পক্ষে মামলার রায় দিতো। ঘুষ দাতা মিথ্যা কথা বললেও তা গ্রহণ করতো, অন্য পক্ষের প্রতি দৃকপাত মাত্র করতো না।

হাসান, কাতাদা, মুকাতিল এবং জুহাক বলেছেন, সুহ্‌তা ওই উৎকোচের নাম যা বিচার মীমাংসার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। হাসান বলেছেন, মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য বিচারককে যে উৎকোচ দেয়া হয় তাকেই বলে সুহ্‌তা। তবে জুলুম থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে যদি হাকিমকে উৎকোচ দেয়া হয়, তাতে কোনো দোষ হবে না। আত্মরক্ষার জন্য উৎকোচ দিলে উৎকোচদাতার কোনো পাপ হবে না। কিন্তু উৎকোচ গ্রহণকারী সকল অবস্থায় গোনাহ্‌গার হবে।

আমি বলি, এ রকম হবে তখনই যখন দাবিদার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দাবিদার যদি এ রকম আশংকা করে যে, ঘুষ না দিলে হাকিম আমার হক ফিরিয়ে দিবে না এবং বিরোধী পক্ষের অত্যাচার থেকেও আত্মরক্ষা করা যাবে না, তবে ওই অবস্থায় উৎকোচ প্রদান তার জন্য বৈধ হবে। কিন্তু কোনো অবস্থায় হাকিম উৎকোচ নিতে পারবে না। তার জন্য সকল অবস্থায় উৎকোচ নাজায়েয।

হজরত ইবনে সা'দ বলেছেন, কেউ যদি কারো হক প্রতিষ্ঠার জন্যে অথবা জুলুম ঠেকানোর জন্য হাকিমের নিকট সুপারিশ করে ও কিছু দেয় এবং হাকিম তা গ্রহণ করে, তবে তা তার জন্য হারাম হবে। লোকেরা বললো, হে আবু আবদুর রহমান, আমরা ধারণা করি, নাজায়েয ফয়সালার জন্য কিছু গ্রহণ করার নাম ঘুষ (জায়েয ফয়সালার জন্য কিছু নেয়া ঘুষ নয়)। তিনি বললেন, নাজায়েয ফয়সালার জন্য ঘুষ গ্রহণ করাতো কুফরী। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, সেই মোতাবেক যারা নির্দেশ প্রদান করবে না, তারাই কাফের'। মাসরুক বলেছেন, আমি হজরত ওমরের নিকট নিবেদন করলাম, অবৈধ সিদ্ধান্ত দানের জন্য ঘুষ নিলে কী হবে? তিনি বললেন, কুফরী হবে। ঘুষ ওই বস্তু, যা কোনো বাদশাহ্‌র পরিচিত জন প্রয়োজন ও বিপদ উদ্ধারের নিমিত্তে বাদশাহ্‌কে উপহার হিসেবে দেয় (উপহার না দিলে যদি তার কার্যোদ্ধার না হয়, তবে ওই প্রদত্ত উপহারই হবে ঘুষ)।

হজরত ওমর বলেছেন, দু'টি উপায়ে মানুষ ঘুষ খেয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, অবৈধ সিদ্ধান্তদানের জন্য ঘুষ এবং অপরটি হচ্ছে ব্যভিচারে ব্যবহৃতা রমণীর বিনিময় মূল্য।

লাইসের বর্ণনায় রয়েছে, একবার বাদী-বিবাদী হজরত ওমরের সম্মুখে হাজির হলো। হজরত ওমর তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। তারা পুনরায় উপস্থিত হলো। তিনি পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। তারা তৃতীয়বার আগমন করলে তিনি তাদের ফয়সালা করে দিলেন। এমন করলেন কেনো— এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, প্রথমবার অনুভব করলাম আমার অন্তর বাদী-বিবাদীর একজনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দ্বিতীয়বারও দেখলাম, আমি নিরপেক্ষ অবস্থায় নেই। তাই প্রথম ও দ্বিতীয়বার আমি বিচার মীমাংসা করা সমীচীন মনে করিনি। তৃতীয়বার আমি ছিলাম পক্ষপাতিত্বের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই তখন তাদের সুবিচার নিশ্চিত করেছি।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, বিচার মীমাংসার ক্ষেত্রে উৎকোচ দাতা ও প্রদাতা উভয়ের উপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ,তিরমিজি ও হাকেম। মারফুরূপে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে। শিথিলসূত্রে মারফুরূপে হজরত সাওবান থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র লানত ঘুষ দাতা ও গ্রহিতা— উভয়ের উপর এবং ঘুষ আদান-প্রদানের ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা চালায় তার উপর।

দ্রষ্টব্য একঃ ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ঘুষ হতে পারে কয়েক প্রকারের। ১. ঘুষ দিয়ে কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করা। এ রকম কাযী, কাযী নয় (ঘুষ দিয়ে কাযী হওয়া জায়েয নয়, এমন কাযীকে কাযীরূপে মান্য করা যাবে না।)। ২. ঘুষ নিয়ে কাযী যে মামলার মীমাংসা করবে সে মামলা গ্রহণযোগ্য নয়—সঠিক রায় দেয়া হলেও। কারণ, ঘুষ না নিয়েই সঠিক রায় দেয়া ছিলো কাযীর অবশ্যকর্তব্য। সুতরাং এক্ষেত্রে ঘুষ দেয়া নেয়া দু'টোই নাজায়েয। ৩. যদি ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার জন্য অথবা ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাদী বিবাদী ছাড়া অন্য কেউ হাকিমকে ঘুষ দিয়ে সুপারিশের মাধ্যমে ন্যায় বিচারকে নিশ্চিত করে। তবে সুপারিশকারীর জন্য ঘুষ প্রদান জায়েয। কিন্তু হাকিমের জন্য ঘুষ গ্রহণ করা হারাম। তবে হাকিম এ ব্যাপারে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তার শ্রমের মূল্য হিসেবে কিছু নিতে পারবে। ওই অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ঘুষ নয়। জানমালের নিরাপত্তার জন্য বাদী-বিবাদীর কেউ হাকিমকে কিছু দান করলে তা তাদের জন্য জায়েয হবে। কিন্তু হাকিমের জন্য ওই দান হারাম।

দ্রষ্টব্য দুইঃ মুহিত গ্রন্থে রয়েছে, ঘুষ কয়েক রকমের। ১. মহব্বত বৃদ্ধির জন্য কেউ কাউকে কিছু দিলে তা ঘুষ নয়, হাদিয়া। এ রকম হাদিয়া প্রদান জায়েয। আমি বলি, রসুল স. এ সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও। এতে করে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা প্রগাঢ় হবে। ২. ভীত হয়ে কেউ কাউকে কিছু দান করলে অথবা হাকিমের জুলুম থেকে জানমাল রক্ষার জন্য

হাকিমকে কিছু দিলে দানকারীর জন্য তা জায়েয হবে, কিন্তু গ্রহণকারীর জন্য হালাল হবে না। ৩. যদি কেউ হাকিমের নিকট সুপারিশ করে তার কার্যসিদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য হাকিমকে কিছু দেয় তবেতো হবে নাজায়েয। এ রকম দেয়া-নেয়া হারাম। বৈধ কাজের জন্য কিছু দিয়ে সুপারিশ করে হাকিমের নিকট থেকে যদি কেউ তার কার্য সিদ্ধি করে তবে তার জন্য তা জায়েয হবে। কিন্তু গ্রহণকারীর জন্য তা জায়েয হবে কিনা, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন জায়েয হবে, কেউ বলেছেন হবে না। এ গ্রহণ বৈধ হওয়ার স্বরূপ এই যে— মধ্যস্থতাকারী সময়সীমা নির্ধারণ করে কেবল তার সময় ও পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে এবং তা থেকে হাকিমকে কিছু দান করবে (আগে থেকে কোনো বিনিময় নির্দিষ্ট করবে না)। এমতোক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী তার নিজের পক্ষ থেকে হাকিমকে কিছু দিলে হাকিমের জন্য তা গ্রহণ করা মাকরূহ হবে না। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন মাকরূহ হবে। এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে মাসউদের অভিমত অনুরূপ।

এরপর বলা হয়েছে, 'তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি কোরো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কোরো; তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা করো তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'—এ কথার অর্থ, অবিশ্বাসীরা যদি আপনার নিকট কোনো মামলা মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হয়, তবে হে আমার প্রিয় রসুল! বিষয়টি সম্পূর্ণতই আপনার অভিপ্রায়ভূত করে দেয়া হলো। আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মামলা নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে নির্লিপ্তও থাকতে পারেন। নির্লিপ্ত থাকলে মনে করবেন না যে, তারা আপনার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে।

বাগবী লিখেছেন, জিম্মি কাফের (যারা জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করেছে) তাদের নিজেদের ভিতরে কোনো দ্বন্দ্ব সমস্যা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মুসলমান হাকিমের শরণাপন্ন হলে হাকিম তাদের বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, বিষয়টি হবে হাকিমের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে তিনি বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন, নাও করতে পারেন। কারণ, সুরা মায়িদার কোনো নির্দেশ রহিত হয়নি। মুসলমান হাকিমের এখনও এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি আহ্‌লে কিতাব ও অন্যান্য বিধর্মীদের মামলা মোকদ্দমা ইচ্ছে হলে নিষ্পত্তি করবেন। ইচ্ছে না হলে করবেন না। কিন্তু নিষ্পত্তি যদি করতে চান, তবে তা করবেন ইসলামের বিধান অনুসারে। এ রকম বলেছেন নাখয়ী, শা'বী, আতা এবং কাতাদা। কেউ কেউ বলেছেন, বিধর্মীরা কোনো বিচার সালিশ নিয়ে এলে তা নিষ্পত্তি করে দেয়া ওয়াজিব। কারণ, সুরা মায়িদার এই আয়াত রহিত হয়েছে ওই আয়াতের মাধ্যমে, যেখানে বলা হয়েছে— ওয়া আনিহ্‌কুম বাইনাহুম বিমা আনযালাল্লাহ্‌ (এবং তাদের মধ্যে হুকুম করুন আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে)। এ রকম বলেছেন হজরত ইকরামা ও মুজাহিদ। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এই অভিমত

পোষণকারী। তিনি বলেছেন, সুরা মায়িদার দু'টি আয়াত ব্যতীত অন্য কোনো আয়াত রহিত হয়নি। 'লা তাহিল্লু শায়ায়িরিল্লাহ্'— এই আয়াতটি রহিত হয়েছে 'উক্বতুলুল মুশরিকিনা কাফ্‌ফাহ্' আয়াত দ্বারা এবং 'ফাইন জায়ুকা ফাহ্‌কুম বাইনাহুম আও, আয়্‌রিদ্ব আনহুম'— আয়াতটি রহিত হয়েছে 'ওয়া আনিহ্‌কুম বাইনাহুম বিমা আনযালাল্লহ্' দ্বারা।

বায়যাবী লিখেছেন, দু'জন কিতাবী (কাফের) তাদের বিবাদ মেটানোর জন্য মুসলমান হাকিমের নিকটে এলে তা নিষ্পত্তি করে দেয়া হাকিমের উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। কিন্তু বাদী বিবাদীর একজন যদি জিম্মি হয়, তবে তা নিষ্পত্তি করে দেয়া ওয়াজিব। কারণ, মুসলমানেরা জিজিয়া গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করতে অংগীকারাবদ্ধ। আলোচ্য আয়াতটির বিধানের মধ্যে জিজিয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সকল অবস্থায় বিচার নিষ্পত্তি করা ওয়াজিব।

আমি বলি, জিম্মি কিংবা হরবী— যে কোনো বিধর্মী বাদী-বিবাদী মুসলমান হাকিমের আদালতে মামলা মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হলে ন্যায়ানুগতার সঙ্গে তা নিষ্পত্তি করে দেয়া হাকিমের উপর ওয়াজিব। কারণ, বাদশাহ্ কর্তৃক হাকিম নিযুক্ত করা হয়েছে বিচারাচারের জন্যই। সুতরাং মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল বাদী-বিবাদীর বিচার নিষ্পত্তি করে দেয়া সকল অবস্থায় হাকিমের উপর ওয়াজিব। মুসলমান তো সর্বাবস্থায় মুসলমানই। আর জিম্মিরাও মুসলমানের অধীনে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। যার উপর দাবি করা হয়েছে সে যদি হরবী (বিধর্মী দেশের কাফের) হয়, তবে সে যেহেতু ইসলামী শরিয়তের বিধানের আওতাভূত নয়— তাই তার বিচার নিষ্পত্তি করা মুসলমান হাকিমের উপর ওয়াজিব নয়। বাদী-বিবাদী দু'জনেই যদি হরবী হয়, অথবা একজন হরবী একজন জিম্মি— এ রকম হয় এবং বাদী বিবাদী দু'জনে গ্রাম নেতা (হাকিম নয়), কোনো মুসলমানের নিকট বিচার নিষ্পত্তির আবেদন নিয়ে হাজির হয়, তবে ওই মুসলমানের উপর বিচার নিষ্পত্তি করে দেয়া ওয়াজিব নয়।

শেষে বলা হয়েছে, 'আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করো, তবে ন্যায়বিচার কোরো; আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। এ কথার মাধ্যমে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাক ন্যায়বিচারকদেরকে ভালোবাসেন। রসুল স. বলেছেন, ন্যায়বিচারকেরা (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌পাকের সান্নিধ্যে নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবে। মুসলিম। হজরত ওমর বিন খাত্তাবের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাকের নিকট ন্যায় বিচারক ও সচ্চরিত্ররা সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীল হবে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে মূর্খ হাকিম এবং অসচ্চরিত্র অত্যাচারীরা। শো'বুল ইমান।

পরের আয়াতে (৪৩) এ মর্মে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, হে প্রিয় রসুল! ইহুদীরা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করবে কিভাবে? তারা তো আপনাকে রসুল বলে স্বীকারই করে না। আর তারা যে বিষয়ে নিষ্পত্তি করতে চায়, তার

স্পষ্ট বিধান রয়েছে তাদের কিতাবেই। সে বিধান সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত (তওরাতের বিধান হচ্ছে, বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি সঙ্গেসার)। কিন্তু সে বিধান তারা মানতে চায় না। তারা চায় তাদের মনগড়া সহজ কোনো বিধান।

শেষে বলা হয়েছে, 'এর পরেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়'। —এ কথার অর্থ তারা সত্য থেকে পশ্চাদপসরণকারী, অবিশ্বাসী। আল্লাহ্পাকের কোনো কিতাবের উপরেই তাদের বিশ্বাস নেই। যদি থাকতো তবে তাদের নিজেদের কিতাবের (তওরাতের) উপরে তারা আমল করতো। আর এ রকম করলে স্বাভাবিকভাবেই তারা তওরাতের প্রত্যয়নকারী কোরআনকেও মেনে নিতো। তারা এ রকম করে না। তাই তারা সত্যবিমুখ, অবিশ্বাসী।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৪

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ○

❒ তওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো; নবীগণ যাহারা আল্লাহের অনুগত ছিল তাহারা ইহুদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণও বিধান দিত, কারণ তাহাদিগকে আল্লাহের কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই সত্য- প্রত্যাখ্যানকারী।

সকল আসমানী কিতাবের মতো তওরাতও ছিলো পথনির্দেশ (হেদায়েত) এবং আলো (নূর)। আয়াতের শুরুতে এ কথাই বলে দেয়া হয়েছে। ইহুদীদের অন্তর যদি কঠিন না হতো, তবে তওরাতের মাধ্যমে তারা আলোকিত হতে পারতো। লাভ করতে পারতো পথের দিশা।

'নবীগণ যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিলো, তারা ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিতো'- এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে হজরত মুসা পরবর্তী সকল সুবিচারক নবীগণের কথা। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স.ও তাঁদের অন্তর্ভূত। হজরত মুসা যেমন ব্যভিচারের জন্য রজমের নির্দেশ দিতেন, শেষ নবী মোহাম্মদ স.ও তেমনি নির্দেশ দেন। হাসান এবং সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'নাবিয়্যুন' (নবীগণ) অর্থ রসুল মোহাম্মদ স. । সম্মানিত দলপতির ক্ষেত্রে এ রকম বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহার আরবী ভাষার একটি প্রচলিত রীতি। সেই রীতির প্রয়োগ ঘটেছে এখানে। অন্যত্রও এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'ইন্না ইব্রাহিমা কানা উম্মাতান কৃনিতা'। এ আয়াতে উম্মত বলা হয়েছে হজরত ইব্রাহিমকে। রসুল স. এর বিধান দানের কথাই এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তাই নবীগণ বলতে তিনিই এককভাবে অভিহিত হয়ে থাকতে পারেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে নবীগণ বলতে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসার পরের এবং হজরত ঈসার আগের নবীবৃন্দকে। কেননা একটু পরেই (৪৬ আয়াতে) উত্তর সাধকরূপে হজরত ঈসাকে প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। সবশেষে প্রেরিত নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অতীত নবীগণের শরিয়তের যে সকল হুকুম রহিত হয়নি, সেগুলোর উপর আমল করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে আম্মি ঈসার সর্বাপেক্ষা নিকটে। নবীগণ বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাঁদের দ্বীন (পিতা) এক। কিন্তু শরিয়ত(মাতা) অনেক। বোখারী, মুসলিম।

'আল্লাজিনা আসলামু লিল্লাজিনা হাদু'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র পূর্ণ অনুগত নবীগণ ইহুদীদেরকে তওরাত অনুসারে বিধান দিতেন। 'পথ-নির্দেশ ও আলো'— তওরাতের এই বিশেষণের সঙ্গে রয়েছে এ বিধান দানের সংযোগ। এভাবে মূল বক্তব্যবিষয় হবে এই— তওরাতের পথ-নির্দেশ ও আলো এবং তদানুসারে প্রদত্ত নবীগণের বিধান ওই সকল লোকের জন্য, যারা কুফরী থেকে তওবা করে বিশ্বাসকে অবলম্বন করেছে। ইহুদীদের বিচার নিষ্পত্তি নবীগণ করেছেন তওরাতের বিধানের আলোকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির শেষের 'লিল্লাজিনা' (লিল্লাজিনা হাদু) এর 'লাম' অক্ষরটির অর্থ হবে 'আ'লা' বা উপরে। যেমন, 'ওয়া ইন আসা'তুম ফালাহা' (যদি তোমরা গোনাহ্ করো তবে তা তোমাদেরই জন্য)— এখানে 'ফালাহা' শব্দটির অর্থ হবে 'ফা আলাইহা।' অর্থাৎ যদি তোমরা গোনাহ্ করো তবে তা তোমাদের নফসের উপরেই বর্তাবে। অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, উলায়িকা লাহুমুল্লা'নাতু। এখানে 'লাহুম' অর্থ হবে 'আলাইহিম' (তাদের উপর)। বাক্যটির পুরো অর্থ হবে, 'তাদের উপরেই হবে লা'নত (অভিশাপ)'। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম — নবীগণ তওরাতের মাধ্যমে অবিশ্বাসী ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিধান দান করতেন। কারণ তওরাতের নির্দেশ এই যে, যখন কোনো নবী তওরাত অনুসারে বিধানদাতারূপে আবির্ভূত হোন, তখন তোমরা তাকে অবশ্যই মেনে নিবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। বায়যাবী লিখেছেন, 'লিল্লাজিনা হাদু' কথাটির মাধ্যমে ওই সকল নবীগণকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা তওরাতের অনুকূল বিধানদাতারূপে হজরত মুসার পর আবির্ভূত হয়েছেন। এই নির্দেশের

মধ্যে হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ স. পড়বেন না। কারণ, তাঁরা তওরাতের বিধানের অধীনে ছিলেন না। ছিলেন তওরাতের প্রত্যয়নকারী এবং স্বতন্ত্র কিতাবের অধিকারী। এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'লিকুল্লি জায়ালনা মিনকুম শিরআতাঁও ওয়া মিনহাজা' (আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও পথ দিয়েছি)। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, হজরত ঈসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.তওরাত অনুসারে বিধান দিতে আদিষ্ট ছিলেন না। বায়যাবীর এ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অতীত নবীগণের শরিয়ত আমাদের জন্য দলিল নয়।

আমরা বলি, 'লিকুল্লি জায়ালনা মিনকুম শিরআতাঁও ওয়া মিনহাজা'— এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তওরাতের সকল নির্দেশ রহিত করে দেয়া হয়েছে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, তওরাতের অধিকাংশ হুকুম আহকামকে রহিত করা হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিস দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে একথা প্রমাণিত না হবে যে, অমুক হুকুমটি রহিত, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হুকুম আমাদের জন্য আমল করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'অনুসরণের মধ্যেই তাদের জন্য রয়েছে হেদায়েত'।

'রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণও বিধান দিতো'— কারণ, তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিলো এবং তারা ছিলো তার সাক্ষী'— এখানে রব্বানীগণ অর্থ সুফী সাধকগণ। অর্থাৎ তৎকালীন পীর মাশায়েখগণ। তাঁরা তাঁদের মুরিদদের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্তে এবং হৃদয়কে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে তওরাতের নির্দেশ অনুসারে বিধান দান করতেন।

আহবার অর্থ আলেম বা পণ্ডিত। আহবার শব্দটির একবচন হচ্ছে 'হাবর' বা 'হিবর'। হিবর বলা হয় পণ্ডিতদেরকে। অর্থাৎ যারা প্রাজ্ঞ— তাদেরকে। কেউ কেউ বলেছেন, হিবর অর্থ জামাল বা সৌন্দর্য। হাদিস শরীফে এসেছে, দোযখ থেকে এক ব্যক্তি এমন অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হবে, যখন সে হয়ে পড়বে সৌন্দর্য (জামাল) বিহীন।

তাহ্বীর অর্থ তাহ্সীন বা সুন্দর। প্রকৃত আলেমগণ উত্তম চরিত্রের এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত হোন বলে তাঁদেরকে বলা হয় আহ্বার। রব্বানী ও আহবারগণ ছিলেন আল্লাহ্র কিতাবের (তওরাতের) রক্ষক। তাঁদেরকে তওরাত গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তওরাতানুসারে আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তওরাতের শব্দ পরিবর্তন কিংবা অর্থ বিকৃতির নির্দেশ দেয়া হয়নি। 'ওয়াকানু আলাইহি শুহাদায়া'— অর্থ তাঁরা ছিলেন তার (তওরাতের) সাক্ষী। অর্থাৎ সুফী সাধক ও আলেমগণ তওরাতের বিধান সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য পেশ করতেন। পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করতেন তওরাতের বিধান।

'ফালা তাখ্শাউন্নাস'— এ কথার অর্থ, সুতরাং মানুষকে ভয় কোরো না। অর্থাৎ হে প্রিয় রসুল! আপনার বিচারের রায় যদি প্রভাবশালী লোকদের বিরুদ্ধেও যায় তবুও আপনি কাউকে ভয় করবেন না।

'ওয়াখশাওনি' অর্থ, আমাকেই ভয় করো। ইবনে আসাকের, হাকেম এবং তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যদি মানুষ মানুষকে ভয় করে তবে যাকে ভয় করা হয়েছে— তাকেই ভীত মানুষের উপর প্রবল করে

দেয়া হয়। আল্লাহ্ ব্যতীত যে অন্য কাউকে ভয় করে, আল্লাহ্পাক তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করে দেন। আর যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর করে না, আল্লাহ্পাক তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করেন না।

'ওয়ালা তাশতারু বিআইয়্যাতি ছামানান কলিলা' (এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় কোরো না) — এ কথার অর্থ, পার্থিব সুবিধার জন্য আল্লাহ্র বিধান থেকে সরে যেয়ো না। উৎকোচ ইত্যাদি গ্রহণ কোরো না। এ কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তওরাতের যে সকল বিধান রহিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তার উপর আমল করা এই উম্মতের জন্য জরুরী।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।' – এ কথার অর্থ, যারা আল্লাহ্তায়ালার বিধানকে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিধানানুসারে যারা অন্যকে চলতে নির্দেশ দেয় না, তারাই কাফের। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কাফের অর্থ হবে ফাসেক। কেউ কেউ বলেছেন, সত্যবিমুখ। হজরত ইবনে আব্বাস এবং তাউস বলেছেন, তারা ওই পর্যায়ের কাফের নয়, যারা ধর্ম থেকে পরিপূর্ণরূপে বহিষ্কৃত। আল্লাহ্, রসুল এবং কিতাবকে অস্বীকার করলে প্রকৃত কাফের হয়। এখানে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বলে ওই রকম কাফেরের কথা বলা হয়নি। তাই এখানে কাফের অর্থ হবে ফাসেক (পাপিষ্ঠ)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ○

❒ তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক. কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই

পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই সীমালংঘনকারী।

❐ মরিয়ম-তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের উত্তর-সাধক করিয়াছিলাম এবং তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে এবং সাবধানকারীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইঞ্জিল দিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।

কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, ইহুদীদের জন্য তওরাতের বিধান ছিলো এ রকম— প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম।

খুনের বদলে খুন— এই বিধান আমাদের শরিয়তেও বহমান। সুরা বাকারার 'আল হুররু বিল হুররি' আয়াতের তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হত্যাকারী স্বাধীন, ক্রীতদাস, পুরুষ, নারী, মুসলমান, জিম্মি— যেই হোক না কেনো তাকে হত্যা করতে হবে।

কিসাস শব্দের অর্থ সাদৃশ্য বা আনুরূপ্য। এর প্রকৃত অর্থ, কেউ কারো ক্ষতি করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির নিকট থেকে সমপরিমাণ বদলা নিতে পারবে। অতিরিক্ত বদলা নিতে পারবে না। যেমন, যদি কেউ কারো কব্জি পর্যন্ত হাত কেটে দেয়, তবে ওই ব্যক্তি হস্ত কর্তনকারীর হাতও কব্জি পর্যন্ত কেটে দিতে পারবে। মাথা, নাক, কান, দাঁত কেটে ফেললে বা তুলে ফেললে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিসাধনকারীর উপর সমপরিমাণ বদলা নিতে পারবে। যদি কাউকে প্রহার করলে তার চোখ বেরিয়ে যায়, তবে তার কিসাস নেয়া সম্ভব হবে না। কেননা, প্রহারকারীকে প্রহার করতে শুরু করলে তার চোখ বেরিয়ে নাও আসতে পারে। কিন্তু যদি চোখ স্বস্থানে স্থির থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, তবে তার বদলা নেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা, এখানে অনুরূপ বদলা নেয়া সম্ভব। এমতোক্ষেত্রে আয়নাকে উত্তপ্ত করে রাখতে হবে প্রহারকারীর চোখের উপর। এভাবে চোখের উপর অতি উত্তপ্ত আয়না রাখলে তার দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হবে। সাহাবীগণের মাধ্যমে এ রকমই বর্ণনা চলে এসেছে। কেফায়া গ্রন্থে রয়েছে, এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো হজরত ওসমানের যুগে। তিনি উপস্থিত সাহাবীগণের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করলেন। কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। এমন সময় হজরত আলী এলেন। সব শুনে তিনি বর্ণিত নিয়মে বদলা নেয়ার কথা বললেন। সকলেই তাঁর কথা মেনে নিলেন। কেউ তখন তাঁর বিরুদ্ধাচারী হননি বলে সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। হজরত ওসমান ওইরূপ বিধানই কার্যকর করেছিলেন। দাঁত ও হাড় উঠিয়ে ফেলার বদলা নেয়া যায় না।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, জখমের বদলা ওই সময় নেয়া যাবে, যখন জখম ছড়িয়ে পড়বে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জখম বেশী হওয়া বা শুকিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করা যাবে না। তাৎক্ষণিকভাবে বদলা নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। হানাফিগণ হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসকে

তাঁদের অভিমতের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে,এক ব্যক্তিকে আহত করা হয়েছিলো— সে তাৎক্ষণিক কিসাসের আবেদন জানালো। কিন্তু রসুল স. জখম নিরাময় হওয়া পর্যন্ত কিসাস নিতে নিষেধ করেছিলেন। দারা কুতনী।

মাসআলাঃ যদি অর্ধেক হাত কেটে দেয়া হয় এবং ভিতরের খালি স্থান পর্যন্ত জখম পৌঁছে যায় এবং জখম ভালো হয়ে পুরো হাত জোড়া লেগে যায়, তবে কিসাস নেয়া যাবে না। কেননা, এমতোক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ বিনিময় গ্রহণ করার সুযোগ নেই। বিনিময় নিলে অপরাধীর হাতের হাড় অকেজো হয়ে যেতে পারে। এমনকি এতে করে তার মৃত্যুর সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই, বদলা বা বিনিময় নেয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি বাহুমূল থেকে কেটে ফেলে দেয়া হয় তবে, কিসাস হিসেবে ওই ব্যক্তির কনুই পর্যন্ত হাত কেটে নিতে হবে। আর যদি কব্জি ও কনুইয়ের মাঝখানে কেটে দেয়া হয়, তবে হাত কেটে নিতে হবে পিছনের দিক থেকে। অন্যান্য অঙ্গ কর্তন করলেও এভাবে কিসাস গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সমপরিমাণ অথবা কাছাকাছি অংশ থেকে কেটে দিতে হবে।

মাসআলাঃ জিহ্বা এবং লজ্জাস্থান কাটলে ইমাম আবু হানিফার মতে কিসাস নেয়া যাবে না। কারণ, এ দু'টো অঙ্গের কর্তনের পরিমাণ বা সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে লজ্জাস্থানের অগ্রভাগ কেটে নিলে তার কিসাস গ্রহণ করা যাবে। কেননা, এক্ষত্রে কর্তনের সীমানা সুচিহ্নিত। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, জিহ্বা এবং লজ্জাস্থান যদি মূল থেকে কেটে নেয়া হয় তবে তার বদলা নেয়া যাবে। কারণ, এক্ষেত্রে সীমানা নির্ধারণের সমস্যা নেই। সম্পূর্ণ ওষ্ঠ মূল থেকে কেটে ফেললে বিনিময় নেয়া যাবে। কারণ, এখানেও পরিমাণ নির্ধারণ অসম্ভব নয়। তবে সম্পূর্ণ ঠোঁট কাটা না হলে বিনিময় নেয়া যাবে না। কারণ, অনুরূপ অবিকল বিনিময় হওয়া সম্ভব নয়।

মাসআলাঃ অক্ষম ও খুঁত বিশিষ্ট হাতের বিনিময়ে সুস্থ সবল হাত, ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাত অথবা বাম হাতের পরিবর্তে ডান হাত কাটা যাবে না। এ অভিমতটি ঐকমত্যোৎসারিত।

মাসআলাঃ প্রহৃত ব্যক্তির চোখ যদি স্বস্থানে থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, অথবা হাত নষ্ট হয়ে যায় বা বাকশক্তি রহিত হয়ে যায় এবং পুরুষাঙ্গ অকেজো হয়ে যায় অথবা প্রহারকারী যদি তার অতিরিক্ত আঙ্গুল কেটে নেয়, তবে জমহুরের নিকট ন্যায়বিচারকের মাধ্যমে এর মীমাংসা করে দিতে হবে। ইমাম আহমদের নিকট সুস্থ অঙ্গের এক তৃতীয়াংশ দিয়ত আদায় করে দিতে হবে। কেননা, আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ হজরত আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এক তৃতীয়াংশ দিয়ত পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, যখন চোখ যথাস্থানে থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিহীন হয়েছিলো, আর যখন নষ্ট হাত কেটে দেয়া হয়েছিলো এবং বিনষ্ট চোখ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। নাসাঈর পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। হজরত ইবনে আব্বাসের মাওকুফ হাদিসে রয়েছে, বিনষ্ট হাতের জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়ত দিতে হবে আর চোখ যথাস্থানে থেকেও দৃষ্টিহীন হলে দিয়ত দিতে হবে এক তৃতীয়াংশ।

মাসআলাঃ যদি কারো সুস্থ সবল হাত কাটা হয় এবং যে হাত কেটেছে তার হাত বিনষ্ট অথবা কম আঙ্গুল বিশিষ্ট থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে যার হাত কাটা হয়েছে সে ইচ্ছে করলে হস্ত কর্তনকারীর বিনষ্ট হাতকে কেটে দেবে অথবা পুরোপুরি সম্পদগত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে পূর্ণ শারীরিক বিনিময় গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই হয়তো নিজের হাতের চেয়ে কম শারীরিক বিনিময় নিতে হবে অথবা নিতে হবে আর্থিক বিনিময় (মালী জরিমানা)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মালী বিনিময় নেয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

মাসআলাঃ যদি মাথার খুলির উভয় পাশে এমন আঘাত লাগে যাতে করে মাথার উপরের সম্পূর্ণ অংশ জখম হয়ে যায় তবে এর বদলা স্বরূপ প্রহারকারীর (মাথা বড় হওয়ার কারণে) খুলির উভয় পাশে আঘাত করলে যদি সেই আঘাত মাথার উপরে পর্যন্ত না পৌঁছায়, তবে প্রহৃত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে প্রহারকারীর মাথার উপরে আঘাত করে জখম করে দিতে পারবে। ডান বা বাম যেদিক থেকে খুশী সেদিক থেকেই তার মস্তকের উপরিভাগে আঘাত করা যাবে। অথবা প্রহৃত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে এ রকম বদলা না নিয়ে প্রহারকারীর নিকট থেকে মালী জরিমানা গ্রহণ করতে পারে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, দাঁত তুলে ফেললেও শারীরিক বিনিময় গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দাঁত তুলে ফেলার শারীরিক বিনিময় নেই। কেননা, এ রকম বিনিময়ের অবিকল সাদৃশ্য হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা বলি, যদি দাঁতের সামান্য অংশ উঠিয়ে ফেলে, তবে অবিকল সাদৃশ্য হওয়া সম্ভব। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দাঁতের বিনিময় নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নাসাঈ। হজরত আনাসের বর্ণনায় আরও এসেছে হজরত আনাস বিন মালেকের ফুফী রবী এক আনসারী মেয়ের দাঁত ভেঙে ফেললেন। ওই আনসার অভিযোগ নিয়ে রসুল স. দরবারে উপস্থিত হলে রসুল স. বিনিময় গ্রহণ করার হুকুম দিয়েছিলেন। এই নির্দেশের কথা শুনে হজরত আনাস বিন মালেকের পিতৃব্য হজরত আনাস বিন নজর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দাঁত উপড়ানোর নির্দেশ থেকে তাকে রক্ষা করুন। রসুল স. বললেন, আনাস! বিনিময় আল্লাহ্র ফরজ বিধান। এ কথা শুনে তিনি মালী বিনিময়ের নির্দেশকে মেনে নিলেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র এমন কতিপয় বান্দা রয়েছে, তারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে কসম খেয়ে বসলে আল্লাহ্ পাক তা পূর্ণ করে দেন। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ প্রাণহরণের চেয়ে কম অপরাধের মধ্যে শিবহে আমাদ নেই (ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যাকে কতল শিবহে আমাদ বলে)। প্রহার যদি ইচ্ছাকৃত হয় অথবা ভুলক্রমে হত্যা করে ফেলে, তবে তা হবে ইচ্ছাকৃত হত্যার মতোই।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রাণ নাশ করার চেয়ে কম অত্যাচারের ক্ষেত্রে স্ত্রী, পুরুষ, স্বাধীন, ক্রীতদাস এবং সমপর্যায়ের দু'জন ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে কিসাস জারী করা যাবে না। অন্য তিন ইমাম বলেছেন, সকল অবস্থায় বিনিময় নেয়া যাবে। তবে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের হাত কেটে ফেললে কিসাস হবে না। কেননা মুসলমানদের রীতি এই যে, স্বাধীনের নিকট থেকে দাসের কিসাস হতে পারে না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'আল হুররু বিল হুররি' (স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন)। এই আয়াত সাধারণ অর্থের দিক থেকে ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের প্রমাণ এই যে, শরীরে অবস্থান সম্পদের মতোই। অর্থাৎ সম্পদের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করে নিতে হবে। কিন্তু শরীরের মূল্যও সুনির্ধারিত। তাই প্রাণনাশের বিষয়টি পৃথক প্রকৃতির। রূহের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে জীবনাবসান ঘটে। কাজেই এর মধ্যে কোনো পার্থক্য চলে না।

মাসআলাঃ মুসলমান এবং জিম্মির মধ্যে দৈহিক বদলা (কিসাস) কার্যকর করা যাবে। কেননা, মুসলমান ও জিম্মি নিরাপত্তাপ্রাপ্তির দিক থেকে সমপর্যায়ের। এ রকম বলেছেন ইমাম আজম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, মুসলমান যদি কোনো অমুসলমানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে, তবে কিসাস হবে না। তাঁরা আরও বলেছেন, মুসলমান কাফেরকে হত্যা করে ফেললেও কিসাস হবে না। সুরা বাকারার তাফসীরে এই মাসআলাটির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তার পাপ মোচন হবে।' —এ কথার অর্থ বদলা গ্রহণের অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও কেউ যদি তা পরিত্যাগ করে এবং অপরাধীকে মাফ করে দেয়, তবে তাতে তার পাপ মোচন হবে। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস, হাসান বসরী, শা'বী এবং কাতাদা এ রকম বলেছেন। এক আনসারী বর্ণনা করেছেন,এ বাক্যটি সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন এখানে ওই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যার দাঁত ফেলে দেয়া হয়েছে, হাত অথবা অন্য কোনো অঙ্গ কেটে নেয়া হয়েছে কিংবা অন্য কোনো ভাবে আঘাত করা হয়েছে— এতদসত্ত্বেও যদি সে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে এর সমপরিমাণ পাপ আল্লাহ্পাক তার আমলনামা থেকে মুছে ফেলবেন। যদি ওই ব্যক্তি তার এক চতুর্থাংশ দিয়ত ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পাপও মার্জনা করা হবে এক চতুর্থাংশ। যদি এক তৃতীয়াংশ দিয়ত ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পাপও ক্ষমা করা হবে এক তৃতীয়াংশ। আর যদি সে তার সম্পূর্ণ দিয়ত ক্ষমা করে দেয়, তবে তার সম্পূর্ণ গোনাহ্ই মাফ করে দেয়া হবে। ইবনে মারদুবিয়া।

তিবরানী তাঁর কবীর পুস্তকে উত্তমসূত্রে হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার শরীরে প্রাপ্ত আঘাতের বিনিময় ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ্পাক তার সমপরিমাণ গোনাহ্ রহিত করে দেবেন। হজরত সানজুরা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও ধৈর্য ধারণ করে এবং দিয়ত দেয়া হলে কৃতজ্ঞচিত্ত হয় এবং

জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেয় অথবা নিজে জুলুম করলে আল্লাহ্‌তায়ালার মার্জনা অন্বেষণকারী হয়, তাকে আখেরাতে আল্লাহ্‌পাকের আযাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে এবং এগুলো হবে তার জন্য হাদিয়া স্বরূপ।

তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি—শারীরিক আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি আঘাতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ্‌পাক তার একটি মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন এবং মুছে দিবেন তার পাপকে।

আমাদের শায়েখ ও ইমাম মীর্জা মাযহারে শহীদ জাঁনে জানা র. কে আঘাত করা হয়েছিলো এবং ওই আঘাতেই তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলেন। আহত শায়েখকে দিল্লির আমির নবাব নজফ খান বলে পাঠালেন, আমি আপনার আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। শায়েখ বললেন, আঘাতকারীর সঙ্গে বিরোধ কোরো না। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'তার পাপ মোচন হবে'—এখানে 'তার' সর্বনামটি অপরাধীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা দৃষ্টে এ কথাটিই প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের হকদার ব্যক্তি যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে ওই ক্ষমা হবে অপরাধীর পাপের ক্ষতিপূরণ। আখেরাতে এ অপরাধের জন্য তাকে আর অভিযুক্ত হতে হবে না। এখন রইলো অত্যাচারিত ব্যক্তির ক্ষমা করার সওয়াব প্রসঙ্গ। এই সওয়াব দান করবেন আল্লাহ্‌পাক। তাই এরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয় তার বিনিময় রয়েছে আল্লাহ্‌র অধিকারে' (ফামান উফিইয়া ওয়া আসলাহা ফাআজরুহু আলাল্লহ্)। বাগবী লিখেছেন, এই তাফসীর করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ, ইব্রাহিম, এবং জায়েদ বিন আসলামের বর্ণনাও অনুরূপ।

বাক্যটির আরেকটি তাফসীর বর্ণিত হয়েছে এ রকম—যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিনিময় দিয়ে দেয় অর্থাৎ শরিয়তসম্মত কিসাস স্বউদ্যোগে পরিশোধ করে, তবে সেটাই হবে তার গোনাহের কাফফারা। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'হে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা' (ফিল কিসাসে হায়াতুঁ ইয়া উলিল আলবাব)।

শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সীমালংঘনকারী।'—এ কথার অর্থ কিসাস ইত্যাদি প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন— তদনুসারে যারা বিচার নিষ্পত্তি করবে না, তারাই জালেম (সীমালংঘনকারী)। অর্থাৎ যারা হুকুমকে গোপন করবে এবং আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করা থেকে বিরত থাকবে, সীমালংঘনকারী তারাই।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে, 'মরিয়ম তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে তাদের উত্তর সাধক করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক হিসেবে এবং সাবধানকারীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম; তাতে ছিলো পথের নির্দেশ ও আলো।' এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা সাবধানী (তাকওয়ার অধিকারী) তাদের জন্যই আসমানী কিতাব ইঞ্জিল পথের নির্দেশ ও আলো।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৭

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

❒ ইঞ্জিল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারা সত্যত্যাগী।

এখানে বলা হয়েছে, ইঞ্জিল অনুসারিগণ যেনো ইঞ্জিলের নির্দেশানুসারে বিধান দেয়; আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা সত্যত্যাগী (ফাসেক)।

একটি সন্দেহঃ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর ইঞ্জিল রহিত হয়েছে অথচ এই আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে, ইঞ্জিল অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা সত্যত্যাগী—এর কারণ কী?

সন্দেহভঞ্জনঃ ইঞ্জিলের সকল নির্দেশ রহিত করা হয়নি। যে সকল নির্দেশ রহিত হয়েছে, সেগুলোর স্থলে কোরআনে নতুন নির্দেশ এসেছে। এখন যদি রহিত নির্দেশের উপর কেউ আমল করে, তবে তাতে করে ইঞ্জিলেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। কারণ, আল্লাহ্পাকই নির্দেশ অবতীর্ণ করেন এবং তারপর নির্দেশ রহিত করেন। সুতরাং রহিত নির্দেশ অনুযায়ী আমল করলে তা চলে যাবে ইঞ্জিলেরও মূল উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে। ইঞ্জিল অনুসারীরা ছিলেন হজরত ঈসার উম্মত। তাঁরা রসুল মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের পূর্বেই গত হয়েছেন। রসুল মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের পরে তাঁদেরকে হতে হবে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এরই উম্মত (অর্থাৎ রসুল স. এর আগমনের পর তাঁর উম্মতেরাও অন্য সকল আসমানী কিতাবের মতো ইঞ্জিলকে মান্য করেন। কিন্তু ইঞ্জিলের রহিত নির্দেশ অনুসারে আমল করেন না। ইঞ্জিলেরও নির্দেশ এই যে, রহিত হুকুমের উপর আমল করা যাবে না। সুতরাং রহিত হওয়ার পরেও যারা রহিত নির্দেশের অনুগামী হবে, তারা ইঞ্জিলেরও বিরোধী)।

এখানে ফাসেক বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয় না। এখানে ফাসেক অর্থ কাফের (অবিশ্বাসী, ইমান বহির্ভূত)। কারণ তারা আল্লাহ্র নির্দেশের অবমাননা করে।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

❒ তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তদ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহা করেন নাই। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহের দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

'তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে'—এখানে প্রথমে উল্লেখিত কিতাব অর্থ কোরআন মজীদ এবং পরে উল্লেখিত কিতাব অর্থ কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাব। 'মুহাইমিনান' শব্দটির অর্থ সাক্ষী—এ কথা বলেছেন মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী এবং কাসাই। হজরত ইকরামা বলেছেন শব্দটির অর্থ, বর্ণনাকারী। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের এবং হজরত আবু উবাদা বলেছেন এর অর্থ, সংরক্ষক। হাসান বসরী বলেছেন বিশ্বাসী। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব এবং জুহাক বলেছেন, বিচারক। খলিল বলেছেন, সংক্ষণকারী। এ সকল শব্দ প্রায় সমার্থক। মূল উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল কিতাবকে কোরআন মজীদ সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়, সে সকল কিতাব আল্লাহ্র কিতাব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্রই কিতাব। ইবনে জারীহ্ বলেছেন কোরআন মজীদ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সংরক্ষক। আহলে কিতাবগণ যা কিছু বর্ণনা করে, সেগুলোর বিবরণ যদি কোরআন মজীদে থাকে, তবে

সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। কোরআনে সেগুলোর সমর্থন না থাকলে সেগুলোকে গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ কোরআন যেগুলোকে প্রত্যয়ন করবে, সেগুলোই সত্য এবং যেগুলোকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করবে সেগুলো মিথ্যা। আর যে বিষয়ে কোরআন নিশ্চুপ থাকবে, সে বিষয়ে তোমাদেরকেও থাকতে হবে নিশ্চুপ। সেগুলোকে সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যাবে না।

'মুহাইমিন' শব্দটি মূলে ছিলো 'মুয়াইমিন'। যার অর্থ আমানতদার বা সংরক্ষক। মুয়াইমিনের 'হামযা' অক্ষরটির স্থলে 'হা' বসিয়ে শব্দটিকে করা হয়েছে মুহাইমিন।

'সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার মীমাংসা কোরো এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না'।—এ কথার অর্থ, হে প্রিয় রসুল! আপনার উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই কিতাবই সর্বশেষ কিতাব। সে কিতাব (কোরআন) কখনও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিধানের অনুকূল। কখনও পূর্ববর্তী বিধানের রহিতকারী। সুতরাং আপনি সর্বশেষ কিতাবের বিধানানুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন। অন্য কোনো দিকে দৃকপাত করবেন না। জনতার (প্রধানত ইহুদীদের) খেয়াল-খুশীকে প্রশ্রয় দেবেন না।

'লিকুল্লি জায়ালনা মিনকুম শিরআতাঁও ওয়া মিনহাজা'— এ কথার অর্থ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। এখানে 'শিরআতা' বা আইন অর্থ শরিয়তের আইন এবং মিনহাজা অর্থ পথ বা ধর্মপথ। 'মিনহাজা' শব্দটি এসেছে নাহাজুন থেকে। নাহাজার অর্থ উন্মুক্ত। বায়যাবী এই আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে বলেছেন, আমরা বিগত কোনো শরিয়তের হুকুম মানতে বাধ্য নই। এর উত্তরে আমরা বলি, যদি আমাদের কোরআন ও হাদিসে পূর্বের কোনো আসমানী কিতাবের হুকুম থেকে থাকে যা রহিত হয়নি, তবে আমরা সেই বিধান মানতে বাধ্য। কারণ, ওই বিধান আমাদেরই শরিয়তের অন্তর্ভূত। এতে করে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য অবতীর্ণ বিশেষ বিধান বিশেষভাবে তাদের জন্যই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত সাধারণভাবে সকলের জন্য। সুতরাং পূর্বের সকল হুকুমকে বাতিল বলা জ্ঞান বর্হিভূত বিষয় এবং তা বিভিন্ন বিশুদ্ধ বর্ণনার প্রতিকূল। তবে বিভিন্ন নবীর শরিয়তে বিভিন্ন প্রকার বিধান অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেগুলো মূল বিষয় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতভিন্নতা রয়েছে শাখাগত বিধানের মধ্যে।

'ইচ্ছে করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তা করেন নি।'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করে দিতে পারতেন। আর সে রকম করলে তাঁর বিধান হতো অপরিবর্তনশীল।

কোনো বিধানই রহিত হতো না। নতুন নতুন বিধানের প্রবর্তনাও ঘটতো না। কিন্তু আল্লাহ্পাক এ রকম করেননি। একের পর এক পৃথক পৃথক উম্মত হিসেবে তোমাদেরকে পৃথিবীতে এনেছেন। এ রকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমাদেরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়া— যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহ্পাকের বিধানকে মান্য করে চলে এবং কারা পিতৃপুরুষদের অন্ধ বিশ্বাসে অনড় থাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ— আল্লাহ্পাক যদি চাইতেন, তবে সকল মানুষকে বল প্রয়োগপূর্বক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন। কিন্তু তোমাদেরকে যাচাই করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তাই তিনি তোমাদের উপর বল প্রয়োগ করেননি।

'সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো; আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।'—এ কথার অর্থ হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে তোমরা সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হও। আল্লাহ্র অবশ্যপালনীয় বিধানকে মেনে নিয়ে পুণ্যের পথে অগ্রগামী হতে চেষ্টা করো যাতে— অধিকতর পুণ্যলাভ নিশ্চিত হয়। রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো উত্তম পন্থা প্রবর্তন করবে, সে ওই উত্তম পন্থার জন্য সওয়াব লাভ করবে। আর ওই উত্তম পন্থা যারা অবলম্বন করে পুণ্য কর্মে ব্রতী হবে, তাদের সকলের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে তাকে, অনুসারিগণের সওয়াবও কম করা হবে না।

'আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন'—এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই মর্মে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হে মানুষ! তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট সমবেত হতেই হবে। সুতরাং তাঁর স্বস্তি ও শাস্তির প্রসঙ্গটি বিস্মৃত হয়ো না। তিনি আখেরাতে পুণ্যবানদেরকে সওয়াব দান করবেন এবং অবাধ্যদেরকে শাস্তি দিবেন।

'অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।' —এ কথার অর্থ কিয়ামত দিবসে তিনি সত্যানুসারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিবেন। অনুগতদেরকে দান করবেন পুরস্কার এবং তিরস্কার করবেন অবাধ্যদেরকে। তখন সকলে বুঝতে পারবে, কে সত্যাশ্রয়ী এবং কে মিথ্যানুসারী।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কা'ব বিন আশরাফ, আবদুল্লাহ বিন সুরিয়া এবং শাছ বিন কায়েস নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, চলো মোহাম্মদের নিকট যাই। সম্ভবতঃ আমরা বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে তার ধর্ম থেকে বিরত রাখতে পারবো। রসুল স. এর দরবারে তারা উপস্থিত হয়ে বললো, হে মোহাম্মদ! আপনি তো জানেন আমরা ইহুদীদের আলেম ও নেতা। আমরা যদি আপনার অনুসারী হই তবে সকলেই আপনার অনুসারী হবে। বিরোধিতা করার কেউ থাকবে না। এখন আমরা আপনার কাছে এসেছি

একটি মোকদ্দমা নিয়ে। আপনি যদি এই মোকদ্দমায় আমাদের পক্ষে রায় দেন, তবে আমরা আপনার ধর্মে বিশ্বাস করবো। রসুল স. তাদের এই অপ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৯

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝

❒ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

এই আয়াতেও আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে কোরআনের বিধানানুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইহুদীদের খেয়াল-খুশীকে প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করেছেন। আর এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ইহুদীরা যেনো আপনাকে সত্য ধর্ম থেকে অপসারণের প্রচেষ্টায় কিছুতেই সফল না হয়। মূল বক্তব্য এই যে, হে রসুল! আপনি সদা সতর্ক থাকুন। ইহুদীরা আপনার দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সদা তৎপর। তাই আল্লাহ্পাক আপনাকে তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতত সাবধান থাকার উপদেশ দিচ্ছেন।

এরপর বলা হয়েছে, যদি তারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে হে প্রিয় রসুল! আপনি জেনে রাখুন তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহ্পাক তাদেরকে ইহজগতে শাস্তি দিতে চান। পাপে পাপে তারা আমস্তক নিমজ্জিত। সেই সকল পাপের মধ্যে এখানে কোনো কোনো পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কোনো কোনো পাপ অর্থ রসুল স. প্রতি অবতীর্ণ কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। নিশ্চয়ই এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরু।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইন্না কাছিরুম মিনান্নাসি লাফাসিকুন'—এ কথার অর্থ, মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ইহুদীদের মধ্যে অধিকাংশই ফাসেক (অবাধ্য)। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অহংকারী ও অবিশ্বাসে সীমালংঘনকারী।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

❒ তবে কি তাহারা প্রাক-ইসলামী যুগের বিচার-ব্যবস্থা কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?

কোনো কোনো বর্ণনাকারী লিখেছেন, বনী কুরায়জা ও বনী নাজিরের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তারাই রসুল স. এর নিকট আবেদন করেছিলো, তিনি স. যেনো ইসলাম পূর্ব যুগের প্রচলিত রীতি অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করে দেন। ওই মূর্খতার যুগের রীতি ছিলো, প্রভাবশালী ও দুর্বল গোত্রের মধ্যে কিসাসের ব্যাপারে সমতা রক্ষা না করা, তওরাতে উল্লেখিত ব্যভিচারের শাস্তিকে লঘু করে দেয়া ইত্যাদি। ইহুদীদের ওই সকল মূর্খজনোচিত কর্মকাণ্ডের দিকে লক্ষ্য করে আয়াতের প্রথমে প্রশ্ন করা হয়েছে 'তবে কি তারা প্রাক ইসলামী যুগের বিচার ব্যবস্থাকে কামনা করে? এভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মূর্খতার যুগের রীতির অনুরাগী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হে রসুল! আপনি নিশ্চয়ই এ রকম করবেন না।

এরপর বলা হয়েছে, 'নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর'—এ কথার অর্থ প্রকৃত বিশ্বাসীরাই পরিণামফল সম্পর্কে সচেতন তাই তাঁরা চিন্তাভাবনা করে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, আল্লাহ্পাকের চেয়ে উত্তম এবং নিখুঁত নির্দেশ দানকারী আর কেউ হতে পারে না। মানুষের জ্ঞান অপূর্ণ এবং আল্লাহ্পাকের জ্ঞান পূর্ণ। মানুষের মধ্যে রয়েছে লোভ, ক্রোধ, হিংসা এবং পক্ষপাতিত্ব। দেশীয় প্রথা, বংশ, ভাষা, বর্ণ গৌরব ইত্যাকার অনেক প্রভাবে মানুষ প্রভাবান্বিত। কিন্তু আল্লাহ্পাক সকল প্রকার প্রভাব ও পক্ষপাতিত্ব থেকে চিরমুক্ত। তাই তাঁর প্রদত্ত বিধানের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানগর্ভ রহস্য ও নিশ্চিত ন্যায়পরায়ণতা। তাই তাঁর নির্দেশ অবশ্য মাননীয়।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। এরপর সে ভাবলো, আমরা বনী কুরায়জা এবং বনী নাজিরের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। এমন তো হতে পারে যে, মুসলমানেরা পরাস্ত হবে, আর ইহুদীরা হবে বিজয়ী। তখন তো আত্মরক্ষা হয়ে পড়বে অসম্ভব। এ রকম শয়তানী চিন্তার কারণে সে ইসলাম পরিত্যাগ করলো। হজরত উবাদা বিন সামেত বললেন, আমি বনী কুরায়জা ও বনী নাজিরের সন্ধির ব্যাপারে আল্লাহ্পাকের সমীপে তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছি। এখন আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। আর আমার সাথে রয়েছে মুসলমানদের জামাত। তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আমানু ইন্নামা ওয়ালিউকুমুল্লহ্ (হে বিশ্বাসীগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের বন্ধু) থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত (আয়াত ৫৫)।

ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, বনু কায়নুকার সঙ্গে ইহুদীদের যুদ্ধ শুরু হলো। ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিলো আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল। তাই সে ইহুদীদের পক্ষ নিলো। ইহুদীদের সঙ্গে হজরত উবাদা বিন সামেতেরও সন্ধি ছিলো। কিন্তু তিনি রসুল স. এর পক্ষে গেলেন এবং বললেন, আমি ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধির বন্ধন ছিন্ন করলাম। ইহুদীদের পক্ষ যারা নিয়েছে, আল্লাহ এবং রসুলের সম্মুখে আমি তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছি। হজরত উবাদা ছিলেন বনী খাজরাজের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সম্পর্কে এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ্ বিন উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

❒ হে বিশ্বসীগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে।আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

এই আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।' এ কথার অর্থ, তোমাদের প্রতি শত্রুতা করার দিক থেকে তারা একই মত ও পথের অনুসারী। এরপর বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করলে সে হবে তাদেরই একজন।' এ কথার অর্থ, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বন্ধু হিসেবে ইহুদীদের পক্ষ নিয়েছে। সুতরাং সেও তাদের মতো কাফের এবং মুনাফিক। রসুল স. তখন বললেন, আবুল হাব্বাব! ইহুদীদের বন্ধুত্ব থেকে তোমরা যা অতিরিক্ত লাভ করবে, তা তোমাদের জন্য রইলো। উবাদা এর মধ্যে নেই। আবদুল্লাহ বিন উবাই বললো, তবে তাই হোক।

'সে হবে তাদেরই একজন' কথাটির রূপক অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ ইহুদী খৃষ্টানদের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব রাখবে, সে হবে ফাসেক-কাফেরের মতো। সে হবে তাদেরই একজন—এ রকম বলে নিষেধাজ্ঞাটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলা হয়েছে। এখানে এ কথাই বলা উদ্দেশ্য যে, কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধুত্ব অভিপ্রেত নয়। রসুল স. বলেছেন, যে মুসলমান মুশরিকদের সঙ্গে থাকে আমি তার জিম্মাদার নই (যুদ্ধের সময় কোনো মুসলমান সৈন্য হয় তো তাকে কাফের মনে করে হত্যা করে ফেলবে)। নির্ভরযোগ্যসূত্রে হজরত খালেদ বিন ওলিদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। তিরমিজি, নাসায়ী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহ থেকে।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আয়াযের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর ইয়েমেনের প্রশাসক হজরত আবু মুসা আশআরীকে একবার নির্দেশ দিলেন, আপনি যা কিছু লেনদেন করেছেন, তা লিখিতভাবে উপস্থিত করুন। হজরত আবু মুসার সচিব ছিলো একজন খৃষ্টান। সে নিখুঁতভাবে আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করলো। হজরত ওমর বিস্মিত হয়ে বললেন, এ লোকের স্মৃতিশক্তিতো অত্যন্ত প্রখর। আমার কোনো চিঠি যখন তোমার কাছে যায় তখন তুমি কি একে মসজিদের ভিতরেই চিঠি পড়তে দাও। হজরত আবু মুসা বললেন, সে তো মসজিদে প্রবেশ করবে না। হজরত ওমর বললেন, কেনো? সে কি অপবিত্র? তিনি বললেন, সে খৃষ্টান। হজরত আবু মুসা বলেছেন, আমার এই কথা শুনে হজরত ওমর আমাকে বকুনি দিলেন এবং আমার উরুদেশে প্রহার করলেন। বললেন, একে বের করে দাও। তারপর পাঠ করলেন এই আয়াতটি। ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা লাইয়াহ্দিল ক্বওমাজ্ জ্বলিমিন' (আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না)। —এ কথার অর্থ, ওই সকল লোককে আল্লাহপাক হেদায়েত করেন না, যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ক'রে নিজেদের উপর জুলুম ক'রে এবং মুসলমানদের উপর জুলুম ক'রে তাদের শত্রুদের সাহায্যকারী হয়।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫২, ৫৩

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ؕ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

❒ এবং যাহাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে সত্বর তাহাদের সহিত মিলিত হইতে দেখিবে এই বলিয়া যে, 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিবে।' হয়তো আল্লাহ্ বিজয়, অথবা তাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু দিবেন যাহাতে তাহারা তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে।

❒ এবং বিশ্বাসীগণ বলিবে, ইহারাই কি তাহারা যাহারা আল্লাহের নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করিয়াছিল যে, তাহারা তোমাদের সঙ্গেই আছে? তাহাদের কার্য নিষ্ফল হইয়াছে; ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ও তার সঙ্গী সাথীদের সম্পর্কে আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, তাদের অন্তঃকরণে রয়েছে ব্যাধি।হে রসুল! আপনি দেখবেন তারা সত্বর গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে এবং বলছে, আমাদের আশংকা হয়, হয়তো আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুনাফিকদের এ কথার অর্থ, অন্তরের ব্যাধির কারণে তারা এ রকম আশংকা করতে শুরু করেছিলো, রসুল স. হয়তো শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদেরও মনে হতে লাগলো, আমাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব হয় তো শেষ পর্যন্ত থাকবে না। তখন হয়তো আবার ইহুদীদের মুখাপেক্ষী হতে হবে। হয়তো দুর্ভিক্ষ এসে যাবে। তখন ইহুদীরা সাহায্য সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবে। মু'মিনদের ভাগ্য বিপর্যয়ের আশংকাটি ছিলো এ রকম।

ইবনে জারীর এবং ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত উবাদা বিন সামেত রসুল স.এর নিকট নিবেদন করলেন, ইহুদীদের অনেকের সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা রয়েছে। কিন্তু আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলাম এবং ওই সকল প্রাক্তন বন্ধুদেরকে অস্বীকার করলাম। আমি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো, আমার ভয় হয়, ভবিষ্যতে হয়তো এ রকম পরিস্থিতি থাকবে না। হয়তো এক সময় আমাদেরকে তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে। সুতরাং সতীর্থ ইহুদীদের সঙ্গে আমি সন্ধি ও বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে পারবো না। রসুল স.বললেন, আবুল হাব্বাব (হে বন্ধুর পিতা) ইহুদীদের বন্ধুত্ব নিয়ে তুমি থাকো। উবাদা এর মধ্যে নেই। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, ঠিক আছে আমি তাই মেনে নিলাম।

'হয়তো আল্লাহ্ বিজয়, অথবা তাঁর নিকট থেকে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিলো তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।' — এখানে যে বিজয় দানের কথা বলা হয়েছে সেই বিজয় হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ বিজয়। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্পাক মুসলমানদের সেই পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছিলেন। কাতাদা এবং মুকাতিল বলেছেন, এ কথার মাধ্যমে রসুল স.কে নির্বিবাদে মেনে নেয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে বিজয়ের অঙ্গীকার। সুতরাং তাঁকে মেনে না নিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। কালাবী ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে বিজয় অর্থ মক্কা বিজয়। জুহাক বলেছেন, খায়বর, ফদক এবং অন্যান্য ইহুদী জনপদ বিজয়।

'তাঁর নিকট থেকে এমন কিছু দিবেন'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের গোপন চক্রান্তকে প্রকাশ করে দিবেন। তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। বনী কুরায়জাকে হত্যা করা হবে এবং বনী নাজিরকে করা হবে বহিষ্কার। এভাবে আরব ভূখণ্ড থেকে ইহুদীদের মূলোৎপাটন করা হবে।

'তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিলো তার জন্য অনুতপ্ত হবে।'—এ কথার অর্থ তখন মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় দেখে তাদের অন্তরের ব্যাধি, কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

এর পরের আয়াতে (আয়াত ৫৩) বলা হয়েছে, 'তখন বিশ্বাসীরা বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিলো যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে।' এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের পর মুনাফিকদের আচরণ যখন সুস্পষ্ট হয়ে পড়লো তখন মুসলমানেরা বিস্মিত হয়ে বললেন, এরা কি সেই সকল লোক যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ় শপথ করেছিলো। দৃঢ় শপথ বুঝতে এখানে 'যাহ্দা আইমন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'ইন্নাহুম লামায়াকুম'—অর্থ আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। মুনাফিকেরা কসম খেয়ে এ রকম বলতো। কিন্তু বাস্তবে তাদের আচরণ ছিলো এর বিপরীত। তাই পরিপূর্ণ বিজয়ের পর মুসলমানেরা তাদের স্বরূপ বুঝতে পেরে বিস্মিত হয়ে বলবে, এরাই তো সেই লোক, যারা দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলতো, 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি।' তারা আরও বলতো তোমাদেরকে যদি বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো। মুনাফিকেরা মুখে এ রকম বলবে বটে, কিন্তু বাস্তবে করবে এর বিপরীত। তাই ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানেরা বিস্মিত অথবা আনন্দিত হয়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলবে।

'তাদের কার্য নিষ্ফল হয়েছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' এই বাক্যটি মুনাফিকদের আচরণ দৃষ্টে বিস্মিত ও আনন্দিত মুসলমানদের হতে পারে, যা তাঁরা বলবেন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর। আবার কথাটি আল্লাহ্পাকেরও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে মুনাফিকদের সম্পর্কে এটাই আল্লাহ্পাকের চূড়ান্ত ঘোষণা যে, তাদের কার্য নিষ্ফল এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ
بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ
يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ
ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ দ্বীন হইতে ফিরিয়া গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন ও যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে; তাহারা বিশ্বাসীদিগের প্রতি কোমল ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের

প্রতি কঠোর হইবে; তাহারা আল্লাহের পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না; ইহা আল্লাহের অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

'তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে'—এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায়, আল্লাহ্পাক সবকিছু জানেন, তাই রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর যারা ইসলাম পরিত্যাগ করবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এখানে এ রকম বলেছেন। হাসান বসরী থেকে এ রকম বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাক জানতেন যে, ভবিষ্যতে কিছু লোক ধর্মত্যাগ করবে। এই আয়াতের মাধ্যমে তিনি সে কথাই জানিয়েছেন। পরবর্তীতে রসুল স. এর মহাঅন্তর্ধানের পর সাধারণ আরববাসী নতুন মুসলমানেরা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলো। ইসলামে অনড় রইল কেবল মক্কাবাসী, মদীনাবাসী এবং বাহরাইনের অধিবাসীগণ (কবিলায়ে আবদুল কায়েস)। মুরতাদেরা বললো, আমরা নামাজ পড়বো, কিন্তু জাকাত দিবো না। কেউ আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর তখন সাহাবীগণকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে বিশ্বাসীগণের নেতা! তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করুন। ধীরে ধীরে তারা ধর্মজ্ঞান লাভ করবে, তখন আর তারা জাকাত দিতে অস্বীকৃত হবে না। হজরত আবু বকর বলেন, আল্লাহ্পাক যে নির্দেশগুলোকে অবশ্য পালনীয় করেছেন আমি সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের বিধানানুযায়ী প্রাপ্য একটি রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। তিনি ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তাদের অনেকে হলো নিহত ও আহত। শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়ে তারা জাকাত প্রদান করতে স্বীকৃত হলো। হজরত কাতাদা বলেছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর এবং তাঁর সঙ্গীগণ সম্পর্কে। অর্থাৎ এখানে 'ইয়াতিহিম' শব্দটির 'হিম' বা 'হুম' একটি অতিরিক্ত সংযোজন— সম্ভবতঃ হজরত কাতাদা এমনই বলেছেন (বি ক্বওমিন ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বুনাহু)। এ রকম বর্ণনা করেছেন আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ, বায়হাকী ও ইবনে আসাকের।

কেবল হজরত আবু বকরের যুগেই ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন এককভাবে। সাহাবীগণ ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে বিনম্র আচরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, হজরত আবু বকরের সিদ্ধান্তই সঠিক। তাঁরা তখন হজরত আবু বকরের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট এই আয়াত পাঠ করলাম এবং জানতে চাইলাম তারা কোন সম্প্রদায়, যাদেরকে আল্লাহ্পাক ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহ্পাককে ভালোবাসবে। রসুল স. বললেন, তারা ইয়েমেনের অধিবাসী বনী কুনদা—বনী কুনদার মধ্যে কবিলায়ে সুকুন—কবিলায়ে সুকুনের মধ্যে কবিলায়ে নজিব গোত্রের লোক।

কাশেম বিন মোহমারা বলেছেন, আমি একবার হজরত ওমরের খেদমতে হাজির হতেই তিনি আমাকে মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন। তারপর পাঠ করলেন এ আয়াত। পাঠ শেষে আমার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করে তিনবার বললেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, এই আয়াতে তোমাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে —'আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহপাককে ভালোবাসেন।' বোখারী। আমি বলি, হজরত আবু বকরের সেনাবাহিনী ইয়েমেনবাসীদের সহায়তায় ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। কাজেই এ সম্পর্কে বর্ণিত দু'টো ঘটনাই সঠিক।

'আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে'—এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদের মধ্য থেকেই একটি দলকে ভালোবাসবেন, তারা হবে আল্লাহ্‌পাকের বন্ধু। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের ওই প্রিয় দল কোনটি — সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই দলটি হচ্ছে হজরত আলী এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা। হাসান, জুহাক ও কাতাদা বলেছেন, হজরত আবু বকর ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। তাঁরা জাকাত প্রদানে অস্বীকৃত ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন। ঘটনাটি ছিলো এ রকম—রসুল স.এর মহাঅন্তর্ধানের পর মক্কা মদীনা এবং বাহরাইনের কবিলায়ে আবদে কায়েসের অধিবাসীরা ছাড়া অন্যান্য নতুন মুসলমানেরা মুরতাদ হয়ে গেলো। তারা বলে বসলো আমরা জাকাত দিতে পারবো না। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারলেন না। হজরত ওমর বললেন, এ সকল লোক কলেমা পাঠ করেছে। সুতরাং আপনি কীরূপে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান? রসুল স. বলেছেন, আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে ওই সময় পর্যন্ত জেহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে —যতোক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলে। যে এই কলেমা পাঠ করবে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ। তার অন্তরের হিসাব গ্রহণ করবেন আল্লাহ্ই। হজরত আবু বকর বললেন, নামাজ ও জাকাত— দু'টোই ফরজ। আল্লাহ্‌পাকের এই ফরজ হুকুমের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার বিরুদ্ধে জেহাদ করবো। নামাজ যেমন দৈহিক ইবাদত, তেমনি জাকাত হচ্ছে সম্পদগত ইবাদত। আল্লাহ্‌র শপথ! রসুল স.কে যারা জাকাত হিসেবে বকরির বাচ্চা দিয়েছে, তারা যদি এখন তা দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

হজরত আনাস বলেছেন, জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে প্রথম দিকে সাহাবীগণ অসম্মত ছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, জাকাত অস্বীকারকারীরাও তো আহলে কেবলা (কাবামুখী হয়ে নামাজ পাঠকারী)। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসমীচীন। কিন্তু যখন হজরত আবু বকর তরবারী নিয়ে একাই যুদ্ধ করতে চললেন, তখন সাহাবীগণ আর তাঁর অনুসরণ না করে পারলেন না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, প্রথম দিকে আমরা হজরত আবু বকরের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু পরে আমরা প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে পেরেছি এবং হজরত আবু বকরের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছি। আবু বকর বিন আয়াশ বলেছেন, আমি হজরত আবু হাফস্‌কে বলতে শুনেছি—নবী রসুলগণের পর হজরত আবু বকরের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। রসুল স.এর মহাতিরোধানের পর তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর স. মহাযাত্রার আগেই তিনটি গোত্র মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। ১. বনী মুযহাজের সর্দার ছিলো জুলহেমার আবহেলা বিন কা'ব আনাসী। তার উপাধি ছিলো আসওয়াদ। সে ছিলো যাদুকর ও গণক। ইয়েমেনে সে নবুয়ত দাবি করলো এবং ইয়েমেনের একটি শহর অধিকার করে নিলো। রসুল স. সেখানকার প্রশাসক হজরত মুয়াজ বিন জাবালকে লিখে জানালেন, মানুষকে ধর্মে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবার নির্দেশ দাও। আসওয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল তাই করলেন। তাঁর নির্দেশে ফিরোজ দায়লামী অতর্কিতে আসওয়াদের গৃহে প্রবেশ করে তাকে শায়িত অবস্থাতেই হত্যা করলেন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মদীনায় শেষ যাত্রার জন্য অপেক্ষারত রসুল স. তখন বলে উঠলেন, গত রাতে আসওয়াদকে হত্যা করা হয়েছে। তাকে হত্যা করেছে এক পবিত্র ব্যক্তিত্ব। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসুল! সেই ব্যক্তির পরিচয় কী? রসুল স. বললেন, ফিরোজ। ফিরোজ সফল হয়েছে। পর দিন রসুল স. পাড়ি দিলেন পরজগতে। মদীনায় আসওয়াদের হত্যার সংবাদ এলো রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে। তখন হজরত উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চলেছে যুদ্ধের দিকে। তিনিও বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন মদীনায়।

২. রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময়েই দশম হিজরী সনের শেষ ভাগে বনী হুনাইফার সর্দার মুসায়লামা কায্‌যাব নবুয়তের দাবী করে বসলো। সে ধারণা করতো, মোহাম্মদ স. এর সঙ্গে আমাকেও নবুয়ত দান করা হয়েছে। সে রসুল স. এর নিকট দু'জন দূতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করলো। সেই পত্রে লিখা ছিলো— অর্ধেক পৃথিবী আমার এবং অর্ধেক আপনার। রসুল স. দূতদ্বয়কে বললেন, যদি দূত হত্যা সমীচীন হতো তবে এক্ষুণি আমি তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম। অতঃপর রসুল স. পত্রের উত্তরে লিখলেন—রসুল মোহাম্মদের নিকট থেকে মুসায়লামা কায্‌যাবের প্রতি। আম্মাবাদ, সমস্ত পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই এর অধিকারী করে দেন এবং পরহেজগারদের জন্যই রয়েছে উত্তম বিনিময়। এর কিছুদিন পরে রসুল স, পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং এক মহাপবিত্র ক্ষণে লাভ করলেন মাশুক মিলন। এরপর হজরত আবু বকর মুসায়লামার বিরুদ্ধে হজরত খালেদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে প্রেরণ করলেন এক বিশাল বাহিনী। যুদ্ধ শুরু হলো। ওই যুদ্ধে হজরত ওয়াহ্‌শী বল্লমের আঘাতে মুসায়লামাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ওহুদ যুদ্ধের সময় শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযাকে শহীদ করে

দিয়েছিলেন। মুসায়লামাকে হত্যার পর তিনি বললেন, আমি মুসলমান হওয়ার আগে শহীদ করে দিয়েছিলাম সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে। আর মুসলমান হওয়ার পরে আজ হত্যা করলাম সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে।

৩. বনী আসাদের সর্দার ছিলো তুলায়হা বিন খুয়াইলিদ। নবুয়তের দাবিদারদের মধ্যে সে ছিলো সর্বশেষ ব্যক্তি। সে ধর্মত্যাগী হয়ে রসুল স.এর মহাপ্রস্থানের আগেই নবুয়তের দাবি করে বসলো। রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর হজরত আবু বকর হজরত খালেদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন এক মুজাহিদ বাহিনী। হজরত খালেদের বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে সে শামদেশে চলে গেলো। কিছুদিন সেখানে বসবাসের পর সে পুনরায় ফিরে এলো ইসলামের চির সুবাসিত কাননে। তাঁর এই ইসলাম গ্রহণ ছিলো বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ।

রসুল স. এর পরজগত গমনের পর হজরত আবু বকরের খেলাফতের সময় অনেক লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। মুরতাদেরা ছিলো সাতটি গোত্রভূত —১. বনী ফাযারাহ্ ২. বনী গাতফান ৩. বনী সুলাইম ৪. বনী ইয়ারবু ৫. খানদানে বনী তামীমের কিছু অংশ (মুসায়লামা কাযযাবের স্ত্রীও ছিলো এই দলে)। ৬. বনী কুনদাহ্ এবং ৭. বনী বকর বিন ওয়ায়েল। হজরত আবু বকর ওই সাতটি গোত্রকেই পূর্ণরূপে পরাস্ত করে সত্য ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মাতা আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পরকাল গমনের সঙ্গে সঙ্গে আরববাসীদের অনেকে মুরতাদ হয়ে গেলো। আমার পিতার স্কন্ধে আপতিত হলো চরম মুসিবত। ওই মুসিবত কোনো পাহাড়ের উপর পতিত হলে নিশ্চয় সেই পাহাড়ের চুড়া ভেঙে পড়তো।

হজরত ওমরের খেলাফতের সময় জাবালা বিন আয়হাম গোত্রের গাসসান মুরতাদ হয়ে গেলো। সে এক দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রহার করেছিলো। হজরত ওমর এর বদলা নেয়ার নির্দেশ দিলেন। গাসসানের আভিজাত্যবোধে এই নির্দেশ চরম আঘাত করলো। ক্ষোভে দুঃখে সে ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলো এবং চলে গেলো শামদেশে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহতায়ালার বন্ধু অর্থ আশয়ারী গোত্রের লোকেরা। হজরত আয়াস বিন গানাম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো তখন রসুল স. হজরত আবু মুসা আশয়ারীর দিকে ইশারা করে বললেন, এই ব্যক্তির গোত্রভূতরাই এই আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্‌পাকের প্রিয়জন। ইবনে জারীর, তিবরানী ও হাকেম। আশয়ারী গোত্রের লোকেরা ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের নিকট এক অধিবাসী এসেছে। তারা বড়ই কোমল চিত্ত। ইমান তো ইয়েমেনীদেরই অধিকারে। হিকমতেরও অধিকারী তারা। বোখারী, মুসলিম। কালাবী বলেছেন তাঁরা ছিলেন ইয়েমেনের বিভিন্ন গোত্রের লোক—কবিলায়ে নাখয়ার দুই হাজার,

বনী কুনদাহ্ এবং বাহলীয়ার পাঁচ হাজার এবং অন্যান্য গোত্রের তিন হাজার। তাঁরা সকলেই হজরত ওমরের খেলাফতের সময় অতিগুরুত্বপূর্ণ কাদসীয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে, 'আজিল্লাতিন আলাল মু'মিনিনা আয়িয্যাতিন আলাল কাফিরিন' (তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর হবে)—এখানে 'আজিল্লাতিন' শব্দটি 'জালিলুন' শব্দটির বহুবচন। অতীতকালবোধক হলে 'জাল্লা,' বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালবোধক হলে 'ইয়াজিল্লু' হবে। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'জিল্লাতুন,' 'জুলালাতুন,' 'জালালাতুন' এবং 'মাজাল্লাতুন' থেকে। 'জাল্লা' অর্থ অপদস্থ হওয়া, সহজ হয়ে যাওয়া। কামুস। 'জাল্লাত' যদি নিজের দিক থেকে নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে হয়, তবে তা প্রশংসনীয়। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'ওয়াখফিদ্ব লাহুমা জানাহাজ্ জুল্লি মিনার রহমাত' (এবং তাদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সাথে নত থাকবে)। অর্থাৎ মাতা পিতার জন্য নম্রতা ও বিনয়ের হস্ত প্রসারিত করে দাও। অন্য কারো দিক থেকে যদি জিল্লত হয়, তবে তা হবে আযাব। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'তারহাক্বুহুম জিল্লাহ্ দ্বুরিবাত আলাইহিমুজ জিল্লাতু ওয়াল মাসকানাতু' (এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে, আর স্থায়ী হবে তাদের উপর লাঞ্ছনা বা অপমান)। জিল্লতের পরে এসেছে ইয্যাত শব্দটি (আইয্যাতিন আলাল কাফিরিন)। ইয্যাত অর্থ বিজয়ী। আযিযুন ওই ব্যক্তি যে বিজয়ী, অপরাজিত। 'ইয্যাত' যদি অযথার্থ বা মিথ্যা হয়, তবে তা হবে অপ্রশংসনীয়। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন, 'বালিল্লাজিনা কাফারু ফি ইয্যাতিঁউ ওয়া শিক্বাক্ব' (বরং ওই কাফেরেরা বিদ্বেষী ও তারা (সত্যের) বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে)। কখনও রূপক অর্থে ইয্যাত শব্দটি লজ্জা, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ্পাক বলেন, 'আখাজাত হুমুল ইয্যাতু বিল ইছমি ফা হাসবুহু জাহান্নাম' (যখন তাকে বলা হয় আল্লাহ্কে ভয় করো, তখন তার অহংবোধ তাকে পাপপ্রবণ করে তোলে, জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট)। যদি ইয্যাত আল্লাহ্র দিক থেকে হয়, তবে তা হবে নেয়মত ও পূর্ণতা। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'ওয়ালিল্লাহিল ইয্যাতু ওয়ালির রসুলিহি ওয়ালিল মু'মিনিন' (আর প্রকৃত সম্মান আল্লাহ্র জন্যে এবং তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের জন্যে)। অন্যত্র এসেছে, 'মানকানা ইউরিদিল ইয্যাতা ফা লিল্লাজিল ইয্যাতু জামিয়া' (কেউ সম্মান চাইলে সে জেনে রাখুক, সকল সম্মান আল্লাহ্র)। রসুল পাক স. বলেছেন, ইয্যাত আল্লাহ্র দিক থেকে না হলে তা হবে জিল্লত বা লাঞ্ছনা।

বায়যাবী লিখেছেন, 'অজিল্লাতুন' 'জালিলুন'—এর বহুবচন, জালুলুন এর বহুবচন নয়। 'জালুলুন'—এর বহুবচন 'জুলুল।' কিন্তু কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'জালিলুন'—এর বহুবচন জিলাল, আজাল্লা এবং আজিল্লা। জুলুলুন এর বহুবচন জুলুলু এবং আজিল্লাতুন। অতএব আজিল্লাতুন— জালিলুন এবং জুলুলুন শব্দ দু'টোর বহুবচন।

আমি বলি, যদি আজিল্লাতুনকে জুলুলুন—এর বহুবচন ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে সহজ, সরল, কাঠিন্যের বিপরীত। শব্দ দু'টি সমার্থক। প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম— নম্র, বিনয়ী, শান্ত, দয়ালু এবং একে অপরের অনুরাগী। কিয়াস এবং আভিধানিক ধারণা এই যে, আলাল মু'মিনিন (বিশ্বাসীদের প্রতি) এর পরিবর্তে লিল্ মু'মিনিন বলা যেতো। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আ'লা। কেননা, এর পরে আল কাফিরিনের সঙ্গেও আ'লা এসেছে (আজিল্লাতিন আলাল মু'মিনিনা আ ইয্যাতিন আলাল কাফিরিন)। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, আল মু'মিনিনের সঙ্গে আ'লা উল্লেখ করা হলে অর্থ হবে অন্যান্য মু'মিনদের তুলনায় তারা উচ্চ মর্যাদাধারী। তবুও এই মুমিনেরা (এখানে উল্লেখিত বিশ্বাসীরা) অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, জিল্লত শব্দটি নিজেই রহমত এবং দয়া প্রকাশক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আ'লা। তাই আজিল্লাতের পরেও আ'লা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা এমনও বলা যায় যে, 'আজিল্লাতুন' শব্দটি 'আয়িযযাতুন' শব্দের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা 'আজিল্লাতুন' অর্থ সম্মানবিবর্জিত।

'আয়িযযাতিন আলাল কাফিরিন' অর্থ— সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর। অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে তারা হবে শক্তিশালী, কঠোর। এ সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আশিদ্দাউ আলাল কুফফার রুহামা-উ বাইনাহুম (কিন্তু তাঁরা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল)।

'তাঁরা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না'— এ কথার অর্থ, তারা আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে যেয়ে নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, কাফেরদের দোষারোপকে উপেক্ষা করে তারা জেহাদে অবতীর্ণ হবে। মুনাফিকদের অবস্থা এর বিপরীত। তারা মুসলমান সৈন্যদের সাথে থাকে গণিমতের লোভে অথবা তাদের অন্তরের অবস্থা প্রকাশ হয়ে যায় কিনা সেই ভয়ে। তাদের ইহুদী বন্ধুরা তাদেরকে দোষারোপ করে কিনা সে ভয়ও তাদের সঙ্গে লেগে থাকে সারাক্ষণ (আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ মর্যাদার বিশ্বাসীদের এ রকম নিন্দা মন্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র থাকে না)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই আয়াতে আল্লাহ পাকের যে প্রিয় বান্দাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের দুটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এই—১. তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং ২. ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দাকে গ্রাহ্য করবে না।

হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, আমরা রসুল স. এর নিকট একথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি যে, আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো, মানবো, জেহাদ করবো, হক কথা বলবো এবং আল্লাহ্র নির্দেশ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে গ্রাহ্য করবো না। বোখারী, মুসলিম।

'এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন'—আল্লাহ্ প্রদত্ত এই বিশেষ অনুগ্রহের বদৌলতেই তাঁর প্রিয়পাত্রগণ আল্লাহ্পাকের ভালোবাসা লাভ করেন এবং হন বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর, করেন

জেহাদ আল্লাহ্র পথে এবং গ্রাহ্য করেন না নিন্দুকের নিন্দা, অধিক সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে গেলেও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার জন্য তারা দোষারোপকারীর কোনো দোষকে আমলেই আনেন না।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু ওয়াসিউন আলীম'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় (অতি প্রশস্ত), প্রজ্ঞাময়। সম্মানিত সুফী সাধকগণ বলেন, আল্লাহ্পাকের এই প্রাচুর্য বা প্রশস্ততা অতুলনীয়। সৃষ্টির বিশাল পরিসর জুড়ে তাঁর সিফাতের (গুণাবলীর) প্রতিচ্ছবি পতিত হয়। তাঁর প্রশস্ত হওয়ার অর্থ, তাঁর ফজল (অনুগ্রহ) এবং কুদরাত (ক্ষমতা) প্রশস্ত হয়। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। তাই তিনি তাঁর অপার ক্ষমতা কোথায় কখন কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সে সম্পর্কে সম্যক অবগত (ক্ষমতা যদিও তাঁর অসীম, তবুও তিনি তা প্রয়োগ করেন হেকমতের সঙ্গে, অযথার্থরূপে নয়)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৫

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○

❐ তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁহার রসুল ও বিশ্বাসীগণ যাহারা বিনত হইয়া সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'হে বিশ্বাসীগণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না' (আয়াত ৫১) এবং 'এমন এক সম্প্রদায়কে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন' (আয়াত ৫৪) তে বন্ধুত্ব কার সঙ্গে করতে হবে তার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এখানে আরো স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীগণ।' সুতরাং মুসলমানদের বন্ধু তিনজন—আল্লাহ্, রসুল এবং বিশ্বাসীগণ। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনের সিগা—বহুবচনের নয়। অর্থাৎ আউলিয়া না বলে বলা হয়েছে ওলি। এ রকম এক বচন ব্যবহারের কারণ এই যে, প্রকৃত পক্ষে বন্ধু তো একজনই। অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধু কেবলই আল্লাহ্—রসুল ও বিশ্বাসীগণের বন্ধুত্ব তো আল্লাহ্র কারণেই হয়ে থাকে।

'যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়' (আল্লাজিনা ইউক্বিমুনাস্ সলাতা ওয়া ইউতুনায্ যাকাহ্)। এখানে বিশ্বাসীগণের দু'টি প্রধান গুণের কথা বলা হয়েছে। সে দুটো গুণ হচ্ছে বিনয়াবনত সালাত প্রতিষ্ঠা ও জাকাত আদায়। বিনয়াবনত সালাত অর্থ, বিশ্বাসীরা নামাজ পাঠ করে রুকুর সঙ্গে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো তাদের নামাজ রুকুবিহীন নয়। তাই সবশেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াহুম রক্বিউন'—এ অর্থ বিনত হওয়া। জুহুরী লিখেছেন, রুকু অর্থ নম্রতা ও বিনয়।

এ রকমও বলা যেতে পারে যে, তারা যেমন নামাজে রুকু করে, তেমনি জাকাতও প্রদান করে রুকু অবস্থায়। তিবরানী তার আল আওসাত গ্রন্থে এক অপরিচিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হজরত আম্মার বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বিন আবু তালেব একবার নফল নামাজে রুকু অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় হাজির হলো এক যাঞ্চাকারী। তিনি রুকু অবস্থাতেই তাঁর হাতের আংটি খুলে ওই যাঞ্চাকারীকে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তিবরানীর এই হাদিসটি অপরিচিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হলেও এর সমর্থনে অন্যান্য সাক্ষ্যও রয়েছে। আবদুর রাজ্জাক বিন আবদুল ওয়াহাব বিন মুজাহিদ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলী বিন আবু তালেবের শানে। ইবনে মারদুবিয়ার ভিন্ন সূত্রে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আলীকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। মুজাহিদের মাধ্যমে ইবনে জারীর এবং সালমা বিন ফুহাইলের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু জর থেকে ছা'লাবীও এ রকম বলেছেন। এছাড়া হাকেম তাঁর উলুমুল হাদিস গ্রন্থে হজরত আলীর উক্তিরূপে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। এ সকল বিবরণ একটি অপরটির সমার্থক।

এ সকল বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ পাঠরত অবস্থায় আমলে কালীল (গৌণ কর্ম) করলে নামাজ ফাসেদ (নষ্ট) হয় না। এ অভিমতটি ঐকমত্যাগত। এ সকল বিবরণ থেকে আরও একটি বিষয়ও প্রতীয়মান হয় যে, নফল সদকাকেও জাকাত বলা যায়। আয়াতটি বিশেষভাবে হজরত আলীর শানে অবতীর্ণ হলেও এর বিধান সাধারণ। অর্থাৎ যারা হজরত আলীর অনুকূল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, তাঁরাও এই আয়াতে উল্লেখিত শুভ সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে বহুবচনের সিগা ব্যবহৃত হয়েছে।

দান করার ঘটনাটি ঘটেছিলো রুকু অবস্থায়। তাই বিশেষ করে রুকুর কথাটি এসেছে। নতুবা আয়াতের অর্থ হতো এ রকম— কোনো প্রার্থী উপস্থিত হলে তাঁরা যে অবস্থায় থাকেন, সে অবস্থায় দান করেন, বিলম্ব করেন না—রুকুতে, কিয়ামে, উপবিষ্ট অবস্থায়, অথবা দ্বীন-দুনিয়ার যে কোনো কাজে রত থাকুন না কেনো, প্রার্থীর প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূরণ করে। রুকু এখানে ওই সকল অবস্থার প্রতীক।

বায়যাবী লিখেছেন, যদিও আয়াতটি এককভাবে হজরত আলীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এখানে বহু বচনের সিগা ব্যবহার করে অন্যদেরকেও এমতো পুণ্যকর্মে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যেরাও যেনো হজরত আলীর মতো এই বিশেষ পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

আমি বলি, হজরত আলী এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলেও এখানে ইন্নামা শব্দটি ব্যবহারের কারণে অন্যেরাও অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এই অন্যেরা হচ্ছেন বিশ্বাসীগণ। ইহুদী , খৃষ্টান ও অনান্য অবিশ্বাসীরা

নয়। যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসুল' (এবং মোহাম্মদ রসুল ব্যতীত কিছু নন)। এখানে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে অন্যান্য রসুলগণও রয়েছেন।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এসেছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত উবাদা বিন সামেত এবং মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কে। যখন হজরত উবাদা ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিন্ন করে বললেন, আমি আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং মুসলমানদের বন্ধু —তখন অবতীর্ণ হলো চুয়ান্ন এবং পঞ্চান্ন নং আয়াত দু'টি। আলোচ্য আয়াতে 'বিশ্বাসীগণ' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত উবাদা এবং অন্যান্য সাহাবীগণকে।

বাগবী আরো লিখেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের সম্প্রদায় (বনী নাজির ও বনী কুরায়জা) আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। তারা শপথ করে বলেছে, তারা আমাদের সঙ্গে ওঠা বসা করবে না, কোনো প্রকার সম্পর্কও রাখবে না। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এরপর হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম বলেছিলেন, আমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীগণের প্রতি বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট। হজরত জুআইবির বর্ণনা করেন, এই আয়াতে 'বিশ্বাসীগণ' বলে ওই সকল বিশ্বাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা একে অন্যের বন্ধু।

আবু জাফর বিন মোহাম্মদ বিন আলী বাকের বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সকল বিশ্বাসী সম্পর্কে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তবে যে লোকেরা বলে, এই আয়াত কেবল হজরত আলীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। আবু জাফর জবাব দিলেন, তিনিও তো বিশ্বাসীদের দলভূত। আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম। আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া পুস্তকে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত ইকরামা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকরের শানে। বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী সম্পর্কে যে বর্ণনাগুলো এসেছে, সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য বর্ণনাগুলোর আলোকে এখানে 'রকিউন' এর উদ্দেশ্য হবে— দিবসে ও নিশীথে নফল নামাজ পাঠকারীগণ।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৬

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

❒ কেহ আল্লাহ্, তাঁহার রসুল এবং বিশ্বাসীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আল্লাহের দলই তো বিজয়ী হইবে।

যারা আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে এই আয়াতে বলা হয়েছে— 'হিযবুল্লাহ্' (আল্লাহ্র দল)। আরোও বলা হয়েছে

আল্লাহ্র দলই বিজয়ী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'বিশ্বাসীগণ' অর্থ মোহাজির ও আনসার সম্প্রদায়। অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং মোহাজির ও আনসারদেরকে যারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাঁরাই আল্লাহ্র দল।

'হিযবুল্লাহ্' (আল্লাহ্র দল) কথাটির মধ্যে রয়েছে আউলিয়া সম্প্রদায়ের সম্মান, উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ অনুগ্রহ প্রদানের কথা। কারণ তাঁরাই আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের প্রকৃত প্রেমিক। এর বিপরীতে যারা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীগণকে পরিত্যাগ করে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তারা নিশ্চয়ই শয়তানের দল।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'হিয্বুন' অর্থ অযিফা, দল, যুদ্ধাস্ত্র, দিক এবং কোনো ব্যক্তির ওই সঙ্গী— যে তার স্মরণপটে সদা উদ্ভাসিত থাকে। আমি বলি, এখানে শেষ অর্থটিই গ্রহণীয়। বায়যাবী লিখেছেন, যে সকল মানুষ কোনো আপতিত বিপদকে প্রতিহত করার জন্য একত্রিত হয় তারাই হিযবুন। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'হাজাবাহুল আমরু'—অর্থ, তার উপর মুসিবত আপতিত হয়েছে।

রাফেজীরা বলে, খেলাফতের হক ছিলো কেবল হজরত আলীর। তাদের বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে এই আয়াতটিকে তারা উপস্থাপন করে থাকে। এখানে ওলী (বন্ধু) অর্থ তত্ত্বাবধানকারী ও ব্যবস্থাকারী — মোতাওয়াল্লী।

আল্লাহ্পাক তাঁর নিজের এবং তাঁর রসুলের জন্য এ রকম বন্ধুত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবেই তিনি হজরত আলীকেও মুসলমানদের ওলী (অভিভাবক) করে দিয়েছেন এবং 'ইন্নামা' শব্দটিকে সীমারেখা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (যাতে মুসলমানদের ওলী হিসেবে আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং হজরত আলী স্বীকৃত হন। অন্য কারো জন্য এ সম্মানিত বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়নি। কেননা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের ওলী হওয়া ব্যাপকার্থক (সকল মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত)। সুতরাং হজরত আলীর বেলায়েতও ব্যাপকভিত্তিক হবে। তাই হজরত আলীই হবেন ইমাম — তিনি ব্যতীত অন্য কারো খলিফা হওয়ার অধিকার নেই। বিষয়টি প্রমাণার্থে রাফেজীরা হজরত বারা ইবনে আজিব এবং হজরত জায়েদ বিন আরকামের হাদিস উল্লেখ করেছে—যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. গাদিরে খুম নামক কূপের নিকট থামলেন এবং হজরত আলীর হাত ধরে বললেন, তোমরা কি জানো না— আমি স্বয়ং বিশ্বাসীদের বন্ধু। তাদের সত্তার উপরে তাদের নিজেদের অধিকার অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি ঠিকই বলেছেন। রসুল স. তখন প্রার্থনা করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি যাদের মাওলা (অভিভাবক) হবো, আলীও হবে তাদের মাওলা। হে আল্লাহ্! আলীকে যারা ভালোবাসবে আপনি তাদেরকেও ভালোবাসুন। আর আলীর সঙ্গে যারা শত্রুতা করবে আপনি তাদেরকেও শত্রু গণ্য করুন। এই ঘটনার পর হজরত আলীর সঙ্গে হজরত ওমরের সাক্ষাত ঘটলো। হজরত ওমর বললেন, হে ইবনে আবু তালেব, তুমি ধন্য। তুমি প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রতিটি বিশ্বাসী নারী-পুরুষের মাওলা (বন্ধু) হয়ে গিয়েছো। আহমদ। হাদিসটি সর্বজনবিদিত হয়েছে। প্রতি যুগে ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে চলেছে। অন্ততপক্ষে তিরিশ জন সাহাবী থেকে মুহাদ্দিসগণের একটি দল সিহাহ্ সিত্তাহ্ এবং সুনান গ্রন্থসমূহে স্বসূত্রে উল্লেখ করেছেন। হজরত

আলী বিন আবু তালেব, হজরত বুরায়দা বিন হাসিব, হজরত আবু আইয়ুব, হজরত আমর বিন মাররাহ্, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আম্বার বিন বুরায়দা, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর, হজরত আনাস বিন মালেক, হজরত জারীর বিন মালেক বিন হুয়াইরিস, হজরত আবু সাঈদ খুদরী, হজরত তালহা, হজরত আবু তোফায়েল, হজরত হুজায়ফা বিন উসাইদ এবং আরো অনেক সাহাবীর মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে, আলী যার অভিভাবক, তাদের উপর আলীর হক প্রাণের চেয়েও বেশী।

গাদিরে খুমের হাদিস স্পষ্টরূপে হজরত আলীর খেলাফতকে প্রমাণ করেছে। হজরত ইমরান বিন হোসাইনের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আলী আমা হতে, আমি আলী হতে। আলী প্রতিটি মুমিনের ওলী। তিরমিজি, ইবনে আবী শায়বা। বর্ণিত হাদিস দু'টো এই আয়াতের চেয়ে অধিক বিশদরূপে হজরত আলীর খেলাফতকে প্রমাণ করেছে। আর এই আয়াতের শানে নুজুল যদি হজরত আলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় তবে বুঝতে হবে, সকল বিশ্বাসীকে হজরত আলীর বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হাদিস দু'টোতে বিশেষ করে বিবরণ দেয়া হয়েছে তাঁর বেলায়েতের (অন্য কেউ এর অন্তর্ভুক্ত নন)।

আমরা বলি, এই আয়াত এবং বর্ণিত হাদিস দু'টোর মাধ্যমে হজরত আলী ব্যতীত অন্য খলিফাগণের খেলাফত নিষিদ্ধ মনে করলে ভুল হবে। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, ওলী শব্দটি এসেছে 'ওয়ালইউন' থেকে। এটি একটি গুণবাচক বিশেষ্য (ওলী অর্থ প্রিয়জন, বন্ধু, সাহায্যকারী)। সিহাহ্ পুস্তকে জাওহারী লিখেছেন, 'বেলাউন' এবং 'তাওয়ালীউন' অর্থ দুই অথবা দু'য়ের অধিক বন্ধুর মধ্যে প্রতিবন্ধকহীন সম্পর্ক। রূপক হিসেবে এই সম্পর্ক বা নৈকট্য বিভিন্ন প্রকার। যেমন, স্থানের নৈকট্য, বংশীয় নৈকট্য, ধর্মীয় নৈকট্য, বন্ধুত্বের নৈকট্য, সহযোগিতার নৈকট্য, বিশ্বাসগত নৈকট্য এবং প্রভুর নৈকট্য। এর অর্থ কর্মনির্বাহী অথবা ব্যবস্থাপকও হতে পারে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, মাওলা অর্থ মালিক, গোলাম, আযাদকারী এবং যাকে আযাদ করা হয়েছে, সাথী, নৈকট্যভাজন— যেমন, পিতৃব্যপুত্র, ভাগিনেয়, প্রতিবেশী, অঙ্গীকারাবদ্ধ, অতিথি, অভিজাত, প্রতিপালক, বন্ধু, সাহায্যকারী, নেয়ামত প্রদানকারী, নেয়ামতপ্রাপ্ত, প্রিয়ভাজন, অনুগামী, সতীর্থ। কোরআন মজীদে এই শব্দগুলো এসেছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার ভালোবাসা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বুঝাতে। এ সম্পর্ককে বেলায়েতও বলা হয়ে থাকে। ওলী বা বন্ধু শব্দটি বান্দার উপরেও প্রয়োগ করা যায়। যেমন, বলা হয়, ওয়ালীউল্লাহ্। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'আল্লাহু ওয়ালীউল্লাজিনা আমানু' (আল্লাহ্ ইমানদারদের ওলী)। মাওলা শব্দটিও কোরআন মজীদে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির' (তিনি কতই না উত্তম কর্মনির্বাহক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী)। হজরত জিবরাইল এবং পুণ্যবান মুমিনদের সঙ্গেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কোরআন মজীদে। যেমন, 'ইন্নাল্লহা হুয়া মাওলাহু ওয়াজিব্‌রিলু ওয়া সালিহুল মু'মিনিন' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্, জিবরাইল এবং পুণ্যবান বিশ্বাসীগণের সহায়)। প্রকৃত

কথা এই যে, এই আয়াত এবং গাদিরে খুম সম্পর্কিত হাদিসগুলো হজরত আলীর খেলাফতকে সুনির্দিষ্টরূপে প্রমাণ করেনি এবং অন্য খলিফাগণের খেলাফতকেও অস্বীকার করেনি। তবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে হজরত আলীর ভালোবাসার উপযুক্ত হওয়া এবং হাদিসসমূহের মাধ্যমে হজরত আলীর ভালোবাসা অপরিহার্য হওয়া এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ হারাম হওয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হারাম হওয়া।

আবু নাঈম মাদায়েনী বর্ণনা করেছেন, যখন হাসান মুসান্না বিন ইমাম হাসান মুজতবার নিকট 'মান কুনতা মাওলা হু' এই হাদিস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন, হাদিসটি যদি হজরত আলীর খেলাফত সম্পর্কিত হতো, তবে আল্লাহ্‌র শপথ! রসুল স. নিশ্চয় সে কথা পরিস্কার করে বলে দিতেন। কারণ, তিনিই স. ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট বক্তা। গাদিরে খুমের নিকট প্রদত্ত রসুল স. এর ওই ভাষণের কারণ ছিলো এই—রসুল স. হজরত আলীকে সেনাপতি নিযুক্ত করে একটি বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন ইয়েমেনে। তিনি ওই যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) হিসেবে একটি ক্রীতদাসী গ্রহণ করেছিলেন। এই নিয়ে কেউ কেউ রসুল স. এর নিকট অনুযোগ উত্থাপন করলো। অনুযোগকারীদের প্রতি রসুল স. হলেন অপ্রসন্ন। বললেন, তোমরা তার সম্পর্কে কী বলতে চাও, যে আল্লাহ্ ও তার রসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলও তাকে ভালোবাসেন। এরপর তিনি উপরোক্ত ভাষণ দিলেন— যাতে করে সকল মুসলমানের হৃদয়ে হজরত আলীর মহব্বত বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তাঁর সম্পর্কে সকল অনুযোগপ্রবণতার অবসান ঘটে। ওই ভাষণে তিনি স. বলেছেন 'আলাস্‌তুম তায়ালামুনা আন্নি আওলা বিকুল্লি মু'মিনিন' (তোমরা কি জানো না যে, আমি সকল বিশ্বাসী থেকে উত্তম)। এ কথার দ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করাই ছিলো রসুল স. এর উদ্দেশ্য। তিনি স. ওই ভাষণে বলতে চেয়েছেন, আলীকে ভালোবাসো—এটা আমার নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব। ভাষণ শেষে তিনি স. হজরত আলীর জন্যে এ মর্মে দোয়াও করেছিলেন।

কোরআন মজীদে দু'ভাবে রাফেজীদের অভিমতের বিরুদ্ধে প্রমাণ এসেছে—

১. রাফেজীদের মতবাদের ভিত্তি তাকিয়া'র উপর। কিন্তু তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।—এই আয়াতের (আয়াত ৫৪) মাধ্যমে এখানে প্রশংসা করা হয়েছে ওই সকল মানুষের যারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর; তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। হজরত আলীও ছিলেন উপরোক্ত গুণবিশিষ্ট। তিনি তাঁর পূর্বসূরী খলিফাত্রয়ের নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। তেইশ বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে নামাজ পড়েছিলেন এবং জেহাদও করেছিলেন। তিনি হজরত ওমরের সঙ্গে তাঁর আপন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। নিশ্চয় এ সকল কিছু করতে গিয়ে তিনি নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করেননি। হজরত

আলীর কর্মকাণ্ডগুলোও ছিলো প্রকাশ্য। তিনি কি নিন্দুক এবং প্রতাপশালীদের ভয়ে উল্লেখিত পুণ্যকর্মসমূহ তাকিয়া হিসেবে সম্পাদন করেছিলেন? যদি তিনি তা করতেন, তবে তিনি নিশ্চয় এই আয়াতের অন্তর্ভূত হতেন না। অতএব প্রমাণিত হলো যে, রাফেজীদের মতবাদ একটি বাতিল মতবাদ।

২. 'ফাইন্না হিয্বাল্লহি হুমুল গলিবুন' (আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হবে)। এ কথার অর্থ কেবল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতই নাজাতপ্রাপ্ত হবে। রাফেজী অথবা অন্য কোনো বেদাতী দল নাজাতপ্রাপ্ত হবে না। কারণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতই সর্বযুগে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত। এ রকম প্রাবল্য রাফেজী কিংবা অন্য বেদাতী দলগুলোর নেই। তারা কোনো যুগে বিজয়ীর মতো প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা পায়নি। বরং তারা হজরত আলীকে মনে করেছে কাপুরুষ। তাই তারা বলে তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলিফার ভয়ে তিনি সত্য প্রকাশ করেননি। পরবর্তী ইমামগণও ভয়ে ভয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সাথীদেরকে সংগোপনে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন এবং সে শিক্ষাকে গোপনই রাখতে বলেছেন। তারা নাকি বলতেন, দেখো দেয়ালেরও কান আছে। খুব গোপনে কার্যোদ্ধার করতে হবে ইত্যাদি। তারা বলে, ইমাম বাকের এবং ইমাম জাফর সাদেক নাকি তাদের সঙ্গীদেরকে এ রকম বলতেন। এগুলো নাকি তাদের গোপন গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধও রয়েছে। এই বেদাতীদের আর একটি অপবিশ্বাস এই যে, ইমাম মাহদী নাকি সামেরাহ্ ভূখণ্ডের নিচে হাজার বছর ধরে আত্মগোপন করে আছেন। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রেফাআ বিন যায়েদ বিন তাবুত এবং সুয়াইব বিন হারেস প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু অন্তরে তারা ছিলো কাফের। মুসলমানেরা সে কথা বুঝতে না পেরে ওই দু'জনকে সুহৃদ ভাবতে শুরু করলো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৭

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগকে ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্কে ভয় কর।

এই আয়াতে ইহুদী ও কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তারা ধর্ম নিয়ে হাসিঠাট্টা করে এবং ধর্মকে মনে করে ক্রীড়াকৌতুকের বিষয়। তাই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে না। করতে

হবে শত্রুতা। এখানে 'হুযুওয়ান' অর্থ হাসি-তামাশা এবং 'লায়িবান' অর্থ ক্রীড়াকৌতুক। আর 'আলকুফফার' অর্থ মুশরিক। হজরত ইবনে মাসউদের 'ওয়ামিনাল্লাজিনা আশরাকু' (এবং তাদের মধ্যে যারা শিরিক করে)। সুতরাং কুফফার অর্থ মুশরিকই হবে। অথবা মুশরিক এবং আহলে কিতাবসহ সকল অবিশ্বাসীকে সাধারণভাবে এখানে বলা হয়েছে আলকুফফার। আহলে কিতাবদেরকে প্রথমে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে পুনরায় সাধারণভাবে মুশরিকসহ সকল অবিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদেরকেও বলা হয়েছে আলকুফফার। অর্থাৎ ইহুদী, কাফের, মুশরিক যেই হোক না কেনো, সকল অবিশ্বাসীদেরকেই শত্রু জ্ঞান করতে হবে। বন্ধু মনে করা যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াত্তাকুল্লহা ইন কুনতুম মু'মিনিন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌কে ভয় করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। রক্ষা পেতে সচেষ্ট হও আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ লংঘন করা থেকে (অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা থেকে)।

কালাবী বলেছেন, রসুল স.এর মুয়াজ্জিন নামাজের জন্য আজান দিলে সাহাবীগণ সমবেত হয়ে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হতেন। ইহুদীরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতো না বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপহাস করতো। তখন অবতীর্ণ হলো নিচের আয়াতটি।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৮

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ○

❒ তোমরা যখন সালাতের জন্য আহবান কর তখন তাহারা উহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে— ইহা এই হেতু যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

নামাজের জন্য আজান দেয়াকে ইহুদী খৃষ্টানেরা মনে করতো হাসি-তামাশা ও খেলাধূলার বস্তু। সুদ্দীর মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুয়াজ্জিন যখন আজানে উচ্চারণ করতেন 'আশ-হাদুআন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লহ্,' তখন মদীনার এক খৃষ্টান বলতো, আল্লাহ্ ওই মিথ্যুককে জ্বালিয়ে দিক। এক রাতে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে একই শয্যায় শায়িত ছিলো। ওই সময় তার পরিচারক রান্নাবান্নার জন্য আগুন নিয়ে এলো। হঠাৎ দমকা বাতাসে ওই আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ উড়ে গিয়ে পড়লো খৃষ্টান দম্পতির উপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলো।

এক বর্ণনায় এসেছে, আজান শুনলে কাফেরেরা হিংসায় জ্বলে যেতো। একবার তারা রসুল স. এর নিকটে এসে বললো, মোহাম্মদ! আপনি এমন এক বেদাত কাজ শুরু করেছেন যা কোনো নবী রসুল করেননি। এর মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকলে আগের নবীগণ অবশ্যই করতেন। এই যে পাঁঠার মতো চিৎকার—এগুলো আপনি শিখেছেন কোত্থেকে? আজানের আওয়াজ অত্যন্ত কর্কশ এবং এর কথাগুলোও অসুন্দর। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'ওয়ামান আহসানু ক্বওলাম্ মিমমান্ দাআ' ইলাল্লহি ওয়াআমিলা সলিহা' (এর চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে— যে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানায় এবং নিজেও পুণ্যকর্ম করে) — এই আয়াতটি এবং তার সঙ্গে আলোচ্য আয়াতটি।

শেষে বলা হয়েছে, 'এটা এ কারণে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই'—এ কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীদের কোনো ধর্মজ্ঞান থাকে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন বিষয়ে সদাসতর্ক এবং সর্বদা জ্ঞানচর্চায় রত। কিন্তু এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়নির্ভর বিষয়ে যতোই চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করা হোক না কেনো, মূল জ্ঞান তাদের কখনই অর্জিত হয় না। দার্শনিকেরা চিন্তা গবেষণাকে জ্ঞানার্জনের জরুরী মাধ্যম বলে মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের বিধান এবং নিয়ম এই যে, বিশুদ্ধ অন্তরে যে জ্ঞানার্জনের জন্য ফিকির করে (অনুসন্ধিৎসু হয়), আল্লাহ্‌পাক তাকে কাঙ্খিত জ্ঞান দান করেন। বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌পাকের মাশীয়াত বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো। তাদের মধ্যে ছিলো আবু ইয়াসার বিন আখতাব, রাফে' বিন আবু রাফে' এবং আরি বিন আমর। তারা রসুল স.কে বললো, কোন নবীর উপরে আপনার ইমান রয়েছে? তিনি স. বললেন, আমি বিশ্বাস রাখি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা কিছু ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে— সে সকলের উপর। আরও বিশ্বাস রাখি মুসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে যা দান করা হয়েছে— সে সকলের উপর। আমি তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করি না (কেউ সত্য, কেউ সত্য নয়— এ রকম মনে করি না)। আমরা আল্লাহ্‌পাকের অনুগত। ইহুদীরা হজরত ঈসার নাম শুনে নাক সিটকালো। বললো, আমরা না ঈসাকে মান্য করি, না বিশ্বাস করি তাদেরকে, যারা ঈসাকে নবী বলে মানে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইহুদীরা তখন বললো, আল্লাহ্‌র কসম, দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই। তোমাদের চেয়ে খারাপ ধর্ম আর কারো আছে বলেও আমাদের জানা নেই।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا
وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ
مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ
عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○ وَتَرٰى كَثِيْرًا
مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ
وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

❒ বল, 'হে কিতাবীগণ! আমরা আল্লাহে ও আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করি, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহ; এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।'

❒ বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যাহা আল্লাহের নিকট আছে? যাহাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদিগের কতককে তিনি বানর ও কতককে শুকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগুতের ইবাদত করে মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।'

❒ তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি' কিন্তু তাহারা অবিশ্বাস সহ আসে এবং উহা লইয়াই বাহির হইয়া যায়। তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

❒ তাহাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমা লংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখিবে; তাহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহা নিকৃষ্ট।

❒ রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? ইহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহাও নিকৃষ্ট।

প্রথমেই নির্দেশ এসেছে, হে প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে বলে দিন, হে কিতাবীগণ! তোমরা তো কেবল এ কারণেই আমাদেরকে শত্রু ভেবে বসে আছো।—আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কোরআন এবং পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করি। এখানে 'নাক্বমাতুন' শব্দটির অর্থ মন্দ, মন্দের বিনিময়ে মন্দ, 'তানক্বিমুনা মিন্না' অর্থ তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। 'মিন্না' অর্থ আমাদের প্রতি বা আমাদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়া আন্না আকছারাকুম ফাসিক্বন'—এ কথার অর্থ এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। এ কথাটিকে আগের বাক্যটির সঙ্গে মিলিত অর্থ করলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই অবিশ্বাসী (সত্যত্যাগী)। কারণ, তোমরা আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করো। আর আমরা সকল আসমানী কিতাবের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী। তোমরা উত্তম কথাকে মনে করো মন্দ আর মন্দ কথাকে মন্দ মনে করো না। পরের বাক্যটির 'ওয়াও' (এবং) কে পূর্ববর্তী বাক্যের 'তানক্বিমুনা' এর সঙ্গে মেলালে এ রকমই অর্থ দাঁড়ায়। আর এই 'ওয়াও'কে পূর্ববর্তী বাক্যের 'আমান্না' (বিশ্বাস করি) এর সঙ্গে মেলালে অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা আমাদের প্রতি এ কারণেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে, আমরা বিশ্বাসী, আমাদের বিশ্বাস তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীত (গ্রন্থকার এখানে বিভিন্নভাবে আলোচ্য বাক্যটির তরকিব ও তরতিব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলোতে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তাই আমরা সেগুলোকে প্রলম্বিত করতে চাইনি—উপস্থাপন করেছি সংক্ষেপে)। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'ওয়াও' (এবং) এর অন্তর্নিহিত অর্থ হবে 'সহ'। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা আমাদের বিশ্বাসকে মন্দ জেনে আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়েছো, তৎসহ তোমরা অধিকাংশই কাফের।'

একটি সন্দেহঃ অধিকাংশ ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট মাফউলে মাআহু বা সঙ্গতাজ্ঞাপক কর্ম পদের জন্য সাথী থাকা জরুরী। তাই এই আয়াতের 'ওয়াও' এর অর্থ 'সঙ্গে' (মাআ) নয়। আখফাশ প্রমুখ ব্যাকরণজ্ঞদের নিকট অবশ্য নিকটতম অবস্থান থাকাই যথেষ্ট। তাই এই বাক্যে সঙ্গতাজ্ঞাপক অর্থ এসেছে।

সন্দেহের অপনোদনঃ জমহুরের নিকট সঙ্গতাজ্ঞাপক কর্ম হওয়ার জন্য নিশ্চিতরূপে সাথী হওয়া শর্ত। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এ রকম হওয়া জরুরী নয়। সুতরাং সাথী হওয়ার শর্তটি সকল সঙ্গতাজ্ঞাপক কর্মে অভিপ্রেত নয়। আলোচ্য বাক্যটি 'যেরে'র হালতেও হতে পারে। যদি হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমরা বিশ্বাস রাখি আল্লাহ্র প্রতি। আল্লাহ্র কিতাবসমূহের প্রতি এবং তোমরা যে অধিকাংশই কাফের—সে কথার প্রতি, তাই তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন।

এ রকম হতে পারে যে, এখানে খবর বা বিধেয় উহ্য রয়েছে। যদি এ কথাকে মানা হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম—একথা তোমরা ভালো করেই জানো যে, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই অবাধ্য (সত্যত্যাগী)। কিন্তু তোমরা কেবল বিত্তলিপ্সা ও নেতৃত্বাকাংখার কারণে আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন।

'কারণ' ধরে নিয়েও শব্দটির অর্থ করা যায়। এ রকম করলে অর্থ দাঁড়াবে—অন্য কোনো কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নও, বিরুদ্ধভাবাপন্ন কেবল এই কারণে যে, আমরা ইমানদার এবং তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই কাফের।

পরের আয়াতে (আয়াত ৬০) বলা হয়েছে, হে রসুল! আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিবো—যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে।

'মাছুবাতান' এবং 'উকুবাতুন' শব্দ দু'টির অর্থ আমলের বিনিময়। প্রথমোক্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয় উত্তম বিনিময় হিসেবে পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে। শেষোক্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিকৃষ্ট বিনিময় হিসেবে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে 'মাছুবাতুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম বুঝাতে। এ রকম করা হয়েছে উপহাস হিসেবে। যেমন, অন্য আয়াতে রয়েছে—'বাশ্‌শিরহুম বিআযাবিন আ'লীম' (তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন)। শাস্তির সংবাদ নিশ্চয়ই সুসংবাদ নয়—দুঃসংবাদ। কিন্তু সেখানে 'বাশারাত' বা সুসংবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিদ্রুপার্থে।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের প্রতি ইমান নিশ্চয় কোনো নিকৃষ্ট কর্ম নয়। অথচ ইহুদীরা বলেছিলো, আমরা দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের মতো হতভাগ্য আর কাউকে দেখিনি। তোমাদের চেয়েও খারাপ ধর্ম আর কারো আছে বলেও আমাদের জানা নেই। তাদের এই গর্হিত উক্তিকে রহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। সেই সূত্রেই বলা হয়েছে 'এরচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিবো' (তোমরা তো মনে করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান একটি নিকৃষ্ট কর্ম (কিন্তু তোমরা যা ধারণা করো তার চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ আমি তোমাদেরকে দিবো যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে)। অন্য আয়াতেও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'আও নাব্বিউকুম বিশার্‌রিম্‌মিন্ জালিকুমুন্নার' (আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিবো এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের, জাহান্নামের)।

এরপর বলা হয়েছে 'যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতিপয়কে তিনি বানর, এবং কতিপয়কে শুকর করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদত করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরলপথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।'-এখানে অতীতকালের সিগা হিসেবে 'আবাদা' (ইবাদত করেছে)। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ কথার অর্থ, অতীতে তারা তাগুতের পূজা করেছে আর সে কারণেই হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিসম্পাতগ্রস্ত। 'আত্‌তাগুত' অর্থ বাছুর। তারা বাছুর পূজা করেছিলো। বাছুরের পূজা ছিলো প্রকৃতপক্ষে শয়তানের পূজা। বাছুর

ও শয়তান দু'টোই তাগুত বা মিথ্যা উপাস্য। অথবা তাগুত বলে কেবল শয়তানকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়েই তারা গো-শাবকের উপাসনা করেছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তাগুত অর্থ এখানে গণক। গণকদের পরামর্শেই তারা অগ্রসর হয়েছিলো মহাপাপের দিকে (শিরিকের দিকে)। তারা ছিলো অবাধ্য। তাই আল্লাহ্পাক তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। কাউকে করেছেন বানর এবং কাউকে করেছেন শুকর। তাগুতের উপাসনাকারীরাই সর্ব নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সবচেয়ে দূরে।

পরের আয়াতে (আয়াত ৬১) মুনাফিকদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা মুসলমানদের সামনে বলে 'আমরা বিশ্বাস করি।' কিন্তু তাদের অন্তরে থাকে অবিশ্বাস অর্থাৎ অন্তরের অবিশ্বাস সহই তারা মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করে।

পরে বলা হয়েছে, 'তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত'— এ কথার মাধ্যমে মুনাফিকদেরকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের অন্তর্নিহিত অবিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ্পাক উত্তমরূপে অবগত। সুতরাং মুনাফিকদের পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। দুনিয়ায় তাদের জন্য রয়েছে চরম লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

এর পরের আয়াতে (আয়াত ৬২) বলা হয়েছে 'হে প্রিয় রসুল! আপনি দেখবেন মুনাফিকেরা পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে সদা তৎপর।' এখানে 'ইছম' শব্দটির অর্থ পাপ। 'উদওয়ান' অর্থ জুলুম বা সীমালংঘন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ইছম' অর্থ তওরাতের বিভিন্ন বিধানকে গোপন করা এবং উদ্ওয়ান অর্থ তওরাতের মধ্যে নতুন ও মনগড়া কোনো কিছু সংযোজন করা। অবৈধ ভক্ষণের কথা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, ইহুদী মুনাফিকেরা সুদ ভক্ষণ করতো। অর্থাৎ ইহুদী মুনাফিকদের চরম অপরাধগুলো ছিলো এই—তারা রসুল স. এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অগ্রসরমান জনতাকে বাধা দিতো, তওরাতের বিধান পরিবর্তন করতো এবং আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন করতো (সুদ ভক্ষণ করতো)।

শেষে বলা হয়েছে, 'তারা যা করে নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট।'—এ কথার মাধ্যমে পাপাচারী মুনাফিকদেরকে সুচিহ্নিত করা হয়েছে।

পরের আয়াতে (আয়াত ৬৩) বলা হয়েছে ইহুদীদের ধর্মনেতা ও আলেমগণের প্রকৃতি সম্পর্কে। তারা ইহুদীদেরকে পাপ কথা বলতে নিষেধ করে না, অবৈধ ভক্ষণেও বাধা দেয় না। এখানে মাশায়েখ ও আলেমদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। তাদের অবশ্য কর্তব্য ছিলো, তারা নিজেরা অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং মানুষের পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক হবে। কিন্তু তারা করেছে এর বিপরীত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন এখানে 'রব্বানিউন' (রব্বনীগণ) অর্থ খৃষ্টান আলেমগণ এবং 'আহ্বার' (পণ্ডিতগণ) অর্থ ইহুদী আলেমগণ।

শেষে বলা হয়েছে, 'তারা যা করে নিশ্চয় তা-ও নিকৃষ্ট।' এখানে পূর্বের আয়াতের মতো 'ইয়া'মালুনা' না বলে 'ইয়াসনাউনা' উল্লেখ করা হয়েছে বক্তব্যকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য। সানাআ অর্থ মাশাক্ব। মাশাক্ব অর্থ হচ্ছে পারদর্শী হয়ে ওঠার পর কোনো কাজ করা (পাপকর্ম ইহুদীদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তাই 'ইয়াসনাউনা' বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে)।

মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরআন মজীদের এই আয়াতটি অত্যন্ত কঠিন। এখানে পাপাচারীকে যারা প্রতিহত করে না, তাদেরকেও পাপাচারীদের মতোই শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে। বরং পাপাচারীদের চেয়ে যারা পাপ কাজে বাধা দান করে না, তাদের প্রতি প্রদত্ত হুঁশিয়ারীটিই এখানে অধিকতর শক্তিশালী।

বায়যাবী লিখেছেন, সৎকর্ম পরিত্যাগ করা, পাপকর্ম করার চেয়েও অধিক মন্দ। কারণ, পাপকর্ম প্রবৃত্তির আস্বাদ্য। কিন্তু সৎকর্ম পরিত্যাগের মধ্যে কোনো প্রকার আস্বাদন নেই। সুতরাং সৎকর্ম পরিত্যাগ করাই অধিকতর দূষণীয়।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৪

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

❒ ইহুদীগণ বলে, 'আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ'; উহারাই ব্যয়কুণ্ঠ এবং উহারা যাহা বলে তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত, আল্লাহের উভয় হস্তই মুক্ত; যে-ভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই; তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি। যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে ততবার আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করেন এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায়; আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কার্যে-লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না।

হজরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা, জুহাক এবং কাতাদা বলেছেন, ইহুদীরা ছিলো সম্পদশালী। কিন্তু যখন থেকে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের অবাধ্যতা শুরু করলো, তখন থেকে কমতে শুরু করলো তাদের বিত্তবৈভব। ক্রমাগত অভাবগ্রস্ত হতে থাকলো তারা এবং বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ। বনু কাইনুকার নেতা ফাখাজ বিন আজুরা বলতে লাগলো, আল্লাহ্ রিজিক দেয়া থেকে তাঁর হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান তাঁর তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাসের এই বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিবরানীর বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বান্নাশ বিন কায়েস ইহুদী বললো, হে মোহাম্মদ! তোমার আল্লাহ্ বখিল। কিছু দিতে চায় না। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ফাখাজ এবং বান্নাশের কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য ইহুদীরা এ রকম না বললেও তারা ছিলো ফাখাজ ও বান্নাশের এই উক্তির নীরব সমর্থক। তাই আয়াতে 'ইহুদীরা বলে'—এ রকম বলা হয়েছে। এভাবে সকল ইহুদীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

'মাগলুলাত' অর্থ ব্যয়কুণ্ঠ বা হাত বন্ধ হওয়া। হাত বন্ধ ও খোলা অর্থ, কৃপণতা ও দানশীলতা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ালা তাজআ'ল ইয়াদাকা মাগলুলাতান ইলা উনুক্বিকা ওয়ালা তাবসুত্হা কুল্লালবাস্ত্' (নিজের হাতকে কৃপণতাবশতঃ কাঁধের দিকে সংকুচিত করে রেখো না এবং সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে দিও না।

এরপর বলা হয়েছে, 'গুল্লাত আইদিহিম ওয়া লুয়ীনু বিমা ক্বালু (তারা যা বলে তার জন্য তারা অভিশপ্ত—এ কথার অর্থ, 'আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ'— এই অপবচনটির কারণে তাদের উপর নেমে এসেছে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। এ রকমও অর্থ হতে পারে— যেহেতু তারা বলেছে আল্লাহ্র হাত বন্ধ, তাই অভিসম্পাত হিসেবে তাদের হাতও বন্ধ হয়ে যাক। তারা হয়ে যাক দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত। হাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ প্রকৃতপক্ষেই হাত বন্ধ হয়ে যাওয়া—এ রকমও হতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেনো তাদের হাত শৃংখলাবদ্ধ হয় অথবা দোজখে তাদেরকে যেনো লাগানো হয় হাত কড়া।

'না, আল্লাহ্র উভয় হস্তই মুক্ত'—শ্রবণ ও দর্শনের মতো দানশীলতাও আল্লাহ্র পাকের একটি গুণ। তাঁর উভয় হস্ত মুক্ত অর্থ, তিনি দানশীল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্পাক আনুরূপ্য থেকে পবিত্র। তাই তাঁর উভয় হস্তকে মানুষের হাতের মতো মনে করা যাবে না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামগণ বলেছেন, এখানে আল্লাহ্পাকের দানশীলতার বিবরণটি যেভাবে এসেছে, সেভাবে আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে। কিন্তু এর সঙ্গে অন্য কিছুকে তুলনীয় মনে করা যাবে না। কারণ, আল্লাহপাকের সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলী—সবকিছুই তুলনা রহিত।

হজরত আমর বিন আমবাসা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, রহমানের (আল্লাহর) উভয় হস্তই দক্ষিণ হস্ত। কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক লোকের বিশেষ মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগণ ওই মর্যাদা লাভের জন্য লোভাতুর হয়ে পড়বেন। তাঁদের মুখমণ্ডলের নূর চমকাতে থাকবে চাঁদের মতো। এ কথা শুনে সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তারা কারা? রসুল স. বললেন, তারা ওই দল যারা আপন অবস্থান পরিত্যাগ করে একত্রে আল্লাহপাকের স্মরণে মগ্ন হয়। তারা পছন্দ করে পবিত্র আহার্য এবং পবিত্র কালাম। উত্তম সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

জ্ঞাতব্যঃ এই বিশেষ দলটি হচ্ছে অন্তর্জগতকে পবিত্র করার জন্য একত্রিত খানকাবাসী সুফী সাধকদের দল এবং ধর্মীয় শিক্ষকদের ছাত্রগণ। গ্রন্থকার।

প্রথম যুগের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ্র হস্ত অর্থ অপার ক্ষমতা বলে কোনো কিছুকে অধিকার করা। এভাবে তারা কথাটির রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, মুক্তহস্ত অর্থ অসীম দাতা— যার দানের সীমা পরিসীমা নেই। 'উভয় হস্ত মুক্ত' বলে এখানে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, পরিপূর্ণরূপেই তিনি দানশীল, কৃপণ নন। তিনিই পরিপূর্ণ দানশীল যিনি দুই হাতে তাঁর সম্পদ বিতরণ করেন। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে তিনি দানশীল। তাঁর উন্মুক্ত দুই হাতের একটি দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, আরেকটি সম্পৃক্ত আখেরাতের সঙ্গে। এমনও বলা যায়– তাঁর উভয় হস্ত মুক্ত, একটির সম্পর্ক অবকাশ দানের সঙ্গে এবং অপরটির সম্পর্ক মর্যাদা প্রদানের সঙ্গে। 'যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন' —এ কথার অর্থ হেকমত অনুসারে কখনও কখনও তিনি মানুষের উপার্জনে দান করেন প্রশস্ততা, কখনও সংকীর্ণতা। এখানে এমতো অপধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, মানুষের উপার্জন সংকুচিত হলে তাঁর দানও সংকুচিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্পাকের ভাণ্ডার তো অফুরন্ত। তবে তিনি রিজিক প্রদানে সংকীর্ণতা করবেন কেনো? এই অপধারণা নিরসনের জন্যই বলা হয়েছে —'যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন'।

'তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই'—এ কথার অর্থ, হে প্রিয় রসুল! আপনার উপর যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তা ইহুদীদের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেবে— যেমন, উত্তম ও শক্তিশালী আহার্য নিরোগ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যবান করে কিন্তু বাড়িয়ে দেয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগ। তেমনি কোরআন মজীদ তাদের অন্তরের রোগ ও মিথ্যা বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেবে। তারা ক্রমাগত হতে থাকবে অধিকতর ধর্মদ্রোহী ও অবিশ্বাসী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোনো আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরা অস্বীকার করতো। এভাবে নতুন নতুন অবতীর্ণ আয়াত তাদেরকে অধিকতর অবাধ্য ও অবিশ্বাসী করে তুলতো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোরআনের কোনো আয়াত অবতীর্ণ হলে

তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতো। এভাবেই তাদের ক্রমঅগ্রসরমাণ অভিযাত্রা চলতো দ্রোহ ও বিশ্বাসহীনতার দিকে।

'তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি।' হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন,

এখানে 'তাদের মধ্যে' (বাইনাহুম) অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে অথবা ইহুদীদের বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে। আল্লাহ্পাক তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত গোত্রদ্বন্দ্ব প্রসূত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছেন।

'যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নিপ্রজ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন'—এ সম্পর্কে হাসান বলেছেন, যখন ইহুদীরা রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিশৃংখলা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়, তখনই আল্লাহ্পাক তাদের নিজেদের মধ্যে গোত্রদ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ প্রবল করে দেন। এভাবে তাদের উদ্দেশ্য বানচাল করে দিয়ে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে সাহায্য করেন।

কাতাদা বলেছেন, এখানে ইহুদীদের পূর্বাপর সকল যুদ্ধ ও বিশৃংখলাকে অকার্যকর করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যখনই তারা তওরাতের হুকুমের বিরুদ্ধে গিয়েছে তখনই অন্য সম্প্রদায়কে তাদের উপর চড়াও করে দেয়া হয়েছে। অতীতে এভাবে বখতে নসরের মাধ্যমে তাদেরকে যেমন পর্যুদস্ত করা হয়েছে, তেমনি বর্তমানে মুসলমানদেরকে প্রবল করে দেয়া হয়েছে তাদের উপর। তাই তারা ক্রমাগত হয়ে চলেছে অপদস্থ। অকৃতকার্য।

'তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়'—এ কথার অর্থ তারা সব সময় যুদ্ধ ও ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় থাকে। এখানে 'ইয়াসআওনা' শব্দটির অর্থ 'ইয়াতলুবুনা' ও হতে পারে। এ রকম হলে অর্থ হবে, তারা বিশৃংখলা ও কুফরী সৃষ্টিতে সতত উদ্যোগী। তারা ইসলামকে ধ্বংসের অপচেষ্টায় লিপ্ত এবং তাদের কিতাব থেকে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কিত বিবরণসমূহ অপসারণ করতে সদা সচেষ্ট।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু লা ইউহিব্বুল মুফ্সিদিন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদেরকে ভালোবাসেন না। তাই তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

জ্ঞাতব্যঃ রসুল স. এরশাদ করেছেন, রসুল মুসার উম্মতেরা একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে সত্তরটি দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী। রসুল ঈসার উম্মতেরা বিভক্ত হয়েছে বায়াত্তরটি দলে। তার মধ্যে একাত্তরটি জাহান্নামী এবং একটি জান্নাতী। আর আমার উম্মতেরা বিভক্ত হবে তিয়াত্তরটি দলে। বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী এবং একটি জান্নাতী। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! জান্নাতী দল কোনটি? তিনি স. বললেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে দলে (আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত)।

হজরত আনাস থেকে ইয়াকুব বিন যায়েদ বিন আসলামের পদ্ধতিতে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইয়াকুব বিন যায়েদ বলেছেন, হজরত আলী বিন আবু তালেব উপরোক্ত মারফু হাদিসটি বর্ণনা করার সময় সুরা মায়িদার পঁয়ষট্টি ও ছেষট্টি সংখ্যক আয়াত পাঠ করে বলতেন, ওই জান্নাতী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা, যারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে।

রসুল স. বলেছেন, এ রকম অবস্থা হবে তখন, যখন এলেম উঠে যেতে থাকবে। হজরত জিয়াদ বিন লবিদ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এলেম কবে থেকে উঠে যেতে থাকবে। আমরাতো কোরআন পাঠ করি। আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও আমরা কোরআন শিক্ষা দিবো। তারাও তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দিবে। তারা শিক্ষা দিবে পরবর্তীদেরকে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে কোরআনের শিক্ষা। রসুল স. বললেন, ইবনে লবিদ! মদীনাবাসীদের মধ্যে আমি তো তোমাকে জ্ঞানী বলে জানি। ইহুদী ও নাসারা কি তওরাত, ইঞ্জিল পাঠ করে না? কিন্তু তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশনার মাধ্যমে তারা কি কোনো উপকার গ্রহণ করতে পারে? হজরত জোবায়ের বিন ইয়াসার থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে, এরপর তিনি স. পাঠ করলেন, 'ওয়ালাউ আন্নাহুম আক্বমুত্ তাওরাতা ওয়াল ইনজিলা....মিন তাহ্‌তি আরজুলিহিম' (আয়াত ৬৬)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৫, ৬৬

وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○

❒ কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস করিত ও ভয় করিত তাহা হইলে তাহাদের দোষ অপনোদন করিতাম এবং তাহাদিগকে সুখদ কাননে দাখিল করিতাম।

❒ তাহারা যদি তওরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে তাহারা সকল দিক দিয়া প্রাচুর্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে এক দল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট।

আলোচ্য আয়াত দুইটির প্রথমটিতে বলা হয়েছে, 'কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস করতো ও ভয় করতো, তাহলে তাদের দোষ অপনোদন করতাম'—এ কথার অর্থ যদি ইহুদী ও খৃষ্টানেরা ইসলাম গ্রহণ করতো তবে আল্লাহ্‌পাক তাদের অতীতের

সকল পাপ মার্জনা করতেন। ইসলাম পশ্চাতের সকল অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হজরত আমর বিন আস বলেছেন, আমি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! হস্ত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকারাবদ্ধ (বায়াত) হবো। রসুল স. তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি স. বললেন, হে আমর! এমন করলে কেনো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি একটি শর্ত করতে চাই। রসুল স. বললেন, বলো। আমি নিবেদন করলাম, আমাকে যেনো ক্ষমা করে দেয়া হয়। তিনি স, বললেন, আমর! তুমি কি জানো না ইসলাম অতীতের সকল পাপ অপসারিত করে, হিজরত দূর করে হিজরত পূর্ব সকল গোনাহ্ এবং হজ মুছে ফেলে হজের আগের সকল অপরাধ। মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং সুখদ কাননে দাখিল করতাম'—এ কথায় বুঝা যায় সুখদ কাননে অর্থাৎ বেহেশতে প্রবেশ করতে গেলে মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করা (ইমান আনা) জরুরী। তাই সুখদ কাননে প্রবেশ করার শর্ত হিসেবে পূর্ববর্তী বাক্যটিতে ইসলাম গ্রহণ করার (ইমান আনার কথা বলা হয়েছে)। রসুল স. বলেছেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যে সকল ইহুদী ও নাসারা আমার রেসালতে এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াবলীতে বিশ্বাস স্থাপন না করে জীবন লীলা সাঙ্গ করবে, নিশ্চয়ই তারা প্রবিষ্ট হবে নরকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা যদি তওরাত ইঞ্জিল ও যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে তারা সকল দিক দিয়ে প্রাচুর্য লাভ করতো।'—এ কথার অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টানেরা যদি তাদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশানুযায়ী চলতো, আল্লাহ্‌র আয়াত গোপন না করতো অর্থাৎ তওরাতে উল্লেখিত রসুল স. এর প্রতি ইমান গ্রহণের নির্দেশ এবং তাঁর গুণাবলী সমূহকে গোপন না করে প্রচার করতে সচেষ্ট হতো— সেই সঙ্গে সকল আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করতো, তবে তারা হতো সকল দিক দিয়ে প্রাচুর্যের অধিকারী। 'লা আকালু মিন ফাওক্বিহিম ওয়া মিন তাহ্‌তি আরজুলিহিম'—কথাটির অর্থ সকল দিক দিয়ে।ফাররা বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে রিজিকের মধ্যে সীমাহীন প্রশস্ততা। আরববাসীগণ বলে থাকেন, অমুক ব্যক্তি আপাদমস্তক নিমজ্জিত রয়েছে (............)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ কথাটির অর্থ, তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতো এবং মৃত্তিকা হয়ে যেতো শস্য শ্যামল। যেমন, অন্য এক আয়াতে এসেছে, 'ওয়ালাও আন্না আহলাল ক্বুরা আমানু ওয়াত্তাক্বাও লা ফাতাহ্‌না আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস্‌সামায়ি ওয়াল আরদ্বি' (যদি জনপদবাসীরা ইমান গ্রহণ করতো, তবে আমি নভোঃমণ্ডলে ও ভুমণ্ডলে তাদের জন্য বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম)। প্রকৃত কথা এই যে, তাদের রিজিকের সংকীর্ণতা আল্লাহ্‌পাকের কৃপণতার কারণে নয়, তাদের অবিশ্বাস ও পাপের কারণে।

এরপর বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী; কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট।'-এখানে মধ্যপন্থী অর্থ সত্য পন্থী, সৎপথের অনুরাগী— যারা সীমা লংঘন করে না। তাঁরা হচ্ছেন হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা। কিন্তু তাঁরা নগণ্য সংখ্যক। অধিকাংশ কিতাবীরা নিকৃষ্ট। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অবাধ্যতা করেই চলেছে। পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করে চলেছে তওরাতের বিধানাবলীর। শত্রুতা পোষণ করে চলেছে আল্লাহ্‌র হাবীব আখেরী রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সঙ্গে। হাসান বসরীর মাধ্যমে আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌পাক যখন আমাকে রেসালত দান করলেন, তখন আমি শংকিত হলাম এই ভেবে যে, মানুষ নিশ্চয় আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন করবে। তখন আল্লাহ্‌পাক আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন এই বলে যে, হে প্রিয় রসুল! প্রেরিত প্রত্যাদেশ প্রচার করুন, অন্যথায় আমি আপনাকে অভিযুক্ত করবো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৭

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

❑ হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। আল্লাহ্ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

মাসরুকের বর্ণনায় রয়েছে, জননী আয়শা বলেছেন, যে-ব্যক্তি বলবে, রসুল স. তাঁর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের কিছু অংশ গোপন করেছেন, সে হবে মিথ্যাবাদী। কারণ আল্লাহ্‌পাক স্পষ্ট বলেছেন, 'হে রসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে রসুল স.কে প্রচার করতে বলা হয়েছে রজম ও কিসাসের বিধানসমূহ যা ইহুদীরা গোপন করতে চেয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে জননী জয়নাব বিনতে জাহাশ এবং রসুল স. এর পবিত্র পরিণয় সম্পর্কে। আবার কেউ বলেছেন, জেহাদের নির্দেশ প্রচার সম্পর্কে অবতীর্ণ এই আয়াতটি ছিলো এ রকম— যুদ্ধের নির্দেশ শুনার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিকেরা হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। তাদের সম্পর্কে অন্যত্র

উল্লেখিত হয়েছে, 'অতঃপর যখন কোনো স্পষ্ট বিষয়ে সুরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জেহাদেরও উল্লেখ থাকে, যখন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকাবে যেমনভাবে তাকায় কোনো মৃত্যু পথযাত্রী।' জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন রসুল স, দেখলেন, কেউ কেউ বিষয়টি পছন্দ করতে পারছে না। তখন তিনিও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখনই। ইবনে আবি হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'হে রসুল, আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। তখন রসুল স. নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমি কেমন করে অগ্রসর হবো, আমি একা আর সকলে অনুপ্রেরণাহীন। তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের অবশিষ্টাংশ।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় রয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, গাদিরে খুম কূপের নিকট হজরত আলী ইবনে আবু তালেবের শানে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এর যুগে আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম এভাবে—'ইয়া আইয়ুহার রসুলু বালিগ মা উনযিলা ইলাইকা মিররব্বিক। ইন্না আলিয়ান মাওলাল মু'মিনিনা ওয়া ইল্লাম তাফ্য়াল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু ওয়াল্লহু ইয়া'ছিমুকা মিনান্নাস।' (হে রসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। নিশ্চয় আলী বিশ্বাসীদের অভিভাবক। যদি আপনি এরূপ না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন)। এই বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো গাদিরে খুম নামক কূপের নিকটে। কিন্তু এই বক্তব্যটি জ্ঞান এবং বিভিন্ন বর্ণনা বিরুদ্ধ। এই সুরার বর্ণনা ধারার মাধ্যমেও বুঝা যায় যে, গাদিরে খুমের নিকট এই আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। হজরত আয়েশা থেকে বিশুদ্ধসূত্রে বোখারীর বর্ণনায় জননী আয়েশা থেকে তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে— এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে খন্দক যুদ্ধের দিন। আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, গাদিরে খুমের ঘটনাটি ঘটেছিলো রসুল স. কর্তৃক ধর্মের প্রচার সমাপ্ত হওয়ার পর। তখন কোরআনের এমন কোনো আয়াত ছিলো না যা প্রচার করা হয়নি। গাদিরে খুমে আগমনের আগেই বিদায় হজে অবতীর্ণ হয়েছিলো কোরআনের সর্বশেষ আয়াতটি—'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম ওয়া আত্তামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রদ্বিতু লাকুমুল ইসলামা দিনা' —আজ তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সমাপ্ত করলাম (কোরআনের অবতরণ সমাপ্ত ঘোষণা করলাম) এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। এরপর ধর্ম প্রচারের নির্দেশ কিভাবে আসতে পারে? তখন তো আরব ভূখণ্ডে বিধর্মী বলে কেউ

ছিলো না। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতের এই বাক্যটির অর্থই বা কি হবে—'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' আর এই আয়াতে পূর্বে ও পরে রয়েছে ইহুদী ও নাসারাদের বিবরণ। এই সুরার ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে চেয়েছিলো, তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন।' পরবর্তী আয়াতেও (আয়াত ৬৮) বলা হয়েছে, 'বলো হে কিতাবীগণ, তওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই।'—এ সকল আয়াতের বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতে রজম ও কিসাসের বিধান প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। হাসানের মাধ্যমে ইবনে হাব্বান এ রকমই বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে 'যদি না করো তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।' —এ কথার অর্থ হে রসুল! আপনি যদি কোনো একটি নির্দেশ প্রচার করলেন না। আল্লাহ্ পাকের বিধানের একাংশ গোপন রাখলে অন্য অংশটিও হয়ে পড়ে অর্থহীন। যেমন, নামাজের রোকনসমূহের কোনো একটি বাদ পড়লে সম্পূর্ণ নামাজ বাতিল হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্তায়ালার একটি বিধান প্রচার না করলে অন্যগুলোর প্রচারও হয়ে পড়ে নিরর্থক। কারণ এতে করে প্রচার না করার বিধানটির প্রতি মানুষ ইমান আনবে না, আল্লাহ্তায়ালার আয়াত বলে মানবে না। এভাবে আনীত আংশিক ইমান ইমানই নয়। যেমন ইহুদীরা বলতো আমরা কোনো কোনো অংশকে বিশ্বাস করি এবং কোনো কোনো অংশকে অস্বীকার করি। ইহুদীদের এ রকম বিশ্বাসকে কোরআনে অবিশ্বাস বলা হয়েছে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, একটি আয়াত গোপন রাখার অপরাধ সকল আয়াত গোপন রাখার অপরাধের মতো। যেমন, এক ব্যক্তিকে হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন 'যেনো সে সকল মানুষকে হত্যা করে ফেলতো।'

'আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।'—এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! সত্য ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে আপনি ভীত হবেন না। যদিও আপনি একা 'কিন্তু তারা আপনাকে হত্যা করতে পারবে না। এই তাফসীরের মধ্যে এ রকম সন্দেহ করা যায় না যে, আল্লাহ্পাকের হেফাজতের অঙ্গীকার দানের পরেও উহুদ যুদ্ধে রসুল স. এর পবিত্র মস্তক রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো কেনো? কেনোই বা ভেঙ্গে গিয়েছিলো তাঁর পবিত্র দন্ত? কেনো তাঁকে দেয়া হয়েছিলো অন্যান্য আপদ বিপদ? এ রকম সন্দেহ নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতে হত্যা থেকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে। সকল দুঃখ বিপদের হেফাজতের ওয়াদা করা হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর পবিত্র মস্তক রক্তে রঞ্জিত হওয়ার পরে। কেননা, সুরা মায়িদা অবতীর্ণ হয়েছে সকলের শেষে। জননী আয়েশা থেকে তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন,

রাত্রিকালে রসুল স.কে পাহারায় রাখা হতো। এরপর আলোচ্য বাক্যটি অবতীর্ণ হলে তিনি প্রহরীদের কে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন এবং তাঁবুর বাইরে এসে বললেন, হে জনতা! তোমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও আল্লাহ্‌পাক আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। রসুল স. রাতে আপন শয্যায় শায়িত ছিলেন। ওই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, মাতা সাহেবা আয়েশা বলেছেন, রসুল স. আপন নিরাপত্তার জন্য রাতে জেগে থাকতেন। মদীনায় আগমনের পর তিনি স. একদিন বললেন, আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি আজ রাতে আমাকে পাহারা দিতো, তবে অতি উত্তম হতো। এমন সময় অস্ত্রের আওয়াজ শোনা গেলো। রসুল স. বললেন, কে? জবাব এলো আমি সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস, পাহারা দিতে এসেছি। এ কথা শুনে রসুল স. শয্যা গ্রহণ করলেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. এর পাহারায় তাঁর পিতৃব্য হজরত আব্বাসও ছিলেন। যখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন,' তখন থেকে তিনি পাহারা দেয়া ছেড়ে দিলেন। হজরত আসমা বিন মালেক হাতামা থেকে তিবরানী লিখেছেন, আমরা রাতে রসুল স. কে পাহারা দিতাম। অতঃপর 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন' অবতীর্ণ হলে তিনি স. আমাদের পাহারা দেয়া বন্ধ করে দিলেন।

ইবনে হাব্বান তাঁর সহিহ্ গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে লিখেছেন — সফরের সময় আমরা রসুল স. এর সঙ্গে একই বাহনে আরোহন করতাম। কোথাও থেমে গেলে আমরা রসুল স. এর জন্য ছেড়ে দিতাম সেখানকার সর্ববৃহৎ বৃক্ষতল। ওই বৃক্ষের ছায়ায় তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি একটি বৃক্ষে তরবারি ঝুলিয়ে শয়ন করলেন। হঠাৎ এক লোক এসে তরবারীটি হাতে নিয়ে বললো, মোহাম্মদ! বলো, আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবে কে? রসুল স. বললেন আল্লাহ্। তারপর বললেন, তরবারি রেখে দাও। লোকটি তৎক্ষণাৎ তরবারি রেখে দিলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।'

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় যে কথাটি অতিরিক্ত রয়েছে তা হচ্ছে— গ্রাম্য লোকটির হাত কাঁপতে শুরু করলো। তার হাত থেকে তরবারীটি পড়ে গেলো এবং সে তার মাথা বৃক্ষের সঙ্গে ঠুকতে লাগলো। তার মাথা হয়ে গেল রক্তাক্ত। তখন আল্লাহ্‌পাক নাজিল করলেন এই আয়াত।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, রসুল স. বনী আনমারের যুদ্ধের সময় জাতুররেকা নামক স্থানে একটি উঁচু বৃক্ষের নিচে তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি স. একটি কুয়ার মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। অনতিদূরে ছিলো শত্রুপক্ষের কয়েকজন লোক। তাদের মধ্যে একজন ছিলো বনী নাজ্জার জনপদের। তার নাম ওয়ারেস। সে বললো, আমি মোহাম্মদকে হত্যা করবো। তার সঙ্গের লোকেরা

বললো, কেমন করে? সে বললো, আমি তাঁর নিকট গিয়ে বলবো, আপনার তরবারিটা একটু দিন, আমি দেখি। তিনি তরবারীটা দিলেই আমি তাঁকে খুন করে ফেলবো। এ কথা বলেই সে রসুল স. এর নিকটে এলো। বললো, মোহাম্মদ আপনার তরবারীটা একটু দিন, আমি দেখি। রসুল স. তরবারীটি দিলেন, কিন্তু তার হাত কাঁপতে শুরু করলো। তিনি স. বললেন, তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সন্দিহান। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। এ ঘটনাটি বোখারীও লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথাটি নেই।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আরও একটি বিস্ময়কর কারণ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি এই—মক্কাবাসের সময় রসুল স. এর সঙ্গে কোনো না কোনো দেহ রক্ষী থাকতো। তাঁর চাচা আবু তালেব প্রতিদিন তাঁর নিরাপত্তার জন্য হাশেমী বংশের কোনো একজনকে দেহরক্ষী নিযুক্ত করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও তিনি দেহরক্ষী নিয়োগ করতে চাইলেন। তখন রসুল স. বললেন, প্রিয় পিতৃব্য! আল্লাহ্পাক নিজেই আমাকে জ্বিন ও মানুষ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। কিন্তু বর্ণনাটি প্রকাশ্য প্রমাণের প্রতিকূল।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।' এ কথার অর্থ, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা সৎ পথে চলতে অনিচ্ছুক। সত্য ধর্ম ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা সদা সচেষ্ট। তাই আল্লাহ্পাক তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন, তখন তারা এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে শুরু করলো। বললো, আমরা তো অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। পরিহাস ছলে তারা এ কথাও বলতে শুরু করলো— নাসারাগণ ঈসাকে যেমন হান্নান বানিয়ে নিয়েছে, তেমনি করে আমরাও তোমাদেরকে হান্নান বানাতে চাই (এখানে হান্নান অর্থ রফিক বা বন্ধু, প্রিয় পাত্র, দয়ালু)। রসুল স. তাদের বিদ্রুপবানে জর্জরিত হয়ে মৌনতা অবলম্বন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত (আয়াত ৬৮)।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাফে, সালাম এবং মালেক বিনআলজয়ীফ ইহুদী বললো, মোহাম্মদ আপনি তো ইব্রাহিম ও তাঁর ধর্মের প্রতি আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন। বলছেন, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াবলীর উপর আপনি বিশ্বাস রাখেন। রসুল স. বললেন, হ্যাঁ আমি এ রকমই বলি। কিন্তু তোমরা ধর্মের মধ্যে নতুন কথা সংযোজন করেছো। যে সকল বিষয় মানুষের নিকট প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তোমরা সে সকল বিষয়কে গোপন করেছো। তারা বললো, যা আমরা পেয়েছি, তাই প্রচার করি। আর এ কথা নিশ্চিত যে, আমরাই রয়েছি বিশুদ্ধ হেদায়েতের উপর। তাদের এ রকম অপবক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَیْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

❒ বল 'হে কিতাবীগণ! তওরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।' তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই। সুতরাং তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।

এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মমত ভিত্তিহীন। তারা ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে তখনই যখন তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল নীতিকে বিশ্বাস করবে এবং তাতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশ মানলে সকল আসমানী কিতাব এবং সকল রসুলকে মান্য করা হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জিল মেনে নিলে মোহাম্মদ স. এবং কোরআনকেও মেনে নিতে হয় এবং প্রকাশ্যে প্রচার করতে হয় তওরাতে উল্লেখিত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর গুণাবলী। তৃতীয় কারণ হচ্ছে তওরাত ও ইঞ্জিলের ওই সকল বিধান পালন করতে হবে, যা কোরআনের মাধ্যমে রহিত হয়নি। এই আয়াত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে,পূর্ববর্তী শরিয়তের অরহিত বিধানগুলোর উপর আমল করা ওয়াজিব। আর এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের যে বিধান কোরআন কর্তৃক রহিত হয়েছে সেই রহিতকারী বিধানের উপর আমল করাই পূর্ববর্তী শরিয়তের উপর আমল করা। কারণ পূর্বাপর সকল বিধান আল্লাহ্‌র।

তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই। সুতরাং সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কোরো না।'—এ কথার অর্থ হে রসুল আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা তা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে। তাদের এই অস্বীকৃতি যত বৃদ্ধি পাবে, ততই বেড়ে যাবে তাদের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! সত্য-প্রত্যাখ্যানই যাদের একমাত্র ব্রত,তাদের জন্য দয়া প্রদর্শন এবং দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

❒ বিশ্বাসীগণ, ইহুদীগণ, সাবেয়ী ও খৃষ্টানগণের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করিলে এবং সৎকার্য করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।

❒ বনি ইসরাইলের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম ও তাহাদের নিকট রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখনই কোন রসুল তাহাদের নিকট এমন কিছু আনে যাহা তাহাদের মনঃপূত নয় তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।

❒ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না; ফলে, তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়াছিল। তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহার দ্রষ্টা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমান, ইহুদী, সাবেয়ী ও খৃষ্টান যে কোনো মতবাদের লোক তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে সংশোধন করে নিতে পারবে। যদি তারা সংশোধিত হয়, তবে কিয়ামতে তাদেরকে ভীত ও দুঃখিত হতে হবে না। ইমান বা বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে— আল্লাহ্পাকের একত্বে এবং পরকালে বিশ্বাস। আর এই অক্ষয় বিশ্বাসের কথা যে নবী বা রসুল প্রচার করেন সেই নবী রসুলের প্রতি বিশ্বাস। আর সৎ কর্ম অর্থ আল্লাহ্পাকের বিধানসম্মত বা শরিয়তসম্মত সৎকর্ম। এখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে সাবেয়ী সম্প্রদায়ের কথাও বলা হয়েছে। সাবেয়ীরা ফেরেশতাদের ইবাদত করে। কেবলার বিপরীত মুখ হয়ে নামাজ পাঠ করে এবং হজরত দাউদের জবুর কেতাব তেলওয়াত করে। সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'বনী ইসরাইলের নিকট থেকে অঙ্গীকার

গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট রসুল প্রেরণ করেছিলাম। —এ কথার অর্থ আমি তওরাতে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তওরাতে বিশ্বাস করো এবং এর নির্দেশানুযায়ী আমল করো এবং সকল নবীদের প্রতি, বিশেষ করে শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনো। এটাই ছিলো বনী ইসরাইল থেকে গৃহিত অঙ্গীকার।

'যখনই কোনো রসুল তাদের নিকট এমন কিছু আনে যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনি তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।'—এ কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাইলেরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, তওরাতের বিরুদ্ধাচারী, প্রবৃত্তির অনুগামী। তাই যখন কোনো নবী এসে তাদেরকে তওরাতের বিধানানুযায়ী চলার সদুপদেশ দেয়, তখনই তারা তাঁদের বিরোধিতা করে। কোনো কোনো নবীকে তারা বলে মিথ্যাবাদী এবং কোনো কোনো নবীকে করে হত্যা। আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নবী হত্যার প্রবণতা তাদের বরাবরই ছিলো, আছে এবং থাকবে। তাই এখানে অতীতকালের পরিবর্তে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সিগা (মুজারে) ব্যবহার করা হয়েছে। 'কতককে হত্যা করে'—কথাটির অর্থ হবে তারা রসুল স. এর সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাঁর খাদ্যে বিষ মেশায়, তাঁর উপর যাদু করে। এভাবে তারা রসুল স.কে হত্যা করতে চায়।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা মনে করেছিলো যে, তাদের কোনো শাস্তি হবে না; ফলে, তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিলো।'—এখানে বলা হয়েছে বনী ইসরাইলেরা স্থির নিশ্চিত ছিলো যে, নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বললে এবং তাঁদেরকে হত্যা করলে তারা বিপদগ্রস্ত হবে না। এই চিন্তাতেই তারা ছিলো অন্ধ ও বধির সদৃশ। সত্যকে তারা চাক্ষুস করতে পারতো না, শুনতে সমর্থ হতো না সত্যের আহ্বান।

'অতঃপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছিলেন'—এ কথার অর্থ চরম পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও এক সময় তারা অনুতপ্ত হলো। তওবা করলো। আল্লাহ্পাকের মেহেরবানী অসীম। তাই তিনি তাদেরকে ক্ষমা করলেন। অর্থাৎ অনুতপ্ত বনী ইসরাইলেরা যখন তওবা করে হজরত ঈসার উপর ইমান আনলো, তখন তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন।

'পুনরায় তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিলো।' তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা'—এখানে পুনরায় তাদের অনেকের অন্ধ ও বধির হওয়ার অর্থ পুনরায় তারা অস্বীকার করে বসলো শেষ নবী মোহাম্মদ স.কে। তাদের এসকল অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহপাক উত্তমরূপে অবগত। সুতরাং তিনি তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার শাস্তি দিবেনই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۞ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

❒ যাহারা বলে 'আল্লাহ্ই মরিয়ম তনয় মসীহ্' তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই; অথচ মসীহ্ বলিয়াছিল, ' হে বনি ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহের ইবাদত কর।' কেহ আল্লাহের শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন ও তাহার আবাস অগ্নি; সীমালংঘনকারীদিগের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

❒ যাহারা বলে 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন,' তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই—যদিও এক ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।

❒ তবে কি তাহারা আল্লাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্ বলে তারা প্রকৃত অর্থেই কাফের। হজরত ঈসা তাদেরকে এ রকম বলার নির্দেশ দেননি। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মতো আমিও আল্লাহ্র বান্দা আর আল্লাহ্ই আমাদের সকলের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করো।

কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস অগ্নি।—এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, যারা মুশরিক, তাদেরজন্য জান্নাত হারাম। কারণ, জান্নাত পবিত্র স্থান। আর মুশরিকেরা অপবিত্র। তারা গায়রুল্লাহ্কে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে। কখনও আল্লাহ্পাকের বিশেষ গুণ ও বিশেষ কার্যের মধ্যে অন্যকে শরীক করে। অথচ আল্লাহ্পাক সত্তাগত, গুণগত এবং কার্যগত (জাত, সিফাত ও আফআল) —সকল দিক থেকেই অংশীবিহীন,

সমকক্ষতাহীন ও অবিভাজ্য। কেউ হয়তো বলতে পারে আল্লাহ্পাকের অনেক গুণতো মানুষের মধ্যেও রয়েছে। যেমন মানুষও বিচারক (হাকিম), জ্ঞানী (আলীম), শ্রোতা (সামী), দ্রষ্টা (বাসির) ইত্যাদি। এ সকল গুণ তো আল্লাহ্র । তবে কি এ সকল গুণে মানুষের অংশ রয়েছে। আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন। এ রকম বিশ্বাসইতো শিরিক যা মানুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। শব্দগত মিল থাকলেও স্রষ্টা ও সৃষ্টির গুণ কখনও এক নয়। সৃষ্টির কোনো গুণই স্রষ্টার গুণের অংশ নয়। প্রতিবিম্ব অপসারিত হলেও মূল বস্তুর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সৃষ্টির গুণ সীমানাভূত। অথচ আল্লাহ্তায়ালার গুণ ধারণাতীত। সৃষ্টি দৃষ্টান্তযুক্ত। আর তিনি দৃষ্টান্তবিহীন (বেমেসাল)। অন্যত্র এই বিশ্বাসটি স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে এভাবে— 'লাইসা কা মিসলিহি শাইউন' (তিনি সকল আনুরূপ্য থেকে পবিত্র)। তাই সৃষ্টির কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর অনুরূপ, সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শরীক মনে করা যাবে না।

জান্নাত কেবল ইমানদার ও মুত্তাকীদের জন্য মুশরিকদের জন্য নয়। আল্লাহ্পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন, কিন্তু তিনি তা করবেন না। কোরআন মজীদে বিভিন্নভাবে সে কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন কোনো কিছুর বিনিময়েও অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদেরকে ক্ষমা করা হবে না। এখানেও স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে 'তাদের আবাস অগ্নি'।

'সীমালংঘনকারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই'—সীমালংঘনকারী বুঝাতে এখানে 'জ্বলিমিন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সীমালংঘনকারী তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। 'নাসের' অর্থ সাহায্যকারী। এর বহুবচন হচ্ছে আনসার (সাহায্যকারীরা)। এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে উপহাসার্থে। কেননা, ওই সীমালংঘনকারীরা ধারণা করতো আমাদের রয়েছে অগণিত সাহায্যকারী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথাটিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, একজন সাহায্যকারী থাকলেও তার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট হবে না, প্রয়োজন পড়বে অসংখ্য সাহায্যকারীর। কিন্তু সেই সাহায্যকারীর দলও তারা পাবে না।

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করলে' কথাটি আল্লাহ্পাকেরও হতে পারে। হজরত ঈসারও হতে পারে। হজরত ঈসা আল্লাহ্পাকের নির্দেশ হিসেবে এ কথা উচ্চারণ করেছেন। এ কথার মাধ্যমে তিনি খৃষ্টানদের অপবিশ্বাসকে নিজেই রহিত করে দিয়েছেন। সুতরাং সত্যানুসারীগণ কখনই তিনি (হজরত ঈসা) যা বলেছেন, তার বিরুদ্ধবিশ্বাসী হতে পারে না।

পরের আয়াতে (আয়াত ৭৩) বলা হয়েছে, তিন আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের কথা। বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিতরূপে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। খৃষ্টানদের মারকুসীয়া ও নাসতুরীরা সম্প্রদায় বিশ্বাস করতো, আল্লাহ্, হজরত ঈসা ও হজরত জিবরাইল। তাদের বিশ্বাস ছিলো সত্তাগত দিক থেকে উচ্চ মর্যাদাধারী আল্লাহ্, জ্ঞানের দিক থেকে হজরত ঈসা এবং হায়াতের দিক থেকে হজরত জিবরাইল শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলতো— আল্লাহ্ হচ্ছেন পিতা, হজরত ঈসা পুত্র এবং হজরত মরিয়ম হচ্ছেন স্ত্রী— এই তিন আল্লাহ্ই উপাস্য। (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)। তাদের এই অপবিশ্বাসের প্রমাণ রয়েছে অন্য একটি আয়াতে—'আআনতা কুলতা লিন্নাসিত্ তাখিজুনি ওয়া উম্মিইয়া ইলাহাইনি মিন্ দুনিল্লাহ্' (যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি মানুষকে এ কথা বলেছিলে যে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমার ও আমার মাতার উপাসনা করো)? এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়ামা মিন ইলাহিন ইল্লা ইলাহুউঁ ওয়হিদ' (যদিও এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই)। — এখানে 'মিন ইলাহিন' এর মধ্যে 'মিন' অতিরিক্ত সংযোজন যা সাধারণ অর্থবোধক এবং বিধেয় হবে উহ্য অর্থাৎ মুমকিনাত বা সম্ভাব্য জগতে আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্পাক সৃষ্টিকে দয়া করে অস্তিত্ব দান করেছেন। সুতরাং তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁর সত্তা, গুণাবলী এবং কার্যাবলীতে সৃষ্টির কোনো অংশ নেই।

এরপর বলা হয়েছে, 'তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই।'—এ কথার অর্থ 'আল্লাহ্ তিনজন' এ রকম শিরিক সম্পন্নবাক্য থেকে তারা যদি বিরত না হয়, এক আল্লাহ্কে উপাস্য সাব্যস্ত না করে শিরিক সহই যদি পৃথিবী পরিত্যাগ করে, তবে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই হবে। এখানে মিনহুম শব্দটি বর্ণনামূলক অথবা অংশবোধক। মিনহুম (তাদের মধ্যে) অর্থ ওই সকল সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে (আল্লাজিনা কাফারু মিনহুম)। 'হুম' কে এখানে সর্বনাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বুঝা যায় শব্দটির সর্বনাম হিসেবে ব্যবহারের কথা। পূর্বের বাক্যেও 'হুম' ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে সম্পূর্ণ আয়াতে দুবার কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে এ কথাটি পরিষ্কার হয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে যারা মৃত্যু পর্যন্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের জন্যই রয়েছে নিশ্চিত মর্মন্তুদ শাস্তি। (মৃত্যুর পূর্বেই যারা তওবা করবে তাদের জন্য নয়)।

এর পরের আয়াতে (আয়াত ৭৪) প্রশ্নাকারে জানানো হয়েছে তাঁর দয়ার্দ্র আহবান— আল্লাহ্পাক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাই তাঁর পক্ষ থেকে দয়া করে স্নেহসিক্ত আহবানটি জানানো হয়েছে এভাবে—'তবে কি তারা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না?'

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

❐ মরিয়ম-তনয় মসীহ্ তো কেবল একজন রসূল; তাহার পূর্বে বহু রসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠা ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করিত। দেখ, উহাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখ, উহারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়!

হজরত ঈসা আল্লাহ্র রসুল (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ)। তাই তিনি ছিলেন রেসালতের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। উপাস্য হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিলো না। তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো কেবল মাতার মাধ্যমে। আরো অনেক অলৌকিকত্ব দেয়া হয়েছিলো তাঁকে কিন্তু সেগুলোর কোনোটিও উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা নয়।

'তাঁর পূর্বে বহু রসুল গত হয়েছে'-এ কথার অর্থ সকল রসুলগণের মতো তিনিও একজন রসুল। সকল রসুল যেমন জীবন মৃত্যু, পানাহার ও অন্যান্য মানবিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিলেন। হজরত ঈসাও ছিলেন তেমনি। তাঁকে দেয়া হয়েছিলো কতিপয় অলৌকিক নিদর্শন—তিনি কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ রকম অলৌকিকত্ব অন্য রসুলদেরকেও দেয়া হয়েছিলো। যেমন, হজরত মুসার লাঠিকে সর্পে পরিণত করা মৃতকে জীবিত করার চেয়েও অধিক বিস্ময়কর (মৃত ব্যক্তিতো এক সময় জীবিত ছিলো কিন্তু লাঠি কখনই জীবিত ছিলো না)। হজরত ঈসাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পিতা ব্যতিরেকে। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। কিন্তু হজরত আদমের সৃষ্টি এর চেয়ে অধিক বিস্ময়কর। তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো কেবল পিতা ব্যতিরেকে নয়, মাতা ব্যতিরেকেও।

'এবং তাঁর মাতা সত্যনিষ্ঠা ছিলো।'— এ কথার অর্থ তিনিও অন্য রমণীদের মতো একজন রমণী। কিন্তু সত্যের প্রতি তাঁর ছিলো অবিচল নিষ্ঠা। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বিধান মান্যকারিণী এবং নবী রসুলগণকে সত্য বলে মান্যকারিণী।

'তারা উভয়ে খাদ্যাহার করতো'— এ কথার অর্থ অন্য মানব ও মানবীদের মতো হজরত ঈসা এবং তাঁর পবিত্রা জননী পানাহার করতেন। এই আয়াতে প্রথম দিকে হজরত ঈসা এবং হজরত মরিয়মের কামালাত ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই ফযীলত ও কামালতগুলো উপাস্য হওয়ার কোনো যোগ্যতা নয়। আর এ রকম ফযীলত তিনি অন্য নবী

রসুলদেরকেও দান করেছিলেন। বিস্ময়কর ফযীলত লাভ করা সত্ত্বেও তাঁরা যে কিছুতেই উপাস্য নন, সে কথাই পরক্ষণে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে—তাঁরা দু'জনেই খাদ্যাহার করতেন। এ কথার অর্থ যারা পানাহারের মুখাপেক্ষী, তাঁরা কখনও স্রষ্টা নন, সৃষ্টি। আর সৃষ্টি কখনই উপাস্য হতে পারে না।

'দেখো, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখো, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়'—হজরত ঈসা সৃষ্টির বৃত্তের (দায়রায়ে এমকানের) অন্তর্ভুক্ত। অন্য নবী রসুলদের মতো তিনিও অলৌকিক নিদর্শনের অধিকারী। তৎসত্ত্বেও তিনি পানাহার বিশ্রাম ও দিবারাত্রির বিবর্তনের অধীন। সকল সৃষ্টির মতো তিনি তাঁর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ্পাকের মুখাপেখী। কিন্তু মূর্খ খৃষ্টান সম্প্রদায়কে এ সকল বিশদ বিবরণ জানানোর পরেও তারা হজরত ঈসাকে সৃষ্টির বৃত্ত বহির্ভূত মনে করে নিয়েছে। স্থির করে নিয়েছে উপাস্য বলে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ○

❐ বল 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যাহার তোমাদিগের ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা নাই? আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

❐ বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না; এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হইয়াছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।'

শুরুতেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারো কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং ইবাদত করতে হবে কেবল তাঁর, অন্য কারো নয়। এ কথার অর্থ, হজরত ঈসা তো আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্ নন। তাঁর বিশেষত্বসমূহ আল্লাহ্পাকই তাঁকে দিয়েছেন। ওই বিশেষত্বের কারণেই তিনি আল্লাহ্র রসুল এবং অনেক নিদর্শনের অধিকারী। কিন্তু তিনি কাউকে সওয়াব ও আযাব দেয়ার ক্ষমতা রাখেন না। পৃথিবীতে শারীরিক সুস্থতা এবং রিজিকের প্রশস্ততা যেমন তিনি দিতে পারেন না, তেমনি পরবর্তী পৃথিবীতে দিতে পারেন না জান্নাত অথবা জাহান্নাম। এ কথাটি এখানে প্রশ্নাকারে বলা হয়েছে এভাবে 'বলো, তোমরা কি

আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করো, তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা মাত্র যার নেই?' এখানে 'মা' অর্থ মাত্র। আভিধানিক নিয়মে শব্দটি ব্যবহৃত হয় জ্ঞানহীন বস্তুর ক্ষেত্রে। জ্ঞানসম্পন্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে জ্ঞানবান হজরত ঈসাকে সৃষ্টি হিসেবে অন্যান্য চেতনাহীন সৃষ্টির সমতুল করে দেয়া হয়েছে। অন্য সৃষ্টি হিসেবে তিনিও যে আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি, সে কথা বুঝাতেই এমন করা হয়েছে। অর্থাৎ হজরত ঈসা জ্ঞানবান হলেও তাঁর জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত নয়। সুতরাং তিনি উপাস্য হবেন কিভাবে? আরেকটি বিষয় অনুধাবনীয় যে, এখানে উপকারের আগে ক্ষতির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতা নেই।' এ রকম বলার কারণ এই যে, উপকার প্রাপ্তি অপেক্ষা ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে 'ক্ষতি'র উল্লেখ করা হয়েছে 'উপকারের' পূর্বে।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াল্লহু হুয়াস্ সামিউল আলিম' (আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)।'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক সকলের সব কথা শোনেন এবং সকলের সবকিছু জানেন। তাই তিনি বিশ্বাসানুযায়ী নির্ধারণ করবেন পুরস্কার ও তিরস্কার। এখানে হজরত ঈসার উপাসনাকারীদেরকে একথাটিও বলা উদ্দেশ্য যে, হজরত ঈসা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞও নন। সুতরাং উপাসনা করতে হবে আল্লাহ্র। হজরত ঈসার নয়।

পরের আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'দ্বীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরো না'— অর্থাৎ হজরত ঈসা আ. আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রসুল— এ বিশুদ্ধ বিশ্বাসটিকে আশ্রয় করো। বিশ্বাসের এই সীমা অতিক্রম কোরো না। ইহুদীরা ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি করেছে। খৃষ্টানেরাও। তারা উপাস্য বানিয়েছে হজরত ঈসাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'হে কিতাবীগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল খৃষ্টানদেরকে।

'গইরাল হাক্বি' অর্থ অন্যায়রূপে। বাড়াবাড়ি নিশ্চয় অন্যায়। তাই এখানে এ রকম শব্দ ব্যবহার ঘটেছে। বলা হয়েছে বাড়াবাড়ি কোরো না (অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি কোরো না)। অথবা গইরাল হাক্বি সাধারণ কর্মকারক নয় বরং অবস্থান জ্ঞাপক। দ্বীনাকুম (দ্বীন সম্বন্ধে) সহযোগে অবস্থাবোধক বিশেষ্য হবে। তখন অর্থ হবে এ রকম— বাতিল ধর্মের প্রতি বাড়াবাড়ি কোরো না। অর্থাৎ বাতিল ধর্মের প্রতি অটল থেকো না।

এরপর বলা হয়েছে 'এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না'— এ কথার অর্থ তোমরা তোমাদের ওই সকল পূর্ব পুরুষের অনুসরণ কোরো না, যারা শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর আগমনের পূর্বেই ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে— (অর্থাৎ অনেক লোক তাদের বেদাত ও গোমরাহীর অনুসরণ করেছে)। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে— এ কথার অর্থ তারা রসুল স. এর আর্বিভাবের আগেই সরল পথ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়েছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৭৮

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

❒ বনি ইসরাইলের মধ্যে যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল-ইহা এই হেতু যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।

বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন হজরত দাউদ ও হজরত ঈসা। কারণ, তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী— আলোচ্য আয়াতে এ কথাটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

হরজত দাউদ অভিশাপ দিয়েছিলেন আইলার আধবাসীদেরকে। শনিবার দিন তাদেরকে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছিলো। কারণ, ওই দিনটি ছিলো সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন। কিন্তু তারা ওই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করেছিলো। তখন হজরত দাউদ বলেছিলেন, ইয়া ইলাহী! তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন এবং তাদেরকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত করে দিন। আল্লাহ্পাক তখন তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন।

হজরত ঈসা অভিশাপ দিয়েছিলেন আসহাবে মায়িদাকে। মায়িদা অর্থ খাদ্যাধার। হজরত ঈসা তাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য অবতরণ করিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ওই খাদ্য জমা করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা তা অমান্য করেছিলো। খাদ্য জমা করে রেখেছিলো। তখন হজরত ঈসা তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করুন, তাদেরকে করুন অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। আল্লাহ্পাক ওই অপপ্রার্থনা কবুল করে নিয়েছিলেন। অবাধ্যদেরকে পরিণত করেছিলেন শুকরে। তাদের সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৭৯

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

❒ তাহারা যে সব গর্হিত কার্য করিত উহা হইতে তাহারা একে অন্যকে বারণ করিত না। তাহারা যাহা করিত নিশ্চয় তাহা নিকৃষ্ট।

গর্হিত কর্মে বাধা প্রদান না করা অন্যায়। এই অন্যায়ে নিমজ্জিত ছিলো অবাধ্য বনী ইসরাইলেরা। সে কথাই বলে দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হজরত আবু বকর বলেছেন, আমি রসুল পাক স. কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, জালেমকে জুলুম করতে দেখে তার হাত না ধরে ফেললে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্পাক সকলকে শাস্তি দিবেন। এ রকম বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়। তিরমিজি এই হাদিসটিকে উত্তম ও বিশুদ্ধ বলেছেন। বিশুদ্ধ বলেছেন

ইবনে হাব্বানও। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, যদি মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখেও অন্যায়কারীকে বাধা না দেয়া হয়। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, যে জাতির মধ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হয় এবং সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ওই জাতি তা দূর করার চেষ্টা না করে, তবে অতিসত্বর তাদের সবাইকে আল্লাহ্পাক শাস্তি প্রদান করবেন।

'তারা একে অন্যকে বারণ করতো না'—কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতো না। বরং মন্দের উপরেই অনড় থাকতো। যেমন বলা হয়েছে, 'তানহা আনিল আমরি' (অমুক ব্যক্তিকে অমুক কাজে বাধা দেয়া হয়েছে)।

'তারা যা করতো নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট'—এ কথার অর্থ পাপ কর্মে বাধা সৃষ্টি না করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কর্ম। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, রসুল স, বলেন বনী ইসরাইলেরা যখন পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন তাদের আলেম সম্প্রদায় তাদেরকে এ রকম করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা ক্ষান্ত হলো না। আলেমেরাও তাদের মজলিশে বসতে শুরু করলো। পানাহার, মদ্য পান সবই চলতে লাগলো তাদের সঙ্গে। এভাবে অসৎসঙ্গের প্রভাবে আলেমদের অন্তরও হয়ে পড়লো কলুষিত। পাপকর্মের এমতো সীমালংঘনের কারণে হজরত দাউদ এবং হজরত ঈসা তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। সেই অভিশাপের ফলে তাদের কেউ হলো বানর, কেউ হলো শুকর। এরপর রসুল স. বললেন, আমার জীবন যার হাতে— সেই পবিত্র সত্তার শপথ, তোমরা অবশ্যই সৎকাজে আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। এবং ধরে ফেলবে অত্যাচারীর দু'হাত। সত্যের উপর সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় তোমাদের একে অপরের হৃদয়কে সম্মিলিত করে দেয়া হবে (সকলের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হবে) এবং আল্লাহ্পাক বনী ইসরাইলকে যেমন অভিসম্পাত দিয়েছেন, তোমাদের উপরও তেমিন অভিসম্পাত দিবেন। তিরমিজি, আবু দাউদ।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮০, ৮১

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

❒ তাহাদের অনেককে তুমি সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবে! কত নিকৃষ্ট তাহাদের কৃতকর্ম— যে কারণে আল্লাহ তাহাদের উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছেন তাহাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হইবে।

❐ তাহারা আল্লাহে নবীতে ও তাহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাসী হইলে উহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অনেকে সত্যত্যাগী।

মদীনার ইহুদী কা'ব বিন আশরাফ এবং তার সঙ্গীরা মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলো। তারা মক্কায় গিয়ে সেখানকার মুশরিকদেরকে রসুল স. এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো। যুদ্ধ করতে বলতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে। সেদিকে ইঙ্গিত করে আয়াতে বলা হয়েছে 'তাদের অনেককে তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে'। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং হাসান বলেছেন এখানে 'মিনহুম' (তাদের মধ্যে) সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে মুনাফিকদের জন্য। কেননা, তারাই ছিলো ইহুদীদের বন্ধু।

শেষে বলা হয়েছে, 'কতো নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম— যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। 'তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে'— এখানে আল্লাহ্র ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ ইহুদীদের উপর আযাবগজব অবশ্যম্ভাবী হওয়া। তাদের ওই আযাব হবে চিরস্থায়ী।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা আল্লাহ্তে নবীতে ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না'—এ কথার অর্থ ইহুদী ও মুনাফিক আল্লাহকে, তাঁর রসুল স.কে এবং কোরআনকে যদি বিশ্বাস করতো, তবে তারা মক্কার অংশীবাদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতো না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধংদেহী করে তুলতো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, মুনাফিকেরা যদি ইমানদার হতো তবে ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতো না। কেননা, আল্লাহ্র দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ইমান বিরোধী কাজ।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী।'—এ কথার অর্থ অধিকাংশ ইহুদী ও মুনাফিক দূরাচার, অবাধ্য।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮২

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا
وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۗ ذٰلِكَ
بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

❐ অবশ্য বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতা মানুষের মধ্যে ইহুদী ও অংশীবাদীদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে এবং যাহারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' মানুষের মধ্যে তাহাদিগকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখিবে, কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে, আর তাহারা অহংকারও করে না।

ইহুদী ও মুশরিকেরাই বিশ্বাসীদের প্রধান শত্রু। রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদেরকে একা পেয়ে ইহুদীদের মনে হতো, একে হত্যা করি। হজরত উবাই থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ ও ইবনে মারদুবিয়া। এখানে মুশরিক অর্থ আরবের মুশরিক। তারা ছিলো সম্পূর্ণতই প্রবৃত্তির দাস এবং তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী। সত্যের সঙ্গে তাদের কোনো প্রকার সম্পর্কই ছিলো না। তাদের শত্রুতা ছিলো সার্বক্ষণিক। এই আয়াতের শুরুতে প্রতিহিংসাপরায়ণ ইহুদীদেরকে এবং প্রবৃত্তিপরায়ণ মুশরিকদেরকে মুসলমানদের সর্বাধিক উগ্র শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে 'যারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে'-বাগবী লিখেছেন, সকল খৃষ্টানকে এখানে 'বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু' বলা হয়নি। কারণ, তারাও ছিলো ইহুদীদের মতো চরম মুসলমান বিদ্বেষী। এখানে যে খৃষ্টানদেরকে বিশ্বাসীদের নিকটবন্ধু বলা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং তাঁর সাথীগণ।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের থেকে নাসাঈ, ইবনে আবী হাতেম এবং তিবরানী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কে। ইবনে আবী হাতেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে— মুজাহিদ বলেছেন, এ আয়াতে ওই সকল খৃষ্টানদেরকে বিশ্বাসীদের বন্ধু বলা হয়েছে, যারা হজরত জাফরের সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে এসেছিলেন। আতাও এ রকম বলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে সকল ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকেই ইমানদারদের নিকটতর বন্ধু বলা হয়েছে। খৃষ্টানেরা ছিলো ইহুদীদের তুলনায় কিছুটা কোমল স্বভাবসম্পন্ন। আর তারা মুশরিকদের তেমন সাহায্য-সহযোগিতাও করতো না। ইহুদীরাই ছিলো মুশরিকদের আসল বন্ধু ও প্রধান সাহায্যকারী।

আমি বলি, খৃষ্টানদের কোনো নির্দিষ্ট দলকে এখানে মুসলমানদের নিকটতর বন্ধু বলা হয়নি। ইহুদীদের মধ্যেও তো কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম, হজরত কা'ব বিন আহবার প্রমুখ। খৃষ্টান ধর্ম থেকে আসা মুসলমানদের চেয়ে তাঁদের মর্যাদা কোনো দিক থেকেই কম ছিলো না। সুতরাং তাদেরকে বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু না বলে কেবল খৃষ্টানদেরকে এরূপ বলা যুক্তিসম্মত নয়। প্রকৃত কথা এই যে, এখানে ওই খৃষ্টানদেরকে নিকটতর বন্ধু বলা হয়েছে, যারা রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে হজরত ঈসা প্রবর্তিত ধর্মে মনে প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্রাট নাজ্জাশী এবং তার সঙ্গীসাথীরাও ছিলেন সে রকম সত্যানুসারী খৃষ্টান। মুসলমানদের বন্ধু বলা হয়েছে তাদেরকেই। যারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্র পুত্র বলে 'আল্লাহ্ তিনজন— এ রকম মতবাদে বিশ্বাস করে, তাদেরকে এই আয়াতে বিশ্বাসীদের বন্ধু বলা হয়নি। খৃষ্টানদের এ রকম দল উপদল অবিশ্বাসী ইহুদীদের মতোই প্রবৃত্তিপূজক এবং পাথরের মতো কঠিন অন্তঃকরণ বিশিষ্ট। যেমন নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়। যারা খাঁটি খৃষ্টান ছিলেন তাঁরা প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁরা জানতেন সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের নাম আহমদ। জ্ঞানী ছিলেন তাঁরা। ছিলেন পুণ্যবান

এবং পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। হজরত ঈসার ধর্মে তাঁরা ছিলেন একনিষ্ঠ। তাই তাঁদের অন্তরে ছিলো সত্যের সতত উদ্ভাস।

'কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে'—এ কথার অর্থ খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক আলেম ও মাশায়েখ রয়েছেন। বাগবী লিখেছেন, রুমী ভাষায় 'ক্বিস' এবং ক্বিস্‌সিসীন অর্থ আলেম। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, খৃষ্টানদের নেতৃস্থানীয় আলেমদেরকে বলা হয় ক্বিস্‌সিসীন। শব্দটির অর্থ (কোনো কিছু) অন্বেষণকারী। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে ক্বিসসিসীন অর্থ নাসারাদের আলেম, আবেদ ও সরদার। এবং ক্বিস অর্থ রাতে কোনো বস্তু তালাশ করা। ওলামা ও মাশায়েখ রাতেই জ্ঞানান্বেষণ করতেন। ইবাদতে রত থাকতেন। এখানে রুহ্‌বান (সংসার বিরাগী) শব্দটি রাহেব শব্দের বহুবচন। খানকাবাসী একাগ্রচিত্ত সাধকদেরকে রুহবান বা সংসার বিরাগী বলা হয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'তারা অহংকার করে না'—এ কথার অর্থ সত্যের দিকে আহবান করা হলে তারা ইহুদীদের মতো জঘন্য আচরণ করে না।

হজরত কাতাদা বলেছেন, কিছুসংখ্যক আহলে কিতাব বিশুদ্ধ ঈসায়ী শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রসুল পাক স.এর আবির্ভাবের পর তারা তাঁকে বিশ্বাস করে মুসলমান হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 'জালিকা বিআন্না মিনহুম ক্বিসসিসিনা ও রুহ্‌বানা' (তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে)।

আমি বলি, হজরত কাতাদা ওই সকল খৃষ্টানদের কথা বলেছেন, যাঁরা রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর স. আবির্ভাবের পরে ইমান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন তিন প্রকার ব্যক্তির জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। তাদের মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে ওই সকল কিতাবী, যারা তাদের নবীর উপর ইমান এনেছিলো, পরে ইমান এনেছে মোহাম্মদ স. এর উপর। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, কোরায়েশ নেতারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো, মুসলমানদেরকে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ কষ্ট দিয়ে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিতে লাগলো। ক্রমাগত চালিয়ে যেতে লাগলো শারীরিক নির্যাতন। আল্লাহ্‌পাক কাউকে কাউকে এই অসহনীয় নির্যাতন থেকে রক্ষা করলেন। রসুল স. কে নিরাপদে রাখলেন তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের মাধ্যমে। নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছলো, তখন রসুল স. অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে বললেন। কেননা তখন পর্যন্ত জেহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। রসুল স. বললেন, আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ পুণ্যবান। সে কারো প্রতি জুলুম করে না। তার কাছে গেলে কেউ জুলুম করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা সেখানে চলে যাও। আল্লাহ্‌পাক সুদিন দিলে ফিরে আসতে পারবে। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্‌কে বলা হতো

নাজ্জাশী। যেমন রোমের বাদশাহ্কে বলা হতো কায়সার এবং ইরানের বাদশাহ্কে বলা হতো কাসরা. আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর প্রকৃত নাম ছিলো আসহামা। আবিসিনিয়ার ভাষায় নাজ্জাশী অর্থ দাতা। রসুল স. এর নির্দেশে ইসলামের প্রথম হিজরতকারী দল আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ওই দলে ছিলেন হজরত ওসমান গণি এবং তাঁর সহধর্মিনী রসুল তনয়া হজরত রোকেয়া, হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত আবু হুজায়ফা বিন উত্বা এবং তাঁর স্ত্রী হজরত সাহালী বিনতে সুহাইল বিন আমর, হজরত মুসআব বিন উমায়ের, হজরত আবু সালমা বিন আবদুল আসাদ এবং তাঁর স্ত্রী হজরত উম্মে সালমা বিনতে উমাইয়া, হজরত ওসমান বিন মাজউন, হজরত আমর বিন রবীয়াহ্ এবং তাঁর স্ত্রী হজরত লাইলী বিনতে আবী হাইসুমা, হজরত হাতেব বিন আমর এবং হজরত সহল বিন বায়দা— এই পনেরো জন। রসুল স. এর নবুয়ত প্রাপ্তির পঞ্চম বৎসরে সংঘটিত হয়েছিলো এই হিজরত। হিজরতকারী দলটি সমুদ্রের তীরে পৌছে অর্ধদিনার দিয়ে একটি নৌকা ভাড়া করে নিয়ে আবিসিনিয়ায় পৌছে ছিলেন।

কিছু দিন পর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত জাফর বিন আবু তালেব। এরপর ধীরে ধীরে অন্য মুসলমানেরাও আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহিলা ও শিশু ছাড়াই তাঁদের সংখ্যা পৌছলো বিরাশিতে।

কোরায়েশ নেতারা যখন জানতে পারলো দেশত্যাগী মুসলমানেরা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আবিসিনিয়ায়, তখন তারা আবিসিনিয়ায় পাঠালো আমর বিন আসকে। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ ও সভাসদদের জন্য কিছু উপঢৌকনও পাঠানো হলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো বাদশাহ্কে উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে প্রসন্ন করে দেশত্যাগী মুসলমানদেরকে তারা মক্কায় ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তারা সফল হলো না। আল্লাহ্পাক মুসলমানদেরকে হেফাজত করলেন। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। আমর বিন আস ও তার সঙ্গীদের অকৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে সসম্মানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। এর কিছু দিন পর রসুল স. মদীনায় হিজরত করলেন। ষষ্ঠ হিজরীতে তিনি স. হজরত আমর বিন উমাইয়ার মাধ্যমে নাজ্জাশীর নিকট একটি বরকতময় পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে লিপিবদ্ধ ছিলো— উম্মে হাবিবা সম্মত হলে তাকে আমার সঙ্গে বিবাহবদ্ধ করে দাও এবং মুহাজির মুসলমানদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।

হজরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান তাঁর স্বামীর সঙ্গে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর স্বামীবিয়োগ ঘটে। রসুল স. তাই তাঁকে শুভবিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন।

রসুল স. এর নির্দেশানুসারে নাজ্জাশী তাঁর ক্রীতদাসী আবরাহাকে চারশত দিনার দিয়ে এবং রসুল স. এর প্রস্তাব নিয়ে হজরত উম্মে হাবিবার নিকট প্রেরণ করলেন। এ পবিত্র প্রস্তাব পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন হজরত উম্মে

হাবিবা। আনন্দের আতিশয্যে তিনি আবরাহাকে খুলে দিলেন তাঁর হাতের কংকন এবং হজরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আসকে নিযুক্ত করলেন বিবাহের উকিল। তিনি চারশত দিনার মোহরানা নির্ধারণ করে শুভবিবাহ সম্পন্ন করলেন। বিবাহের মোহর পরিশোধ করে দিলেন নাজ্জাশী। মোহরানার স্বর্ণ মুদ্রাগুলো আবরাহা পৌঁছে দিলেন হজরত উম্মে হাবিবাকে। তিনি মোহরানার স্বর্ণ মুদ্রাগুলো থেকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা আবরাহাকে উপহার দিতে চাইলেন। আবরাহা বললেন, বাদশাহ্ আমাকে কোনো উপহার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।। আমিই তো বাদশার রাজকোষের পরিচালিকা। আমি রসুল মোহাম্মদ স.কে বিশ্বাস করি। আমার একটি বিনীত নিবেদন এই যে, যখন আপনি মদীনায় পৌঁছবেন, তখন প্রিয় রসুলকে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন। জননী উম্মে হাবিবা বললেন, এটিতো অত্যন্ত শুভসংবাদ । বাদশাহ তাঁর সহধর্মিনীদেরকে নির্দেশ দিলেন, হাতের কাছে যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য পাও (উদ, আম্বর ইত্যাদি) সে সকল সুগন্ধি দ্রব্য পাঠিয়ে দাও। জননী উম্মে হাবিবা বলেছেন, আমরা আবিসিনিয়া থেকে যখন মদীনায় যাত্রা করলাম, তখন রসুল স. অবস্থান করছিলেন খায়বরে। কেউ কেউ খায়বরে চলে গেলেন। কিন্তু আমি থেকে গেলাম মদীনায়। রসুল স. খায়বর থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে পরস্পর মিলিত হলাম আমরা। তিনি স. আমার নিকট নাজ্জাশীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন। আমি সব বললাম এবং সেই সঙ্গে পৌঁছে দিলাম আবরাহার সালাম। তিনি স. সালামের জবাব দান করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—আসাল্লহু আঁই ইয়াজ্আলা বাইনাকুম ওয়া বাইনাল্লাজিনা আদাইতুম মিনহুম মুআদ্দাতান (অচিরেই আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিবেন, যারা ছিলো তোমাদের শত্রু)।

হজরত উম্মে হাবিবাকে বিবাহ করার কথা শুনে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান প্রসন্ন হলেন। বললেন, মোহাম্মদ অভিজাত এবং সাহসী পুরুষ। তাঁর মধ্যে কোনো দোষ নেই।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের নেতা হজরত জাফরের সঙ্গে নাজ্জাশী তাঁর পুত্র আরহা বিন আসহামা বিনিল জরকে মদীনায় পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো ষাট সদস্যবিশিষ্ট একটি আবিসিনিয় দল। নাজ্জাশী তাঁর পুত্রের মাধ্যমে একটি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেছিলেন— যাতে লেখা ছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্য রসুল। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাসমূহে আপনার পবিত্র প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমি আপনার প্রতিনিধি ও পিতৃব্যপুত্র হজরত আবু জাফরের মাধ্যমে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি এবং বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র একত্বকে স্বীকার করে নিয়েছি। আপনার পবিত্র সংসর্গে আমি আমার প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করলাম। যদি আদেশ হয়, তবে আমি নিজেও উপস্থিত হবো। আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্।

হজরত আবু জাফরের কাফেলার সঙ্গে নাজ্জাশীপুত্র রওয়ানা হলো মদীনায়। কিন্তু সমুদ্রযাত্রার সময় তাঁর নৌকা নিমজ্জিত হলো অথৈ সাগরে। সকলেই উদ্ধার

পেলো। নাজ্জাশী পুত্রকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। হজরত আবু জাফরের সঙ্গে পশমী বস্ত্র পরিহিত তাঁর সত্তরজন সঙ্গী উপস্থিত হলেন রসুল স. এর পবিত্র দরবারে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আবিসিনিয়ার ষাটজন এবং শামের আটজন। রসুল স. তাঁদেরকে সম্পূর্ণ সুরা ইয়াসিন পাঠ করে শুনালেন। কোরআনের মর্মস্পর্শী পাঠ শুনে কেঁদে ফেললেন নতুন অতিথিরা। তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন, এই পবিত্র বাণী সম্ভার তো ওই বাণীবৈভবের মতো যা অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত ঈসার উপর। এরপর অবতীর্ণ হলো 'এবং যারা বলে আমরা খৃষ্টান, মানুষের মধ্যে তাদেরকে তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু বলে দেখবে'— এই আয়াতে ওই খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে, যারা নাজ্জাশীর নির্দেশে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সত্তর জন।

মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, তাঁরা ছিলেন চল্লিশজন—বত্রিশজন আবিসিনিয় এবং আটজন শামী। আতা বলেছেন, আশিজন ছিলেন তাঁরা— নাজরানের বনী হারেসা গোত্রের চল্লিশ জন, আবিসিনিয়ার বত্রিশ জন এবং শাম বা রোমের আটজন। ইবনে আবী শায়রা, ইবনে আবী হাতেম এবং ওয়াহেদী, ইবনে শিহাবের সূত্রে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, আবু বকর বিন আবদুর রহমান এবং ওরওয়া বিন জোবায়েরের মুরসাল বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, রসুল স. হজরত আমর বিন উমাইয়া দ্বমেরীকে একটি পত্রসহ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করলেন। হজরত আমর যথাসময়ে নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছে দিলেন সেই পবিত্র পত্র। নাজ্জাশী সেই পত্র পাঠ করে ওলামা ও মাশায়েখগণকে দরবারে তলব করলেন। হজরত জাফরকেও তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ নিয়ে এলেন দরবারে। হজরত আবু জাফর সুরা মরিয়ম পাঠ করে শোনালেন। পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে সকলেই ইমান গ্রহণ করলো। তাঁদের নয়ন থেকে নির্গত হলো অশ্রুর ধারা। তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে—'এবং যারা বলে আমরা খৃষ্টান.........সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যবহদিগের তালিকাভুক্ত করো' (৮৩ আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, নাজ্জাশী ফাল্লাস নামক তাঁর এক পুণ্যবান দরবারীকে একটি দলসহ প্রেরণ করলেন রসুল স. এর খেদমতে। রসুল স. তাঁদেরকে সুরা ইয়াসিন পাঠ করে শুনালেন। পবিত্র বাণীর আবৃত্তি শ্রবণ করে তাঁরা সকলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত।

নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের বলেছেন,, নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

তৃতীয় খণ্ড শেষ